১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১ প্রকাশের স্থান—৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২ প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩ মুদ্রক—দেবেশ রায়, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭

৪ প্রকাশক—ঐ ঐ ঐ

৫ সম্পাদক—দেবেশ রায়, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৯

৬ পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর যে-সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট-১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩/এল, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৯॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ১২৪, রাজা সুবোধ-চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৪৭॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫/বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৩, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-৩২॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ফ্ল্যাট-৮, ১।১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪৫।৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯/এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২/বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', ৫২, গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩/বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩/সি, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত

স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৪ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩/ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০/এল, শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯/এ, বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯।এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি. বি. সি. রোড, জলপাইগুড়ি ॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় দূতাবাস, ঢাকা, বাঙলাদেশ ॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫ ॥ ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১/এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কল্‌কাতা-৭ ॥ ১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫/বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯ ॥ ৪২। দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬১২।১, ব্লক-ও, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ ॥ ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্ল্যাট-বি সি ৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬ ॥ ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১।২, হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট-২, ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৯। অজয় দাশগুপ্ত, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৫০। সুরেন ধরচৌধুরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥

আমি দেবেশ রায় এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

স্বাঃ দেবেশ রায়

২০.৩.৭৯

বি—২

দীপেন্দ্রনাথের আকস্মিক অকাল প্রয়াণে আমাদের শোকে ও বেদনায় তাঁর ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী সকলকেই আমরা একাত্ম করে পেয়েছি। তাঁর শ্রদ্ধেয় আদর্শস্থানীয় গুরুজন, প্রাণপ্রতিম সুহৃদ এবং স্নেহভাজন কনিষ্ঠ সকলেই আমাদের মুহ্যমান চিত্তকে স্নেহ, সমবেদনায় আশ্রয় দিয়েছেন। আমাদের শোকসন্তপ্ত দিনগুলিতে যাঁরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধায় ছিলেন অংশভাক, তাঁদের সকলকে আমাদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা অজস্র শোকবার্তা পেয়েছি, পত্রোত্তর দেওয়ার অক্ষমতা জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৮ বর্ষ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৫ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯

প্রচ্ছদ সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয় প্রাঃ লিমিটেড-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

'পরিচয়'-এর পঞ্চাশ বৎসরে পৌঁছনোর আর-যখন সামান্যই বাকি তার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের সম্পাদকের এই স্মরণসংখ্যা অবশেষে আমাদের বের করতে হল।

ছাপার ব্যাপারে দীপেন্দ্রনাথ খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন। বেশ কিছু বছর তিনি প্রায় একা 'পরিচয়'-এর সব লেখার সব প্রুফ দেখতেন। আর সেই ক-টি বছরে প্রায়-নির্ভুল ছাপা সম্ভব এমন একটি ধারণাও তিনি দিতে পেরে-ছিলেন। খুব ঝরঝরে, পরিষ্কার, একটু বোধহয় সাবেকি ছাঁচ ছিল তাঁর পছন্দ। সে সব কথা ভেবে এই সংখ্যা বের করতে লজ্জাই হচ্ছে। ছাপাখানার ধর্মঘট, টাইপ ফাউণ্ড্রির নানা গোলমাল, সবার ওপরে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তা—এই সব কারণে আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি হয়ে উঠেছিল ছেপে বের করাটাই। আর এমন তাড়াহুড়োতে যা যা ঘটার তাই হয়েছে।

এই সংখ্যা প্রকাশে সবার কাছ থেকেই আমরা সাহায্য পেয়েছি। অনেকে হয়ত লিখে উঠতে পারেন নি—লেখাটা বড় বেদনাদায়ক বলে। একটু দেরিতে হাতে আসায় একটি-দুটি লেখা আর দেয়া গেল না।

দীপেন্দ্রনাথের কাগজপত্র থেকে উদ্ধার করে শ্রীমতী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন তাঁর পুরনো লেখাগুলি। 'পরিচয়'-এর কর্মী শ্রীমতী সুলেখা মল্লিক সেই সব খোঁজাখুঁজি ও টোকাটুকিতে খুব খেটেছেন। প্রুফ পরীক্ষায় যত্ন নিয়েছেন শ্রীপ্রশান্ত মিত্র ও শ্রীকেশব দাস।

১৮ মে, ১৯৭৯ সম্পাদক, পরিচয়

দীপেন্দ্রনাথের রচনা

'একজনের নাম দীপেন্দ্রনাথ'

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রস্তুতিতে দীপেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন, দিল্লিতে। পরে ১৯৭০-এ এই লেখাটি পড়েছিলেন আকাশবাণীর কলকাতার বাঙলা গল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে এক আলোচনায়।

একটা গল্প বলি। একজনের নাম দীপেন্দ্রনাথ। সে নিজের সম্পর্কে বেজায় খুঁতখুঁতে, কিন্তু পিতৃপুরুষের দেওয়া এই নাম তার খুব পছন্দ। দীপ-ইন্দ্র থেকে দীপেন্দ্র, অর্থাৎ সূর্য। লোকটা নিজের নাম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। আর তার শুদ্ধতা বজায় রাখতেও সাধ্যমতো চেষ্টা করে থাকে।

কিন্তু বানান আর ব্যাকরণের প্রাথমিক সূত্রটুকুও সকলে মেনে চলে না। তাই নানা জনের হাতে পড়ে তার নামের অর্থ হরেক রকম হয়ে উঠল।

জেলখানায় একদিন সে চিঠি পেল। খামের ওপর প্রেরক তার নামের বানান লিখেছেন দ-য় ব-ফলা দীর্ঘ ই-কার, অর্থাৎ দ্বীপেন্দ্র। মানে—দ্বীপ। খামের ভেতরটা শূন্য ছিল। হাতের লেখা দেখে কিছুতেই সে বুঝতে পারল না ফাঁকা একটা এনভেলাপ কে পাঠিয়েছে। লোকটা হঠাৎ ধাক্কা খেল। এতদিন নিজেকে সে অনন্ত সৌরলোকের অবিচ্ছিন্ন অংশ মনে করত। জেলখানায় বসেও অনুভব করত আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আর ভিয়েতনাম মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম ইতিহাসের একই সূত্রে বাঁধা। চিঠি বিহীন সেই খামের দিকে তাকিয়ে লোকটা এই প্রথম একবার নিজের চারপাশ খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। তারপর নিজেকে সমুদ্রে ঘেরা নিঃসঙ্গ এক দ্বীপ কল্পনা করে হঠাৎ শিউরে উঠল।

লোকটার এক শিল্পী বন্ধু ছিলেন। জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি বাড়ি বয়ে এসে একদিন লোকটিকে তাঁর চতুর্থ একক প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্র দিয়ে গেলেন। লোকটা বেজায় খুশী হয়ে কার্ডখানা হাতে নিয়ে দেখল—তার নামের বানান লেখা হয়েছে দ-য়ে ব-য়ে হস্তি, অর্থাৎ দ্বিপেন্দ্র। শিল্পী রঙ আর রেখা বোঝেন ভালো, বাংলা বানান-টানান বেচারির আসেই না। এই নিয়ে সে খুব এক চোট ঠাট্টা করতে যাবে—হঠাৎ বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। নিজের কুচ্ছিত মুখ আর উঁচু দাঁত কটা সে স্পষ্টই দেখতে পেল। তারপর দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবল—তাকে হস্তি এবং মূর্খ বলা যায় বৈকি! একদা এই বন্ধুর সঙ্গেই তো সে তার প্রথম ও অন্তিম প্রদর্শনী করেছিল।

যথাদিনে সে বন্ধুর "ক্রুদ্ধ আর বিমূর্ত আর বৈপ্লবিক" চিত্রাবলীর প্রদর্শনীতে গিয়ে ক্লাউন সিরিজের ভাঁড়ের সঙ্গে নিজের মুখের সাদৃশ্য দেখে একটুও বিস্মিত হলো না। বরং বেশ কিছু অনুরাগিণী পরিবৃত বন্ধুর শিল্প বিষয়ে নানা গূঢ় আর আত্মসন্তুষ্ট আলোচনা মন দিয়ে শুনল। তারপর সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চেপে এলাকায় দৌড়ল। সেখানে মধ্যবর্তী নির্বাচন বয়কট করার জন্য কয়েকটা সুন্দর পোস্টার পড়েছে। তাকে নির্বাচন সফল করার আহ্বান জানিয়ে কয়েকটা ব্যানার আঁকতে হবে।

আর, তাদের সমস্ত কাঁটা ধ্বস্ত করে, তারপর একদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের আকাশে আলোর ফুল ফুটল। যুক্তফ্রণ্টের বিজয় উৎসব!

তাকে চারদিক থেকে পরিচিতজনেরা "দীপেন দীপেন" বলে ডাকতে লাগলেন। সে কার ডাকে আগে সাড়া দেবে? ক রয়েছেন সব থেকে সামনে, যদি তাকে প্রথম সাড়া দেয়—খ তাহলে অবধারিত ভাবে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করবেন। আর গ ভাববে ক নেতা, তাই সে তাঁকেই আগে রেকগনাইজ করছে। এবং ঘ ভাববে—বুদ্ধিজীবীরা মজুরের ডাকে সাড়া দেবে কেন?

কাউকে হাত নেড়ে, কাউকে চোখের ইশারায়, কাউকে হেসে, কাউকে বা দুটো কথা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে করতে সে ভাবতে লাগল—এই উৎসব সভায় তাকে খুঁজে বার করতে হবে, সেই মেয়েটিকে। ১৯৬৭ সালের বাইশে নভেম্বর এই প্যারেড গ্রাউণ্ডে যুক্তফ্রণ্টের সভা করতে এসে এক অজ্ঞাতনামা তরুণী রক্তের ছোপধরা সবুজ মাঠে আড় হয়ে অচৈতন্য পড়েছিল। তার দিকে পেছন ফিরে উদ্যত অস্ত্র হাতে ক'জন সান্ত্রী দূরের কয়েকটা

গাছ কিছু মানুষের দিকে তাকিয়ে হিংস্র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল। বুট আর মোজাপরা লোমশ পাগুলোর কাছে যেন বা আকস্মিক আক্রমণে হতচেতন বাঙলাদেশ, যেন হাড়িকাঠের সামনে একরাশ ঝরা ফুল।

আজকের উৎসব সভায় লোকটা তাই সেই তরুণীকে খুঁজছিল। সে চাইছিল ঝাণ্ডা আর মানুষের তরঙ্গের মধ্যে সেই রমণী হাসিমুখে বুক চিতিয়ে হেঁটে বেড়াক।

ঘুরতে ঘুরতে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা। গলায় লাল রোমাল বাঁধা আট-ন-বছরের দুরন্ত ছেলেটার হাত শক্ত করে ধরে রেখে জয়ন্তী তার সঙ্গে কথা বলছে—হঠাৎ হাজার হাজার মশালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের আকাশ আলো হয়ে উঠল। আর পাখির ডানার মতো ঝাণ্ডা উড়ছে। আর জয়ধ্বনির সমুদ্রকল্লোল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে লোকটার সাধ হলো চীৎকার করে গান গেয়ে ওঠে: "সার্থক জনম আমার..."

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী বলল: তোমাদের সত্যাগ্রহ সার্থক হলো দীপেন।

লোকটা উত্তর দিতে যাবে, তার আগে জয়ন্তীর হাতের বাঁধনে হাঁপিয়ে ওঠা বালক অবজ্ঞার সঙ্গে বলল: ছাই! দীপেন আবার একটা নাম! মানে কি?

লোকটা থতমত খেয়ে ভাবল—সত্যিই তো দী-পে-ন—এই শব্দ-সমষ্টির তো কোন অর্থ হয় না অথচ প্রায় সকলে তাকে এই নামেই ডেকে থাকে। কারণ পুরো নামটা বেজায় লম্বা, আর মানুষের স্বভাবই হচ্ছে বড়কে সুবিধেমতো ছোটো করে নেওয়া।

সভা শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। কিন্তু প্রিয়তম নেতার বক্তৃতা শেষ হয়েছে। তার শ্রোতাদের বড় একটা অংশ মশাল হাতে স্লোগান দিতে দিতে বাড়ি যাচ্ছে। প্যারেড গ্রাউণ্ডটাকে এখন খেলা শেষের ফুটবল গ্রাউণ্ডের মতো মনে হচ্ছে। মশালের সেই ছোটাছুটির দিকে তাকিয়ে লোকটা অন্যমনে ভাবতে লাগল—তাইতো! মানে কী? বালককে কী উত্তর দেবে? এই উৎসব সভায় দাঁড়িয়ে সে কি বলবে—কিছু লোক তাদের সুবিধের জন্য পবিত্র একটি নামকে নিছক অর্থহীন শব্দ-সমষ্টিতে পরিণত করেছে। সে তার বোঝা টেনে বেড়াচ্ছে মাত্র।

জয়ন্তী মুখ টিপে হেসে বলল: কেন, সুন্দর নাম। ডীপ মানে জানো না? দীপেন হচ্ছে গভীর, যাকে বলে অতলান্ত।

বালক সন্দেহে চোখ কুঁচকে বলল: কিন্তু কাকু কি সাহেব?

জয়ন্তী বলল: কাকু সাহেব বাঙালী সব। কাকু যে—

বালক বাধা দিয়ে বলল: তাহলে কাকু কিছু না!

জয়ন্তী বলল: তাহলে তোমার বাবুও কিছু না!

বালক রেগে উঠে বলল: কেন? আমার বাবু তো শ্রীবিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কি সাহেবদের মতো নাম?

লোকটা এতক্ষণে প্রশ্ন করল: বিপ্লব মানে কী?

বালক গম্ভীর হয়ে বলল: তুমি আমার দিদিমণি যে পড়া জিজ্ঞেস করছ?

লোকটা হেসে ফেলল। বালকও রেহাই পেয়ে খুশী। কিছুটা তোষামোদের সুরেই যেন বলল: ডি ডবল-ই পি ডীপ। ডীপ মানে গাঢ়। হ্যাঁ মা, গাঢ় মানে কি গভীর?

জয়ন্তী আড় চোখে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল: হ্যাঁ।

আশ্চর্য এই সময়। কখনো সোজা কখনো জটিল পথ বেয়ে নিরন্তর সে তার ধ্রুব লক্ষ্যের দিকে চলেছে।

মানুষ ভিয়েতনামের জঙ্গলে বন্দুক হাতে লড়ছে। মানুষ গ্রীসের সামরিক কারাগারে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী পালন করছে। মানুষ আফ্রিকার অন্ধকারে আলোর উপাসনায় মেতেছে। মানুষ কিউবার তামাক ক্ষেতে সভ্যতার অজেয় বনিয়াদ গড়ছে। মানুষ ভারতবর্ষের বসিরহাটে বেনামী জমি দখল করে সমবায় খামার গড়ে মহাভারতের দেশকে এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছে দিয়েছে।

আশ্চর্য এই সময়। নিজ গ্রহের সীমা অতিক্রম করে মানুষ তার সভ্যতাকে এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ আর ঐতিহাসিক এক শহরে মশার কামড় খেয়ে বৃষ্টির জলে ভেসে রোদের তাপে শুকিয়ে সেই মানুষটা বাঁচছে। সেই মানুষটা এই আশ্চর্য আর জটিল সময়ের সঙ্গে, এই গ্রহের সঙ্গে, অনন্ত সৌর জগতের সঙ্গে মানব সভ্যতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার জন্য লড়াই করছে।

লোকটা নিজের সম্পর্কে বেজায় খুঁতখুঁতে। নিজের নাম সম্পর্কে ভয়ানক স্পর্শকাতর। সে চায় শুদ্ধতা বজায় রেখে চলতে।

আর মাঝে মাঝেই ধাক্কা খায়। আর মাঝে মাঝেই নিজেকে প্রশ্ন করে—আমি কে? আমি কি সূর্য না অন্ধ; আমি কি বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ, না গভীর কোনো অস্তিত্ব? নাকি আমি কিছু না, কয়েকটা অর্থহীন শব্দের সমষ্টিমাত্র?

এই ভাবে বাঁচতে বাঁচতে লোকটা নিরন্তর নিজেকে খুঁজছে, নিজের নামের অর্থ খুঁজছে। আর, অনন্ত সৌরজগতের পটভূমিতে নিজেকে দাঁড় করিয়ে বারবার প্রশ্ন করছে—আমি কে! আমি কেন! আমি কোথায়!

লোকটা জানে সময়ের দায় মেটানোই হলো সময়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার একমাত্র শর্ত।

আমার মনে হয় আত্মসনাক্তকরণের এই আকুতি, ভবিষ্যতের কাছে এই সময়ের সাক্ষ্য বহনের আন্তরিক প্রয়াসই রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, ধূর্জটি-প্রসাদ, মানিক বাঁড়ুজ্যের বাঙলা গল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা হতে পারত!

১৭ই মার্চ, ১৯৭০

সূর্যমুখী

'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১, জুন, ১৯৫৪-তে প্রকাশিত। এটি 'পরিচয়'-এ দীপেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা—পূর্ব পাকিস্তান সফর সেরে।

ভয় ছিল ভেঙে পড়ব। ভয় ছিল হয় তো মুখ তুলে তাকাতে পারবো না। যেন বর্তমান শতাব্দীর অপরাধবোধ চেপে বসছে আমার কাঁধে। উত্তর দাবি করছে, চাইছে জবাব।

চিনতাম না। তবু, এতগুলি বিছানার মধ্যেও এক দৃষ্টিপাতে তাঁকে খুঁজে নিলাম। সাদা শাড়ি, সাদা জামার মধ্যে একখানি শ্বেত-মূর্তি। পায়ের দিকে খাটের গায়ে ঝোলানো জ্বরের চার্ট। ওদিকে একটা মিট্‌সেফ। ওপরে সুকান্তর বই কখানা ছড়ানো।

সুভাষদা আলাপ করিয়ে দিলেন। ইলা মিত্র আমার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন। আবার চোখ বন্ধ করলেন। তারপর আবার তাকালেন, এবং তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

সুভাষদার হাতে নাজিম হিকমতের কবিতা। বললেন, পড়ে শোনাই ?

কিছুক্ষণ তাঁরও মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ইলা মিত্র। তারপর ঘাড় নাড়লেন আস্তে আস্তে। সঙ্গে ছিলেন আনোয়ার। তিনি বললেন : আপনি বসুন সুভাষদা। বসে বসে পড়ুন।

বিছানাতেই বসলেন সুভাষদা কোনো রকমে। আমি তখনো দাঁড়িয়ে। ইলা মিত্র আঙুল দিয়ে ইশারা করে আমাকেও বসতে বললেন। অন্যমনস্ক ছিলাম। বসতে গিয়ে ইলা মিত্রের পায়ে আঘাত দিয়ে ফেললাম। চমকে সরে গিয়ে কপালে হাত ঠেকালাম আমি। দেখলাম, ইলা মিত্রের সেই রোগা রোগা হাতখানাও কপালের ওপর। না, মুহূর্তের জন্যও তাঁর মন নিষ্ক্রিয় হয় নি।

সুভাষদা বইয়ের পাতা উল্টিয়ে কবিতা খুঁজছিলেন। আমি দেখিয়ে দিলাম 'কলকাতার বাঁড়ুজ্যে'। পড়তে সুরু করলেন তিনি। পরপর পড়লেন আরও অনেক কবিতা। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছেন ইলা মিত্র। কবিতায় যেখানে যেখানে অত্যাচারের বিবরণ আছে, সেইখানে চমকে উঠছেন হঠাৎ। সমস্ত দেহটা মুচড়ে, বিছানার ওপর বুক চেপে শুয়ে তিনি যেন চাইছেন শুধু শরীরের যন্ত্রণা নয়, মনের কতগুলো দুঃস্বপ্নকেও গুঁড়িয়ে ফেলতে।

তারপর আস্তে আস্তে নামল প্রশান্তি। স্থির, শান্ত চোখে ওপরের দিকে চেয়ে তিনি শুনতে লাগলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ, নাজিম হিকমতের বাংলা অনুবাদ। কি আশ্চর্য যোগাযোগ, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম।

তারপরেই মনে পড়ল।

গাঁয়ের চাষীরা বিদ্রোহ করলে, তেভাগা চাই। রাতারাতি জোতদার পাইক পাঠিয়ে মাটির বাঁধ কেটে দিল। বললে, জমিতে ধানের বদলে মাছের চাষ করবে সে। ভেসে গেল ঘর-দোর খেত-খামার। জল থইথই সেই মাটিতে তবু আশ্চর্যভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল একটা খেজুর গাছ। সেই পরিবেশে গাছটাকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কারুণ্য আর প্রতিজ্ঞা মেশানো এক সুকঠিন শপথ যেন।

ইলা মিত্রের মুখ আর চোখে আজ আবার দেখলাম সেই আকাশ-মুখীনতা।

ঠিক তখনই ভদ্রলোক এলেন। কবিতা পড়া থামে নি কিন্তু। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকেই প্রশ্ন করলেন তিনি : আপনি তো কাল যাচ্ছেন? ভদ্রলোকের গলায় অন্তরঙ্গতা।

হেসে বললাম : হ্যাঁ।

সুভাষবাবু তো পরশু যাচ্ছেন?

আবার বললাম : হ্যাঁ।

মনোজবাবুরা আজ চলে গেলেন, না?

এবারও একই উত্তর দিলাম। কোনো সন্দেহ মনে জাগে নি। দিনে লক্ষবার লক্ষজনকে দিতে হয়েছে কে কবে ফিরছেন তার ফিরিস্তি। সুতরাং—।

ভদ্রলোক হঠাৎ বোকার মতো একটু হাসলেন। ততক্ষণে সুভাষদা কবিতা পড়া থামিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। অপ্রতিভের মতো আগন্তুক তাঁকে নমস্কার জানালেন। তারপর চারদিকে একবার তাকিয়ে ইলা মিত্রকে অত্যন্ত দ্রুত একটা নমস্কার নিবেদন করে চলে গেলেন তিনি।

ইলা মিত্র আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন : কে?

বললাম : চিনি না তো।

সুভাষদার দিকে তাকালেন তিনি। তিনিও আমার কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। হঠাৎ দুষ্টু মেয়ের মতো ফিক্ করে হেসে ফেললেন ইলা মিত্র। তারপর ফিসফিস করে বললেন : আই-বি।

ও। হেসে উঠলেন সুভাষদা। তারপর আবার ঝুঁকে পড়লেন কবিতার বইয়ের ওপর।

ঠিক কিছুক্ষণ গেল। তারপর এল নতুন একটা দল। কয়েকজন ভদ্রলোক এবং একটি ভদ্রমহিলা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। চোখে রুপোর ফ্রেমের চশমা। পরনে থান।

শুনলাম তিনি নাকি কোনো এক রাজবন্দীর মা। যতদূর মনে পড়ছে আনোয়ার বললেন, জেল-আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন এঁর ছেলে। তবু তো তিনি মা! ইলা মিত্রের মাথায় কপালে কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। কোনো কথা বললেন না মা। কোনো কথা বলল না কেউ।

চোখ বুজে কুঁকড়ে ইলা মিত্র শুয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে মা কয়েক পা দূরে সরে গেলেন। এবং ছোট্ট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন তাঁর দল নিয়ে।

আবার শুরু হল কবিতা-পাঠ। আই-বি-র অন্য একটি লোক এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। গলা বাড়িয়ে দেখতে চাইলেন কী বই পড়া হচ্ছে। আনোয়ারের হাতে ছিল সুভাষদার 'ভূতের বেগার'। আমার ইশারায় না নিজের বুদ্ধিতে জানি না, আনোয়ার বইটা বুকের ওপর এমন ভাবে চেপে ধরলেন যাতে দূর থেকে দেখা যায় বইটার নাম—ভূতের বেগার। ভদ্রলোক চলে গেলেন।

সেদিনের এক ঘণ্টার অভিজ্ঞতা। কত রকমের কত লোকজন আসছেন ইলা মিত্রকে দেখতে। কথা কেউই বলছেন না। নীরবে শ্রদ্ধা জানিয়ে, স্নেহ জানিয়ে চলে যাচ্ছেন তাঁরা, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও দেন না আশপাশের রোগিণীরা। বলেন : আপনারা এবার যান। ওঁর শরীর ভালো নেই। শুনলাম হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, জমাদার প্রত্যেকেরই নাকি ইলা মিত্রের ওপর সশ্রদ্ধ সতর্ক দৃষ্টি। তাই তিনি বেঁচে আছেন, বেঁচে উঠছেন। আর মুহুর্মুহু আসছেন আই-বি-র লোকেরা। ইলা মিত্রের মুখের দিকে তাকাবার সাহস তাঁদের নেই। চোরের মতো ঘোরা-ফেরা করছেন বারবার। এবং চলে যাচ্ছেন।

গান শুনতে ইচ্ছে করে? হঠাৎ সুভাষদা জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে ইলা মিত্র ঘাড় নাড়লেন। যেন, 'না' বললে আমরা দুঃখ পাব, তাই 'হ্যাঁ' বলছেন। আনোয়ারকে সুভাষদা বললেন, 'মাঝে মাঝে রেকর্ড এনে আপনারা গান শুনিয়ে যাবেন।' আমি জুড়লাম, 'কেন, আপনাদের গায়কও তো আছেন অনেক।' ইলা মিত্র তাকিয়ে রইলেন একভাবে। আমাদের কোনো কথা শুনলেন কি শুনলেন না, বোঝা গেল না।

ঘণ্টা বেজে গেছে, এবার আমরা যাব। সুভাষদা এগিয়ে গেছেন। আমি ইলা মিত্রকে বললাম, 'কাল দুপুরে চলে যাচ্ছি। আর তো আসতে পারব না। কলকাতায় আপনাকে আমরা নিয়ে যাবই। তখন আবার দেখা হবে। আপনি আবার সেরে উঠবেনই।'

অভিভূতের মতো আমার দিকে চেয়ে রইলেন ইলা মিত্র। যেন অবাক হয়ে আমার কথা শুনছেন।

একটু থেমে আমি বললাম, 'এবার যাই ?'

কোনো কথা বললেন না তিনি। একভাবে তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে চলে এলাম।

আমি আর সুভাষদা এক ঘরে শুই। সেই রাতেই ঘুমোবার আগে দেখলাম সুভাষদা বসে বসে কী লিখছেন। পরদিনও ঘুম থেকে উঠে দেখি, তখনও বসে বসে কি লিখছেন। অনেক আগেই ওঁর চা-টা-র পর্ব সারা হয়ে গেছে।

আনোয়ার আর আবদুল এসে পড়লেন। সুভাষদা গেলেন ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে। সেই ফাঁকে পাতা উল্টে দেখলাম, নতুন কবিতা—

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার—

মনে হল আনন্দে চিৎকার করে উঠি। ইলা মিত্রকে দেখার আগেই, তাঁকে নিয়ে আমার অনেক কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল। পড়েছিলাম গোলাম কুদ্দুসের কবিতা—স্তালিন-নন্দিনী, ফুচিকের বোন ইলা মিত্রের সেই আশ্চর্য বন্দনা। কিন্তু রোগশয্যায় ইলা মিত্রকে দেখে বারবার খালি মনে হয়েছে, তিনি যেন আরো কিছু, অন্য কিছু! অনেক ভেবেও সেই বিশেষ কথাটি কিছুতেই মনে আনতে পারি নি। আজ সুভাষদার কবিতায় যেন নিজেরই প্রাণের প্রতিচ্ছবি দেখলাম। মনে হল সত্যিই তিনি—পারুল বোন আমার।

তারপর হঠাৎ মনে হল, আর একবার যেতে হবে আমায়। এখনই। কালকে চলে আসবার সময় ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমন সুর ওখানে বেজে ওঠে নি। হয়তো আজ সেই অভাব মিটবে।

সাইকেল রিক্সায় চড়ে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম। ওখানে তখন বিপুল উত্তেজনা। সুদৃশ্য পোস্টারে আগেই দেয়াল ছেয়ে গেছে। আজ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন।

ছাত্ররা অনেকে এসে পাশে দাঁড়ালেন। বললাম : আজ দুপুরে পালাচ্ছি। একবার দেখা করতে চাই।

ওটা জেনানা-ওয়ার্ড। সঙ্গে পাস্ না থাকলে সকালে ঢোকা সম্ভব নয়। একজন ছাত্র আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

যেতে যেতে বললাম, 'ফুল কিনতে পাওয়া যায় না?'

উনি লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, 'না। ঢাকায় ঐ একটা মস্ত অভাব।'

আশেপাশে অজস্র ফুল ফুটে আছে। দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছও লালে লাল। কিন্তু কৃষ্ণচূড়া আনার সময় ছিল না। এখানেও মালিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নিরাশ হয়েই ফিরতে হল আমাকে। আমি তখন মরিয়া। কোনো দিকে না তাকিয়েই হঠাৎ বাগান থেকে তাজা সূর্যমুখী ফুল একটা ছিঁড়ে নিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য। হলে ঢুকে ইলা মিত্রের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমি তাঁকে দেখার আগেই পারুল বোন আমাকে দেখেছেন। সেই হাসিতে আছে অভ্যর্থনা, আছে আহ্বান।

কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'আজ দুপুরে আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে আপনাকে দেখার জন্য আর একবার না এসে কিছুতেই পারলাম না।'

তখনও পারুল বোন হাসছেন। যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ হেসেছেন তিনি। সে হাসিতে শব্দ নেই। চোখ আর মুখ দিয়ে সে হাসি লাবণ্যের মতো ঝরে পড়ে। জানি না আজকের সূর্যে, আজকের সকালে কী মায়া ছিল!

বললাম, 'আপনার জন্য ফুল এনেছি।'

সেই রোগা রোগা হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। তারপর সূর্যমুখী ফুলটা রাখলেন মাথার পাশে বিছানার ওপর।

বললাম, 'আপনার শরীর খারাপ। কিন্তু কোনো কথাই কি বলতে পারবেন না?'

অবশেষে ইলা মিত্র কথা বললেন। অত্যন্ত মার্জিত গলা, শিক্ষিত উচ্চারণ। স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'কী করে বলব বলুন তো। কথা বললেই যে গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। এই তো একটু আগে স্টমাক-ওয়াশ করে গেল। আমি যে নিশ্বাস নিতেই কষ্ট পাচ্ছি।' কথাগুলো আক্ষেপের। কিন্তু আশ্চর্য, বললেন হেসে-হেসে।

আমি বললাম, 'কুদ্দুস সাহেবের কবিতাটা পড়েছেন আপনি?'

লজ্জায় তার মুখটা রাঙা হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে জানালেন, পড়েছি।

আমি বললাম, 'ও কিন্তু একা কুন্দুসের কথা নয়, আমাদের সকলের কথা। সকলের—সমস্ত পূব আর পশ্চিমবাংলার। পারুল বোন গভীর স্বরে বললেন, 'জানি। আপনাদের জন্যেই বাঁচব আমি। আপনাদের জন্যেই আমাকে বাঁচতে হবে।'

আমি বললাম, 'শুধু আমার নয়, আমাদের অনেকেরই জানার কৌতূহল ছিল, আজ আপনি কী ভাবছেন, আজ আপনি কী বলতে চান! সে প্রশ্নের উত্তর পেলাম। ওখানে গিয়ে বলব আপনার কথা। বলব, আপনি বাঁচবেন। আমাদের জন্যেই বাঁচবেন। বেঁচে আবার বাঁচাবেন অন্যকে। সত্যি, বেঁচে আপনাকে উঠতেই হবে।'

আশ্চর্য মমতার সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে পারুল বোন বললেন, 'হাঁ, বলবেন। তাই বলবেন আপনি।'

আরো কিছুক্ষণ ছিলাম। অন্য কথাও হল। ছাত্রবন্ধুটি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললাম, 'এইবার যেতে হবে। এখানে আর আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। তবে কলকাতায় নিশ্চয়ই।'

সে কথার উত্তরে হঠাৎ পারুল বোন বললেন, 'যাওয়ার আগে বলি, সকলকে আমার মে-দিবসের অভিনন্দন।'

চমকে উঠলাম। বোঝাতে পারব না আমার তখনকার অবস্থা। এসেছিলাম ইলা মিত্রকে সান্ত্বনা দিতে, প্রেরণা জোগাতে! কিন্তু, এ কোন শিক্ষা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি? আজ পয়লা মে, হাসপাতালে ঢুকে সে কথা আমি সাময়িকভাবে ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! রোগ-যন্ত্রণা আর সীমাহীন মানসিক সংঘাতের মধ্যেও তো আমার পারুল বোন ঠিক সে কথা মনে রেখেছেন।

আবার নতুন করে তাকালাম তাঁর দিকে। দেখলাম বিছানার ওপর শুয়ে ইলা মিত্র, পাশে আমার দেওয়া সূর্যমুখী ফুল। দু' জনেরই চোখ আকাশের দিকে, সূর্যের দিকে।

বললাম, 'চলি দিদি?'

একমুখ হেসে পারুল বোন ঘাড় নাড়লেন।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

লেনিন শতাব্দী

১৯৭৮-এ দীপেন্দ্রনাথ 'লেনিন শতাব্দী' নামে একটি কাব্য-সংকলন সম্পাদনা করেন—উপলক্ষ: লেনিন শতবর্ষ। তাঁর ভূমিকার একটি অংশ উদ্ধৃত হল।

১৮৭০ সালের ২২এ এপ্রিল একটি মানুষ জন্মেছিলেন—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। নচিকেতার মতো 'নরক'-এ গিয়ে তিনি জীবনের রহস্য উপলব্ধি করলেন। ১৯০০ সালে লেনিন হাতে আনলেন নাচিকেত অগ্নি 'ইসক্রা'। তারপর ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে একটি রাষ্ট্র জন্ম নিল—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র।

এই মানুষ এবং এই দেশ পৃথিবীকে যে-আশ্চর্য উপহার দিল—তারই নাম সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা। সেই সভ্যতা বরফে ফুল ফোটাল, মরুতে নদী বহাল, মহাকাশে ওড়াল মানব সভ্যতার বিজয়পতাকা।

তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইলিচ লেনিনের প্রতি মানুষের ভালোবাসার অন্ত নেই। তাই এই লেনিন শতাব্দীতে মরুভূমি, মেরুদেশ ও সমুদ্র-ঘেরা দ্বীপ পৃথিবী গ্রহের যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয়, সেখানেই লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। গ্রীসের ফ্যাসিস্ট কারাগার, বলিভিয়ার জঙ্গল, ভিয়েতনামের পাহাড়, আফ্রিকার খনি, সমাজতান্ত্রিক দেশের সমবায় খামারে একই সঙ্গে লেনিন-উৎসব চলছে। এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে মহাভারতের এই দেশের বাঙালি কবিরাও ইতিহাসের সেই ধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন।

লেনিন ছিলেন কবির কবি। আজন্ম ধ্রুপদী সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পের শুদ্ধ রুচিতে গঠিত লেনিন তাই বিপ্লব-পরবর্তী সমস্ত হঠকারিতার সামনে বুক পেতে

দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—প্রলেতারীয় সংস্কৃতি কোনো ভুঁইফোড় বস্তু নয়, একমাত্র বেজন্মাদেরই ঐতিহ্য বলে কিছু থাকে না। আবার 'ঐতিহ্য'-অনুসরণের নামে দেশ-কাল-শ্রেণী-নিরপেক্ষ যে-'সৃষ্টি', যা সময় ও মানুষের পক্ষে নয়—তাকেও লেনিন কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গ্রহণ ও বর্জনের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠবে, শিল্পের নিয়মে তার শরীর নির্মিত হবে, শ্রেণীচেতনা কমিটমেণ্ট তার অন্বয় হবে আত্মা—লেনিনের এই বোধ সভ্য মানুষের ইতিহাসে এ-যাবৎ অবরুদ্ধ সৃষ্টির এক মহান সম্ভাবনাকে এই প্রথম পৃথিবীতে ভগীরথের মতো আবাহন করল। আর, নদী বইল। নদী আজও বয়। সোভিয়েত রাষ্ট্র নতুন সংস্কৃতি ও তার স্রষ্টাদের চোখের মণির মতো সযত্নে লালন করল। তাই গৃহযুদ্ধের সেই ছন্নছাড়া দিনেও একজন নর্তকীর মোজার অভাব লেনিনকে বিচলিত করত, প্রচণ্ড আপত্তি ওঠা সত্ত্বেও 'বলশয়' থিয়েটারের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় অব্যাহত রাখার প্রশ্নে তিনি লুনাচারস্কির পাশে দাঁড়াতেন

আর, কবিদের মর্যাদা সম্পর্কে লেনিন সব সময় সচেতন ছিলেন।

ভালো গদ্যের থেকে মাঝারি কবিতা লেখা সোজা—গর্কীর এ-মন্তব্য তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল।

তাই তিনি সব দেশের কবিদেরই আত্মার আত্মীয়, সব ভাষার কবিতারই অন্যতম বিষয়. তাই পৃথিবী জুড়ে কবিরা কবিতা লিখে লেনিনকে বন্দনা করেন, আবার তার মধ্য দিয়ে কবিতাকেও বন্দনা জানান। তাই শুধু "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে"ই নয়, সৎ সৃষ্টির প্রতিটি সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবিরা নিজেদের মধ্যে লেনিনের সেই অমোঘ উপস্থিতি অনুভব করেন।

তারপর সৃষ্টি। আর, সৃষ্টি মানেই তো অন্বয়। এবং কে না জানেন—লেনিন ও অন্বয় সমার্থক শব্দ হয়ে গেছে।

সামনের শতাব্দীতে মানুষ গ্রহান্তরে লেনিন-উৎসব করবেন। এমন দিনও আসবে যখন অনন্ত সৌরলোকের দিকে দিকে সেই উৎসব ছড়িয়ে পড়বে। অপরাজেয় মানুষ তার সভ্যতার রাঙা নিশান হাতে মহাশূন্যে নতুন থেকে নতুনতর ইতিহাস সৃষ্টি করতে থাকবে।

কিন্তু তার আগে এই গ্রহকে লেনিনের নামের যোগ্য করতে হবে। এই গ্রহকে লেনিন হতে হবে।

কৈশোরে তিনি জারের পুলিশকে বলেছিলেন—এ-দেয়াল ভাঙবে, যৌবনে

সহকর্মীকে বলেছিলেন—সাইবেরিয়া বদলাবে, প্রৌঢ় বয়েসে ওয়েলসকে বলেছিলেন—রুশদেশের অন্ধকার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের বাতি জ্বলবে, মৃত্যুর আগে দেশবাসীদের বলেছিলেন—শিশু সোভিয়েতকে রক্ষা করো···দুনিয়া পাল্টে যাবে।

লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, হচ্ছে। পৃথিবীর মানচিত্রের গায়ে কৃষ্ণচূড়ার মতো লেনিনের স্বপ্ন নিয়তই ফুটে উঠছে। এই গ্রহ ক্রমেই লেনিন হচ্ছে।

এই হয়ে ওঠা কোনো উদারনৈতিক বা হঠকারী সহজসাধনের পথে সম্ভব ছিল না। দেশে দেশে তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে আরও দিতে হবে। ভারতবর্ষের সামনে অপেক্ষা করছে কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তর। কে না জানেন সত্য সহজে মেলে না! কে না বোঝেন কী দুস্তর পথ বেয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভকে লেনিন হতে হয়েছিল!

এই শতাব্দী তাই কঠোর আর অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। ১৯৭০ সালের মানুষ বুঝেছে মুক্তির অব্যাহত সংগ্রাম আর লেনিন হয়ে ওঠার সাধনাই শ্রেষ্ঠ লেনিন-উৎসব।

সেই উৎসবের আর্তি ও উল্লাসই 'লেনিন শতাব্দী'। এই সঙ্কলন তাই সন্ধিলগ্নের বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের অমোঘ জন্মযন্ত্রণার কান্না আর শঙ্খধ্বনির, এক অনন্য অর্কেস্ট্রা।

কবিরা এইভাবেই শিল্প ও সময়ের ঋণ পরিশোধ করেন, ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হন।

রচনাপঞ্জি

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথের অভ্যেস, সেই কৈশোর থেকেই, লেখা কোথায় প্রকাশ হল, তা নোটবইয়ে টুকে রাখা। লেখার-কপি তিনি রাখতে পারতেন না। শেষে তাঁর এই লেখার-বিবরণ-টোকা নোট-বইটি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর প্রায় সারা জীবনেরই রচনাপঞ্জি, কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সহ। বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম, একজন লেখক তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জি তৈরি করে গেলেন।

দীপেন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জিটি, যেমন তাঁর তৈরি, আমরা অবিকল প্রকাশ করছি। পদ্ধতিগত সঙ্গতির খাতিরে দু-একটি জায়গায় তথ্যগুলোর পরম্পরা আর তাঁর ব্যবহৃত যতিচিহ্ন—ব্র্যাকেট, কোলন, ড্যাস ইত্যাদি—বদলেছি, দুটি জায়গায় বানান। ইংরেজি হরফে ইংরেজি তারিখ, বা কোথাও বাংলা হরফে, মূলেই আছে।

আমার জানা কিছু তথ্য, তাঁর জীবনের প্রাসঙ্গিক কোনো খবর, ক্বচিৎ ক্ষীণ মন্তব্য—জুড়েছি, তৃতীয় ব্র্যাকেটে। শেষের নোটগুলোও আমার। এ-ব্যতীত আর সব কিছুই দীপেন্দ্রনাথের।

মার্চ, ১৯৭৯

দেবেশ রায়

১৩৫৫ [১৯৪৮-১৯৪৯]

[দীপেন্দ্রনাথের জন্ম : ১০ নভেম্বর, ১৯৩৩]

আমার দেশের মানুষ। কিশোর (দৈনিক) ৫ই পৌষ, সোমবার

[পনের বছর বয়সে প্রকাশিত এই রচনাটি প্রথম মুদ্রিত প্রকাশিত লেখা]

১৩৫৭ [১৯৫০-১৯৫১]

কিশোর সংগঠন। সবুজের অভিযান, নববর্ষ (বৈশাখ)

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষালের ছদ্মনামে লিখিত

সবুজের অভিযান। সংকলন, (সম্পাদনা), নববর্ষ (বৈশাখ)[১]

আলো। শিশুসাথী, অগ্রহায়ণ

স্বাধীন অনুবাদ

১৩৫৮ [১৯৫১-১৯৫২]

[১৯৫২ সালে দীপেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বর্ষ সাহিত্যে ভর্তি হন]

দূরের মায়া। শিশুসাথী, বৈশাখ

দূরের মায়া। শিশুসাথী, জ্যৈষ্ঠ

দূরের মায়া। শিশুসাথী, আষাঢ়

প্রথম প্রেম। পুনশ্চ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ

দুঃখের পূর্ণিমা। শিশুসাথী, আশ্বিন

রামধনু। মৌচাক, চৈত্র

আগামী। [উপন্যাস]। প্রথম খণ্ড—মাঝি, গ্রন্থ

প্রথম প্রকাশ পনেরই কার্তিক (১৯৫১)

দ্বিতীয় প্রকাশ পনেরই অগ্রহায়ণ

[১৮ বছর বয়সে রচিত ও প্রকাশিত এটি দীপেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস ও প্রথম প্রকাশিত বই। 'ঘরোয়া', সাপ্তাহিক, শারদীয়, ১৯৭৮-এ পুনর্মুদ্রিত। অন্নদাশঙ্কর রায় উপন্যাসটির ভূমিকা লিখে দেন।]

১৩৫৯ [১৯৫২-১৯৫৩]

জিজ্ঞাসা। অভিক্রমা, বৈশাখ

বালক। [?]

উত্তরকাল, পুনশ্চ, জীবনকথা, শিশির, অভিক্রমা

গ্রহণ। নতুন সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ

ঘরোয়ানা। রবিবাসরীয় সত্যযুগ, ১৫ই আষাঢ়, 29th June, 52

ঝলক। রবিবাসরীয় সত্যযুগ, ১১ই শ্রাবণ, 27th July, 52

সে

কর্মী রবীন্দ্রনাথ। রবিবাসরীয় সত্যযুগ, ১লা ভাদ্র, 17th August, 52

কর্মী রবীন্দ্রনাথ। রবিবাসরীয় সত্যযুগ, ১৫ই ভাদ্র, 31st August, 52

কিন্তু। জাতক, পূজা সংকলন, আশ্বিন

য়্যাকসিডেণ্ট। অচলপত্র, পূজা-সংখ্যা-নয়, ভাদ্র-আশ্বিন

বৃত্ত। ঝরনা, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন

ডাক। অভিক্রমা, পূজা সংখ্যা, আশ্বিন

আমড়া। রূপবাণী, কার্তিক

শঙ্খ। সৃজনী প্রকাশের পুস্তিকা, কার্তিক

মুক্তি। ছাত্র-ছাত্রী, অগ্রহায়ণ-পৌষ

না। নতুন সাহিত্য, ফাল্গুন

শঙ্খ। (গল্প) পুস্তিকা—প্রকাশ, কার্তিক

[আগেও একবার উল্লেখিত]

১৩৬০ [১৯৫৩-১৯৫৪]

পথিক। শিশুসাথী, বৈশাখ

সানাই। নতুন সাহিত্য, আশ্বিন

কবিরাজ। উত্তর স্বাক্ষর, আশ্বিন

কান্না। ছাত্র-ছাত্রী, আশ্বিন

আজ-কাল-পরশু। অগ্নি আখর, আশ্বিন

শুঁয়োপোকা। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ

উজান। সংকলন, (সম্পাদনা), আশ্বিন

গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্ম-সম্পাদক

১৩৬১ [১৯৫৪-১৯৫৫]

[১৯৫৪-তে দীপেন্দ্রনাথ আই-এ পাশ করে স্কটিশচার্চ কলেজে তৃতীয় বর্ষে বাংলায় অনার্স সহ ভর্তি হন। তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে নিতে আপত্তি করা হয়]

১৩৬১-৬৭ পর্যন্ত নিয়মিত লেখা হয় নি। কোন কোন লেখা বাদ থাকতে পারে।

২৪. ১১. ৬০ [ইংরেজি তারিখ]

কাছের মায়া। গল্প-সংকলন, বৈশাখ, (১৯৫৪)

গ্রহণ, বৃত্ত, সানাই, মডেল, কিন্তু, মহাকাব্যের ভূমিকা

আরেক ঢাকায়।[২] নতুন সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ

[১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জিতলে পশ্চিমবঙ্গের লেখক-প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ঢাকা যান। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই দলে ছিলেন]

সূর্যমুখী। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

[১৯৫৪-তে ঢাকা সফরে হাসপাতালে ইলা মিত্র-কে দেখার রিপোর্টাজ। এটিই 'পরিচয়'-এ দীপেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত লেখা]

সেতু। শঙ্খ, জ্যৈষ্ঠ

বিদ্যুৎ। রবিবাসরীয় স্বাধীনতা, ১৯শে ভাদ্র, 5th Sept, 54

মন। চলমান, শারদীয় সংকলন, আশ্বিন

গান। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা

অমৃত। নতুন সাহিত্য, শারদীয় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন

বনাম। সাঁকো, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

এজেন্ট। কল্পনা-সাহিত্য, শারদীয় সংকলন, আশ্বিন

বিজ্ঞানের রূপকথা। চতুষ্কোণ, অগ্রহায়ণ-মাঘ

'জানবার কথা'-র [দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত] সমালোচনা

ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড প্রসঙ্গ। উজান, চৈত্র

আলোচনা

কাছের মায়া। গল্প-সংকলন

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ৬১

[আগে একবার উল্লেখিত]

উজান। (সম্পাদনা), ফাল্গুন, ৬১

১৩৬২ [১৯৫৫-১৯৫৬]

[স্কটিশ চার্চ কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র]

বর্ষণ। চতুষ্কোণ (মাসিক), বৈশাখ

পুস্তক-পরিচয়। পরিচয়, আষাঢ়

নোবেল পুরস্কার ও বিশ্বসাহিত্যের সমালোচনা

শোক। আগামী, শ্রাবণ

বালি। পাত্তাবাহার, আশ্বিন

স্মৃতি। পরিচয়, আশ্বিন কার্তিক

একটি লোক-হাসানো গল্প। নতুন সাহিত্য, আশ্বিন-কার্তিক

অমৃতকুম্ভ। কল্পনাসাহিত্য, আশ্বিন

পালুসকর। নতুন সাহিত্য, অগ্রহায়ণ

বিয়োগপঞ্জি

দক্ষিণের পাঁচালি। আগামী, চৈত্র

১৩৬৩ [১৯৫৬-১৯৫৭]

[১৯৫৬-তে দীপেন্দ্রনাথ বি-এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হন]

দক্ষিণের পাঁচালি। আগামী, বৈশাখ

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে। নতুন সাহিত্য, বৈশাখ

আলোচনা

মুহূর্ত। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

'জীবনী বিচিত্রা'। নতুন সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ

সমালোচনা

দক্ষিণের পাঁচালি। আগামী, আষাঢ়

'টনির স্বপ্ন'। পরিচয়, আষাঢ়

সমালোচনা

শাঁখা-সিঁদুর। পরিচয়, ভাদ্র-আশ্বিন

ভাসান। নতুন সাহিত্য, আশ্বিন-কার্তিক

হিসাব। কল্পনা সাহিত্য, শ্রাবণ-আশ্বিন

অ-শারদীয় সাহিত্য। লোকায়ত, শরৎ সংকলন

আলোচনা

সার্কাস। যাত্রী, শারদীয় সংখ্যা

ভিন্ন ভুবন। বিংশ শতাব্দী, অগ্রহায়ণ

'গোধূলির রং'। পরিচয়, অগ্রহায়ণ

পুস্তক-পরিচয়

১৩৬৭ [১৯৫৭-১৯৫৮]

'জুয়াড়ী', 'বাড়িওয়ালী'। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

সমালোচনা

নেয়ারের খাট, মেহগিনি পালঙ্ক, একটি ছুটি সন্ধ্যা। একতা, (বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা), আশ্বিন

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মৃত্যু নিয়ে লেখা রিপোর্টাজ]

সম্পর্ক। স্বাধীনতা, শারদীয় সংখ্যা

তৃতীয় ভুবন। উপন্যাস, নতুন সাহিত্য, শারদীয় সংখ্যা

'বেলুগিনের বিবাহ', 'মানুষের জন্ম', 'পিতা ও পুত্র', 'তৃষ্ণা'। পরিচয়, চৈত্র

সমালোচনা

১৩৬৫ [১৯৫৮-৫৯]

[১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলায় এম-এ পাশ করেন। ফল বেরোয় ১৯৫৯ এর ফেব্রুয়ারিতে]

ঘাম। পরিচয়, নববর্ষ সংখ্যা

[এই গল্পটি নিয়ে 'পরিচয়'-এ ও প্রগতিশীল সাহিত্য-রসিক মহলে বিতর্ক হয়।]

ছাত্র অভিযান (নবপর্যায়)। (সম্পাদনা), শ্রাবণ

শিক্ষাজগৎ, প্রসঙ্গকথাঃ শিক্ষার অধিকার, মৃত্যুহীন, ছাত্রসংবাদ—১ম সংখ্যার এই ৪-টি লেখা আমার।

[বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের আসানসোল সম্মেলনে, ১৯৫৮ দীপেন্দ্রনাথ ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র ছাত্র অভিযান'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন]

তৃতীয় ভুবন। উপন্যাস, গ্রন্থ, ভাদ্র, আগস্ট, ১৯৫৮

ছাত্র অভিযান। ২য় সংখ্যা (সম্পাদনা), ভাদ্র-আশ্বিন

বিজ্ঞানাচার্য অধ্যাপক জোলিও কুরীর মৃত্যুতে, অভিনন্দন, মাধবপুরের ইতিকথা, শিক্ষাজগৎ ছাত্রসংবাদ—২য় সংখ্যার এই ৫টি লেখা আমার।

আমার হাতে শেষ সংখ্যা। এই পর্যায়ে আরও একটি সংখ্যা বোধহয় বেরিয়েছিল। সম্পাদক হিসাবে আমার নাম থাকলেও আমি কিছু দেখি নি।

নরকের প্রহরী। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা

বাঁশিওলা। নয়া দমদম, শারদীয় সংখ্যা

'মুলঁ্যা রুজ'। পরিচয়, পৌষ

পুস্তক পরিচয়

'চৈত্রদিন'। পরিচয়, মাঘ

পুস্তক-পরিচয়

তৃতীয় ভুবন। উপন্যাস, ভাদ্র ১৩৬৫

[আগে উল্লেখিত]

ছাত্র অভিযান। (সম্পাদিত), শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র

[আগে উল্লেখিত]

একতা। (সম্পাদিত), ডিসেম্বর, ১৯৫৮

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ প্রকাশিত বার্ষিকী

১৩৬৬ [১৯৫৯-১৯৬০]

উৎসবের আহ্বান। ত্রিমাত্রিক, [?] সংকলন, বৈশাখ

চিঠি। ছোটগল্প, শারদীয় সংখ্যা

চর্যাপদের হরিণী। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা

কয়েকটি মৃত্যু। চতুষ্কোণ, শারদীয় সংকলন

মৃত শহর। বসন্ত। নতুন সাহিত্য, শারদীয় সংখ্যা

একটি গাভীর মৃত্যু। নয়া দমদম, শারদীয় সংখ্যা

'চা মাটি মানুষ'। পরিচয়, কার্তিক

পুস্তক-পরিচয়

'বর্ষা বিজয়'। পরিচয়, কার্তিক

কজ্জল সেন নামে

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। রবিবাসরীয় স্বাধীনতা, ৬ই ডিসেম্বর, ৫৯

'তিন তাসের খেলা'। পরিচয়, পৌষ

পুস্তক-পরিচয়

'সাগরে মিলায় ডন', 'ধীর প্রবাহিণী ডন'। পরিচয়, পৌষ

কজ্জল সেন নামে

পি. এ. বি.-র আলোকচিত্র প্রদর্শনী। যুগান্তর, ৬ই ফাল্গুন, ১৯.২.৬০

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, চৈত্র

১৩৬৭ [১৯৬০-১৯৬১]

পাস্তেরনাক। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

সংস্কৃতি সংবাদ: বিয়োগপঞ্জী

'প্রবন্ধ পত্রিকা'। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

পত্রিকা-প্রসঙ্গ। কজ্জল সেন নামে

জটায়ু। ছোটগল্প : নতুন রীতি, আষাঢ়

'আমেরিকায় শিশিবকুমার'। পরিচয়, আষাঢ়

পুস্তক-পরিচয়

চর্যাপদের হরিণী। গল্প সংকলন, শ্রাবণ, জুলাই ১৯৬০

ভাসান, কয়েকটি পৃথিবী (তিন ভুবন). ঘাম, নরকের প্রহরী, চর্যাপদের হরিণী

ফুল ফোটার গল্প। পরিচয়, ভাদ্র-আশ্বিন

প্রহরা। নতুন সাহিত্য, কার্তিক-পৌষ

অশ্বমেধের ঘোড়া। ছোটগল্প, শারদীয় সংখ্যা

পরীক্ষা। স্বাধীনতা, শারদীয় সংখ্যা

দিনে দিনে। ঋতায়ন, শারদীয় সংখ্যা

আকাশ। জাগৃহি, আশ্বিন

চিঠি। স্বর্ণসম্পুট, শারদীয় সংগ্রহ

পুনর্মুদ্রণ। 'ছোটগল্প', শারদীয় ১৩৬৬ [থেকে]

সার্কাস। কালীঘাট সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পত্রিকা, শারদ সংকলন

পুনর্মুদ্রণ। 'যাত্রী', শারদীয় ১৩৬৩ [থেকে]

জটায়ু। উত্তরণ, ভাদ্র

পূর্ববঙ্গের পত্রিকা। বিশেষ...সংখ্যা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের। পুনর্মুদ্রণ।
'ছোটগল্প : নতুন রীতি', আষাঢ় [থেকে]

'বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকা'। পরিচয়, কার্তিক

পত্রিকা-প্রসঙ্গ। কজ্জল সেন নামে।

শিল্পীর স্বাধীনতা ও মানুষের মুক্তি (সার্ত্র)। পরিচয়, কার্তিক

সংস্কৃতি সংবাদ

অশ্বমেধের ঘোড়া। এই দশকের গল্প, সম্পাদক—বিমল কর, অগ্রহায়ণ

পুনর্মুদ্রণ। ছোটগল্প' শারদীয় ১৩৬৭ [থেকে]

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, অগ্রহায়ণ

আমাদের যৌবন ও স্বাধীনতা। স্বাধীনতা, রবিবার, ১০ পৌষ, ২৫.১২.৬০

ষোড়শ প্রতিষ্ঠা দিবস সংখ্যা

ঈশ্বরের সহিত সংলাপ ১ ও ২। আশাবরী, অগ্রহায়ণ

'উত্তরণ'। পরিচয়, পৌষ

পত্রিকা-প্রসঙ্গ। কজ্জল সেন নামে

সভ্যতার প্রহরী ও কারাগার (সেকেরাস), অ্যাংগ্রি ওল্ড ম্যান এবং অন্যান্য।
পরিচয়, পৌষ

সংস্কৃতি-সংবাদ

ঈশ্বরের সহিত সংলাপ ৩। আশাবরী, পৌষ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ১। বিংশ শতাব্দী, পৌষ

'মুরলীধর বসু', 'ইউজিন ডেনিস'।

সংস্কৃতি-সংবাদ, বিয়োগপঞ্জী

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ২। বিংশ শতাব্দী, মাঘ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৩। বিংশ শতাব্দী, ফাল্গুন

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, চৈত্র

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৪। বিংশ শতাব্দী, চৈত্র

চর্যাপদের হরিণী। গল্প সংকলন, প্রকাশক—মিত্রালয়, জুলাই ১৯৬০

[আগে উল্লেখিত]

১৩৬৮ [১৯৬১-১৯৬২]

উঃ ভুঃ ক্রুঃ। অমৃত, প্রথম সংখ্যা, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৬৮, শুক্রবার, 12 5.61.

কাজল সেন নামে

হিসাব। সেরা সেরা লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প, বৈশাখ

সাহিত্য সেবক সমিতি-র পক্ষে 'কত কথা' কর্তৃক প্রকাশিত।

পুনর্মুদ্রণ। কল্পনা সাহিত্য, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮১ [থেকে]।

মহাবিদ্যার গুপ্তকথা। অমৃত, ২২ জ্যৈষ্ঠ '6 5.61

'অমৃত'-পত্রিকার লেখা দুটি বিদেশী রচনা অবলম্বনে।

আমার 'পরিচয়'-এর ছদ্মনাম ছিল কজ্জল সেন, মণীন্দ্র রায় সেটাকে কাজল সেন করে দেন। পরে তাকেই আবার করেন দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে অবশ্য আমি এখানে ছদ্মনাম ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলাম না।

['অমৃত'-সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ-প্রস্তুতিতে দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে মণীন্দ্র রায়-এর প্রায় দৈনন্দিন সংযোগ ছিল। তাঁরা কাছাকাছি থাকতেন—এও একটা কারণ। দীপেন্দ্রনাথ বহু পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। পরে, তাঁর 'স্বয়ংবর সভা' প্রকাশ নিয়ে তাঁর সঙ্গে এই পত্রিকার মতভেদ হয়—এই পত্রিকায় তিনি আর লেখেন নি।]

স্বয়ংবর সভা। মানসী, জ্যৈষ্ঠ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৫। বিংশ শতাব্দী, জ্যৈষ্ঠ

হায় ছায়াবৃতা। (প্রকাশক), জ্যৈষ্ঠ

প্যাট্রিস লুমুম্বা-র স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কবিতা সংকলন

আইজেনষ্টাইন চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে। পরিচয়, আষাঢ়

সংস্কৃতি সংবাদ

'হায় ছায়াবৃতা'। ২য় মুদ্রণ, আষাঢ়

গগনঠাকুরের সিঁড়ি ৬। বিংশ শতাব্দী, শ্রাবণ

প্রথম শোকের স্মৃতি। কথাকলি, আষাঢ়-শ্রাবণ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৭। বিংশ শতাব্দী, ভাদ্র

কলেজ ষ্ট্রীটের হৃদপিণ্ড। অমৃত, ২২ ভাদ্র, 8. 9. 61

দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে

সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরিচয়, ভাদ্র

কজ্জল সেন নামে

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, ভাদ্র

পরিপ্রেক্ষিত। স্বাধীনতা, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

অশোকবন। মানসী, দেয়ালী সংখ্যা, কার্তিক

রবীন্দ্র শতবর্ষে শান্তি উৎসব। পরিচয়, কার্তিক

সংস্কৃতি সংবাদ

ধূর্জটিপ্রসাদ ও অন্যান্য। পরিচয়, অগ্রহায়ণ

সংস্কৃতি-সংবাদ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৮। বিংশ শতাব্দী, অগ্রহায়ণ

গোয়া ও অন্যান্য। পরিচয়, পৌষ

সংস্কৃতি-সংবাদ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৯। বিংশ শতাব্দী, পৌষ

অমরেন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য। পরিচয়, মাঘ

সংস্কৃতি সংবাদ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ১০। বিংশ শতাব্দী, মাঘ

স্পেশাল ট্রেণ। নতুন পদক্ষেপ, গন্ধর্ব, নভেম্বর-জানুয়ারী ৬১-৬২

একটি গ্রামের গল্প। ফসল, গল্প সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ

এক অঙ্গে এত রূপ ও অন্যান্য। পরিচয়, চৈত্র

সংস্কৃতি সংবাদ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ১১। বিংশ শতাব্দী, চৈত্র

১৩৬৯ [১৯৬২-১৯৬৩]

সম্পাদকীয়। (সম্পাদিত), সাহাপুর-নিউ আলিপুর যুব উৎসব স্মারক সংকলন, বৈশাখ, মে ৬২

সাহাপুর-নিউ আলিপুর যুব উৎসব : বৈশাখ, মে ৬২

রমেশচন্দ্র সেন। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, June, 62

বিয়োগপঞ্জী, সংস্কৃতি-সংবাদ

পুস্তক পরিচয়। পরিচয় আষাঢ়, July, 62

কজ্জল সেন নামে

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, আষাঢ়

তৃতীয় পরিকল্পনা। শারদীয় স্বাধীনতা, আশ্বিন, Sept. 1962

মৃত্যুর ইতিহাস। শারদীয় ছোটগল্প, আশ্বিন

উৎসর্গ। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

কাটা সৈনিক নতুন সাহিত্য, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

দায়ী। চতুষ্কোণ, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

১৩৭০ [১৯৬৩-১৯৬৪]

[এই বছর দীপেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁর মনোহরপুকুর রোডের ভাড়া বাড়িতে। এই বাড়িতে তিনি ১৯৬৩-তেই উঠে এসেছিলেন, তাঁদের নিউ আলিপুরের পারিবারিক আবাস ছেড়ে, তাঁর প্রথম সন্তানের জন্মকালে। এই সময় থেকে দীপেন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস লেখার সংখ্যা কমে আসতে থাকে।]

অশ্বমেধের ঘোড়া। গল্প সংকলন, আষাঢ়, জুন—১৯৬৩, প্রকাশক—সৃজনী

মৃতশহর। বসন্ত, জটায়ু, অশ্বমেধের ঘোড়া, স্বয়ংবর সভা, প্রহরা

সাপ্তাহিক বসুমতী। ৬৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ৬ কার্তিক, ১৩৭০

ইংরেজি ২৪. ১০. ৬৩ থেকে ২৬ সংখ্যা, ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০,

ইংরেজি ২১. ১১. ৬৩ পর্যন্ত কার্যকালে বিভিন্ন বিভাগে রচনা।

[এই প্রায় একমাস দীপেন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক বসুমতীতে চাকরি করেছেন। তখন তিনি বড়িশার সাজের আটচালায় থাকেন।]

১৩৭১ [১৯৬৪-১৯৬৫]

ঘাম। তরুণ লেখকদের স্বনির্বাচিত প্রেমের গল্প, বৈশাখ, May 64

বিনা অনুমতিতে অজ্ঞাতে সংকলিত

[প্রতিবাদে দীপেন্দ্রনাথ অনশন করেছিলেন। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর অনুরোধে প্রত্যাহার করেন।]

১৩৭২ [১৯৬৫ ১৯৬৬]

কুট্টি খড়ম। পরিচয়, আন্তর্জাতিক গল্প সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, March-April 6

ভিয়েতনামী গল্প। হ্যানয় প্রকাশিত (১৯৬৫) 'The Fire Blazes' গ্রন্থ থেকে। লেখক Thuy Thu, গল্প—The Little Wooden Sandal।

১৩৭৪ [১৯৬৭-১৯৬৮]

[প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন দীপেন্দ্রনাথকে সাংবাদিক রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তখন তিনি 'কালান্তর'-পত্রিকার কর্মী।

বরযাত্রা। দৈনিক কালান্তর, নববর্ষ ক্রোড়পত্র, ১লা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৭

'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ': একটি সাক্ষাৎকার। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২২ বৈশাখ, ১৩৭৪, ৬ই মে, ১৯৬৭, শনিবার

কুট্টি খড়ম। দূর-সুদূর, গোপাল হালদার সম্পাদিত সংকলন, বৈশাখ

ভিয়েতনামী গল্পের অনুবাদ। পুনর্মুদ্রণ [পরিচয়, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭২ থেকে]

একটি সঙ্গীতের জন্য। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৭শে মে, শনিবার, ১৯৬৭

একটি সঙ্গীতের জন্য (শেষাংশ)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৩রা জুন, শনিবার, ১৯৬৭

দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া পুরুলিয়া দেখে এলাম (১ম পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১০ই জুন, শনিবার, ১৯৬৭

প্রথমে, 'সর্বনাশ এড়ানো যাবে না', পরে, 'শ্মশান বন্ধু' নাম দিয়েছিলাম। সে নাম ছাপা হয় নি।

[আমাকে বলেছিলেন 'শ্মশানবন্ধুর চিঠি' নাম দিয়ে ছিলেন]

দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া-পুরুলিয়া দেখে এলাম (২য় পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৭ই জুন, শনিবার, ১৯৬৭

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া দেখে এলাম (৩য় পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৮ই জুলাই ১৯৬৭

নাম ছোট হয়েছে

ক্ষেত ফলিয়ে খেতে পায় না—ক্ষেত মজুর। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২২শে জুলাই, ১৯৬৭

আসলে এটি 'দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া-পুরুলিয়া দেখে এলাম' রচনাটির চতুর্থ কিস্তি।

বসিরহাটের রামলক্ষ্মণ ভাইয়েরা জোট বাঁধছে। দৈনিক কালান্তর, ২৪শে জুলাই, ১৯৬৭

১৫. ৭. ৬৭ তারিখে পার্টি অফিসে কৃষক সভার আঞ্চলিক নেতা ও কর্মীদের interview করি, ১৭ ৭. ৬৭ তারিখে লিখি।

ভূমিহীন মানবগোষ্ঠীর রক্ত ও অশ্রুকে নক্ষত্রের অক্ষরে গেঁথে তুলুন। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৯শে জুলাই, ১৯৬৭

আসলে এটিও 'দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া পুরুলিয়া দেখে এলাম' রচনাটির পঞ্চম কিস্তি। এটির শিরোনামও আমার দেওয়া নয়।

দরিদ্র দেশের দীনজন। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

অবশেষে 'দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া পুরুলিয়া দেখে এলাম' রচনার শেষ (ষষ্ঠ) কিস্তি প্রকাশিত হল। এই নামটিও আমার দেওয়া নয়।

নূতন পরিস্থিতি। দৈনিক কালান্তর, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৫, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৬৭

এস. এ. ডাঙ্গের লেখার অনুবাদ

র্জি ডিমিট্রভ। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৭ই জুন ১৯৬৭

...ইলজিয়া কিওলিওভস্কি লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ, ১৮ই জুন ডিমিট্রভের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের আলোকচিত্র প্রদর্শনী। দৈনিক কালান্তর, সোমবার ২৯শে জানুয়ারি, ১৯৬৮

জনমত বিভাগে প্রকাশিত চিঠি

মানুষের জন্মের কাহিনীকার ম্যাকসিম গর্কীর জন্মশতবার্ষিকী। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৬. ৩. ৬৮

দৈনিক Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কর্তিত অনুবাদ

আমিও তো রক্ত দিতে চাই। শারদীয় আন্তর্জাতিক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৭ (৩০.৯.৬৭)

হওয়া না-হওয়া। পরিচয়, আশ্বিন ১৩৭৪, অক্টোবর ১৯৬৭

মিলাবে মানব জাত। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৭।

লেখার তারিখ ১৯. ১১. ৬৭

মালার ইতিবৃত্ত। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৬৭

পদচিহ্ন। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই দুই অধিকারে অশুভ শক্তির নখের দাগ। দৈনিক কালান্তর, ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৬৮

৯ই জানুয়ারি সাহিত্যিকদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব। আমার লেখা, আমিই উত্থাপন করি। সম্পাদকীয় note ও শিরোনামটি বার্তা-সম্পাদকের দেওয়া।

নচিকেতার দেশ। দৈনিক কালান্তর, ৩১. ১. ৬৮, ১৭ই মাঘ ১৩৭৪

২৩শে জানুয়ারি লিখি, শেষটুকু ২৫শে।

'কার্যানন্দ নগর'-এ মার্সাই-এর শ্রমিক নেতা। দৈনিক কালান্তর, ১. ৩. ৬৮, ১৭. ১১. ১৩৭৪

উঠো, জাগো ও ভুখে বন্দী। সাপ্তাহিক কালান্তর, শনিবার, ২. ৩. ৬৮

ওপরের লেখা দুটি যথাক্রমে ফ্রান্সের বিউ ও কস্টারিকার ভার্গাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

ওপরের দুটি লেখা যথাক্রমে ২২ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি লিখিত।

'ঘোড়েওয়ালাবাবু'।[৪] সাপ্তাহিক কালান্তর, ৯. ৩. ৬৮

নক্ষত্র মালাকার সম্পর্কে ধারাবাহিক রচনার প্রথম কিস্তি

[দীপেন্দ্রনাথ ১৯৬৮ সালে পাটনায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসে গিয়েছিলেন। সেই সভাস্থলের নাম হয়েছিল 'কার্যানন্দনগর'। সেখানে বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছাড়াও বিহারের নক্ষত্র মালাকারের সঙ্গেও তাঁর অনেক গল্প হয়]

গৃহযুদ্ধের লেখক। আন্তর্জাতিক, মার্চ ১৯৬৮ (৯.৩.৬৮)

ওপরের দুটি লেখা যথাক্রমে ২৬ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি লিখিত

'ঘোড়েওয়ালাবাবু' (দ্বিতীয় পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৬. ৩, ৬৮

'ঘোড়েওয়ালাবাবু' (তৃতীয় পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৩. ৩. ৬৮

অন্ধকার দ্বিপ্রহর। দৈনিক কালান্তর (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ২৮. ৩. ৬৮

গর্কির লেখার অনুবাদ, কোথাও সংক্ষেপিত অনুবাদ বা অবলম্বন

রাজার রাজা। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৩০. ৩. ৬৮

গর্কির লেখার অনুবাদ, কোথাও সংক্ষেপিত অনুবাদ বা অবলম্বন

'ঘোড়েওয়ালাবাবু' (চতুর্থ পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৩.৪.৬৮, চৈত্র-সংক্রান্তি '৭৪

১৩৭৫ [১৯৬৮-১৯৬৯]

'ঘোড়েওয়ালাবাবু' (পঞ্চম পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬৮ ৭ই বৈশাখ, ১৩৭৫

লেনিনের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে প্রকাশিত সংখ্যা।

ঘাড়েওয়ালাবাবু' (শেষ পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, মে-দিবস সংখ্যা, ২৭শে এপ্রিল

তিহাস কথা বলে। দৈনিক কালান্তর, মে-দিবস বিশেষ সংখ্যা, ১. ৫. ১৯৬৮ বুধবার, ১৮ই বৈশাখ ১৩৭৫

ট্রাকটেনবুর্গ-এর লেখা অনুসরণে. কোথাও-বা ভাষান্তর।

তিহাস কথা বলে। সাপ্তাহিক কালান্তর, মার্কসের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা, শনিবার, ৪ঠা মে, ১৯৬৮

দৈনিকের লেখাটিই আমার অজ্ঞাতসারে এবং ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে পুনর্মুদ্রিত

র উৎসব স্মারকপত্র, ১৯৬৮। ১লা জুন, ১৯৬৮

আমি নির্বাচিত সম্পাদক, সম্পাদনাও করি। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে নাম প্রকাশ করি নি।

ই ভারতবর্ষ। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৬ জুলাই ১৯৬৮

আমার দেওয়া নাম ছিল, 'সেই ভারতবর্ষ'

শ্রাবণ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৮ থেকে 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হিসেবে আমার নামও প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য তার আগের সংখ্যা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় May-June-July—বাধ্য হয়েই একসঙ্গে বেরোয়) থেকেই আমরা সম্পাদনার কাজ শুরু করি।

দৈনিক 'কালান্তর'এর 'রবিবারের পাতা'র সম্পাদক হিসেবে 'কালান্তর'-এর শারদীয় সংখ্যার সম্পাদনাও আমি করি। অবশ্য আমার নাম দিই নি। দুই শারদীয় সংখ্যা করে পুজোয় নিজে কিছুই লিখতে পারলুম না।

কবার বিদায় দাও মা। দৈনিক কালান্তর, ৩১. ১০. ৬৮ বৃহস্পতিবার, ১৪ই কার্তিক ১৩৭৫

প্রথম সম্পাদকীয়

একটি বিতর্কমূলক লাঠিচালনা। দৈনিক কালান্তর, ৩১. ১০. ৬৮

সাইরেন। দৈনিক কালান্তর, বুধবার ৬ই নভেম্বর ১৯৬৮

রক্তকরবী। দৈনিক কালান্তর, বুধবার ১৩ই নভেম্বর

'বিমলচন্দ্র ঘোষের সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার লাভ। দৈনিক কালান্তর, ১৩ই নভেম্বর

বার্তা-সম্পাদকের নির্দেশে লেখা 'রাইট আপ'

মানবতার উত্থান'। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১০ই নভেম্বর, ১লা অগ্রহায়ণ

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু। দৈনিক কালান্তর, বৃহস্পতিবার, ২০শে নভেম্বর

দেয়ালের লিখন। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার ২৯শে নভেম্বর
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

দুই শতকের সেতু ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ১লা পৌষ
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

তেলের ভেজাল : কি ও কেন। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর, ৫ই পৌষ
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

বিশ্বভারতী : অচলায়তন। দৈনিক কালান্তর, বুধবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮, ১০ই পৌষ ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

সীমানার বিরোধ কমছে। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮, ১৫ই পৌষ, ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

কে দায়ী হবে? দৈনিক কালান্তর, মঙ্গলবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮, ১৬ই পৌষ, ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

একটি বিবেচনার বিষয়। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার, ৩রা জানুয়ারি, ১৯৬৯, ১৯শে পৌষ, ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

পাক-ভারত সম্পর্ক : দ্বিপক্ষীয় যুক্ত প্রতিষ্ঠান। দৈনিক কালান্তর, ১২. ১. ৬৯, ২৮. ৯. ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

আমি ইণ্ডিয়া। সাপ্তাহিক কালান্তর, শনিবার, ১৮. ১. ১৯৬৯
লেখা ১৫.১.৬৯। পত্রিকা বেরিয়েছে ১৬.১.৬০

অর্জুন, অর্জুন, আজ লক্ষ লক্ষ জনগণমন। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার, ১৭. ১. ৬৯
লেখা ১৫. ১. ৬৯

সইউক্ত ৯। দৈনিক কালান্তর, শনিবার, ২৫. ১. ৬৯, ১১ মাঘ ১৩৭৫
১৯. ১. ৬৯ তারিখে লিখিত

আজ অন্যদিন। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, ২৭ মাঘ ১৩৭৫

ফুল ফোটার গল্প। দৈনিক কালান্তর, ১৪. ২. ৬৯, ২রা ফাল্গুন ১৩৭৫

আজ অন্যদিন। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৫. ২ ৬৯, ৩রা ফাল্গুন ১৩৭৫

ঈষৎ পরিবর্ধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত

সরকার এখন শ্রমিকদের হাতিয়ার। দৈনিক কালান্তর, বুধবার ২৬ মার্চ ৬৯, ১২ চৈত্র ১৩৭৫

সভ্যতার পিলসুজ। দৈনিক কালান্তর, ২৯ মার্চ ১৯৬৯. শনিবার

২৬ তারিখে লিখিত

মরনে নেহি দেগা। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ৩০ মার্চ ১৯৬৯

মানুষের জয়যাত্রাকে রোধ করা যায় না। দৈনিক কালান্তর, বৃহস্পতিবার, ৩ এপ্রিল, ১৯৬৯

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগের জন্য লিখিত। বড় হয়ে যায় বলে ওঁরা প্রবন্ধাকারে ছেপেছেন।

মানুষের জয়যাত্রা'। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১৩. ৪. ৬৯, ৩০. ১২. ১৩৭৫

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

১৩৭৬ [১৯৬৯-১৯৭০]

কমরেড সুধাংশু দাশ। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১৪ই বৈশাখ ৭৬, ২৭ ৪. ৬৯

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত।

তাতা বাড়ি। দৈনিক কালান্তর, বুধবার ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে ১৯৬৯

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

পিলিচ প্রদীপ। দৈনিক কালান্তর, (রবিবারের পাতা), ২১ আষাঢ়, ৬ই জুলাই

লেনিনের বাঁচা। দৈনিক কালান্তর, (রবিবারের পাতা); ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই ১৯৬৯

গর্জন কবি। দৈনিক কালান্তর, (রবিবারের পাতা), ৪ শ্রাবণ ৭৬, ২০ জুলাই ৬৯

[বিষ্ণু দে-র ষাট বৎসর পূর্তিতে]

জনসত্তরের পরিপ্রেক্ষিত। পরিচয়, আষাঢ়, জুলাই

ভি. ভি. গিরি : একটি মানুষ। দৈনিক কালান্তর, বৃহস্পতিবার, ৪ ভাদ্র, ২১ আগস্ট

ভি. ভি. গিরির অভিনন্দন। দৈনিক কালান্তর, ২১ আগস্ট ১৯৬৯

গিরির অভিনন্দনবার্তার অনুবাদ

ভি ভি. গিরি: একটি মানুষ। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৩ আগস্ট

দৈনিকের লেখাটির পুনর্মুদ্রণ

'সাধারণ মানুষের সেবক'কে সাধারণ মানুষের অভিনন্দন। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ২৫ আগস্ট ১৯৬৯

PTI প্রচারিত সংবাদের অনুবাদ

হো-চি-মিন, তুমি বাঁচো। পরিচয়, সমালোচনা সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৬, অগাস্ট ১৯৬৯

বিয়োগপঞ্জী বিভাগে প্রকাশিত

আরও একটু মৃত্যু। দৈনিক কালান্তর, বৃহস্পতিবার, ১৩ই নভেম্বর ১৯৬৯, ২৭শে কার্তিক ১৩৭৬

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

ওরা এসেছিল। দৈনিক কালান্তর, ১ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, ১৭ নভেম্বর ১৯৬৯

শিরোনাম চীফ রিপোর্টারের দেওয়া

১৬ নভেম্বর ওরা এসেছিল। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২২ নভেম্বর, ৬ অগ্রহায়ণ

ভ্যান ত্রয় স্কুল। দৈনিক কালান্তর, ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ই ডিসেম্বর

কে আগে। দৈনিক কালান্তর, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের গলায় একই মালা। দৈনিক কালান্তর, ১৮. ১২. ৬৯, ২ পৌষ ১৩৭৬, বৃহস্পতিবার

বিশেষ সংবাদদাতা নামে

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (১)। সাপ্তাহিক কালান্তর, শনিবার, ২৭. ১২. ৬৯, ১১ পৌষ ১৩৭৬

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (২)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৩রা জানুয়ারি ১৯৭০, ১৮ পৌষ

তোমার নাম আমার নাম। পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ডিসেম্বর ১৯৬৯

'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে প্রকাশিত

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (৩)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭০

লেনিন জন্মশতবার্ষিকী যুব উৎসব। দৈনিক কালান্তর, ১৫.১.১৯৭০, ১লা মাঘ ১৩৭৬

রচনাটি পশ্চিমবঙ্গ লেনিন জন্মশতবার্ষিকী যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির নামে প্রকাশিত

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (৪)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৭ই জানুয়ারি ১৯৭০

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (৫)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭০

লেখক সমবায়। রবিবারের পাতা, দৈনিক কালান্তর, ২৫. ১. ১৯৭০

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (৬)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৭০

এখন কি করছেন। দৈনিক কালান্তর, ৩. ২. ৭০

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (শেষাংশ)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

লেনিন শতাব্দী (১)। দৈনিক কালান্তর, ৮. ২ ৭০

আমেরিকা

[পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লেনিন জন্মশতবর্ষ জয়ন্তীর বিবরণ]

লেনিন শতাব্দী (২)। দৈনিক কালান্তর, ৯, ২. ৭০

উলিয়ানভস্ক-এ পৃথিবীর ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সম্মেলন; সোভিয়েতে একদিন কমিউনিষ্ট সাবোৎনিক

লেনিন শতাব্দী (৩)। দৈনিক কালান্তর, ১০, ২. ৭০

জাপান

লেনিন শতাব্দী (৪)। দৈনিক কালান্তর, ১১. ২. ৭০

কানাডা

লেনিন শতাব্দী (৫)। দৈনিক কালান্তর, ১২. ২. ৭০

কঙ্গো, কিউবা

লেনিন শতাব্দী (৬)। দৈনিক কালান্তর, ১৩. ২. ৬০

সিংহল, ইরান : তেহ্‌রান

লেনিন শতাব্দী (৭)। দৈনিক কালান্তর, শনিবার, ১৪. ২. ৭০

ভিয়েতনাম

লেনিন শতাব্দী (৮)। দৈনিক কালান্তর, ১৫. ২. ৭০

চেকোস্লোভাকিয়া

লেনিদ শতাব্দী (৯)। দৈনিক কালান্তর, ১৬ ২. ৭০

সুইডেন

লেনিন শতাব্দী (১০)। দৈনিক কালান্তর, ১৭, ২, ৭০

গ্রেট ব্রিটেন

লেনিন শতাব্দী (১১)। দৈনিক কালান্তর, ১৮. ২. ৭০

ইংলণ্ড, ফ্রান্স

লেনিন শতাব্দী (১২)। দৈনিক কালান্তর, ১৯. ২. ৭০

আমেরিকা

লেনিন শতাব্দী (১৩)। দৈনিক কালান্তর, ২০. ২. ৭০

ইতালি

লেনিন শতাব্দী (১৪)। দৈনিক কালান্তর, ২১. ২. ৭০

কিউবা

একুশে ফেব্রুয়ারি। দৈনিক কালান্তর, ২১.২.৭০

লেনিন শতাব্দী (১৫)। দৈনিক কালান্তর, ২২.২.৭০

কিউবা

লেনিন শতাব্দীতে শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ২২ ২.৭০

লেনিন শতাব্দী (১৬)। দৈনিক কালান্তর, ২৩.২.৭০

চিলি, কলম্বিয়া

লেনিন শতাব্দী (১৭)। দৈনিক কালান্তর, ২৪.২.৭০

আফ্রো-এশীয় সংহতি সমিতি, অল আফ্রিকা ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস, কঙ্গো, নাইজিরিয়া

লেনিন শতাব্দী (১৮)। দৈনিক কালান্তর, ২৫ ২.৭০

ইরাক, ইরান, সিরিয়া

লেনিন শতাব্দী (১৯)। দৈনিক কালান্তর, ২৬ ২ ৭০

লেবানন, ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র

লেনিন শতাব্দী (২০)। দৈনিক কালান্তর, ২৭.২.৭০

সুদান

লেনিন শতাব্দী (২১)। দৈনিক কালান্তর, ২৮.২.৭০

জাপান

লেনিন শতাব্দী (২২)। দৈনিক কালান্তর, ১.৩.৭০

লাকসেমবার্গ

লেনিন শতাব্দী (২৩)। দৈনিক কালান্তর, ২.৩.৭০

বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (২৪)। দৈনিক কালান্তর, ৩.৩.৭০

ফ্রান্স

লেনিন শতাব্দী (২৫)। দৈনিক কালান্তর, ৪.৩.৭০

ফ্রান্স

লেনিন শতাব্দী (২৬)। দৈনিক কালান্তর, ৫.৩.৭০

চেকোস্লোভাকিয়া

লেনিনের বাঁচা : দুর্গাপুর আঞ্চলিক লেনিন শতবার্ষিকী উৎসব স্মারক পত্র (২-৬ মার্চ)

পুনর্মুদ্রণ

লেনিন শতাব্দী (২৭)। দৈনিক কালান্তর, ৬.৩.৭০

বুলগেরিয়া

লেনিন শতাব্দী (২৮)। দৈনিক কালান্তর, ৭.৩.৭০

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

লেনিন শতাব্দী (২৯)। দৈনিক কালান্তর, ৮.৩.৭০

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

সম্পাদকীয়। লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী যুব উৎসব স্মারকপত্র, ৭—১৫ই মার্চ

লেনিন শতাব্দী (৩০)। দৈনিক কালান্তর, ৯.৩.৭০

পোল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩১)। দৈনিক কালান্তর, ১০.৩.৭০

মস্কো-চীন

লেনিন শতাব্দী (৩২)। দৈনিক কালান্তর, ১১.৩.৭০

ইংল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৩)। দৈনিক কালান্তর ১২.৩.৭০

ইংল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৪)। দৈনিক কালান্তর, ১৩.৩.৭০

ইংল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৫)। দৈনিক কালান্তর, ১৪.৩.৭০

স্কটল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৬)। দৈনিক কালান্তর, ১৫.৩.৭০

স্কটল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৭)। দৈনিক কালান্তর, ১৬.৩.৭০

কানাডা, সান মারিনো, জেনেভা

লেনিন শতাব্দী (৩৮)। দৈনিক কালান্তর, ১৭.৩.৭০

পাকিস্তান

লেনিন শতাব্দী (৩৯)। দৈনিক কালান্তর, ১৮.৩.৭০

আমেরিকা

লেনিন শতাব্দী (৪০)। দৈনিক কালান্তর, ১৯.৩.৭০

আমেরিকা

লেনিন শতাব্দী (৪১)। দৈনিক কালান্তর, ২০.৩.৭০

বার্মা, সুদান

লেনিন শতাব্দী (৪২)। দৈনিক কালান্তর, ২১.৩.৭০

ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ব্রিটেন

লেনিন শতাব্দী (৪৩)। দৈনিক কালান্তর, ২২.৩.৭০

ইসক্রা ও লেনা

তীতুমীর নগরের ডাক। দৈনিক কালান্তর, ২৯.৩.৭০

সম্পাদকীয়

'পরিচয়'-এ নক্ষত্র মালাকার। দৈনিক কালান্তর, ৮.৪.৭০, ২৫.১২.৭৬

সংবাদ

সংগ্রামী যুবকদের সভায় নক্ষত্র মালাকার। দৈনিক কালান্তর, ১০.৪.৭৬

সংবাদ

পুস্তক পরিচয়। দৈনিক কালান্তর, রবিবারের পাতা, ১২.৪.৭০, ২৯.১২.৭০

কম্বোডিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে। পরিচয়, চৈত্র ১৩৭৬

বাঙলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিবৃতি

লেনিন সরণী। পরিচয়, চৈত্র ১৩৭৬, এপ্রিল ১৯৭০

প্রকাশিত হয়েছে ২৮. ৫. ৭০

লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী যুব উৎসব স্মারকপত্র ১৯৭০। (সম্পাদনা)

৭—১৫ই মার্চ

সম্পাদনা: 'কালান্তর' লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা। ১৯৭০, ২২ এপ্রিল

১৩৭৭ [১৯৭০-১৯৭১]

হরিপদ রক্ষিতের অহঙ্কার। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১ শ্রাবণ ১৩৭৭, ১৮.৭.৭০

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দৈনিক কালান্তর, ২ শ্রাবণ ১৩৭৭, ১৯ জুলাই ১৯৭০

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

সর্দার। সাপ্তাহিক কালান্তর, জমি দখল সংখ্যা (১)। ৮ শ্রাবণ ৭৭, ২৫.৭.৭০

পঞ্চম বর্ষ। দৈনিক কালান্তর, ২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর, ১৯৭০

লেনিন শতাব্দী। সম্পাদনা, মঙ্গলবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০
লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত বাংলা কবিতা সঙ্কলন

আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন স্মারকপত্র। সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি সম্মেলন
৪-৭ অক্টোবর

বিজয়া দশমী। দৈনিক কালান্তর, শনিবার ১০.১০.৭০, ২৩.৬.৭৭

বাংলার মানুষ কোথায়? দৈনিক কালান্তর, বুধবার, ২৮.১০.৭০
১১ই কার্তিক ৭৭
'জনমত' বিভাগে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

একে বন্ধ করা দরকার। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১লা নভেম্বর ১৯৭০,
১৫ই কার্তিক
'জনমত' বিভাগে তপন উপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

গুরু ও শিষ্য সম্পর্কে দুই বিচার কেন? দৈনিক কালান্তর, ৩. ১১. ৭০,
১৭ ৭. ৭৭
'জনমত' বিভাগে নচিকেতা দাস ছদ্মনামে প্রকাশিত

কুৎসা প্রচারে রুশ-ভারত মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হবে না। দৈনিক কালান্তর, ৪. ১১. ৭০,
১৮. ৭. ৭৭
'জনমত' বিভাগে সিরাজ ইসলাম ছদ্মনামে প্রকাশিত

ব্যাপারটি কি খুবই পরিষ্কার। দৈনিক কালান্তর, ১ জানুয়ারি ১৯৭১,
১৬ পৌষ ১৩৭৭
'জনমত' বিভাগে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

আমরা কি করব? দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার, ১৫. ১. ৭১. ১লা মাঘ ১৩৭৭
'জনমত' বিভাগে তপন উপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

গণশক্তির দুই পৃষ্ঠায় দুই বক্তব্য কেন? দৈনিক কালান্তর, ২৩ জানুয়ারি
'জনমত' বিভাগে সিরাজ ইসলাম ছদ্মনামে প্রকাশিত

সি. পি. এম-এর স্বীকারোক্তি! দৈনিক কালান্তর, ২৫. ১. ৭১, সোমবার
'জনমত' বিভাগে তপন উপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

প্রার্থী চাই! দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ২৫. ১. ৭১, ১১ মাঘ ১৩৭৭
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

মাও চিন্তার আত্মঘাতী আগুন। দৈনিক কালান্তর, ২৯. ১. ৭১
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

প্রতাপচন্দ্রের বঙ্গদর্শন। দৈনিক কালান্তর, ৫. ২. ৭১, ২২ মাঘ ১৩৭৭
'জনমত' বিভাগে তপন উপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

সি. পি. এম-এর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হবে? দৈনিক কালান্তর,
৯. ২ ৭১

'জনমত' বিভাগে নচিকেতা দাস ছদ্মনামে প্রকাশিত

উহারা সি. পি. এম: উহারা থানা হইতে আসিয়াছিল। সাপ্তাহিক কালান্তর,
১৩. ২. ৭১

শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

উহারা সি. পি. এম: উহারা থানা হইতে আসিয়াছিল। দৈনিক কালান্তর,
১৪. ২. ৭১

পুনর্মুদ্রণ

কৃষিবিপ্লব ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য হচ্ছে মাত্র ৪ কোটি ভোট।
দৈনিক কালান্তর, ১৮. ২. ৭১

শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

উহারা সি. পি. এম: উহারা থানা হইতে আসিয়াছিল

পুনর্মুদ্রণ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা পরিষদ কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

না, ভুলিনি এবং ভুলব না। দৈনিক কালান্তর, ২. ৩. ৭১

শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

দুঃখে জীবন জীর্ণ। দৈনিক কালান্তর, ৭. ৩ ৭১

না, ভয় করিব না। দৈনিক কালান্তর, ৯. ৩. ৭১

শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

ভুলিনি ভুলব না। দৈনিক কালান্তর, ১০ই মার্চ ১৯৭১, ২৫ ফাল্গুন ১৩৭৭

ডাক আসিয়াছে। দৈনিক কালান্তর, বুধবার, ১০. ৩ ৭১, ২৫. ১১. ৭৭

সমবেত পাপ ও তার প্রায়শ্চিত্ত। দৈনিক কালান্তর, ২৯ ৩. ৭১

'জনমত' বিভাগে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

প্রস্তাব। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ৪. ৪. ৭১, ২১. ১২. ৭৭

জেনোসাইড বনাম মুক্তিযুদ্ধ। দৈনিক কালান্তর, ১০. ৪. ৭১ ২৭. ১২. ৭৭

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির আবেদন: দৈনিক
কালান্তর, রবিবার, ১১. ৪. ৭১, ২৮. ২. ৭৭

আওটি। দৈনিক কালান্তর, মঙ্গলবার, ১৩ই এপ্রিল ৭১, ৩০ চৈত্র ১৩৭৭

লেনিন শতাব্দী সম্পাদনা, সেপ্টেম্বর ১৯৭০

লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা সংকলন

[আগে উল্লিখিত]

১৩৬৮ [১৯৭১—৭২]

বাংলাদেশের জন্য ঐক্য। দৈনিক কালান্তর, রবিবার ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১, ৪ঠা বৈশাখ ১৩৭৮

আমরা আপনাদের দিকে আছি। দৈনিক কালান্তর, ২০.৪.৭১

এবারের রবীন্দ্র উৎসব। দৈনিক কালান্তর, ১.৫.৭১, ১৭.১.৭৮

'জনমত' বিভাগে প্রকাশিত

আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি। দৈনিক কালান্তর, ২.৭.৭১, ১৭.৩.৭৮

বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি থেকে প্রেরিত স্বাক্ষর-বিহীন রচনাটিই ভিন্ন শিরোনামায় দৈনিক 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত হয়

অপরাজেয় জন্মদিন। দৈনিক কালান্তর, ১৭ই অগাস্ট, মঙ্গলবার, ৩১শে শ্রাবণ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। দৈনিক কালান্তর, ১৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার, ২৯শে ভাদ্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৮ই সেপ্টেম্বর

দৈনিক কালান্তরে প্রকাশিত লেখাটির পুনর্মুদ্রণ।

মার্কিন সরকারের মানবসেবা ও আসন্ন জাহাজডুবি। দৈনিক কালান্তর, ২০-এ সেপ্টেম্বর, ৩ আশ্বিন

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

শবদের যুক্তফ্রন্ট : বাঙলা গদ্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা। গল্প কবিতা, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন, সেপ্টেম্বর ১৯৭১

মণি সিং-এর জীবনের একটি অধ্যায়। পরিচয়, শারদীয়, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৮, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭১

বিদ্যাসাগরের গোপাল ও মানিক বাঁড়ুজ্যে। আন্তর্জাতিক, শারদীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১০২তম জন্মদিবস ও জাতীয় সংহতি সপ্তাহ। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ৪ অক্টোবর ১৯৭১, ১৭ আশ্বিন ১৩৭৮

প্রথম সম্পাদকীয়

সিংহ চর্মাবৃত। দৈনিক কালান্তর, ৫ অক্টোবর
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

পিংপং বনাম ভ্যানত্রয়। দৈনিক কালান্তর, ৬ অক্টোবর
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি। দৈনিক কালান্তর, ৭ অক্টোবর
প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়

শেখ মুজিবের পক্ষে বিশ্ববিবেক। দৈনিক কালান্তর, ৮ অক্টোবর
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি চক্রান্ত। দৈনিক কালান্তর, ১১ ১০.৭১
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

খুচরা পয়সার কৃত্রিম অভাব ও তার প্রতিকার। দৈনিক কালান্তর, ১৩.১০.৭১
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

ভুট্টো, প্রস্তুত হও! দৈনিক কালান্তর, ১৩.১০.৭১, বুধবার
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

বাঙলা দেশ প্রসঙ্গে আরও একটি অগ্রসর পদক্ষেপ। দৈনিক কালান্তর, ২২.১০.৭১
দ্বিতীয় সম্পাদকীয়

ইন্দিরা কংগ্রেস কি ভেবে দেখবে? দৈনিক কালান্তর, ২৫.১০.৭১
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান: আয় রে ভাই লড়াইয়ে যাই। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ৫.১২.৭১, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

প্রস্তাব। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১৯.১২.৭১, ৩ পৌষ ১৩৭৮
ভারতরাষ্ট্র কর্তৃক বাঙলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে স্বীকৃতিদান উপলক্ষে বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের উৎসব সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাব

লেনিনের দশহাত। সাপ্তাহিক কালান্তর, শনিবার, ১. ১. ৭২
[ইউক্রেনের সোভিয়েত-ভারত সংস্কৃতি সমিতির আমন্ত্রণে সোভিয়েত ভ্রমণের বিবরণ]

লেনিনের দশহাত। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৫. ১. ৭২

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই এই মুহূর্তের শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ১৭. ১. ৭২
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

লেনিনের দশ হাত। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৯. ১. ৭২

শহীদ মিনার। দৈনিক কালান্তব, রবিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ৭ ফাল্গুন
১৯ ফেব্রুয়ারি লেখা

নেয়ারের খাট, মেহগিনি পালঙ্ক ও একটি ছুটি সন্ধ্যা। মানিক বিচিত্রা, মে দিবস ১৯৭১

রক্তাক্ত কারা? কে আক্রমণকারী? দৈনিক কালান্তর, ৫ মার্চ ১৯৭১

এক বৃদ্ধের প্রার্থনা। দৈনিক কালান্তর, ৭ মার্চ
'জনমত' বিভাগে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো। পবিচয়, একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা

হওয়া না-হওয়া। (গল্প সংকলন), মঙ্গলবার ২৩ ফাল্গুন, ১৩৭৮, ৭ মার্চ, ১৯৭১

আমার স্বপ্নের জন্য। দৈনিক কালান্তর, শনিবার, ১১ মার্চ, ২৭ ফাল্গুন।

মণি সিং-এর জীবনের একটি অধ্যায়। সংবাদ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৭২, রবিবার, ১২ চৈত্র, ২৬. ৩. ৭২

হওয়া না-হওয়া। (গল্প সংকলন)। ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
ফুল ফোটার গল্প, অশোকবন, পরিপ্রেক্ষিত, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, নিবাসন, উৎসর্গ, হওয়া না-হওয়া
[আগে উল্লেখিত। দুই উল্লেখে প্রকাশ তারিখের পার্থক্য আছে]

১৩৭৯ [১৯৭২-৭৩]

অভাব নাটক: একটি আবেদন। বহুরূপী জয়ন্তী সংখ্যা, ১ মে ১৯৭২

ভিয়েতনাম: উৎসবেব আহ্বান। পরিচয়, মার্চ-এপ্রিল (১৬. ৫. ৭২, প্রকাশিত)

সম্পাদকীয়। পরিচয়, মার্চ এপ্রিল '৭২, ফাল্গুন চৈত্র ১৩৭৮
অস্বাক্ষরিত

চিরন্তন আগুন। আন্তর্জাতিক, জুলাই ১৯৭২

'পরিচয়'-এর একচল্লিশ বছব পুর্তি: একটি আবেদন। দৈনিক কালান্তর, রবিবার ২০ আগস্ট, ১৯৭২

শান্তি ও সংস্কৃতির জাতীয় সম্মেলন। দৈনিক কালান্তর, শনিবার, ২৬. ৮. ৭২, ফিচার

শান্তি ও সংস্কৃতির জাতীয় সম্মেলন। দৈনিক কালান্তর, বুধবার, ৩০ ৮. ৭২

আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে গেছে বিশ্বের আকাশ। দৈনিক কালান্তর,

শান্তি ও সংহতির জাতীয় সম্মেলন। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর।

বিচার। দৈনিক কালান্তর, সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সম্মেলন সংখ্যা, বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২

ভিয়েতনাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবর খুঁড়ছেই। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার ২৭ অক্টোবর

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

পরিশিষ্ট

[দীপেন্দ্রনাথ ১০৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত তাঁর রচনাপঞ্জি তৈরি রেখে গেছেন; তারপর থেকে প্রধানত 'পরিচয়' ও 'কালান্তর'-এ প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলির একটি তালিকা আমরা তৈরি করেছি। এ-তালিকাও অসম্পূর্ণ; তাঁর 'রচনা-সমগ্র'-য় আমরা এই সময়ের পূর্ণতর তালিকা প্রকাশ করতে পারব, আশা করি।

'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে মালবিকা চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে প্রকাশিত লেখাগুলি সন্ধান ও রচনাপঞ্জির এই অংশ তৈরি করেছেন।

অনুল্লেখিত কোনো রচনার সন্ধান কারো জানা থাকলে দয়া করে আমাদের জানাবেন।]

১৩৮১ [১৯৭৪-১৯৭৫]

ফ্যাসিস্ট বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি। পরিচয়, ফাল্গুন-চৈত্র, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৫

ভারতে ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানের প্রয়াসের বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের আবেদন-সহ ১৯৭৫-এর ২৬ এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটুটে অনুষ্ঠিত সমাবেশের বিবরণ।

এফ্রো-এশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা: সমস্যা ও প্রতিকারের পথ। পরিচয়, জানুয়ারি

১৩৮২ [১৯৭৫-১৯৭৬]

সংগ্রাম, ভালোবাসা আর জয়ের প্রতীক আর্নেস্ট থেলমান। পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ়, মে-জুলাই ১৯৭৫

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবজাতির বিজয়ের ত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে। পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ়, মে-জুলাই, ১৯৭৫

['পরিচয়', ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বিশেষ সংখ্যায়, মে-জুলাই ১৯৭৫, চল্লিশের দশকে প্রকাশিত রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকা পুস্তক-পুস্তিকা থেকে নানা লেখা সংগৃহীত হয়। এই রচনাগুলির পরিচিতিমূলক ভূমিকা দীপেন্দ্রনাথ লেখেন—অনেকগুলি। এই লেখাগুলি সংগ্রহ করতে এই সময় তিনি চল্লিশের দশকের পত্র-পত্রিকা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন। ফলে নোটগুলি মিলে যেন একটি সম্পূর্ণ রচনারই আভাস মেলে। এই সংখ্যায়, একমাত্র 'সমুদ্রের মৌন' রচনাটির ভূমিকা ব্যতীত 'সম্পাদক, পরিচয়' স্বাক্ষরিত আর সব নোটই দীপেন্দ্রনাথের।]

নো পাসারন। কালান্তর (দৈনিক), ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১ জুন, ১৯৭৫

[ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় জয়প্রকাশ নারায়ণের সভায় সি. পি. এম-এর যোগদান উপলক্ষে লিখিত]

বিনয় রায়। কালান্তর (দৈনিক), ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই, ১৯৭৫

বিশ্বরঞ্জন দে। পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৬

[বিয়োগপঞ্জি]

সত্যজিৎ রায়-এর 'জন-অরণ্য' প্রসঙ্গে কিছু কথা। পরিচয়, পৌষ-মাঘ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬

সম্পাদকীয়। পরিচয়, পৌষ-মাঘ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬,

[১ ও ২ মে, ১৯৭৬-এ পশ্চিমবাংলা প্রগতি লেখক সংঘ-এর সম্মিলনের বিবরণ। পত্রিকার সংখ্যা মে মাসের শেষে বেরোয়। এই সংখ্যা থেকেই দীপেন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর একক সম্পাদক নিযুক্ত হন।]

১৩৮৩ [১৯৭৬-১৯৭৭]

আমার বুলার জন্য। কালান্তর (সাপ্তাহিক), ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ, ১৯৭৭

উড়াওরে উর্ধ্বে লাল নিশান। কালান্তর (দৈনিক), ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ, ১৯৭৭

১৩৮৪ [১৯৭৭-১৯৭৮]

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-র উপর 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রের বিশেষ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

'ঘরোয়া' সাপ্তাহিক পত্রে কয়েকটি ফিচার লেখেন। ক্ষীরোদ নট্টকে নিয়ে রবিবারের কালান্তরে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই রচনাগুলি প্রকাশের সঠিক তারিখ সন্ধান করা হচ্ছে।

১৩৮৪ [১৯৭৮-১৯৭৯]

পাড়ি। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, আগস্ট-অক্টোবর
[শেষ প্রকাশিত রচনা]

টীকা

১. এই সংকলনটি সম্পর্কে দীপেন্দ্রনাথ ১৯৭৮-এ একটা চিঠিতে লিখেছেন, (সাধন দাশগুপ্তকে) সম্পাদক হিসেবে আমি চিরকালই দুঃসাহসী। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার আগে কিশোর বয়সে একবার 'সবুজের অভিযান' নামে একটি সংকলন করেছিলাম। আমি তখন অসুস্থ—বছর দুই টানা রোগশয্যায়। চিঠি দিয়ে অনেকের লেখা পেয়েছিলাম। তার মধ্যে একজন ছিলেন 'বনফুল'। তিনি রীতিমতো একটি গল্প লিখলেন যার কিশোর হিন্দু নায়ক পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল পশ্চিমবাংলায় একটি মুসলমানের বুকে ছুরি বসিয়ে। সোজা সাম্প্রদায়িক উস্কানির গল্প, কোনো আড়াল নেই। আমি প্রায় বালক ছিলাম তখন। সেই গল্পকে পালটে একেবারে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর গল্প করে দিলাম।......

২. 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যায় সন্‌জীদা খাতুন-এর রচনাটিতে দীপেন্দ্রনাথের এই সফর সম্পর্কে কিছু কথা আছে।

৩. ইলা মিত্র-কে এই দেখা ও ইলা মিত্র-র জীবন দীপেন্দ্রনাথের লেখকজীবনে এক পুরাণ হয়ে উঠেছিল যেন। এ-বিষয়ে তাঁর কয়েকটি লেখা আছে, 'ফুল ফোটার গল্প' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইলা মিত্র-র ওপর প্রথম লেখা ও 'পরিচয়'-এও তাঁর প্রথম লেখা 'সূর্যমুখী', এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল।

৪. এই সংখ্যায় জ্যোতি দাশগুপ্ত-এর রচনায় এই লেখাটি কি করে শুরু হল সে-বিষয়ে তথ্য আছে।

[দীপেন্দ্রনাথ এই নোটটিও রেখে গেছেন, তাঁর কাগজপত্রের ভেতর]

জন্ম : শুক্রবার ২৪ কার্তিক ১৩৪০
১০ নভেম্বর ১৯৩৩

নাম—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছদ্মনাম—১. কজ্জল সেন
২. শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তপন উপাধ্যায়, নচিকেতা দাস, সিরাজ ইসলাম, কাজল সেন, দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামেও একটি-দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

জন্ম তারিখ—২৪ কার্তিক ১৩৪০
১০ নভেম্বর ১৯৩৩

প্রথম প্রকাশিত রচনা—আমার দেশের মানুষ। দৈনিক 'কিশোর', সোমবার, ৫ পৌষ, ১৩৫৫।

গ্রন্থ তালিকা—১. আগামী (প্রথম খণ্ড : মাঝি)
শ্রেণী—উপন্যাসিকা
প্রকাশকাল—১৪ কার্তিক ১৩৮৫ (১৯৫১)

২. কাছের যারা
শ্রেণী—গল্প সঙ্কলন
প্রকাশকাল—বৈশাখ ১৩৬১ (১৯৫৪)

৩. তৃতীয় ভুবন
শ্রেণী—উপন্যাস
প্রকাশকাল—ভাদ্র ১৩৬৫ (১৯৫৮)

৪ বর্ষাপদের হরিণী
শ্রেণী—গল্প সঙ্কলন
প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৬৭ (১৯৬০)

৫. অশ্বমেধের ঘোড়া
শ্রেণী—গল্প সঙ্কলন
প্রকাশকাল—আষাঢ় ১৩৭০ (১৯৬৩)

৬. হওয়া না-হওয়া
শ্রেণী—গল্প সঙ্কলন
প্রকাশকাল—ফাল্গুন, ১৩৭৮ (১৯৭২)

সম্পাদিত গ্রন্থ—১. লেনিন শতাব্দী
শ্রেণী—কাব্য সঙ্কলন
[লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত ১০০-জন বাঙালি কবির কবিতা]
প্রকাশকাল—ভাদ্র ১৩৭৭ (১৯৭০)

২. প্রতিরোধ প্রতিদিন
ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন
প্রকাশকাল—১৩৮৩ (ডিসেম্বর ১৯৭৫)

সম্পাদিত পত্রিকা—পরিচয়

প্রথম প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৩৮, আগস্ট ১৯৩১। শ্রাবণ ১৩৭৫, আগস্ট ১৯৬৮ থেকে অন্যতম সম্পাদক

ঠিকানা—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭।

এছাড়া ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্ন সঙ্কলন ও পত্রিকা সম্পাদনা করেন

১. সবুজের অভিযান (১৩৫৭)
২. উজান (১৩৬০)
৩. ছাত্র অভিযান [বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র] (১৩৬৫)
৪. একতা [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী] ১৩৬৫
৫. আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় যুব উৎসব স্মারক সম্মেলন (১৩৬৯, ১৩৭৫, ১৩৭৭)
৬. পশ্চিমবঙ্গ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন স্মারকপত্র (১৩৭৭)
৭. শারদীয় কালান্তর (১৩৭৫, ১৩৭৬, ১৩৭৭, ১৩৭৮, ১৩৭৯)
৮. কালান্তর [লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা] (১৩৭৭, ১৩৭০)

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম যে ভেঙেছে, এটুকু বুঝতে খানিক সময় লাগল। গড়িয়ে খাটের একদিকে চলে এসেছিল। চোখ খুলতেই টেবিলের তলা দিয়ে দেয়ালের কোণে চোখ আটকাল। অন্ধকার। শীত করছিল। ঘুমের মধ্যেই কখন বিছানার চাদরটা টেনে গায়ে জড়িয়েছে জানে না। আর একটু কুঁকড়ে শুলো। রাত যায় নি। এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙল কেন? আশ্চর্য, ইচ্ছে করলে আজ আমি সূর্যোদয় দেখতে পারি। কবে যেন একটা সূর্যোদয় দেখে, কবে যেন আমার জীবনে একটা, কবে যেন সূর্যোদয়…

তন্দ্রায় তলিয়ে যেতে যেতে নিশানাথ প্রশ্নটা ভাবছে, এমন সময় পাশের বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল। নিশানাথ একটু বিব্রত বোধ করল। কারণ ভোর রাতে শাঁখ বড় বাজে না। আজ কি কোনো পুজো? আজ তারিখ কত?

দূরে আবার কোথায় শাঁখ বাজল। আর পলকে নিশানাথ নিজের ভুল বুঝল। দুপুরে ঘুমিয়েছিল, তারপর সন্ধে নেমে অন্ধকার হয়েছে। এখন রাত্রি!

নিশানাথ কানের কাছে যেন অস্ফুট উচ্চারণ শুনল, রাত্রি। তার তাবৎ শরীর অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে রাত্রির ইন্দ্রিয়গুলিকে অনুভব করল। আসলে রাত তার কাছে নিছক একটি ধ্বনি নয়। তার স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে শব্দটি এক বিশেষ অনুষঙ্গ আনে। নিশানাথকে কেউ ঠেলে তুলল।

পোষাক পালটে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে রাস্তায় নামতেই মনে পড়ল, মুখ ধোয়া হয় নি, চুল আঁচড়ানো হয় নি, আরো কি যেন একটা - যা পেটে আসছে অথচ মনে আসছে না।

নিশানাথ হেসে ফেলল। বেশ ভেবেছি। কথাটা আর একবার মনে হতেই নিশানাথ প্রায় শব্দ করে হেসে উঠে লক্ষ্য করল জনৈক মাথা ভাঙা গ্যাসপোস্টের গায়ে ঝোলানো একটা দড়ির মাথা থেকে সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে মুখ তুলে তাকে একবার দেখল; বলল, 'ও, আপনি', তারপর আবার আগুন ধরাতে লাগল। মুখে সিগারেট থাকায় লোকটির কথাগুলি জড়িয়ে গেছিল। নিশানাথ বলল, 'হুঁ', তারপর হাঁটতে লাগল।

অবশ্য নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। লোকটি আমাকে চেনে। হঠাৎ দেখে এইভাবে রেকগ্‌নাইজ্‌ করল।

একলা এবং নিজের মনে কাউকে হাসতে দেখলে বিস্ময় বা বিরক্তি স্বাভাবিক। পাগল ভাবাও বিচিত্র নয়। সে কারণে ভদ্রলোক মুখ তুলে আমাকে চিনতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সিগারেট ধরাতে লাগলেন।

ভদ্রলোক দেখেই বুঝলেন এ জাতীয় অস্বাভাবিক আচরণ এক আমার পক্ষেই সম্ভব। তাই নতুন করে বিচলিত বোধ করলেন না।

এখন, ভদ্রলোক সত্যিই কি ভাবলেন, আমি তা কেমন করে বুঝব। প্রথমত আমি তাঁকে চিনি না। দ্বিতীয় ভদ্রলোক আমাকে আদপে চেনেন কিনা। দ্বিতীয়ত, উঁহু তৃতীয়ত—চিনলেও, কতটুকু—তা জানি না। কোথায়, কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় দেখে আমার সম্পর্কে কি ধারণা করে রেখেছেন—তাও জানা নেই। অবশ্য মানুষ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি এমনই বিচ্ছিন্ন, কাঁচা। তথাপি এই ধারণা নিয়েই আমরা সভ্য-জীবন অতিবাহিত করে থাকি। ও, মনে পড়েছে। আসলে দাড়ি কামানো হয় নি। হুঁ, ঠিক। পেটে আসছে, মনে আসছে না। হুঁ, ঠিক। আচ্ছা, লোকটা তো আমাকে অন্য কেউ ভেবে পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ও-কথা বলতে পারে!

নিশানাথ স্থির করল দাড়ি কামাবে। আর পলকে তার বেজায় শীত ধরল, ঘন ঘন হাই উঠতে লাগল। তখন সে খুব উদারভাবে নিজেকে বলল, 'আজ থাক নিশানাথ। মনোভাবে তখন সেই রাজা, যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজদ্রোহীকে শেষ মুহূর্তে ক্ষমা করার উদারতা দেখিয়েছিল। আসলে, প্রভু-ভৃত্য আমরা সকলেই এক একটি সম্রাট। যদিচ উভয়ের ক্ষেত্র

আলাদা। এই যেমন, দাড়ি কামাব কি কামাব না—এখানে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

অতঃপর নিশানাথ কিছুটা অন্যমনস্ক ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে সামনের চায়ের দোকানটায় ঢুকে পড়ল। পাড়ার রেস্টুরেন্ট, সে কারণে নিশানাথ একেবারে অপরিচিত নয়। মোটামুটি ভীড় ছিল। সন্ধেবেলাটা রাস্তার মোড়, বাড়ির রোয়াক, চায়ের দোকান এবং পার্ক বা ময়দান কোলকাতার বৈঠকখানা। রাত হলে গোটা শহরটাই কলকাতার অন্তঃপুর। সকাল আমি জানি না। কলকাতায় বোধহয় সকাল নেই। উনবিংশ শতাব্দীর পর কলকাতায় বোধহয় কোনোদিন সকাল হয় নি। আর দুপুর আমার বিষয়ের বাইরে। চড়া রোদ, প্রখর আলো, যাবতীয় স্পষ্টতা নিয়ে দুপুর বড় প্রাগৈতিহাসিক।

নিশানাথ গলা পরিষ্কার করে অনুচ্চ স্বরে ডাকল, গোলাম হোসেন?

সেই ছেলেটি এসে দাঁড়াল।

নিশানাথ বলল, হুঁ, এখনও আছিস? চা-ফা-দে।

ছেলেটা যার নাম ক্ষিতীশ এবং যাকে যে কেউ যা ইচ্ছে নামে ডাকে, বলল, রোজ রোজ বাবুর এক কথা।

নিশানাথ মৃদু হাসল। বালক, তুমিও কি রোজ রোজ নতুন কথা শুনতে চাও? না কি মনোগত প্রৌঢ়তায় আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ, যে কারণে কথামাত্রই তোমাকে বিরক্ত করে? বলল, জানিস না তো? তুই এসেছিস সাতদিন। আর তোর ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞেস কর, গত দু-বছরে লাখখানেক ছোকরা কাজ করেছে চলে গেছে।

নিশানাথ ছোকরা শব্দটা ব্যবহার করায় মনে মনে অপ্রতিভ হলো। কিন্তু ছেলেটির চোখে মুখে ভাব কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। হঠাৎ লক্ষ্য করল ছেলেটি আজ উল্টে আঁচড়াবার চেষ্টায় মাথাটাকে সজারু বানিয়েছে। নিশানাথের বমি এলো। এবং সে নিজের এই প্রতিক্রিয়ায় যারপরনাই বিস্মিতও হলো। কারণ এ তো অনিবার্যই ছিল। চোখের সামনে কতগুলি নিষ্পাপ ছেলেকে সে এইভাবে বুড়িয়ে যেতে দেখল। যুদ্ধ পাশ্চাত্য কমিউনিজম দিয়েছে বা ক্যাথলিসিজম্‌কে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে। হাতে রইল পেন্সিল—এ্যাবসর্ডিটির তত্ত্ব। একজিস্‌টেন্‌সিয়ালিস্ট এ্যাংগ্রি ইয়ংম্যান: বেট জেনারেশন। আমাদের দেশে যুদ্ধ দিল গণোরিয়ার মহৌষধ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তার ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ, আর বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব—ঘর-কৈনু বাহির। ফলে কলকাতা শহরটা পাল্টে গেল। দু পা অন্তর চায়ের দোকান,

ওষুধের দোকান। আর দু শ পা অন্তর মদের দোকান, সিনেমার দোকান। আর রাত হলে সমস্ত শহরটা যেহেতু অন্তঃপুরে, সেহেতু পত্নী-উপপত্নী এবং নিছক শয্যাসঙ্গিনীর সন্ধানে এক পাও হাঁটতে হয় না। আধুনিকতার চোলাইয়ে কলকাতা তার বাবু কালচারকে অক্ষুন্ন রেখেছে। মাঝে মাঝে আমরা আরও পেছিয়ে যাই। আমি তো বুঝি না কলকাতাকে গ্রাম বলতে বাধা কোথায়?

ঠকাশ করে চায়ের কাপ নামিয়ে ছেলেটি বলল, বাবু?

নিশানাথ চোখ তুলে তাকাল।

বাবু?

উঁ?

আমায় একটা ঠিকানা লিখে দেবেন?

নিশানাথ যথেষ্ট বিস্মিত হয়ে বলল, কেন? আসলে সে বলতে চেয়েছিল – কিসের?

ছেলেটি বলল, আমার মায়ের। আমি তো ইংরিজি জানি না। তারপর একটু হেসে, যে হাসি নিশানাথ একমাত্র প্রেমিকার মুখে কল্পনা করতে পারে, বলল, আপনার জন্যে রেখে দিয়েছিলাম।

ওঃ। নিশানাথ উত্তরে চায়ের কাপে মুখ দিল। বোবা কাণ্ড। ছেলেটি আমাকে মহৎ ভেবেছে, অন্তত পরোপকারী, নিদেন ঘনিষ্ঠ। ছেলেটি সারাদিন আমার প্রতীক্ষা করেছিল। ধন্য নিশানাথ। একজন তোমার অপেক্ষায় ছিল, তোমাকে দিয়ে সে কাজটা করিয়ে নেবে, তার মায়ের চিঠি—তার মা, কি লিখবে ছেলেটি, তার মা কি জানবে পোস্টকার্ডের ঠিকানাটা যার লেখা সে একটা আধুনিক মানুষ, ফলত ইতর, থুড়ি নিস্পৃহ। সে তার ছেলেকে দেখে গোলাম হোসেন বলে ডাকে—কারণ এইভাবে তার মনের অচরিতার্থ প্রভুত্ব বাসনা প্রকাশের পথ পায়। অস্ফুটে ডাকে, কারণ সে শিক্ষিত। সে তার ছেলের সঙ্গে রোজ কিছু না কিছু কথা বলে, কিন্তু তার নাম মনে রাখে নি, মুখ মনে রাখে নি, কিছু মনে রাখে নি।

নিশানাথ কাপ থেকে মুখ তুলছে না। কারণ সে এই সুযোগে ছেলেটির মুখের কোনো ছাপ মনে আছে কিনা যাচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। মোটামুটি একটা আদল যখন তার কাছে স্পষ্ট হলো তখন সে চোখ তুলে দেখল সামনে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই

ছেলেটিকেই সে একটু আগে চায়ের অর্ডার দিয়েছিল। নিজের কাছে যথারীতি নিশানাথের আর-এক মস্ত চুরি ধরা পড়ে গেল।

নিশানাথ বলল আর কাউকে বললেও তো পারতিস।

ছেলেটি আবার সেইভাবে হাসল। যে-হাসি নিশানাথ কোনো প্রেমিকার মুখে কল্পনা করতে পারে, যদিচ তার চুল আঁচড়াবার ধরনের পাশে যে-হাসিটি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য এমন কি অশ্লীলতা সৃষ্টি করে, অথচ দুটি চোখের ভাষায় যে-হাসির অকৃত্রিম সাক্ষ্য মেলে। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, লজ্জা করে।

নিশানাথের সমস্ত শরীর রি রি করে উঠল। ডেঁপো ছোকরা। বদমাস, লম্পট। অন্য সকলকে লজ্জা করে, আমাকে লজ্জা নেই? কেন, আমি চা খেয়ে পয়সা দিই না? মোটামুটি ভদ্রলোকের মতো জামা কাপড় পরি না? ও-ওহ, দাড়িটা কামানো হয় নি। তাই, তাই স্কাউন্‌ড্রেল আমাকে তোমার লজ্জা নেই। তুমি ভেবেছ আমিও তোমারই মতো জনৈক হরিদাস পাল। তাই আমার সঙ্গে তোমার চেনালি করা সাজে।

বাবু?

কি?

আনব চিঠিটা?

তিন থাপ্পর মারব ইয়ারকি করলে।

নিশানাথ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল প্রথমে বিস্ময়ে, তারপর অবিশ্বাস, তারপর অপমান বা বেদনাগোছের কিছু একটা ব্যাপার কি দ্রুত ছেলেটির মুখের রঙ পাল্টাল।

নিশানাথ চিৎকার করে উঠল, আমি তোমার ইয়ার?

নিশানাথের কণ্ঠস্বরে সকলেই সচকিত। আশেপাশের টেবিলে যাঁরা এতক্ষণ সস্তা রবীন্দ্র রচনাবলী, ঘোড়ার বাজি, চিত্রতারকার ডিভোর্স, নেহরুর বাঙালী-বিদ্বেষ জাতীয় আলোচনায় মগ্ন ছিলেন—তাঁরা অনেকেই হাতের কাছে একটা টাটকা প্রসঙ্গ পেয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কি দাদা, ব্যাপার কি?

কি হলো, নিশানাথ বাবু?

এই রেস্টুরেন্ট বয়গুলো যা হয়েছে না মশাই। চাবকে সব—

নিশানাথ বিমূঢ়ের মতো সেই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটির চোখে আতঙ্ক। কোণের ক্যাশ টেবিলে ডিম, কেকের বোয়েম আর পাঁউরুটির

টিনের আড়ালে ম্যানেজার বসেছিলেন। তিনি হঠাৎ উঠে এসে ছেলেটার কান ধরে দু-তিনটে চড় মারলেন।

কে একজন বলল, থাক থাক, এত জোরে মারবেন না।

কে একজন বলল, রাখুন মশাই, চাব্‌কে—

ম্যানেজার নিশানাথকে বললেন, ছেড়ে দিন স্যার। অজাত-কুজাত, মা-বাপ নেই, কি বলতে কি বলে ফেলে। এই ছোঁড়া, যা ভেতরে যা।

ব্যাস। ব্যাপারটা মিটে গেল। ছেলেটি কি বলছিল, ম্যানেজার তা শুনতেও চাইলেন না। কারণ নিশানাথ বুঝল, ভদ্রলোক জানেন কথায় কথা বাড়ে। বস্তুত নির্ঝঞ্ঝাটে দোকান চালানোই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং নিশানাথ সত্যিই অপমানিত হয়েছে কিনা, হলে এটুকু ক্ষমা-প্রার্থনাই যথেষ্ট কি না—সে ব্যাপারে ম্যানেজারের কোনোই মাথা-ব্যথা নেই। আর এই লোকগুলোও মুহূর্তে পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে গেছে। ছেলেটি বলেছিল, ছেলেটির পক্ষে কি বলা সম্ভব—এ ব্যাপারেও কারোর কৌতূহল থাকল না।

নিশানাথ চায়ের দাম মিটিয়ে বাইরে বেরোল কিন্তু আমি এরকম করলাম কেন? জানি না। ছেলেটি আমায় কি ভাবল? জানি না। কাল দোকানে এসে পুনরায় গোলাম হোসেন বলে ডাকতে পারব কি? জানি না। ডাকলে ছেলেটি এইভাবে এসে দাঁড়াবে কি? জানি না। কিন্তু ছেলেটার ঠিকানা লিখে দেবে কে? জানি না। ছেলেটির মা—আহ্, মা। মরুক গে, দাড়িটাই কামিয়ে নি।

অতঃপর নিশানাথ ব্যাপারটা প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেলুনের চেয়ারে বসে আয়নায় নিজের মুখ, নাপিতের ঝুঁকে পড়া শরীর, পেছনের দেয়ালে ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি দেখতে দেখতে হঠাৎ লক্ষ্য করল ক্যালেণ্ডারের অক্ষরগুলি সব উল্টো, পড়া যাচ্ছে না। অথচ ক্যালেণ্ডারের ছবিটা ঠিক আছে।

তাহলে আয়নায় যে ছায়া পড়ে, তা উল্টো। আমার ছায়াও উল্টো। হাত তুলল। উল্টো। অথচ, সোজা। এ বড় বিচিত্র হলো। প্রতিবিম্ব মাত্রেই উল্টো। অথচ তাকেই আমরা সোজা দেখি, ঠিক দেখি। আয়নার আবিষ্কার হয়েছে কত বছর? কোটি কোটি মানুষ এইভাবে নিয়ত নিজের উল্টো ছায়ার অহমিকায় রূপ, প্রণয় ইত্যাকার সাধু ব্যাপারগুলি নিয়ে কত না কাণ্ড করল! আমাদের চোখও তো দর্পণ। তাহলে বস্তুর যে প্রতিভাস আমরা দেখি, তাও তো উল্টো। তাহলে চিরদিন মানুষ যা কিছু দেখেছে,

উল্টো দেখেছে। যা কিছু পড়েছে, উল্টো পড়েছে। তাহলে এই যে মানুষের সৃষ্টি, সভ্যতা, ঐতিহ্য—তার ভিত্তিটাই কোনো কালে সোজা নয়।

নিশানাথ অতীব আনন্দিত বোধ করল। বেড়ে, খুব একচোট নেওয়া গেছে। মূর্খের দল, তোমরা কি জানো—উহহ্। নিশানাথ অস্ফুট আর্তনাদ করে বলল, কেটে ফেললে তো ব্রণটা?

ছোকরা খবরের কাগজের টুকরোয় খুরের গায়ে জমা সাবানের ফেনা মুছতে মুছতে হেসে বলল, ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছি স্যার।

সাদা ফেনায় কাটা দাড়িগুলো কালো কালো ছিটের মতো জড়িয়ে আছে। সাদা ফেনায় কালো ছিট। এতে একটু ক্রিমসন রেড হলে, এক ফোঁটা। নিশানাথ ভাবল বলে, আমার গালটা কামাতে কামাতে এমনভাবে একটু কেটে দাও—যাতে ব্যথা না পাই। তারপর সেই রক্তটা তোমার সাবানের ফেনায় ঠিক যখন মিশে যাবে। আর ঐ কালো ছিটগুলো—

নিতান্ত প্রেমিকের মতো নাপিত ছোকরা নিশানাথের চিবুকটা আস্তে উঁচু করল। নাপিতের হাতে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ এক। এবং নিশানাথ লক্ষ্য করেছে কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকেই এরা সমভাবে পরিচর্যা করে। খানিকটা অভ্যাসে, কিছুটা বা পেশার তাগিদ ও গরিমায়। নিশানাথ একদিন দেখেছিল একটি হিন্দুস্থানী মজুরের গোঁফ সমান করে ছাঁটার জন্যে একজন সেলুনবয় রীতিমতো পরিশ্রম করছে। চুলছাটা ও দাড়ি কামানোর মধ্যে যে সূক্ষ্ম আর্ট আছে—যা আমাদের চোখে বড় একটা ধরা পড়ে না—সে সম্পর্কে এরা সচেতন। সেখানে এদের ফাঁকি নেই। এরা যেভাবে চিবুকটা তুলে ধরে, যেভাবে ঘাড়টা নামায় তাতে এদের অজ্ঞাতেই এমন একটা ব্যাপার প্রকাশ পায়—যা-ও প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষেত্রেই সম্ভব। আসলে এটিও এদের এফিশিয়েনসিরই একটা অঙ্গ। নিছক অভ্যাসও বলা চলে। তবু নিশানাথ প্রত্যেকবার বিস্ময়ের সঙ্গে তা উপলব্ধি না করে পারে না। কিংবা বলা যায়, চেয়ারে উপবিষ্ট কোনো শক্তির প্রতিই এদের পারতপক্ষে বিশেষ মনোযোগ না থাকার ফলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। দাঁতের ডাক্তারের কাছে সমস্ত দাঁতই যেমন সমান, পরামানিকের কাছেও সমস্ত মাথা আর গাল সে কারণেই অভিন্ন। এদিক দিয়ে বিশ্বের প্রতিটি সেলুনকে প্রকাশ্য, আইনসম্মত ও এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ গণিকালয় বলা যেতে পারে।

তারপর ছোকরা গলায় বাঁধা টাওয়েলটা খুলল। ডেটল দিয়ে মুখটা পুঁছে

ছিল। তার ওপর ক্রিম লাগিয়ে আঙুল দিয়ে গালে বিলি কাটতে লাগল। নিশানাথ আয়নায় তার সগুকামানো মুখটার ওপর কটি পরুষ আঙুলের চঞ্চল চলাফেরার দিকে স্তব্ধ তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য ছবি। যে মুখটা আমার, অথচ আমার মনে হচ্ছে না—তার ওপর শুধু কটি আঙুল—পরুষ, শিরওঠা আঙুল চঞ্চলভাবে ঘুরছে। ইচ্ছে করলে আমি আমার গলা, কাঁধ, চেয়ারের পিঠ, পেছনের রঙচটা দেওয়াল আর ক্যালেণ্ডারটি বাদ দিতে পারি কিন্তু দেয়ালে একটা কালো ঝুল শুঁড়ের মতো বেঁকে সমস্ত ব্যাপারটাকে আলাদা চরিত্র দিয়েছে। অতএব দেওয়াল থাক।

সুতরাং, এইভাবে নেওয়া যায়—একটা মামুলি দেওয়াল, একটি মাত্র ঝুল কিভাবে উড়ে এসে হাতির মতো শুঁড় তুলে দেওয়ালের গায়ে লেপ্টে আছে। তার সামনে একটি সগুকামানো মুখ—না কোনো ব্যক্তির, অথচ কারোরই নয়। তার ওপর কটা আঙুল।

নিশানাথ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। কে যেন আবার কানের কাছে বলেছে, রাত্রি!

দুই

বাসের জন্য অন্যমনস্ক দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করল জনৈক ভিখিরি অপেক্ষমান যাত্রীদের কাছে ভিক্ষে চেয়ে বারংবার প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে আর ধাপে ধাপে নিজের চোখ-মুখ-গলায় আপন দৈন্য ও অসহায়ত্বের অভিব্যক্তি বাড়াতে বাড়াতে শেষে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেচে যেখানে লোকটার সঙ্গে আলমগীরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা সাজাহানের বা ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বা পোড়া-আঙুল ভানগখের কোনো তফাৎ থাকে নি।

নিশানাথ মুগ্ধ হলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে খুচরো পয়সার ভীড থেকে তর্জনীর ছোঁয়ায় একটা পাঁচ নয়া পয়সা বের করল। ভিখিরির চোখের সামনে গাদাখানেক খুচরো নেড়েচেড়ে সব থেকে কম দামী মুদ্রাটি লোকে কিভাবে ভিক্ষে দেয় সে বোঝে না। এ ব্যাপারে নিশানাথ সঙ্গতিতে মধ্যবিত্ত কিন্তু রুচিতে পুরোদস্তুর অভিজাত। অভিপ্রেত মুদ্রাটি খুঁজে এমনভাবে বার করে দেয়, যাতে ভিখিরি না ভেবে পারে না হাতে যা এলো ভদ্রলোকটি তাই তাকে দিয়েছে। দানার্থে সে প্রস্তুত হয়েছে এমন সময় একটু দূরে আর একটি বাস এসে দাঁড়াল আর ভিখিরিটা দৌড়ে সেদিকে

গেল, যেন ওখানে যারা নামবে তাদের জন্যই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু দেখেছ? লোকটা আমার কাছে ভিক্ষে চাইল না। দাড়ি কামাই নি বলে কি—অভ্যাসে নিশানাথ গালে হাত দিয়ে বুঝল একটু আগেই সে সেলুন থেকে বেরিয়েছে। তাহলে কি আমার চোখে মুখে, আমার পোশাকে, আহ্, চাইল না, হুঁ, ছেলেটাও আমাকে ঠিকানা…নিশানাথ অতিশয় ক্রুদ্ধ হলো। নিশানাথ ভীত হলো। তারপর বাসে উঠে কতকটা মরিয়ার মতো একটি লোকের পা মাড়িয়ে দিল। মনে মনে যখন কিছু গালমন্দ শুনবার ও তার উত্তরে (যথা, ট্যাক্সিতে গেলেই পারেন; উঁহু, মেজাজ দেখালেই বুঝি, না, স্ট্রেট বল, বেশ করেছি মশাই, ইত্যাদি) বলার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে তখন সেই লোকটিকে বলতে শুনল, 'সরি'। নিশানাথ বিস্মিত হবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের দুটি চোখই অমাবস্যা-রাতের মেঘার্ত আকাশ।

নিশানাথ যেন নিজের ঘাতককে দেখল, কি এক অনির্দিষ্ট আতঙ্কের তাড়নায় তার চোয়াল শক্ত হলো। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে সামনের সিটে বসা একটি যুবকের কাঁধ খাঁচা মেরে প্রায় ধমকের সুরে সে বলল, এঁকে একটু বসতে দিন না মশাই। আপনি তো ইয়ংম্যান।

শেষ শব্দটা সেই অবস্থায়ও খচ্ করে কানে লাগল। নিশানাথ ভুল প্রয়োগের লজ্জায় আমতা আমতা করে বলল, মানে আপনি তো একজন যুবা, অর্থাৎ কিনা যুবক।

যুবকটি নিশানাথের মারমুখী ভঙ্গিতে হঠাৎ থমকে গেছিল। তাকে তোতলাতে দেখে পলকে উত্তেজনা ফিরে পেয়ে বলল, এটা কি লেডিজ সীট মশাই, এঁ্যা? না উনি মেয়েছেলে যে উঠে দাঁড়াতে হবে?

নিশানাথ পরিষ্কার বুঝল, যুবকটি ঠিক এই কথাগুলি বলতে চায় নি। আসলে সে হয়তো অন্ধ লোকটিকে দেখে নি। হয়তো দেখলেও মনে মনে ভেবেছে, নিজের জায়গায় ওকে বসতে দেওয়া উচিত। তারপর নাগরিকতাবোধ গোছের ভারী ভারী ব্যাপারগুলি নিয়ে চিন্তা করতে করতে লোকটির অস্তিত্ব ভুলে গেছে। কিংবা হয়তো তার মনে সাংসারিক বৃত্তিটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কেউ যখন ছাড়ল না, যখন ছাড়ে না, তখন আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন ইত্যাকার ভেবে হয়তো নিজেকে সে সান্ত্বনা দিয়েছে। নিশানাথ নিশ্চিত জানে ভালো

ভাবে বললে যুবকটি এককথায় জায়গা ছেড়ে দিত। কিন্তু সে সেভাবে খোঁচা মেরেছে, যে স্বরে আদেশ করেছে, তারপর উত্তেজনা স্বাভাবিক।

কিন্তু দেখেছ, ছেলেটা আমাকে কি রকম ভুল বুঝল! 'ইয়ংম্যান' বলে যে আমি লজ্জা পেয়েছি তা-ও বুঝল না। আমি যদি পরে কোনো দ্বিধা প্রকাশ না করতাম, যদি গলায় অ্যাদেশের ভঙ্গিটা বজায় রাখতাম, তাহলে ছোকরা (না না, যুবক) নিশ্চয়ই আসন ছেড়ে না উঠে পারত না। আমাকে কুণ্ঠিত দেখে ভাবল হঠাৎ উত্তেজনা প্রকাশ করে আমি নিজেই ভয় পেয়েছি। হয়তো ওর চওড়া শরীরটাকে ভয় পেয়েছি। তাই রেগে উঠতে পারল। নিশানাথ যুবকটির রুচিহীনতায় মমতা বোধ করল।

কিন্তু ততক্ষণ যুবকটির ভিতর বাসে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। একজন ভদ্রলোক নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেই অন্ধ লোকটিকে সেখানে বসার জন্য অনুরোধ করছে। সে অসহায়ের মতো বলছে, 'না না, ঠিক আছে। মানে আমার কোনো অসুবিধে. মানে রোজই তো যেতে হয়।' তার কথার মধ্যেই একজন তাকে বলছে বসুন না দাদু। আপনি অন্ধ মানুষ, চোখে দেখেন না।' আর লোকটি যেন ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটি দিয়ে, সে তার সর্বশরীরের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে, সে তার যাবতীয় অনুভব দিয়ে পলকে বুঝেছে বাসের তাবৎ যাত্রী এখন, এই মুহূর্তে, তাকেই দেখছে, তার অন্ধতাকে দেখছে।

নিশানাথ স্তম্ভিত। এই যে লোকগুলি, মানে এই যে লোকগুলো এঁরা একজন অন্ধকে বলছেন, আপনি অন্ধ, অতএব বসুন; আপনি অন্ধ দাঁড়িয়ে যেতে অসুবিধে, অতএব আমি দাঁড়িয়ে আপনাকে বসার জায়গা দিচ্ছি। অর্থাৎ এখানে মানুষটির অস্তিত্ব তুচ্ছ, প্রায় নেই; সকলেই যা দেখছে, যা স্বীকার করছে—তা হলো লোকটির দৃষ্টিহীনতা। মানুষটার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য-প্রস্থের শরীরে অতি সামান্য অংশ নিয়ে আছে ভুরুর তলায় দুটি কোটরে মৃত একজোড়া চোখের যে মণি— দেখ, কিভাবে তা পলকে এতবড় একটা অবয়বকে মিথ্যা করে দিল। কিভাবে অনস্তিত্ব অস্তিত্বকে গ্রাস করে। আসলে, মানুষ কি আমার অপরাধবোধের তাড়ায় বা নেহাৎ অন্যমনস্কতার কারণে বা অন্য প্রসঙ্গ অবতারণার ইচ্ছেয় হঠাৎ পরোপকারী বনে যায়? আর মানুষ কি পরোপকার, দয়া, সেবা ইত্যাকার গুরুগম্ভীর ব্যাপারগুলি মারফৎ অন্য মানুষকে লাঞ্ছনা, দীনতা স্বীকারে বাধ্য করে একাধারে নিজের গরিমা, নিজের হীনমন্যতাবোধেরই পরিচয় দেয় না? অন্ধ

ভদ্রলোকটি একটুখানি বসতে পাওয়ার বিনিময়ে সকলের মনোযোগের কারণ হওয়ার থেকে দুর্ঘটনায় হাসপাতালে দুখানা পা খোয়ালে কি এখনকার থেকে বেশি দুঃখিত হতেন ?

কি মশাই ঠিক কিনা ? একজন নিশানাথকে প্রশ্ন করল। ইতিমধ্যে বাসে যে পারস্পরিক মন্তব্যাদির নানা স্রোত-উপস্রোত বয়ে গেছে, নিশানাথ তার অধিকাংশই শোনে নি। সুতরাং প্রশ্নটা ধরতে পারল না। তাই এমনভাবে মাথা নাড়ল, আর মুখে এমন একটা হাসি ফোটাল যার কোনো অর্থ নেই। তারপর নিশানাথ বাসের পরিবেশে ফিরে এসে লক্ষ্য করল একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক সেই যুবকটিকে বলছেন, ছি, ছি, আপনি একজন ইয়ংম্যান, এটুকু স্পিরিট নেই আপনার, আবার আইন দেখাচ্ছেন ? একজন বৃদ্ধ বললেন, আজকালকার ইয়ংম্যান মশাই, এঁরা যখন আইন মানেন না, তখন তার পেছনেও আইন দেখান। আর হবে নাইবা কেন ? গোটা দেশখানা একবার তাকিয়ে দেখুন। বেরুবাড়ি দিতে হবে ? আইন নেই ? কেন আইন পাল্টাবার আইন আছে, পাল্টাও আইন, দাও বেরুবাড়ি। এমন দেশের ছেলেরা মশাই অন্ধ, খোঁড়া, বৃদ্ধ, লেডিজ—এঁদের কখনো সম্মান দিতে পারে ? এই না হলে স্বাধীনতা ? একজন যুবক বললে, 'যা বলেছেন। দেখুন স্টেটবাস হাতে নিয়ে আমাদের কি দুর্ভোগ। যদ্দিন পাঞ্জাবীরা ছিল, একটি ছোকরা বৃদ্ধটিকে বলল 'এ আপনার অন্যায় দাদু। একজনের জন্য গোটা জাত তুলে গালাগালি। এই জন্যই তো বাঙালীর—। কেন, আমাদের ছেলেরাই এই সেদিন নন্দাঘুন্টি ঘুরে এলো না, আমাদের…' বুড়ো লোকটি বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে রাখ তোমার নন্দাঘুন্টি। আজকালকার কাগজগুলোও হয়েছে তেমনি। হুজুক পেলেই কথা নেই। আজ নন্দাঘুন্টি, কাল টেস্টম্যাচ, পরশু চীন, তরশু রাণী। আর মাঝে মাঝে এই নিয়ে হৈ চৈ—নেতাজী কি জীবিত ?' ভদ্রলোক জ আর ছ-এর উচ্চারণে অবজ্ঞা ফুটিয়ে তুললেন। ছোকরাটি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কেন, হুজুগ হবে কেন ? আপনি বললেই হবে ? ভারী বোঝেন আপনি ?' ছেলেটিও তার 'ঝ'-এর উচ্চারণে সমভাবে অবজ্ঞা প্রকাশে পারদর্শিতা দেখাল।

নিশানাথের বমি এলো। যে কোনো সুযোগে রুচিহীন, দায়িত্বহীন কিছু বাণী উদ্‌গার করার কি অস্বাভাবিক প্রবণতা। তাছাড়া প্রত্যেকে যেন সব সময় একটা প্রতিপক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভাষায়, ভঙ্গিতে অন্যকে

অপমান করার কি অনুপম কৌশল। আহ্ মধ্যবিত্ততা। নিশানাথ ভাবল একটা বক্তৃতা দেয়। তারপরেই মনে হলো, কি লাভ? তাছাড়া যদি সকলেই হেসে ওঠে! এই তো কাল না পরশু, না, আরও আগে কবে যেন চীনেবাদামঅলাটা কিভাবে হেসে উঠে অপমান করল।

অতঃপর নিশানাথ সেই কবেকার সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া একটা মামুলি চীনেবাদামঅলার জন্যে রক্তে আক্রোশ বোধ করল। একটা অস্থিরতা। সেদিন রাগে হতবাক হয়ে খানিক দূর চলে আসার পর হঠাৎ মনে হয়েছিল আবার ফিরে গিয়ে লোকটাকে বলে 'কি হয়েছে তাতে? মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে গেছে?' তারপর আরো খানিকদূর গিয়ে ভেবেছিল ফিরে শুধু বলবে 'মহাভারত তো দেখছি শুদ্ধই রয়েছে', তারপর লোকটা হাঁ করে যখন কথার মানে বোঝবার চেষ্টা করবে তখন দিগ্বিজয়ীর মতো ফিরে আসবে। তারপর আবো খানিকদূর হেঁটে ভেবেছিল 'দেখছি' শব্দটা সমস্ত বাক্যকে এলিয়ে দিচ্ছে। শুধু বলবে 'মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে'। কিন্তু ফিরে গিয়ে বলা আর হয় নি।

নিশানাথ উঠে দাঁড়াল। এমন একটা চোখা ডায়াল্‌গ, অথচ প্রয়োগ করা গেল না। কাকে বলব? এই অর্বাচীনদের বলেই বা লাভ কি? শব্দ যে ব্রহ্ম, আদিতে শব্দই যে ছিল ঈশ্বর—কে তা মনে রেখেছে? মানুষ জেনেছিল আপন ভাবনার সত্য আর সুচারু প্রকাশই হল ঈশ্বরত্ব। জেনেছিল প্রকাশেই ঈশ্বর। তাই তাদের প্রতিটি বাক্যে ছিল দেবত্ব।

নিশানাথের গায়ে কাঁটা দিল। সে যেন কানে সমুদ্রের গর্জন শুনল, শঙ্খের ফুৎকার শুনল, গীর্জার ঘণ্টা শুনল, তানপুরার সুর আর নূপুরের নিকন শুনল। নিশানাথ শুনল আদি মানুষ উচ্চারণ করছে 'মা'। নিশানাথ শুনল 'ভালোবাসি'। নিশানাথ শুনল 'জন্ম-মৃত্যু-দহন-যন্ত্রণা'। হায় একটি শব্দ একটি কাব্য। আস্তে আস্তে মানুষ শব্দের ব্যঞ্জনা ভুলে গেল। তাই তাকে অন্য ঈশ্বর খুঁজতে হলো।

সেই পুরনো ক্ষোভটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বড় দেরিতে জন্মেছি। এমন কোনো মহৎ শব্দ নেই, যা আমি প্রথম উচ্চারণ করব। ব্যবহারে ব্যবহারে শব্দ আজ কথা, বাক্য আজ কথা। কথা আমার ভালো লাগে না। কথা বড় হালকা, সমুদ্রের ফেনা যেন। শব্দ ছিল সমুদ্র, সমুদ্র কয়েক হাজার বছরে ফেনা ছাড়া কিছু রইল না। কয়েক হাজার বছরে সভ্যতা মানুষের হাতে অপরিমেয় গাঁজলা তুলে দিয়েছে।

নিশানাথ ভূতগ্রস্তের মতো নিচে নেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ একতলার দরজার কাছ থেকে সিঁড়িতে একটা হাত এগিয়ে কণ্ডাক্টর বললে, 'টিকিট' ?

নিশানাথ চমকে বুক পকেটে হাত দিল, পাশ পকেটে দিল, তারপর বুঝল কাটা হয় নি। পয়সা বার করে দিতে দিতে হঠাৎ সে বলে বসল, কাটি নি দেখছি, কিন্তু মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে।'

কণ্ডাক্টর ব্যস্ত গলায় বলল, 'কি বললেন ? কোথ্ থেকে ?'

নিশানাথের তাবৎ আনন্দ পলকে অন্তর্হিত হলো। অত্যন্ত অপমানিতের মতো মুখ করে বলল, 'চোদ্দ।'

দোতলায় তখনো তর্ক চলছে। 'আরে রেখে দিন, আপনাদের মশাই চেনা আছে। ফরটি-টুতে।' হা হা করে হাসি, 'মশাই এতে আর চিঁড়ে ভিজবে না। নতুন কিছু বলুন।' আরে বাবা, 'সার কথা বুঝে নিয়েছি। এভাবে চলে না। তবে এভাবেই চলবে।'

নিশানাথ হো হো করে হেসে ফেলল। কণ্ঠস্বরে মুখগুলো মনে কবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ক্ষণপূর্বে দেখা কোনো মুখই তার স্মরণে এলো না। সে যেন বিনয়বাবু, হরিশ, মনো—এদেরকেই দেখল।

'কি হলো ?' কণ্ডাক্টর একা একা হাসতে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। আব দরজার পাশে লেডিজ সীটে বসা গুটিকয় মেয়ে সময়োপযোগী দৃষ্টিতে তাকাল। নিশানাথ পলকে শামুক হয়ে বলল, 'ওপরে একটা মাতাল, একটা নয়, কয়েকটা…'

কণ্ডাক্টর হেসে বলল 'রোজ লেগে আছে। সেই থেকে শুনছি।'

নিশানাথ শুকনো মুখে বলল, 'হুঁ।'

আমি বললাম, বিশ্বাস করল। যদি বলতাম ওপরে একটা সৎ ব্যাপার হচ্ছে, তাহলে কি এভাবে মেনে নিত ? মানুষ কি স্বভাবত বিশ্বাস-প্রবণ, না এ এক ধরনের কেচ্ছাবিলাস ? নাকি কণ্ডাক্টর তার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ছকে আমার বিবরণ মিলিয়ে নিতে পারল বলেই তাব মনে কোনো সংশয় নেই ?

নিশানাথ বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাঁধুন।'

স্টপে বাস দাঁড়াল। নিশানাথ হ্যাণ্ডেল ধরে নামছে, একটা পা মাটিতে, এমন সময় তার চোখ ছবি দেখল। ফুটবোর্ডের ওপরকার কাঁচের বেড়া দিয়ে একতলার বাঁ দিকটা দেখা যায়। দরজার পাশে আড়াআড়ি ভাবে

টানা লেডিজ সীট। তারপর সারি সারি তুজনের সীট এঞ্জিনের দিকে মুখ করা। সবশেষে আর একটা টানা সীট, দরজার দিকে চোখ। কাঁচটা মলিন, জায়গায় জায়গায় ছোপ ধরেছে। আর ঠিক মধ্যিখানে বোধহয় কোনোদিন ঢিল পড়েছিল, একটা বিন্দুর চারদিকে অজস্র সরু সরু রেখায় খানিকটা ফেটে আছে। ফাটাব চিহ্নগুলি ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বাসের আলো সেই সূক্ষ্ম বেখাগুলির ওপর পড়ে কেঁপে ভেঙে যাওয়ায় কাঁচটা যেন বালুকণাব মতো মসৃণ আলোর গুঁড়োয় জ্বলছে। আর সেই আলোর ফুলের মধ্য দিয়ে লেডিজ সীটে বসা একটি মেয়ের মুখ, মুখের আভাস; তার পাশে আরো গুটি তুই রমণীর আদল; জোড়া সীটে পরপব এক জোড়া মাথা; মাথাগুলি ছাড়িয়ে শেষ সারিতে কতগুলো পুরুষের মুখ; তাদের পিঠে বাসের দেওয়াল; দেওয়ালে কি যেন কি লেখা আর তারের জাল; জালের পেছনে এঞ্জিন, ড্রাইভাবের পিঠ। আবছা ফাটা কাঁচের ভেতর দিয়ে নিশানাথ এক জগৎ দেখতে পেল—একটা জগৎ, কিছু কিছু আভাস, অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, অথচ আলোব গুঁড়োয় জ্বলছে। আর ভাঙা রেখাগুলির কারণে সমগ্র ছবিটি অজস্র ডায়ামেনসনে সত্যিই এক চরিত্র পেয়েছে।

কি মশাই, কি হলো?

নিশানাথ কণ্ডাক্টরের বিরক্ত ধমকানিতে লজ্জিত হয়ে দ্রুত বাসে উঠে পড়ল। বলল, ইয়ে, নেক্সট···

কণ্ডাক্টর বলল, ঝুলতে ঝুলতে কি ধ্যান হচ্ছিল? আচ্ছা জ্বালা।

নিশানাথ ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে পূর্বদৃশ্য দেখার চেষ্টা করছিল। কণ্ডাক্টর বলল, উঠে আসুন মশাই। এই যে এখান থেকেও দেখা যায়। আবার য়্যাকসিডেণ্ট করলে তো আমাদের প্রাণ নিয়ে—

নিশানাথ বাধ্য চাকরের মতো কণ্ডাক্টরের নির্দেশে সিঁড়ির তলা আর একতলার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আর সেই মেয়েটিকে দেখল। ইস্ কি কুচ্ছিত। তার গা গুলিয়ে উঠল। কোথায় যেন একে দেখেছি? আর কণ্ডাক্টরটা এখানে দাঁড়াতে বলল কেন? কি যেন বলল? এখান থেকেও দেখা যায়! কি দেখা যায়? কি দেখতে চাই আমি? কি দেখছিলাম ও ভেবেছে? নিশানাথের সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হলো। আমাকে কি ভাবল এই মেয়েটার মুখ দেখে আমি নামতে গিয়েও ফিরে এলাম? আঃ, এখান থেকে সমস্ত বাসের ভেতরটা কি স্পষ্ট, কি রূঢ় দেখায়।

মধ্যিখানে সরু প্যাসেজ। দু-ধারে সারি সারি আসন। কতগুলো পুরুষ আর মেয়েমানুষ কোথা থেকে যেন কোথায় যাচ্ছে। ভীড় নেই, তাই আরো অশ্লীল মনে হচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড খাঁচার মতো, খাঁচায় সমস্ত আয়োজন আছে, পাখি নেই। মেয়েটি মাঝে মাঝে আমায় দেখছে কেন? ওহ্, মনে পড়েছে। একটু আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যখন কণ্ডাক্টরের সঙ্গে···অথচ তখন তো একে দেখে আমার দ্বিতীয়বার তাকাবার, আসলে মেয়েটা কি হঠাৎ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠল? বিরক্তি না আত্মতৃপ্তি? আমার কারণে? মূর্খে রমণী, তুমি কি জানো না, হায় কোনো রমণী শরীর, কোনো রমণী আমায়, হায়, এ পরবাসে রবে কে, এ পরবাস, কণ্ডাক্টর, তুমি যথার্থই একটি শূকরীর সন্তান, নইলে আমাকে একথা বলবে কেন? কি দেখছিলাম, কি দেখতে চাই কেমন করে বুঝবে? কেউ বোঝে না। সেই চীনেবাদামঅলাটা তাইতো আমাকে, দাড়ি কামালাম—তবু, অথচ মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে।

নিশানাথ সেই কবেকার সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া একটা মামুলি চিনেবাদাম-অলার জন্য যারপরনাই আক্রোশ বোধ করল। অথচ তাকে আর কোনো দিন দেখবে না। কোনোদিন উত্তর দেওয়া হবে না। কতকাল এই দহন ভোগ করব জানি না। আবার কবে কি প্রসঙ্গে এই জ্বালা আপাদমস্তক, আপাদমস্তক এই জ্বালা, নাই রস নাই—দারুণ দহন বেলা।

নিশানাথ অজ্ঞাতে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝল কণ্ডাক্টরের অপমানটা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। তাই সেটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে দূরের অন্য এক অপমানবোধ প্রসঙ্গে হঠাৎ সে নিজেকে তপ্ত করেছিল। অথচ বাসের এই মধ্যবিত্ততা এবং ভদ্র শ্রমিক শ্রেণীর জনৈক প্রতিভূ এই কণ্ডাক্টর ও সর্বহারা শ্রেণীর নিদর্শন কোনো এক বুড়ো বাদামঅলার কাছ থেকে প্রায় অকারণে লব্ধ অপমানবোধ যখন তার স্নায়ুকে উত্যক্ত করেছে তখন একেবারে হঠাৎ এই গানটা এলো কিভাবে? ও, বুঝতে পেরেছি। জ্বালার সঙ্গে বেলার একটা ধ্বনিসাদৃশ্য আছে। আর দহন শব্দটি আমাকে সেই মরীচিকা জালে বেঁধে ফেলল। কিন্তু একটু আগে আরও কি একটা গান যেন ভেবেছিলাম? কি যেন, হায়, তারপর... আসলে আমি জানি এও এক ধরনের এস্কেপ। কাঁচের পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ যে ছবি দেখেছিলাম আর এইখানে দাঁড়িয়ে যে কুৎসিৎ মহিলাটি, অবশ্য ঠিক কুৎসিৎ নয়—সুন্দরই বলতে হয়, তথাপি আমার

কাছে যাকে অত্যন্ত মামুলি একটা মেয়েছেলে বলে মনে হলো—আর বাসের এই ভেতরটা—একটা বৃহৎ শূন্য খাঁচা ইত্যাদি যা দেখতে হচ্ছে, তার থেকে পলায়নের কি সুন্দর উপায় এই গান। এও রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্র ঠাকুর প্রণীত, রবিবাবু রচিত। আহ রবীন্দ্রনাথ!

নিশানাথের কাছে ক্ষণপূর্বের যাবতীয় চাঞ্চল্য অত্যন্ত তুচ্ছ হলো। রবীন্দ্রনাথের নামে নয়, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতেও নয়, বস্তুত কোনো কারণেই ছিল না। খানিকটা বিমচের মতো সে লক্ষ্য করল এই এখন আর কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। পরের স্টপে নিশানাথ নেমে পড়ল।

আর সেই মেয়েটিও নামল। জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে বাস চলতে শুরু করল, কণ্ডাক্টরটা হ্যাণ্ডেল ধরে পেছন দিকে ঝুঁকে কিছুক্ষণ তাদের দেখল। নিশানাথ তার মুখে স্পষ্ট হাসি লক্ষ্য করল। মনে হলো একতলা আর দোতলার জানলায়ও কিছু মুখ তাদের দেখছে। নিশানাথ অস্বস্তি বোধ করল। ওরা ভেবেছে মেয়েটি আর সঙ্গী। কিন্তু কণ্ডাক্টরটা? হঠাৎ নিশানাথ যার মুখের দিকে একবারও ভালো করে তাকায় নি, সেই কণ্ডাক্টরটির চেহারা, পোশাক স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেল। ব্যাগের লম্বা পটিটা এমন কোণাকুনিভাবে বুকের ওপর ঝোলানো যে পাশ থেকে দেখলে পুলিশ-সার্জেণ্ট বলে হলেও হতে পারে।

নিশানাথের পা ছমছম করতে লাগল। হঠাৎ ছবিটা চোখে পড়ায় এক স্টপ এগিয়ে এলাম কেন? ভদ্রমহিলাই বা এখানে নামলেন কেন? আসলে সমস্তটাই কি আমার অজ্ঞাত, অচেতন ইচ্ছাশক্তির ফল? কিন্তু এখন, কিন্তু আমি কণ্ডাক্টরটা কি সবই বুঝেছিল?

মেয়েটি বাস থেকে নেমে আঁচলটা গুছিয়ে নিল। ঝুঁকে জুতোর বক্‌লস্ ঠিক করল। আঁচলটা খসে রাস্তায় পড়ছিল। তাড়াতাড়ি বাঁ-হাত দিয়ে বুকের কাছটা চেপে ধরল। আর নিশানাথ পুনরায় একটি ছবি দেখল। ট্রাম নেই, বাস নেই, গাড়ি নেই, লোক নেই। সামনের বিশাল বাড়িগুলি তার চোখে ধরা পড়ছে না। সে শুধু একটি প্রণত রমণী-শরীরের পেছনে দাঁড়িয়ে। আর রাস্তা পেরিয়ে, ফুটপাত ডিঙিয়ে যে বিশাল হলুদ বাড়িটা—তার মাথায় নিওন আলোয় কোন এক হাওয়াই জাহাজ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন জ্বলছে। কয়েক পলকের ব্যবধানে লাল, সবুজ, নীল আলো জলধারার মতো কিভাবে চকচকে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে। নিশানাথ রঙের সমুদ্রে একটি নারীকে প্রণত দেখল।

তারপর মেয়েটি উঠল। আর একবার আঁচলটা টেনেটুনে ঠিক করল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে স্পষ্ট নিশানাথের দিকে তাকাল। মেয়েটি কি বেশ্যা? কিন্তু এমন নিষ্পাপ, ইনোসেন্ট মুখ তাহলে সম্ভব হত না। মেয়েটার শরীর অতিশয় সুন্দর। কিন্তু ওর চোখ বলছে সে সম্পর্কে মেয়েটি কিছুই জানে না। ক্ষণপূর্বে বক্ষের আঁচলটা কি রকম অবলীলায় চেপে ধরেছিল, যেন একটি প্রেমিক তার রমণীর বক্ষ স্পর্শ করছে। কিন্তু মেয়েটি এখানে নেমে কোথায় যাবে?

প্রায় পাশাপাশি তারা রাস্তা পার হলো। তারপর মেয়েটি আগে আগে যাচ্ছে। একটু পেছনে নিশানাথ। যাদুঘরের গায়ের রাস্তা সোজা পুব দিকে গেছে। এই সন্ধেতেও কেমন অন্ধকার। নিশানাথ জানে· কত সতর্কতায় এখানকার কিছু কিছু রাস্তায় অন্ধকার সংরক্ষিত হয়। মোড়ে কতগুলো রিক্সা দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের দেখে ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজাল। মেয়েটি একবারও পেছন ফিরছে না। নিশানাথ খানিক ব্যবধান রেখে হাঁটছে। একদিকে সে গোটা পরিস্থিতিসহ নিজেকে লক্ষ্য করছে, অন্যদিকে কি একটা অলৌকিক শক্তি যেন তাকে টেনে সেই অন্ধকার পথটায় ঢোকাচ্ছে।

তারপর চৌরঙ্গী পেছনে পড়ে রইল। শুধু অতিপ্রাকৃত জানোয়ারের দীর্ঘশ্বাসের মতো ধাবমান গাড়ির আওয়াজ ভেসে এলো। দু পাশে বাড়ি, ছায়া ছায়া বাড়ি। আলোগুলিও ছায়া ছায়া। অচেনা, কাঁপা, বিলম্বিত সুরে কে যেন শিষ দিয়ে উঠল। পাশ দিয়ে বোধহয় একটি যুবক দ্রুত সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

আর জুতোর শব্দ। কলকাতাটা মুছে গেছে। অনেকগুলো শতাব্দী মুছে গেল। নিশানাথ হাঁটছে। সামনে একটি মেয়ে। কোন্ অদৃশ্য আদেশে তাদের পায়ের শব্দ এমন এক হয়ে গেল! কি এক জেদে নিশানাথ থমকে দাঁড়াল। সে নিজের স্বাতন্ত্র্য রেখে পা ফেলবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির পদশব্দ শুনল। ভেবেছিল' মেয়েটিও কি থমকে দাঁড়াবে, একবার তাকাবে ঘাড় ফিরিয়ে? নিশানাথ জানে না। সে আবার হাঁটতে লাগল। তার অনিয়মিত পদক্ষেপ যেন পলকে কুৎসিৎ কোলাহল সৃষ্টি করল।

তখন নিশানাথ তার মধ্যে কামনাকে প্রত্যক্ষ করল। আমি তাহলে মরে যাই নি? অস্ফুটে নিজেকেই প্রশ্ন করল। এ কি বিস্ময়, আমার রক্তপ্রবাহে আসঙ্গলিপ্সা? অস্ফুটে নিজেকেই প্রশ্ন করল। মাঝে মাঝে কেন যে……

চকিতে সুনয়নীর কথা মনে এলো। নিশানাথ শিউরে উঠল। সুনয়নীর মুখটা কিছুতেই মনে করতে পারছে না। থমকে দাঁড়াল। যেন একটি রেখায় সে মুখটি স্পষ্ট করতে চায়। অথচ সামনে এই রাস্তা। হঠাৎ ছোট কপালে দুটি ভাঁজ তার মনে এলো! আর সুনয়নীকে সে চোখের সামনে দেখতে পেল।

নিশানাথ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। মেয়েটি অনেক দূরে। বাঁকের কাছে আলো জ্বলছিল। সে স্পষ্ট তাকে মোড় ফিরতে দেখল। মেয়েটিকে আমি কি ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে দিলাম? হঠাৎ কামনা বোধ করে আমি কি এই জগতটায় ফিরে এলাম, যা আমার কাছে অতীত স্মৃতির মতো ধূসর বা স্বপ্নে দেখা অস্পষ্ট কোনো ছবি—যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে আমি নিজেকে অপরিচিত আর সংশয়ী মনে করি অথচ যেখানে সুনয়নী আজও, আহ্, এই মেয়েটি আমাকে কেন, কেন এখানে নিয়ে এল। কেন আমার রক্তে আজও জীবনের সাড়া ওঠে। কেন এই লজ্জা। একটি বিমূঢ় উত্তেজনায় পা ফেলতে লাগল। সেই মোড়ে বাঁক নিল। আলো, কোলাহল। হারিয়ে গেল। কোথায় এসেছি? আস্তে আস্তে সে চিনতে পারল। রেকর্ডে গান বাজছে। মুসলিম হোটেল। আগে কিছু খেয়ে নেব? সে নিজের অজ্ঞাতে অবশেষে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। সামনে খানকয় ট্যাক্সি। অল্প দূরে কয়েকটি রিক্শা। উর্দিপরা দরোয়ানটা সেলাম করে দরজা খুলে ধরল। নিশানাথ মদের দোকানে ঢুকে পড়ল।

তিন

ভেতরে ঢুকতেই গন্ধ আর শব্দের একটা মিশ্র কোলাহল সমুদ্র-স্তম্ভের মতো তার চোখের সামনে ভেঙে গেল। তারপর কয়েকটি প্রবাহ তীরের দিকে ছড়িয়ে যেতে যেতে একটি ঢেউ হয়ে নিশানাথের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। নিশানাথ মুগ্ধ শঙ্কায় তাকিয়ে রইল।

ঘরটি আকারে অবিকল স্বাস্থ্য-বইয়ের হৃৎপিণ্ডের ছবি। লোক চলাচলের পথ রেখে চারদিকে শিরা উপশিরার মতো ছড়ানো টেবিল, চেয়ার। নিশানাথ এখানে এলে মানুষ দেখে না, দেখতে পায় না। নিশানাথ স্পষ্ট অনুভব করে ত্বক ও প্রসাধনের নানা বৈপরীত্য সত্ত্বেও বিভিন্ন অবয়বে আসলে কিছু রক্ত দৌড়চ্ছে; নাচছে; নতুবা বুঁদ হয়ে জমে গেছে। নিশানাথ এখানে কিছু ধমনী দেখে, রক্ত দেখে। আর সেই অবিচ্ছিন্ন গুঞ্জন, ছিপি খোলার আওয়াজ, গেলাসের শব্দ, গান, পেছল মাটিতে শক্ত হিলের ছন্দিত

রব এবং সোডা ঢালার কুলকুল ধ্বনি—এই তাবৎ সূক্ষ্ম ও পরুষ শব্দের অবিমিশ্র কোলাহল যেন হৃদপিণ্ডটির নিভুল স্পন্দন।

সাব?

নিশানাথ তাকাল। বিব্রতের মতো ভাবল কি অর্ডার দেব?

সাব, অর্ডার?

আমি মদ খাব কেন? নিশানাথ অবাক হয়ে ভাবল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ওয়েটারটা ছাপা ওয়াইন চার্ট সামনে মেলে ধরল। অনেকা সুন্দরীর আভাসিত নগ্ন শরীরের ওপর লাল-কালো অক্ষরে ছাপা হিশি-বিলিতি অজস্র পানীয়ের নাম। নিশানাথ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কৈফিয়তের সুরে মনে মনে বলল, এ আমাকে নভিশ ভেবেছে। আসলে আমি জানি না কেন মদ খাব, ও ধরে নিল মদ্যাদির নাম অথবা মূল্য জানা নেই বলেই ইতস্তত করছি। নিশানাথ যারপরনাই অপমান বোধ করল। সে মুখ না তুলেও ওয়েটারটার চোখে হাসি দেখতে পেল এবং বিরক্ত হয়ে উদাসীনের মতো বলল, 'থ্রি, এক্স, নীট।' ওয়েটার শুনেই চলে গেল। নিশানাথের অর্ডার বা আদেশের ভঙ্গিতে সে যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছে বা তাকে অভিজ্ঞ বুঝে লজ্জা পেয়েছে এমন বোঝা গেল না। আর নিশানাথের মাথা ধরল।

মদ খেতে আমার, সরি, মদ্য পান করতে মোটে ভালো লাগে না, তবু গিলতে হচ্ছে। নিছক হুকুমের জন্য যে দাঁড়িয়ে, পানশালার চাকর যে, তার কাছেও অপটু মদ্যপ হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে কি অভিমান! খাঁটি মাতালরা রাম খায়, আমিও তাই খাব। রামের গন্ধ মৃত ছারপোকার মতো, গলা দিয়ে আগুন নামে। হুইস্কি তাও চলে। আসলে মদের গন্ধটাই আমার সহ্য হয় না। জীবনে প্রথম কফি খেয়ে যেমন হতাশ হয়েছিলাম, মদ্য পানে ততোধিক। মদের টেস্ট যদি সুন্দর হতো, গ্যালন গ্যালন খেতে কোনো আপত্তি ছিল না। মদ্যপানে আমি কোনো নৈতিক সমর্থন পাই নি। কারণ আমি কিছুতেই মধ্যবিত্ত হতে পারি নে। আনন্দ না বিষাদের আধিক্যে মদ গিলে দেবদাস হওয়ার কথা ভাবা যায় না। শরৎচন্দ্র বৃথাই লিখেছেন পান করে যে মাতাল হয় না, সে মিথ্যেবাদী নতুবা জল খায়। আসলে কমল, তুমি সাক্ষী, একবার পাঁচ পেগ রাম গিলে আমি কাহিল হয়েছিলাম। চোখ মেলে তাকাতে পারছিলাম না। পা দুটোকে পাখির ডানার মতো অবান্তর মনে হচ্ছিল। আর শরীরের সমস্ত রক্ত এসে দুই

হাতের নখে জমা হয়েছিল আর কানে অবিশ্রাম অলৌকিক শব্দ। দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে গেলাম। পৃথিবীটা ঘুরতে লাগল। আর অকথ্য শারীরিক যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবু, সেই অবস্থায় ভাবলাম—এই কি নেশা? কিন্তু মাতলামি করতে পারছি কই, বিস্মৃতি কই? আর নাগরদোলার সব থেকে দ্রুত মুহূর্তে যেমন কিছু দেখা যায় না, সমস্ত পৃথিবী ঘুরছে, ভয় করে, অথচ পরিষ্কার জানি দোলনার বাইরে সব স্থির—ঠিক তেমনই আমার মনে হলো। যদিও দোলনা থেকে ছিটকে পড়ে যাবার সেই ভয়টা ছিল না। কোনো ভয়ই না। আমার খুব বমি করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আর নিজেকে বললাম, এতো হবেই। নিছক বৈজ্ঞানিক কারণ। আমার স্টমাক এতখানি লিকার কনজিউম করতে পারে না, তাই স্নায়ুগুলি আক্রান্ত হয়েছে। বস্তুটা বেরিয়ে গেলেই মোটামুটি ঠিক হবে। কিন্তু কমল, তোমার সামনে সেই অবস্থায়ও বমি করতে লজ্জা পেয়েছিলাম। আর তখনই বুঝেছিলাম মূর্খ ছাড়া কেউ মদ্যপান করে না। আসলে অতীশ, তুমি মিছেই উপদেশ দিচ্ছ। মদ কোন আশ্রয় নয়। হতে পারে না। শরীরের কনসটিটিউশনের ওপর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তার বেশি খেলে জৈবিক কারণে স্নায়ু তোমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। কিন্তু কোনো মুহূর্তে চৈতন্য লোপ পায় না। হায় আমাদের আত্মসচেতনতা আর সভ্যতার অভিশাপ। মদ খেতে খেতে অজ্ঞান না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তুমি ভুলতে পার না যে তুমি নিশানাথ। নিশানাথবাবু, অতএব তোমার পক্ষে মদ খাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। অবশ্য পর্যাপ্ত খেলে তখুনি ঘুম পায়, অল্প খেলেও রাতে ভালো ঘুম হয়। শরীরটা কেমন শিথিল হয়ে আসে। কিন্তু এর থেকে দু আনা দামের সোনেরিল ট্যাবলেট তো কার্যকর, উপাদেয়। এই কারণে আমেরিকানরা নিত্যি-নতুন ঘুমের ওষুধ বার করছে। ওদের নেশা মদে না, মেয়েমানুষ নয়, ইনসমনিয়ার ওষুধে। আসলে বন্ধুগণ বিংশ শতাব্দীর মহত্তম ব্যাধি হলো নিদ্রাহীনতা ও অপরিমেয় চিন্তাশক্তি। ঘুম এর একমাত্র ওষুধ। মাত্র দু আনা। বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন আপনারা। একদিকে একটি বা কয়েকটি ট্যাবলেট আর এক গ্লাস জল, বেশ, চাইলে দুধ দিয়েও খেতে পারেন। চা, কফি, মদ যা আপনার ইচ্ছে।

নিশানাথ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। যথারীতি সে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করেছে এবং কোনো এক জনসম্মিলনে বক্তৃতা। এমন সময়ে হঠাৎ মনে হলো এ জিনিসটা তো কখনো করা হয় নি।

মদ আর সোনেরিল ট্যাবলেট একসঙ্গে খেলে, আচ্ছা, আমি যখন সুইসাইড করব তখন যদি একসঙ্গে—

ঠকাস করে টেবিলে গেলাস রাখল। বড় পেগে রাম ঢেলে পেগটা তারপর গেলাসের ওপর উপুড় করে দিল। ছিপি খুলে সোডার বোতল রাখল।

নিশানাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'নীট খাব, সোডা কেন?' বলেই আবার অপ্রতিভ হলো। কারণ নিজেকে অভিজ্ঞ প্রমাণ করার জন্য আবার সে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতি পেগের সঙ্গে সোডা এরা দিয়েই যাবে। খাওয়া না খাওয়া ইচ্ছে। আর মরমে মরে গিয়ে নিশানাথ লক্ষ্য করল ওয়েটারটা মৃদু হেসে বলছে, 'ঠিক হায় সাব।'

নিশানাথ এক ঝটকায় গেলাসটা তুলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রায় আদ্দেক মদ গিলে ফেলে মুখ বিকৃত করল, যদিও জানত এটা এটিকেটের অঙ্গ নয়। তারপর হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটটা মুছল।

বিষ খেলাম। খালি পেট, সোডা ছাড়া রাম। লিভার পুড়ে গেল, বুকটা এখনও জ্বলছে। হঠাৎ তার টেবিলে পাতা ওয়াইন চার্টটা চোখে পড়ল। আর লক্ষ্য করল মেয়েটির যোনিদেশের ওপর ছাপা মদের নামটাই থ্রি এক্স রাম। নিশানাথ হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ওয়েটারটা কি ভাবল এইজন্যই আমি, নিশানাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো আর তার গেলাস ছুঁড়ে ভীষণ একটা মারামারি করার ইচ্ছে জাগল। তারপরই মনে পড়ল বসে আছে মদের দোকানে, লোকে ভাববে মাতাল। সুতরাং অলক্ষ্য ভ্রূকুটির শাসনে নিশানাথ অতঃপর নিজেকে গুটিয়ে নিল।

কি অভিশাপ। এই এতগুলো লোক এখানে বেলেল্লাপনা করছে, আমি মাতাল হতে পারব না কেন? কেন পারব না আমি মাতাল হতে? কেন আমি কিছুই পারি না? নিশানাথ অত্যন্ত আহত আর অসহায় একটা ভঙ্গিতে বাকি মদটা শেষ করল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটারটা সামনে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু আমি মদ খাচ্ছি কেন? নিশানাথ শিশুর মতো নিজেকেই প্রশ্ন করল।

সাব?

নিশানাথ ফস্ করে বলে ফেলল, থ্রি এক্স। বলেই ডাকল 'শোনো'। ওয়েটারটা ঘুরে দাঁড়াতে বলল, 'দাঁড়াও'। তারপর ওয়াইন চার্টের ওপর

ঝুঁকে পড়েই আবার সচেতন হয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে বেপরোয়া আদেশ দিল, 'ঠিক হ্যায়, ওহি লাও'।

'ম্যাচিস ?'

নিশানাথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওয়াইন চার্টের সেই মেয়েটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাঢ় নীল রঙের একটা ফিনফিনে শাড়ি কোনো রকমে কোমরে জড়িয়ে সম্পূর্ণ আঁচলটা ডানার মতো ছড়ানো বাঁ হাত উপচে বাইরে পড়েছে। যেন এইমাত্র কাঁধ থেকে খসে গেল। বুকে একটা ব্রেসিয়ার, তাতে স্থানে স্থানে কাঁচ বসানো। আর চুল, ঠোঁট, চোখ, নখ, প্রভৃতি নিতান্ত সময়োপযোগী।

নিশানাথ দেশলাইটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল। তারপর চারমিনারের প্যাকেট থেকে শেষ সিগারেটটি বের করে ঠোঁটে গুঁজল। মেয়েটি নিজের মুখাগ্নি সেরে টেবিলের ওপাশ থেকে ঝুঁকে জলন্ত কাঠিটা নিশানাথের মুখের সামনে ধরল। আর টেবিলের ঝকঝকে হালকা-সবুজ কাঁচে একটা চকিত ছায়া পড়ল। আঙুর গুচ্ছের মতো থোলো থোলো চুল ঘাড় ডিঙিয়ে চিবুকের পাশে পড়েছে। উত্থিত দক্ষিণ হস্তের ক্ষুদ্র অগ্নিশলাটি স্থির। মেয়েটি আগ্রহে বঙ্কিম শরীরের ভঙ্গিটি যেন এক দীপাধার। নিশানাথ খুশি হয়ে চোখ তুলে তাকাল। আর সেই মেয়েমানুষটির শরীর দেখা গেল। থুতনির ডৌল, কণ্ঠার হাড়, আলোর সামনে ধরা সাদা কাগজের গায়ের আপাত অদৃশ্য নানাবিধ রেখার মতো সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট দাগের নক্সায় ভরা দুটি স্তন। ঝুঁকে থাকায় পেটের একটা পেশি সাপের মতো বেঁকে ছিল। আর পাঁজরার ঠিক তলায় যাকে কোমরের উর্ধ্বদেশ বলা যেতে পারে সেখানটায় কাপড়ের কষি বাঁধা এবং চর্বির কারণে কেমন যেন কালচে, স্থুল। নিশানাথ চোখ নামিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সৌজন্য সহকারে বলল মদ খাবে ?

মেয়েটি ত্বরিতে আঁচল, চুল আর শরীরে জলধারাসম তীব্র এক মোচড় দিয়ে সামনে থেকে ঘুরে নিশানাথের পাশের চেয়ারটিতে বসল।

বুঝতে পেরেছি। নিশানাথের উদাসীন দুটি চোখ এই কথা বলল। ইংরেজ, য়্যাংলো, চীনে, জাপানী নানা জাতের মেয়েমানুষ হৃদপিণ্ডের নানাস্থানে চাক বেঁধে আছে। এ মেয়েটি বাঙালী। শাড়ির সংখ্যা এখানে কম। সঙ্গী পায়নি বলেই কি আগুনের আছিলায় এলো। কিন্তু একটা টেবিলে গুটি তিনেক য়্যাংলো মেয়েমানুষ গল্প করতে করতে এই যে অধৈর্যের মতো দরজার দিকে তাকাচ্ছে, ওদের কেউ এলো না কেন? এখানেও কি

জাত্যাভিমান ক্রিয়া করে? অবশ্য আমি ডাকলে, পয়সা দিলে, কিন্তু আমার চামড়ার জন্যে তার চোখে কি স্পষ্ট কৌতুক থাকবে না? এখানে যদি একটা নিগ্রো বেশ্যা থাকত, আমিই কি তার দিকে তাকাতে পারতাম? চারিপাশে অধিকাংশ সাহেব-সুবো। এই মেয়েমানুষটা যেভাবে আমার কাছে এলো, তেমন অনায়াসে একটি ইংরেজ যুবকের কাছে যেতে পারত কি? এই মেয়েমানুষটি কি আমাকে তার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করার সাহসেই দেশলাই চাইতে পারল? নিশানাথ স্পষ্টত অপমান বোধ করল। অবশ্য কোন মেয়ে যদি তার টেবিলে না আসত, তাহলে সে নিশ্চিত আর এক জাতীয় হীনমন্যতায় পীড়িত হতো।

মেয়েটি টেবিলের মাঝখানে কনুই ঠেকিয়ে হাতের তেলোর ওপর মাথা রাখল। কলাপাতার মতো তার শরীরটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে রইল। পা নাচাতে নাচাতে মেয়েটি প্রশ্ন করল আপনি চারমিনার খান?

'হুঁ'। কিন্তু একে নিয়ে আমি কি করি?

কেন?

'উঁ'?

চারমিনার খেলে অসুখ হয়। মেয়েটি হাসল।

সর্বনাশ। মেয়েটির দাঁতগুলো কি বাঁধানো? নিশানাথ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তাই নাকি?'

অতঃপর মেয়েটি স্পষ্টত নতুন প্রসঙ্গ অন্বেষণের ফাঁকে অনাবশ্যকভাবে ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর ব্রেসিয়ারের ফিতেটা একটু টানাটানি করল। পুট করে আওয়াজ হলো, অর্থাৎ একটা বোতাম ছিঁড়ল মেয়েটি। নিশানাথ অন্যমনস্কের মতো মেয়েটির মুখের ওপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। মেয়েটি খুকখুক করে কেশে উঠে ডান হাত দিয়ে সামনের ধোঁয়াটা নেড়ে চেড়ে দিয়ে নিজে একমুখ ধোঁয়া নিশানাথের মুখে ছাড়ল। আগের সেই বিলীয়মান অস্পষ্ট ধোঁয়া আর নতুন গাঢ় ধোঁয়া ঢেউয়ের মতো ভাসতে ভাসতে ক্রমশ এক হয়ে দুজনের মাঝখানে হালকা আর জটিল জালের সৃষ্টি করল। সেই জালের একটা আকৃতি ছিল। নিশানাথ এবং মেয়েটি জালের দু-দিক থেকে দুজনের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

সাব, অর্ডার?

ওয়েটারটার চোখে স্পষ্ট তাকাল, না, বিরক্তি বা প্রশংসা কিছু নেই নিশানাথ হতাশ হয়ে বলল, কি খাবে?

মেয়েটি বেয়ারাকে বলল, লেমনস্কোয়াশ। তারপর নিশানাথকে বলল, মদ আমি খাই না।

নিশানাথ হেসে বলল, নতুন বুঝি? বলতে পেরে নিজের ওপর খুশি হলো।

মেয়েটি তাবৎ শরীরে প্রতিবাদের ভঙ্গী ফুটিয়ে বলল, আহ্লাদ? আমরা তিনপুরুষে প্রস্।

তাই নাকি? নিশানাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়েও মুখে চোখে সম্ভ্রম ফোটাল। তারপর বলল, তবে এখানে কেন?

মেয়েটি ভুরু তুলে বলল, সরকার আইন করে যে আমাদের মহল্লাই তুলে দিয়েছে। তাছাড়া ভদ্রবাবুরা তো আজকাল বেশ্যাপাড়ায় যেতে চায় না, বারে ঢোকে। আমরাও তাই—

ও।

মেয়েটি হাই তুলল, তুড়ি বাজাল। আড়চোখে একবার নিশানাথের দিকে তাকিয়ে লাজুক হেসে বলল, ঘুম পাচ্ছে।

নিশানাথ বলল, ঘুমিয়ে পড়ো।

এখানে?

ক্ষতি কি? কথা বলতে বলতে নিশানাথ মেয়েটির ব্রেসিয়ারের ওপর অন্যমনস্কের মতো সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। হঠাৎ যেন তার মনে হয়েছিল এই বন্ধুর শরীরাংশের উপত্যকাকে অনায়াসে য্যাসট্রের বিকল্প ভাবা যায়। মেয়েটি তার হাতের চঞ্চলতা লক্ষ্য করে বলল, আপনার ঘুম পাচ্ছে না?

না। মাথা ধরেছে।

বাইরে যাবেন?

হুঁ।

ট্যাক্সিতে যাবেন, গঙ্গার ধার?

হুঁ।

পঁচিশ টাকা লাগবে কিন্তু।

কেন? নিশানাথ প্রশ্ন করেই এতক্ষণের সংলাপের তাৎপর্য বুঝতে পারল। অথচ মেয়েটি কিছুতেই তার বাঁ হাতটা নড়াবে না। মেয়েটি জানে না শারীরিক ক্লেশ সত্ত্বেও নিপুণ শিল্পীর মতো টেবিলের ওপর নিজের বাহু আর বক্ষের যে অর্ধ উন্মুক্ত কম্পোজিশান সে এতক্ষণ অটুট রেখেছে, আসলে তা আমার কাছে নিছক একটা ছাইদানির অনুষঙ্গ আনছে। আর

সেই সূক্ষ্ম দাগগুলিকে মনে হচ্ছে পোড়ামাটির মৃৎপাত্রের গায়ে অলঙ্কৃত রেখা।

আবার ঠকাশ করে গেলাস পড়ল। ছিপি খোলার শব্দ। নিশানাথ ওয়েটারের দিকে চেয়ে পলকে তার হারানো অভিমান ফিরে পেল এবং প্রবীণ লম্পটের মতো উদাসীন স্বরে প্রশ্ন করল, পাঁচ টাকায় যাবে?

মেয়েটি চটে উঠে বলল, মস্করা করছেন?

নিশানাথ অতীব পুলকিত হলো। এতক্ষণে বাঙালী বেশ্যার প্রাচীন শব্দভাণ্ডার দেখা দিচ্ছে। সাহেব পাড়ার পানশালায় বসে মেয়েটার মার্জিত আলাপ শুনতে শুনতে তার মাথা ধরেছিল। নিশানাথ অনায়াসে বলে ফেলল, মাইরি?

মেয়েটি হেসে বলল, কলেজে পড়েন?

নিশানাথ হেসে মিথ্যে জবাব দিল 'হুঁ'। চিবুকে হাত বুলিয়ে ভাবল ভাগ্যি দাড়িটা কামিয়েছিলাম। কিন্তু রেস্তোরার সেই ছেলেটা, কি যেন নাম, গোলাম হোসেন, আর মা। ধুত্তোরি। বলল 'কেন'?

মেয়েটা হেসে উত্তর দিল, কলেজের মেয়েরা তো পাঁচসিকের সিনেমা দেখেই খুশি। আমাদের বাজার গেল।

সর্বনাশ। এখানেও প্রতিযোগিতা। বাজার। মনোপলিতে হাত পড়েছে, তাই ক্ষেপে গেছ সুন্দরী? নিশানাথ হা-হা করে হেসে উঠেই থমকে গেল।

দেখল চার পাশের টেবিল থেকে অনেকেই তার দিকে তাকিয়েছে। একটি প্রৌঢ় নাবিক দূর থেকে তার মাথার টুপি তুলে নিশানাথকে অভিবাদনের ইঙ্গিত করল। সঙ্গিনী ডান হাতের চেটোটা নাচের মুদ্রায় ঘুরিয়ে সেই প্রতীক্ষারত য়্যাংলো মেয়েদের একজনকে হাসিমুখে একটা চোখ টিপে ইসারায় বোঝাল, কি জানি কেন, অর্থাৎ মাতাল হয়েছে। আর অল্প দূরের টেবিল থেকে একটা যোয়ান সাহেব তার অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান হাতটা তুলে নিশানাথকে দেখিয়ে তার সঙ্গিনীকে কি যেন বলে হো-হো করে হেসে উঠল।

নিশানাথ কুঁকড়ে গেল। কি বলল সাহেবটা। তাকে কি ভাবছে এরা? মনে হলো সেই হৃদপিণ্ডের আকার পানশালাটার চারদিক থেকে হাসির বুজকুরি পাক খেতে খেতে পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে।

আর কেট্‌ল্ ড্রামে কাঠি পড়ল। আর প্রায় ধমকের সুরে বিউগিল

বেজে উঠল। যার চেলোর লম্বা মোটা তারে একটা ছোকরা-ফিরিঙ্গি-হাত গমগমে আওয়াজ তুলল। তারপর পিয়ানো এ্যাকর্ডিয়ান এবং কাঁসরের ধ্বনিতরঙ্গ উঠল এবং সেক্‌সপীয়রের ক্লাউনের মতো একটি লোক কোথা থেকে হঠাৎ শূন্যে দুটো হাত তুলে পরিত্রাহি ভঙ্গিতে একজোড় ঝুমঝুমি বাজাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ঠেলে জোড়া বাঁধা মেয়েপুরুষ পথচলার সরু জায়গাটায় পরপর দাঁড়িয়ে পড়ল। টেবিলে টেবিলে জোড়ের বদল হলো। আর মদিগ্‌লিয়ানির একটি মডেল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত নির্বিকার উদাসীন মুখে কোমর দুলিয়ে হাতে তাল দিয়ে তীব্র উত্তেজক গান ধরল। 'ইয়্যাও', 'ইয়্যাও' 'ইয়্যাও' সমস্বরে সকলে আনন্দধ্বনি করল এবং ঠিক সেই সঙ্গে বীয়ারের বোতল খোলার একটা তীব্র শব্দ সেই হল্লার বুকে তারের মতো বিঁধল। কে যেন শিষ দিল। যারা নাচতে নামে নি তারা চেয়ারে বসে তালে তালে হাতে তালি দিতে লাগল, পা ঠুকতে লাগল, হাসিভরা জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রইল নাচের দিকে।

মুহূর্তে পানশালার পটপরিবর্তন হয়েছে। আমার হাসিটা, আমাকে সকলে মাতাল ভাবল, আমি অর্থাৎ—

নাচবেন ?

নিশানাথ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। এ এখনও যায় নি ? কিন্তু আমি মদ খাচ্ছি কেন ?

চলুন না নাচি ?

নিশানাথের ইচ্ছে হলো বাঁ হাতে একটা থাপ্পড় মারে। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, জানি না।

ধুর, জানতে হয় নাকি ? শুধু পা ঠুকলেই—আমিও তো -

নিশানাথ লক্ষ্য করল নিজের অজান্তে মেয়েটি অর্কেস্ট্রার তালে মেঝেতে পা ঠুকছে আর নীল কাপড়ে মোড়া তার মাংসল দুটি জানু ঢেউয়ের মতো এক একবার কেঁপে উঠছে। নিশানাথ খুশি হয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে গেল এবং আবার তার কণ্ঠা, বক্ষ এবং পেট দেখতে পেল। নিশানাথের বিরক্তি হলো। সে টেবিলের কাচের ঢাকনায় তাকাল এবং দেখল মেয়েটি সরে বসার কারণে সেখানে কোনো ছায়া নেই।

আর আলো, প্রখর আলো। নিশানাথ অসহায়ের মতো চারদিকে তাকাল। কোথাও ছায়া নেই, শিল্প নেই। এবং মাইকের সামনে

গলার রগ ফুলিয়ে হাতে তালি দিয়ে কোমর দুলিয়ে সেই মেয়েটি গাইছে। এখানে সে দেগার মডেল। গানের সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটের কোল কুঁচকে চকচকে দাঁত বেরিয়ে আসছে, চোখ দুটো সাপ। আর সেই ক্লাউনটা প্রাণপণে দুটো হাত শূন্যে তুলে ম্যারাকাস বাজিয়ে চলেছে। যেন একটা অলীক অস্তিত্ব। আর হাতে তালি। আর পায়ের ছন্দিত ধ্বনি। ক্রমশ গান দ্রুত হচ্ছে, সুর দ্রুত হচ্ছে, নাচ দ্রুত হচ্ছে। ইয়াও বলে এবার গানের মধ্যে সেই মেয়েটিই চেঁচিয়ে উঠল। নিশানাথ বিস্ফারিত চোখে দেখল স্বাস্থ্য বইয়ের হৃৎপিণ্ডটায় ত্বক আর প্রসাধনের বৈপরীত্য সত্ত্বেও আসলে কতগুলি ধমনী উন্মাদের মতো দাপাচ্ছে। রক্ত দাপাচ্ছে।

নিশানাথ এই উন্মত্ত উৎসব আর কোলাহলের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ বোধ করল। কোথায় যেন যেতে হবে? কোথায় যেন যাবার ছিল সন্ধের পর আমি দাড়িটা, ও মনে পড়েছে। কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলল, রাত্রি।

নিশানাথ রোমাঞ্চিত হয়ে নড়েচড়ে বসতেই মেয়েটি অপ্রতিভের মতো ছিটকে সরে বসল। একটু যেন ভয়ও পেয়েছে। হেসে বলল, বলছিলাম যাবেন?

এই মেয়েটাও কি কানের কাছে কথা বলল? আমি যে শুনলাম, আমি যেন, এই মেয়েটা সেই থেকে, আসলে এ কে, কি চায়?

ভয়ে ভয়ে নিশানাথ প্রশ্ন করল, কোথায়? মেয়েটা মোহময়ী হাসি ফুটিয়ে বলল, বাইরে।

নিশানাথ বলল, যাব।

মেয়েটা ওয়েটারকে ডাকল। নিশানাথ বিলের ফেরৎ পয়সা একটা একটা করে গুনে পকেটে পুরল। সে স্পষ্টত বেয়ারার চোখে বিস্ময় দেখল। কিন্তু তার নিজেকে এতটুকু দীন বা অ-কেতাবান মনে হলো না। ওয়েটারটা মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি হেসে আবদারের সুরে বলল, ওকে কিছু দিন?

নিশানাথ এতক্ষণে বিজয়ীর মতো সেই বেয়ারাটার দিকে তাকিয়ে একটা আস্ত পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কেন, মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে।

বেয়ারাটা সেলাম করে বলল, জী সাব।

নিশানাথ প্রফুল্ল মনে উঠে দাঁড়াল। বেয়ারাটা যদি মানুষ হয় তাহলে

এই পাঁচ টাকা ওর কাছে চিরকাল কাঁটা হবে, চিরকাল। খুশি হয়ে সামনের দিকে এগোতে যাবে, মেয়েটি এসে ওর হাত ধরল, তারপর টেবিলে বসা অন্য কটা নিঃসঙ্গ বারমেডের দিকে খুশি হয়ে তাকাল। সে দৃষ্টিতে শুধু অর্থ উপার্জনের পুলকই ছিল না, পুরুষ-বিজয়ের নারী মহিমাও অজ্ঞাতে ফুটে উঠেছিল। প্রতিদিন এই এক জয়-পরাজয়ের লীলায় অবতীর্ণ হয়েও রমণীর গৌরব মেয়েটি হারাতে পারে নি। মেয়েটি তারপর প্রেমিকার মতো মুখ তুলে নিশানাথের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

নিশানাথ বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বলল, কোথায় ?

মেয়েটি ততোধিক তিক্তকণ্ঠে বলল, মানে ? তারপরেই গলায় অনুনয়ের সুর ফুটিয়ে বলল, বারে, গঙ্গায়—

নিশানাথ এতক্ষণে মেয়েটির সম্পূর্ণ চেহারার ওপর একবার চোখ বোলাল। পায়ে জরির কাজ করা স্যাণ্ডেল, স্ট্র্যাপের ফাঁকে রঙ করা নখ। আর মোটামুটি একটি শরীর। বাহুল্যের মতো নীল শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে আঁচলটি ডানার মতো ছড়ানো। বাঁ হাত উপচে বাইরে পড়েছে। নিশানাথের দৃষ্টি দেখে মেয়েটি তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে বুক ঢাকল। আর পলকে নিশানাথের আপাদমস্তক রি রি করে উঠল। সে মেয়েটার লজ্জায় অপমান বোধ করল। তারপর এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তিন পুরুষে প্রেম, আবার ট্যাক্সি চাপার সখ।

তারপর দ্রুত, প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

চার

নিশানাথ দূর থেকে দেখল তার সিংহাসনে একটি যুগল বসে আছে। সচরাচর এমন হয় না। পুকুরের পাশে, গাছের ছায়ায় নির্জনতা বা অন্ধকার-বিলাসী মেয়ে পুরুষ সে প্রায়ই দেখে। কিন্তু ঠিক তার এই নির্দিষ্ট জায়গাটুকু কোনোদিনই অধিকৃত হয় নি।

নিশানাথের ভয় করতে লাগল। সমস্তটা পথ সে পেছনে এক নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনেছে আর অলৌকিক কোলাহল। সমস্তটা পথ তার মনে হয়েছে কে যেন তর্জনী উঁচিয়ে তাকে চিনিয়ে দিচ্ছে। অত্যন্ত অসহায়ের মতো নিশানাথ নিজের আশ্রয়ে দৌড়ে এসেছিল। যেখানে রাত্রি তার ঐশ্বর্য নিয়ে অপেক্ষা করে। যেখানে কোনো হীনমন্যতা নেই। যেখানে সে অধীশ্বর। অথচ আজই কেন, কেন এরা এখানে এসে বসল।

পুরু কাঠের সাদা বেড়াটার গায়ে হাত রেখে সে প্রায় নিজের অজ্ঞাতে যুগলটির পেছনে এসে দাঁড়াল। বেড়ার ওপাশে পুকুরের দিকে মুখ করে তারা বসেছিল, নিশানাথের আগমন সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন অথচ ভঙ্গিতে আপাত ঔদাসীন্যের ভানটা বজায় রেখেছে। নিশানাথ জানে ওরা বিরক্ত হয়েছে, ভয় পেয়েছে। তাকে লম্পট বা পুলিশ ভাবছে।

মেয়েটি কি বলছিল, হঠাৎ চুপ করে গেল। ছেলেটি হঠাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে নিশানাথের মুখে তাকাল। অর্থাৎ এরা যে ভদ্রলোক এবং খারাপ মতলবে এখানে আসে নি···পুলিশ হলে এই ভাবে তা নিশানাথকে বোঝাতে চায়। আর নিশানাথ যদি লম্পট বা গুণ্ডা হয় তাহলেও যে ছেলেটি ভীত নয় তার চাউনিতে এমনও একটা অর্থ ছিল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুতের মতো নিশানাথ হঠাৎ বলে ফেলল, দেশলাই আছে? তার গলায় যে স্বাভাবিক কুণ্ঠা এবং উচ্চারণে যে সহজাত দ্বিধা—এক্ষেত্রে তা নিশানাথের কানেই মধুর শোনাল। এরা তার কথার ছাঁদে বুঝতে পারবে নিশানাথ অভিজাত। সে বাধ্য হয়েই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকাল, মেয়েটি অত্যন্ত লজ্জিত ও বিব্রতের মতো এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অতঃপর তার বটুয়া থেকে একটি দেশলাই বের করে নিশানাথের দিকে হাত বাড়িয়ে আবার হাত গুটিয়ে নিল এবং ছেলেটিকে সেই দেশলাইটা দিল। ছেলেটি দেশলাইসুদ্ধ হাত এগিয়ে বলল, এই নিন।

নিশানাথ ডান হাতে দেশলাইটা ধরে বাঁ হাত পকেটে ঢোকাল। পলকে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। সিগারেট তো নেই, এমনকি খালি প্যাকেটটাও। কিন্তু এখন কি করি? কি করি এখন? আমাকে এরা, আমাকে, কিন্তু প্রেম কি সত্যিই সম্ভব? ছেলেটিকে বেশি সিগারেট খেতে দেবে না বলেই কি মেয়েটি জোর করে দেশলাইটা, আমার সিগারেট নেই তবু দেশলাই চাওয়ার জন্য এখানে এসে দাঁড়ানোর কি অর্থ করবে এই প্রেমিক-প্রেমিকা!

নিশানাথ ফস্ করে একটা কাঠি জেলে বেড়ার এপাশ থেকে ঝুঁকে জ্বলন্ত কাঠিটা ওদের বিস্মিত ও ভীত মুখের সামনে ধরে থমথমে গলায় প্রশ্ন করল, এখানে কি হচ্ছে এত রাতে! নিজের কণ্ঠস্বরে নিশানাথ তার মধ্যে যেন নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করল।

ছেলেটি জেদী গলায় বললে, সে খবরে তোমার প্রয়োজন! মাতলামি করার জায়গা পাওনি? এখুনি পুলিশ ডাকব।

নিশানাথ স্নিগ্ধ হেসে বলল, তা একটু মদ্যপান করেছি বটে। কিন্তু পুলিশ তো আমিও ডাকতে পারি। কিংবা আমি নিজেই যদি সাদা পোষাকের পুলিশ হই আপত্তি আছে, একটু থেমে বলল, আপনাদের ?

ততক্ষণে দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি ঈষৎ কাঁপছে। ছেলেটি বিশ্বাস করতে পারছে না, অবিশ্বাস করতে পারছে না। অনেক আগে, মানে পৌরাণিক যুগে যখন আমি ভালোবাসাবাসি করতুম, সঙ্গে সুনয়নী ছিল—গঙ্গার ধারে আমরা মগ্ন হয়ে বসেছিলাম—একটা লোক এসে ঠিক এইভাবে আমাদের অপমান—কথার ছাঁদে বুঝিয়েছিল সুনয়নী বেশ্যা, আমি লম্পট, নইলে গঙ্গার ধারে এতরাতে—কলকাতায় ভালোবাসার নির্জন অবকাশ না পেয়ে আর অপমানে, অপমানে, অপমানে সুনয়নী—আর আমি—পৌরাণিক যুগে, যখন আমি প্রেমিক ছিলাম।

ছেলেটি ভীরু গলায় বলল, দেখি আপনার আইডেনটিটি কার্ড।

নিশানাথ বলল, সে সব থানায় গিয়ে দেখাব। তারপর গলায় অন্তরঙ্গতা এনে প্রশ্ন করল, কলেজে পড়েন বুঝি ?

মেয়েটি ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ'। যেন এই উত্তরেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

এই প্রেমিকাটিও তাহলে সেই বারাঙ্গনার একজন প্রতিযোগিনী। অহো! প্রেম ভার্সেস প্রয়োজন। প্রণয় বনাম—শরীরের এমন কোনো প্রতিশব্দ তার মনে এলো না, যা এখানে পান করে ব্যবহার করা যায়। নিশানাথ নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে বলল, বুঝেছি।

মেয়েটি ঘাড় নামাল। নিশানাথ অতীব পুলকিত হলো। আজকাল ধরিত্রী দ্বিধা হয় না, এ বস্তুত সৌভাগ্য বলতে হবে।

ছেলেটি বললে, কি বলতে চান আপনি ? আমরা কি দোষ করেছি ? নিশানাথ ছোকরার (সরি যুবকের) ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হয়ে বলল, বলতে চাই এখানে এভাবে বসা ঠিক হয় নি, এই আর কি।

কেন ? এই জায়গাটা কি প্রহিবিটেড এরিয়া ?

আমার অতীত দেখতে পাচ্ছি—যা এমনি নিষ্কলঙ্ক আর নির্ভয় আর নির্বোধ ছিল। কিন্তু থাকবে না। দিনে দিনে পরিবেশ এদের সমস্ত অহমিকা কেড়ে নেবে। এদের মধ্যে পাপ ঢোকাবে। এরা তখন নির্জনতা খুঁজে নেবার জন্যে চড়া দাম দেবে। তারপর সেই অপরাধবোধ। সেই অপরাধবোধ

আর অনির্দিষ্ট উৎকণ্ঠা। এদের আতঙ্কের অভিমান কান্নাই চাতুর্যে পরিণত হবে।

নিশানাথ বলল, তর্ক করবেন না। বাড়ি যান নয় ঐ ওদিকে গিয়ে বসুন। এখানে চুরি, ছিনতাই (বহুপূর্বে শ্রুত এই শব্দটি ও সাবধানবাণী তার মনে গেঁথে আছে দেখে সে আনন্দিত হলো), রাহাজানি হরদম হচ্ছে। বোঝেন না, কলকাতার ময়দান।

মেয়েটি অস্ফুটে বলল চলুন যাই।

ছেলেটি অতঃপর বেড়া ডিঙিয়ে এপারে এল, মেয়েটি নিচু হয়ে গলে এপাশে এসে দাঁড়াল। তারপর দুজনে মধ্যে ব্যবধান রেখে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। পানশালা থেকে বেরিয়ে সমস্তটা পথ আমি কি এই ভাবেই হেঁটেছি ? আমি কি এইভাবে—

হঠাৎ নিশানাথ পেছন থেকে দৌড়ে যুগলটিকে ধরল। নিশানাথ স্পষ্ট শুনল মেয়েটি ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করেছে। তার আপাদমস্তক ঘৃণা হলো, সে অপমানিত বোধ করল। ছেলেটিকে বলল, এই যে আপনার দেশলাইটা।

ছেলেটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, থ্যাঙ্কস।

নিশানাথ অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের জায়গাটিতে এসে বসল। আহ্ এতক্ষণে। পুকুরটার দিকে তাকাল। সামনে গাছের জটিল ছায়া। পাতাগুলির ফাঁকে আকাশ এবং একটি দুটি তারা, মৃদু বাতাসে জল মাঝে মাঝে কাঁপে। ছায়া কাঁপে। আর আকাশ ও নক্ষত্র খচিত জটিল সেই ছায়ার আকৃতি পাল্টায়। দিঘির বাঁ কোণে জলজ ঘাসের গায়ে খানিকটা লাল। তারপর উত্তর দক্ষিণে টানা সাদা বেড়ার ছায়া। বেড়াগুলির ফাঁকে পিচের রাস্তা। আর লাল, নীল, হলুদ বর্ণিকা। দক্ষিণ কোণে কতগুলি গভীর জলরেখা। কতগুলি রঙের জটিল কম্পোজিশন।

নিশানাথ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। চৌরঙ্গীর ওপারে যে বিশাল হলুদ বাড়িটা, তার ছায়া নেমেছে পুকুরে। যেন জলের তলায় এক নিদ্রিত প্রাসাদ। খিলান অলিন্দ ও সেই আশ্চর্য সিঁড়িটা জলের অতলে কি এক মহারহস্যের আয়োজন করে রেখেছে। নিশানাথ গুনে গুনে দেখল বন্ধ জানলাগুলির সংখ্যা ঠিক আছে। নিশানাথ কোনোদিন রাত্রে এ বাড়ির জানলা খোলা দেখে নি। আর আশেপাশের নিয়নবাতিগুলি জ্বলছে, নিভছে। তির্যক রেখায় সেই নিদ্রিত প্রাসাদের গায়ে আলো জ্বলছে, নিভছে।

পুকুরের স্থির জলে স্বচ্ছ ছায়া-বাড়ির খিলান, অলিন্দ এবং সিঁড়ির একোণ ওকোণে রঙ জ্বলছে, নিভছে। জানলাগুলি বন্ধ। খোলে না। সমস্ত ছায়া কি এক রহস্যে থরথর কাঁপছে। দিঘির হৃদ্‌পিণ্ড একটা অলৌকিক জগতের স্পন্দনে কাঁপছে।

আর যেহেতু ট্রাম লাইনের গায়ে সেই বাতিটা জ্বলছিল সেহেতু তরল ও রুগ্ন একটা রঙের প্রবাহ তীক্ষ্ণ মুখ থেকে ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে পুকুরের মধ্যিখানে অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে আছে। দিঘির শরীরে কখন কি আবেগ হয় নিশানাথ জানে না, শুধু মাঝে মাঝে সে দেখেছে পুকুরের এক একটা অংশে জল শান্ত হয়ে কাঁপে। সেই রঙের প্রবাহটি জোনাকির মতো ফুটছিল। যেন দিঘির হৃৎপিণ্ডে, পাতালে আগুন লেগেছে।

নিশানাথ স্তব্ধ চোখে দেখল বাতাস উঠেছে আর পলকে সমস্ত পুকুরটায় কাঁপন ধরল। আর অজস্র কুঞ্চিত কেশে যেন দিঘির জল ফেঁপে ছেয়ে গেল। আর গাছের ছায়া, বেড়ার ছায়া, বাড়ির ছায়া হাল্কা হয়ে দুলতে লাগল এবং সেই তরল আগুনটা মুহূর্তে সেই আশ্চর্য প্রাসাদের দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল। সেই রুদ্ধ গবাক্ষ, অলিন্দ, খিলানে আগুন লাগল এবং সিঁড়ির কোণে কোণে লাল, হলুদ, নীল আলো জ্যামিতিক আকারে অন্ধকার, আলো ও বিবিধবর্ণের জটিল উদ্ভাসে বিচিত্র হয়ে উঠল।

নিশানাথ ফিস ফিস করে বলল, বিদায়।

তখন সমুদ্রে ট্রয়ের রাজকুমার আবার নৌকো ভাসিয়েছে।

পৃথিবীতে তার কোথাও আশ্রয় ছিল না। ইউলিসিস, আগামেমনন এবং পৌরাণিক বীর বৃদ্ধ প্রায়ামের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শেষ বংশধরটির পেছনে নিয়তির মতো ধাওয়া করেছে। ট্রয়ের বিধ্বংসী আগুনের স্মৃতি নিয়তির মতো তাড়া করেছে। হেক্টরের মৃত্যু, প্রায়ামের হত্যা, কাসান্ড্রার ধর্ষণ, রাজবংশ ও প্রজাদের অমোঘ লাঞ্ছনা, ধ্বংস অভিশপ্ত আর্তনাদ হয়ে নিয়তির মতো অনুসরণ করেছে। আর উত্তাল সমুদ্রে তরণীর ওপর একাকী দণ্ডায়মান ইনিয়াস। তরণীর গর্ভে গুটিকয় সঙ্গী সাথী। পৌরাণিক বীরেরা যে ট্রয়কে ধ্বংস করেছে, হেলেনের রূপের আগুনে যে ট্রয় ছারখার হয়ে গেছে, তার বংশধরকে কেউ আশ্রয় দেয় না। পারলে বন্দী করে। তরণীর তীর জোটে না। আর পিতা গেল, শিশুপুত্র গেল। পেছনে অতীত দুঃস্বপ্ন, সম্মুখে অলৌকিক ও অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ। সমুদ্রের বুকে তরণীর ওপর ইনিয়াস একাকী।

অবশেষে কার্থেজ। সেই আশ্চর্য দেশের বিধবা রাণী দিদো—রূপসী, যৌবনবতী। আর তার অলৌকিক প্রমীলা বাহিনী। একটা স্তন কর্তিত, বীরাঙ্গনা সেই আমাজনদের দল। ইনিয়াস আশ্রয় পেল! দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের পর মৃত্তিকা ও রমণীর মুখ দেখল ট্রয়ের সেই অবশিষ্ট হতভাগ্যের দল। আর দিন যায়। ইনিয়াস দিদোর কালো পাথরে গড়া প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বুকে চোখ রাখে, আকাশের নক্ষত্র দেখে। আর দিন যায়; দিদো, সুন্দরী, যৌবনবতী, আমাজনদের অধিরাণী ইনিয়াসের চোখে দেবতার নির্দেশ পাঠ করে, ক্রমে ক্রমে তাকে ভালোবাসে। আর দিন যায়, খবর আসে পৌরাণিক বীরের দল কার্থেজ ঘিরে ফেলবে। ইনিয়াস কালো পাথরের প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বুকে চোখ রাখে, নক্ষত্রের স্পন্দন দেখে। প্রণয় বা স্থিতি তো তার নয়। সমুদ্র ইনিয়াসকে ডাকে। ট্রয়ের আগুন তাকে ডাকে। তাই আবার প্রায়ামের বংশধর একদিন গোপনে সমুদ্রে নৌকা ভাসায়।

শেষ মুহূর্তে সংবাদ পেয়ে দিদো সমুদ্রতীরে দৌড়ে এসেছিল। দিদো ফিরে যেতে ডেকেছিল। কিন্তু ইনিয়াস দূর থেকে বলেছিল, বিদায়। আর তরঙ্গ তাকে ঠেলে দিচ্ছিল দূরে। তারপর সমুদ্রের বুকে তরণীর ওপর একাকী দণ্ডায়মান ইনিয়াস দেখল কার্থেজ ও আমাজন-বাহিনীর অধিরাণী দিদোর কালো পাথরের বিশাল প্রাসাদে আগুন জ্বলছে। কৃষ্ণ হর্ম আগুনের আভায় দিদোর মতোই শুভ্র, রক্তিম, উজ্জ্বল। আর প্রাসাদ শীর্ষে একটি রমণী আকাশের দিকে দুই বাহু তুলে অকম্পিত দণ্ডায়মান। ইনিয়াস অস্ফুটে বলল, বিদায়। আর ট্রয়ের শেষ বংশধর ইতিহাস গড়তে সমুদ্রে গেল।

নিশানাথ জলের গভীরে কার্থেজের সেই জ্বলন্ত প্রাসাদের দিকে স্তম্ভিত, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। সেই অবাস্তব ছায়ার অলৌকিক শিল্প সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল। জটিল রেখা ও বিচিত্র বর্ণের আশ্চর্য কম্পোজিশন। পৃথিবীর কোনো আর্টিস্ট যা আঁকতে পারে নি, পৃথিবীর কোনো দর্শক যা দেখে দেখে দেখে পুরনো করে দেয় নি।

নিশানাথ রোমাঞ্চিত হলো। বড় দেরিতে জন্মেছি, শত শত শতাব্দীর পর। যে ভাষায় আমি কথা বলি তা ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত। আদি বাক্য উচ্চারণের অনুভবকে স্পষ্ট ভাষায়, ছন্দিত শব্দে রূপান্তরিত করার প্রথম সুযোগ বা অধিকার আমি পাই নি। ফলে কতগুলো গ্রাম্য, অর্ধশিক্ষিত শব্দের যে মানে এবং ভাষার যে ব্যাকরণ বেঁধে দিয়ে গেছে আমাকে তা মানতে

হয়। তাই, বন্ধুগণ, আমি শব্দের চর্চায় উৎসাহী নই। ভাষাশিল্পে আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। এমনকি পারস্পরিক কথাবার্তায় আমার অনীহা। যেমন ধরুন ভালোবাসা ব্যাপারটা। মধ্যযুগে পীরিত শব্দটার চল ছিল, এখন তার অন্য মানে। বর্তমানে প্রেম, প্রণয়, অনুরাগ, ভালোবাসা ইত্যাদির প্রচলন আছে। একটি যুবক একটি যুবতীকে কোন্ ভাষায় প্রেম নিবেদন করবে? আমি তোমায় ভালবাসি? অশ্লীল। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি? অশ্লীল। আমি তোমার প্রণয়াসক্ত? অশ্লীল। এই যে আমরা বলি অমুকের সঙ্গে তমুকে প্রেম করছে, আমরা জানি না একটা সুন্দর ব্যাপারকে (অন্তত থিয়োরিটিক্যালি) আমরা কিভাবে ভাল্গারাইজ করি। সুতরাং ভালোবাসার যা সেন্স বাংলায় তা বোঝাবার মতো কোনো শব্দ নেই। অথচ ভাষার অনুশাসন আমি এড়াব কি করে?

ঠিক এই কারণেই আমার বিশ্বাস ভাষা দিয়ে আদপেই কোনো মহৎ শিল্প হয় না।

তাছাড়া আমি লক্ষ্য করেছি কোনো আর্টফর্মই চিরন্তন নয়। আদি মানুষ প্রথমে ভাষাহীন সুরে গান গেয়েছিল। তারপর কয়েক সহস্র বৎসরে পাশ্চাত্য আজ রক-এন-রোল এবং প্রাচ্য তার দিশি সংস্করণের পর্বে পৌঁছেছে। সুতরাং ভাষাহীন সুর থেকে ভাষা প্রযুক্ত সুর এবং কণ্ঠ ও যন্ত্র নিঃস্বারিত স্বর—একক বা সমবেত—আদিম-ধ্রুপদী-লৌকিক এবং আধুনিক ভঙ্গিমা যে ছাঁদেরই হোক—সুর তার আর্টফর্ম ক্রমাগত বদলেছে এবং তাতে ক্রমে ক্রমে অন্য শিল্পধারার প্রভাব এসে পড়েছে।

চিত্রকলায়ও ঠিক তাই। গুহাগাত্রে প্রথম একটি অলৌকিক জীবের রেখাচিত্র এঁকেছে আদিম কোনো মানুষ। তারপর ম্যাজিক বিশ্বাস থেকে উদ্ভব হলো চিত্রকলার। তারপর কয়েক সহস্র বৎসরে বদলাতে বদলাতে চিত্রকলা আজ বিশেষ দেশের বিশেষ অবস্থায় আধুনিক।

সুতরাং কোনো আর্টফর্মই আদি অর্থে অকৃত্রিম বা অপরিবর্তনীয় নয়। বদলাতে বদলাতে আজ ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্য পরস্পরের গায়ে এসে পড়েছে এবং যতদিন যাবে ততই এরা নিজেদের বহু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বহু বিশিষ্টতা অর্জন করে পরস্পরের আরো নিকটবর্তী হবে। এইভাবে জন্মাবে নতুন আর্টফর্ম, যেমন ফিল্ম এবং ইত্যাদি।

কিন্তু বন্ধুগণ, কে না জানে কোনো স্মৃতিই চিরন্তন নয়। সময় সব মুছে দেয়। আমরা হরপ্পায় বৃষ নিয়ে গদগদ। কিন্তু কে জানছে তারও আগে কি ছিল?

আমরা চর্যাপদ নিয়ে বিমুগ্ধ। কিন্তু কে জানছে বাংলাদেশে শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ার আগে কি মহৎ কাব্য রচিত ও বিনষ্ট হয়েছে। মিশর, গ্রীস, রোম, চীন, ভারতবর্ষ তার মহান সৃষ্টির কতটুকু সংরক্ষণ করতে পেরেছে? তার অত্যাশ্চর্য বিকাশের কতটুকু সাক্ষ্য আজও আছে? এক, সময় সব হরণ করে। দুই, সময় আজ দেয় কাল কেড়ে নেয়। অশেষ সম্মানিত শিল্পী জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর কি অমোঘ বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে। কতশত শতাব্দীতে কতকোটি সম্মানিত ভদ্রজনের এই দুরবস্থা (অহো অহো) বন্ধুগণ, নিশ্চয়ই তা ভোলেন নি। (ইয়্যাও) কালজয়ী বলে কিছু নেই। (ইয়্যাও) যা পাঁচশো বছর টিকেছে, পাঁচহাজার বছর পরে তা থাকছে না। যাদুঘরে ঠাঁই পাবে বড়জোর। (সাধু সাধু) যাদুঘর এক বিচিত্র মর্গ। দাহ বা কবরস্থ হওয়ার পূর্ব অবস্থা। সুতরাং যে মৃতদেহ মর্গে ঠাঁই পেয়েছে, সে কালজয়ী নয়।

অতএব বন্ধুগণ, আমি যেহেতু লক্ষ্য করেছি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো আর্টফর্মই চূড়ান্ত নয় এবং কোনো সৃষ্টিই কালজয়ী হতে পারে না এবং আমি যেহেতু এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এক যুবক যার কাঁধের ওপর কয়েক হাজার বছরের মানবীয় ভাব ভাষা আচরণ ও ঐতিহ্যের বিশাল বোঝা— সেহেতু আমার পক্ষে কোনো নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয়, কারণ আমার আগে পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ ব্যাপারগুলি আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হয়ে গেছে। সে কারণে আমি মানবসভ্যতার একজন দীন চাকর মাত্র।

অথচ আমি চেয়েছিলাম সম্রাট হতে। আর যাবতীয় অনুভব ও আবেগ প্রকাশের পথ বা মাধ্যম খুঁজে না পেয়ে যখন ক্লীব হয়ে যাচ্ছে তখন একদিন আমি ছায়া দেখলাম।

বন্ধুগণ, আজ আমি সভ্যতার শেষ বাণী নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত। হ্যাঁ, কয়েক হাজার বছর পৃথিবীকে মানুষ সভ্যতা দিয়েছে। আর বিংশ শতাব্দী মানুষকে দিল ছায়া।

ছায়া আমার স্বভূমি, আমার নিজের আবিষ্কার। বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন শিলালিপি মুছে যায়, পিরামিড বালি চাপা পড়ে, ব্যাবিলনের প্রাসাদ ইতিকথা হয়, দেয়ালচিত্র বিবর্ণ, বিবর্ণ, বিবর্ণতা পায়। কিন্তু পৃথিবীর এই আদি ও অকৃত্রিম আর্টফর্ম কালস্পর্শ করতে পারে নি, পারে না। এর কোনো পরিবর্তন নেই।

পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ যখন শক্ত হয় নি আর অলৌকিক জন্তুরা যখন অবাস্তব শরীর নিয়ে ইতস্তত ঘোরে, যখন মানুষ জন্মায় নি, তখন প্রথম, প্রথম

একদিন সূর্যের কিরণে একটি ছায়া পড়েছিল ধরিত্রীর বুকে। সেই প্রথম অজ্ঞাতে আর বিনা আয়াসে শিল্প সৃষ্টি হলো। কেউ দেখল না। তারপর সেই একই প্রক্রিয়ায় অযুত-নিযুত বৎসরে পৃথিবীর সর্বত্র যে-কোনো ছায়া কোনো না কোনো শিল্পরূপ রচনা করল। কিন্তু কেউ দেখল না। আদি মানব-মানবী গুহাপৃষ্ঠে আগুনের শিখার ছায়া দেখে নৃত্যের ভঙ্গি শিখল, ধাবন্ত হরিণের ছায়া দেখে রেখাচিত্র শিখল, নদীবক্ষে বৃক্ষপত্রের ছায়া দেখে বৃক্ষ মর্মরের ভাষা শিখল। তারপর সভ্যতা হলো। সভ্যতা গেল। তারপর যুগ, যুগ, যুগ। ইতিহাসের পর্ব-বিভাগ। কিন্তু মিশর, গ্রীস, ভারতবর্ষ চীন—তার আদিপর্ব থেকে আজ পর্যন্ত কত না সৃষ্টির অর্ঘ কালের গর্ভে ঢেলে হারিয়ে গেল আর ছায়া অনন্তকাল মানবচক্ষুর অজ্ঞাতে, মানব সমাজের অবহেলা সত্ত্বেও শিল্পরচনা করে গেল।

মহৎ শিল্পের লক্ষণই তাই। তা হয়, মানে হয়ে যায়। সমাদর অথবা বিরূপতার তোয়াক্কা করে না। তারপর হয়তো শত-সহস্র বৎসর পর একদিন কোনো চোখ তা আবিষ্কার করে। বন্ধুগণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পকে আবিষ্কৃত হতে তাই খৃষ্টজন্মেরও পরে দু হাজার বছর অপেক্ষা করতে হলো। ধন্য বিংশ শতাব্দী। যখন চারদিকে আর্তনাদ উঠেছে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের দানবিক প্রগতিতে শিল্প সৃষ্টি পৃথিবী থেকে মুছে যাবার দিন এসেছে—তখন তুমি পৃথিবীর আদিতম, শুদ্ধতম অথচ নবীনতম শিল্পকে আবিষ্কার করলে।

এই ছায়ার শিল্পে বস্তুত শুদ্ধতার চরম উৎকর্ষ আপনারা লক্ষ্য করবেন। জন্মমুহূর্তেই এ ছিল আধুনিকতম। এ্যাবস্ট্রাক্ট একটা আকৃতি বা কিছু অনুষঙ্গ চোখের সামনে ফেলে দেয়—তুমি তোমার স্মৃতি, বোধ, অনুষঙ্গ দিয়ে তা বুঝে নাও, অনুভব করো। সৌন্দর্য, বাস্তবতা ও নন্দনতত্ত্বের নির্যাসটুকু নিয়ে ছায়া যে শিল্প গড়ল, মনে পড়ে থাকে, তা কত স্বতঃস্ফূর্ত, অনায়াস, আনপ্রিটেনশাস অথচ তাতে কি গভীর জটিলতা ও কি আদিম সারল্য। তোমরা মিউজিককে বলো হায়েস্ট ফর্ম অব আর্ট কারণ তা সব থেকে বেশি বিমূর্ত এবং তার আবেদন নাকি সর্বজনীন। অথচ এই যে ছায়া, আহ্, ছায়া, এর থেকে বেশি ইউনিভার্সাল ও এ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো শিল্প আছে কি? কারণ সুরের তরঙ্গও যে এই ছায়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। আমার তো তাই মনে হয়।

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, আমার এই তত্ত্বকথাগুলি আমি ঠিক মতো বুঝিয়ে বলতে

পারলাম কি? তবে এ আমি সার বুঝেছি। ব্যাখ্যার অক্ষমতায়, আচ্ছা, ঘণ্টা পড়ল, আজকের মতো এইখানেই শেষ করছি।

তারপর নিশানাথ বুঝল আসলে দমকলের ঘণ্টা বাজছে। একটা চকিত কোলাহল। সে যারপরনাই বিরক্ত হলো এবং এতক্ষণে লক্ষ্য করল পায়ের কাছে একটা রোমাল পড়ে আছে। হাত বাড়িয়ে তুলল। রোমালের গায়ে সুঁচ দিয়ে লেখা—আমি তোমায় ভালোবাসি।

অবাক হয়ে সে রোমালটার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন কোনো অজ্ঞাত-লিপি পাঠ করছে। ভালোবাসা? আমি? তোমায়? ওর মনে পড়েছে। একটি প্রেমিকা নির্জনতা খুঁজে তার ভালোবাসার মানুষটিকে, অতঃপর আমি, বোঝো কাণ্ড। নিশানাথ--পুরাণ, মহাকাব্য এবং ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে শিল্পের রাজ্যে এই যে তুমি অধীশ্বর হয়ে বসে আছ—এখানে রোমান্স আর ভালোবাসা কিভাবে ছিটকে এলো। আহ্‌ অশ্লীলতা।

নিশানাথ অত্যন্ত করুণাপরবশ হয়ে রোমালটি ছুঁড়ে বেড়ার বাইরে ফেলে দিল।

তারপর আবার সেই পুকুরটা। এবার তাতে একটা ধাবন্ত ডবলডেকারের ছায়া পড়ল। স্পষ্ট ছায়া। একতলার আধখানা দেখা যায় দ্বিতল সম্পূর্ণ। সারি সারি মাথা, জানলায় মুখ, হাতের কনুই। দ্রুত অথচ দূরাগত কোনো সুরধ্বনির মতো ভাসতে ভাসতে চলে গেল। আর আবার সেই অলৌকিক প্রাসাদ, রুদ্ধ গবাক্ষ, জটিল সিঁড়ি এবং কুঞ্চিত কেশদামে ছাওয়া জলে লাল, হলুদ, নীল বর্ণ জ্বলছে, নিভছে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের পৌরাণিক কণ্ঠ শুনতে পেল। এলসিনোরের প্রাকারে একাকী দণ্ডায়মান ডেনমার্কের যুবরাজের বিষণ্ণ অথচ উদ্ধত কণ্ঠ শুনতে পেল। গাছের অতিকায় ছায়া, পাতার গায়ে গায়ে আকাশ আর নক্ষত্র—দিঘির একধারে বিষণ্ণ, ক্লান্ত অথচ হিংস্র কয়েকটা গুহাচিত্রের মতো দিঘির একধারে পড়ে আছে। জল সেখানে স্থির। জীবন সেখানে স্থির। সময় সেখানে স্থির। নিশানাথ দেখল পুকুরে একদিকে ধাবমান ইতিহাস, অন্যদিকে স্তব্ধ সময়। পৃথিবীর দর্পণের সামনে বসে আছি আমি ইতিহাসের বিধাতা।

নিশানাথ সেই প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হা-হা করে হাসতে লাগল। আনন্দে নয়, বিষাদেও নয়, বস্তুত স্পষ্ট কোনো লৌকিক অনুভব তখন তার ছিল না। তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। এবং

কাঠের বেড়া টপকে শিথিল পায়ে মাঠের প্রায়ান্ধকার পথটুকু অতিক্রম করে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

আর সে অনুভব করল ক্লান্তি, ক্লান্তি। আলোয় উদ্ভাসিত চৌরঙ্গীর পথে এসে দাঁড়াতেই আবার কেমন যেন একটা ভয়ে তার গা ছমছম করছে। ঐ লোকটা বাস থেকে আমার দিকেই তাকাল কেন? অথচ, আহ্, অথচ এতক্ষণ কি নির্ভয় নিশ্চিন্ততায় সময় কেটেছে। নিশানাথ থুথু ফেলল।

অতঃপর?

বাড়ি।

অতঃপর?

জানি না।

কেন?

জানি না।

কেন?

জানি না।

কেন?

জানি না।

বাড়িতেই যাবে?

হ্যাঁ।

কেন?

জানি, কিন্তু বলব না।

নিজের ভাঁড়ামিতে নিজেই অতীব পুলকিত হয়ে নিশানাথ তারপর লাফিয়ে উঠল।

পাঁচ

ভিড় ছিল। নিশানাথ কোনোরকমে সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল। দোতলার মুখটাতেও জিলিপির মতো এক জটলা। খুব অন্তরঙ্গ সুরে লোকগুলো একটা হিন্দি ফিল্মের আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের সাম্প্রতিক ভারতভ্রমণ ও কি-এক নটীর সঙ্গে তাঁর রোমাঞ্চকর প্রণয় কাহিনী বিষয়ে নানা রসসিক্ত মন্তব্য করছিল। বম্বে শহরটা যে উচ্ছন্নে গেছে এবং বড় বড় হোটেল যে যাবতীয় আন্তর্জাতিক নোংরামির একটা ঘাঁটি—এ সম্পর্কে কারোর সংশয়

ছিল না। তাদের প্রত্যেকের বাচনভঙ্গীতে প্রত্যক্ষদর্শীর অমোঘ নিশ্চিতি ও ত্রিকালজ্ঞের নিশ্চয়তা সর্বদাই জাগরূক ছিল।

এমন সময় তাদের মধ্যে একজন ছিটকে সামনে এগিয়ে গেল। নিশানাথ গলা বাড়িয়ে লক্ষ্য করল এক ভদ্রলোক সীট ছেড়ে উঠেছেন আর লোকটা তাঁর ত্যক্ত জায়গা দখল করার জন্য—প্রায় তাঁকে মাড়িয়ে দিয়েই সেখানে বসে পড়েছে।

দিলেন তো মাড়িয়ে? ভদ্রলোক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, সেই তো আগে-পরে নামতেই হবে—বসার জন্য—

লোকটা উত্তর দিল, আমিও নামবার সময় লোককে এই সব বলেই নামব।

সকলে হেসে উঠল। ভদ্রলোক গজগজ করতে করতে নিচে নামছেন, নিশানাথের ইচ্ছে হল তাঁকে একটা চড় মারে। ভদ্রলোক একটা ঝগড়া করতে পারতেন, দুঘা দিতে—মানে, কাওয়ার্ড। লোকটা অন্যায় করেও, আর তুমি মুখ বুজে—বাঙালী কোথাকার।

নিশানাথ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, দিলেন তো মাড়িয়ে?

ভদ্রলোক নামতে নামতে দাঁড়িয়ে বললেন, কই, আমি তো—

নিশানাথ বলল, সেই তো বাড়িতেই যাবেন, তবে এত তাড়াহুড়ো করে লোককে মাড়িয়ে--

ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, আহ্, ঘরে বউ আছে না?

আবার সকলে হেসে উঠল। একতলার দরজার মুখে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাও হেসে উঠে সেই নিরীহ ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তাকাল।

অকারণে, সম্পূর্ণ অকারণে ভদ্রলোকটি সকলের কৌতুকের পাত্র হয়ে অস্ফুটে বললেন, আপনার পায়ে তো—

অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় যারা হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছিল তাদের মধ্যে কেউ বলে উঠল, দাদু বুঝি এ লাইনে নতুন? মানে বিয়ের লাইনে?

মোটেই না, আমরা তিন পুরুষে প্রস্। বারে, গঙ্গার ধারে—। মোটেই না। বারে। মোটেই না। গঙ্গার ধারে! মোটেই না। আবার ট্যাক্সিতে চাপার সখ!

উঃ। নিশানাথ অস্ফুটে আর্তনাদ করল। ওপর থেকে জনা তিন-চার লোক একসঙ্গে নামছে। একজন তার পা সত্যি সত্যি মাড়িয়ে দিয়েছে।

নিশানাথ কিছু বলার আগেই লোকটা বিরক্ত কণ্ঠে বলল, ধ্যার মশাই, দাঁড়াবার আর জায়গা পেলেন না? যতোসব।

সেই বিপজ্জনক জায়গা থেকে ঝুলতে ঝুলতে কেউ একজন বলল, দাদু বুঝি এ লাইনে পুরনো, মানে বাসের লাইনে? সিঁড়ি যে কিছুতেই ছাড়তে চান না?

নিশানাথ চোরের মতো ওপরে উঠে গেল। এরা এখুনি আমায় নিয়ে পড়তে পারে, এমনিভাবে হেসে উঠে হেসে উঠে হেসে উঠে, এবং, এমনিভাবে, অবশ্য প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, আমিও ঐ লোকটাকে শুধু শুধু, আসলে আমি তো জানি কি অকারণে আর উপলক্ষ তৈরি করে মানুষ অন্যকে অপমান করে, তার প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত-অপমানিত অস্তিত্বকে সে এইভাবে খানিক হাল্কা করার সুযোগ খোঁজে। অপমানিত হওয়া আর অপমান করা—এই তো আধুনিক জীবন।

মরুকগে। একটু মদ খেলে হতো। কতকাল যে—ভাবনার মধ্যেই নিশানাথ বিস্মিত, আনন্দিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। কারণ একটু আগেই সে বেশ্যাটার (সরি, বারবণিতার, উঁহু, বারবধূটির) কথা ভেবেছে যার সঙ্গে আজই সন্ধেবেলা (আঃ, রাস্তার কি কুৎসিৎ গন্ধ) একটা পাঠশালায়—অথচ ভাখো, কোনো স্মৃতি নেই। যেন স্বপ্নে দেখা কিংবা বইয়ে পড়া কোনো একটি মেয়ের কথা সে ভাবছে। যেন কত, কতদিন আগে শেষ মদ্যপান করেছে। এবং এই বিস্ময়েই তার আনন্দ। বিস্মৃতিতে তার আনন্দ। একদা চেষ্টা করে ভুলতে হতো, ভান করে ভুলতে হতো। আজকাল যখন সত্যিই ভুলে যায়, তখন নিশানাথ পুলক বোধ না করে পারে না। আমি তো বিস্মৃতিই চাই। স্বতঃস্ফূর্ত অনায়াস ও আন্তরিক বিস্মৃতি। এই বর্তমানটাকে ভুলে যাওয়া। কিন্তু হঠাৎ মদের তৃষ্ণা কেন? অজ্ঞাতে আমার মধ্যে কি মদ ব্যাপারটা চারিয়ে যাচ্ছে? আসক্তি মাত্রেই নিশানাথের ভয়। সাবধান নিশানাথ, বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, আমি হয়তো ঠিকমতো, কিন্তু, আসলে, অপমানিত হতে হবে, সমস্ত অপমান মাথা পেতে নেব, আর এইভাবে সভ্যতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। অপমানে আমার ভয়। তাই প্রতি মুহূর্তে অপমানিত হয়ে আমি এইভাবে নিজের ভয় ভাঙাব। কারণ আমার মতো এক অলীক অস্তিত্বের কোনো ভয়ই সাজে না।

অবশ্য এই ভয়কে আপনারা মহৎ ভীতিও বলতে পারতেন। আসলে

এ হলো নিজের জন্য ভয়, নিজেকে ভয়। মানুষের সভ্যতার জন্মলগ্নে ছিল এই ভয়—নিজের জন্য, নিজেকে। প্রতি মুহূর্তের বিচারে নিজেকে যাচাই করা, প্রতিটি আচরণে আর ভাবনায় আর প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে যাচাই করা। এবং পরিপার্শ্বের হাতে চড় খেতে খেতে—

নিশানাথ ভয়ে কুঁকড়ে উঠল। হঠাৎ থাপ্পড় মারতে উদ্যত হাতের বাতাস লাগালে শরীরের তাবৎ স্নায়ু যেভাবে কুঁকড়ে যায়। তারপর বুঝল, কণ্ডাক্টর পিঠে হাত রেখে টিকিট চেয়েছে।

নিশানাথের এই এক আশ্চর্য অবসেশান আছে। মাঝে মাঝে সে এই ভাবে চমকে ওঠে আর তার মনে হয় সকলের সামনে পরিচিত-অপরিচিত যে কোনো পরিবেশে কে যেন তাকে হঠাৎ একটা চড় মারবে। আর নিশানাথ যখন তারপরও মাথা হঁট করে থাকবে তখন চারপাশের সবকটা চোখ একসঙ্গে হেসে উঠবে।

টিকিট ?

নিশানাথ পকেট থেকে পয়সা বের করে দিল।

আমি যেন কি ভাবছিলাম ? কি যেন—সভ্যতা, মরুকগে। বিরক্তভাবে নিশানাথ পকেট থেকে রোমাল বের করে চশমার কাঁচ মুছল।

যদি এই জানলাটার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকি, তবে অবশ্য হাওয়া পাব আর হাতটা আরামে এলিয়ে রাখতে পারব। বস্তুত, দাঁড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে এই জায়গাটাই সব থেকে প্রশস্ত। কিন্তু এরপর যদি একটা দুটো সীট খালি হয় তাহলে এপাশে যারা দাঁড়িয়েছে, তারাই বসবে। তাদের জায়গায় সিঁড়ির লোকগুলো উঠে এসে দাঁড়াবে এবং নতুন সীট খালি হলে সেখানে তারা বসবে। সুতরাং আমি যদি সরে ওখানে দাঁড়াই আর কিছুক্ষণ কষ্ট করি—তাহলে পরে বাকি পথটা বসে যেতে পারব। অবশ্য সবটাই চান্স। যদি ইতিমধ্যে কেউ না নামে ?

নিশানাথ চোখ তুলে যাত্রীদের মুখের দিকে বই পড়ার মতো করে তাকাল। আর হঠাৎ আবার সেই দৃশ্য দেখল। একটি লোক বসেছিল, কণ্ডাক্টর তার কাছে টিকিট চাইল, লোকটা চোখ তুলে ঠোঁটটা একটু নাড়ল। কণ্ডাক্টর পাশের লোকটির সামনে হাত পাতল।

বন্ধুগণ, বাসে দু-ধরনের লোক টিকিট না করার অধিকারী। এক, যারা স্টেট ট্রান্সপোর্টে চাকরী করে। তাদের পোষাক দেখলে আপনি চিনবেন। সাদা পোষাকে থাকলেও তারা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে, স্টাফ।

অনেক সময় তাতেও বিশ্বাস না করে কণ্ডাক্টররা কার্ড দেখতে চায়। আর, দুই—যারা পুলিশের লোক। এরা টিকিট চাইলে এমনিভাবে ঠোঁট নাড়ে, যেন গোপনে কিছু বলছে। অথচ কিছুই উচ্চারণ করে না। এদের ভঙ্গিতেই কণ্ডাক্টররা বুঝে ফেলে।

আপনি জানেন না কলকাতা শহরে পুলিশ তার জাল কিভাবে ছড়িয়েছে, ছড়াচ্ছে। আপনি জানেন না সমস্ত পৃথিবীতে কিভাবে এই সূক্ষ্ম আর অদৃশ্য আর নিয়তির মতো নিষ্ঠুর জাল ছড়ানো আছে। আপনি জানেন না, প্রতি মুহূর্তে কেউ না কেউ আপনাকে লক্ষ্য করছে আর খাতায় তা লেখা হয়ে যাচ্ছে। তারপর একদিন আপনার ডাক পড়ল আর সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মানুষের মুখে আপনি নিজের তাবৎ জীবন প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বন্ধুগণ, যে দেশ যত সভ্য—তার এই জাল তত সূক্ষ্ম আর বিস্তৃত আর জটিল। মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানই হল বিচার ব্যবস্থা—যার ভিত্তি অসংখ্য আইন এবং অবলম্বন হল অসামান্য প্রহরা।

আর ভাখো, ট্রামে-বাসে আমি এমন দিন দেখি না, যেদিন অন্তত একবার এই ধরনের পুলিশের লোক চোখে না পড়েছে। আমি ভীষণভাবে চেহারা-গুলো মনে রাখতে চাই। কিন্তু এদের চেহারার বৈশিষ্ট্যই হলো বিশিষ্টতা-বিহীন হওয়া। ফলত কাউকে মনে থাকে না। হয়তো তারই সঙ্গে রেস্তোরায়—নিশানাথের উরু দুটো জ্বালা করে উঠল এবং বস্তুত বুকটা থরথর কাঁপতে লাগল।

অবশ্য এখন তো আমি একা। অবশ্য আমি তো আমার অতীতকে অস্বীকার করি। অবশ্য আমি তো এখন বর্তমান ভুলে যাই। অবশ্য আমি তো কতকাল, আহ্, কতকাল সেই নিশানাথ নই—তার ছায়া—

ছায়া সম্পর্কে আমার—। কিন্তু না, ভালো লাগছে না। টু কনটিনিউ, সুতরাং, আমার ভয়ের কি কারণ আছে। সারা দুপুর ঘুমিয়েছি। তারপর সন্ধেবেলা বেরিয়ে প্রথমে দাড়ি কামালাম। তারপর চা খেলাম। না না, সারা দুপুর ঘুমিয়ে, তারপর সন্ধেবেলাকে প্রভাত বলে ভুল করলাম, তারপর চা খেলাম। তারপর দাড়ি কামালাম, তারপর বাসে করে মদ খেতে গেলাম (মানে সেই মেয়েটা আমায় টেনে নিয়ে গেল), তারপর পুকুরের ধারে বসে—ও হ্যাঁ, একটি প্রেমিক প্রেমিকাকে অপমান করলাম (কারণ একদা আমিও ঠিক এইভাবে অপমানিত হয়েছিলাম, সেই পৌরাণিক যুগে, যখন সুনয়নী, মানে একদিন যখন প্রেমিক ছিলাম), অবশ্য সেই বালক-বালিকা জানল না

আমি পরোক্ষভাবে তাদের কি উপকার করেছি, নইলে ঐখানে বসে গল্প করার দরুন তাদের কপালে আরও কি দুর্ভোগ জুটতে পারত। বস্তুত স্বীকার করতে লজ্জা নেই—আমি ইচ্ছে করেই ওদের ওখান থেকে তুলেছিলাম, অবশ্য তুমি বলতে পারো ঈর্ষায় বা হতাশায় বা ব্যর্থতার গ্লানিতে। (কিন্তু তুমি তো জানো সুনয়নী, তুমি জানো না আমি, হ্যাঁ, আচ্ছা, ও না না,—বিশ্বাস করো, হায়, এ্যাঁ, হুঁ, এ্যাঁ, হুঁ, এ্যাঁ, আচ্ছা।) কিন্তু পুকুরের ধারে ছায়া দেখতে দেখতে—সর্বনাশ, ইনিয়াস প্রায়ামের ছেলে নয় ভাইপো, আমি তখন কি ভাবছিলাম? কিন্তু এমনও তো হতে পারে আই-বির লোকটা সারাদিন কাজ করে এখন বাড়ি ফিরছে। এখন ও কাউকে ওয়াচ করছে না। কি ভাবে লোকটা? (সরি ভদ্রলোকটি?) কি এঁরা ভাবতে পারেন? কেমন হয় এঁদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন?

এমন সময় কাছের একটা সীট থেকে জনৈক ভদ্রলোক উঠবার উপক্রম করতেই নিশানাথ যাবতীয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলে অত্যন্ত সতর্ক ও হিসেবী বাঙালীবাবুটির মতো সামনে দাঁড়ানো জনাদুই লোককে পাশ কাটিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি আসলে নামবেন না, তিনি একটু উঁচু হয়ে পাশ পকেট থেকে একটা নস্যির ডিবে বার করে সশব্দে এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজলেন। বারবার অত্যন্ত পরিষ্কার একটা রোমাল দিয়ে নাক আর আঙুলের ডগা মুছে আবার সীটের পিঠে এলিয়ে পড়লেন।

নিশানাথ প্রথমে অপ্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণে ভদ্রলোকের রোমালখানা দেখে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল। নস্যিখোরদের রোমাল সর্বদাই নোংরা হয়। ফ্রান্সের অভিজাত মহিলারা কি ভাবে নস্যি নিতেন, নিশানাথ তা কিছুতেই ঠাওর করে উঠতে পারে নি। বস্তুত ব্যাপারটা একসময় তার কাছে প্রব্লেম ছিল। মোগল রমণীর ফর্শি টানার মধ্যে যে অসামান্য আভিজাত্য আর মহিমা আছে, তার সঙ্গে শব্দ করে নস্যি টানা আর নাক মোছার তুলনা কোথায়? কিন্তু এই ছাপোষা বাঙালীবাবু যদি নিয়মিত নস্যি নিয়েও এমন পরিচ্ছন্ন রোমাল ব্যবহার করতে পারেন, আচ্ছা, তাহলে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের রোমাল লাগে প্রচুর, সি. আর. দাসের রোমাল প্যারিস থেকে কেচে আসত, আমি জীবনে রোমাল ব্যবহারে অভ্যস্ত হলুম না—কোথায় যে হারিয়ে যায়; 'আমি তোমায় ভালোবাসি'—অহো, অহো, প্রণয়জ্ঞাপনের কি গ্রাম্য পন্থা, মেয়েটি যখন বিয়ে করবে আর গর্ভিনী হবে

তখন চটের ওপর পাড়ের সুতো আর ছুঁচ নিয়ে লিখবে 'পতি পরম গুরু' এবং ভাববে (আবছা ছবির মতো, প্রায় বিস্মৃত স্বপ্ন যেন) একদা প্রেমিককে যে রোমালটি লিখে দিয়েছিল তার কথা, সেই রাতের কথা, যখন একজন লম্পট হঠাৎ এসে—; কিন্তু ছ্যাখো, বন্ধুগণ, ও—আপনি বলতে চান আধুনিক মেয়েরা সূচীশিল্প জানে না বা এ জাতীয় আপ্তবাক্য ঘরের দেওয়ালে টাঙাতে তাদের, বেশ তো, আমি তাতে আপত্তি করতে যাব কেন? মাপ করবেন স্যার, সাম্প্রতিক রমণীদের সম্পর্কে নিন্দা বা প্রশংসায় মুখর হতে আমি অনীহা (ওহ্ শব্দটা একবার ব্যবহার করেছি—বেশ, তাহলে বলি), মুখর হতে আমি বিবমিষা বোধ করি। বিবমিষার সঙ্গে নিশার একটা ধ্বনিসাদৃশ্য আছে লক্ষ্য করেছেন? আসলে রাত্রি মানেই তো বমন ..জাগরণে বা নিদ্রায় বমি করতে করতে করতে করতে—আরে, এই ভদ্রলোক উঠেছেন।

অতঃপর নিশানাথ সেইখানে বসল। ভদ্রলোক জানলার ধার থেকে উঠেছেন, নিশানাথ কাৎ হয়ে সেইখানে ঢুকতে যাবে এমন সময় সীটের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গম্ভীরভাবে সরে সেই জায়গাটা দখল করলেন এবং নিশানাথ হতবাক হয়ে লক্ষ্য করল একটু আগে পুলিশের এই লোকটিকেই সে দেখছিল।

তখন তার গা ছমছম করতে লাগল। লোকটা সরে বসে এমন ভুরু কুঁচকে কেন দেখছে আমাকে? লোকটা কি চেনে? নাকি আমি জানলার ধারটা বেদখল করতে চাওয়ার কারণে বিরক্ত হয়েছে? নিশানাথ স্পষ্টত তার দিকে তাকাতে পারছে না। আসলে সে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ভদ্রতার প্রশ্নও একটা ছিল।

সে পাশের লোকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আর দেখল কাঁচে ডান দিকের গোটা বাসে ছায়া পড়েছে। মনে হচ্ছে ওপারেও একটা এমনই দোতলা। জানলাটা আসলে পার্টিশান মাত্র।

আর সেই ছায়ায় দেখা গেল কতগুলো সীটের পিঠ ও মানুষের মাথা। বাসের ছাদের ভাঁজে লাগানো বাতি কটা নিষ্প্রভ। কেন জানি তার মনে হলো সে এক বিচার কক্ষ দেখছে। বিচারকের উঁচু পাটাতনটি নেই, কাঠ-গরাদ নেই, জুরিদের টেবিল নেই। বিচার কথাটি চলছে। তাদেরই সঙ্গে চলছে।

যাত্রীদের নানা ধাঁচের আলাপ, পথে বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর হর্ণের বা দ্রুত চলে যাওয়ার বা হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দ, জানলা দিয়ে বাঁ দিকের পথের আলো

বাড়ি সাইনবোর্ড, দেওয়ালে পোস্টার মানুষ আর আমি আর আপনি পাশা-পাশি বসে যাচ্ছি। আপনি জানেন না আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি, নিষ্ঠুরের মতো আপনাকে লক্ষ্য করছি। আপনি চোখ তুলে কখনোই জানলার কাঁচে তাকাবেন না। আপনি জানবেন না আপনার বাঁ দিকে একটি জলপূর্ণ বিচার কক্ষ, ডান দিকে নিয়তি। আপনি কি এখন গৃহে প্রত্যাগমন করছেন? সারাদিন কজনকে ফাঁসালেন স্যার? এখন ক্লান্ত ও নিশ্চিন্ত মনে, ভালো কথা আপনার স্ত্রী সুক্তো রাঁধতে ভুল করলে তাঁর নামেও রিপোর্ট পাঠান কি? প্রিয়গোপাল আত্মহত্যা করার পর যখন আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তখন যে খাতাটিতে আমার বিষয়ে যাবতীয় খবর লিপিবদ্ধ ছিল—তার কতটুকু আপনার সংগ্রহ বলবেন? হা হা হা, নিশানাথ জানলার কাঁচের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। কখন তার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণ্যে নিয়ত যে-হীনমন্যতা বোধ করে কখন তা কাটিয়ে উঠে হারানো প্রত্যয় ফিরে পেয়েছে। নিশানাথ অতীব, অতীব পুলকিত বোধ করছে। হা হা হা, আপনি ধরা পড়ে গেছেন। এক অনড় বিচারকক্ষে প্রতিদিন শত শত লোককে অভিযুক্ত করছেন আর এই দেখুন সচল বিচারা-লয়টি আপনারই পাশে পাশে ছুটছে। হঠাৎ ঘণ্টা পড়বে, হঠাৎ শুনবেন আপনার দণ্ড ঘোষিত হয়ে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করবেন—আপনি হাঁটু গেড়ে বসেছেন। আচ্ছা, বিদায় আমি এখন চলি। আমার গন্তব্য এসে গেছে।

তারপর নিশানাথ হুড়মুড় করে নিচে নামতে নামতে বাস স্টপেজ ছেড়ে দিল। এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী উঠে এক তলায় ঢুকছেন। কণ্ডাক্টর জোরে জোরে বেল বাজিয়ে বাসের দেয়ালে দ্রুত কটা চাঁটি মেরে ড্রাইভারকে বোঝাচ্ছে, জোরে চল। নিশানাথ রানিং বাস থেকেই লাফিয়ে নেমে পড়ল।

মাটিতে পা দিয়েই তার বাড়ির কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য এই যে, বাসে সে উঠেছিল বাড়ি ফিরবে বলে। কিন্তু তখন বা সমস্তটা পথ ক্ষণতরে নিশানাথ তাদের বাড়িটা বা মা-বা কারোর কথা ভাবে নি। অথচ পানের দোকান আর গলির মুখখানা চোখে পড়তেই তাবৎ খুঁটিনাটিসহ বাড়ির ব্যাপারটা তার চোখের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল।

আর মনে পড়ল সে মদ খেয়েছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অন্য-মনস্কতার ভান করে ডান দিকে তেরছাভাবে মুখ ঘুরিয়ে পান চাইল।

দোকানীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চাইল না, কারণ জানত কথার সঙ্গে মদের গন্ধ পলকে লোকটার শিক্ষিত নাসাকে সচেতন করবে।

অতঃপর পানের খিলিটা মুখে পুরে হাত পাতল, দোকানী কিছু জর্দা আর কুচো সুপুরি তার প্রসারিত করতলে রাখল এবং মুখে বলল, কিছুটা বা লজ্জিত হয়ে বলল. 'দু টাকা হল বাবু'। 'ও'। নিশানাথ উদাসভাবে উত্তর দিয়ে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে চমকে হাত বার করে নিল।

পানঅলা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি বাবু? মাকড় ঢুকেছে?' নিশানাথ কোনোক্রমে বলল, 'চারমিনার দাও তো এক প্যাকেট। একটা ম্যাচিসও'—তারপর থতমত খেয়ে থেমে গেল। নিশানাথ জীবনে এই প্রথম দেশলাইয়ের বদলে ম্যাচিস শব্দটি উচ্চারণ করল আর হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেল মাথার ওপর উত্থিত অলীক দুটো হাতে প্রাণপণে ঝুমঝুমি বাজানো হচ্ছে। নিশানাথ দেশলাইটা সন্তর্পণে নিয়ে তাড়া খাওয়া আর শেকলে বাঁধা একটা জন্তুর মতো গলিতে ঢুকল।

আর সেই অলৌকিক ভয় ও উত্তেজনাটা ক্রমশই তাকে পেয়ে বসছে। পথের দিকে তাকাল—না, খইয়ের ছিটে নেই। এ পথে তাহলে কোনো মৃতদেহ যায় নি। মিষ্টির দোকানটায় যথারীতি পরের দিনের জন্য নানা জাতীয় খাবার তৈরি হচ্ছে। সেই ভুঁড়িয়ালা লোকটা নিশানাথকে দেখেই রোজকার মতো একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। নিশানাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে বুঝে নিতে চাইল—বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে নিশ্চয়ই রোজকার চোখে আমাকে দেখতে পারত না। নিশ্চয়ই এর চোখে অন্য ভাষা ফুটত। সেই রোয়াকে এ-বাড়ি সে-বাড়ির চাকরগুলো গল্প জুড়েছে। এরাও একবার নিশানাথের দিকে তাকিয়ে নিজেদের গল্পে জমে গেল। যত বাড়ির কাছে যাচ্ছে···ততই নিশানাথের উত্তেজনা প্রবল হচ্ছে। সেই আলো-অন্ধকারে মাখানো অর্ধ জাগরিত পথটা বলছে···না, না। আর সেই অমোঘ সম্ভাবনার কথা ভেবে তার তাবৎ স্নায়ু ও অনুভব পর্বত চূড়ার মতো তীক্ষ্ণ, একাগ্র হয়ে উঠেছে। ফলে তার জানু দুটো জ্বালা করছে, নিঃশ্বাস অনিয়মিত, রক্ত চলাচল দ্রুত ও হাত মুষ্টিবদ্ধ। তার দুটি কান উৎকর্ণ, ক্ষীণ ক্রন্দন ধ্বনি দূর থেকে কি শোনা যায়?

এই ভাবে প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থের মতো (যদিও বাইরে তার চলনে বা চাহনিতে তার আভাষমাত্র ছিল না) নিশানাথ বাড়ির সামনে এসে

দাঁড়াল এবং দরজা ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ শুনে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেই বুঝল যাকে সে কান্না ভেবেছিল আসলে তা এক দমক হাসি।

নিশানাথ বাড়ির অন্ধকার দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমত বুঝল— কোনো ঘটনা ঘটে নি। দ্বিতীয়ত, দাদা ইত্যাদি জেগে এবং তৃতীয়ত, কিছু একটা আমোদের ব্যাপার হয়েছে।

বস্তুত নিশানাথ অনেকদিন হঠাৎ হাসি, হঠাৎ চেয়ার ঠেলার কর্কশ শব্দ, হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে প্রথম পলকে কান্না ভেবে প্রচণ্ড স্নায়ুবিক আঘাত পাবার পর তার স্বরূপ বুঝেছে। আর, সারাটা দিন-মান যখন বাড়িতে থাকে বা বাইরে—একবারও বাড়ির কথা মনে পড়ে কি পড়ে না। কিন্তু রাত্রিবেলা গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালেই তার তাবৎ স্নায়ু ও অনুভূতি তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কুকুর যেমন বাতাসে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আসে তেমনই নিশানাথ তার চোখ কান ইন্দ্রিয় দিয়ে একটা অমোঘ মৃত্যুর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বাড়ি ঢোকে।

কারণ সে জানে যে-মানুষ শত বৎসর পরমায়ু পেয়েছে, তার মৃত্যুক্ষণটিও একটি মুহূর্ত মাত্র। মানুষ মরবেই এবং যে কোনো সময়ে তার বিনাশ ঘটতে পারে। সুতরাং কতগুলো অনিবার্য মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এই আমাদের দুঃখ সুখ, গ্লানি রোমাঞ্চ ইত্যাদি। এমনও হতে পারে এই যে আমি এখানে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে হাসির তরঙ্গে এখনকার মতো নিশ্চিন্ত হলাম—এও এক মিথ্যা। হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে, ঠিক এই এখন, বাবা তার ঘরে কিংবা মন্টু তার বিছানায়—এই যাঃ, আজও ভুলে গেছি।

নিশানাথ দ্রুত তার ঘরের দিকে পা চালাল। এই যে ছোট্ট পথটুকু হেঁটে আসতে আসতে আমি সহস্র মৃত্যুর অভিজ্ঞতা পার হয়ে এলুম, এই যে বাকি রাতটুকু নানান ধরনের শব্দ শুনে আমি চম্‌কে চম্‌কে উঠব এবং তার স্বরূপ আবিষ্কার না করা পর্যন্ত কয়েকটি সেকেণ্ড সেই শব্দের ধাক্কা আমাকে আরো কয়েকটা মৃত্যুর স্মৃতি বা ভবিষ্যৎ বিনাশের অনিবার্য সম্ভাবনার পাঁকে চুবিয়ে দেবে—এ কেন? আমি কি মরতে ভয় পাই? না বোধহয়। আমি কি জীবন ভালোবাসি? উহুঁ, বাসি না। আমি কি পৃথিবীর ভবিষ্যতে বিশ্বাসী? কদাচ নই।

তাহলে এ আমার কাপুরুষতা। যে জানে জন্ম মুহূর্তে জীবন-মৃত্যুর ক্রীড়নক হলো, যে জানে জীবন কতগুলি দুর্ঘটনার সমাহার মাত্র, যে জানে

সভ্যতা ভূমিষ্ঠ হয়েছে মানুষের অপরিমেয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাপে আর তার প্রায়শ্চিত্ত হবে অনিবার্য আত্মহননে ; ইতিহাস যার কাছে উচ্চাঙ্গের পরিহাস, মানবিক মূল্যবোধ যার চোখে অপরিচিত ভাষার স্বরলিপি, সভ্যতা যার আত্মাকে গ্লানি গ্লানি গ্লানিতে চুবিয়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করছে। যার প্রেম নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই, বিশ্বাসহীনতার স্পর্ধা নেই ; এই বর্তমানটা যার কাছে অজ্ঞাত স্বপ্ন এবং যে বেঁচে আছে এক অলৌকিক ছায়ার জগতে একা, একেবারে একা—সে প্রতিদিন বাড়িতে ঢোকার সময় রুদ্ধনিশ্বাসে পিতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে ; যে পিতায় তার ঘৃণা, যে ভাইপোটাকে সে নিয়ত প্রতারণা করছে, হায় ! জীবনে যার স্বাদ নেই, মৃত্যুকে তার কত ভয়।

নিশানাথ নিজেকে অবজ্ঞা করল, অপমান করল, আজই সন্ধেবেলা সে রক্তে আসঙ্গলিপ্সা বোধ করে যারপরনাই বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছিল। এখন নিজের এই মৃত্যুভীতিকে তার থেকেও বেশি অশ্লীল মনে হলো। এই যে অনির্দিষ্ট উৎকণ্ঠা, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয় ঘটে যাবে—তার জন্য জাগরণে নিদ্রায় সর্বদা উত্তেজিত থাকা—এতদিন সে একে সভ্যতারই এক ব্যধি বলে ঠাউরেছে। কিন্তু আজ প্রথম মনে হলো—বাড়ির এত লোকের মধ্যে বাবা এবং মন্টুর মৃত্যুর আশঙ্কাই সে করে কেন? বাবার প্রতি তার যাবতীয় ঘৃণা কি করুণায় রূপান্তরিত হচ্ছে, যেদিন থেকে মা—ও, হ্যাঁ, তার মা আছে বটে! আর মন্টু শিশু, মন্টু প্রায় প্রকৃতির মতোই নিষ্পাপ এবং অসহায়—মন্টুর বাঁচা উচিত বলেই মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নেবে—এ কারণেই কি মন্টু সম্পর্কে তার উৎকণ্ঠা নয়? এর পেছনে মন্টুর জন্য একটা সূক্ষ্ম প্রীতি বা আকর্ষণ ক্রিয়া করে নি? কি আশ্চর্য, আমি কি মন্টুকে —আর দেখেছো, সেই ছেলেটা—যে বলেছিল ঠিকানা লিখে দিতে—তাকে যে আমার পছন্দ হতো, তার পেছনেও কি অবচেতনায় মন্টুর প্রভাব ক্রিয়া করে নি? যে স্নেহ আমি মন্টুকে জানাতে লজ্জা পাই—তা-ই কি কিছুটা স্থূলভাবে আমি এতদিন চায়ের দোকানের ছেলেটাকে বিতরণ করে অজ্ঞাতে নিজের কাছে হাল্কা হই নি? ধন্য নিশানাথ, তুমি শিশুদের ভালোবাসো? অহো, অহো, এ একটা সন্দেশ বটে।

খুট করে আলো জ্বালল। প্রায় একই সঙ্গে রান্নাঘরে আবার একটা হাসির শব্দ উঠে মাঝপথে থেমে গেল। বারান্দায় নিশানাথের ঘরের আলো পড়ায় এরা বুঝেছে সে ফিরেছে। আমাকে সকলে ভয় করে, সমীহ করে,

ঘৃণা করে। নিশানাথ হঠাৎ হাসি থেমে যাওয়াটা অত্যন্ত উপভোগ করল। দাদা, বৌদি, মা ইত্যাদির গলা পাওয়া যাচ্ছে। খেতে খেতে গল্প হচ্ছে। সিনেমার গল্প হচ্ছে। সিনেমার গল্প। বৌদিই বেশি প্রগল্‌ভা। মাও কি গিয়েছিল? মন্টু? মার প্রেমিকপ্রবরটি?

তার ইচ্ছে হলো ওদের সঙ্গে খেতে বসে যায়। দাদার আত্মতৃপ্ত মুখটা, বৌদির চিবুকের ভৌল ও ভুরুর পাশের আঁচিল সে স্পষ্ট দেখতে পেল। মার মুখটা কিছুতেই মনে এলো না। কিন্তু কি নিয়ে গল্প করব? কিভাবে আমি এ-রকম হেসে উঠব? আমার উপস্থিতি ওদের সহজ হালকা পরিবেশটুকু মাটি করে দেবে। আমি কতকাল হাসি না! আমি কি হাসতে ভুলে গেলাম? পরীক্ষা করে দেখব? কিন্তু একা একা এভাবে, কিন্তু একা একা একা একা একা একা, ও মনে পড়েছে—সেই যে বাসে শুনলাম কোথাকার রাষ্ট্রনেতা এদেশে সফরে এসে আমাদের এক ফিল্মস্টারের, কেন, আমি তো আজই মদের দোকানে হো হো করে, ইয়্যাও ইয়্যাও ইয়্যাও—কতগুলি ধমনী আর রক্ত নাচছে আর হৃদ্‌পিণ্ডের ছবির মতো সেই ঘরটার মধ্যিখানে দুটো অলীক হাত শূন্যে উঁচিয়ে ঝুমঝুমি বাজানো হচ্ছে, মেঝেতে পা ঠোকার শব্দ হাততালির শব্দ উল্লাসের শব্দ, আমি মদ খাচ্ছি কেন, একটি রমণীর বুক ছাইদানী, সমুদ্রবক্ষে ইনিয়াস—পেছনে কলকাতা জ্বলছে, শত শত মানুষ অলি-গলিতে ছিটকে গেল, ধোঁয়া, চাপ চাপ সাদা ধোঁয়ায় আকণ্ঠ ভরে গেল আর সকলে কাশতে লাগল, তারপর বিদ্যুৎ চমকের মতো এক ঝাঁক ঘোড়া এলোমেলো দৌড়ে গেল আর আর্তনাদ আর কোলাহল আর হত্যা।

নিশানাথ ক্লান্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বন্ধুগণ, এইবার আমার মনে পড়বে সুনয়নীকে, আমি, আমরা—না, আমি, আমিই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। তারপর সেই বিলম্বিত, প্রাচীন, প্রবীণ ক্লান্তি ও অবসাদ আমাকে অবসন্ন করবে—একদা যা উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত, উদভ্রান্ত করত। এই পাপবোধ, এই হীনমন্যতা এখন আমি চারিয়ে চারিয়ে উপভোগ করব। নিজেকে এখন ভাবব সভ্যতার ক্রুশবিদ্ধ যীশু। মানব ইতিহাসের যাবতীয় পাপ কাঁধে বহন করে এইবার আমি ঘুমোব। আর ভাত ঢাকা থাকবে, মা ভদ্রমহিলা দরজার বাইরে অকারণে একবার কি দুবার ঘুরঘুর করে আস্তে ফিরে যাবে, বৌদি হয়তো সাহসে ভর করে মৃদু অনুযোগের সুরে একবার খেতে ডেকে বিবেকের কাছে মুক্ত থাকবে এবং আমি আলো নিভিয়ে

দেয়ালে জানলার গরাদের যে ছায়া পড়ে, যা অবিকল একটি কাঠগরাদ, তার দিকে তাকিয়ে হয়তো সারারাত নিজেকে আর পৃথিবীকে অভিযুক্ত করব। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে হয়ে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ব এবং অতিকায় সব দুঃস্বপ্ন দেখব। বন্ধুগণ, এইবার আমার নিজের কাছে নগ্ন হওয়ার পালা।

নিশানাথ উঠে সিগারেট ধরাল। জামা খুলে ছুঁড়ে দিল চেয়ারের ওপর। আলো নেভাতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল টেবিলে একটা এনভেলাপ। অন্যমনস্ক কৌতূহলে, কিছুটা বা বিরক্ত হয়ে এনভেলাপটা তুলল এবং পরিচিত হস্তাক্ষরের ঠিকানা দেখে খুলেও ফেলল। তারপর ছোট্ট দু-লাইনের চিঠি পড়ল—আজ তোমার জন্মদিন, নিশ্চয়ই তা খেয়াল নেই। আন্তরিক শুভ কামনা নিও। সুনয়।

আজ আমার জন্মদিন। আজ। নিশানাথ বিমূঢ়ের মতো চিঠিটির দিকে তাকিয়ে রইল। আজ কি বার? আজ তারিখ কত? আমার কত বয়স হল? সুনয় কি এইভাবে আমাকে শাসন করল, অপমান করল? কিন্তু চিঠিতে তো কোন অভিযোগ নেই, অভিমান নেই। এই কি প্রেম? প্রত্যাশাহীন, শুভ কামনা, অনির্বাণ, অপরিসীম। সুনয় কি আজ সমস্ত সন্ধ্যা আমার অপেক্ষায় ছিল? সে কি সত্যিই জানত জন্মদিনেও আমি যেতে ভুলে যাব? তাই কি আগেই চিঠি লিখে ডাকে দিতে ভরসা পেল?

নিশানাথ সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিভ্রান্তের মতো সেই চিঠিটির দিকে তাকিয়ে রইল। অক্ষর, ভাষা কতটুকু প্রকাশ করে? মেয়েলী ছাঁদের এই হস্তাক্ষর, সুডৌল আর রেখায়িত এই দুটি পংক্তি—শিউরে উঠে নিশানাথ চিঠির কাগজটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রাখল।

আর আলো নেভাতে এই প্রথম ভয় করল। অন্ধকারকে ভয় করল। কারণ সে জানত তাহলেই দেয়ালের বুকে জানলার শিকের ছায়া ফুটবে—কাঠগরাদের ছায়া। আজ তার জন্মদিন।

নিশানাথ বিছানায় বালিশের ওপর মুখ চেপে শুলো। আর তারপর সেই যুবকটি, সেই ইতিহাসের বিধাতা অস্ফুটে আর্তনাদের স্বরে কাকে যেন বলল, আহ্ কেন, কেন আমি জন্মালাম। কেন আমার জন্ম হল!

ছয়

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, আমি শুনেছি এই কাঠগরাদের সামনে দাঁড়ালেই মানুষের স্বাভাবিক কণ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত বাক্‌ রুদ্ধ হয়। আমি শুনেছি ঈশ্বরের নামে সত্যভাষণের শপথ নেওয়ার অর্থ এক বিশেষ স্বরে বিশেষ ভাষায় বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলা। আমি শুনেছি কিছু কিছু বাক্যপ্রয়োগ এখানে অবাঞ্ছনীয় এবং কোনো কোনো শব্দ ব্যবহারের ফল আদালত অবমাননা। ধর্মাবতার, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বা মানুষের বিচার ব্যবস্থার মহান আদর্শকে লাঞ্ছিত করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু অনভিজ্ঞতা অসতর্ক আবেগ ও সত্যবাচনের স্পর্ধিত তাড়নায় যদি রীতিবিরুদ্ধ কিছু বলে বসি, তাহলে মার্জনা করবেন।

আমি নিজের পক্ষে কোনো উকিল নিয়োগ করি নি। জুরীমহোদয়গণ, আপনারা ভালোই জানেন এই বিচার ব্যবস্থা কি জটিল আর ব্যাপক আর সূক্ষ্ম। আবার অন্যদিকে কি সরল, একমুখী ও প্রত্যক্ষ। জুরীমহোদয়গণ, আপনারা জানেন জীববিজ্ঞানের কোন অমোঘ নিয়মে একদা প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল আর অস্তিত্বের কি অনিবার্য তাড়নায় ধাপে ধাপে মানুষ তার বর্তমান আকার ও প্রকৃতি লাভ করল। এই অযুত-নিযুত বৎসর ধরে মানুষ নানা ভাবে তার এক এবং একমাত্র প্রবৃত্তির অকুণ্ঠ পরিচয় দিয়েছে। জুরীমহোদয়গণ, পৃথিবীতে ব্যক্তি বলে কোনোদিন কিছু ছিল না, আজও নেই। ব্যক্তি—সমষ্টির যে কোনো ইউনিট মাত্র নয়; একক, একা, অথচ সার্বভৌম। মানুষের কল্পনায়ও তাই স্বর্গভ্রষ্ট হতে হয় দু-জনকে। এমনকি তার কল্পনাশক্তিও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সহ্য করতে পারে নি! ঋষি বাক্য অনুসারে এক শুধু ঈশ্বর। কিন্তু আপনারা উত্তমরূপে জানেন কোনো ধর্মেই ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত একা নন। ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ—কী জীবনে, কি কল্পনায় এইভাবেই মানুষ সর্বদা বহু থাকতে চেয়েছে। আর একেই বলেছি তার সহজাত প্রবৃত্তি, তার জন্মগত প্রকৃতি। এবং এরই তাড়নায় একে একে পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব; যাকে বলা যায় সভ্যতা আর সভ্যতার অর্থই হলো সংগঠন। এই সংগঠনের চরিত্র ও প্রকৃতি কি বিশাল, কি ব্যাপক, কি সর্বগ্রাসী মানে মূ সঞ্চারী—তাও আপনারা জানেন। মানব সভ্যতায় এমন কোনো স্তর ছিল না—যখন সংগঠন ছিল না। মানব জীবন ও কল্পনার এমন কোনো ব্যাপার নেই—যার পেছনে সংগঠন নেই। স্বর্গ-মর্ত্য-নরক জুড়ে অযুত নিযুত বর্ষে ইতিহাস

যে বহু বিচিত্র সংগঠন গড়েছে, তার নিজের জীবন ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে মানুষই তার বনিয়াদ দৃঢ়, দৃঢ়, দৃঢ়ভাবে গেঁথেছে। একেই বলি সভ্যতা।

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান হলো বিচার ব্যবস্থা—যা এই তাবৎ সংগঠনের উধ্বে অবস্থিত এক সার্বভৌম সংগঠন; জটিল, সূক্ষ্ম অথচ সর্বদর্শী। যার চোখ প্রায় নিয়তি। আমি অভিযুক্ত হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আপনারা জানেন, নিজের পক্ষে কোনো উকিল নিয়োগ করি নি। কারণ সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধে আমি বিচার ক্রয়বিক্রয়কারী কোনো সংগঠন বা তার এজেন্টের সহায়তা চাই না। এক্ষেত্রে আমি আদি ঈশ্বর—একা; স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করব।

আপনার নাম?

নিশানাথ।

বয়স?

ঠিক জানি না।

পিতার নাম?

অবান্তর প্রশ্ন, কারণ আপনারা তা জানেন।

ইয়োর অনার, আসামীকে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হোক। নইলে এই আদালত কক্ষের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবে। আপনার পক্ষেও এই জটিল ও জঘন্যতম পাপের রহস্য উন্মোচন কঠিন হবে মনে করি।

ধর্মাবতার, কৌঁসুলী মহোদয়ের ফাইলে আমার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যই লিপিবদ্ধ আছে। তার মধ্যে যেগুলি আমার ক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই সঠিক বলে জানেন, সেগুলি সম্পর্কেও প্রশ্ন করে করে আপনার অমূল্য সময় হরণ করা বা আমার স্নায়ু বিনাশ করা—আদালতী এই কৌশল সম্পর্কে আমি প্রথমেই আমার আপত্তি উত্থাপন করছি। কারণ জানি ভবিষ্যতে বারবার একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হবে।

নিশানাথবাবু, আমি শুনেছি সময় সম্পর্কে আপনি এক মস্ত বিশেষজ্ঞ। আপনি বিশ্বাস করেন সময় হলো স্থির, তা কোনোদিন এবং কখনোই প্রবাহিত হয় না। তথাপি আজ সময় হরণের এই মামুলী অভিযোগ কেন?

বাস্তবিক, সময় কেউ হরণ করতে পারে না। সময় এক স্থির অকম্প্র ব্যাপার। পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই বা মানুষের এমন কোনো কল্পনা—যার সঙ্গে সময়ের তুলনা চলে। আপনারা সুন্দরী, রূপসী, চির

যৌবনবতী উর্বশীর কথা শুনেছেন, স্বপ্নসভাতল যে আপন নূপুর নিক্কণে অনন্তকাল ঝঙ্কৃত রেখেছে। আপনাদের ইমাজিনেশন ও ইসথেটিকসের চূড়ান্ত প্রসব হলো এই সর্বমানবসম্পর্ক উত্তীর্ণ, কালাতীত, অপ্সরা রমণী কল্পনা। ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, আমার বিবেচনায় এই বিস্ময়বোধ, এই এ্যাডমিরেশন মারফৎ অত্যন্ত মামুলী এক ইমাজিনেশনকে আরো বেশি এঁটো করে দেওয়া হয়েছে। একবার সময়ের কথা ভাবুন—সে কি জড়, না তার প্রাণ আছে? সে কি পুরুষ না রমণী? সে কি সুন্দর না কুৎসিৎ? স্বর্গ মর্ত্য নরক কোথায় তার প্রকৃত অধিষ্ঠান? কায়া নেই, রূপ নেই, গুণ নেই, মানুষের কোনো সম্পর্কবোধ বা অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে না। অথচ সে আছে। আর জানি না কবে তার শুরু, কি ভাবে তার শুরু। অথচ সে আছে। আর জানি না কি বা কেন, অথচ সে আছে। আদিতেই যে সমাপ্ত ও পূর্ণ, চিরকাল যে অতীত আর বর্তমান আর ভবিষ্যতের সমাহার, স্থির অনড় অপরিবর্তনীয় সেই সময়কে আমরা তুলনা করেছি তুচ্ছ প্রবাহের সঙ্গে—প্রকৃতির কারণে যার অস্তিত্ব। সেই সময়কে আমরা ঘণ্টায় মিনিটে সেকেণ্ডে বেঁধেছি—আর দেশে দেশে তার ভিন্ন রূপ। ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ—এই এখন, ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে একটাই সময়—অথচ ক্যালেণ্ডার আর ঘড়িতে দেশে দেশে কতই না ভিন্নতা। এই এখন সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে—অথচ কি ভুলভাবে তার পরিমাপ করি। আর পদ্য লিখি শিশুর উচ্ছ্বাসে। বাস্তবিক, কৌসুলী মহোদয় ঠিকই বলেছেন—সময়কে কেউ হরণ করতে পারে না, সময়ই সব কিছু হরণ করে। না, তাও না। সময় সব কিছু হরণ করে। না, তাও না। সময় সব কিছুকে জড়িয়েও তাবৎ ব্যাপার থেকে আলগা—অর্থাৎ সময়েরই যথার্থ ল্যাজ খসেছে, তাই সে শুধু দেখে, কিছুই করে না। হ্যাঁ, সময়ই যথার্থ ব্যক্তি।

আসামী, তোমার কথার মধ্যে এই ল্যাজ খসার প্রসঙ্গ ঠিক বুঝতে পারলুম না। একটু ফুটনোট দাও।

ধর্মাবতার, আপনি যথার্থই রসিক। সুতরাং এ গল্প আপনাকে বলায় সুখ আছে। একবার রামকৃষ্ণ গেলেন কেশব সেনকে দেখতে—খবর না দিয়েই গেছেন। কেশবচন্দ্র তখন সশিষ্য পুকুরে চান করছিলেন। রামকৃষ্ণ দূর থেকে তাঁকে দেখে নিজের সঙ্গীদের বললেন—'এই যে, এরই লেজ খসেছে'। কথাটা কেশবচন্দ্রের শিষ্যদের কানে গেল আর তারা উঠলেন ক্ষেপে। কেশব সেন তাঁদের শান্ত করে রামকৃষ্ণকে বললেন 'মহাশয়, আপনি

এমত বললেন কেন জানতে বড়ই কৌতূহল বোধ করি।' রামকৃষ্ণ একগাল হেসে বললেন, 'তাও বুঝলে না? বলি ব্যাঙাচি দেখেছ? 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 'ব্যাঙাচির ধর্ম কি জানো? সে জলে থাকলে জলেই থাকে, আব ডাঙ্গা হলে ডাঙ্গায়। যখন তার ল্যাজ খসে, সে ব্যাং হয়, ইচ্ছে করলে জল-ডাঙ্গায় যেখানে খুশি থাকতে পারে। তুমি বাপু সেই রকম। সংসার বা সন্ন্যাস দুইয়েই তুমি বিচরণ কর' ইত্যাদি। ধর্মাবতার, রামকৃষ্ণ এই আশ্চর্য উপমাটি বড়ই অপাত্রে অর্পণ করেছিলেন। বাস্তবিক এক সময় ছাড়া কারোর ল্যাজ খসেছে বলে জানি না। যদিও ডারউইনের থিয়োরী অন্যরকম।

ইয়োর অনার, অন্য কোনো আসামী অর্থাৎ কোনো সাধারণ অপরাধী হলে, কনটেম্প্‌ট অব কোর্টের পক্ষে এ-ই মাত্রাতিরিক্ত রকম যথেষ্ট হতো। কিন্তু প্রার্থনা করি বিচক্ষণ আসামীর প্রগলভ ভূমিকাটুকু স্মরণ করে আপনি তাঁকে আপাতত এই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেবেন। অপরাধীর পূর্ব অপরাধ এত গুরুত্বপূর্ণ, এত মৌলিক যে আমিও তাঁকে এই বিচারব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যই মূল প্রসঙ্গে ফিরতে চাই।

কনটিনিউ।

নিশানাথবাবু, আপনার জীবিকা কি?

অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন, উত্তর দিতে বাধ্য নই।

আপনার মামলার সঙ্গে জড়িত সব প্রশ্নের উত্তরই আদালত দাবি করে।

ধর্মাবতার, আমার বিরুদ্ধে যথার্থ অভিযোগ কি তা জানি না। সুতরাং এই মামলার সঙ্গে কোন্ প্রশ্নের সম্পর্ক আছে তা নির্ণয় করা কঠিন। তবু সাধারণ বুদ্ধিতে যে প্রশ্নগুলি অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় সেগুলির উত্তর আমি দিতে বাধ্য নই।

সাধারণ বুদ্ধি? নিশানাথবাবু, আপনি আমাকে বিস্মিত বিচলিত বিমূঢ় করলেন। ভেবে দেখুন—সাধারণ এবং বুদ্ধি এর দ্বারা মনের কোন্ ভাব প্রকাশ করতে চাইছেন?

বাস্তবিক, কৌঁসুলী মহোদয়—আপনি ঠিকই বলেছেন। শব্দ মাত্রেই আপেক্ষিক। সাধারণ এবং বুদ্ধি—এই দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, নিহিতার্থ ও প্রয়োগার্থ সর্বক্ষেত্রে এক না-ও হতে পারে। কিন্তু আমরা যেহেতু আইনের দাস সেহেতু—

ও, ভাষা সম্পর্কে আপনি নিজের সেই থিয়োরী ব্যক্ত করতে চাইছেন? আচ্ছা এ সম্পর্কে ধর্মাবতারকে ও জুরীমহোদয়গণকে আমি এই চিঠিটি প্রদর্শনের জন্য দিচ্ছি। ইয়োর অনার - একস্‌হিবিট নাম্বার ওয়ান। লেখক, আসামী নিশানাথ রায়, প্রাপক—সুনয়নী বসু। চিঠির তারিখ ২৭শে জুন ১৯৫৯, একটি পোস্টাফিসের সীল—১লা জুলাই ১৯৫৯, দ্বিতীয় পোস্টাফিসের ছাপ ২রা জুলাই ১৯৫৯। দ্বিতীয় পোস্টাফিসের নাম দেখছি টালিগঞ্জ—সুনয়নী দেবী টালিগঞ্জে থাকেন, তাই না নিশানাথবাবু?

অবান্তর ও ব্যক্তিগত প্রশ্ন। উত্তর দিতে বাধ্য নই।

কিন্তু আমি তো আপনাদের সম্পর্ক কি, আলাপ কি ভাবে বা সে যাক—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি নি। আমি শুধু জানতে চাইছি—

চিঠিটি যখন পেয়েছেন, তখন ঠিকানাও তাতেই লেখা আছে দেখে থাকবেন।

নিশানাথবাবু আইনের কাছে সবই প্রমাণ সাপেক্ষ। জবানবন্দী বলুন, সওয়াল জেরা বলুন, সাক্ষ্য বলুন—সবই এ কারণে।

ধর্মাবতার—কৌসুলী মহোদয় আর একটি বিচক্ষণ উক্তি করলেন। একবার এক বাড়িওলা তাঁর ভাড়াটাকে মিথ্যে মামলায় উচ্ছেদ করতে চাইলেন। ভাড়াটে আমার বন্ধু, আমি সেখানে নিয়মিত যেতাম—সমস্ত ঘটনাটাই আমার জানা ছিল। বিচারে বাড়িওলা হেরে গেলেন—সত্যেরই জয় হল। অত্যন্ত সাধারণ কেস। আমি সাক্ষী ছিলুম। সত্যের পক্ষে সত্য জেনেও আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হলো। নইলে নাকি নিরপরাধ আমার বন্ধু হেরে যেতেন, তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হতো। আদালতের অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। কিন্তু বুঝেছি বিচার ব্যবস্থা কি অসহায় আর জটিল—নইলে···

কিন্তু নিশানাথবাবু, আদালতের অভিজ্ঞতা সেই প্রথম কেন বললেন? পরেও কি এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

হ্যাঁ, কাঠগড়াতে তারপরেও দু-বার আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে। একবার আসামীরূপে, একবার সাক্ষী হয়ে।

আসামীরূপে? আপনার অপরাধ?

অপরাধের প্রশ্ন ছেড়ে দিন। অভিযোগ ছিল—বে-আইনী অবরোধ, গুণ্ডামি, পুলিশের কর্তব্যে বাধাসৃষ্টি, নরহত্যার চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর?

সাত-আট মাস আটকে রাখল—কেস ফর্ম করার জন্য। শেষে রাস্তায় গুণ্ডামির চার্জে বিচার হলো। সে কেস টিঁকল না। তখন নতুন করে মামলা সাজানো হলো—বৈধ সরকারের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র।

ও, আপনি বামপন্থী রাজনৈতিক ?

অবান্তর প্রশ্ন।

আর হ্যাঁ, সাক্ষী দিয়েছিলেন কিসে ?

বলব না।

ইয়োর অনার, এই প্রশ্নের উত্তর বর্তমান মামলায় পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

আল্লায়।

আমার এক বন্ধু সুইসাইড করেন। সেই মামলায় সরকার পক্ষ আমাকে সাক্ষী মেনেছিল।

আপনার বন্ধুর নাম ?

প্রিয়গোপাল দে।

কতদিনের বন্ধুত্ব ?

চার বছরের।

কি সূত্রে আলাপ ?

কাজকর্মের।

জীবিকা-বিষয়ক ?

না।

তবে ?

কি তবে ?

কি ধরনের কাজকর্ম ?

আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা, ঠিক আছে। কবে তাঁর সঙ্গে আলাপ ?

মনে নেই।

সত্যি বলছেন তো ?

মানুষ ভয়ে অথবা লোভে অথবা ভদ্রতায় মিথ্যে বলে। আমি ভীতু লোভী ভদ্র কিছুই নই।

তার মানে আপনি সাহসী নির্লোভ এবং অভদ্র—এই কি বলতে চাইছেন ?

কৌঁসুলী মহোদয়—আপনাদের বিচারশালার অভিধানে শুধু দুটি শব্দ আছে—হ্যাঁ অথবা না, ইতিবাচক অথবা নেতিমূলক। আর আমার অভিধান থেকে আমি ওই পৃষ্ঠাগুলি একেবারেই ছিঁড়ে ফেলেছি। ইতিবাচকও নয়, নেতিমূলকও নয়— অথচ অস্তি—এ জিনিষটা বোঝেন ?

বুঝি প্রিয়গোপালের আত্মহত্যার ব্যাপারে। ভালো কথা—সে হঠাৎ এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল কেন ?

ধর্মাবতার, ভুল শব্দপ্রয়োগ আমি একেবারে সইতে পারি নে। একজন ভদ্রলোক সম্পর্কে—

অত্যন্ত দুঃখিত, পরলোকগত প্রিয়গোপালবাবু—

পরলোকে প্রিয়গোপাল বিশ্বাসী ছিলেন না।

ঠিক আছে। মৃত প্রিয়গোপালবাবু আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ?

জীবন তাকে শূন্য করেছিল।

কেন ?

সে অনেক কথা।

ধন্যবাদ, প্রিয়গোপালের এই ডায়েরিখানা যদি আপনি সনাক্ত করেন—তাতেই সমস্ত কারণ লিপিবদ্ধ আছে—তাহলে আদালতের প্রচুর সময় বেঁচে যায়।

এ ডায়েরী আপনি কোথায় পেলেন ?

মৃত প্রিয়গোপালবাবুর বিধবা—

আহ্, এ ডায়েরী আপনি কোথায় পেলেন ?

মৃত প্রিয়গোপালবাবুর বিধবা শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবীর ট্রাঙ্ক থেকে।

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, আমি সনাক্ত করছি। কিন্তু ডায়েরির সমস্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ধর্মাবতার, এ সত্য নয় যে আমারই জন্য প্রিয়গোপাল—ধর্মাবতার জীবন তাকে শূন্য করেছিল। আকাঙ্ক্ষা এবং অভিজ্ঞতাকে সে মেলাতে পারে নি—তাই—

নিশানাথবাবু, আপনার বাবার নাম কি ?

দীননাথ রায়।

আপনার বাবা কি করেন ?

ওকালতি।

আপনারা ক ভাই ?

চার ভাই।

ক বোন ?

তিন বোন।

ভাইয়েদের কি বিয়ে হয়েছে ?

হয়েছে—বড় আর ছোট ভাইটির।

সে কি ?

কেন ?

না, ঠিক আছে। আপনি কোন্ ভাই ?

মেজ।

আপনার দাদা কি করেন ?

ডাক্তারি।

আপনি কি করেন।

ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

আপনার পরের ভাই—যিনি বিবাহ করেন নি—তাঁর কি পেশা ?

গুণ্ডামী করা।

ছোট ভাইয়ের ?

রাজনীতি।

বোনেদের বিয়ে হয়েছে ?

বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল, সেপারেশন হয়েছে।

পরের দুটি বোনের ?

না।

কেন ?

তাঁরা করেন নি বলে।

মাপ করবেন, প্রশ্নটা করে ফেলেই ভেবেছিলাম আপনি বলবেন—ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনার বোনেরা কি চাকরি বা পড়াশুনো—

হ্যাঁ, দুইই করেন।

দুজনেই ?

সম্ভবত।

মানে ?

অর্থাৎ আমি সব খবর রাখি না।

ও, আপনারা বুঝি আলাদা থাকেন ?

হ্যাঁ। না, মানে, একই বাড়িতে থাকি—তথাকথিত জয়েন্ট ফ্যামিলি

সিস্টেম আমাদের। তবে আলাদাই বলতে পারেন। অর্থাৎ বোনেরা কবে কি পাশ করেছে, কি চাকরি নিচ্ছে বা ছাড়ছে—সব অত মনে রাখতে পারি না। আমাকে বলেও না আজকাল।

ও, আপনি তো আবার একা থাকতে ভালোবাসেন।

হ্যাঁ।

আপনার ভায়েদের ছেলেপুলে কটি ?

দাদার একটি।

তার নাম মনে আছে ?

হোয়াট ডু ইউ মীন ?

রাগলে আপনিও ইংরিজী বলেন দেখছি। কোনো খবর রাখেন না বলেছেন—তাই—

বাঃ, আমি যে তাকে ভালোবাসি ?

মেম্বারস অব দি জুরী, 'ভালোবাসি' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করুন।

সে কি নিশানাথবাবু, আপনি তো স্নেহ-ভালোবাসা ইত্যাকার মানবিক বৃত্তিগুলিকে বিশ্বাসই করেন না।

ঠিকই বলেছেন। ওকে আমার ভালো লাগে। আমি ভালোলাগায় অবিশ্বাসী নই।

ইয়োর অনার আসামীর নিজের স্বীকৃতি আপনি ও জুরীমহোদয়গণ নিশ্চয়ই উপেক্ষা করবেন না। নিশানাথবাবু, ভালো না বেসেও ভালো-লাগায় বিশ্বাস—এ আপনার সাম্প্রতিক ধারণা। একদিন যখন আপনি প্রেম ইত্যাদি মহৎ মূল্যে বিশ্বাসী ছিলেন—

একদিন শৈশব পেরিয়ে মানুষ ব্যক্তি হয়।

নিশানাথবাবু, সভ্যতার মহৎ মূল্যগুলিকে অবিশ্বাস করাই কি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ?

না। সভ্যতা যে সত্যিই মহৎ হতে পারে নি, সম্পর্কের মূল্যবোধগুলি যে নিতান্ত ফাঁকা কথা, ব্যক্তিত্ব তা বুঝিয়ে দেয়। ব্যক্তিত্ব মানুষকে বিবেক দেয়। আর বিবেকবানের মুক্তি নেই। সে জানে কোনো কিছুই আকস্মিক বা কার্যকারণ-সম্পর্ক বিহীন নয়। তাই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পাপের বোঝা কাঁধে নিয়ে সে এইভাবে কাঠ-গরাদে এসে দাঁড়ায়।

সাধু সাধু নিশানাথবাবু। আপনার বক্তৃতার হাত বড় চমৎকার।

আবার ভুল শব্দের প্রয়োগ? বক্তৃতার হাত নয়, এ ক্ষেত্রে হবে বাচনক্ষমতা।

নিশানাথবাবু, আপনার মা সম্পর্কে ধারণা কি?

মানে?

মাকে আপনার কি রকম লাগে?

অবান্তর প্রশ্ন।

মার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি রকম?

মোটামুটি।

মার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

ইয়োর অনার এই প্রশ্নের উত্তর বর্তমান মামলার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

আল্লার।

বলুন?

মা একটা ভিখারি।

কেন?

মা চিরজীবন দীন ভাবে জীবনের কাছে হাত পেতে গেল আর শেষকালে যখন সত্যিই দান এলো, তখন তা নিতে পারল না। খবরের কাগজে সেই সব সাধু ভিখারী বা দরিদ্রের সংবাদ কখনো কখনো বেরোয় যারা হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ধন কুড়িয়ে মালিকের কাছে বা থানায় জমা দেয়—আমার মা তেমনই এক সাধু ভিখারী। অবশ্য এ খবর কাগজের নয়। শুধু আমিই জানি আর মা জানে আর—

আর কে?

বলব না।

আচ্ছা, আপনার মা-ই সে কথা বলবেন। তিনিই আমার এক নম্বর উইটনেস্। ধর্মাবতার সাক্ষী মৃণালিনী দেবীকে ডাকা হোক।

নিশানাথ তাকিয়ে দেখল ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। আর দেয়ালে জানলার গরাদে ছায়াটা মিলিয়ে গেল। সেখানে মা এসে দাঁড়ালেন।

সাত

যাবি না?

না।

খেয়ে এসছিস ?

হুঁ।

নিশানাথ অকারণে মিথ্যে বলল। অবশ্য এক মুহূর্ত আগেও জানত না যে রাতে ভাত খাবে না। মা যদি বলতেন, 'খেতে চল'—তাহলে হয়তো আমি, মা নেতিবাচক উত্তরের সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করলেন বলেই কি আমাকে বাধ্য হয়ে, আসলে, আশ্চর্য দেখেছ ; বোধহয় কত, কতদিন বাদে আজ মার সঙ্গে কথা বলছি। মার সঙ্গে শেষ কথা কবে কি প্রসঙ্গে হয়েছিল মনেই পড়ছে না।

কোথায় খেলি ?

মা হাসলেন। মা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছেন। একদা মা এইসব প্রশ্ন করতেন, আমি বুঝতাম কৈফিয়ৎ চাইছেন। মার সন্দেহে আমার বিরক্তি, এমন কি ঘৃণা হতো। আজ কতকাল প্রশ্ন করেন না। করতে সাহস পান না। যেদিন থেকে সত্যিই কৈফিয়ৎ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সুযোগ ছিল—সে দিন থেকেই মা নীরব। আসলে মা কি সব বোঝেন ? যাকে ভাবি ভয়, যাকে মনে করি ঔদাসীন্য—বাস্তবিক সেগুলি কি মার সৌজন্য, দুঃখ, হতাশা ? নিশানাথ অজ্ঞাতে মুচকে হাসল।

মা বললেন, কিরে ?

মা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। প্রশ্নের উত্তর দিলাম না বলে কি ? মা কি অপমানিত বোধ করলেন ? মা, তুমি কি, তুমি কি মা, বাস্তবিক বলতো মা, তোমারও কি অপমানবোধ, তাহলে আমাদের মতো এহেন একটি রত্ন প্রসব করে, মা বলতো, এতবড় একটা মিথ্যে-ফাঁকা-ব্যর্থ জীবন কাটিয়ে, আজও যে পঞ্চাশ বছর বয়েসে কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে একটু আগে খেতে বসে পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে গল্প করছিলে, এখন এসেছ তোমার প্রবাসী পুত্রটিকে কিছু একটা বলতে—মা, বলতো তুমি কি—

ছোটকু আর বৌমা কাল আসছে।

ও।

কাল তোর কাজ আছে নাকি ?

নিশানাথ হেসে ফেলল। মা দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাঁর ছেলেটিকে হাসতে দেখছেন। মা, তুমি যে কি পৌরাণিক ভাষায় কথা বলো—আমি বুঝতে

পারি না। নিশানাথ অনেক ভেবেও কিছুই মনে করতে পারল না কি কাজ তার থাকতে পারে। তবু বলল, হ্যাঁ।

কাল যে বাড়িতে, মানে, তোর কি খুব জরুরি—

হ্যাঁ।

কখন বেরোবি ?

দেখি।

মা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিন্তু তুমি বৃথাই কষ্ট পাচ্ছ। উপযুক্ত মনোযোগ দিয়ে তোমার প্রশ্ন শোনো ও যোগ্য মর্যাদায় তার যথাবিহিত প্রত্যুত্তর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ভান করছি না। মা, তুমি যদি বলতে কাল বাড়িতে এই ব্যাপার, তোকে থাকতে হবে—তাহলেও আমি বলতাম, দেখি। মা, তুমি বোঝো না কেন—আমি তোমার অপরিচিত, তোমাকে আমার লজ্জা করে। তুমি এই এসেছ—তোমার চোখ দুটো দেখে আমার লজ্জা। মা, তুমি আদেশ করতে পারো না—কিন্তু তোমার ভীরু বিষণ্ণ কণ্ঠ, তোমার ভীরু বিষণ্ণ চোখ, তোমার ভীরু বিষণ্ণ অস্বস্তি আমায় ক্রমাগত অভিযোগ করে। মা, তুমি যাও—যদি বুঝতে তোমার সম্পর্কেও আমার অভিযোগ কত তীব্র ; যদি বুঝতে মা, যদি—

শোন।

কি ?

কাল বড় বৌমার সাধ।

কি সাধ।

মা হেসে ফেললেন।

আর মার হাসিতে নিশানাথ যেন এক শিলালিপির পাঠ আবিষ্কার করল। খুবই বিস্মিত হলো বিরক্ত হলো। বলল, ও।

সেইজন্যেই তো বাড়িতে কাল, ছোটকুরাও—

ও।

তুই কি ভাবিস এত ?

নিশানাথ চোখ তুলে তাকাল।

মা যেন জেদ করে বললেন, সব সময় অন্যমনস্ক—কোনো কথা ভালো করে শুনিস না, উত্তরও দিস না! কি ভাবিস রে ?

মা আমি জানি, তোমার প্রশ্নেই সব সময় উত্তর থাকে। এই মাঝরাতে,

আহ, তুমিও এলে আমাকে অভিযোগ করতে। নিশানাথ বিরক্ত আর অসহায় দৃষ্টিতে তার জননীর দিকে তাকিয়ে রইল।

ঠাকুরপো, খাবে না?

নিশানাথ শুয়েছিল, চকিতে উঠে বসল।

চৌকাঠের ওপাশে দাঁড়িয়ে স্বর্ণ এক হাতে মাথার ঘোমটা তুলে অন্য হাতে দরজার পাল্লায় কনুই ঠেকিয়ে বলল, শোনো তোমার দাদা বলছিলেন কালকের বাজারটা তুমি করো। মানে কেষ্ট তো রোজই, আর কাল আবার—এদিকে কাল ভোর রাতে ওকে বেরোতে হবে। সেজবাবুকেও তো—

নিশানাথ দুর্বোধ্য বিস্ময়ে স্বর্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোঝো কাণ্ড। কালকের বাজার চাকরে করলে মনে থাকে না। আর, এ বাড়ির সেজ ছেলের ওপর কারোর বিশ্বাস নেই। তোমার বৌঠান নিশানাথ, তোমার এককালীন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। সে বলছে কাল বাজার করতে হবে। কারণ উনি ভোর রাতে বেরোবেন। কারণ কাল আমার সাধ। তোমার দাদা, মানে উনি, বুঝলে ঠাকুরপো—আমাকে আর একটি সন্তান দিচ্ছেন। অতএব, বুঝলে ঠাকুরপো, কাল বাড়িতে উৎসব হবে। তাই, তুমি বাজারে যেয়ো।

নিশানাথের অতীব, অতীব রাগ হলো। আর, একটা অশ্লীল ঝগড়া করার ইচ্ছায় তার মাথা ধরল। বৌঠান পান চিবুচ্ছে। চিবুকে টোল। বৌঠান আজ সিনেমায় গেছিল। খেতে বসে স্বামী আর শাশুড়ীর সঙ্গে সেই গল্প হচ্ছিল। অহো! জীবন! নিশানাথ, তুমি ভাবনায় ভাবনায় ভাবনায় কোন্ স্বর্গে—কোন্ নরকে পৌঁছতে চাও? এই দেখ- সম্মুখে একটি রমণী। শিক্ষিতা, সুরূপা, গৃহকর্মে নিপুণা, সদ্বংশজাতা,— তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কত সুখী, কত নিশ্চিন্ত। আর নিশানাথ—তুমি যুবক তাবৎ সভ্যতার বোঝা ঘাড়ে করে, নিশানাথ—হায় হায় হায়, নিশানাথ—

কি অমনি মুখ গম্ভীর হয়ে গেল? একদিন না হয় একটু কাজ করলেই বাবা।

সাবধান নিশানাথ, এও একজন সাক্ষী। এও তোমার বিরুদ্ধে তর্জনী উঁচিয়ে অভিযোগ করছে। তুমি কিছু করো না। তুমি উদ্বৃত্ত। নিশানাথ, এই পরিবারের প্রতি কোনো কর্তব্যই তুমি পালন করো নি। তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার দাদা-বৌদি, তোমার ভাই বোনেরা—ওহ্, কাল ছোটকু আর সাধনা আসছে। নিশানাথ, তোমার ছোটো ভাই তোমাকে ঘৃণা করে—

তুমি বোঝো না? তোমার ভাইয়ের বৌ তোমাকে করুণা করে—তুমি বোঝো না? আর অন্য ভাই বোনেদের সঙ্গে তোমার তো বাস্তবিক কোনো সম্পর্কই নেই। দেখ নিশানাথ, পরিবারের দাবি ছিল—বৌঠান সেই কথাই মনে করিয়ে দিলেন। সমাজের দাবি ছিল—ছোটকু সেই কথাই কাল বলবে। নিশানাথ, তুমি উদ্বৃত্ত, আর তোমাকে ঘিরে চতুর্দিকে শুধু অভিযোগ।

ওই! স্বর্ণ বিচিত্র হেসে বলল।

নিশানাথ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বলল, এঁ্যা?

সেজবাবু।

ও।

বারান্দায় আবার রান্নাঘরের আলো পড়েছে। নিশানাথ আর দিবানাথের ভাত ঢাকা থাকে। বাড়িতে এই দুজনের ফেরার ঠিক নেই। নিশানাথ অনেকদিন না খেয়েই শুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দুজনে একসঙ্গেও খেতে বসে। ঢাকনা তুলে থালার চারপাশে বাটি সাজিয়ে খায়। নীরবে খায়। কতদিন নিশানাথ স্তব্ধ বাড়িতে নিঃশব্দে খেতে খেতে হঠাৎ দুজনের ভাত চিবোনোর শব্দে চমকে উঠেছে। আর মনে পড়েছে—সে একা নয়। পাশে বসে খাচ্ছে তারই সহোদর ভাই। আর এই সত্য আবিষ্কার করে যারপরনাই বিস্ময়ও বোধ করেছে।

শোনো!

নিশানাথ অবাক হয়ে তাকাল। কি চান এই ভদ্রমহিলা, তার বৌঠান। এতরাতে তার ঘরে এসে কি সব সুখ-দুঃখের কথা বলছেন, কত সহজ সুরে, কি নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়। যেন প্রত্যহ বাড়ি ফিরে নিশানাথ খাওয়ার আগে বা পরে এমনি ভাবেই তার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে খানিক গল্প করে। কিংবা, যেন প্রবাস থেকে ফিরেছে।

মন্টু আজ খুব কাঁদছিল।

কেন? নিশানাথ ভীত চোখে তাকাল।

তুমি নাকি কি দেবে বলেছিলে, তাই জেগে বসে থাকবে। আমি জোর করে ঘুম পাড়িয়েছি। কাল কিন্তু সকালেই—

বৌঠান। তুমি হাসছ! তোমার চোখ হাসছে। তুমি জানো আমি আনি নি। তুমি জানতে আমি আনব না। তাই মন্টুকে জোর করে ঘুম পাড়াতে তোমার বাধে নি। সুনয়নী, সুনয়, জানত আমি যাব না। তাই, যাতে আজ বাড়ি ফিরে চিঠি পাই তার জন্য হিসেব করে আগেই চিঠি পোষ্ট

করেছে। কিন্তু তোমার কণ্ঠে কোনো অভিযোগ নেই। এমন কি কৌতুকও না। কি সরলভাবে বৌঠান, তুমি, ঘটনাটা বিবৃত করলে। সত্যি বৌঠান, ছোট বড় সমস্ত ব্যাপারে তোমার এই তুচ্ছ ধূর্তামী দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত। তুমি একটা মামুলি মেয়েমানুষ। বৌঠান, তুমি যদি এখন যাও, আমি বাস্তবিক বলছি, অত্যন্ত খুশী হব। আর এই যে তুমি ভদ্রমহিলা, আমার গর্ভধারিনী মাতঃ, শাস্ত্রে-নীতিকথায়-শিল্পে-সাহিত্যে তোমারই জয়জয়কার; এবং সেই তুমি, মা, কেমন অবলীলায় এখানে বসে আর পাশের ঘরে তোমার পুত্র একাকী—ঢাকনা তুলে ভাত খাচ্ছে। তুমি জানো তোমার এই পুত্রটি খেতে ভালোবাসে, তার স্বাস্থ্যচর্চার ব্যাপার আছে—খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণে ভুল হলে, রান্নায় গণ্ডগোল হলে, প্রোটিন আর ভিটামিন ডি কম পড়লে সে যারপরনাই বিচলিত হয়। তবু তুমি তার ভাত সাজিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট। কারণ, ও রোজ দেরি করে ফেরে, ও রোজ দেরি করে ফেরে, ও গুণ্ডা, ও বংশের মুখে কালি দিয়েছে—ওর সম্পর্কে তোমাদের আবেগ কম। কিন্তু আমি জানি যদি নিয়মিত টাকা এনে দিত, সমস্ত বেদনা ও অপমানবোধ সহ্য করেও তুমি এবং তোমার সাবিত্রী সমান বধূমাতা যত রাতই হোক—ওর খাওয়ার পাশটিতে গিয়ে বসতে। হায় মা, তুমি জানো না, তোমরা জানো না—তোমাদের অভ্যাস, তোমাদের অনুভব—ঠিক নীতিশাস্ত্র মেনে চলে না। ঠিক নীতিশাস্ত্র মেনে গড়ে ওঠে নি। বাস্তবিক, এ বড়ই পুরনো কথা যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যাবতীয় সম্পর্কবোধের ভিত্তিই হলো উৎপাদন ব্যবস্থা।

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে রেনেসাঁস একটি ঘটনা। মধ্যযুগের ভূমিব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা আমূল নাড়া খেল। আর পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—তাবৎ সংগঠনের চেহারা গেল বদলে। চার্চ এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের অমানুষিক বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেল ব্যক্তিত্বের বোধ। আর শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারুবিদ্যা, দর্শন, নন্দন-তত্ত্ব, ইতিহাস চর্চা ও অর্থনীতিশাস্ত্র—যা কিছু বলুন, মানব সভ্যতা ও কল্পনার যাবতীয় শ্রেষ্ঠ উপচার সেই থেকে নতুন করে শুরু হলো। মানুষ তার মহান অতীত ভুলে গেছিল। হেলেনীয় সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবী একদিকে তার অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কার করল অন্যদিকে অজ্ঞাত-অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের দিকে তার নৌকো ভাসাল। এই যুগটাই আবিষ্কার আর অভিযানের যুগ। সৃষ্টি আর গঠনের যুগ। বস্তুত,

রেনেসাঁস সেই ধাত্রী যে প্রাচীন পৃথিবীর গর্ভ থেকে নবীন জগৎকে ভূমিষ্ঠ করাল।

কিন্তু কোন্ সে জগৎ। এ বড়ই জানা কথা আর পূর্বেও বলেছি—সে জগতে হলো ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ। গ্রীকদেরও নাকি স্বাতন্ত্র্যপরায়ণতা ছিল অসামান্য। কিন্তু তাকে আমি ঠিক ব্যক্তিত্ববোধ বলব না। মানুষ যে দেব আর নিয়তির ক্রীড়নক নয়, প্রকৃতি চার্চ আর রাষ্ট্রের ক্রীতদাস নয়, কোনো ব্যবস্থা বা অবস্থাই যে মানবজীবনে অপরিবর্তনীয় নয়—মানুষ তা বুঝল। আর সেই থেকে শুরু হলো তার অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমি জয় করব, স্বর্গ-মর্ত্য-নরকের আমি অধীশ্বর হবে—সে ভাবল।

আর বন্ধুগণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতা—রেনেসাঁস পৃথিবীকে দিয়ে গেল এই দুই অমোঘ উপহার। আমি মনে করি এরাই হলো সেই আদম ও ঈভ—রেনেসাঁসের ফল খেয়ে যারা মধ্যযুগের আদিম অথচ শান্ত আর স্তিমিত স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের নগ্নতায় শিউরে উঠেছিল। আর আগুন জ্বলল।

বন্ধুগণ, আমি কবে কোথায় যেন বলেছি পৃথিবীতে কোনোদিন ব্যক্তি ছিল না, ব্যক্তি নেই। অথচ এখন বলছি রেনেসাঁসের অবদানই হলো জগতে ব্যক্তিত্ববোধের আবির্ভাব। একি পরস্পরবিরোধী কথা? না, মোটেই না!

প্রথমাবধি এই ব্যক্তিত্ববোধ ছিল বিকৃত, খণ্ডিত। সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে, তথা পৃথিবীর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কোনোদিনই ইতিহাসসম্মত, উদার ও যথার্থ হয় নি। তার কারণই এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিযোগিতা। ফলত এই অসম বিকাশ থেকেই একদিকে হলো স্বাতন্ত্র্যের জন্ম, অন্যদিকে স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ। আর এই ভাবে নতুন এক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল। মানবেতিহাসের কি ট্র্যাজেডি। রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শেক্সপীয়ারের মহৎ শিল্পকর্ম কি তাই ট্র্যাজেডি? এই বিকাশ আর বিনাশের ট্র্যাজেডি? তাই কি মেকিয়াভেলির প্রিন্স একাধারে অতিমানুষ আর অমানুষ! তাই কি ফরাসীবিপ্লবের প্রোডাক্ট নেপোলিয়ন!

বন্ধুগণ, এই ভদ্রবালাক, এই দেবশিশুটি সম্পর্কে আমার প্রচুর বক্তব্য আছে। কিন্তু সে পরের কথা। ফরাসী বিপ্লবকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক আলোকস্তম্ভ হিসেবে ধরতে আপত্তি করার কোনো কারণ দেখি না। এই বিপ্লবের প্রধান ভূমিকাই ছিল বুর্জোয়াসীর মুক্তি সাধন, তার এই গৌরবময় ভূমিকাকে মার্কস্ সাহেবও অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কিন্তু তারপর? স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্বের সেই পতাকাদণ্ডের তলায় সেদিন দেখেছি কোড নেপোলিয়ন—যার কিছু মানবিক ভূমিকা ছিল আর অধিকাংশই ধাপ্পা। আজ দেখি গু গলের বিশাল নাক। আর রেনেসাঁস পশ্চিম ইয়োরোপে মানুষকে দিল মুক্তি—এশিয়া এবং আফ্রিকায় গড়ল উপনিবেশ। বাস্তবিক—আমি যদি রেনেসাঁসের ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাইয়ের একটি কার্ড করি তাহলে দেখা যাবে একদিকে রইল শুদ্ধতা, অন্যদিকে মেকিয়াভেলির প্রিন্স, নেপোলিয়ন, হিটলার। ওহোঃ বন্ধুগণ, আমরা বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গেছি। এই এক আশ্চর্য শতাব্দী! পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আশ্চর্য সময় আর আসে নি।

এখন, এই এখন, ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত গোলার্ধে মানুষ প্রহরারত। বন্ধুগণ, পৃথিবীর সমস্ত আকাশে সন্ধানী চোখ পাহারা দিচ্ছে—শত্রুপক্ষের রকেট কখন, কোথা থেকে এসে আঘাত করবে, কেউ জানে না। আর এখন, এই এখনই কাঁচের গরাদে বন্দী আইখম্যান দণ্ডায়মান। আমেরিকা পাগল হয়ে গেছে, গোটা জাতের ইন্‌সমনিয়া, হাইপার টেনসন্। ইয়োরোপ সন্ত্রস্ত—বারট্রাণ্ড রাসেল আলমারি বোঝাই সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী দেখিয়ে বলেছেন আমি যখন পৃথিবীর আশু ভবিষ্যতের কথা ভাবি তখন আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য এই সব হালকা বই পড়ি। জ্ঞানচর্চা স্থগিত রেখেছি, কি লাভ? পশ্চিম জার্মানীতে হলুদ সার্ট পরে ছোকরা ফ্যাসিস্টরা পুনরায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর পুনরপি জর্মান রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছে। আর জাপান আগামী কয়েক পুরুষ তার বীর্যে হিরোসিমার স্মৃতি বহন করবে।

বন্ধুগণ, মানুষকে এই নিরবচ্ছিন্ন উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে রেনেসাঁস। তাই ও দেশের সাহিত্যিক অনেকেই আজ মনে করেছেন যে—আচ্ছা, তার আগে আমাদের দেশের কথাটা সেরে নি। সর্বোপরি, পৃথিবীর একটা বড় ভূখণ্ড—যাকে বলা হয় বিকাশমান শিবির—সে প্রসঙ্গ তো রইলই।

এমন সময় তার মনে হল কে যেন দূরে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। নিশানাথ চমকে উঠে দাঁড়াল আর পরক্ষণেই বুঝল সেই ভিখারিণীটা রোজকার মতোই 'মাগো, দুটি ভাত হবে' বলে ডাকতে ডাকতে আসছে। নিশানাথ এ গলা চেনে। এ ডাকের ধ্বনিতরঙ্গ কোথায় বিলম্বিত হয়, কোথায় হ্রস্ব এবং কিভাবে দূর থেকে কাছে এসে আবার দূরে চলে যায়—নিশানাথ তা

জানে। অনেকদিনই এত রাতে ভিখিরি ভদ্রমহিলার এই অকারণ ডাকের অর্থহীনতার কথা ভেবে মনে মনে সে বিস্মিত হয়েছে। তার গলায় তার ধ্বনিতরঙ্গে প্রতিদিন সে প্রত্যাশা বিহীন আবেদন শুনেছে, যেন উদাসীন অথচ অভ্যস্ত ডাক। আজ হঠাৎ নিশানাথ এই ছোট্ট কথাটার মানে বুঝে, তাৎপর্য বুঝে, পাথর হয়ে গেল। ভদ্রমহিলার ক্ষিধে পেয়েছে, খুব ক্ষিধে পেয়েছে, কিন্তু খাদ্য নেই।

কি যেন ভাবছিলাম? রেনেসাঁস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিযোগিতা, মানুষের মৌলিক পাপ, পৃথিবীর বিনাশ—আহ্, আহ্। এই কলকাতা শহরে পঁচিশ হাজার লোক ফুটপাতে শোয়, এই দেশে প্রতি মিনিটে যক্ষ্মায় একজন মরে যায় (বন্ধুগণ, মরে যায়), এই দেশে শিশুমৃত্যুর হার যেন কত? আর আমাদের গড়পড়তা আয়ু? সেনসাসের রিপোর্ট অনুযায়ী আমি বোধহয় মৃত।

নিশানাথ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

কি রে, হাত মুখ ধুবি না?

নিশানাথ তাকিয়ে দেখল, মা! অত্যন্ত বিস্মিত হলো। মা, তুমি—ও, মনে পড়েছে, কিন্তু বৌঠান—ও, চলে গেছে। ও, কাল তোমার সাধ বৌঠান, অতএব আমাকে বাজারে যেতে হবে। আর এই ভদ্রমহিলা রাস্তায় প্রত্যহ প্রত্যাশাহীন, উদাসীন অথচ অভ্যস্ত কণ্ঠে, আর আমি মদ খাচ্ছি কেন, আর আমরা তিনপুরুষে প্রস্, অথচ মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে।

শোন্।

মা অত্যন্ত লজ্জিত, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন, আমি একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

এঁ্যা?

হ্যাঁ রে। দেখলাম তোর ওপর মায়ের দয়া হয়েছে। তোর সারা শরীরে-চোখে—মা বলতে বলতে শিউরে উঠলেন। আর ব্যাকুলভাবে নিশানাথের হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন, কাল সকালে তোকে আমার সঙ্গে মন্দিরে যেতে হবে, না করতে পারবি না কিন্তু।

আর নিশানাথ তার সম্মুখে যেন এক প্রাচীন অপরিচিত শিলামূর্তি দেখল। সেইজন্য, আহ্ সেই জন্য তুমি—মা, দুঃস্বপ্নে তোমার ভয়, ভগবানে তোমার ভয়, পুত্রকে তোমার ভয়—মা, ভিখিরির মতো এই যে তুমি বললে তোকে

আমার সঙ্গে মন্দিরে যেতে হবে—তোমার কণ্ঠে, উচ্চারণে কি অনিশ্চয়তা আর সংশয়—তোমার আশঙ্কা আমি যাব না, তাই সেই কখন থেকে বসে আছ, কথাটা বলার জন্য পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছ—হায় মা, আমি যে জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখি, মা আমি যে দেখলুম সমস্ত পৃথিবীটার গায়ে ক্ষত ; চোখে, দাঁতে, নখে, মাথার চুলে—মা, আমি কোন্ মন্দিরে যাব—কাকে নিয়ে যাব ! মা হায় মা—

কাল সকালে আমি তোকে ডেকে দেব।

নিশানাথ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, দেখি।

মা আবার তার হাত দুটো ধরে বললেন, না, একটু কথা শোন্।

নিশানাথ অতীব, অতীব বিরক্ত হলো। তার হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা অশ্লীল মনে হলো। অথচ মার জন্য সে অপরিসীম করুণা বোধ করল। আর বিরক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, কিন্তু কাল সকালে যে আমায় বাজারে যেতে হবে।

মার চোখে-মুখে নিশানাথ খুশি দেখল। সে স্পষ্ট বুঝল, মা এমন উত্তর প্রত্যাশা করেন নি। বললেন, যাস্, তার আগেই আমরা মন্দির থেকে ঘুরে আসব।

দেখি। নিশানাথ ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল আর মৃণালিনী ঘরের আলো নিভিয়ে নতমুখে বেরিয়ে গেলেন।

ফোর অনার দ্যাটস্ অল্।

নিশানাথ সেই অলৌকিক কাঠ রাদের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আট

ঘাড়ে হাত রেখে ইশারায় বলল, চলো।

নিশানাথ আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। টানা বারান্দায় জ্যামিতিক ছায়া পড়েছিল। নিশানাথ যেন দাবার ছকের ওপর পা ফেলে স্বপ্নোত্থিতের মতো রাস্তায় নামল।

আর ডাকতে ডাকতে দূর থেকে কতগুলো কুকুর দৌড়ে এল। নিশানাথের পায়ের কাছে বারকয় মাটি শুঁকে আবার চিৎকার করে দৌড়ে চলে গেল। নিশুত রাস্তায় ঘুমন্ত দেয়ালগুলিতে সেই ভয়াবহ চিৎকার

এক ঝাঁক তীরের মতো প্রতিহত হয়ে নিশানাথের চারদিকে ছিটকে পড়ল।

তারপর বড় রাস্তা। কতগুলো লোক গাঁইতি দিয়ে ট্রাম লাইনের খানিকটা খুঁড়ে ফেলেছে। দাঁতে দাঁত চেপে একজন একটা নলের মুখ লাইনের ওপর ধরেছে আর নীল হলুদ লাল বিচিত্র বর্ণের আগুন জায়গাটাকে ভৌতিক আলোয় উদ্ভাসিত করে ইস্পাতের ট্রাম লাইনকে পুড়িয়ে গালিয়ে দিচ্ছে। হাতুড়ি আর ছেনির সংঘাতে মাঝে মাঝে একটা অলৌকিক শব্দ, যেন ঘণ্টা বাজছে। লোকগুলোর একজন নিশানাথকে দেখিয়ে কি বলল, বাকি কজন হা হা করে হেসে উঠল।

ফুটপাত ধরে এগোতে লাগল। গাড়ি বারান্দার তলায়, এমন কি খোলা আকাশের নিচে চাক বেঁধে বেঁধে মানুষ শুয়ে আছে। গায়ে মাথায় যা পেরেছে জড়িয়ে শুয়ে আছে। কে একজন নিশানাথকে দেখে উঠে বসল। তারপর উদাসীন অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিশানাথ ডান দিকে বাঁক নিল। সরু রাস্তা, আলো কম, মানুষ নেই। আবার একদল কুকুর কোথা থেকে দৌড়ে এসে নিশানাথকে অনুসরণ করতে লাগল আর মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বিলম্বিত স্বরে ডেকে উঠে আমূল ছুরিকাঘাতে সেই নৈশ গলিটার হৃদপিণ্ডে ক্ষত সৃষ্টি করল।

তারপর বাড়িগুলো আরও কাছে কাছে সরে এল। রাস্তাটা আরও সরু হলো। দুটো মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। এই পথটুকু সিমেন্টের এবং সর্বত্র ময়লা ছড়ানো। যেন একটা বাড়ির উঠোন। বাড়িগুলি জীর্ণ, ছুঁলে পড়ে যাবে মনে হয়। আর অন্ধকার। খানিক গিয়েই রাস্তাটা ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।

সেই বাঁকের মুখে প্রশস্ত একটি স্নানাগার। এ গলির পক্ষে অপ্রত্যাশিত, বেমানান। নিশানাথ ভেতরে ঢুকল। বৃহৎ শবাধারের মতো লম্বা চৌবাচ্চা। জল প্রায় নেই। তার ইচ্ছে হলো নেমে চুপ করে শুয়ে থাকে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল, শীত ধরল। নিশানাথ ত্রস্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আবার সরু গলি, লম্বা, ভৌতিক। হঠাৎ একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল। কয়েকজন একটা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে পলকে অন্তর্হিত হলো। নিশানাথ থমকে দাঁড়িয়ে তারপর খোলা দরজা দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। একটা ইঁদুর তার পা মাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল। নিশানাথ ওপরে উঠতে লাগল। জ্যামিতিক সিঁড়ি, কোথা থেকে আলো এসে পড়েছে। নিশানাথ ওপরে উঠতে লাগল।

তার পায়ে শব্দ নেই। আলো আর অন্ধকার স্পর্শ করে, আলোয় ছায়ায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে নিশানাথ ওপরে উঠতে লাগল। তারপর সিঁড়ি যেখানে শেষ হলো সেখানে অপ্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার ঠিক মাঝখানে একটি নারীমূর্তি আলোয় ছায়ায় নিজেকে মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা। একটি চোখের পল্লব চোখে পড়ে। নিশানাথ থমকে দাঁড়াল। মাথা নিচু করল। কিন্তু নারীমূর্তি স্থির, তার চোখের পাতা কাঁপল না। নিশানাথ কাছে গিয়ে দেখল মেয়েটি বন্দিনী। নিশানাথ তার চোখের ভাষা পড়তে চাইল। তারপর সামনে নতজানু হয়ে বসল। আলোয় ছায়ায় শরীর মিশিয়ে দিয়ে বন্দিনী দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিশানাথ আস্তে আস্তে যেন তার পদতলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এক মিশ্র অনুভূতিতে ঘুম ভাঙল। একটি ছোট্ট নরম শীতল হাতের স্পর্শে হঠাৎ চমকে জেগে গেল। সেই স্পর্শের অনুভবে মুহূর্তে বুঝতে পারল জ্বর হয়েছে। আর মনে হলো, তার যেন এই ঘরে থাকার কথা নয়। ক ল রাতে না কবে সে যেন কোথায়—চেয়ে চেয়ে দেখল। হ্যাঁ, সেই ঘরটাই। সেই কুৎসিৎ অভ্যস্ত এলোমেলো ঘর। আর কে যেন হাট করে জানলা খুলে দিয়েছে। অজস্র রোদ তার পায়ে বিছানায় পড়েছে। বেলা হয়েছে।

তারপর খুবই আশ্চর্য যে নিশানাথের মনে পড়ল আজ তার বাজারে যাওয়ার কথা। মন্দিরে যাওয়ার কথা। মনে পড়ল ছোটকুরা আসবে, বৌঠানেব সাধ। প্রত্যেকটি ব্যাপারই ছিল বিরক্তিকর। কিন্তু সকালে উঠে তার ব্যত্যয় দেখে নিশানাথের গা ছমছম করতে লাগল। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? আসলে কাল রাতে মা অথবা বৌদি—কারোর সঙ্গেই কি দেখা হয় নি? আজ কি হবার কথা ছিল না? আর হঠাৎ সে চোখের সামনে দেখতে পেল প্রখর দিবালোকে জলজল করছে প্রশস্ত স্নানাগার। তারপর—তারপরে যেন—যেন আমি—আহ্, সূর্যালোকে তপ্ত আর উজ্জ্বল আর প্রশস্ত সেই স্নানাগারে জল—ও, মনে পড়েছে, আমি স্নান করব।

নিশানাথ ধড়মড় করে উঠে বসল।

মন্টু বলল, তাই বলো। মটকা মেরে পড়েছিলে?

নিশানাথ দেখল মন্টু। অসহায়ের মতো যেন একটা অবলম্বন পেয়েছে

এমনিভাবে সে দুহাতে মন্টুকে জড়িয়ে ধরতে গেল। মন্টু ছিটকে সরে গিয়ে বলল, উঁহু। আগে দাও?

নিশানাথ যারপরনাই অপ্রস্তুত হয়ে বলল, এই যাহ্। আজও ভুলে গেছি।

মন্টু বলল, মিথ্যুক। রোজ রোজ ঠকাও।

নিশানাথ স্তব্ধ হয়ে মন্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। মন্টু বলল, চাই না যাও।

নিশানাথ হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল। আর হাসতে হাসতেই তার মনে পড়ল এ বাড়ির কানে তার হাস্যধ্বনি প্রায় অপরিচিত হয়ে গেছে। সবাই না ভয় পেয়ে যায়। আর একথা মনে পড়তেই সে আবার দ্বিগুণ জোরে হেসে উঠল। মন্টু একটু বা বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু হাসির ছোঁয়ায় তার বিস্ময় অন্তর্হিত হলো। মন্টুও হাসতে লাগল। দুজনের হাসি শুনে সাধনা দরজার বাইরে থেকে একবার উঁকি মেরে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল, তারপর হঠাৎ মনে পড়ায় মাথার ঘোমটাটা টেনে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মেজদা?

আর সাধনাকে দেখে নিশানাথ বুঝল নিশ্চয়ই কাল রাতে যার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তাহলে পাগল হইনি? নিশানাথ অতীব, অতীব পুলকিত হলো এবং আরো জোরে হাসতে শুরু করল। অগত্যা সাধনাকেও হাসিতে পেল। আর কাকীমাকে হাসতে দেখে মন্টু আরো বেশি হাসতে শুরু করল। নিশানাথ স্পষ্ট বুঝল এই মন্টুও জানে হাসার পেছনে একটা কারণ দরকার এবং সে কারণ তার কাকার হাসি হতে পারে না, পারে সাধনার হাসি। নিশানাথ মুহূর্তে অদ্ভুত হীনমন্যতা বোধ করল। এই মেয়েটি, অর্থাৎ কি না তার ভ্রাতৃবধূ, সে তার সম্মানার্থে হাসতে হাসতেও মাথার কাপড় ঠিক রাখছে—সেই ছোটকুর বউ যে তার শ্রদ্ধেয় ভাসুরটির থেকে নির্ভরযোগ্য বেশি, তা এই বালকও বোঝে। নিশানাথ হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল।

ততক্ষণে স্বর্ণ ঘরে ঢুকছে। বলল, কি হয়েছে? সবাই মিলে এত হাসছ কেন তোমরা? বলতে বলতে স্বর্ণও প্রায় হাসতে শুরু করবে এমন সময় নিশানাথ আচম্বিতে হাসি থামিয়ে বলে বসল, মন্টু আমায় বলল আমি মিথ্যেবাদী, আমি ধোঁকা দি।

শুনেই সাধনার মুখের হাসি বন্ধ হলো। সে চকিতে একবার স্বর্ণর দিকে

তাকিয়ে আস্তে আস্তে মন্টুকে কাছে টেনে নিল। মৃদুস্বরে বলল, গুরুজনদের এমন বলে?

মন্টু বলল, বারে। আমি তো ধোঁকা দাও বলি নি, আমি তো বললুম রোজ রোজ ঠকাও।

নিশানাথ চমৎকৃত হলো। সে ভেবেছিল মন্টু বলবে বেশ করেছি। বলবে মিথ্যেবাদীই তো। রোজ রোজ আনবে বলো আর রোজই ভুলে যাও? মনে মনে সে মন্টুকে মাল্যভূষিত করল।

সাধনা মন্টুকে বলল, যাও, পিসিকে কাকুর চা নিয়ে আসতে বলো।

মন্টু নিশানাথের দিকে একবার তাকিয়ে বাধ্য ছেলের মতো চলে গেল।

এক মুহূর্তে কেউ কোনো কথা খুঁজে পেল না। নিশানাথ বুঝল তার কিছু বলা দরকার। সম্মুখে বৌঠান ও ভ্রাতৃবধূ। ভ্রাতৃবধূটি দূর থেকে অনেকদিন পরে আজ এসেছেন। সুতরাং স্বভাবতই কিছু কুশল প্রশ্নাদি করা যেতে পারে। ভ্রাতৃবধূটি, পুনরপি, শিক্ষিত ও সমাজসচেতন। সুতরাং রাজনীতি নিয়েও আলোচনা চলে। ভ্রাতৃবর বাড়ির অমতে প্রেমজ বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক নিয়ে—না না, আমি তো আবার—ধন্য নিশানাথ, তুমি একজনের ভাসুর, তুমি একটি বধূর গুরুজন। বধূ শব্দটির অর্থ যেন আজই সে আবিষ্কার করল। কপালকুণ্ডলার মতো অস্ফুটে যেন বলল, বি-বা-হ। বাস্তবিক, তাহলে বিয়ে একটা ব্যাপার। আর কি বিরাট সে অভিজ্ঞতা। তাহলে এই বালিকা, সাধনা—সেও কত না অভিজ্ঞতার, আর সুনয়, সুনয়নী, কত না অভিজ্ঞতার, আর আমি নিশানাথ কত না অভিজ্ঞতার···আচ্ছা, ইন্টার-কাস্ট ম্যারেজ যে সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে এক অপরিহার্য ঘটনা এ নিয়ে যদি সাধনার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম দার্শনিক ধাঁচের আলোচনা উত্থাপন করি তাহলে হয়তো সবদিকই বাঁচে। কিন্তু বৌঠান নিশ্চয়ই তাতে অস্বস্তি বোধ করবে। কারণ এই মহিলাটির ছোটকুর বিয়েতে কম আপত্তি ছিল না।

স্বর্ণ বলল, ওঠো না ঠাকুরপো।

নিশানাথ ধড়মড় করে উঠে বসল। ইতিমধ্যে সে আবার শুয়ে পড়েছিল। বাসি মুখে সাধনার দিকে তাকাতে হঠাৎ তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। ভাবল এইবার নিশ্চয়ই এই ভদ্রমহিলা বাজারে না যাওয়ার জন্য তাকে অভিযোগ করবে। বৌমা সামনে আছেন, তাহলে কিন্তু আমি অত্যন্ত অপমানিতবোধ করব ইত্যাদি ভেবে নিশানাথ উত্তেজিত হবার চেষ্টা করল।

স্বর্ণ বলল, মনুটু কাল কি বলেছে জানো ?

ভীত নিশানাথ বলল, কি ?

স্বর্ণ বলল, বলছিল বড় হয়ে আমি কাকুর মতো হব। সব সময় শুয়ে থাকব আর বই পড়ব। স্কুলে যাব না, অফিসে যাব না, আমি বলেছি, আচ্ছা।

স্বর্ণ হাসতে লাগল। কিন্তু সাধনা হাসিতে যোগ না দিয়ে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের গা থেকে পুরনো দুটো মাসের পাতা ছিঁড়ে বলল, আপনার চাকরির ব্যাপারটার কি হলো ?

নিশানাথ বিব্রতভাবে বলল, কি আর হবে।

আপনি তাহলে মেনে নিলেন ?

নিশানাথ যেন জেরায় জবাব দিচ্ছে এমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব চোখে ফুটিয়ে বলল, কেন ?

বারে। পুলিশ রিপোর্টে চাকরি যাবে, কেন চাকরি গেল তার কোনো কারণ দেখাবে না—এ সবই তো সংবিধানের ফাণ্ডামেন্টাল রাইটসের বিরোধী। আপনি এ নিয়ে কেস করতে পারেন।

নিশানাথ বলল, লাভ কি ?

সাধনা একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল, লাভের সম্ভাবনা অবিশ্যি কম, তবে—

স্বর্ণ হেসে বলল, তবে কেস করে তুমি তো অন্তত দেখতে পারতে এরা কত খারাপ, এরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও—মানে, তোমার খরচে সাধনাদের খানিক প্রচার হয়ে যেত। কি বল্‌রে সাধনা ?

নিশানাথ অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, ঠিক সেইজন্তেই কেস করি নি। কিন্তু না করলে যে দাদার খানিকটে সুবিধে হয় একথা পরে বুঝতে পেরে না করার জন্য খুবই আপশোষ হচ্ছে।

স্বর্ণ বলল, সে কি ঠাকুরপো ? তোমার দাদার সুবিধে আবার কিসে করলে ? একটু বলো শুনি ! এ একটা খবর বটে।

আহ্‌ বৌঠান। এই সকালবেলাটা বিষাক্ত করে দিও না। তোমার উপস্থিতি, তোমার চাউনি, তোমার ঠোঁটের কোণের হাসি, আহ্‌ বৌঠান, তুমি যাও, বাস্তবিক, তোমার এই ধূর্তামি দেখলে আমার বমি আসে।

নিশানাথকে নীরব দেখে সাধনা উত্তর দিল, সে তো ঠিকই। মেজদা কেস করলে বড়দার ইলেকশনে একটু অসুবিধে তো হতোই।

স্বর্ণ যেন স্নেহভরে ছোট বোনকে শাসন করছে এমন ভঙ্গিতে সাধনার পিঠে আলতো চড় মেরে বলল, ওরে মুখপুড়ী, সেই জন্যেই বুঝি এদ্দুর থেকে দৌড়ে এসে মেজদা মেজদা বলে ঠাকুরপোকে উস্কানি দিচ্ছ? দাঁড়া, তোর বড় ভাসুরকে আজ বলছি। এমনিতে তো বউমা বলতে অজ্ঞান!

সাধনা একটুও না দমে হেসে বলল, তোমাকে আর বলতে হবে না। বড়দাকে আমি নিজেই বলব—আমি এসেছি আপনার এগেইন্‌স্টে ক্যাম্পেন করতে। আপনি কেন এদের নমিনেশনে দাঁড়াতে গেলেন। তুমিই বলো দিদি। বড়দা নিজে কতদিন কত সমালোচনা করেছেন। কত দুঃখ করেছেন। ডাক্তারী কলেজে ছাত্র ভর্তিতে দুর্নীতি, পড়ানোয় অব্যবস্থা, পাশ করলে ইনসিকিউরিটি; বেঁচে থাকবার জন্যে ডাক্তারদের রুগী হাতে রেখে চিকিৎসা করতে হয়, ওষুধে ভেজাল, প্রয়োজনের তুলনায় হাসপাতাল সংখ্যায় নগণ্য, যা আছে তাও যেন মর্গ, লাস্ট সেন্সাসে—

স্বর্ণ বাধা দিয়ে বলল, থাম থাম থাম। হ্যাঁরে, ছোট ঠাকুরপোর সঙ্গে তুই কি নিয়ে গল্প করিস বলতো? এই সবই বলিস নাকি?

সাধনা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। সে কথায় কথায় উত্তেজিত হয়েছিল। বিব্রতের মতো হেসে বলল, যাও। ইশারায় নিশানাথকে দেখিয়ে বলল, যা হচ্ছ না?

নিশানাথ বিমূঢ়ের মতো সাধনাকে দেখছিল। তার উত্তেজনা, তার লজ্জা দেখছিল। স্বর্ণ, মানে বৌঠান, কি ভাবে হেরে গিয়েও সাধনাকে থামিয়ে দিল এবং কিভাবে সাধনাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে আবার নিজেই যেন তাকে উদ্ধার করার মহত্ত্ব দেখাল ইত্যাদি প্রসঙ্গে ভাবনা করতে করতে করতে করতে নিশানাথ বিমূঢ়ের মতো এক দৃষ্টিতে সাধনাকে দেখছিল, এমতাবস্থায় ট্রেতে করে চা সাজিয়ে হৈমন্তী ঘরে ঢুকল। পেছন পেছন মন্টু। মন্টু এসেই সাধনার কোল ঘেঁসে দাঁড়াল।

স্বর্ণ বলল, যাও পড়তে যাও।

মন্টু বলল, না, আজকে—

নিশানাথ উদগ্রীব হয়ে শুনতে চাইল কি ভাবে মন্টু কথাটা শেষ করে। মন্টু কি বলবে আজ তোমার সাথে। আজ পড়ব না? মন্টু কি বলবে, মা, মন্টু কি বলবে, মা, মন্টু কি বলবে, মা……

নিশানাথ হঠাৎ উপলব্ধি করল নিঃশব্দে সে মাকে ডাকছে। মাকে ডাকছি আমি। রোমাঞ্চিত হলো। আর লজ্জা হলো, ভয় হলো, কেমন যেন উদ্বেগ

একটা। তার পলকে মনে পড়ল মা বলেছিল মন্দিরে যাবে। মা বলেছিল। মন্দিরে যাব। মা স্বপ্ন দেখেছে। আমার সর্বাঙ্গে গুটি। আমি কাকুর মত শুয়ে থাকব। পাগল হয়ে যাচ্ছি। মা কেন এল না? এত হাসি শুনে, আমাদের এত হাসি শুনে, আমার এত হাসি শুনেও মা কেন এল না? কাল রাতে কোনো কথা কি হয় নি? তবে সাধনা? সাধনা এখানে কেন? সাধনা কি এ বাড়িতেই থাকে?

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ; বন্ধুগণ বন্ধুগণ; আলো অন্ধকার সিঁড়ির ওপর বন্দিনী। নতজানু হয়ে বসেছিলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম। আ, ঘুম।

নিঃশব্দে মনে মনে জপতে লাগল—আমি কতকাল ঘুমোই নি। বড্ড আলো। আমি এবার ঘুমোব।

নয়

নিশানাথ বিস্মিত হয়ে বলল, কি ব্যাপার?

হৈমন্তী হাসল। বলল, ছোটবৌদি করেছে। ফাসক্লাস।

স্বর্ণ বলল, তবেই হয়েছে। চায়ের সঙ্গে খাদ্য? ঠাকুরপোর আর জাত থাকবে না।

নিশানাথ বলল কেন? বলেই বুঝল প্রশ্নটা ঠিক হলো না। হাত বাড়িয়ে ডিশটা নিতে গিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে লজ্জিত হেসে বলল, যাই মুখটা—

মন্টু হাততালি দিয়ে বলল, ওমা চায়ের আগে মুখ ধোয়। ওমা, চায়ের আগে মুখ ধোয়।

নিশানাথ দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে মন্টুর দিকে তাকাল। আ, মনে পড়েছে। রেস্টুরেন্টের সেই ছেলেটি—আর মন্টু হেসে আমার যাবতীয় ভেলচারকে এই ভাবেই উড়িয়ে দেবে। টেবিলের ওপর থেকে ব্রাশটা টেনে নিয়ে প্রায় চোরের মতো সে বেরিয়ে গেল।

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিশানাথ হাঁপাতে লাগল। কি ব্যাপার? আজ সকালে এরা আমার ঘরে একটা মনোরম পারিবারিক আবহাওয়া ফোটাতে চাইছে কেন? বিচার করতে চায় কি? আর মন্টু, আহ্ মন্টু—আমিই বা সাধনাকে এত মূল্য দিচ্ছি কেন?

বেসিনের কল খুলতেই তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। উজ্জ্বল সূর্যালোকে প্রশস্ত স্নানাগার সে দেখল, জ্বলছে। আর সিঁড়ি। বন্দিনী। কোথায়

দেখেছি? আলো-অন্ধকার, প্রতিমার মতো চিবুক, একটি চোখে পলক পড়ে না। এক হাতে শক্ত করে বেসিনটা চেপে ধরল। সামনে আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ল। অস্পষ্ট, কারণ আয়নার কাঁচ বহুদিন পরিষ্কার করা হয় নি, নিশানাথ অতীব, অতীব বিরক্ত হলো। সে লক্ষ্য করল বেসিনের কানাচ ভাঙা, একটা সোপ-কেসে সাবান নেই, অন্য একটায় শুকনো গোবর, ঝাঁঝরির কাছে দেওয়ালটি হলুদ, পাথর বসানো মেঝেয় যত্নের কোনো ছাপ চোখে পড়ে না। আর, কেমন একটা চাপা দুর্গন্ধ।

নিশানাথ নিঃশব্দে হাসতে লাগল। আমাদের বাড়ি, আমাদের পরিবার। এই কলকাতা শহরটা। মধ্যযুগীয় অথচ আধুনিক। আধা গ্রাম, আধা ইওরোপ। আর রুচিহীন সচ্ছলতা ও দৈন্য। নিঃশব্দে হাসতে লাগল। এই বাড়িটাকে ঘৃণা করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। তার মাথা-ধরাটা ছেড়ে গেল। নিশানাথ টিউব টিপে পেস্ট বার করল। টিউবের মাঝখানে কে টিপে রেখেছে। সে যারপরনাই খুশি হলো। চারদিকে অশিক্ষা ও যত্নহীনতার প্রগাঢ় ছাপ। বেশ সময় নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে দাঁত মাজল। তারপর রীতিমতো একটা ভঙ্গি করে যেন শতাব্দীকাল পরে দর্পণে নিজের দাঁতগুলির চেহারা নিরীক্ষণ করতে গেল। দেখল সবুজ থুতু রক্তধারার মতো তার ঠোঁটের কোণ বেয়ে নামছে। আর অস্পষ্ট একটা মুখ।

আমার সমস্ত রক্ত যদি সবুজ—মানে দূষিত, মানে আমি কি এতদিনে, যদিও জানি পেস্টের রঙ, তথাপি কে বলতে পারে সেই নায়কের মতো রক্তে আমার, সেই নায়ক, রক্তে আমার, মা বলেছিল আজ মন্দিরে যাবে, স্বনয় বলেছিল আজ তোমার জন্মদিন, আর প্রিয়গোপাল তার ডায়েরিতে আমাকেই দায়ী করে গেছে। তবু সাধনা বলল, আপনি মেনে নিলেন?

নিশানাথ অকস্মাৎ স্থির করল আজ সে সাধনাকে প্রকৃত অর্থে অপমান করবে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে বাইরে এল। লক্ষ্য করল দিব্যনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎকর্ণভাবে তার ঘরের হাসাহাসি, সংলাপাদি শুনছে। নিশানাথকে দেখে দিব্যনাথ অপ্রতিভ ভঙ্গিতে সরে গেল। নিশানাথ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে তার ঘরে ঢুকল।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার বসিয়ে এসেছি।

নিশানাথ গাম্ভীর্য সহকারে তার সদ্য পরিষ্কৃত খাটের ওপর রাজকীয় ভঙ্গিতে

বসে হাত বাড়িয়ে প্লেটের খাবারটি নিয়ে বলল, তারপর সাধনা, তোমাদের খবর কি ?

সাধনা মৃদু হেসে বলল, ভালোই।

ছোটকু কোথায় ?

উনি তো আসেন নি।

সাধনা কি তার স্বামীর নাম ধরে ডাকে না ? আড়ালেও না ? আর মিটিংয়ে বসে আলোচনার সময়ও কি বলে কমরেড উনি যা বললেন,—নিশানাথ মনে মনে দৃশ্যটি উপভোগ করে বলল, কেন ?

স্বর্ণ বলল, নারে, কাজের মানুষ তো।

মন্টু হেসে বলল, উঃ, যে না কাজ !

নিশানাথ মন্টুকে বলতে চাইল, চুপ। বলল, আজ ঠিক এনে দেব।

মন্টু বলল, চাই না।

হৈমন্তী বলল, ভুলে যাও তো কেন রোজ রোজ—স্বর্ণ বলল, থাম তো। ভারি একটা ব্যাপার যা মনে রাখতেই হবে আর ভুলে গেলে তোকে পর্যন্ত কৈফিয়ৎ—

নিশানাথ হঠাৎ বলল, তারপর, তোমাদের রাজনীতির—

সাধনা হাসল, মোটামুটি।

ইলেকশনে—

দেখা যাক।

নিশানাথ উত্তেজিত হয়ে বলল, কি দেখবে ? কেরালায়ও শিক্ষা হয় নি ?

সাধনা হেসে বলল, হয়েছে বৈ কি। মেজদা আপনাকে বলছি, কেরালায় আমরাই জিতেছি। ইতিহাস একদিন একথা বলবে।

হৈমন্তী বলল, চলো বৌদি। পলিটিকস।

স্বর্ণ বলল, বোস না একটু। শোনাই যাক—

নিশানাথ বলল, ইতিহাস ? তোমাদের এই এক মহৎ গুণ সাধনা। ইতিহাসের চরিত্র আর ভবিষ্যৎ শুধু তোমাদেরই নখদর্পণে। ঈশ্বর বিশ্বাসের মতো তোমাদের এই আরেক ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় বিশ্বাস।

সাধনা মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে বলল, মেজদা আপনিই একটা গল্প বলেছিলেন।

নিশানাথ পলকে সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, কি ?

যুদ্ধের সময় রোজ রাশিয়া হারছে, প্রত্যেকে বুঝতে পারছে আর রক্ষে নেই। আপনি সেই শিবানীবাবুর গল্প বলতেন? আপনাদের কোন ব্রাঞ্চ, না না, লোকাল কমিটির অফিস সেক্রেটারী ছিলেন? আপনিই বলেছেন ভাঙা অন্ধকার ঘরে নড়বড়ে একটা টেবিলের সামনে বসে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ভদ্রলোক রোজ বলতেন, উঁহু, অসম্ভব। আপনিই বলেছেন বঙ্কিমদার কথা! রোজ টেবিলে ম্যাপ খুলে পেন্সিল দিয়ে দাগ টেনে তিনি দুপক্ষের স্ট্রাটেজি বিচার করে গর্জে উঠতেন, উঁহু, অসম্ভব। মেজদা—এই বিশ্বাসের পেছনে অন্ধ বিশ্বাসই শুধু নেই—তা আপনি বেশ জানেন।

সত্য বটে, একদা এই গল্প বলেছি। একদা। কিন্তু সাধনা তা জানল কি করে? ছোটকু কি আমার সম্পর্কে তার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে? আর, দিব্য, সে বাইরে দাঁড়িয়ে কি শুনছিল?

নিশানাথ হাসি ফুটিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। নইলে প্রমাণ করতে পারতাম বিশ্বাস মাত্রেই অন্ধ, এমন কি বিশ্বাসহীনতাও এক বিশ্বাস এবং তা-ও অন্ধ। এবং এই অন্ধতাই জীবন।

সাধনা হেসে বলল, মেজদা, আপনি দার্শনিকতায় চলে যাচ্ছেন। তবে আমার দর্শনে অন্ধতা নেই, তা নিয়ত বিকাশশীল। তাছাড়া আপনি তো জানেনই, দার্শনিকতা প্রচুর হয়েছে। এখন দি কোয়েশ্চেন ইজ টু চেঞ্জ।

নিশানাথ অপলক তাকিয়েছিল। সাধনার স্পর্ধিত বিনয়, অসংকোচ প্রত্যয়ে সে অতীত দেখছিল। তার নিষ্পাপ অতীত। গ্রন্থে, অভিজ্ঞতায়, বিশ্বাসে এমনই বিশ্বাসী ছিলাম। এমনই পবিত্র। সমস্ত পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিজের মুঠোয় পেতাম। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার ছিলাম আমি, আমরা। তারপর ঘা খেয়ে খেয়ে, ঘা খেয়ে খেয়ে, ঘা খেয়ে খেয়ে পাঁকে ডুবে গেলাম। বুঝলাম কি সীমাহীন অন্ধতাকে, কি ব্যাপ্ত মূর্খামিকে পবিত্র বিশ্বাস বলে আঁকড়ে রেখেছিলাম। বুঝলাম সেই যে বিশ্বাস, আমি বদলে দেব, আমি ইতিহাস হব—আসলে কি ভ্রান্ত, ফাঁকা। বুঝলাম কিছুই আমরা করি না—আমাদের করানো হয়।

নিশানাথ বলল, বেশ বললে, টু চেঞ্জ। বাট মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড—হু ইজ টু চেঞ্জ, হোয়াট ইজ টু চেঞ্জ? মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড—তুমি এখনো শিশু। কদ্দিন পার্টি করছ?

সাধনা মুখ তুলে দীপ্ত চোখে বলল, মেজদা, এই কথাটি আপনাকে বলছি, আমায় ক্ষমা করবেন। হ্যাঁ, বয়েস আমার কম, অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু

আপনি তো জানেন বয়েস বা অভিজ্ঞতার দুয়েরই কোনো শেষ নেই। আমি দেখেছি আমাদের মধ্যেও পুরনো কেউ কেউ এই একই কথা বলে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

সাধু সাধু ভ্রাতৃবধূ! হাততালি দেব কি? ঠিক এইভাবে, ভ্রাতৃবধূ, ঠিক এইভাবে একদিন আমি, আমরাও বয়েস এবং অভিজ্ঞতা শব্দ দুটিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছি। সাধু সাধু ভ্রাতৃবধূ। ঠিক এইভাবে একদিন আমি, আমরা নিজেদের বিশ্বাসের কাছে অনুগত থাকার স্পর্ধা অর্জন করেছি। তাহলে একটা গল্প বলি শোনো। তোমার এই চাকর সদৃশ ভাসুরটিও একদা অনুরূপ এক মতবিরোধের কালে শ্রদ্ধাস্পদ মাস্টার-মশাইকে বলেছিল পাড়ার মোড়ের বুড়ো কনস্টেবলেরও বয়স অনেক, তার কপালের ভাঁজেও অনেক অভিজ্ঞতা। শুনে তিনি স্তব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর চোখে বেদনা প্রকাশ পেল। আমি পুনরপি বলেছিলাম, আসলে এ আপনার এসকেপিজম, আপনার সিকিউরিটির লোভ। তাকে র‍্যাশনা-লাইজ করেছেন অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি এবং বয়েসের দোহাই পেড়ে। আর শোনো ভ্রাতৃবধূ, তারপর প্রবল উপেক্ষায় আমি চলে এসেছিলাম, গর্ব করে সকলকে বলেছিলাম গল্পটা। প্রত্যেকে তাঁকে ঘৃণা করেছিল। বিদ্রূপ করেছিল। কিন্তু তারপর একদিন আমাদেরই ভুল স্বীকার করতে হলো।

নিশানাথ অসংলগ্নভাবে, উত্তেজিতভাবে শুরু করল, অনেক জ্বালায় বলি সাধনা, তুমি বুঝতে পারবে না। আমি জানি বয়েসের দোহাই দেওয়াটা এক ধরনের অশ্লীলতা (ভাল্‌গারিটি বলা উচিত ছিল কি?)। অনেকগুলো বাঁক পেরিয়ে আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আমার বয়েস কয়েক শতাব্দী। অথচ সামনে কিছু নেই, পেছনটাও ফাঁকা। তুমি বুঝতে পারবে না সাধনা।

নিশানাথের আরক্ত মুখের দিকে সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। এমনকি মন্টুও। সাধনা ক্ষণেক নীরব থেকে আস্তে আস্তে শুরু করল, বুঝি মেজদা। কিন্তু এই তো নিয়ম। ভুল তো হবেই। পৃথিবীর—

ভুল? নিশানাথ চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল, তুমি তো দেখ নি, সেই উন্মাদনা, সেই ত্যাগ, সেই অমানুষিক অত্যাচার আর বর্বরতার সামনে, আহ্‌ সাধনা, তুমি তো দেখনি—শত শত নিষ্পাপ বিশ্বাসের ওপর দিয়ে ঐতিহাসিক অনিবার্যতার রথে চাকা চলে গেল। আর হতবাক একদিন বুঝলাম সমস্তটাই ভুল। অথচ কত সঙ্গী মরে গেল, কিছুজন পঙ্গু হলো

হতাশায় গ্লানিতে ক্ষোভে কেউ বা ক্লীব হলো। তুমি তো জানো না সাধনা। ভাই ভাইকে শাস্তি দিয়েছে, কারণ সে জানত বদলাতে হবে। পুত্র মাকে কাঁদিয়েছে, পিতা সন্তানকে মরতে দেখেও ফেরে নি, প্রেমিক প্রেমিকাকে মিছিলে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছে—সাধনা, তুমি কি জানো না? তোমরা এখন ইলেকশন করো, শান্তি আন্দোলন করো, পাঁসফুল সহাবস্থানের জন্য নেহরুর সামনে কুর্নিশ জানাও। সাধনা, পুলিশের বুটের তলায় তোমার প্রিয়জনের হাত পিষ্ট হতে দেখেছ? জেলখানায় যে ব্যারিকেড বানিয়ে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, চল্লিশ দিন অনশন করে হার মানে নি—হঠাৎ যখন তাকে বুঝতে হয় সবটাই ভুল, তার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছ সাধনা? তাদের কেউ আজ কেরানী, কেউ মাস্টার, কেউ বা উন্নতির জন্য এই বয়েসে পরীক্ষায় বসে—তুমি তাদের চেনো সাধনা? উজ্জ্বল ছেলে—সব বিসর্জন দিয়ে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পরাভূত, একদিন সব ছেড়ে আবার ঘরে ঢুকতে চাইল, পারল না, আত্মহত্যা করে তাকে ভুলের মাশুল দিতে হলো—কারণ নিজেকে সে ভাবত ঘাতক, ভাবত এই সামগ্রিক ভুলের দায়িত্ব থেকে সেও রেহাই পেতে পারে না। যে বন্ধুটি তাকে এই কথা বুঝিয়েছিল মৃত্যুর জন্য তাকে সে দায়ী করে গেল, বন্ধুকে ঘৃণা করে গেল। আর সেই বন্ধুটি! তুমি দেখেছ সাধনা বিশ্বাসের মৃত্যু, ঘৃণার জন্ম, সন্দেহ আর অপরাধবোধের নিয়ত অস্তি।

সাধনা আস্তে আস্তে বলল, মেজদা, আপনার যন্ত্রণা আমি বুঝি।

নিশানাথ বলল, একটা ভুল করো না। যা বললাম, এ সবই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়। সেই আমলেও আমাকে এত সইতে হয় নি। তবে দেখেছি, শুনেছি। ভুগেওছি কিছু। আমি একটা জেনারেশনের কথা বললাম। আরও আছে সাধনা। পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষ মার খাচ্ছে। মার খাচ্ছে আর একটা নিশ্চিত অকুণ্ঠ বিশ্বাসে ধ্রুবতারার মতো একটি দেশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, একটি জানলার দিকে, যেখানে বাতি জ্বলে আর একখানি মুখ অতন্দ্র প্রহরা দেয় পৃথিবীকে। সেই জানলায় তোমরা পর্দা টেনে দিলে, সেই বাতি তোমরা নিভিয়ে দিলে। নিজের দেশে ভুল হলেও এতদিন জানতাম অনির্বাণ শক্তি আছে পৃথিবী জুড়ে, আমি একা নই। আমি জানলাম সেখানেও ভুল, সেখানেও সংশয়। ঘরে বাইরে মানুষ আজ একা। তার কোনো অভিভাবক নেই। সভ্যতার, মনুষ্যত্বের এত বড় সংকট পৃথিবীর ইতিহাসে আগে আসে নি সাধনা।

বলো ভ্রাতৃবধূ, উত্তর দাও। তোমার দীপ্ত মুখ প্রত্যয়পূর্ণ চোখ এবার নত হোক। অকুণ্ঠ আত্মবিশ্বাসে মুখ তুলে তাকানো আমি দেখতে পারি না। সব ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে—এই একটা ভাব করে ঘুরে বেড়ানো, আ অশ্লীলতা। এর থেকে বৌঠান সহনীয়। সে ছোটো, তার সমস্যাও ছোটো। বুঝতে পারি। কিন্তু চূড়ান্ত বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও তোমাদের এই নিরুদ্বেগ থাকার ঔদ্ধত্য সহ্য হয় না। ভ্রাতৃবধূ, স্বীকার করো, আজ ঘরে বাইরে আগুন। স্বীকার করো আশা করার কিছু নেই, তবে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

না মেজদা, সাধনা বলল, আমি মানতে পারলাম না। পৃথিবীতে এত বড় সংকটের দিন আর আসে নি, একথা সত্যি। আবার এতবড় সম্ভাবনাও এর আগে এমন বাস্তব চেহারা ধরে নি। মানুষ জিতেছে। প্রকৃতিকে সে ক্রীতদাস করেছে। এখন স্বর্গলোকে তার যাত্রা। মানুষ জিতেছে মেজদা। মহাকাশে উপনিবেশ গড়ছে সে। এর তাৎপর্য কি করে ভুলি? আমি জানি আপনি বলবেন, তাতে পৃথিবীর সমস্যা কি মিটেছে? না মেটেনি। কিন্তু দেখেছেন কি মানচিত্র কি দ্রুত পাল্টাচ্ছে? দেখেছেন কি আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি আজ কোন্ দিকে? আমি আপনাকে অঙ্ক কষে হিসেব করে দেখাতে পারি পৃথিবী থেকে উপনিবেশবাদ নিশ্চিহ্ন হতে বাকি নেই। মানুষ স্বাধীন হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় পুঁজিবাদ ক্রমশ কোণঠাসা। আজ পৃথিবীর ভাগ্য এতদিন যে বিধাতাদের হাতের মুঠোয় ছিল, নিজেদের মর্জি মাফিক এতদিন যারা দেশ ও মানুষের নিয়তি বাঁটোয়ারা করে নিত—আজ তাদেরই চোখের সামনে সমাজ-তন্ত্র এক বিশ্ববিধান। আজ পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণের প্রকৃত ক্ষমতা সমাজ-তন্ত্রেরই হাতে। দু-দুটো মহাযুদ্ধ বাধিয়ে, একের পর এক ষড়যন্ত্র করেও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি রুদ্ধ করা গেল না। আপনি বললেন জানলা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, আলো নিভিয়েছি? না মেজদা, না, দেশে দেশে জানলা খুলে যাচ্ছে, আলো জ্বলে উঠছে। মানুষ মহীয়ার মতো লড়েছে এবং এখনও মুখ তুলে তাকিয়ে দেখছে ধ্রুব নক্ষত্র আছে—শুধু ক্রেমলিনে নয়, পিকিংয়ে, দেশে দেশে। আপনি বললেন আন্তর্জাতিক আন্দোলনে ভুলের কথা। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, আমারও ভিতটা কেঁপে উঠেছিল। হ্যাঁ, আমিও চিন্তিত। কিন্তু আপনি তো জানেন এতৎসত্ত্বেও পৃথিবীর একাশিটি পার্টি আজও সাম্যবাদের মূল নীতিগুলিতে ঐক্যবদ্ধ। আপনি তো জানেন এই আকস্মিক বিরোধের পরও পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রই জয়লাভ করছে। হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি, কোন

অভিভাবক নন, কোনো একটি মাত্র দলও নয়। আসলে মার্কসবাদ, সমাজতান্ত্রিক শিবির, মানুষের শুভবুদ্ধিই ইতিহাসের অভিভাবক। তাই আমেরিকার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে কিউবা আজ বিপ্লবের পথে, সুয়েজ থেকে ব্রিটিশ রণতরী পালায়, ভিয়েৎনামে হো চি মীন রূপকথা হন—কেউ একা নয়। তাই চোখের সামনে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস দেখে শুধু বিলাপ করে আর মৃগী রোগীর মতো হাত পা ছোঁড়ে কিন্তু ইতিহাসের মুখ ঘোরাতে পারে না। ভুল করা আর বিভক্ত হওয়া এক নয় মেজদা। সমাজতন্ত্র একটা জীবন্ত ব্যাপার। মার্কসবাদের নিয়মেই সমাজতন্ত্রের প্রয়োগে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। মার্কসবাদের নিয়মেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেও কনট্র্যাডিকশন ইনএভিটেবল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবির আজ সাবালক, তাই সে প্রকাশ্যে ভুল আলোচনা করে, স্বীকারকরে—যাতে তার অভিজ্ঞতা দেখে অন্য দেশে তার পুনরাবৃত্তি না হয়। তা ছাড়া কত বড় পার্টি ও কি সীমাহীন আত্মবিশ্বাস থাকলে এই ভুল প্রকাশ্যে তুলে ধরা সম্ভব দেখেছেন? মানব নিয়তি সম্পর্কে কতখানি আগ্রহ থাকলে এই ভুল স্বীকার করে অন্যদের সাবধান করে দেওয়া সম্ভব ভেবে দেখেছেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আত্মসন্তুষ্টির ভাব ভেঙে দিতে পারে সমাজতন্ত্রই। কোনো ব্যক্তি বা পার্টিকে অভিভাবক ভেবে নাবালক সেজে থাকার চেয়ে বড় হও, নিজের বাস্তব অবস্থার অনুধাবন করো, ভুল করতে করতেও বড় হও, তোমার বিপ্লব তোমাকেই করতে হবে—তা বোঝা—এই শিক্ষাকে আপনি সংকট বলেন? সব থেকে মানবিক দর্শন ঐতিহাসিক কারণে যে গোঁড়ামির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল—তার থেকে মুক্তি চাইছে—শিল্প বিজ্ঞান, জীবনের সর্ব দিকে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে—একে আপনি অভিনন্দিত করবেন না?

সাধু ভ্রাতৃবধূ, সাধু। চমৎকার বলেছ। ওজস্বিনী বক্তৃতা, ঘোমটাটি খসে পড়ায় কানের পাশে চুলের গুছি কুঁড়ির মতো যেন বা ফুল হয়ে ফুটবে। সাধু ভ্রাতৃবধূ, সাধু। যদিও উত্তেজনায় তোমার বক্তব্য এলোমেলো, যদি তোমার মূল পয়েন্ট সম্ভবত ঠিক থাকলেও তা যথেষ্ট যুক্তিসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারো নি—তথাপি তোমার দীপ্ত ভঙ্গি ও সুষ্ঠু ভাষা প্রয়োগ সত্যিই প্রশংসার্হ।

সাধনা বলল, আর আমাদের দেশের কথা? মেজদা, আপনার কি ধারণা আমরা খুব সুখে রাজনীতি করি? স্কুলে, কলেজে, সরকারী অফিসে কারোর ভাই কমিউনিস্ট হলেও তার চাকরী হয় না। আপনি নিজের কথা

ভেবে দেখুন। সেই কবে কি করেছেন, আজ দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই—তবু পুলিশ রিপোর্টে আপনার চাকরি গেল। আমাদের দেশে ধনতন্ত্র ক্রমশ ম্যাচিওর হয়েছে। ছলে বলে কৌশলে শ্রমিক আন্দোলনকে সে পর্যুদস্ত করতে চায়। একদিকে তার প্রলোভন—অন্যদিকে তার অমানুষিক উৎপীড়ন। আপনি জানেন, মেজদা, কতদিন আপনার ভাইকে আমি পয়সার অভাবে—আপনি জানেন মেজদা গাঁয়ে কি কষ্টে আমরা থাকি। আপনি জানেন আজ এই বাজারেও পঞ্চাশ টাকা মাইনে নিয়ে কত কর্মী দিন কাটাচ্ছে। যারা অনায়াসে সুখে থাকতে পারত, যাদের প্রাক্তন সঙ্গীরা আজ যথেষ্ট আরামে দিন কাটায়—সেই তারা কত কষ্টে আর কি বিশ্বাসে লড়াই করছে। আপনার ধারণা আমি শুধুই ইলেকশন করি, শান্তি করি। মেজদা, এগুলিও তো আন্দোলন। শান্তি আন্দোলনের সার্থকতার ওপর পৃথিবীর অস্তিত্ব নির্ভর করে। কলকাতার দেওয়ালে কাঁচা হরফে খবরের কাগজে লেখা শান্তির পোস্টার দেখে যাঁরা একদিন হেসেছিলেন, পৃথিবীব্যাপী শান্তি আন্দোলনের প্রসারে তাঁরাও আজ স্তব্ধ। তাই ধনতন্ত্রকে যেমন সমাজতন্ত্র, তেমনই শান্তির বুলি আওড়াতে হচ্ছে। এই তো আন্দোলনের সার্থকতা মেজদা। তা ছাড়া গাঁয়ে যান, কারখানায় যান—আপনি দেখবেন মালিকপক্ষ, পুলিশ আর গুণ্ডার অত্যাচারের সীমা নেই। একদিনের বীরত্ব নয়, একটা সময়ের লড়াই না, প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত এই অত্যাচার আর গুণ্ডামীর সঙ্গে লড়াই করে কাজ। মেজদা আপনি ভুলে গেছেন ট্রাম, শিক্ষক, খাদ্য আন্দোলনের কথা। কত রক্তপাত, কত অশ্রু। বুঝি আপনাদের যন্ত্রণা। কিন্তু সরে থাকা, ভয় পাওয়া কি সমাধান? মেজদা', পৃথিবীর কোন্ দেশে মুক্তির আন্দোলনে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি? কোন্ দেশেই বা মুক্তির আন্দোলন প্রথমাবধি নির্ভুল সরল ছিল? কোন্ দেশেই বা রাতারাতি বিপ্লব হয়েছে? ভুল কি শুধু আপনারাই করেছেন? আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কি অজস্র ভুলের ইতিহাস নয়? আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কি অনুরূপ ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ইতিহাস নেই? আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কি খণ্ডিতভাবে হলেও শেষ অবধি সফল নয়? আপনি কি চেয়েছিলেন মেজদা? দেশের মুক্তি, মানুষের মুক্তি? তার মূল্য তো দিতেই হবে, দিতেই হয়। ইতিহাস তো ভুলে যাবে। ভুলে যায়। তবু কি মানুষের কর্তব্য থেকে সরে যাবার অধিকার আপনার আছে, উপায় আছে? মেজদা,

লেফ্‌ট্ পিরিয়ডের যে দু-একজনের কথা বললেন, শুধু কি তাঁরাই সত্য? আর কয়েক সহস্র মানুষ—যাঁরা তারপর নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন, একেবারে গোড়া থেকে শুরু করেছেন—তাঁদের কথা ভোলেন কি করে? যাঁরা ভেবেছিলেন কালই বিপ্লব হবে—যাঁরা সেই আবেগে যে কোনো ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন—তাঁরা আবার সর্বত্র নতুন করে ছড়িয়ে পড়েছেন। আন্দোলন করছেন। বিপ্লব ভাবাবেগ নয় মেজদা। তার পেছনে বৈজ্ঞানিক কার্য কারণ সম্পর্ক আছে। বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত কোনো ঘটনা নয় মেজদা, তার বাস্তব সম্ভাবনাকে বাস্তব আকার দিতে হয়। তাই ঠিকই বলেছেন। আমাদের অনেকেই আজ নতুন করে পরীক্ষা দিচ্ছেন, চাকরি খুঁজছেন—তার কারণ আমরা বুঝেছি এখন বেঁচে উঠতে হবে আর সেই সঙ্গে নিয়ত, অবিরত সংগ্রাম। আজ বেঁচে থাকাটাও সেই লড়ায়ের অংশ।

আহ্ অশ্লীলতা। নিশানাথ অতীব বিরক্ত হলো। লড়াই, সংগ্রাম, বাস্তবতা এই সব বহু ব্যবহৃত শব্দগুলি শুনলে গা বমি বমি করে। শব্দতত্ত্ব বিষয়ে কিছু বক্তৃতা দেব কি? আসলে ভাত্রবধূ, আমি জানি যে কোনো বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি তৈরি করা যায়। তা ছাড়া ডায়ালেকটিক্স্ এমনই এক দৈব ওষুধ যাতে কোনো ঘটনাই ব্যাখ্যার অতীত নয়। সোভিয়েতের সাফল্য, ব্যর্থতা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র—সবই তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো। আসলে বিশ্বাস। তাই বলছি ভ্রাতৃবধূ, আমি জানতাম কি বলবে। তোমার কথাগুলি আমিই আরো যুক্তিসহ বলতে পারি। কিন্তু ঘণ্টা পড়ে গেছে। এর থেকে বৌঠানের সঙ্গে কিছু ছ্যাবলামি করা যাক।

অবশ্য বৌঠান ও হৈমন্তী অনেক আগেই উঠে গেছিল। মন্টু ঘরের দেয়ালে একটা পিঁপড়েকে হাতের কৌশলে অনর্থক দৌড় করাচ্ছিল। নিশানাথের খুব ক্লান্তি লাগল। অথচ সাধনার মুখে চোখে বিরক্তি, ক্লান্তির কোনো ছাপই নেই। সে যেন আরও কয়েক ঘণ্টা অনায়াসে তর্ক করতে পারে। নিশানাথের অতীব রাগ হলো। এই সমস্ত ক্রুসেডাররা সময়ে কিছুতেই হার মানবে না। পরে যেদিন পেছন ফিরবে, দেখবে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

বৌমা এই ঘরে? মচমচ করে জুতোর শব্দ তুলে গম্ভীর ডাক দিয়ে কৃপানাথ ঘরে ঢুকল। নিশানাথ প্রায় স্তম্ভিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। সাধনাও তাড়াতাড়ি ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর হেঁট হয়ে বড়দাকে প্রণাম

করল। কৃপানাথ বলল, তারপর কি খবর? হাউ ইজ ভাট প্রেটি ইয়াং চ্যাপ?

সাধনা মৃদু হাসল। কৃপানাথ ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, হরিবল। নিশানাথের দিকে তাকিয়ে বলল, ঘরের কি চেহারা? অসুখ নাকি?

নিশানাথও ভাববাচ্যে উত্তর দিল, না।

হৈমী, হারি আপ।

হৈমন্তী আর স্বর্ণ একটা টেপ রেকর্ডার মেসিন ঘরে নিয়ে এল। কৃপানাথ বলল, বৌমা, আমার ইলেকশান স্পীচের টেপ। তোমার মতো তো নয়। জীবনে এই প্রথম বক্তৃতা দিচ্ছি। ভালোই হলো। এসে গেছ। তুমি নিজে শুনে বলো কেমন বক্তৃতা দি।

স্বর্ণ খিলখিল করে হেসে বলল, পোড়াকপাল। শেষে বৌমার সার্টিফিকেট্।

কৃপানাথ বলল, হোয়াট্ ইন স্যাট? বৌয়ের সার্টিফিকেটের দিন কি চিরকালই চলবে? তাছাড়া তোমরা কি বুঝবে বক্তৃতার?

হৈমন্তী বলল, ও, আমরা বুঝব না, বুঝবে শুধু বৌদি? ঠিক আছে, চলো বৌঠান, আমরা যাই।

কৃপানাথ বলল, ইউ বুড়ি। ডোণ্ট বি ফুল। যাও মাকে ডেকে নিয়ে এসো। হোয়্যার ইজ সী, বাসন্তী? অরু কোথায়? অহ্ ইয়েস, মেজবাবুকেও ডাকো। আচ্ছা, না হয় দাদারের ঘরে গিয়েই সকলে—না না থাক। মনটু এখানে এসো। তোমার বাবার বক্তৃতা। বুঝলে, আমার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে শোনো।

নিশানাথ বিমূঢ়ের মতো তার দাদার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রৌঢ় দাদা, বোধহয় একযুগ বাদে তার ঘরে ঢুকলেন। নিশানাথ লক্ষ্য করল দাদার কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে। আর তাঁর পৃথিবীতে কোনোই বদল নেই। এখন টেপ রেকর্ডে তাঁর বক্তৃতা শুনতে হবে। তার ইচ্ছে হলো সকলের মুখের ওপর হা হা করে হেসে ওঠে। বা তার মনে হলো সে যেন স্বপ্ন দেখছে। বা সকলে যেন তার চারপাশে জড়ো হয়েছে কি একটা গভীর উদ্দেশ্যে। অথচ মা এখনও এল না। তাহলে কি বাস্তবিকই কাল কোনো কথা হয় নি। বৌঠানের সাধ? সচ্ছল সুখী নিরুপদ্রব দাদা সামাজিক সম্মানের পথে ঝুঁকেছেন। ইলেকশনের বক্তৃতা শিওর আকর্ষে

টেপ করে বাড়ির সকলকে শোনাতে চাইছেন। আর দাদা, কত খুসী তুমি। বৌঠান, তোমার গর্ব আনন্দ গোপন করার চেষ্টার রূপটি কি অপরূপ। স্বামীগর্বে গর্বিতা, আ বৌঠান, তুমিও এই মুহূর্তে কত সুন্দর। আর সাধনা, কেমন বিব্রত অথচ সস্নেহ দৃষ্টিতে বড়দাকে দেখছে। যদিও সে ঘৃণা করে। আমি? ঘৃণা নেই, আসক্তি নেই, আমি, হায়, এখন কি করব?

তারপর বিশ্রী একটা শব্দ করে মেসিন চলতে লাগল। নারীকণ্ঠে গান। স্বর্ণ খিলখিল করে হেসে উঠে সাধনার পিঠে চিমটি কেটে বলল, হ্যাঁ গা, গলাটা এমন পেলে কোথায়?

কৃপানাথ খুব খুশী হয়ে বলল, ইডিয়ট। এটা একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত। তারপর তো বক্তৃতা। দেখো বৌমা, তোমাদের যা ঠুকেছি না।

নিশানাথ অপলক ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। এখানেও দুটি পক্ষ। দাদা আর সাধনা। বৌঠান স্বামী গর্বে গর্বিতা। মন্টু, বোধহয় ও সাধনার পক্ষ। আর আমি? একা।

তারপর কৃপানাথের বক্তৃতা সুরু হলো।

দশ

আমি ভেবে দেখেছি, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র হলো হিজিবিজবিজ। সেই যে সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল জীবটি—অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যা ছিল যার, পৃথিবীর তাবৎ নদীর জল ডাঙায় উঠে এসে যাবতীয় স্থলভূমিকে পেছল করে দিলে প্রতিটি মানুষ যখন আছাড় খেয়ে পড়বে—কল্পনায় সেই দৃশ্য দেখে গাছতলায় হাত পা ছুঁড়ে হেসে যে আকুল হয়েছিল—বাস্তবিক তার তুল্য ঋষি-দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা আছে কার?

দাদা মহাশয়, তোমার এই আত্মতৃপ্ত-গৃহস্থমার্কা হাসি আর বুড়ী বেশ্যার ব্রতকথা আওড়াবার ঢঙে বক্তৃতা—আহ্ অশ্লীলতা! যদি হিজবিজবিজের মতো হাত-পা ছুঁড়ে, সর্বনাশ, যদি হেসে উঠি, পালাও নিশানাথ, পালাও। এরা সকলে তোমাকে চিড়িয়াখানার জন্তু ভেবে ফুর্তি করতে ঘিরে বসেছে। অহো বন্ধুগণ, আমার দাদাও একজন ওরেটর? তিনিও রাজনীতির ভাবনায় ভাবিত! ভোট চাইছেন ভদ্রলোক—ভোট চাইছেন দেশবাসীর কাছে, দেশবাসীর কারণে। দাদা, তোমার বৌঠান আছে, মন্টু আছে, ডাক্তারি আছে, এই প্রাচীন বাড়িটা আছে—দেশও আছে। আমার কিছু নেই। দাদা, তুমি কত সুখী। এই নির্বোধ উক্তিগুলো টেপ করে এনে বাড়ির সকলকে তোমার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে

পারছ, কি সরল তুমি, দাদা, তোতাপাখির মতো মুখস্থ করে এই যে কথাগুলি বলছ, দাদা তুমি জানো না—তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার কাছে ক্লাউনের মুখের এক-একটি মুদ্রা। বেড়ে সার্কাস খুলেছ দাদা। বেশ, না হয় উপভোগই করা যাক।

টেপ রেকর্ডে কৃপানাথের নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা নিশানাথ কিছুই শোনে নি। সবে যখন বিরক্তি কাটিয়ে ব্যাপারটা শোনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—ঠিক তখনই বক্তৃতা শেষ হলো। কৃপানাথ একবার স্বর্ণর দিকে তাকাল, ভাবটা—আর খেলবে? তারপর আড়চোখে নিশানাথকে দেখে নিয়ে মন্টুকে বলল, কিরে? তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখে বড় হ। তা হলে তো তুইও এরকম ইলেকশনে—

নিশানাথ সেই মুহূর্তে কৃপানাথের কণ্ঠে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখল। সে ভেবেছিল দাদাকে বোকা বুঝিয়ে ওরা নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজকাল ডাক্তার, ব্যারিস্টার, অধ্যাপক, সাহিত্যিকের নির্বাচন উপলক্ষে বাজার-দর আছে। সে ভেবেছিল ওরা দাদার অর্থ ও পেশাগত জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে দাদাকে পুতুল খেলাচ্ছে। কিন্তু এখন নিশানাথ স্পষ্টই বুঝল—দাদার সামনে এক নতুন জগতের দরজা খুলে গেছে। আর দাদা এমনকি বংশ-পরম্পরায় সেই জগতে অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছে। একদিন দাদার স্বপ্ন ছিল সফল ডাক্তার হওয়া। প্রথম সন্তানরূপে এই বিচিত্র পরিবারটির জটিল সমস্যার গুরুভার নিজের কাঁধে বহন করা। তাদের এই প্রাচীন, বিবর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু বাড়িটাকে বন্ধক মুক্ত করা। বাড়িটা নতুন করে সারানো। নিশানাথ কোনোদিন, কোনোদিন ভাবতেই পারে নি এই বাড়ি, এই পরিবার ও গার্হস্থ্যধর্ম ছাড়া দাদার সামনে আর কোনো সমস্যা আছে।

আজ দাদা ভাবছে সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা। বংশগত আভিজাত্যে আজকাল চিঁড়ে ভেজে না। অতীত মানুষ সহজেই বিস্মৃত হয়। বলাই বাহুল্য আজ কৌলিন্য শুধু অর্থের। কিন্তু ভারতবর্ষে মনোপলি ক্যাপি-টালিজমের যুগ এসে যাচ্ছে। ছাতু খেয়ে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আজ আর আলামোহন দাস হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে শত শত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর প্রতিষ্ঠাবাসনা ও অহমিকা চরিতার্থ হওয়ার পথ কি? ধনতন্ত্র নিজেই সে পথ খুলে দিল। নতুন জীবিকা তৈরি হলো—রাজনীতি বা সংস্কৃতি করা। দেশের লুপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের জন্য বৎসরব্যাপী

আয়োজন, অনুষ্ঠান আর নানা লোকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও পরিবার পোষণের কারণ। তেমনই রাজনীতি। যার সাফল্য প্রত্যক্ষতর।

আর সদা অসন্তুষ্ট অথচ সহজে তৃপ্ত মধ্যশ্রেণী এই দুটি সহজ কারণে নিজেদের যাবতীয় প্রতিভা ও সামর্থ নিয়োগ করে আসলে ধনতন্ত্রেরই নিরুপদ্রব বিকাশের সহায়তা করছে। এই সৌখিন সেবকবৃন্দের অনেকে কোনোদিনই জানল না, অনেকে জেনেও মেনে নিল যে তারা বস্তুত পুঁজিবাদেরই ভৃত্য। দল, নির্বাচন, সংবিধান ও গণতন্ত্র নিজের হাতে পরিচালনা করে রথ ভাবল আমি দেব, পথ ভাবল আমি। কিন্তু অন্তর্যামী আড়ালে হেসে আরও বেশি বেশি তাদের মাথায় এই দেবমহিমা সঞ্চারিত করে দিল। চিরদিনই মধ্যশ্রেণী নকল বিধাতা হয়ে খুশি।

দাদা মহাশয়, এবার তুমিও বিধাতা হতে চাও নিশ্চয়ই, বিধাতাপনায় তোমার জন্মগত অধিকার। তোমার পূজনীয় পিতৃদেব ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। শৈশব থেকে তুমি সেই আবহাওয়ায় মানুষ যেখানে মিথ্যার জয়ে উৎসব। যেখানে ঘাতক তোমার পিতৃদেবকে অর্থ দিয়েছে আর তোমার পিতৃদেব তাকে দিয়েছে আইনের কূট প্রয়োগে স্বাধীনতা। যেখানে ব্যভিচারী নিষ্পাপ রমণীকে ধর্ষণ করেছে আর তোমার পিতৃদেব প্রমাণ করেছে তা ধর্ষণ নয়, সঙ্গম; কারণ সাক্ষ্যদানকালে রমণীটি বলেছিল সে 'আহ্' বলে চিৎকার করে ওঠে কিন্তু ভয়ে বা যন্ত্রণায় সেখানে তার 'উহ্' বলা উচিত ছিল। এই আহ্ আর উহ্-এর সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম প্রভেদটুকু আবিষ্কার করতে পারায় তোমার পূজনীয় পিতৃদেব আইন ব্যবসায়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

আর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র, তুমি দাদা মহাশয়, একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তুমি দাদা মহাশয়, জানো, কোন রোগে কি চিকিৎসা। যে অসুখ একদিনে আরোগ্য হয় তুমি তাকে এক মাস ভোগাও—কারণ তাতে তোমার ভিজিট বাড়ে। যে দুরূহ ব্যাধির আশু প্রতিকার আশা করা যায় না—এক ডোজ্ ওষুধে তুমি তাকে জীবন দাও—কারণ তাতে তোমার ধন্বন্তরী হিসেবে খ্যাতি হয়। সেই আহ্ আর উহ্-এর সূক্ষ্ম প্রভেদ নির্ণয় করার দুরূহ প্রতিভা তুমি তোমার চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রয়োগ করার অলোকসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছ। তাই জীবন আর মৃত্যু, ব্যাধি আর আরোগ্যে তুমি নির্বিকার।

দাদা মহাশয়, আজ তুমি সেই প্রতিভা আরও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ

করতে চাও। দেবদূত ছিলে, বিধাতা হতে চাও। যে আইন, যে ব্যবস্থা তোমার পূজনীয় পিতৃদেবকে, তোমাকে আহ্ এবং উহ্-এর সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করার সুযোগ দিয়েছে—এবার তুমি স্বয়ং সেই আইন ও ব্যবস্থা শুধু প্রয়োগ নয়, প্রণয়ন করতে চাইছ। দেবদূত তুমি দেবতা হতে চাইছ।

হায় নকল বিধাতা, তুমি জানো না, তোমরা জানো না, তোমাদের ওপরে এক অন্তর্যামী আছেন—যেন রক্তকরবীর জালের আড়ালে রাজা—তাকে দেখা যায় না, কোনোদিন যায় নি, কোনোদিন যাবে না। তোমরা এ যুগের নকল বিধাতা সেই জালের আড়ালের রাজাটির বরকন্দাজ মাত্র। তারই অভিমানে তোমরা স্ফীত। তারই অভিমানে তুমি দাদা মহাশয় এমনকি বংশগত সূত্রে মনটুকে রাজনীতিবাজ করতে চাও।

ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হতো আর সম্রাটের পুত্র সম্রাট। সভ্যতার স্তরে স্তরে এই উত্তরাধিকারবোধ নানাভাবে ক্রিয়া করেছে। তারপর এল আধুনিকতা। মানুষ ঘোষণা করল জন্মসূত্রে তার অধিকার ও ভাগ্য নির্দিষ্ট হয় না। এল গণতন্ত্র, এল ধর্মনিরপেক্ষতা। এবং এই আধাসামন্ততান্ত্রিক আধা ইওরোপীয় দেশটি নতুন অবস্থা বিন্যাসের মধ্যেও তার অকৃত্রিম প্রকৃতিটি অক্ষুণ্ণ রাখল। তাই এদেশে নির্বাসিত জওহরলাল নেহরু জননেতা এবং ভাগ্যবান। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী উত্তরাধিকারসূত্রে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। ধন্য দাদা, ধন্য এই তোমরা। বস্তুত, তোমার পুত্র হিসেবে মনটু ডাক্তার যে হবেই তার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু রাজনীতিতে যদি সফল হও তাহলে তোমার উত্তরাধিকার মনটুতেই বর্তাবে। কারণ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হতো, সম্রাটের পুত্র সম্রাট। আজ ব্রাহ্মণ্য নেই, সম্রাটত্ব নেই। আজ এই এক নতুন শ্রেণী তৈরি হয়েছে—নতুন জীবিকা।

'আসছি' বলে নিশানাথ উঠল! চটিটা পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ তার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল।

থমকে দাঁড়িয়ে সে বাড়িটা দেখল। প্রাচীন বিবর্ণ আর ক্ষয়িষ্ণু। দেয়ালটা জায়গায় জায়গায় নোনা পড়ে ফেঁপে উঠেছে, কোথাও বা ক্ষত। অবাক হয়ে, অবাক হয়ে নিশানাথ বাড়িটা দেখল। যেন এই শতাব্দী, এই শহর তাদের গৃহটিতে মূর্ত। সে চারিদিকে বয়েসের ঘ্রাণ পেল।

আর নিশানাথকে এক আশ্চর্য ইচ্ছেয় পেয়ে বসল! সে শক্ত দুহাতে দেয়ালটা চেপে ধরল। ঝুর ঝুর করে খানিক চুনবালি খসে পড়ল।

হায়! আমি পুরাণের বীর নই। দু হাতের চাপে এই জরাগ্রস্ত গৃহটিকে চূর্ণ করে আমি এই শহর, এই শতাব্দীকে পাপমুক্ত করতে পারি না। হায়! বীর নই, আমি ধ্বংস করতে পারি না। আমি রয়েছি এমন একটা যুগে যখন মানুষ খর্ব, ক্ষীণ, অবল আর অনিদ্রার রোগগ্রস্ত। অথচ তার হাতে অপরিমিত বিধ্বংসী শক্তি। পৃথিবীতে আজ আর বীরত্ব নেই, আছে হত্যা।

থুঃ করে দেয়ালে থুতু ফেলে নিশানাথ নিচে নামল। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দাদার চেম্বারের দিকে। কার যেন গলা পাওয়া যাচ্ছে। ও, ফোন করছে হৈমন্তী। আচ্ছা, এইখানে দাঁড়াই।

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ—আপনারা সাক্ষী, এই ভৌতিক গৃহের অণু-পরমাণু সাক্ষী—কোনো হঠকারী উত্তেজনার আকস্মিক উন্মাদনায় আমি আত্মহত্যা করি নি। পৃথিবীতে কে কবে এহেন ধীরতায় এমন স্থৈর্যে যাবতীয় খুঁটিনাটি বিচার করে চারিয়ে উপভোগ করতে করতে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে? ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি কাল্পনিক—মিস্টার ক্রাইস্টের মুখ কেউ দেখে নি। তা ছাড়া কথিত হয়, যীশু মানবত্রাণে আত্মত্যাগ করেছিলেন। সক্রেটিস নিজের হাতে হেমলক পান করলেও আসলে তাঁকে হত্যাই করা হয়েছিল। বন্ধুগণ—আমি আত্মত্যাগ করছি না—এ কথাটি চিৎকার করে বলে যেতে চাই। আমি দাদার চেম্বার থেকে চুরি করে প্রত্যহ অল্প অল্প বিষপানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটু একটু করে মরতে চাই। ধীর কিন্তু নিয়মিতভাবে। আমার এই মৃত্যুকে কোনো দর্শন বা কাব্যের রঙীন পোশাক পরিয়ে মনোহর করার বাসনা রাখি না। আসলে জীবনে মৃত্যু অনিবার্য, বর্তমান সভ্যতা জীবনকে আরো লোভনীয় এবং মৃত্যুকে আরও দ্রুত ও অনিবার্য করেছে। আমি জীবনের বিধান ও সভ্যতার উত্তরাধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছি।

আহ্ কি করছে হৈমন্তী, কাকে ফোন করছে এতক্ষণ? হঠাৎ নিশানাথের মনে পড়ল—তাই তো, হৈমন্তী, হৈমী—শেষ ওকে কবে দেখেছি—আজ, কাল, নাকি উনবিংশ শতাব্দীতে? কি করে হৈমী সারাদিন, কিভাবে দিন কাটায়? দিন কাটানো কি দুরূহ! ঘড়ির দিকে তাকাও—দেখবে কতখানি সময় নিয়ে একটা সেকেণ্ডের কাঁটা ঘোরে। তারপর মিনিট, তারপর ঘণ্টা, তারপর দিন, তারও পরে বছর। কি করে হৈমী সারাদিন, কি ভাবে সময় কাটায়?

একই বাড়িতে থেকেও দীর্ঘ, দীর্ঘকাল যে বোনের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোনো চেতনা ছিল না—হঠাৎ এই ভৌতিক বাড়িটার অন্ধকার সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে নিশানাথ যেন তাকে নতুন করে আবিষ্কার করল।

তিন বছর একটি অনাত্মীয় যুবাকে যে জেনেছে ; তিন বছর (ঘড়ির দিকে তাকাও—দেখবে কতখানি সময় নিয়ে একটা সেকেণ্ডের কাঁটা ঘোরে) যে নতুন পরিবেশে নতুন অভ্যাসে দিন কাটিয়েছে ; তিন বছর যে একটি পুরুষের কাছে নিজেকে নগ্ন করেছে—ডিভোর্সের পর গত দুবছর কি ভাবে, আহ্ কি ভাবে সে এই তার পুরানো বিবর্ণ মামুলি পিতৃগৃহে দিন কাটাল। কি নিয়ে কাটাল!

রাত্রে ঘুমঘোরে তার শিথিল হাতটি অবলম্বন খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ কি চমকে ওঠে নি? আর নিজেকে কি কখনো তার একা, অসহায় মনে হয় না? এই দিনগুলো কি করে হৈমী?

নিশানাথ উৎকর্ণ হয়ে টেলিফোনে হৈমন্তীর গলা শুনতে চাইল। ওর স্বর, উচ্চারণ, সংলাপে যেন সে পলকে দু বছরের ইতিহাস বুঝে নিতে চায়।

আমি তাঁর স্ত্রী।

হ্যাঁ।

কিছু করার ছিল না।

না না, ডিভোর্সটা একটা সাময়িক মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। শেষ ছ মাস আমরা একসঙ্গেই থাকতাম।

ওটা গুজব।

আমি বলছি ওটা গুজব। আমার কোলে মাথা রেখেই তিনি—আচ্ছা নমস্কার।

হৈমন্তী টেলিফোনে কাকে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছে? নিখিল মারা গেছে? বাড়িতে তো মৃত্যুর কোনো ছায়া—দাদার বক্তৃতা—হৈমী বিধবা হলো? বাঃ বেশ, বেশ, অতীব চমৎকার। শেষ ছ মাস ওরা এক সঙ্গেই থেকেছে। ওরই কোলে মাথা রেখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। সাধু সাধু, হৈমী—জীবনে মরণে—

আপনারা খবর পেয়েছেন?

নিখিলবাবু বলতে বললেন, আমি ওঁর বোন।

হ্যাঁ, কালকের প্লেনেই স্টার্ট করছেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে আমার বৌদির ডেডবডি নিয়ে আসবেন।

তা দিন তিনেক হবে।

হ্যাঁ, এখানেই দাহ হবে।

আচ্ছা নমস্কার।

নিশানাথ ছিটকে বেরিয়ে এল। আমার বোন হৈমন্তী সুইজারল্যাণ্ডে মারা গেছে। স্বামী তার আজকেই প্লেন ধরছে, মৃতদেহ বহন করে আনবে।

একদা, কোনো এক যুগে, কথিত হয়, সতীর মৃতদেহ কাঁধে উন্মাদ মহাদেব স্বর্গে মর্তে পা ফেলে পা ফেলে, স্বর্গে মর্তে পা ফেলে পা ফেলে, স্বর্গে মর্তে পা ফেলে পা ফেলে—আর বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে খণ্ড খণ্ড করে—আর মহাদেব স্বর্গে মর্তে পা ফেলে পা ফেলে—পালাও নিশানাথ, পালাও। তোমার ভগ্নী হৈমন্তী টেলিফোনে কাকে যেন নিজের মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছে।

এগারো

ত্রস্ত পদে সেই জটিল ও অন্ধকার প্যাসেজটুকু পেরিয়ে এলো। উঠোন, তারপর সদর দরজা। নিশানাথ উঠোন থেকেই একটা সমবেত উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল। অনুভবে বুঝল কারা যেন দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে। মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হেসে তাকে স্বীকার করতে হলো আজকাল উল্লাসের ধ্বনি শুনে তার কারণ বা প্রকৃতি অনুমান করা দুঃসাধ্য। চকিতে দিব্যনাথের কথা মনে পড়ল। বারান্দায় চোরের মতো দাঁড়িয়েছিল। মুখে অনুক্ষণ কেমন এক দুর্বিনীত ক্ষমাপ্রার্থীর হাসি। আমি বিলক্ষণ জানি ঘরের ভেতর সাধনাদের হাস্যধ্বনি শ্রীমানের মনে লোভ জাগায়! কিন্তু একসঙ্গে বসে গল্প করার সাহস কদাপি পায় না। দিব্য স্পষ্টতই সাধনাকে ভয় করে চলে।

বাহবা ভ্রাতৃবধূ, একেই বলি পার্সোন্যালিটি। তোমার ভাসুর তোমাকে সমীহ দেখায়। বাহবা ভ্রাতৃবর, প্রতিবেশী তোমায় ভয় করে; বাড়ির সকলে তুমি কখন কি করে বসো এই ভাবনায় সন্ত্রস্ত; আর তুমি, যুবক, আপন হীনমন্যতার তাড়নায় নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজের দাদার ঘরে নিজের পরিজন যে গল্পের আসর বসিয়েছে তা চোরের মতো শোনো। হায় ভ্রাতঃ, উচিত কি তব এ কাজ? তোমার অই ব্যায়ামপুষ্ট শরীরে, দুর্ধর্ষ একটা বুকে এই সংকোচ কি সাজে? এ মনিহার তোমায় নাহি সা-আ-আ-আ-আ-আ-আ-জে-এ। কতদিন দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনি না। 'কোমল গান্ধার'-এর পরের ছবিতে যদি রাজেশ্বরী দত্ত, রাজেশ্বরী বাসুদেব, তোমার যোগ্য গান বিরচিত বলে, ফিরাইব তার কেমনে। হায় ভ্রাতঃ, যে গৃহে তোমার বাস অথচ যেখানে তুমি রবাহূত—সে বাড়ির কর্তা তুচ্ছ মানুষের খলন জননা সম্পর্কে এ কি তোমার হীন কৌতূহল? আসলে

দিব্যনাথ, আমার মতো তুমিও এই ক্ষয়গ্রস্ত বাড়িটা সম্পর্কে এক বিরাট অভিমান নিয়ে ঘুরে বেড়াও। আমার ঔদাসীন্যের মতো তোমার ভীতিও এক ছদ্মবেশ।

রাস্তায় পা দিয়েই মুখোমুখী দেখা। প্রায় হাঁটু অবধি ট্রাউজার গুটনো, বিবিধ বর্ণে নানা দৃশ্য ও মুখমণ্ডল শোভিত জামা, গলায় অনুরূপ রুমাল, পায়ে হাওয়াই চটি, বিচিত্র ছাঁদে বিন্যস্ত চুল—একটি ছেলেকে নিশানাথ প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার ?

সে নিশানাথকে দেখে স্পষ্টতই অপ্রতিভ। নিশানাথ যে ডেকে তাকে প্রশ্ন করবে এ যেন অপ্রত্যাশিত ছিল। তার মুখের হাসি, চোখের দৃষ্টিতে নিশানাথ অবিকল তার ভাইটিকে প্রত্যক্ষ করল। ছেলেটাকে ছোট থেকে দেখেছি, তার দিব্যনাথের বন্ধু। সে কারণে সমীহ সহকারে ঘটনাটি সম্পর্কে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে যুবক বলল, "কিসু না, একটা বাওরা"—ছোকরাটি 'কিছু না' কে বলল 'কিসু না'। অথচ আমাকে অসম্মান করা তার অভিপ্রেত ছিল না। ছেলেটি 'পাগল'কে বলল 'বাওরা'। অথচ এ-ই আবার বঙ্গদেশে হিন্দী আধিপত্যে যারপরনাই ক্ষুব্ধ। সর্বোপরি এই বিদেশী মোড়কে এহেন কণ্ঠ, ভাষা ও উচ্চারণ কি বিরোধাভাসই না সৃষ্টি করে। নিশানাথের বমি এলো। বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে তাবৎ ধনতান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক পৃথিবীর এক শ্রেণীর যুবজনের পোষাক, প্রসাধন, ভঙ্গি, চলাচল মোটামুটি এক করে দিচ্ছে। যাকে এক ধরনের দেশ-কালাতীত বিশ্বসংস্কৃতিও বলতে পারো। এমন কি মহান সোভিয়েত ভূমিতেও আজ এই সাধারণ লক্ষণটি সেখানকার কোনো কোনো যুব মহলে প্রকাশ পাচ্ছে। মহামতি ক্রুশ্চভ ভুরুকুঁচকে একে বলছেন টেডি বয়ের সমস্যা। কিন্তু 'সমস্যা' এই বিশেষণ প্রয়োগে ঘটনাটির চরিত্র পাল্টায় না এবং টেডি বয়, উঠতি গুণ্ডা, ডেলিংকোয়েন্ট যে নামেই ডাকুন প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে সভ্যতার প্যাটার্ন ও রুচি আজ আর দেশ এবং সমাজ-ব্যবস্থার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল নয়। তাহলে বিপ্লবের চল্লিশ বছর পরে সোভিয়েতে টেডি বয়রা সমাজতন্ত্রের কামানো গালে বিশুদ্ধ থাপ্পর মারত না; ক্লাস এইটের বিদ্যে নিয়ে এই গরীব স্কুল মাস্টার-তনয়টি মাকে আধপেটা রেখে কি গুণ্ডামি বা দালালি করে যেন তেন একটা ট্রাউজার জোটানোকে পরমার্থ জ্ঞান করত না; পশ্চাদপদ আফ্রিকার একটি নিগ্রো যুবক কারখানার শ্রমিক বা বাড়ির ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও একটা নেক টাইয়ের লোকে এমন কি [illegible] জীবিকা [illegible]

করত না। আসলে পৃথিবীটা এই ভাবেই দ্রুত কাছে আসছে আর এক হয়ে যাচ্ছে।

শহরের উপকণ্ঠে আমি অজস্র কারখানা অঞ্চলে ঘুরেছি—রেডিও, গ্রামাফোন, চায়ের দোকান, আর সেলুনে ছেয়ে গেছে। কুচ্ছিত ফিল্মের গান ছাড়া কিছু বাজে না। অথচ ভ্রাতৃবধূ, এই শ্রমিকরা এসেছে কেউ বিহার থেকে, কেউ ইউ. পি. থেকে, কেউ উড়িষ্যা থেকে, কেউ বা দার্জিলিঙ থেকে। আসমুদ্র হিমাচলের বহুমুখী সংস্কৃতির প্রবাহে যেখানে এক মোহনা হতে পারত, সেটা আসলে এক মজা ডোবা।

ছুটির দিন এরা যখন দেশীয় প্রথায় গোল হয়ে বসে বিকট করতালধ্বনি সহকারে উন্মাদের মতো রাম-নাম গায়—তখন, তুমি কি জানো ভ্রাতৃবধূ, এরা যে সুরে পবন-নন্দন ও সীতাপতির গুণকীর্তন করে তার অনেকটাই লেবতম জনপ্রিয় ফিল্মী গানের সুর? তুমি অবশ্যই গবেষণা সহকারে প্রমাণ করতে পারো যে-হিন্দীভাষী শ্রমিকটি রামনামের আসরে খাঁটি দেশীয় প্রথায় হিন্দী ফিল্মের সুর গাইছে, তার উৎস একটি বিদেশী জাজ-সঙ্গীতের রেকর্ড যার উৎস আবার নিগ্রো পল্লীগীতির সুরধ্বনিতে নিহিত। মানবমুক্তি ও শুদ্ধ সংস্কৃতির অগ্রদূতরা এইভাবেই নানা মিশ্রণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ প্রলেটারীয় কালচার তৈরি করছে। আর নিউ এম্পায়ারে, সংস্কৃতি সম্মেলনে, জলসায়, এমন কি রাজনৈতিক সভায় পল্লীসঙ্গীত পরিবেশন না করলে আজ বঙ্গদেশের ইজ্জত থাকে না। কিন্তু, ভ্রাতৃবধূ, তুমি কি জানো অজ গাঁয়ের চাষীও আজ কি গান গেয়ে খুশি হয়? তোমরা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতাকাবাহীরা কখনো কোনো মেলায় গেছ? মেলাগুলোর চরিত্র কি ভাবে পাল্টে যাচ্ছে জানো?

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, বাংলা দেশের রেনেসাঁসে জন্ম মুহূর্তেই মৃত্যুর বীজ থেকে গেছে। আর্থনীতিক ভিত্তিভূমি ছিল অপ্রস্তুত, ঘটে গেল ভাবগত জাগরণ। এই কলকাতা শহরটি স্বভাবত গড়ে ওঠে নি, তাকে যথেচ্ছ বানিয়ে তোলা হয়েছে। উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনে যার সৃষ্টি, সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে যার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ব্যাহত; একদিকে যার রাজনৈতিক প্রাধান্য খর্ব করার অবিরাম ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে যে ভাবনৈতিক নায়কত্বের গরিমায় অফুরান আহ্লাদিত—এই শহর চিরদিন ভারতবর্ষের মাটিতে যেন এক নিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড, আজও যা মানব বসতির সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে উঠল না এবং প্রাকৃতিক নিয়মে চিরদিনই যে নাকি ক্রমশ গড়ে উঠছে।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অর্ধসম্ভব শিল্প বিপ্লব, বিভ্রান্ত ভাব জাগরণ,

নবজাত কৃত্রিম মধ্যশ্রেণী যে জীবনের স্বপ্ন দেখল, বুর্জোয়া বিকাশের প্রয়োজনে যে বন্ধনকে অস্বীকার করল—তার সঙ্গে সর্বদা দেশের নাড়ির যোগ ছিল না। এই প্রথম আমাদের দেশে এক 'আউট সাইডার' শ্রেণী তৈরি হলো। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। আর সেই থেকে স্পষ্টত সমান্তরাল ভাবে আধুনিক ও প্রাচীন দুই সভ্যতা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রইল। রেনেসাঁসীরা যে কূপমণ্ডুক সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন—আসলে তা ছিল দরবার, জমিদার, চণ্ডীমণ্ডপ আর হঠাৎ বাবুপুষ্ট এক বিকৃত অবক্ষয়ী সভ্যতা। দূরতম পল্লী অঞ্চলেও জীবনে সংস্কৃতিতে অনিবার্যভাবে এই ক্ষয় ধরে ছিল। কিন্তু ঘুমভাঙানিয়ারা তাদের দেশ-কাল-পাত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবে এবং অপরিসীম উচ্চম্মন্যতায় সেই অবক্ষয়ী সভ্যতার বিরুদ্ধেই শুধু সংগ্রাম করলেন না; পল্লী সংস্কৃতির সজীব সচল যে ধারা তখনও প্রবাহিত ছিল, যে মূল্যবোধ ও জীবন-ধারণা-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি—তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। অন্যদিকে বুর্জোয়া বিকাশের বিরুদ্ধবাদী যে সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ কিছু মূঢ়কে তার সংবাহীরূপে নানা সময়ে পেল—"ঐতিহ্য বাঁচাও" বুলি তাদের মুখে কাকাতুয়ার মতো ধ্বনিত হলেও আসলে ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। নতুন সভ্যতা হওয়ার কথা নগরভিত্তিক, অথচ তা সম্পূর্ণত হলো কলকাতা কেন্দ্রিক। বুর্জোয়া বিকাশের সুবিধাটুকু পেল কলকাতা, তার মূল্য দিল গোটা দেশ। গ্রাম দূরস্থান, শহরের উপকণ্ঠে, এই শহরের উপকণ্ঠে, নতুন সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের ভিত্তিভূমি তৈরি হলো না। ফলে বাংলার নবজাগরণের সভ্যতা তথা সাহিত্য-শিল্প-মূল্যবোধ হয়ে রইল মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের সম্পত্তি। তা ব্যাপকতা পেল না, শেকড় পেল না। অথচ ক্রমশ পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে তাই ক্রমে দেশের সভ্যতার মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃতি পেল। আস্তে আস্তে তা পল্লীসংস্কৃতির কিছু বহিরঙ্গ গ্রাস করল, যেমন বিজাতীয়ত্বের দুর্নাম ঘোচাবার জন্যে নিকট অতীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখতে হয়েছিল কৃষ্ণচরিত্র। অর্থাৎ আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন কোনোদিনই শ্রদ্ধা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ভিত্তিতে হলো না, তা হয়ে রইল কখনো অগ্রগামীর এক কৌশল, কখনো বা পশ্চাৎপদের এক অজুহাত। এবং এই যে খিচুড়ি সভ্যতা, যার ভিত্তিভূমিতে গণ্ডগোল, তার সৌধ যে খালিকটা দুর্বল হবে তাতে আর সন্দেহ কি?

ধর্মাবতার ও জুরী মহোদয়গণ, আমি একে বলব না তাসের ঘর, এ বরং জতুগৃহ। একদা আশা করেছি সমাতা পঞ্চপাণ্ডব শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাবে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর মহাপ্রস্থানের পথ। একে একে পৌরাণিক বীরদের পতন, ধর্ম রাস্তার কুকুর আর ধর্মরাজ নরক-দর্শক।

কৌঁসুলী মহোদয়, কলকাতার জতুগৃহ জলছে। কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব পলাতক। শুধু মরে গেল সেই অসহায় পাঁচটি ভাই ও তাদের মা, আতিথ্যে তৃপ্ত নির্বোধ ছটি প্রাণী। দেশ যে মরে গেল, কেউ তা জানল না। কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডবের মৃতদেহ দেখে দুর্যোধন নিশ্চিন্ত। কৌঁসুলী মহোদয়, আমি আমাদের এই রেনেসাঁসকে অভিযুক্ত করি যে আপন নিরাপত্তার জন্য তার জতুগৃহে আতিথ্যের লোভ দেখিয়ে ছটি নির্বোধ সরল আত্মাকে নিজের হাতে পুড়িয়ে মারল। আর এই হত্যাপরাধের কোনো তুলনা নেই, কারণ যারা মরল তারা তৃপ্ত হয়ে অকালে বিনষ্ট হলো। এবং বিনষ্ট হয়ে পঞ্চপাণ্ডবের শত্রুপক্ষকে দীর্ঘকাল প্রতারিত করে রাখল। আমাদের এই বুর্জোয়া বিকাশ এমনই প্রতারক। আর তারই ফলে আজও কলকাতা শহরে ভূতের ওঝা, জ্যোতিষী, ধর্মের ষাঁড় ও ভগবানের বাচ্চার অবাধ প্রাবল্য।

বন্ধুগণ বন্ধুগণ; আমরা, আমাদের সন্ততি আজ ঘাড় উঁচু করে আকাশে স্পুৎনিক খুঁজি, রেডিয়োয় তার বিপ বিপ ধ্বনি শুনি; অথচ হো-হো-হো, ইয়্যাও ইয়্যাও, মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে, সুইজারল্যাণ্ডে মৃতদেহ আনতে যাচ্ছেন; হ্যাঁ আমরা বন্ধুগণ, আমরাই বন্ধুগণ বসন্তের টীকা নিতে ভুলে গিয়ে মহামারীর সময়ে মনসার মন্দিরে পূজা দিতে যাই, চন্দ্রগ্রহণে তেষ্টায় মরে গেলেও রোগীকে পর্যন্ত জল খেতে দিই না, হাওড়ার ব্রীজ পেরোবার সময় গঙ্গায় পয়সা ছুঁড়ে দি। অবিশ্বাস্য কুসংস্কার, প্রখর বিজ্ঞান বিশ্বাস, অন্ধ ধর্মজ্ঞান আর পাশবিক নীতিহীনতার এমন অপূর্ব সহাবস্থান অল্পই মিলবে। আর এই চূড়ান্ত পরস্পরবিরোধিতাই আমাদের সমগ্র দেশ ও জাতীয় জীবনের মহতী ট্র্যাজেডি। একে ফার্সও বলতে পারেন। এর ফলে আমরা কোনো কিছুই সম্পূর্ণ পাই নি, সম্পূর্ণ চাই নি। আস্তে আস্তে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আমাদের জীবন ভাবনার পদ্ধতি পাল্টেছে। কিন্তু অধিকাংশের সংস্থান সেই অনুপাতে বাড়ে নি। অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক আর্থনীতিক কার্য-কারণের অসামান্য প্রভেদ সত্ত্বেও তাই দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মতোই স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সর্বস্তরে

যাবতীয় মূল্যবোধের অবসান ও উভয়দেশের জীবনগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্রমশ সাযুজ্য ঘটেছে। ধনতন্ত্র, ফাসীবাদ ও বিশ্বযুদ্ধ; হিরোসিমার স্মৃতি ও শীতল সংগ্রামের পরিণামভীতি এবং কখনো বা সাম্যবাদ—আতঙ্ক সমস্ত ধনতান্ত্রিক জগৎকে রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত, মরিয়া করে দিয়েছে। শেলটারে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, ফ্রন্টে যারা বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে বেঁচে আছে—এ যুগের সেই শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব কি ব্যর্থ কি অভিশপ্ত। আর যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির সর্বনাশা ভাঙনে যারা ভেসে গেল, দেশে দেশে আজও যারা কর্মসন্ধানী এবং উদ্বাস্তু, পশ্চিম জার্মানী ইটালী ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড বন্যার স্রোতের মতো যাদের অভিঘাতে কাঁপছে—সেই তারা, যে কোনো বয়সের লস্ট জেনারেশন, যাদের অভিজ্ঞতায় জীবন ও মূল্যবোধ কি তুচ্ছ, মামুলী, হাস্যকর এবং তাৎক্ষণিক হিরোসিমার শ্মশানে বোমা পড়ার মাত্র কয়েকদিন পরে দখলকারী মার্কিন সৈন্যদের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকার জাপানী মেয়েদের সংগ্রহ করে বেশ্যাপটি খোলা হয়েছিল, আলোর মালা জেলে সেই শ্মশানে উৎসব বাসর বসেছিল। পুরুষানুক্রমে রক্তে আনবিক রোগ ও স্মৃতিতে লাঞ্ছনার বীজ বহন করবে একটা গোটা জাত। আর বাণিজ্য কূটনীতি সংস্কৃতি ও সাহায্যদানের মিশনারীরা দেশে দেশে—এমনকি আদিম-জীবনে অভ্যস্ত দূর অঞ্চলেও তা সার্থক ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে, দেবে।

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, আমি হলফ করে বলতে পারি আজ এদেশে নিছক মোটা ভাত-কাপড়ের জন্য বা সামাজিক অত্যাচারের কারণেই মেয়েরা সর্বক্ষেত্রে বেশ্যাবৃত্তি করে না। দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের পর এক শ্রেণীর যুবক যে শহর, শহরতলী, এমনকি সুদূর গ্রামেও বে-পরোয়া জীবন কাটাচ্ছে, রাজনৈতিক কারণে শাসনযন্ত্র যাদের পৃষ্ঠপোষক, আমাদের রাষ্ট্রজীবনে উদ্দেশ্যহীন, উত্তেজনায় ক্রম-অভ্যস্ত, জটিল চক্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধনতন্ত্রের প্রসাদপুষ্ট, অথচ আত্মসম্মান ও নিরাপত্তাবোধের অভাবে সদা আত্মপীড়িত এই যে মরিয়া যুবসমাজ আমাদের রাষ্ট্রজীবনে ফ্যাসিজমের পথ তৈরি করছে—তারও কারণ সর্বক্ষেত্রে নিছক অন্নাভাব নয়।

পার্কের অন্ধকারে নাবালিকা মেয়েকে যখন প্রৌঢ় পিতৃবন্ধু নগ্ন করে, তখন সেই সমগ্র ঘটনাটিকে যে কুকুর পাহারা দেয়, সে মেয়েটিরই বাবা। আর ভাই নিজের বোনকে কলোনী থেকে মদের দোকানে পৌঁছে দেয়। আর মা তার মেয়েকে নিয়ে শেষ বাসে চায়ের দোকান থেকে গৃহে

প্রত্যাবর্তন করে। বস্তুত বেশ্যাবৃত্তির কত অভিনব ক্ষেত্র ও রীতি প্রস্তুত হয়েছে। আর আমাদের পূত পুত্র ভদ্রলোকেরা রেসের মাঠে, মদ্যালয়ে, গণিকাগৃহে এবং সর্বত্র ব্যভিচার ও দুর্নীতির ধুনুচি জ্বালিয়ে বিসর্জন নৃত্যে আত্মহারা। গত দশ বছরে মদের কন্‌জাম্‌শান সীমাহীন বেড়েছে। অথচ সামাজিকভাবে আজও আমরা মদ্যপানে অভ্যস্ত নই। সুতরাং পুনরপি সেই ভণ্ডামি, যা আর শুধু উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ নেই। ভেবে দেখেছ কে খায় এত মদ? আর চোলাই করে, কে খায়? তুমি বলবে—কেন খায় সে-কথা বলুন মেজদা। ভ্রাতৃবধূ, সমস্ত ব্যাপারের মূল অনুসন্ধানে এই যে প্রবৃত্তি, এ-ও এক ধরনের আত্ম-প্রতারণা। ইয়ে সমাজব্যবস্থার ওপর তাবৎ দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। আমি রোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত নই। আবার কারবার লক্ষণ নিয়ে স্ট্যাটিসটিক্স বলে সমস্ত ধরনের অপরাধ বেড়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশে শিশু-অপরাধ, সমকামিতা, কুমারীর মাতৃত্ব, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উন্মাদরোগ, অসম্ভব সব উপায়ে হত্যা ও আত্মহত্যা, বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্য প্রায় নারকীয় ধরনের ক্লাব ও চক্র প্রকাশ্যে গোপনে তাবৎ অগ্রগামী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে অজগরের প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলেছে। সুতরাং উপনিবেশের মারফৎ তার বিস্তৃতি অন্যত্রও ঘটেছে। লাটিন আমেরিকা, মিডল ইস্ট, আফ্রিকা, মালয়-সিঙ্গাপুর-হংকং প্রভৃতি দ্বীপ, জাপান,-ব্রহ্ম-ভারতবর্ষ—কেউ এই বেড়াজালের বাইরে নয়।

অসমাপ্ত

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা বিভাগের গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারটি পাঠিয়ে, গবেষণা পরিষদ-এর সম্পাদক, আমাদের জানিয়েছেন :

'ইং ২৫. ৮. ৭৫ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষের ঘরে শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাক্ষাৎকারটি টেপ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রকল্পের কাজ তখন আমরা চালাচ্ছিলাম, সেই উদ্দেশ্যেই কয়েকজন নির্বাচিত বুদ্ধিজীবীর মতামত সংগ্রহ করা হয়েছিল, এটি তার একটি। নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন এই সাক্ষাৎকারের অনুলিপিগুলি পড়ে ছিল। বর্তমানে এই কাজটি প্রকাশের চেষ্টা হচ্ছে।

ক্যাসেটের অভাব থাকায় টেপগুলি রাখা যায় নি; তখনই টুকে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে আপনার কাছে যা প্রেরিত হলো, তা দীপেন্দ্রনাথের বলা কথার অনুলিপি; লেখা নয়। তাই কিছু অস্পষ্ট বাক্য আছে—যা বলা কথাতে থাকবেই। আমরা এ-সবের উপর ইচ্ছে করেই কলম চালাই নি। অন্য সাক্ষাৎকারগুলির ক্ষেত্রে আমরা বক্তাকে দিয়ে এই সংশোধনগুলি করিয়ে নিই। কিন্তু দীপেন্দ্রনাথের বেলায় যেহেতু সে উপায় আর নেই তাই তাঁর মতামত, বাচনভঙ্গী ও শব্দব্যবহার সম্পর্কে যিনি আপনাদের মধ্যে সব থেকে অবহিত আছেন তেমন কোনো একজনকে দিয়ে আপনি এ কাজটি করিয়ে নিলে আমরাও উপকৃত হতে পারবো; শুধু দেখতে হবে যে তাঁর সে সময়ের চিন্তাটাই যেন যথাযথভাবে ফুটে ওঠে।'

খুব কম জায়গাতেই আমাদের অতি সামান্য কোনো সংশোধন করতে হয়েছে—সে সংশোধন যে-কারো পক্ষেই করা সম্ভব ছিল, এতই পরিষ্কার।—সম্পাদক, পরিচয়

প্রশ্ন : সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর : প্রথমেই এমন প্রশ্ন করলেন যার উত্তরটা অনেকটা মুখস্থ বলার মত বলতে'হয়। এমনি বলা যেতে পারে যে আমার সময়কে সৃজনশীলভাবে ধরে রাখা, আমার কথাগুলো জানানো।

প্রশ্ন : আমার মনে হলো এটা আপনি সাহিত্যস্রষ্টার দৃষ্টিতে বললেন, কিন্তু যাঁরা সাহিত্য পড়েন তাঁদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি রকম হবে ?

উত্তর : পাঠক হিসেবে আমি চাইব সৃজনশীল ভাবেই জীবনের সমগ্রতার উপস্থাপন।

প্রশ্ন : এখানে একটা প্রশ্ন আছে, আপনার কাছে যা জীবনের সমগ্রতা অন্য একজনের কাছে তা কিন্তু জীবনের সমগ্রতা নাও হতে পারে। তার কাছে জীবনেব সমগ্রতাটা হয়তো অন্যরকম। আপনার কাছে সেটা মনে হতে পারে জীবনের বিরুদ্ধতা। এ সব জায়গায় সাহিত্যের উদ্দেশ্যটা আপনি কি করে ঠিক করবেন ?

উত্তর : আপনি জানতে চাইছেন কোন জীবনের সমগ্রতা ? 'কোন জীবনে' এই কথাটার মানে কি। জীবন, এই তো, তার সমগ্রতা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছেন না কিন্তু জানতে চাইছেন তা হল আমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা। এই জীবনকেই নানা লেখক নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন, দেখছেন এবং দেখবেন। তাদের অনেকেই ঠিকভাবে এবং অনেকেই ভুলভাবে জীবনের খণ্ডকে সমগ্র বলে ভুল করেছেন, করেন এবং করবেন। আমি কাকে জীবনের সমগ্রতা বলব, এই তো ? এখন এ নিয়ে প্রশ্ন করলে তো মহাভারত বলা যায়। তা না-বলে এক কথায় উত্তর দিচ্ছি তাতে সবটাই বোঝা যাবে।

আমি জগৎ ও জীবনকে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চাই। আমি মনে করি একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই জগৎ ও জীবনের সমগ্রতাকে, তার প্রকৃত ঐতিহ্যকে, আত্মস্থ করা ও সৃজনশীল ভাবে নির্মাণ করা সম্ভব। অনেকে এই দ্বান্দ্বিক দেখায় বিশ্বাসী নন। ফলে আমি মনে করি যে তারা খণ্ডিত ভাবে জগৎ ও জীবনকে দেখেন। পার্থক্যটি ঘটে যায় দৃষ্টিভঙ্গিগত। সেটা ছিল এবং এখনও আছে।

প্রশ্ন : দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে যাঁরা জীবনের

সমগ্রতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যকে আমরা ভালই বলি। আজও তত্ত্ব হিসাবে একে না-জেনে কি ভাল সাহিত্য রচনা করা সম্ভব?

উত্তর: আজও যদি কেউ দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন না হন অথচ জীবনের কথা লেখেন, আপনি যা জানতে চাইছেন, তাঁর পক্ষে কি জীবনের সমগ্রতার অনুধাবন সম্ভব? আমি বলব, সম্ভব। কারণ, ঐ ব্যালজাকের উদাহরণ দিয়েই বলব যে, একই ঘটনা আজও ঘটতে পারে, ঘটেও মাঝে মাঝে। তা ছাড়া পরে আমরা যখন আলোচনা করব, দেখতে পাব যে আমাদের এই সময়েই এমন লেখক আছেন যাঁদের কোনো কোনো লেখায় জীবনের এই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা অসামান্য লেখা লিখেছেন। আমি একটু আগ বাড়িয়েই বলছি, যেমন কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসটি অথবা সমরেশ বসুরই কোনো কোনো গল্প; আবার তাঁদের অন্যান্য রচনাতে এই সমগ্রতার বোধ দেখা যায় নি বলে সে লেখা তেমন উত্তরোয় নি। সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে তো অনেক লেখা খারাপই হয়েছে, দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হবে। এবং এমন লেখকও আমাদের দেশে আছেন যাঁরা তাঁদের সাহিত্যজীবনের একটা পর্ব থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ না করে সৃজনশীল ভাবে জীবনের এই সমগ্রতাকে রূপায়িত করতে চাইছেন এবং সুন্দরভাবে এবং নিশ্চিত পদক্ষেপে করেও যেতে পারছেন। যেমন দেবেশ রায়।

প্রশ্ন: আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সাহিত্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন কি যথোপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করেন?

উত্তর: না হয় নি।

প্রশ্ন: কেন হয় নি?

উত্তর: কেন হয় নি, এটা এক কথায় বলা যাবে না। আমার কথা হচ্ছে আমি নিজেও এই 'কেন'-র উত্তর এখনো খুঁজছি। তবে কয়েকটা কথা আমি বলব। আমার একটা সেমিনারের কথা মনে পড়ছে। যেখানে অনেক বক্তা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকও। তাঁরা বলছিলেন বাংলা কথাসাহিত্য বিশেষত বরাবরই ভীষণভাবে জীবননিষ্ঠ। আমি একটু অন্য কথা বলেছিলাম। আমি কয়েকটা প্রশ্ন তুলেছিলাম। আপনারা তো স্বাধীনতা-উত্তরকালের কথা বলেছেন বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কথা বলছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে যে একান্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কয়েক পুরুষ ধরে, কয়েক দশক ধরে চলল, বাংলা উপন্যাসে তার

ছাপ কতখানি আছে! আমি ভাবি যে পৃথিবীর বহু দেশের সাহিত্যিক দেশপ্রেমী রচনার জন্যে কত উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। আমাদের দেশে ক'জন সাহিত্যিক প্রাক-স্বাধীনতার আমলে সেই উৎপীড়ন সহ্য করেছেন? আমি ভাবি যখন একদিকে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনকে প্লাবিত করল তখন রবীন্দ্রনাথের কিছু অসাধারণ গানই কেবল সৃষ্টি হয়ে থাকল কেন? এর পরবর্তীকালে একমাত্র 'গোরা' ছাড়া বড় জাতের কোনো উপন্যাস রচিত হল না কেন? আমি ভাবি, আমাদের অগ্নিযুগের কল্পনা পরাস্তকারী বীরত্ব, রাজনৈতিক ভ্রান্তি, অথবা মহত্ত্ব এবং কত আন্দোলনের কথা - কত বীর ও শহীদের কথা মনে পড়ে—তাঁদের নিয়ে তৎকালীন জীবিত লেখকরা না লিখে থাকতে পারলেন কি করে? আমি ভাবি যে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর রাজনীতি যখন গ্রামের কৃষকের ঘরেও পৌঁছে গেছে বা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন যখন সত্যিসত্যিই ইংরেজ-রাজকে কাঁপিয়েছে তখন আমাদের সেই বিদ্রোহকে সীমিত রাখি কি করে 'কল্লোল' ও 'কলিকলম'-এর পাতায়!

তারপর ধরুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কথা। একটা কথা যদি তার আগে বলে না দিই যে তার সঙ্গে চল্লিশের দশকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে কিছু কিছু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল এবং আপনারা তো জানেন যে সেই সময়ে আমাদের দেশে ফ্যাশিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠিত হয়েছিল, যাঁরা শুধু সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তাকে শিল্প মাধ্যমের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং জাতীয়তাবোধ এই দুইকে মিলিয়েছিলেন, জীবনের নতুন বাস্তবতাগুলিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলেন, রূপ দিতে পারছিলেন। এই সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে লিখতে শুরু করলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন যে উপন্যাস, তার নায়ক পাঁচটা গ্রাম। একটি উপন্যাস লিখলেন নাম 'গণদেবতা' অর্থাৎ বাংলার কথা সাহিত্যে লিখিতভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন মূল্যবোধ এলো। এই সময় 'নবান্ন'-নাটক হয়েছিল। এই সময় 'নবজীবনের গান' গাঁথা হয়েছিল। এবং এই সময় ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রবীণ ও নবীন শিল্পী ও লেখক। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই খুব ইতিবাচক ও সদর্থকভাবে গল্পে কবিতায় গানে নাটকে ছবি আঁকায় এই নতুন মূল্যবোধের

শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। আপনাদের চিত্তপ্রসাদের নাম নিশ্চয়ই জানা আছে, আলোকচিত্রও যে কতবড় একটা শিল্প মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে তা এই সময়ে আবার জানা গেল সুনীল জানার ছবিতে। এমনি কত নাম বলব! মহাভারত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারগুলি এ সময় ঘটে। এই সুযোগে এইটুকুও বলে রাখি যে, চল্লিশের দশকের এই যে যুগান্তকারী আন্দোলন তার স্রোতেই আজও ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য চলছে। এটা আপনারা খেয়াল করবেন যে এখনও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষায় যে নবনাট্য, সৎনাট্য ইত্যাদি হচ্ছে, নতুন চলচ্চিত্রের যে আন্দোলন হচ্ছে, আর কথা-সাহিত্য ও কবিতায় যে-সার্থক অংশগুলি, তা নিশ্চিতভাবে সেই চল্লিশের দশকের ঐতিহ্যকে প্রসারিত করে এগোচ্ছে। তাছাড়া বাংলা কবিতায় সেই সময়ে বিষ্ণুবাবু, সুভাষদা, এবং নিশ্চয়ই আপনারা শুনে বিচলিত হবেন, তবু বলছি, এমন-কি, জীবনানন্দ দাশ পর্যন্ত যে আশ্চর্য কবিতা লিখেছিলেন, আজও আমরা তারই প্রতিফলিত আলোতে অনেক দূরের পথ হাঁটতে পারছি।

কিন্তু আপনাদের প্রশ্নটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের, অর্থাৎ ৪৫ সালের পর থেকে, সেটাকে যদি বলি স্বাধীনতা-উত্তর কালের, সেটা কি খুব দোষ হবে? যুদ্ধের শেষ ১৯৪৬ সালে এটা খুব স্মরণীয় কাল। কারণ এ-সময়েই বিশেষত বাংলা দেশে যে প্রচণ্ড ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়, তারই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল। এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল। এ তো গেল ইতিহাসের কথা। পূর্ব পাকিস্তান আমাদের চোখের সামনে বাংলাদেশ হল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন যথাযথ হয়নি। একেবারেই কি হয়নি? আমি বলব—না কিছু-কিছু হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু বড় লেখক তো জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীনতা-উত্তরকালে জীবিত ছিলেন আমি তাঁদের আমার আলোচনার সীমার মধ্যে রাখছি। প্রশ্নটা হল স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে যে নতুন বাস্তবতার জন্ম হল, তাকে বাংলা কথাসাহিত্যে ঠিকমত আনা গেল না কেন? এ নিয়ে অনেক কারণ বলা যায়, অনেক কঠোর মন্তব্য করা যায়। আমি একটু অন্যদিক থেকে বলি, স্বাধীনতার পরে আমাদের সাহিত্যজগতে কিছু নতুন লক্ষণের জন্ম হল। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বটে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বটে। স্বাধীনতার পূর্বে সাংবাদিকতা ছিল এক ধরনের দেশপ্রেমী কাজ। এবং প্রকৃত

সাংবাদিকরা দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত হয়ে সাংবাদিকতা করতেন। দুঃখভোগও করেছেন তাঁদের অনেকে। সাহিত্যিকরা কিছুটা দুঃখবরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই সাহিত্য করতেন। পুরনো গল্প খুঁজলে দেখবেন, সেকালের মা-বাবারা কোনো সাহিত্যিকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেন না। কারণ হলো যে তা হলে মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্ষুধার হাতে সমর্পণ করা হবে। স্বাধীনতার পরে কি হল? সাহিত্যিকরা দেখলেন যে সাহিত্য একটা চমৎকার জীবিকা হতে পারে, রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাওয়া যেতে পারে। নানা ধরনের পুরস্কার, নানা ধরনের বৃত্তি, খেতাব এবং এই রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের পাশেপাশে আমাদের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক ধরনের মনোপলির আবির্ভাব ঘটল। এবং মোটামুটি স্বাধীনতার দশবছর পরে ৫৬।৫৭ সাল থেকে আমাদের সাহিত্য জগতকে নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল একটি বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠী। নাম করেই বলছি, 'আনন্দবাজার' এবং 'দেশ' গোষ্ঠী। তাঁরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র মধ্য দিয়ে বাঙালি সাংবাদিকতার যে-ধরন-ধারণ তাতে বহুল পরিমাণে বদলে দিতে পারলেন। মোটের ওপর আধুনিক বুর্জোয়া জার্নালিজম্ তাঁরা আমাদের রাজ্যে প্রবর্তন করলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁরা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষমতাশালী প্রায় সমস্ত লেখককে চাকরি অথবা অন্য কোনো সূত্রে তাঁদের গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করলেন। একদিক দিয়ে এটা ছিল খুব বড় কাজ। কারণ সাহিত্যিকরা চিরকালই অর্থের জন্য প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে অভ্যস্ত ছিলেন। দুঃখভোগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-ই বড় সাহিত্যিকদের হয় চাকরি দিয়ে, নয় ফিচার লিখিয়ে মাসে একটা নিশ্চিত অর্থাগমের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখন, এই যে 'ফিচার' বললাম, এটা কিন্তু খুব লক্ষণীয়। পত্রিকার, সংবাদপত্রের যে চরিত্র তা ক্রমে ক্রমে পাল্টাতে লাগল। নানা ধরনের চোখ-ঝলসানো, মন-ভোলানো ফিচারের সংখ্যা পত্রিকায় বাড়তে লাগল। যেহেতু সৃজনশীল সাহিত্যিকরা লিখতেন, সেহেতু তার মধ্যে দক্ষতা থাকত খুবই। তাই সংবাদপত্রের পাঠকেরা প্রতিদিনই এক ধরনের সংবাদপত্রের সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত হতে লাগলেন এবং অনিবার্যভাবেই ওটা কিছুটা হালকা হতে বাধ্য। ফলে একই সঙ্গে একটা প্রক্রিয়া আরম্ভ হল। বাঙালি পাঠকসমাজ আস্তে আস্তে দেখতে লাগলেন যে, সংবাদপত্রের ভাষা ও প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। তাদের পাঠের অভ্যাস একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে পাক খাচ্ছে। অন্যদিকে লেখকরা, আগে যাঁরা একান্তভাবেই ছিলেন সৃজনশীল, তাঁরা তাঁদের সাহিত্য প্রতিভা বা দক্ষতা নিয়োগ করতে

লাগলেন সৃজনশীল সাহিত্যের পাশাপাশি এই ধরনের ফিচার ইত্যাদি রচনায়। তাদের লেখার অভ্যাসও খানিকটা বদল হতে লাগল। অর্থাৎ কি-না লেখক এবং পাঠকের একটা বিরাট অংশ, তাঁরা তাঁদের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে বদলাতে লাগল। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটে যায় আমারই বা আমাদের অনেকের চোখের সামনে—যার ফল আজ খুব প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে।

পাশাপাশি আরেকটি মনোপলি আমাদের আছে—'যুগান্তর' এবং তার সঙ্গে 'অমৃত'। বলা যেতে পারে 'দেশ'-এর সি-অথবা ডি-টিম। তার, পাশাপাশি তো নয়ই, এমনকি বি-টিমও নয়। ফলে সৎ সাহিত্যিক এবং সৎ পাঠক যাঁরা, তাঁদের কিছুই লাভ হল না, এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ায়। এবং ক্রমে একটা ভিসিয়াস সার্কেল তৈরি হল, যাকে প্রথমেই বলেছি মনোপলির আবির্ভাব। এই পত্রিকা গোষ্ঠীদুটি, বিশেষত প্রথমটি, তাঁরা যে শুধু পত্রিকা জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন তা নয়, ultimately তাঁরা বাংলা দেশের পুস্তক ব্যবসাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। এবং অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বহু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও দুর্বল হয়ে পড়ল, নয় বাধ্য হয়ে ভোল বদলালেন। নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন বলতে সিগ্‌নেট বুকশপকে মিন করছি, ভোল পালটালেন বলতে ডি এম লাইব্রেরি, বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর কথা বলছি। আর নানা রকমের প্রকাশনার প্রতিষ্ঠান রাতারাতি গজিয়ে উঠল এবং অতি দ্রুত বই বেরোতে লাগল। লেখকরা বা অনেক লেখক দু হাতে লিখতে লাগলেন। এখন ঘটনা হচ্ছে যে কোনো লেখকই তো ভগবান নন মানুষ। তাই তাঁর অভিজ্ঞতার একটা মাত্রা আছে, লেখার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। কিন্তু যেহেতু মনোপলি পাঠক-রুচিকে বদলে দিতে পেরেছে এবং সাহিত্যের বাজারটা প্রায় সিনেমার স্টারদের মতো অবস্থায় পরিণত হয়েছে, সেহেতু সৃজনশীল লেখকদের কাছে 'ইয়েস স্যর হাজির আছি'—এই কথা বলাটা প্রয়োজন পড়ল। ফিল্মস্টার যেমন তাঁদের বয়েসের ভাবনায় ভাবিত থাকেন তেমনি আমাদের সাহিত্যকুলের এক বড় অংশও ভাবিত হলেন কি পরিমাণ উপস্থিতির প্রমাণ তাঁরা দিতে পারছেন তার ওপর, রচনার মানের ওপর নয়। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল। এটা হতে পারল এই কারণেই যে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি, এমন কি বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এবং আমাদের রাষ্ট্র সুস্থ এবং সদর্থক সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি এবং লেখকদের নিজের মর্জিমতো লিখে বাঁচবার উপায় করে

দিতে পারেন নি। সেইজন্য বহু লেখককে ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, এই মনোপলির ভিসিয়াস সার্কল-এর মধ্যে পড়তে বাধ্য হতে হলো। খুব দুঃখজনক-ভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ জীবন অতিক্রান্ত হলো এবং সমরেশ বসুর মতো অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক, তিনিও তাঁর যা-দেবার ছিল সাহিত্যে তিনি তা দিতে পারলেন না। এখন আপনারা বলবেন—না হয় তর্কের খাতিরে আপনার কথা মেনে নিলাম, তাহলেও এই লেখকদের বাধা কী ছিল যা তাদের স্বাধীনতা-উত্তরকালের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনকে রূপ দিতে দিল না। বাধা একটাই ছিল। সেটা হল শিল্পীর স্বাধীনতা। কমিউনিস্টরা শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় সেই অর্থেই আমি বলছি, এটা মনে রাখবেন।

বাধা আরেকটাও ছিল, জীবনের সমগ্রতার বোধ এবং তাকে সাহিত্যে আনার ইচ্ছা, চেষ্টা ও সামর্থ। অনেকের ইচ্ছেই ছিল না, ফলে চেষ্টাও ছিল না আর অধিকাংশের সামর্থও ছিল না। কারণ মনোরঞ্জনই যখন সাহিত্যের এ্যাজেণ্ডা তখন জীবনের সমগ্রতা এই ধারণাটাই ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যায়। জীবনের সমগ্রতার ধারণা অনুপস্থিত থাকলে জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণের প্রশ্নটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। আর সেটা যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন সমসময় ও সমাজ—তার বৈচিত্র্য, জটিলতা ও সমগ্রতা সহ—সাহিত্যে আসতেই পারে না। সেইজন্যই লক্ষ লক্ষ উপন্যাস এই সময় লেখা হয়েছে একহাজার থেকে দেড়হাজার পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

বলা উচিত আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক এক-এক বছরে সেই সংখ্যক উপন্যাস লিখেছেন যা বিশ্ববন্দিত কোনো কোনো ঔপন্যাসিক গোটা জীবনেও লিখতে পারেন নি। তবে এসব ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই মনোপলির পাপচক্রে পড়লেও এটা তো সত্যি যে এদের অনেকেই সাহিত্যিক। যেমন সমরেশবাবু। আমার বহু শ্রদ্ধাভাজন বা অন্তরঙ্গ, সমরেশ বসুর সম্পর্কে ভয়ানক অভিযোগ এবং অভিমান পোষণ করেন। অভিযোগ তো আমারও আছে। তার থেকে বেশি আছে অভিমান। কিন্তু আমি তো মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না যে তিনি একজন জাত-লেখক এবং বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে তিনি এসেছিলেন। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-পর্বে, তার পরবর্তীকালের প্রধান লেখক তাঁরই হবার কথা ছিল। নানা কারণেই তিনি বেশি লিখছেন, লিখতে বাধ্য হচ্ছেন হয়তো। আমি খুশি হতাম যদি প্রথম জীবনের মতো আমৃত্যু তিনি সৃজনশীলতার স্বাধীনতার জন্য দুঃখবরণে প্রস্তুত থাকতেন। তা সত্ত্বেও, আমি তো জানি, এরই মধ্যে

যেহেতু তিনি প্রকৃত লেখক, সেহেতু মাঝেমাঝেই এমন লেখা লেখেন যা সর্ব অর্থেই এক সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা, এবং আপনাদের স্তম্ভিত করে আমি যদি বলি যে আমি 'বিবর'-কে একটি significant লেখা মনে করি, তাহলে কি আমার আরো অনেক বন্ধুর মতো আপনারাও আমাকে ভুল বুঝবেন? তা বুঝুন। কিন্তু আমি আবার বলছি যে, significant লেখা হচ্ছে 'বিবর' এবং সমরেশ বসুর পক্ষেই এই উপন্যাস লেখা স্বাভাবিক ছিল। বা তার পরে, আমি এখন সব লেখা পড়ার সুযোগ পাই না, হাতের কাছেও পাই না, তার পরেও তার কিছু কিছু গল্প আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু আলোচনাটা খুব ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমি এবার শেষ করছি এই প্রসঙ্গে-যে, না, যেহেতু সাহিত্য এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে সেহেতু আমাদের সাহিত্যিক সমাজ স্বাধীনভাবে লিখতে পারেন না এবং উনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের খণ্ডিত রেনেসাঁসের যে-দায়ভাগ আমরা আজও বহন করছি, বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী সমাজের যে-বিচ্ছিন্নতা, ক্রমেই যা তুঙ্গে উঠছে, তার অনিবার্য প্রতিফলন হিসেবে আমাদের সমকালের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ঔপন্যাসিকরা প্রায় অনেকেই আমাদের সময় এবং সমাজকে সমগ্রভাবে ধরতে পারছেন না। তাই সমকালের সামাজিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিফলনও তাতে ঘটছে না। কিন্তু কয়েকজন লেখক, এঁরা নিশ্চিতভাবে ব্যতিক্রম, যাঁরা মনোপলির পাপচক্রের মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে অসামান্য ভালো বা মোটামুটি ভালো লেখা লেখেন, তাঁরা তো আছেনই কয়েকজন। তার বাইরে আছে কিছু লেখক, খুব মুষ্টিমেয় অবশ্য, বাংলা দেশের পাঠকসমাজ তাঁদের নাম বিশেষ জানেন না, তাদের বই কম ছাপা হয়, আদপেই বিক্রি হয় না, এই যে কয়েকজন লেখক, এঁরা স্বাধীনতা-উত্তরকালের যে জীবন তাকে তার সমগ্রতায়, বৈচিত্র্যে, জটিলতা-সহ ধরবার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন, কখনো কখনো ধরতে পারছেন, কখনো কখনো পারছেন না। কিন্তু তাঁরা যে চেষ্টা করছেন, এটা নিশ্চিত ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত, এবং তারা চেষ্টা করতে পারছেন এই জন্যে যে, সুলভ জনপ্রিয়তার জালে তাঁরা নিজেদের জড়ান নি এবং সাহিত্যের জন্যে দুঃখবরণে এঁরা আজও প্রস্তুত।

প্রশ্ন: এ প্রসঙ্গেই আর একটি প্রশ্নে আসি, সেটা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যে আর-কি দুর্বলতাগুলো আপনি দেখেছেন?

উত্তর: আর-কি দুর্বলতা? এ-বিষয়ে বলার আছে আমার, জিজ্ঞেস

করা উচিত, আমি যে এই দীর্ঘক্ষণ ধরে কথাগুলো বললাম তার মধ্য থেকে কি কি দুর্বলতা আমি বলেছি বলে আপনারা বুঝলেন? কিন্তু আমি সে প্রশ্ন করছি না, আমি বলছি যে, আমি যা বলেছি তাতেই সব বলা হয়ে যায়। এক নম্বর কি? আমি বলেছি যে,—সেটা অবশ্য একলাইনে বলেছি, অনেকক্ষণ ধরে বলা যেতে পারত—উনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের শিক্ষিত, পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা দেশের সমষ্টির থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাঁদেব অনেক বড অবদান আছে, কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা তাদের জীবন ও কর্মকে প্রভাবিত করেছিল, পরবর্তী কালে তার দায়ভাগ আজও অবধি আমরা বহন করছি। আমরা প্রধানতঃ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লেখকরা, এ হচ্ছে 'এক', দ্বিতীয়ত, গত দশবছরে দেখেছেন যে, বাংলা উপন্যাস কি ভীষণভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক হয়েছে, আমার এমন কোনো ছক নেই যে উপন্যাস গ্রাম নিয়েই লিখতে হবে, নিশ্চয় না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবি যে একজন লেখক তিনি তার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ রাখেন কি করে বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে? আরো সত্যি করে বললে, বিশেষ কয়েকটি সামাজিক স্তর-বিন্যাসের মধ্যে? এই যে অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ রাখা, সংকীর্ণ রাখা, এটা তো আমার সমগ্রতা-বোধের ঘোরতর পরিপন্থী। এই জিনিসটাই চলতে থাকে। তৃতীয় ব্যাপার হল যে, এত কলকাতাকেন্দ্রিক বা শহরকেন্দ্রিক উপন্যাস লেখা হয়, কিন্তু কলকাতা শহর তার অসামান্য ঐতিহ্য, প্রচণ্ড বৈচিত্র্য এবং, কি বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে, মোদ্দা কথাটা হল, কটা উপন্যাসে কলকাতা শহরটা আসে, বা কলকাতার মানুষগুলো আসে। এখানে তাহলে বোধহয় দেখার মধ্যে কোথাও ফাঁকি বা ফাঁক থেকে যায়। যার ফলে আমরা কলকাতার বাইরের তো জানিই না, এমনকি কলকাতাকেও ভাল করে জানি না, আর আমি বলতে চাই যে জনপ্রিয় উপন্যাসের একটা ছক জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যখন লেখককে পরিচালিত করে তখন এই ধরনের ব্যাপারগুলি ঘটতে বাধ্য, এই।

প্রশ্ন: আর-কি কিছু চোখে পড়ে নি আমাদের কাছে বলার মত। দুর্বলতার আর কোনো ক্ষেত্র কি আপনার চোখে পড়েছে?

উত্তর: একটা কথা কি খুব স্পেশিফিক্যালি শুনতেই চান আপনারা, আপনাদের পরবর্তী প্রশ্নে দেখছি—'পশ্চিমী প্রভাব'। আমি পশ্চিমী প্রভাব ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝি না। পুরানো কথা যে, আমার বিশ্বাীক্ষা আছে,

তাই বিশ্ব সাহিত্যের যে মহৎ উত্তরাধিকার তা আমারই উত্তরাধিকার, যেমন রবীন্দ্রনাথের ছিল যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। এবং বাংলা সাহিত্যও পশ্চিম থেকে নানাভাবে ঋণ গ্রহণ করেছে। এগুলো সব কেতাবী কথা, বলতে সংকোচ বোধ করি। কিন্তু একটা কথা আমি বলি, ১৯৫৯/৬০ বা ৬১/৬২ সালে কলকাতা শহরে তরুণতর এবং তরুণতম কথাসাহিত্যিক, কবি, যাঁরা তাঁদের মত existentialism এবং আলবের ক্যামুকে বুঝেছিলেন এবং কিছু মার্কিন গল্প কবিতা-নাটককে একটু অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছিলেন তাঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, প্রধানত লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোয় যা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে, আমার বিচারে, কিছু সদর্থক দিকও ছিল। তাঁরা সমকালীন অবক্ষয়কে হয়ত তাঁদের অজ্ঞাতসারেই, তাঁদের সাহিত্যে প্রতিভাত করলেন। আর, আর-এক ধরনের ছকে তাঁরা পড়ে গেলেন, যে-ই ছক আবার প্রায়ই নন্‌কমার্শিয়াল সাহিত্যের বেশ ক্ষতি আনে। আমি কারোও নাম করলাম না, কোনো পত্রিকার নাম করলাম না, কোনো গোষ্ঠীর নাম করলাম না, ইচ্ছে করেই করবও না এখন। আশাকরি, আপনারা বুঝতে পারলেন আমি কি বলতে চেয়েছি, অর্থাৎ ব্যবসায়ী পত্রিকাগুলিতে যেমন একধরনের ছক ছিল, তেমনি কোনো কোনো অ-ব্যবসায়ী লিট্‌ল ম্যাগাজিনেও আর এক ধরনের ছক আবির্ভূত হল। এবং এই দুই ছক বাংলা সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আবার এই দুই ছকের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ বেশ কিছু ভাল লেখা লিখেছেন, এবং এই দুই ছকের বাইরে থেকেও কেউ কেউ আরো অনেক ভালো লেখা লিখেছেন। এই আমার মোট বক্তব্য।

প্রশ্ন : এই কালসীমাতে বাংলা সাহিত্যে গল্প নাটক কবিতা ইত্যাদি যতগুলি শাখা রয়েছে তার মধ্যে কোন শাখাটা সবচেয়ে বেশি ঐশ্বর্যবান হয়েছে ?

উত্তর : আমি যদি একটু গোষ্ঠীতান্ত্রিক হই তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন। আমি বলব গল্পের শাখা, এবং প্রমাণ হিসেবে আমি একজন সমালোচককে উদ্ধৃত করব। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে, বাংলা গল্পে যখন নতুন ভাবে গল্প লেখবার একটা চেষ্টা চলছিল, তখন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মোটামুটি ভাবটা আমি বলছি, আমারই ভাষায়। কথাটা এই ছিল যে চিরকাল বাংলা কবিতা বাংলা গল্পের চেয়ে এগিয়ে থাকত, পথ দেখাত। এই প্রথম বাংলা গল্প বাংলা কবিতার থেকে এগিয়ে আছে এবং বাংলা কবিতাকে প্রভাবিত করছে—এই জাতীয় কি যেন

একটা বলেছিলেন আর-কি! কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল তখন, বুঝতেই পারেন। এবং তারপর ষাটের দশকে বা এই সত্তরের দশকের পঁচাত্তর বছর চলছে, এই পনের বছরে তেমন কোনো আন্দোলন হয় নি সাহিত্যের, যা সবাইকে নাড়া দিয়েছে। কি গল্পে, কি কবিতায়। কিন্তু নিশ্চিতভাবে ভালো গল্প-কবিতা লেখা হয়েছে বেশ কিছু। আমার ত মনে হয়েছে এখনও যত কম সংখ্যাতেই হোক, বাংলা গল্পই বেশি লেখা হচ্ছে উপন্যাস-কবিতা-নাটক ইত্যাদির চেয়ে।

প্রশ্ন: একটা প্রশ্ন আছে—আপনি বলছেন গল্পটা সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে, কিন্তু এটাও বোধহয় আপনি দেখেছেন যে গল্পের বইটা সবচেয়ে কম বিক্রি হচ্ছে এবং গল্পের পাঠক খুব কমে গেছে এর কারণ কি?

উত্তর: আমি ঠাট্টা করে একটা কথা বলব, আমাদের একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতিক বলেছিলেন, statesman নিন্দে করেছে তাহলে বুঝতে হবে আমরা ঠিক পথেই আছি। তো আপনি বলছেন যে এখন যখন দশ-দিনে পনের-দিনে বই এর সংস্করণ হয় বলে বিজ্ঞাপন দেখি তখন বাংলা গল্পের বিক্রি একেবারে কমে গেছে? তাহলে হয়ত—ঠাট্টা করেই বলছি অবিশ্যি—যে, বাংলা গল্প বোধ হয় কিছু ভালই লেখা হচ্ছে।

প্রশ্ন—একালটাতে আপনি আমাদের সাহিত্যে এমন কিছু কি দেখেছেন যা সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর রচনাগুলোর সমপর্যায়ভুক্ত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: সমকালীন বিশ্বসাহিত্য আমি কিন্তু যথেষ্ট পড়ি নি এটা আগেই বলে রাখি। এমন-কি এক সময় যাদের লেখা দ্বারা আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম বলে কাগজে-কলমে কিছু লেখা হয়েছিল তাঁদের অনেক লেখা আজও অবধি আমি পড়তে পারি নি। এটা গৌরবের কথা নয়, লজ্জারই কথা, তবু এটা সত্যি কথা। তাই সমকালীন বিশ্ব-সাহিত্যের সম্পর্কে কিছু রায় দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে কিছু ত আমি পড়েছি। আমি টলষ্টয়, দস্তয়েভস্কি পড়েছি। পশ্চিমের আরো কিছু প্রাচীন মাস্টার্স বা আধুনিক লেখকের লেখা আমি পড়েছি। আমি মনে করি নিশ্চিতভাবে স্বাধীনতা উত্তর কালে, এমন কিছু গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে যা বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। এখন, আমরা কে না মনে করি, যে তারাশঙ্কর বা মানিকবাবুর অনেক লেখা নিশ্চিতভাবে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায়, কিন্তু আমি তাঁদের কথা বলছি না। আমি বলছি এই এখনকার লেখকদেরই কথা।

যেমন ধরুন, একটি উপন্যাস, 'অন্তর্জলী যাত্রা', যার কথা আমি আগেই বলেছি, আমি মনে করি মহৎ উপন্যাস। বা গল্প, আমি মনে করি যে আমাদের দেবেশ রায়, গত দশ বছরে কি পনের বছরে এমন কয়েকটি গল্প লিখেছেন যা নিশ্চিন্তভাবে পৃথিবীর পাঠকদের উপহার দেওয়া যায়। আপনারা যদি আমাকে একটু সময় দিতেন তাহলে আমি অসীম রায় এবং আরো কারোর কারোর কয়েকটি গল্পের কথা তালিকা করে দিতে পারতাম। সেগুলোও আমি মনে করি দুনিয়ার পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যায়। এবং এটা খুব অকুণ্ঠিতভাবেই আমি বলছি যে, নিশ্চয় যায়। এখন এঁদের দুর্ভাগ্য, যেমন দুর্ভাগা ছিলেন তারাশঙ্কর, মানিকবাবু যে এঁরা বাংলা ভাষায় লিখতেন, এবং আমাদের এই দেশে অনেক আয়োজন আছে কিন্তু বড় লেখার উপযুক্ত তর্জমা করার আয়োজন ঠিকমতো নেই। এবং তা বাইরের পাঠকদের পড়াবার ব্যবস্থাও ঠিকমতো নেই, তাই এঁরা বাইরে খুবই অপঠিত। আর তাছাড়া বাইরের কথা কি-ই বা বলব, ধরুন আমার ঘরেই কি কমলকুমার মজুমদার, দেবেশ রায়, অসীম রায় এঁরা আদৌ পঠিত! বহুল পঠিত ত দূরস্থ।

নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

দীপশিখা অনির্বাণ!

গোপাল হালদার

অরুণা হালদার

প্রদীপই আগুন, তবু প্রদীপ ফুরিয়ে যায়
হয়ত বা শেষকালে দীপকলিকার বৃন্তে
একটুকু ছাই পড়ে থাকে।
দীপশিখা ততক্ষণ জ্ব'লে, জ্ব'লে, চলে
শিখা থেকে শিখান্তরে—আলোক প্রয়াণে
অন্ধকার দীর্ণ ক'রে! তবুও জানি না
সে জ্বলা কি চলা নাকি নিয়তি নিষ্ফলা!
কখনও সে মাঙ্গলিক গৃহের অঙ্গনে
প্রিয়মুখে চোখের প্রদীপ প্রতিভাসে—
কখন সে দীপ্তশিখা—অতি সমুজ্জ্বল
কোনও আহিতাগ্নিক সংকল্পের
কল্যাণ শোভন হোমজ্যোতি!
শিখা থেকে শিখান্তরে—জ্বলে আর নেভে

কখনও স্তিমিত রেখা নিবিড় আঁধারে
কোথাও সে সুনির্মল পরিমিত আয়ুতৈল সেকে !

মানব হৃদয় শিখা হাসির প্রদীপে, দু চোখের জলে
ডাক দেয়—আলো দেয়—আর, নিভে যায়।
অ-পরিমেয় যন্ত্রণায় ইশারায়
দিগন্ত সম্বৃত কালো আকাশের বুকে
বিদ্যুৎ জ্বালায়।
দিশাহারা পথিকের অন্ধচোখে জাগে
ক্ষীণ দীপালোক—ভালোবাসা আলো হঠাৎ জ্বলে,
প্রাণের স্ফুলিঙ্গ থেকে নব প্রাণোন্মেষ
জন্মান্তরিত হয় মেঘে মৃত্তিকার স্বপ্নে—
আকাশের অন্ধকার চিরে দিয়ে যায়
বিজ্জ্বলন্ত অহমিকা বেদনাভিযান—
কাঁপা দীপকলিকার পাশাপাশি দীপ অনির্বাণ !
কাল থেকে কালান্তরে স্রোত বয়ে যায়
ক্ষীণ একা দীপশিখা দূর—আরও দূর !
তট হ'তে সীমাহীন তরঙ্গ বিস্তারে
আপন আবেধ লক্ষ্যে জ্ব'লে জ্ব'লে চলে যায়
সে চিরায়মান শিখা, একা বড় একা !
বিধূনিত তরঙ্গের ওপারে যায় না দেখা আর
এপারের মানুষের বাসনার বেদনার স্পর্শের বাইরে
দেখতে দেখতে শেষ প্রদীপের ইতিহাস—
সবটুকু একাকার উদয় বিলয়।

তারপরে ? একমুঠি ভস্মের তিলকে
মানুষের স্মৃতি খোঁজে চির নির্বাপিত
অনির্বাণ দীপ কলিকারে !

২২.১.৭৯

দীপেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদে শোকাহত অরুণা হালদার ও গোপাল হালদার এই কবিতাটি শ্রীমতী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠান

দীপেনের জন্য, একটি স্বপ্ন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমাদের বুকের ভেতর
যে হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করছে
তার সঙ্গে যদি
কিছু গরম চোখের জল মেশাতে পারতাম,
আমরা কি তা দিয়ে
অনেকগুলি রুটি বানাতে পারতাম
যা মানুষের ভালবাসার খিদে মেটায় ?

অথবা আমরা কি
শ্মশান থেকে ঘরে ফেরার পথে
সবাই একসঙ্গে
এমন একটি ভাল-থাকার গান বানাতে পারতাম,
যা শুনতে পেলে
আমাদের সেইসব বন্ধুরা—যারা আজ, কাল,
পরশু এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে
সবাই দল বেঁধে আবার ফিরে আসে ;
আমাদের গলায় তাদের গলা মেলায় ,
আর পৃথিবী
একটি আশ্চর্য, সুন্দর মানুষের পৃথিবী হয় ?

২০ এপ্রিল, ১৯৭৯

খবর

রাম বসু

দীপেনের ৪।৬।৭৮ তারিখের একটা চিঠির অংশ : 'আমি লোকটা যে আছি না গেছি একবার খবর তো নেন না।'

নিশাক্রান্ত রণভূমি পার হয়ে গেলে
পুরাণের চরিত্রের মতো

খবর এখনই নিতে হবে
কারণ, এখন তুমি বাঁচার প্রখর সুগন্ধি ।

বুকের আট দলের পদ্মটা ফেটে পড়েছে
বৃষ্টির ধারায় ভিজে গেছে আশ্রয়ভূমি
দীপেন, পরস্পরের নিবিড় খবরের সময় এল এখন !

ধ্রুবপদের পায়ে পরিপূর্ণ ফল
আলোর প্রান্তরে ঋতুচক্রের গোলাপ
ঠোঁটে অপরিমিতের স্বাদ
দুই হাতে গরল আর অমৃত
তুমি এখন নক্ষত্রের ধুলোয় প্রসারিত
নদী আর নক্ষত্রের কাছ থেকেই তোমার
খবর পাবো, দীপেন ।

রাজার চিঠি

সিদ্ধেশ্বর সেন

শ্রীমান দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য

": প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও—এখন আকাশের
তারাটি থেকে আলো আসুক
: এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন ! তারার
আলোতে আমার কি হবে !
: চুপ করো অবিশ্বাসী ! কথা কোয়ো না"

—ডাকঘর

সুধা, দাও তোমার ফুল

অমলের শিয়রে রইল

তোমার ফুল র'য়ে গেল, তুমি
তো তোলোনি তাকে, এই সত্য থাক—

কেউ কী তুলেছে তাকে, কে
ও-কে তোলায়

হাসপাতালের মধ্যে যে বকুল, তার কতো ফুল
ঝরে যায়

ফুলের স্তবক, স্তূপ, ক্রিমেটোরিয়ম
অবধি ছড়ায়

ফুল থেকে
আগুনের ফুল্‌কি, থেকে
আকাশের তারা থেকে আলো—

প্রদীপ নিবিয়ে ফেলো

বন্ধ যত দরোজা-জানালা খুলে দিলেন রাজ-কবিরাজ,
অন্ধকারের ওপারের সব তারা
দেখে তুমি নিয়েছ অমল ?

মধ্যরাতে রাজা এলেন নিজে, শয্যা ছেড়ে
উঠেছ অমল ?

রাজদূত বার্তা এনে দিয়েছিল জানি, ঘার ভেঙে,
তোমার প্রহরীর ঘণ্টা তেমনি কি বেজেছিল
ঢং ঢং ঢং
দু' প্রহরে, রাতে, তুমি শুনেছ অমল ?

রাজার চিঠি তো ছিল, ফকিরের বেশে সত্যবাদী

ঠাকুর্দা হলফ করেছিল

গাঁয়ে-না-মানলেও সেই আপনি-মোড়ল
স্থূল হাসাহাসির বিষয়, তবু তুমি
ক্ষমা করে দিলে যে তাকেও, অমল

তোমার নামের মতো অনাবিল, তুমি না অমল,
তোমার জানালার পৈঠে বেয়ে, তাই
চলে যেত লোকযাত্রা ঘুরপথে, দূরে
পাহাড়, ঝর্ণা, নদী ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে

কখনো সে দইঅলার হাঁকে, ছেলের দলের
চাষবাসের খেলায়
মল ঝল্‌মল্‌-করা মালিনীর মেয়ের
ফুলের সাজির সঙ্গ নিয়ে

রাজার তকমা-আঁটা ডাক-হরকরাদের কাঁধে
একগাদা বিলি-করবার
চিঠির থলিতে
(তোমারও চিঠিটি যার মধ্যে ছিল, লুকিয়ে, অমল)

বাদল-হরকরা, শরৎ-হরকরা,—ঋতুতে, ঋতুতে প্রত্যেকে ওরা—
মনে পড়ে ?

মনে পড়ে পাঁচমুড়ো পাহাড়তলীতে, শামলী নদীর ধারে
গাঁ ?
খঞ্জ ভিখারী এক নতুন কাহিনী শুনে গিরিও ডিঙোতে যেত মনে

আর, লাঠির আগায় পুঁটুলিতে চিঁড়ে বাঁধা
পুরোনো নাগরা জুতো পায়
ডুমুর-গাছের তলা দিয়ে, ঝিরঝিরে নদীটি পেরিয়ে

কাজ খুঁজতে যাওয়া সেই মানুষ, অমল
তোমারই দেখা

কাজ খুঁজতে কাজ খুঁজতে, মানুষ
খুঁজতে খুঁজতে, মানুষের কাছে
তোমাকেও দেখা যে, অমল

একটি তারার আলো ধ্রুব-বিশ্বাস
রাজা এসে জাগাবেন ও-কে—
ততক্ষণ দিয়ে যেও ফুল,
বোলো 'সুধা, ভোলেনি তোমাকে'

তুমি আছো, সেইভাবে আছো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসা ভেবেছিলো, তোমাকে অর্পণ করে তার
যা আছে সবটুকু, দিয়ে, ছুটি নেবে, বিদায় জানাবে ··
বিচারসাপেক্ষ এই জনে-জনে বেঁটে দেওয়া থেকে
এবার নিষ্কৃতি নেবে, ভালোবাসা ভেবেছিলো এই
কিন্তু, তুমি ছুটি নিয়ে গেলে···
স্মৃতির স্থগিত রূপ রেখে গেলে চোখের সুমুখে
বুকের ভিতরে রেখে গেলে নিষ্ঠাবান মাতৃসুখ
করস্পর্শ রেখে গেলে শোকদুঃখ থেকে তুলে নিতে
বন্ধু ও শিশুর মতো কতোকাল তোমার প্রশ্রয়
পেয়েছি, তা, আমি জানি, আর জানি কখনো পাবো না।

পিছনে দেবদারু গাছ, তার শান্ত ছায়ার বিকেলে
প্রেসিডেনসি কলেজের সেই থেকান, উর্ধ্বগামী সিঁড়ি
বরফখণ্ডের রোজ বারান্দার এখানে-সেখানে
পড়ে আছে, তুমি নেই...
কোনদিন ছিলে না এমন, ছিলে নাকি ?

স্বভাব ছিলো না কিছু আগে আসা, সময়ের আগে ?
সময়ের বেশ কিছু আগে এসেছিলে বলে আফসোস করোনি
এতো স্বাভাবিকভাবে তুমি সব মেনে নিয়েছিলে
আমরা পারি নি, তাই, মাঝেমধ্যে বেঁকেচুরে গেছি···

সাদর আঙুল তুলে তুমি সাবধান করে দিতে, মনে আছে ?
তোমার মন তো ভালো, কারো মন্দ কখনো ছাখোনি
নিজেকে বিপন্ন করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছো
দীর্ঘ ও সহাস্য হাত অসুখের রেখেছো কপালে
কতোবার, আরোগ্যের মধ্যে ছিলো তোমার করুণা।
করুণাই বলি একে, বিশ্বাসভাজন ভালোবাসা
কিংবা, তারও চেয়ে কিছু বেশি এই নিষ্পলক আলো
অন্ধকার গলি থেকে বহুবার সড়কে এনেছে
আমাদের।

বন্ধু, সুখে থেকো আর মনে রেখো দেবদারুচ্ছায়ে
কিছু কিছু লতাগুল্ম, ছোট গাছপালা—তার কথা
তোমার মন তো ভালো, মনে রেখো, পরিত্রাণ করো
প্রকৃত সংকট থেকে, ভালোবাসাহীনতার থেকে
ক্ষমা করো, শেষ দৃশ্যে আমি যেতে কিছুতে পারি নি
যাতে, মনে হতে পারে, তুমি আছো, সেইভাবে আছে,
যেভাবে আগেও ছিলে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে
কাছাকাছি

ক্রীতদাস কি বোঝে মুক্তির ?

অমিতাভ দাশগুপ্ত

'প্রায়'—এই শব্দটির ভুল ব্যবহারে
প্রকৃত প্রলয় ঘটে যেতে পারে—একথা জেনেও
আমার সমস্ত প্রায় কেড়ে নিয়ে চলে গেলে তুমি

বিপন্নতা এসেছে এখন
অমোঘ মোষের মত প্রস্তুতিবিহীন খুব কাছে।
তাছাড়া আমার আছে লাল শার্ট
যা সবারই প্রিয়,
বিশেষত পশুদের—নির্বিবেক বুনো প্রবৃত্তির
ভারী মনোমত সেই বিপদসংকেত,
অমোঘ মোষের মত খুব কাছে এসেছে এখন
প্রস্তুতিবিহীন—বিপন্নতা।

স্তিমিত আলোর নিচে ঐখানে সমাসীন ছিলে।
টেবিল ও থুতনির মাঝখানে হাতের হাইফেন
বালকের চেয়ে খুশি প্রবীণের চেয়েও গম্ভীর
দশবছর আশিরনখর
আমাকে জরিপ করে কি পেয়েছ? খুঁতো গুল্ম, তীক্ষ্ণ কাঁটাগাছ?
ভালো নয়, কমসম নষ্ট, কবি নামে হঠকারী?
অত ভালোবাসা মানে শাস্তি, মানে দীর্ঘ দশ বছর
মুঠো খুলে ফেলা নয়, পুরো নষ্ট হতে দেওয়া নয়।

তোমার মৃত্যু এসে একটানে হঠায় চাদর।
বাতাসে উড়েছে খড়, ময়না কাঁটা উড়ে এসে
বসেছে তালু ও বুকে,
সকলেই ছুঁড়ে দিয়ে অনুকম্পা
যার যার তুলেছে কুঠার—
দায়বদ্ধতার থেকে পুরোপুরি কাকে মুক্তি দিয়ে যাও তুমি?

আমার অসুখ আগে নিয়েছিলে,
পরাধীনতার অর্ধ সুখ
সেই সুখও কেড়ে নিলে,
কাকে মুক্তি দিয়ে যাও—ক্রীতদাস কি বোঝে মুক্তির

দীপ

কবিতা সিংহ

গগন ঠাকুর তাঁর জলরঙা ছবিটির থেকে
ডোবান-ওঠান তুলি
রঙে রঙে গাঢ় ছয়লাপ!
তুমি সেই প্রলাপের পরপারে গিয়ে পাও—
জীবনের দুরূহ সরল।

অমন সজল ধাপ
অমন তরল ধাপ
দুলে ওঠা রক্তের সরণি ধিকি ধিকি

বড় অশ্রুময় এই উত্তরণ ওঠা
বড় রক্তময় কাঁটা ফোটা!

দুলন্ত সময় থেকে, ঘুরন্ত সময় থেকে তবু তুমি
তুলেছ তর্জনী
তোমার নির্বাকে আমি
আমি, ও আমরা সব—
সময়ের বজ্রঘোষ শুনি।

হিরণ্ময় দেবদারু

লসী মুখোপাধ্যায়

কার কাছে যাবো আর
কোথায় দাঁড়াবো? আশ্রয় কোথায়?
যুদ্ধ কই? নিরাময় কই?
মাংসাসী প্রেমিকার মতো
নষ্ট পাপোষ এসে

কোমর তুলিয়ে ধরছে তীব্র নখে দাঁতে
চিলের ঠোঁটের মতো
ঘরের আরাম এসে ছোঁ মেরে নিতে চাইছে
অন্ধকার কামুক পাতালে
কে দেবে শাসন ? বিবেক কোথায় ? কোথায় তক্ষক ?
চিত্রল হরিণী ডাকছে
মায়াময় গূঢ় আলিঙ্গনে
অবিরাম···দিবানিশি···অবিরাম
অশ্বখুরে জ্যাকপট অশ্বখুরে জ্যাকপট ঝমাঝম জ্যাকপট
হায় ! এই অলৌকিক মত্ত আন্দোলনে
আমি আর শিরদাঁড়া রাখতে পারি না
আমি আর শিরদাঁড়া রাখতে পারি না
কে দেবে উদ্ধার ? কে দোলাবে জয়ের নিশান ?
দীপেন্দ্রনাথের মতো আর কোনো দেবদারু
আর কোনো হিরণ্ময় দেবদারু
আমাদের চারপাশে নাই !

হিক্রদের ভগবান

কমল চক্রবর্তী

আগুনের জাহাজে আগুন ধরিয়ে এলুম।
দীপেন মারা গেছেন।
আমাদের ঘোড়াটির রং কালো
বিদ্যুৎবাহী ঘোড়াদের খুরে আগুন ধরেছে, হে আকাশ।

ধরা যায় রাত হয়, রাতে কাক ডাকে, কাকের পালকে ভালবাসা
গতকালও খোকাদের জন্য মোয়া গেছে
শেষ ট্রেনে আবেগ তাড়িত পোনা মাছ, চিতলের পেটী

গতকালও জবা ফুল ফুটেছে মড়কে
আজ দীপেনের চণ্ডালেরা ভাত ঘুম ভেঙে, কাঠ নিয়ে তর্ক জুড়েছে

এসো খেয়া পারাপার করি
মনে শোক গোপন কোর না নৌকো বাও, মন মুরশীদের ছবি
দূরে গেলে ছাপাখানা ঘণ্টা হয়ে বাজে
রতিশাস্ত্র বিশারদ কলম ধরেছেন, ভুবনের মা
হিক্রদের ভগবান বড় বেশি সময় নিচ্ছেন, জেগে ওঠো।

দীপেন্দ্রনাথ সঙ্গে আছে

অমরেশ বিশ্বাস

সপ্তব্যূহের বেড়াজালে
পথ পাওয়া-না-পাওয়ার কালে
দুহাত কাটা নেত্যচরণ
আগুন নিয়ে রক্তে নাচে।
বস্তুত এই মাৎস্যন্যায়ে
মিছিল হাঁটে পায়ে পায়ে
বজ্রমুঠি একটি মানুষ
কলম শানায় অসির ধাঁচে
দেউলে-হওয়া আমরা দেখি
মরে গিয়েও হয় নি মেকি
ছোটো মাপের বড়ো মানুষ
দীপেন্দ্রনাথ সঙ্গে আছে।

স্বর্গের ঠিকানায়

প্রশান্ত মিত্র

জানি না মুখোমুখি দেখা হয় কি না,
হবে কি না।

শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর মতো
আজকের 'স্বকীয়' জীবনের মেলায়
স্বরাজতা নিয়ে—
সর্বজনের কারণে কর্ম যেখানে তোমার
'স্বার্থ' হয়ে উঠেছিল।

সম্ভাবনা শেষ বিন্দু স্পর্শ করে না কেন?

অনেককেই না পেয়ে
শেষ পর্যন্ত তোমার দেখা পেলাম।
আর পাশে টেনে নিলে—
স্বর্গে আলোকিত হতে গোত্রবিচার নেই।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিন্তু তুমি আমার অগ্রজ,
আয়ু থাকলে প্রথম জীবনের অভিভাবককে
হারাতেই হয়,
কিন্তু শেষ জীবনের বয়ঃকনিষ্ঠ
অভিভাবককেও হারাতে হবে—
ভাবিনি;
জীবন বড়ো নতুন-নতুন ক'রে ভাবায়।

আত্মজীবনে কোথায় যেন চিড় ধ'রে গেল!

দীপেন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জি

পরিশিষ্টের সংযোজন

রচনাপঞ্জির পরিশিষ্টে দীপেন্দ্রনাথের এমন কয়েকটি রচনার উল্লেখ করা হয়েছিল যেগুলির প্রকৃত শিরোনাম ও প্রকাশ তারিখ এখন জানা যায় নি। সেগুলোর ভেতর কয়েকটির ও কিছু নতুন রচনার প্রকাশ-তথ্য রচনাপঞ্জি-অংশ ছাপা হয়ে যাওয়ার পর সংগ্রহ করতে পেরেছি।

মালবিকা চট্টোপাধ্যায়

১৩৭৭ [১৯৭০]

শ্লোক। 'সুকান্ত স্মৃতি', ১৫ জুলাই, ৩০ শ্রাবণ

১৩৮০ [১৯৭৩-৭৪]

শোক মিছিল। গল্প, পরিচয়, শারদীয় ১৩৮০, ১৯৭৩

১৩৮৪ [১৯৭৭]

বিবাহ বার্ষিকী। উপন্যাস, কালান্তর, শারদীয়

১৩৮৫ [১৯৭৮]

প্রিয়েরে দেবতা করি। সাপ্তাহিক ঘরোয়া, ১৪, ২১, ২৮ এপ্রিল ও ২২ মে

গোরা: তমিজ বাংলা উপন্যাসের মুক্তি। পশ্চিমবঙ্গ ১৯ মে, ৪ জ্যৈষ্ঠ

চার্লি চ্যাপলিন ও কুমারসম্ভব কাব্য। সাপ্তাহিক ঘরোয়া, ২৬ মে

সুকুমারী গোলাপের কথা। সাপ্তাহিক ঘরোয়া, ১৬ ও ২৩ জুন,
৭ ও ১৪ জুলাই

দীপেন্দ্রনাথের স্মরণে

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতা শহরে, ১৯৩৩ সালের ১০ই নভেম্বর। পাঁচ ভাই, তিন বোনের পরিবারে তিনি ছিলেন চতুর্থ।

তাঁর শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বেশির ভাগ সময়টাই কেটেছে উত্তর কলকাতায়, বা আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে শিয়ালদহ-বৌবাজার এলাকার মধ্য কলকাতায়। শিয়ালদহের কাছে তাঁদের পারিবারিক বসবাস ছিল দীর্ঘকাল—১৯৫৭ পর্যন্তও। তখন দীপেন্দ্রনাথ পঞ্চম বর্ষের ছাত্র। তারপর তাঁরা নিউ আলিপুরে নিজেদের বাড়িতে উঠে যান।

অবশ্য কলেজে ঢোকার পর থেকে শুধু এই অঞ্চলটুকুই নয়, সারা কলকাতা শহরই চষে বেড়াতেন তিনি—কখনো ছাত্র-আন্দোলনের সূত্রে, কখনো-বা নিতান্তই সাহিত্যিক আড্ডার টানে। ফলে তাঁর বিভিন্ন গল্পে ও উপন্যাসে কলকাতা শহর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রথম দিকের কিছু রচনা বাদে এই কলকাতাই ছিল তাঁর গল্প-উপন্যাসের পটভূমি।

অবশ্য তাঁদের পিতৃপুরুষের বাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। সেদিক থেকে এই আজন্ম নাগরিক লেখকের একটি শিকড় পূর্ববাংলায়। দেশে অবশ্য তিনি খুব একটা যান নি। একবার গিয়েছিলেন, খুব ছোটবেলায়, পরিবারের লোকজনের সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও গিয়েছিলেন। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। আরো একবার ১৯৭২ সালে, বাংলাদেশ তখন স্বাধীন।

পূর্ববাংলার সঙ্গে এই যোগসূত্র নিয়ে কখনো ভাবাবেগ প্রকাশ করেন নি দীপেন্দ্রনাথ। কিন্তু, বোঝা যায়, এই সময়েই পূর্ববাংলার প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আগামী' যখন তিনি লেখেন, তখন তাঁর বয়স ১৮। এই উপন্যাসে তিনি পূর্ববাংলার অনতিনির্দিষ্ট স্থানকে তাঁর ঘটনাস্থল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দেশ-বিভাগের যে-যন্ত্রণা তাঁর লেখকজীবনের সূত্রপাতের সমসাময়িক ঘটনা, তাকেই তিনি রূপ দিয়েছিলেন খেয়া-পারাপারকারী বোবা মাঝির রূপকে।

১৯৫৪ সালের পুজো সংখ্যা 'নতুন সাহিত্যে' তাঁর 'ভাসান' গল্পটি বেরোয়। এই 'ভাসানে'-এ পূর্ববাংলার মানুষ আর প্রকৃতি অনেক বেশি প্রত্যক্ষ।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, যদিও তিনি কোনোদিনই কলকাতা শহরের বাইরে দীর্ঘকাল বসবাস করেন নি, কিন্তু 'আগামী' ও 'ভাসান' দুটিতেই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে দেখাতে পেরেছেন অসামান্য দক্ষতা।

দীপেন্দ্রনাথের স্কুল-জীবন শুরু হয় কলকাতায় সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে। বাল্যে মেরুদণ্ডের গুরুতর পীড়ায় তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল দেড়-দু-বছর। তারপর তিনি দেওঘরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে যান পড়তে। বিদ্যাপীঠে দীপেন্দ্রনাথ নানারকম সাংস্কৃতিক কাজে অংশ নিতেন ও উঁচু ক্লাসে নেতৃত্ব দিতেন। কিশোর দীপেন্দ্রনাথ এই বিদ্যাপীঠেই একটি হাতে-লেখা দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বলা যায়, দীপেন্দ্রনাথের সম্পাদনা কর্মের এখানেই হাতে খড়ি। বিদ্যাপীঠের সন্ন্যাসীগণ দীপেন্দ্রনাথকে তাঁর সাহিত্যকর্মেও নিয়ত উৎসাহ দিতেন। স্বামীজিদের কারো কারো প্রভাব তাঁর জীবনে বেশ গভীর ভাবেই পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে পান্নু মহারাজের নাম তিনি প্রায়ই করতেন। ধার্মিক ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে স্বামীজিদের সংস্পর্শে কিছুটা আধ্যাত্মিকতার দিকেও ঝুঁকেছিলেন। তখনকার অনেক স্বামীজি পরেও দীপেন্দ্রনাথের খোঁজ-খবর রাখতেন—এখন তিনি নাস্তিক ও মার্কসবাদী জানা সত্ত্বেও।

দীপেন্দ্রনাথের পরিবারে রাজনীতির পরিবেশ ছিল। পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। পিতা ধীরেন্দ্রনাথ দেশবন্ধুর নেতৃত্বে রাজনীতি করেছেন। তাঁদের পরিবারের অনেকে পরে ও এখনো রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন ও আছেন।

দেওঘরে থাকার সময়ই ছাত্রাবস্থায় দীপেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা বেরোয় তখনকার দৈনিক 'কিশোর'-এ। আর তারপর, বোধহয় বছরখানেক বাদেই বেরোয় তাঁর প্রথম বই 'আগামী'—অন্নদাশঙ্কর রায় তার ভূমিকা লিখেছিলেন।

ভালো রেজাল্ট করে ১৯৫২ সালে স্কুল ফাইনাল পাশের পর দীপেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কলেজ জীবনের প্রথম দিকে সাহিত্যই ছিল তাঁর প্রধান ব্রত। কিন্তু তখনই তাঁর সাহিত্যে এসে যুক্ত হয়েছে প্রখর সমাজবাস্তবতাবোধ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে একটি ছাপানো সাময়িকপত্রও প্রকাশ করেন। সেই সাময়িকপত্রের একটি-দুটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল, কিন্তু সাংবাদিক-রচনায় দীপেন্দ্রনাথের ক্ষমতার পরিচয় তাতে পাওয়া যায়।

সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের খানিকটা পারিবারিক পরিচয়। তাঁরই সস্নেহ আনুকূল্যে দীপেন্দ্রনাথ বৃহত্তর সাহিত্যিক পরিবেশে পরিচিত হন। তিনি তাঁর প্রকাশনালয় 'মিত্রালয়' থেকে দীপেন্দ্রনাথের 'কাছের যারা', 'তৃতীয় ভুবন' ও 'চর্যাপদের হরিণী' এই তিনটি বই প্রকাশ করেন।

এ ছাড়া, সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন দীপেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন। রমেশচন্দ্রর বাড়িতে সাহিত্য সেবক সমিতির নিয়মিত অধিবেশন হত। দীপেন্দ্রনাথ তাঁর কম বয়স সত্ত্বেও এই সমিতির অধিবেশনে নিয়মিত যেতেন, আলোচনায় অংশ নিতেন ও গল্প পাঠ করতেন। কাছের যারা গল্পটি তিনি এখানে প্রথম পড়েছিলেন।

'নতুন সাহিত্য' মাসিক পত্রের সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। শিশু ও কিশোর সাহিত্যের বাইরে তাঁর গল্প প্রথম 'নতুন সাহিত্য'-তেই প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই পত্রিকার সম্পাদক অনিলকুমার সিংহ তাঁকে সস্নেহ যত্নে লালন করতেন।

১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ সফরে যে সাহিত্যিক প্রতিনিধিদল গিয়েছিলেন তাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন, দীপেন্দ্রনাথও ছিলেন। মনে হয় এই সময়েই সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর মাধ্যমে দীপেন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এই পূর্ববঙ্গ সফরের বিবরণ দিয়েই 'পরিচয়'-এ তাঁর লেখা শুরু। এই সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ননী ভৌমিক দীপেন্দ্রনাথকে প্রশ্রয়ই দিয়েছেন শুধু তাই নয়,

বস্তুত দীপেন্দ্রনাথের গল্পরচনায় ননী ভৌমিকের ও জীবনচর্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা ও প্রভাব কার্যকর ছিল।

সাহিত্য ও রাজনীতির এই পরিবেশের মধ্যেই দীপেন্দ্রনাথের কলেজ-জীবনের প্রথম দু বছর কাটে। ১৯৫৪ সালে তিনি আই-এ পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভর্তি করতে প্রত্যাখ্যান করেন। সেই বছরই স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলা অনার্স সহ বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন। তখনই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে যুক্ত হন এবং ছাত্র সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ দীপেন্দ্রনাথের জীবনে এক অত্যন্ত, বলা যায় প্রায় সবচেয়ে, মূল্যবান অভিজ্ঞতা। এই সদস্যপদ তাঁর কাছে ছিল—পৃথিবীর সব দেশের মেহনতী মানুষের সঙ্গে মৈত্রীর প্রতীক, আন্তর্জাতিকতাবাদের উত্তরাধিকারের রূপক, আর তাঁর নিজের কর্ম ও জীবনের সমন্বয়ের প্রধান সূত্রটির সংকেত।

দীপেন্দ্রনাথের রাজনীতি-সচেতন পরিবারে একমাত্র তিনিই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁদের পরিবারে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনেক গুরুত্ব-পূর্ণ নেতাও ছিলেন। মতাদর্শের এই বিরোধ তাঁর ছাত্রজীবনে যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাঁর কর্মমুখর যৌবনেও। ছাত্রজীবনে পরিবারের সস্নেহ প্রশ্রয় যেমন হয়ত তাঁকে পাশ কাটিয়ে গেছে তেমনি আবার দীপেন্দ্রনাথকে তাঁর অবস্থার মূল্য হিসেবে দুঃখব্রতও গ্রহণ করতে হয়েছে বারবার। যে-রাজনীতি ছিল দীপেন্দ্রনাথের জীবন ও বিশ্বই, তাতে তাঁর বৃহত্তর পারিবারিক পরিবেশের সমর্থন ছিল না।

স্কটিশচার্চ কলেজে, দীপেন্দ্রনাথের জীবনের আরো একটি প্রধান ঘটনা ঘটে। তাঁর সহপাঠিনী শ্রীমতী চিন্ময়ীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়। ১৯৫৯ সালে তাঁদের বিবাহ। তাঁদের দুজনকেই প্রবল বাধা পেরিয়ে পরস্পরের কাছে আসতে হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিজীবনের এই প্রেম ও দাম্পত্য তাঁকে মানবসম্পর্কের এক অমলিন উৎসের সঙ্গে গ্রথিত রেখেছে। তাঁর গল্প-উপন্যাসেও ঘটেছে তার ছায়াসম্পাত। কোনো বিশেষ গল্প বা উপন্যাসের উদাহরণ হয়তো এখানে অবান্তর, কিন্তু কথাসাহিত্যিক হিসেবে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর বস্তুবিশ্বে প্রবেশ করেন তাঁর ব্যক্তিবিশ্বের এই একান্ত অন্তরপথ দিয়েই।

বি-এ ক্লাশ দীপেন্দ্রনাথের কেটেছে উত্তাল রাজনীতিতে ও সাহিত্যে, ছাত্র আন্দোলনে ও সংগঠনে, পরে, যুব আন্দোলনে, বিভিন্ন যুব উৎসবের সাহিত্য-সংক্রান্ত অধিবেশনের সংগঠনে। পঞ্চাশের দশকে বামপন্থী রাজনীতিতে চঞ্চল পশ্চিমবাংলায় রাজনীতি আর সাহিত্য এইভাবেই তাঁর ব্যক্তিত্বে ও কর্মে মিলেমিশে গেছে। এই সময়ে লেখা তাঁর গল্পগুলির ভেতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ভাসান' ও 'মুহূর্ত'। স্কটিশচার্চ কলেজে তাঁর ছাত্রজীবনের আলেখ্য পাওয়া যায় ১৯৫৭ সালে লেখা 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে।

১৯৫৬ সালে দীপেন্দ্রনাথ বি-এ পাশ করেন ও বাংলা এম-এ ক্লাসে ভর্তি হন।

স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র আন্দোলনের ধারাতেই বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তাঁর দু-বছরের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি ছাত্র-সংসদের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা 'একতা'-র সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনও ছিল প্রধানত ছাত্র-আন্দোলন ও কলকাতাকেন্দ্রিক। পশ্চিমবাংলার ছাত্র-আন্দোলনে তখন দীপেন্দ্রনাথের স্থান ছিল বেশ উঁচুতে।

বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত, সাহিত্য-আন্দোলন ও রাজনীতি সব দিক থেকেই সহযাত্রী দেবেশ রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাত। ১৯৫৬-৫৭ সালে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নিয়ে যে আত্মসচেতনতার আন্দোলন শুরু হয়, দীপেন্দ্রনাথ তাঁর কমিউনিস্ট প্রত্যয় নিয়ে তাকে নিছক প্রকরণের চর্চা থেকে উত্তীর্ণ করে বিষয়-অন্বেষণের গতিমুখে স্থাপন করেন। এই সময়কার লেখা গল্পগুলো পড়লে দেখা যায়, দীপেন্দ্রনাথের গল্পগুলো কিভাবে সমগ্র আন্দোলনের দিকদর্শনের কাজ করেছিল। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' নামে একটি অনিয়মিত কাগজ কিছুদিন বেরিয়েছিল বলে এই আন্দোলনকে 'ছোটগল্প—নতুন রীতি' নামেও চিহ্নিত করা হয়।

১৯৫৬ থেকে ৬২ এই মাত্র ছটি বছর দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের সবচেয়ে উর্বর সময়। এই সময়ের ভেতর বেরিয়েছে গ্রন্থাকারে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'তৃতীয় ভুবন' এবং 'ঘাম', 'নরকের প্রহরী', 'চর্যাপদের

হরিণী', 'জটায়ু', 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'স্বয়ম্বর সভা', 'ফুল ফোটার গল্প', 'উৎসর্গ', 'পরিপ্রেক্ষিত'—এই অবিস্মরণীয় গল্পগুলি।

৬৩ সালে দীপেন্দ্রনাথের কন্যা মৃত্তিকার জন্ম। সেই সময় তিনি তাঁদের পারিবারিক বাড়ি ছেড়ে মনোহর পুকুর রোডে একটি একতলা ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন। এই বাড়িতে কিছুদিন বাসের পর দীপেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই পূর্ণ-যৌবনে যখন দীপেন্দ্রনাথ তাঁর জীবন ও কর্মের এক আস্থাবান বোধে দৃঢ় ও ভবিষ্যৎ-কর্মে প্রস্তুত, সেই সময় চীনের ভারত আক্রমণ ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙন দীপেন্দ্রনাথকে বিধ্বস্ত করে দেয়। তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরও দীর্ঘদিন তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকতে হয়। সুস্থতার পর আবার তিনি পারিবারিক বাস ছেড়ে নিজের আলাদা বাড়ি ভাড়া করেন। এরই মধ্যে মাত্র একমাস তিনি সাপ্তাহিক বসুমতীতে চাকরি করেছিলেন।

৬২ সালের পর আর তিনি মাত্র দু-বার দুটি গল্প লিখেছেন। ৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার পরে, রাষ্ট্রশক্তির প্রতি-হিংসার বিরুদ্ধে বামপন্থী গণ-জাগরণের ক্ষ মুহূর্তে: 'হওয়া না-হওয়া'। আর ১৯৭৩-এ পশ্চিমবাংলার বামপন্থী, বিশেষত কমিউনিস্ট আন্দোলনের জিঘাংসু আত্মহত্যার পরাজয় মুহূর্তে: 'শোক মিছিল'। দীপেন্দ্রনাথ এর পর আর একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, ১৯৭৭-এর শারদীয় 'কালান্তর'-এ—'বিবাহবার্ষিকী'। দীপেন্দ্রনাথের শেষ রচনা ১৯৭৮-এর শারদীয় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'পাড়ি'—শম্ভু মিত্র-র 'চাঁদ বনিকের পালা' পাঠ নিয়ে লেখা।

এখন, দীপেন্দ্রনাথের জীবনের অবসানে যেন ছক কেটে বলা যায়, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির সবচেয়ে উর্বর কালের শেষেই সাহিত্য-জগতে তাঁর অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার শুরু, সম্পাদক-হিসেবে।

'পরিচয়' মাসিকপত্রের সঙ্গে যোগ তাঁর কলেজ-জীবন থেকেই। 'পরিচয়'-এর কর্মী হিসেবে তিনি সক্রিয় হন ১৯৫৯ সাল থেকে। সেই সময় থেকেই তিনি 'পরিচয়'-এর অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে সাময়িক অসুস্থতার ফলে কিছুদিন তাঁর সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু যে মহাকাব্যিক মানবিক বীরত্বে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর শারীরিক বাধা অতিক্রম করেছিলেন, তারই জোরে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর মানসিক বাধাও

সামলে ওঠেন। ১৯৬৮-তে আর শুধু সহ-সম্পাদক নন; 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সম্পাদনাকর্মে দীপেন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদকদের সঙ্গে তুলনীয়। এ-বিষয়ে উপেন্দ্রনাথ-রামানন্দ তাঁর পূর্বসূরী। পাঠক ও লেখকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগস্থাপনে, প্রেরিত বা আমন্ত্রিত প্রতিটি লেখার নিখুঁত সম্পাদনায়, প্রতিটি প্রুফ সংশোধনে, নতুন লেখকদের দিয়ে লেখানো ও পুরনো লেখকদের অবিরল অনুরোধ জ্ঞাপনে তিনি নিজেকে বাংলা-সাহিত্যের আদর্শ সম্পাদকে পরিণত করেছিলেন।

কিন্তু কর্মের সেই চূড়ান্ত নিপুণতার সঙ্গে মিশে ছিল সাহিত্য স্রষ্টার দূরবিস্তারী কল্পনা। ইতিহাসবোধ ও সাহস নিয়ে তিনি 'পরিচয়'-এর একেকটি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা করতেন এবং তাকে রূপায়িতও করতেন।

দীপেন্দ্রনাথের সম্পাদনা-কর্মের আরেক উদাহরণ শারদীয় 'কালান্তর'। বেশ কয়েক বছর তিনি 'কালান্তর' শারদীয় সংখ্যার সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় এই পত্রিকাটির উৎকর্ষ দলমতনির্বিশেষ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

এই সম্পাদনাকর্মের সঙ্গেই দীপেন্দ্রনাথ যুক্ত করেছিলেন সাংবাদিকতাকে। 'কালান্তর' পত্রিকার সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই জড়িত। এই কাগজে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত রিপোর্টাজ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭-র নির্বাচনের পর, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিলের পর, ১৯৬৯-র নির্বাচনের আগে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে—তাঁর রিপোর্টাজ ও ফিচার রচনা 'কালান্তর'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে, পাঠককে আলোড়িতও করেছে। সাপ্তাহিক 'কালান্তর'-এ 'ঘোড়েওয়ালাবাবু' নামে এক দীর্ঘ রচনা বেরিয়েছিল, তারপর পুরুলিয়ার খরা নিয়ে একটি রিপোর্টাজ এবং তারপর 'নো পাসারন'। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি লেখার নাম মাত্র উল্লেখ করা যায়। মনে হয়, ১৯৬৭ থেকে ৭৬ এই ন-বছরই দীপেন্দ্রনাথের সাংবাদিক রচনার সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময়।

সাহিত্যিক-সংগঠক হিসেবে দীপেন্দ্রনাথের তুলনাহীন ভূমিকা আরো জানা গিয়েছিল ১৯৭১-এর বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময়। বাঙলাদেশ সহায়ক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সমিতি গড়ে ওঠে তাঁরই প্রধান উদ্যোগে। তিনিই ছিলেন ঐ সমিতির অন্যতম সম্পাদক। তারপর গয়ায় ন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ প্রগ্রেসিভ রাইটার্স বা আরো পরে কলকাতায় প্রগতি লেখক সংঘের

পুনরুজ্জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৭১-এ একবার সোভিয়েত ইউনিয়নে ও ১৯৭৪-এ একবার লেবাননে তিনি গিয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী প্রগতি লেখক আন্দোলনের সূত্রেই।

দীপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ব্যাপকতা বিস্ময়কর। একদিকে শিল্প-সাহিত্যের বিচারে ও চর্চায় তিনি ছিলেন প্রায় শুদ্ধতার পূজারী—ক্লাসিক্যাল আদর্শে স্থির। টলস্টয়ের কথা বারবার বলতেন বন্ধুদের। নিজে প্রবলভাবে অনুরাগী ছিলেন ভারতীয় রাগসংগীতের। শব্দের শুদ্ধতার সন্ধানে সদাসতর্ক। প্রকরণের পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় চিরউৎসাহী। শিল্প-সাহিত্যে অন্ধত্ব বা একদেশদর্শিতার প্রবলতম বিরোধী।

অন্যদিকে সেই দীপেন্দ্রনাথই ছিলেন সক্রিয় কমিউনিস্টকর্মী, শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন। কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর প্রায় ২৫ বছরের সদস্য-জীবনে তিনি সদা-সর্বদাই ছিলেন শৃঙ্খলা, আনুগত্য, ত্যাগ ও কর্মের উদাহরণ।

আবার এই দুয়ের মিলই হয়তো নিহিত তাঁর সেই ক্লাসিক জীবনাদর্শে, যার চিরন্তন আধার ছিলেন তাঁর কাছে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। লেনিন শতবর্ষে 'লেনিন-শতাব্দী' নামে একটি কবিতা-সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। তার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'আগামী শতাব্দীতে মানুষ গ্রহান্তরে লেনিন জন্মজয়ন্তী পালন করবে।'

এই প্রত্যয়েই দীপেন্দ্রনাথের ৪৫ বছরের জীবনের অবসান ঘটেছে গত ১৪ই জানুয়ারি।

পশ্চিমবঙ্গের কবি-লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের আহূত দীপেন্দ্রনাথের স্মরণসভায়—শিশির মঞ্চ, ২২ জানুয়ারি, ১৯৭৯—পঠিত জীবনালেখ্যটি 'পরিচয়'-এর কর্মীরা প্রস্তুত করেন, অতিক্রত, প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

এটি তারই কিছুটা বর্ধিত, কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ।

দীপেন

সুশোভন সরকার

দীপেনের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ তার ছাত্রাবস্থায়, প্রেসিডেন্সি কলেজে। কি একটা ব্যাপারে একটি ঘরোয়া বৈঠক বসেছিল, পরিচালনার ভার পড়েছিল আমার উপর। খর্বাকৃতি মানুষটি বলতে উঠল, তার শারীরিক বৈকল্য সুস্পষ্ট, কিন্তু অদ্ভুত লাগল তার দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়। বলিষ্ঠ স্বরে সে বলতে লাগল আর তার বক্তব্য পেল তুমুল হর্ষধ্বনি। সেদিন নিঃসন্দেহে সে-ই ছিল শ্রেষ্ঠ বক্তা। আমি বুঝলাম ছেলেটি এক আগুনের হল্‌কা।

এর ক-দিন পর ইতিহাস সেমিনার ঘরে দীপেনদের অনুরোধে বসল আর এক বৈঠক। আমি তাতে মার্ক্স-তত্ত্বের কিছু কিছু জটিলতা বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। সেদিন দেখলাম দীপেনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়ল।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে জনশিক্ষা পরিষদের পর পর দুই অধিবেশনে আলোচিত হয় বাংলা গল্পে 'নূতন রীতি'র প্রবর্তন। ইতিমধ্যে দীপেন বাংলা সাহিত্যে একটা তোলপাড় এনেছে। অধিবেশনে প্রথমে অশোক রুদ্র তীব্রভাবে আক্রমণ করে নূতন রীতিকে, তার মতে দীপেনই হল প্রধান আসামী। বোধহয় দ্বিতীয় দিনে দীপেন উত্তর দেয় অসাধারণ দীপ্তির সঙ্গে। আমি সব ব্যাপারটা ঠিক বুঝতাম না, তার সব যুক্তিও আমার অকাট্য মনে হয় নি, কিন্তু মুগ্ধ করেছিল তার তেজস্বী ভঙ্গি, তার অকপট আত্মবিশ্বাস, তার দৃঢ় তেজ। মনে হচ্ছে এই বাদানুবাদ পরিচয় পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধুবর হিরণকুমার সান্যাল (দীপেনের অন্তরঙ্গ হাবুলদা) তার এক মজার কবিতায় দীপেনকে এই বিতর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে দীপেন কমিউনিস্ট কর্মী হয়েছে, পরিচয়-গোষ্ঠির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। আমার সঙ্গে তার অনেকবার মতান্তর ঘটল, কিন্তু মতান্তর কখনই মনান্তরে পরিণত হয় নি তারই গুণে। রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করার সময় দীপেনের মনে হয়েছিল শান্তিকামী রুশদেশের পক্ষে কাজটা অন্যায়। আমি তখন তাকে বুঝিয়েছিলাম যে বিপ্লব বিশ্বশান্তি ইত্যাদির পথে সরল সহজ রাস্তা নেই, এগোতে হয় বাঁকা পথে মোড় ঘুরতে ঘুরতে। বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে হলে আণবিক সমশক্তি অর্জন করাই ছিল সেদিন প্রাথমিক কর্তব্য। এর পর দীপেন সোভিয়েতের প্রচণ্ড সমর্থক হয়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালে আমি যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় রুশ সামরিক হস্তক্ষেপের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করি তখন দীপেন অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল, তখন সে পরিচয়ের সম্পাদকমণ্ডলীতে, বোধহয় যুগ্ম-সম্পাদক। পরিচয় পত্রিকায় আমাকে আক্রমণ করা হয়। আমি তার উত্তর পাঠাবার আগে গিরিজাপতিবাবুর বাড়িতে পরিচালকমণ্ডলী ও অন্যান্য বন্ধুদের এক সভার আয়োজন করেছিলাম। মনে হয় দীপেন এতই মর্মাহত হয়েছিল যে সেদিন সে নিজে এল না, এল সহ-সম্পাদক তরুণ সান্যাল। আমার প্রবন্ধ পরিচয়ে প্রকাশিত হয়, সম্ভবত প্রকাশ না করলে অত্যন্ত বিসদৃশ হবে, আমি পরিচালকদের অন্যতম। দীপেন নিশ্চয় পরে আমাকে ক্ষমা করেছিল।

পরিচয়ের নীতি নিয়ে এর আগেই অনেক আলোচনা সভা বসে—অফিসের সংলগ্ন বিশাল হল ঘরে, পার্টি অফিসেও। আমি বারবার আমার মত প্রচার করি। প্রগতির স্রোতে নানা ধারা আছে, নেই সম্মিলিত একমুখীন ধারা। প্রগতিশীল পরিচয়ের কাজই হল বিভিন্ন ধারাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়ে এগোন, প্রগতির ভূমিকা তাতেই সার্থক হয়, বিভিন্ন ধারাকে একমুখীন করে তোলার কাজ সফল হয়ে ওঠে এই পথেই, ছক-বাঁধা পদ্ধতিতে নয়। মনে হয় প্রথমে দীপেনের খানিকটা দ্বিধা-সংকোচ ছিল এই ভাবে এগোবার পথে। কিন্তু এ-ও জানি পরিশেষে সে এটাই সিদ্ধির পথ বলে বোঝে, এবং এ-পথের দৃঢ় সমর্থক হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ পরিচয়ের গত কয়েক বছরের সংখ্যার পর সংখ্যায়।

দীপেন ছিল অত্যন্ত অসুস্থ, দিন দিন বাড়ছিল তার শরীরের যন্ত্রণা। এর মধ্যে সে যে কি করে চলাফেরা করত, আমার আশ্চর্য মনে হয়। কি অসম্ভব মনের বল, কি আশ্চর্য সহ্যশক্তি! হিরণকুমার সান্যাল তার সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল, কতবার আমাকে বলেছে এত লোককে বিদেশে পাঠানো হয়, রুশ দেশে চিকিৎসার জন্য যায়, কিন্তু দীপেনের দিকে কেউ ফিরে তাকায় না, কারণ সে অভিমানী, কারো কাছে সে কিছু প্রার্থনা করার পাত্র নয়। একেবারে শেষে বন্ধু আশীষ বর্মন চেষ্টা করছিল চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশ পাঠাবার, কিন্তু কিছু ব্যবস্থা করে ওঠার আগেই সে চলে গেল।

দীপেন আমাদের মধ্যে যে-ফাঁক রেখে গেল সে কি কোনও দিন পূর্ণ হবে? অসাধারণ এক প্রতিভাদৃপ্ত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব শূন্যে মিলিয়ে গেল।

দ্বিতীয় কিশোর

ননী ভৌমিক

কী লিখব? যারা চলে গেল, আমরা, দেবেশের ভাষায় যারা 'বেঁচে-বর্তে' আছি, কী লিখতে পারি তাদের সম্পর্কে। বটুকদা, হাবুলদা, বিজনকে নিয়ে অমন অমূল্য একটা সংখ্যা বার করার পর যে ছেলেটা নিজেই চলে গেল তাদের পেছু পেছু, দাড়ি রাখলেও আমি তাকে কিশোর ছাড়া অন্য কোনো মূর্তিতে ভাবতে পারি না—প্রথম যেমন তাকে দেখেছিলাম। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুদ্রিত প্রশংসাসহ তার সম্ভবত প্রথম বিদিকিচ্ছিরি ছাপা বইখানা নিয়ে এসেছিল 'পরিচয়'-এর দপ্তরে—কত তখন তার বয়স—পনেরো, ষোলো? আমায় সে আচ্ছন্ন করেছিল। শুধু এইজন্য নয় যে তার লেখা আমায় ভাবিয়েছিল, সব মিলিয়ে। কিশোর বলতে আমি সর্বাগ্রে স্মরণ করি সুকান্তকে, তার মৃত্যুর কিছু আগে আমরা ছিলাম একই হাসপাতালে (কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব উদ্যোগ, সামান্য) পাশাপাশি শয্যায়, দ্বিতীয় কিশোর দীপেনকে আমি শেষবার দেখতে পেলাম না। গত বছর গ্রীষ্মে দেশে গিয়েছিলাম, মায়ের অসুখ বলে কলকাতায় থাকতে পারি নি, তবু দু-একদিনের যেটুকু ফাঁকা পেয়েছিলাম 'মনীষা' আর 'পরিচয়'-এ যেতে অন্যথা করি নি। দীপেন ছিল না।

সেই না-থাকাটা এমন চিরকালের হয়ে যাবে, কান্না পাচ্ছে, যদিও প্রৌঢ়, বলতে কি বৃদ্ধ।

দীপেনের সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা করুক অন্যে, প্রধানত তরুণেরা,

হয়ত গোপালদাও কিছু বলবেন, আমি নিশ্চিত, তিনি দীপেনের গুণগ্রাহী, আমার কাছে মুখ ফসকে 'একদা' ফাঁস করেছিলেন। তবে আমি জানি, মস্কোয় বিদ্যার্থী বাঙলাদেশের কিছু ছাত্রছাত্রী দীপেনের লেখার বেশ অনুরাগী। কোত্থেকে ওদের কাছে পৌঁছেছিল ওর বই কে জানে। তবে ভালোবাসার তো সীমান্ত নেই।

মস্কোয় দীপেন এসেছিল সম্ভবত দু-বার। দু-বারই আমাদের সঙ্গে দেখা না করে সে যায় নি। আমার স্ত্রী, স্ভেৎলানা, আমি বলি শ্বেতা, তার আন্তরিক মর্মবেদনা জানাবার ভাষা পাচ্ছে না।

দীপেন আমার জন্য পরিচয়ে লিখেছিল আমি ওর জন্য পরিচয়ে লিখছি

সরলা বসু

দীপেন আমার জন্য পরিচয়ে লিখেছিল। আমিও ওর জন্য পরিচয়ে লিখছি—ওকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি, আলাপ সাড়ে-তিন ঘণ্টার, তবু সে আমার সর্বহারা, শোকাতুর জীবনে, বোঝার পরে শাকের আঁটি হয়ে রইল। বহুকাল আগে ওর একটি গল্প আমি পড়েছিলাম, কোনো পত্রিকায়, হয়তো পরিচয়-ও হতে পারে, মনে নেই। অরুণাচলের কাছে জানতে চাইলাম লেখাটা কার, বেশ ভাল তো। ও উত্তর দিল 'ও একটা ছোট ছেলের।'

কিছুদিন পরে আমরা সবাই গেলাম রবীন্দ্র শত বার্ষিকীতে, পার্ক সার্কাস ময়দানে। দেখে শুনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অরুণাচল ওকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে মা, তোমার সেই গল্প-লেখা ছেলেটা। ও হাসিমুখে নমস্কার করল।

কিন্তু ওকে আমি ভুলি নি। বহুদিন আমার সুকান্তকে হারিয়ে ফেলেছি। 'সুডৌল চাঁদের তনিমা, মদির বাতাস এল ঠাণ্ডা বট থির'—অরুণাচলের কবিতার একটু অংশ বিশেষ। এতদিন, বটের ছায়ায় ছিলাম। কিন্তু এই তিন বছর আগে ঠাণ্ডা বট মদির বাতাসেই উপড়ে পড়ে গেছে। জীবনের প্রথম বজ্রাঘাতে আমি বিধ্বস্ত হয়েও আমায় উঠে দাঁড়াতে হল। মৃত ছেলে অরুণাচলের একখানা কাব্যগ্রন্থ, আর একখানা 'সুকান্ত জীবন ও কাব্য' আর আমার অন্ধ চোখে প্রায় হাতড়ে লেখা শেষ রচনা একখানি উপন্যাস, অরুণাচলের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে মাত্র শেষ হয়েছিল। ওর নতুন সংস্কৃতি সংস্থার

ছেলেমেয়েরা কেঁদে কেটে সবাই চলে গেল। আমি তখন খুঁজে বেড়াচ্ছি ওর স্মৃতির টুকরো যদি কার কাছে পাই আর বইগুলির যদি কিছু হয়। অবশ্য ওর মৃত্যুর দু-তিন দিন পরে অভাবনীয়ভাবে এক কাণ্ড হল। চোখে না-দেখা, কিন্তু অরুণাচলের মুখে যার কবিতা শুনে শুনে গল্প শুনে অত্যন্ত পরিচিত, সেই ছেলেটি এসে দাঁড়াল। সে অরুণাচলের বড় শ্রদ্ধার, বড় ভালবাসার সুভাষদা। সুভাষ ও ডাক্তারবাবু (ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী) যখন আমার বাড়িতে আসেন আমার চোখ জলে ভরে যায়। ভাবি আমার শিশুর মতো সরল, মাতৃভক্ত, হতভাগ্য ছেলেটি আজ বেঁচে থাকলে ওঁদের পেয়ে কি করত। দারিদ্র্য ব্যাঘ্রেই গ্রাস করল, আমার সুকান্ত—অরুণাচলকে। 'দারিদ্র্য-ব্যাঘ্র' অরুণাচলের কবিতার একটু।

এখন আমার দীপেনের কথায় আসা যাক। আমি তখন সবাইকে চিঠি লিখে চলেছি। শ্রীমান তরুণ সান্যালকে পরিচয়ের ঠিকানায় একখানা চিঠি দিলাম। তরুণকে চোখে না দেখলেও অরুণাচলের মধ্য দিয়ে চিনতাম। তরুণকে আসতে লিখলাম। আর দীপেনকেও। তরুণ অবশ্য আজও আসেন নি। দীপেন একখানি চিঠিতে কোনো একটি সাহিত্য সভার আমন্ত্রণ জানিয়ে সাড়া দিল। এই পর্যন্তই. কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমি একটি আশ্চর্য ঘটনায় মনে একটু স্বস্তি পেয়েছি। দিনরাত ছবি এঁকে চলেছি, কোনো দিনই আমি ছবি আঁকতে জানতাম না। আমার শিক্ষয়িত্রী জীবনে মাত্র একটি আপেল, একটি গেলাস এঁকে ড্রয়িং-এর কাজ সারতাম, তাও আবার অরুণাচলের কাছে শেখা। তবে আমি কোনো দুঃখ পেলে ও আমাকে বড় বড় লোকের ছবি দেখিয়ে শান্ত করত, ও নিজেও ছবি আঁকতে পারত। ওকে ওর উনত্রিশ জন্ম তিথিতে ছবি আঁকতে বড় একটি খাতা আমি দিয়েছিলাম, সেই খাতাখানা আবার আমার হাতে ফিরে এল। সেই খাতাখানা ভরে অরুণাচল, সুকান্তর কবিতার পদগুলি এঁকে চলেছি। যে আসে আমার কাছে তাকেই ছবি দেখতে হয়, রং তুলিতেও আঁকছি। তার থেকে সুভাষও বাদ যায় নি। সবারই একটি মন্তব্য ছবি দেখে করতে হয়। বুদ্ধিমান সুভাষ 'এ তো আমি বুঝি না' বলে আমার হাত থেকে উদ্ধার পেল।

ঠিক এই সময়ে, শ্রাবণ মাস যেন হবে, হঠাৎ দেখি রিক্সা থেকে আমার কনিষ্ঠা কন্যা মহাশ্বেতা দীপেনকে নামিয়ে আনছে আর আমাকে ডাকছে 'মা, দীপেনদা এসেছেন'। ও দীপেনকে চিনত। আর আমাকে পায় কে। না

বসতে বলা। (অবশ্য আমার কন্যা ওকে বসিয়েছিল) আমি ছবি দেখাতে শুরু করে দিলাম। আমার ছবি দেখানোর আকুলতা দীপেনের অসহায়তার ব্যাকুলতা। ও না পেরে আমাকে বলল, 'এরও একটা ছবি নেব।' বুদ্ধি প্রখর ছেলেটি আমার এই বিভ্রান্ত অবস্থাটা বুঝে মহাশ্বেতাকে বলল, 'ভাই তুমি আমায় একটু সহায়তা কর।' তখন আমার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল, বুঝলাম ও কোনো কাজে এসেছে। ও বলল, 'পরিচয়'-এ কোনোদিন উপন্যাস ছাপা হয় নি, এই সুকান্ত-বর্ষে আমার উপন্যাসের কিছুটা দেওয়া যায় কিনা। আমি উত্তর দিলাম 'তোমাদের 'পরিচয়' তো নীরস তরুবর'। দেখ আমার ছোট্ট নাতি অরুণাচলের পুত্র ঋতুরাজের নকল করা এলোমেলো লেখা প্রথম দু-খণ্ড 'জলপদ্ম', 'স্থলপদ্ম' উপন্যাসের সূচনাটুকু, উপনায়ক গাছুর কাহিনীর খানিকটা নেওয়া যেতে পারে।' ও বলল, 'ভুল আমি ঠিক করে নেব।' এখন নাম কি হবে আমার কাছে জানতে চাইল। আমি বলতে পারলাম না। ও বলল 'গাছুর পাঁচালী' নাম দিলে কেমন হয়?' আমি সম্মত হলাম। ও আমার লেখক জীবনের কিছু কিছু জেনে নিল। সেদিন ঘণ্টা দুই ও আমাদের কাছে ছিল। সেদিনকার আমার ছবি দেখানোর আকুলতা আর ওর অসহায়তার ব্যাকুলতা মনে করে কত দিন যে হেসেছি।

তারপর তো ও এলো পুজার মধ্যে 'পরিচয়'খানি নিয়ে সন্ধ্যাবেলা। আমি বললাম, 'বাবা, তুমি তো আমার উপন্যাস রুই মাছটার ল্যাজা কেটে বৌভাত করলে, এখন যে ওর পেট ভরা ডিমের বড়াও হবে, মস্ত মাথাটার মুড়িঘণ্টও হবে। ও হাসল। আমার বৌমা—অরুণাচলের স্ত্রী, আমার কন্যা মহাশ্বেতা, আমার মেজছেলে, আমি ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম, ও হাসিমুখে চলে গেল।

তখন তো জানি না এই ওর শেষ বিদায়। আমার হতভাগ্য জীবনে ছেলেটি যেন কত আপন, উজ্জ্বল হয়ে রইল।

তার পরের কথা সংক্ষিপ্ত। গত শ্রাবণ মাসে আমার শরীরটা বেশ অসুস্থ হয়ে উঠছে। আমি আমার বইগুলির বহু আবেদন-নিবেদন করেও কিছুই করতে পারলাম না। তখন ওকে ও সুভাষকে দু-খানা চিঠি দিলাম। লিখলাম বাবা, আমার বইগুলি থাকল। 'দীপেন উত্তর দিল তার নানারকম অসুখের কথা লিখে, আর আমার সঙ্গে তার দেখা করবার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু অসুখের জন্য পারছে না। তবু চেষ্টায় রইল। বইগুলি যেন গুছিয়ে রাখি, কখন কি হয়। আর লিখল সর্বনেশে একটি কথা, আমার জন্য ওর

খুবই কষ্ট হয়। আমি ওর চিঠির উত্তর দিলাম, বাবা তোমার যে অসুখগুলি ওই অসুখগুলিই আমার চিরকাল আছে, মাত্র দু-একটা নেই। তুমি ওষুধ খাও, সেরে যাবে।

যে ছেলেদের আমার জন্য কষ্ট হয়, তারা কি আমার কাছে থাকে! না আছে! আমি থাকি টেলিভিশনের টাওয়ারটার নিচে। আমার বামে টি. বি. হাসপাতাল, গাছ-গাছালির মধ্যে সুকান্ত ওয়ার্ডে আমার রানার ঘুমিয়ে গেছে, চিঁড়ে-দৈটুকু আলমারিতে পড়ে আছে, ঘুম-ক্লান্তের খাওয়া হয় নি।

আমার ডাইনে ভাঙড় হাসপাতাল, ওখানেই গ্রাম-শ্যামল ছেলেটি কোন 'শ্যামল নীলে নীল দেশের' স্বপ্ন দেখতে দেখতে শ্রাবণের বৃষ্টি ধারায়, অপ্সরীর পায়ের টুপুর টুপুর নূপুরধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছে।

আমার বয়স ছিয়াত্তর, চোখে দেখতে পাইনে, তাই তো আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করে ওরা পালিয়ে যায়।

অবশেষে, আমার বুকের রক্তে, চোখের জলে লেখা শেষ রচনা অপ্রকাশিত 'কতোদিনের কতো ব্যথা' উপন্যাসখানি সুকান্ত-অরুণাচলের আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলাম। আজ থাকল ওদের সঙ্গেই আমার দীপেনের নাম। যে-ছেলেটি আমার সৃষ্টির সূচনাটুকুকে মুক্তি দিয়ে পুত্রশোকাতুর মনে একটু স্বস্তি দিয়েছিল, তাকে ভুলব না। তার জন্য রইল জীবন-ক্লান্ত মায়ের বুকভরা হাহাকার।

সম্ভবত নিশ্চয়ই

সন্‌জীদা খাতুন

উনিশশো চুয়ান্ন সালে তাঁকে প্রথম দেখি। এদেশের নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের বিজয়ের পর ঢাকাতে সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। একটি সুন্দর সম্মিলন উৎসব। সাংবাদিক হিসেবেই বুঝি এসেছিলেন তিনি। ফিরে গিয়ে 'নতুন সাহিত্যে' যে রিপোর্ট লিখেছিলেন—তা পড়ে হেসেছিলাম আমরা। ঢাকার রিক্সাওয়ালাও জীবনানন্দের কবিতা আওড়ায়—এ-ধরনের কথায় হাসব না-ই বা কেন! ওই উচ্ছ্বাসই তো খায়। বড্ড আশা বাড়িয়ে দেয়। আকাশে তুলে দিয়ে, তারপর ধুলায় ফেলে দেয় ধপ্ করে, আচমকা।

এই উচ্ছ্বাসের মরণে মরতে হয়েছে তাঁকে জীবনে কতবার!

আগে, তাঁকে কেমন করে জানলাম, সে কথা বলি।

'নতুন সাহিত্যে'ই তাঁর 'তৃতীয় ভুবন' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বড় সাহিত্যিক বলে স্থান দিয়েছিলাম মনে। তারপরে বহুদিন দেখাশোনা নেই। উনসত্তর সালে ঢাকায় ছেলেমেয়ে ফেলে রংপুরে চাকরি করতে গিয়ে, একাকিত্ব কাটাবার জন্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' পাঠাগারে গিয়ে পেলাম তাঁর বই 'চর্যাপদের হরিণী'। ফিরে জানাশোনা হল। তারপর একাত্তরের বিপর্যয়ের ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে কলকাতায় পৌঁছে আবার দেখা। বললেন, 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র পক্ষ থেকে তাঁরা ভাবছেন, একটি বাড়ি ভাড়া করে তাতে বুদ্ধিজীবীদের থাকবার ব্যবস্থা করবেন। সেখানে শিল্পীরা রিহার্স্যাল করে অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি হতে পারবেন—অনুষ্ঠান করে টাকা তোলা যাবে।

প্ল্যানটা শীগগির কার্যকর হওয়া দুষ্কর মনে হল বলে, তখনকার মতো একখানা রিহার্স্যালের জায়গা ঠিক করা স্থির হল। সেখানে সব শিল্পীদের জমা করতে পারলে অনুষ্ঠানের মহড়া শুরু করা যাবে। চিঠি লিখে খবর দিয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে-থাকা বিভ্রান্ত বাংলাদেশী শিল্পীদের জড়ো করলেন দীপেন। তৈরি হল আমাদের 'রূপান্তরের গান'। ক্রমে গড়ে উঠল 'মুক্তি-যোদ্ধা শিল্পী সংস্থা'—যাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে, শরণার্থী শিবিরে মানুষের মনোবল বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন, গান গেয়েছেন 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে', দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপন করেছেন বাংলাদেশের রূপান্তরের ইতিহাস।

উচ্ছ্বাসের মরণের কথা হচ্ছিল। একাত্তরের ঘটনার সঙ্গেও আছে সেই কাহিনী। সে-সময়টায় ওপারের রাজনীতি তাঁকে কোনো কথা বলবার আগে 'সম্ভবত নিশ্চয়ই' বলবার অবস্থায় ফেলেছিল—সে জানেন তাঁর বন্ধুরা—জানেন তাঁরাও, যাঁরা পড়েছেন তাঁর 'হওয়া না-হওয়া'। ওই অবস্থায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁকে আবার 'নিশ্চয়' প্রতীতিতে বলিষ্ঠ করে তুলল।

কতবার বলেছেন—তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে ডাউন টু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়—কতদিন পর আবার সবরকমের লোক নিয়ে হতে পেরেছে 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'—ভাবুন তো একবার! এ সম্ভব হল কেবল বাংলাদেশের এই অনন্য সংগ্রামের দৃষ্টান্তে। এই রকমের বড় ব্যাপার হলে এমন মিলন সম্ভব হয়!

বাংলাদেশের সে-সংগ্রাম কতটা স্বাধীনতার জন্য, আর কতটা মার খেয়ে মরতে-মরতে মরিয়া হয়ে ফিরে-দাঁড়ানো সংগ্রাম—এ বিষয়ে আমার সংশয় ছিল। যারা মারছিল, তারা অবশ্য স্বাধীনতা দিয়ে ফেলবার ইচ্ছেয় নয়—মেরে শেষ করে দেবার জন্যেই মারছিল। আবার, স্বাধীনতার কথা যারা বলছিল, মার খাওয়ার পিছনে মহৎ আদর্শের দৃষ্টান্তের কথা যারা প্রচার করছিল, তাদের মধ্যে যে কতখানি দ্বিধা কাজ করে যাচ্ছিল, তা-ও অপ্রত্যক্ষ ছিল না। মুজিবনগরের সরকারের পাশাপাশি খন্দকার মোশতাক আহ্‌মেদের নিজের একটি গভর্নমেণ্ট চালিয়ে যাবার চেষ্টার কথা তখন কানাঘুষায় সকলে জানত। পাকিস্তানের জন্যে এঁদের দরদ চাপা ছিল না।

আমার কেমন মনে হত, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় সত্যি-সত্যি এ সংগ্রাম শুরু হয় নি। বাঙালিয়ানা কাকে বলে, সে থোড়াই জানে বাংলা-দেশের সব মানুষ।

যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করে, সকল দিক বিবেচনা করে দেখা আমার নয়, তবে এইরকম আমার অনুভব, সে-কথা বলতাম। শুনে দীপেন আহত হতেন। জোর দিয়ে বলতেন—আপনি কিছুই বোঝেন না।

এর কারণ অবশ্য, দীপেন আমাদের মধ্যে, যে-সব শিল্পীরা সমিতির সঙ্গে কাজ করতাম, তাদের মধ্যে দেশের জন্য কাতরতা আর ভালোবাসা দেখতে পেতেন। সচেতন শিল্পীদের কথা যে আলাদা তা বুঝতে চাইতেন না। কিন্তু হায়রে শিল্পীরা—হায় সংস্কৃতি! সংস্কৃতি যা বলে যা অনুভব করায় রাজনীতি কি চলে সেইমতো? এদেশে রাজনীতির যে চিরকালই দেখছি আলাদা রাস্তা। দশাটা এমন—সংস্কৃতিবানরা রাজনীতির জগৎটাতে শ্বাসই নিতে পারেন না ভালো করে। রাজনীতি যেমনটা হতে পারত, তা তো হয় না! বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুন্দর সুন্দর কথা আবেগ দিয়ে উচ্চারণ করে গাই আমরা শিল্পীরা। তারপর বছরের পর বছর যায়, কথাগুলো বলা হতে হতে ঘষে ঘষে মুছে মুছে অর্থ হারায়। উচ্চারণে আর জোর থাকে না—হয়ে ওঠে শুধু আবৃত্তি। তারপরেও বলে যাই অভ্যাসবশে। ভাবতে ভালবাসি এর effect হচ্ছে দেশের উপরে। কে জানে তা কতটা সত্যি! তবু, এ না হলে আবার বাঁচিও না। নিজের বিবেকের কাছে জবাব দেবার জন্যে করতেই হয় কিছু!

যাই হোক, সংস্কৃতিবান দীপেন বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামের সেই দিনগুলোতে আদর্শের বিশ্বাসযোগ্য ছবি দেখতে পেয়েছেন ভেবে নিয়েছিলেন।

কথা অবশ্য ওইটুকুই সব নয়। মাসের পর মাস আপিস কামাই করে, সংসারে বিসর্পিত অনুচ্চারিত অসন্তোষ সৃষ্টি করে দীপেন বাংলাদেশ উদ্ধার করেছেন। তারপর, শিল্পীদের সঙ্গে পাওনাগণ্ডা নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছে। কারণ, খাওয়া-পরা চলবার জন্যে যার যতটুকু চাই তার সবটাই কেন দেওয়া হচ্ছে না—এর জবাব তো দীপেনকেই দিতে হবে! সমিতির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তো বটে তিনি। তাছাড়া তিনিই তো সকলকে একত্র করেছেন কিছু করবার জন্য—সকলে মিলে একসাথে চলে বাঁচবার ব্যবস্থা কি হতে পারে, পাশাপাশি, সংগ্রামী মনকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা কি—এইসব খুঁজে বার করবার জন্য। দোষ তাঁর নয় তো কার?! তাছাড়া ধর্মের কথা শুনতে গিয়ে প্রতিভাবান শিল্পীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তো। ব্যবস্থা ছিল, যে যেখানে গান গাইবেন, তার টাকা এনে দেবেন কমন ফাণ্ডে, সেখান থেকে মাসে

মাসে যার যেমন বরাদ্দ নিয়ে যাবেন। এতে, ভালো গাইয়েরা যে-টাকা উপার্জন করে দিব্যি চলতে পারতেন, তার ভাগ সকলকে দিয়ে ভোগ করতে গিয়ে ক্ষতি পোহাতে লাগলেন। তখন কি আর করা—দে দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালি! সময়টা যে কী সংকটেরই ছিল!

মনে আছে, 'কলামন্দিরে' বাংলাদেশের 'রূপান্তরের গান' হচ্ছিল একবার। তখন 'রবীন্দ্রসদন', 'মহাজাতি সদন', 'কমলা গার্লস স্কুল' বহু জায়গায় 'রূপান্তরের গান' হয়ে গেছে। ততদিনে দীপেনের কাছেও কি ঘষা-ঘষা হয়ে এসেছিল এইসব কথা আর গানগুলো! বললেন, গানের সময় আমার কি-সব মনে হচ্ছিল জানেন, কি সব অন্যকথা ভাবছিলাম, কি-রকম অবাস্তব লাগছিল সব। বলে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতেই লাগলেন নিজের কথা। মনে হল দীপেন যেন ডিসইলিউসান্‌ড।

অনেক চেহারা দেখে ফেলেছিলেন ততদিনে বাংলাদেশের শিল্পীদের। একদল বেরিয়ে গিয়ে নানা জায়গায় নানারকম গান গেয়ে নিজেদের মধ্যে বেঁটে নিচ্ছেন পয়সা। কামাই এতে ভালো হচ্ছে তাঁদের।

তবু তখনো উচ্ছ্বাসের বিপরীত টান ভালোমতো লাগেনি। যার মনটা বেলুন হয়ে উড়তে বেজায় খুশি, সে কি সহজে পড়বে মাটিতে।

বাহাত্তর সালে এলেন বাংলাদেশের 'বাঙাল' দেখে মনের সাধ পুরাতে। এসে দেখলেন গাড়ি-বাড়ি-সোফাসেট-টেলিভিশনের চমক। শিক্ষিত শহুরে-দের জীবনযাত্রার মান দেখে কপালে উঠল চোখ। বুঝলেন মনের কল্পনার সে-'বাঙাল' বাংলাদেশে চোখে পড়বার নয়। বুঝলেন বাঙালি জাতীয়তা-বাদের হাল-হকিকত। দেয়ালের গায়ের লিখনে পড়লেন, ভারতবিরোধী প্রচারের প্রখরতা, গ্রামের দিকে ঘুরতে গিয়ে দেখলেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জলজ্যান্ত ছবি।

বেলুন আরো কত উড়তে পারে!

বুঝি বুঝলেন, 'সম্ভবত নিশ্চয়ই' বুঝবার কিছু ভুল হয়েছিল।

আর উচ্ছ্বাস করেন নি বোধকরি বাংলাদেশ নিয়ে। তবু মনটা টনটন করত বেদনায়, ভালো খবর শুনবার ঐকান্তিক কামনায়। লোকের মুখে অথবা চিঠিতে কত সময় সেকথা জেনেছি।

একাত্তর সালে একসাথে পথ চলতে চলতে, তাঁর চলার রকমটি তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, কাঁধের ঝোলাটিতে করে মানুষের সব বেদনা-

গুলোকে বয়ে বয়ে পথ হাঁটছেন যেন তিনি। আমার মনের মধ্যে তাঁর সেই চলাটা এখনো চলছে, ও-চলা থামে না।

গত বছর ডিসেম্বরের ছয় তারিখে দেখা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর উনচল্লিশ দিন আগের কথা। 'পরিচয়'-এর জন্যে বাংলাদেশের এক নতুন কবির কবিতা নিয়ে গিয়েছিলাম হাতে করে। তত পছন্দ করলেন না লেখা। তার আগে পাঠানো রুদ্র মহম্মদ শহিদুল্ল -র কবিতার হাত বরং 'পাওয়ারফুল' বললেন। বললেন, তবু একটি কবিতা বেছে নেব, কারণ, বাংলাদেশের জন্যে আমার বড্ড দুর্বলতা তো!

এই দুর্বলতার দরুন বহুদিন মেনে আসা এক আদর্শ বিসর্জন দিয়েছিলেন একাত্তর সালে। শুনলে হাসি পাবে, একালেও যে দিনকাল পড়েছে এ-সময়েও এমন আদর্শ নিয়ে চলবার কথা ভাবে কেউ! কিন্তু গর্ববোধ করি তাঁর ভালোবাসার কথা ভেবে। তাঁর অতিথি হয়ে বাস করছিলাম সপরিবারে, রাত্রে রুটি খেতে পারি না, ভাতই খাই। ঘরের লোকেরা একদিন বললেন, শুনুন সন্‌জীদা খাতুন, জানবেন, জীবনে এই প্রথম দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় কালোবাজারে চাল কিনেছেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্যে!

ওই ডিসেম্বরে বলেছিলেন, সন্‌জীদা খাতুনকে বলবেন 'পরিচয়'-এ লেখা দিতে।

সেই লেখা এই পাঠাচ্ছি।

স্মৃতির প্রদীপ ভাসানো

অরুণা হালদার

দেখতে দেখতে কমাস কেটে গেছে। আশ্চর্য লাগে যে মানবজীবন কত ভঙ্গুর তা ভেবে। নিজেদের বিস্ময়কর তুচ্ছতা নিয়ে মহাকালের সামনে মাথা নত করা ছাড়া আমরা কিছুই পারি না। পারি না সুখ বা দুঃখ কোনটাকেই স্থায়ী করতে। তা হলেও কোনো কোনো ক্ষত মিলিয়ে যায় না। কোনো কোনো ক্ষত গভীর একটা বিসদৃশ চিহ্ন রেখে যায় জীবনে—সে বিসদৃশতা একদর্শনে বুঝিয়ে দেয় আঘাত বা ক্ষত কি পরিমাণ ক্ষতিকর ছিল। দীপেন্দ্রনাথের তিরোভাব আমাদের কাছে তাই। আমি দীপেন্দ্রনাথকে গত পঁচিশ বৎসর দেখে আসছি। তরুণ দীপেন্দ্রনাথ সদ্য-ছাত্রজীবন পার হয়ে এসেছেন। নবীন লেখক হিসাবে 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাস লিখেছেন। মানবীয় মহিমায় দীপ্ত স্নিগ্ধ হাসিমুখ সেই দীপেন্দ্রনাথকে সদ্য-পরিণীতা বধূসহ বাড়িতে (তখন আমরা বিবেকানন্দ রোডে থাকি) সানন্দে সকৌতুকে আশীর্বাদ জানিয়েছি। তাঁদের দুজনকে দেখে বারবার একটি মহামন্ত্রই মনে এসেছে—'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।'

বিগত পঁচিশ বৎসরে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কার্যকারণের সমবায়ে আমাদের যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি দীপেন্দ্রেরও হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের পথে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় আরো গাঢ়তর এবং আনন্দময় হয়েছিল। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করে এসেছি তাঁর পরিণত চিন্তাভাবনা তাঁকে ঘরোয়া আলাপে এবং লেখায় ক্রমশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সাহিত্যিকের সঙ্গলাভ করলেই

মানুষ সাহিত্যিক হয়ে ওঠে না। আমিও তা হতে পারি নি। দীপেন্দ্রও তা জানতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর 'হওয়া না হওয়া' গল্পগ্রন্থের আলোচনা করার জন্য আমাকেই বলেন। আর, সেই গল্পগ্রন্থেই আভাস ছিল লেখকের সমৃদ্ধ সুপরিণত মানসের। সে মানসলোকে তৎসময়ের ঘটনাপঞ্জিও বিধৃত হয়েছে বাস্তব চিন্তাভাবনার উপাদান রূপে; তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সূক্ষ্ম মানবিকতা ও বিশ্বাত্মিকতাবোধ একই সঙ্গে। এগুলির সঙ্গেই পটভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে স্রষ্টা মানুষ দীপেন্দ্রনাথের সৃজনশীল উদ্যম। মানুষকে মানুষই হতে হয় এ পরিচয় তাকে বহন করে চলতেই হয়। শুধু কল্পনায় নয়, এ পরিচয়ের দায়িত্ব প্রতি পদক্ষেপে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে পারিপার্শ্বিক ও নিজেকে অপূর্ব সমন্বয়ের জীবন রসায়নে জারিত করে তবেই লোকে পরিবেশন করতে পারে। এই মহৎ প্রয়াস মানুষকে 'মানুষ' করে। এই মানবধর্ম দীপেন্দ্রর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। পড়ে মনে হয়েছিল এ বস্তু নূতন। সে লেখার গঠন-শিল্প অনেক নিরীক্ষা-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঘটেছিল তা বোঝা গেছিল। বোধ করি জীবনযন্ত্রণার রূপসাগরে ডুব দেওয়া তাঁর শুরু হয়েছিল আরো আগে, হয়ত ১৯৫০-এর তৎকালীন পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও হাঙ্গামার সময়। সে সময় তিনি সেই শহীদদের কণ্ঠে 'পাখীর ভাষা' শুনে-ছিলেন। 'চর্যাপদের হরিণী'—যে 'অপনা মাংসে অপনা বৈরী' এই নব রূপকথা তাঁর হাতেই তখন সৃষ্টি হয়েছিল। এই লেখার ধরনটিই ক্রমশ সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল দীপেন্দ্রনাথের ১৯৭৭-এর শারদীয় সংখ্যার কালান্তরে সম্ভবত তাঁর শেষ উপন্যাসটির মধ্যে। সে উপন্যাস পড়ে দেখলে দেখা যাবে তাতে রিপোর্টিং আছে, আছে বাঙালীর বিভিন্ন মানসিকতার দ্যোতক আড্ডা, আছে দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বেজে ওঠা ঝংকার। আর, এসব শুদ্ধ, কিছুই না বাদ দিয়ে, সব কিছুর মধ্য দিয়ে মানুষ চলেছে তার নিরন্তর সংগ্রাম নিয়ে। বহুর মধ্যে একা সে মানুষ, নিজের এককত্বকে বহুজনার সম্মিলিত রসায়নে মিশ্রিত করেছে। তার মধ্যেই ব্যক্ত হচ্ছে অর্কেস্ট্রাল সিমফনি। সেটা কোনও মতেই একমাত্রিক নয়, বা লাইনার নয়। অথচ শঙ্খবিবরের মুখেই যেমন আকাশ-স্পন্দনে ঘন গভীর ধ্বনি বেজে ওঠে ঠিক তেমন ভাবেই সমস্ত উপন্যাসটির সূত্র ধরা আছে 'বিবাহবার্ষিকী'র স্মরণে। সে স্মরণ একক পদাতিক লেখকের চিত্ত-গোমুখ থেকে সঞ্চারিত হচ্ছে দূরপ্রাবিনী দুকূল ছোঁওয়া ভাগীরথী ধারণায়। মানব-মহাসাগরে তার যাত্রা। দীপেন্দ্রনাথের এ রচনা সামগ্রিক জীবন-শিল্প বলে আমার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে নিজের মধ্যে তিনি কেন্দ্র ও বৃত্ত

পরিসরের স্থিতিস্থাপকতা পেয়েছেন বা আবিষ্কার করেছেন। আজকের দীপেন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ন তখনই সম্ভব যখন মানুষ তার আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েও বিপর্যস্ত হবে না, বিমূঢ় হবে না। সম্ভব হবে তখনই যখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানবীয় সুখদুঃখকে আমরা পরিশীলিত পরিমিতিবোধ দিয়ে দেখতে পারব—যথার্থ শিল্পীমন নিয়ে। একই সাথে সংহত বিজ্ঞানের নিরাসক্তি এবং পর্যাপ্ত আবেগ বা প্যাশনশুদ্ধ, তখন জীবন-সঙ্গীতের পারমার্থিকতাকে প্রাত্যহিকের মধ্যে আভাসিত দেখতে পাব। সাক্ষাতে দীপেন্দ্রকে প্রশ্ন করতে পারি নি, সত্যই তিনি নিজের মধ্যে সেই সত্যকে স্পর্শ করেছিলেন কিনা। আজ মনে হচ্ছে প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না। কারণ, সত্য স্বয়ম্প্রকাশ।

উপর্যুক্ত আলোচনার মধ্যে যা আমি বলতে চেয়েছি তা হল মানুষ দীপেন্দ্র আর লেখক দীপেন্দ্রের মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। এরূপ সমন্বয় জীবন বিধাতার পরম আশীর্বাদ। সকল সুখদুঃখকে অস্বীকার না করেও সকল কিছুর মধ্যে সেই পরম আশীর্বাদ চরম মূল্যবোধ নিয়ে, হীরার চেয়েও আশ্চর্য দ্যুতি নিয়ে ভাস্বর হয়ে থাকে। মানুষের তা 'স্থিতি' বা চরম আশ্রয়। আর, সকরুণ বেদনার মধ্যেও কৃতজ্ঞ আনন্দে স্মরণ করতে বাধা নেই যে, দীপেন্দ্র সেই 'মহৎপদ'কে ভাগ্য বলে নয় অ-পরিমেয় পুরুষকার দিয়েই আয়ত্ত করেছিলেন। সেই কারণেই মনে হয় যে, বর্তমানকালে রচনাসামগ্রী সম্ভার তো বঙ্গ-ভারতীর দ্বারে কম নয়, প্রতিদিন পুঞ্জ পুঞ্জ ফেণোদ্গমের মতই গল্প-উপন্যাস উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে। মানবীয় সুখদুঃখের কষ্টকল্পনা, আবেগের উৎকট আতিশয্য, প্রকাশের রূঢ় ঘোষণা, জৈব প্রেরণার অ-প্রাসঙ্গিক প্রক্ষেপ বা projection, বিশিষ্টরূপ মতবাদের অশালীন আক্রমণ প্রভৃতি নানারকম ভাবাভাব (Affirmation-Negation) নিয়ে সাহিত্যনামা এক জটিল তন্ত্রের আক্রমণে আমরা সতত যেখানে আক্রান্ত হচ্ছি, সমাজমন, ব্যক্তিমন সজ্ঞানে অজ্ঞানে নিরন্তর ক্লিষ্ট হচ্ছে, সেখানে মনে করতেই হয় যে 'বিবাহ বার্ষিকী'র মতো উপন্যাস তো বেশি নেই। অথবা এরূপ পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ বেশি উপন্যাসে ব্যক্ত হয় নি। আমাদের ব্যক্তি জীবনের ক্ষয়-ক্ষতির কথার সঙ্গে সঙ্গেই মনে না হয়ে পারে না, এই জীবনমন্ত্রের এক উদ্গাতার তিরোভাব বড় অসময়োচিত, বড় বেদনার। কারণ বাঙলা সাহিত্য-জগতের এই জ্যোতিষ্কটির আবির্ভাবও যখন সম্পূর্ণ করে বোঝা যায় নি, আর তখনই তাঁর তিরোভাব ঘটল।

আমার কাছে লেখক দীপেন্দ্র ও মানুষ দীপেন্দ্র অচ্ছেদ্যভাবে পরিচিত। তাহলেও বেশি করে মানুষ দীপেন্দ্রকেই হারিয়েছি, একথাই সত্য হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালেই তাঁর চিঠিতে জেনেছিলাম তাঁর স-পরিবার রাজগীর যাবার কথা হচ্ছে। তাতে তাঁর অসুস্থতার কিছু লাঘব হতে পারে বলে চিকিৎসকেরা মনে করেছিলেন। আমরা খুশি হয়েছিলাম আমাদের পাটনার বাড়িতে তাঁকে সপরিবার দেখতে পাব বলে। সে বৎসর যাওয়া সম্ভব হয় নি। হয়েছিল গত ১৯৭৮ সালের শারদ অবকাশের সময়। ২০শে অক্টোবর পাটনা পৌঁছে সেদিনই রাজগীর যান তাঁরা। ফিরে আসেন ৩১শে। সেদিনই সন্ধ্যায় কলকাতা ফেরেন। পাটনার প্রখ্যাত ভিষগাচার্য ডঃ অজিত সেনের সাগ্রহ ব্যবস্থাপনায় এই যাত্রা পরিকল্পিত ও সুনির্বাহিত হয়েছিল। যাওয়ার পথে ও আসার পথে দু-বারই তাঁদের সাথে দেখা আমাদের হয়েছিল। আসার পথে আমি অসুস্থ বলে তাঁরা আমাদের বাড়িতেই আসেন দেখা করতে। নিজেও তিনি তখন অসুস্থ। তবুও সেই পরমাত্মীয়-প্রতিম অনুজমুখের আশা ও আশ্বাসের তৃপ্তি থেকে মন আনন্দবোধ করেছিল। দীপেন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মহীয়সী জীবনসঙ্গিনী, কন্যা কল্যাণীয়া মৃত্তিকা আর আত্মজ শ্রীমান মেঘেন্দ্র। এই দেখাটা না হলে আমি সংসারের একটি সুন্দর প্রকাশের শ্রী দেখার থেকে বঞ্চিত থাকতাম বলে মনে করি। মানুষের শৌর্য-বীর্য-বিক্রম তো শুধু সভাক্ষেত্রে নয়, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে যুযুধানত্বের মধ্যেও নয়। মানুষের সত্যকার প্রকাশ তার স্বভূমিতে, তার গৃহে, নিতান্ত নিজস্ব পরিজনদের পরিকল্পনার সসীম বৃত্তের মধ্যে, অর্থাৎ তার স্বরাজ্যে। এই দেখা, বেশি লোকের ভাগ্যে সম্ভব হয় না। সেদিনের সেই দেখার মধ্যে আমার মনে হয়েছিল দীপেন্দ্র তাঁর স্বরাজ্যে অভিষিক্ত স্বরাট্। ১৯৭৭ সালের মে মাসে আমাদের শ্রদ্ধেয় আচার্যদেব সুনীতিকুমার লোকান্তরিত হন। দীপেন্দ্র অকাতর পরিশ্রমে ভাষাচার্য সংখ্যা 'পরিচয়' বের করেছিলেন। সেই সংখ্যায় দীপেন্দ্রের অনুরোধে আমিও লিখি। আচার্যদেবকে তো ঘরে বাইরে নানাভাবে দেখেছি। তাঁকে তাঁর সংসারক্ষেত্রেও আমার স্বরাট বলে মনে হত। তাঁর প্রাচুর্য ঐশ্বর্যের তুলনা দেবার মতো বেশি লোক নেই। কিন্তু সেদিন দীপেন্দ্রের মুখের প্রসন্ন হাসিতে, উজ্জ্বল মাধুর্যে আমি একরূপ মানবীয় সাযুজ্য দেখতে পেয়েছিলাম। আচার্যদেব বহুদর্শী সুপ্রাচীন। তাঁর গৃহে তিনি সতত স্নেহময় স্বজন; সব চাইতে বড় কথা যে তিনি জ্ঞানে সমুজ্জ্বল, বিনয়ে নম্র, করুণায় প্রবাহিত। দীপেন্দ্রের মধ্যেও সেই চরিত্র

মাধুর্য, নির্লোভ নিরহঙ্কার আর অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে সশ্রদ্ধ আনন্দে ও বিশ্বাসে পাটনায় আমাদের শেষ সাক্ষাতের সন্ধ্যা আমার কাছে অভিষিক্ত হয়েছিল। পরম মমতায় সেই পরিবারটির কল্যাণ কামনা বারবার করে আমার মনে জেগেছিল। আমাদের সীমাবদ্ধ ইচ্ছা যে ফলপ্রসূ হয় না তা বুঝবার জন্য কয়মাসই বা লাগল? আমি সুস্থ হয়েও তাঁর পত্র পেয়েছি। তার পরই জেনেছি তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আকস্মিক-ভাবে পাটনায় বসে ১৫ই জানুয়ারির কাগজে দেখে স্তম্ভিত হয়েছি যে দীপেন্দ্র লোকান্তরিত। আমার দেখা সেই বিশেষ পরিবারটি চোখে ভেসে উঠল। কেন্দ্র ও বৃত্তের সমানুপাতে বিষম অসামঞ্জস্য ঘটে গেছে! মনে হয়েছে জ্যেষ্ঠ হিসাবে আমার যাত্রাই তো বাঞ্ছনীয় হত।

সত্যই মানুষ আমরা অতি সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির বৃত্তেই ঘুরে ফিরি। আত্মা-পরমাত্মার কোনো অস্তিত্ব আছে কি না জানি না। থাকলেও এটা বুঝি যে, মাটির বন্ধনের মতো সহজগ্রাহ্য পরিচয় 'আত্মার' নেই। জন্মান্তর আছে কিনা সেও অজ্ঞাত। আর, থাকলেই বা সেই স্নিগ্ধ জীবন-ব্যঞ্জনা কি সেখানে অভিব্যক্ত হয়, না হতে পারে? অথচ, মানুষের বেদনাবোধ যে কী সুতীক্ষ্ণ! সূক্ষ্ম চেতনা দিয়ে তা বোধ করি স্থূল শরীরকেও খানিকটা কাটে। আজকের বিয়োগ ব্যথার মধ্যে স্মরণ হচ্ছে ১৯৭৫ সালের কোনো একটা সময়ে দীপেন্দ্র শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয়কে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। শ্রীযুক্ত হালদার তখন পাটনায়। সে পত্র তিনি আমায় পড়তে দেন। তাতে একস্থানে ছিল—'গোপালদা, মাঝে মাঝে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে'।

উপর্যুল্লিখিত কথাগুলি তার সারল্যের জন্যই মর্মস্পর্শী। কাঁদতে কজন চায়? কাঁদতে কজন পারে? দীপেন্দ্রনাথের অন্তর্দাহে সেই ক্রন্দন জাগ্রত ছিল। সে ক্রন্দনের উৎসমূল জীবনবোধের বেদনাময় চেতনা। দীপেন্দ্রনাথের আশ্চর্য চেতনায় তাঁর দেহের সকল ক্লেশ সকল ত্রুটিকে তিনি উত্তরণ করেছিলেন। কিন্তু, সে বেদনার শুদ্ধ অনল শেষ পর্যন্ত তাঁকেই আহুতি নিল। দীপজীবন একপ্রকার দিব্যজীবন তো বটেই। তার অস্তিত্বই তার বিজ্ঞসন্ত আত্মধ্বংসী শিখারূপ। অথচ, সেই শিখারই আলোক সঞ্চারিত হয় জীবন থেকে জীবনে, মন থেকে গভীর চেতনায় এবং অনিরত ঊর্ধ্বায়ণে। অনন্ত সে পরিক্রমার উৎস কিন্তু শান্তই।

বহু বর্ষ আগে মথুরায় বিশ্রাম ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম যমুনার

আরতি। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ আজ মনে পড়ে না। কিন্তু বিস্ময়করভাবে মনে আছে যে পুজার্থী নরনারী ছোট পাতার দোলায় করে কিছু ফুল ও ঘৃতদীপ একটি স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে প্রণাম জানাচ্ছিলেন। যতদূর চোখ যায় মেলে দিয়ে দেখছিলাম দূর থেকে দূরান্তরে দীপশিখা ভেসে গেল, মিলিয়ে গেল, কোনটি বা ডুবে গেল, তরঙ্গ দোলায়—কোনটি বা ভেসে উঠল একটু উঁচুতে। সর্বগ্রাসী কালস্রোতে সবই যেন ভেসে গেল। শেষ প্রদীপের দেখাও কালগর্ভে লীন হয়ে যেন ডুবে গেল। সেই যমুনার তিমির নীরে ক্ষণশিখার জলদ্যুতি আরো ভয়াবহরূপে অসহায় ও শূন্য মনে হয়েছিল সেদিন। আজকেও মানব-মূল্যায়নের নিকটে কথিত পাবক মানুষটির উদ্দেশ্যে, তিরোহিত অনুজের উদ্দেশ্যে এই ব্যর্থ স্মৃতির প্রদীপ ভাসিয়ে দেওয়াও মনে হচ্ছে তেমনিই শূন্যগর্ভ এবং অসার্থক। তবুও সীমিত বুদ্ধিচিত্ত মানুষের সীমিত তৃপ্তি খোঁজে, বেদনা ভাগ করে নিতে চায়, আর, স্মরণের বেদনাকে বহন করতেও চায়।

যেমন করে আমার চেনা

জ্যোতি দাশগুপ্ত

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কিছুক্ষণ এই সংবাদটাই আমাকে পেয়ে বসেছিল যে তিনি প্রায় আমার বিশ বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন। সহ-কর্মীর মৃত্যু কতটা অকালে ঘটল মাত্র সেজন্য নয়, কাছাকাছি বসে কাজ করা এই মানুষটি বয়সের এতখানি ব্যবধানকে ডিঙিয়ে আমারও অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন কোন গুণে, এই চিন্তাই আমাকে চেপে ধরেছিল ; এবং এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে আজও দীপেন্দ্রনাথকে বেশি বেশি করে চিনে চলেছি। নিজের সঙ্গে তুলনায় অন্যের মতো বোঝাটা একটা সহজাত নিয়ম।

দীপেন্দ্রনাথ যে বড়ো ছিলেন সেকথা তো পঞ্জিকাতেই লিপিবদ্ধ। তেরো বছর বয়সে তিনি গল্প লিখেছেন; চৌদ্দ বছর বয়সে লিখেছেন উপন্যাস। আর তেরো-চৌদ্দ বছরে আমার গুরুজনদের নজর এড়িয়ে পাঠ্য-পুস্তকের নিচে রেখে প্রথম উপন্যাস পাঠে চোখ ও নাকের জলে একাকার হয়েছে।

বাল্যাবধি কথা-সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ অসামান্য জীবনবোধের তাড়নায় কমিউনিস্ট হয়েছেন। আর আমার লেখার জগতে প্রবেশ তিরিশোধে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মবিভাগের ঘূর্ণাবর্তে। আমাদের পরিচয় ঘটল পত্রিকার কাজের মধ্যে—সংবাদপত্রের দপ্তর, যেখানে দেশের ও পৃথিবীর ঝড়ঝাপ্টা সবচেয়ে আগে লাগে। কমিউনিস্ট পত্রিকার সাংবাদিকদের আরো দায় পার্টির কর্মকৌশলের আবেষ্টনির মধ্যে বিষয়কে সাজানো; অথচ ফুটিয়ে তোলা।

অসীমকে সীমার মধ্যে টানার এই প্রক্রিয়া সৃষ্টিশীল কথকের কাছে বুঝি কিছুটা উল্টাটান, কিন্তু সংবাদের ঝড়ই অধিকাংশকে যেভাবে আলোড়িত করে তাতে তপ্ত বিতর্ক ও বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এখানকার সাধারণ প্রবণতা। এই সদা-চাঞ্চল্যেরই ফল হল পত্রিকার পটে একটা গড়-ব্যক্তিত্বের বিকাশ—যিনি বড় তাঁর স্বকীয়তায় কিছু আঁটসাঁট লাগলেও সাধারণ দশজনের কাছে বড় হয়ে ওঠার এ এক প্রশস্ত দেশ।

পত্রিকার কাজ-কারবারে ঘনিষ্ঠ ও অন্বিষ্ট হয়ে থাকায় দীপেন্দ্রনাথের অনেক লেখা হয়ে ওঠে নি একথা স্বতঃসিদ্ধ। সাহিত্যে তাঁর যা দেবার ছিল তার অনেকটা চাপা পড়ে থেকেছে এ নালিশ অযৌক্তিক নয়। 'কালান্তর'-এর শারদীয় সংখ্যাগুলি তার একটা সাক্ষী। এগুলোর সম্পাদনায় বছরের পর বছর দীপেন্দ্রনাথ যেরকম ভূতের মতো খেটেছেন তার শতভাগের এক ভাগ শ্রমে সাহিত্যক্ষেত্র অনেক পুষ্পে মঞ্জুরিত হতে পারত। রাতদিন এবং দিনের চেয়ে রাতেই বেশি, অন্যকে দিয়ে লেখানোর জন্য, সেসব লেখার উপর স্কেচ অংকনের শিল্পী খোঁজার জন্য, এমনকি লেখার প্রুফগুলি স্বহস্তে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নির্ভুল রাখার জন্য তাঁর অন্তহীন খাটুনি কুলির শ্রমকেও হার মানাত। সম্পাদকরূপে দীপেন্দ্রনাথেব নিষ্ঠা 'কালান্তর', 'পরিচয়' এবং কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত আরো কতগুলি সংকলনে মূর্ত। অথচ বছরের পর বছর এই 'কালান্তর'-এর সংখ্যাতে দীপেন্দ্রনাথ নিজের একটা লেখা দেন নি।

এ কী শুধু সময়াভাবের জন্য? কিংবা আরো কিছু কারণ ছিল?

যতটা আমি বুঝেছি, দীপেন্দ্রনাথের আচারনিষ্ঠ কমিউনিস্ট মেজাজও তাঁর লেখার অন্তরায় হয়েছে। কী লিখি, কেন লিখি, কোথায় লিখি, প্রগতি-শীলদের সৃজনীশক্তির বিকাশ ও তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটা কাগজ বের করা, একটা সমবেত মঞ্চ এবং একটা সমবায় গড়া প্রভৃতি প্রশ্নকে জড়িয়ে তাঁর ক্ষ্যাপার মতো অন্বেষণ অনেকেই টের পেয়েছেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে উঠতি পুঁজিবাদের হাতছানি প্রলোভন মুনির মনকেও টলাবার মতো এক সামাজিক বাস্তবতা ছিল। কার্ল মার্কস-এর সেই সতর্কবাণী—লেখকের বাঁচবার জন্য টাকা চাই, কিন্তু টাকার জন্য লেখায় লেখক থাকে না—এ কি অনেক অভিজ্ঞতার পোড় না খেয়ে আপনা-আপনি আত্মস্থ হতে পারে? তবু এরই মধ্যে দীপেন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকের

মতো নিজেকে রক্ষা করে চলেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হবার গৌরববোধটা দীপেন্দ্রনাথের এসেছিল এখান থেকেই।

এরই মধ্যে আবার কমিউনিস্টদের নৌকটা ভাঙল। কমিউনিস্ট আন্দোলনে কী বিভেদ সংগঠন কী সৃষ্টিশীল উন্মাদনা দু' ক্ষেত্রেই যে হতাশা ছড়াল তার প্রধান শিকার হল মননশীলতা।

দীপেন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে মিস্ত্রি হবার কাজটাই নিজের জন্য বেছে নিলেন৷ লেখার জন্য তিনি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় তিনি পেলেন না।

কিন্তু এরই মধ্য আশ্চর্য, কী লিখি কোথায় লিখি বলে যাঁর নিজের লেখা নিয়ে এত খুঁতখুঁতি, অন্য লেখকের বেলায় সেই দীপেন্দ্রনাথ বসুন্ধরাকে কুটুম্ব করার পক্ষপাতী। এ নিয়ে 'কালান্তর'-এ অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। টাকার টানের লেখককে কমিউনিস্ট পত্রিকায় স্থান দেবার বিতর্কে দীপেন্দ্রনাথ সর্বদা লেখকের পক্ষ নিয়েছেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, সৃষ্টিশীলতার মুখ কমিউনিজমের দিকেই, কুয়াসার চেয়ে সূর্য বড়ো।

সাহিত্যের ধ্রুপদী শাখায় দীপেন্দ্রনাথ সবুরপন্থী হলেও সংবাদ সাহিত্যে তাঁর রচনা কম নয়, এবং তার মধ্যে কতগুলি দীর্ঘস্থায়ী সম্পদের উপাদান বিশিষ্ট। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত 'কালান্তর' ঘেঁটে সংবাদপত্রে দীপেন্দ্রনাথের লেখার যে তালিকা তৈরি করেছেন তাতে চল্লিশ ফর্মার পুস্তক হতে পারে। 'ঘোড়েওয়ালাবাবু', 'আমরা থানা থেকে এসেছি', 'নো পাসারান', 'আমার বুলার জন্য' প্রভৃতি লেখা এর অন্তর্ভুক্ত।

পত্রিকার এসব লেখা ষোলআনা পার্টিজান, কোন প্রতীকির আশ্রয় করে নয় বলে চাঁছাছোলা। দলাদলির কালপর্ব অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এর সাহিত্য-মূল্য আপাতত বহুজনের নিকট থেকে আবশ্যকীয় মর্যাদা পেতে না পারে ; কিন্তু প্রচার-ধর্মী এ-লেখাগুলির মধ্যেও সত্যসন্ধানী দীপেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ দূরদর্শিতা, প্রগতিশীলতার জন্য তাঁর যে আবেগ, কথা বলার সেই অপরূপ ভঙ্গি, শিকড় ও ফলের সমাহারপূর্ণ বাস্তবতা উপস্থাপনের বিজ্ঞান প্রভৃতি সার্বজনীন উপাদানগুলি ভবিষ্যৎ পাঠক চিরদিন বর্জন করে চলতে পারবেন না।

সংবাদপত্রের পাতায় দীপেন্দ্রনাথের এ রকমের অনেক লেখার বিষয়বস্তু এবং তার উপস্থাপনের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। আমাদের ঘনিষ্ঠতার কাঠামোটা মুখ্যতর এসবের আলোচনার মধ্যেই গঠিত হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির 'পজিটিভ হিরো'-র জীবন-সাহিত্য রচনা সম্পর্কে আমাদের অনেক আলোচনা হয়েছে। 'ঘোড়েওয়ালাবাবু' তারই একটা ফল।

কিন্তু তার যে বিড়ম্বনা সেকথাও ভুলবার নয়।

বিহার বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী নক্ষত্র মালাকারের জীবন নিয়েই 'ঘোড়েওয়ালাবাবু'। তা যেমন তখনকার রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাল, তেমনই এক সাহিত্য সৃষ্টি হল। কিন্তু একটানা ভাল হয় কোথায়? কিছুদিন পরই সংবাদ এল ঐ দুর্দ্ধর্ষ মানুষটি নকশালদের সঙ্গে ভিড়েছেন। রাজনীতির এমন এক চড়ে সাহিত্যেরও দফা রফা। আমরা দুজনেই বোকা বনে গেলাম। আমাদের ঘনিষ্ঠতা কিন্তু তাতে নিবিড়তর হয়েছে এবং পরস্পরকে বুঝ দিয়েছি একথা বলেই যে, চিরদিনের সত্য হল না বলে 'ঘোড়েওয়ালাবাবু' মিথ্যে নয়।

তবে আবার আমাদের দিন এসেছিল। নক্ষত্র মালাকার আবার পার্টিতে ফিরে এলেন।

তবু সাহিত্যের হিরোকে একজনের জীবনভিত্তিক না করে কমিউনিস্ট জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় প্রতিভূ-জীবন নিয়েই তা রচনা করা উচিত বলে তখনকার মতো সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছিলাম।

বিপরীতে আমার লেখা একটা সম্পাদকীয় নিয়েও দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বিপদের দিনের বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। তা '৭২ সালের নির্বাচনের সময়। সি-পি-এম মুখপত্রের একটা 'শহীদ সংখ্যা' বেরিয়েছিল, এবং শহীদের নামে ভোট চাওয়া হয়েছিল। 'কালান্তর'-এর সম্পাদকীয়তে বলা হল যে, সি-পি-এম-এর শহীদনামায় নক্সালপন্থীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে নিহতরাও স্থান পেয়েছেন। এ থেকে সম্পাদকীয়কে টেনে নেওয়া হয়েছিল এই বক্তব্যের দিকেই যে, সি-পি-এম-এর হাতে নিহত নক্সাল ও নক্সালদের হাতে নিহত সি-পি-এম দুয়ের জন্যই বাংলা-মায়ের আজ বুক চাপড়ানো ছাড়া উপায় নেই। সম্পাদকীয়ের শেষ কথা ছিল এইরূপ যে নিছক দলের শহীদনামা তৈরি করতে গেলে সকলের শহীদ বসিরহাটের নুরুল, কৃষ্ণনগরের আনন্দ হাইত এরাই নতুন করে মারা যাবে।

নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পাদকীয় ভাল কি মন্দ তার পরিবর্তে পার্টির তৎকালীন তাৎক্ষণিক রাজনীতির কষ্টিপাথরে এই সম্পাদকীয় বেশ বেসুরেই

বাজল। নির্বাচনীক্ষেত্রে সি-পি এম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ঠিকই, কিন্তু নির্বাচন-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টিকারী নক্সালপন্থীরা তখন কমিউনিস্ট প্রচারকদের ঠেঙাচ্ছে এবং প্রার্থীদের প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছে। এমত এক সময়ে নক্সালপন্থী শহীদদের উধ্বে তুলে ধরা কী সময়োচিত ?

আমি বেকুব বনলাম নিঃসন্দেহে।

দীপেন্দ্রনাথ কিন্তু সহানুভূতি জানালেন আমাকে। ভ্রান্ত, এমনকি ভ্রাতৃঘাতী রাজনীতির নায়ক যাঁরা, তাঁরা, এবং স্বপ্ন নিয়ে যে-কিশোররা প্রাণ দিল এরা এক নয় কিছুতেই। অথচ নিয়ম এমনই যে মৃত্যুর পর নেতাদের দোষ ছেড়ে গুণ ধরে জাতীয় স্বীকৃতি জুটবে, কিন্তু নিষ্পাপ কিশোরের দল মায়ের বুকের জ্বালা জুড়ানোর মতো সান্ত্বনাটাও পাবে না।

দীপেন্দ্রনাথের দুটো রিপোর্টাজ 'আমরা থানা থেকে এসেছি' এবং 'আমার বুলার জন্য' বাঁশদ্রোণীর কমিউনিস্ট কর্মী নিতাই মুখার্জিকে হত্যার ঘটনার উপর রচিত। এই খুনের অভিযোগ সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে। 'আমার বুলার জন্য' '৭৭ সালের নির্বাচন উপলক্ষে লেখা। তখন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অবস্থান ছিল এইরূপ যে, নির্বাচনে সি-পি-এম এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরিহার্য হলেও সি-পি-এম বিরোধী রাজনৈতিক ফ্রন্ট গড়া নয়।

তত্ত্বগত অবস্থান সঠিক—কিন্তু এর রাজনৈতিক রূপদান কঠিন।

এমনই এক সময় পত্রিকায় প্রকাশিত কতগুলি সংবাদ নিয়ে দীপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুললেন, আমরা কার্যত সি-পি-এম-বিরোধী হয়ে যাচ্ছি কিনা।

এই নির্বাচনে সি-পি-এম'এর প্রচারের একটা মুখ্য বিষয় ছিল এই যে গৃহ ও পাড়া ছাড়া তাদের ১৫ হাজার কর্মী সি-পি-এম জিতলেই ঘরে ফিরতে পারবে—নতুবা নয়।

ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা সৃষ্টিতে সি-পি এম-এর ভূমিকা ও সেই পথ পরিহার করার কথা এই প্রচারে ছিল না। তা ছাড়া এই প্রচার এ-কারণেও অহিতকর যে গণতন্ত্র বিনাশেই সকলের মঙ্গল এর পরিবর্তে দলের জয়েই দলের কর্মীদের মঙ্গল এই ধারণা ছড়ায়।

'কালান্তর'-এর কর্তব্য পালন সহজ ছিল না বলাই বাহুল্য। দীপেন্দ্রনাথকে বললাম, নিতাই-এর স্ত্রী ঝুনু ও তার কন্যা বুলুর কাছ থেকে জেনে আসা ভাল আমাদের কী বলা উচিত। দীপেন্দ্রনাথ গেলেন এবং রিপোর্টাজ লিখলেন।

ঝুনুর সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের যে-কথা হল তা নিম্নরূপ :

'কাগজে দেখেছেন তো সি-পি-এম নেতারা বলছেন তাঁদের দলের পনের হাজার ক্যাডার ঘরে ফিরতে পারছেন না। আপনি কি চান যে তাঁরা যে-যার ঘরে ফিরুন।

'মুহূর্তের চিন্তা না করে আমার প্রত্যাশার অতিরিক্ত স্বাভাবিকভাবে কমরেড ঝুনু বললেন—ফিরে আসবে না কেন? তাঁদেরও তো মা-বৌ-মেয়ে আছে।

'তারপর একটু থেমে, একটু কুণ্ঠিত হয়েই বললেন, এসে যেন ভালভাবে থাকে, আবার সেই সন্ত্রাস সৃষ্টি না করে। মনের ভেতর একটা ভীতি যে থেকেই যায় দাদা।

'বললাম, আপনি কি চান ওঁরা আবার রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করুন।

'—নিশ্চয়ই। তবে রাজনীতিটা যেন সুস্থ হয়। সেদিনের পলিটিক্স মনে হলেই তো বিভীষিকা মনে পড়ে যায়।

'একবার, ঐ একবারই বুঝি কমরেড ঝুনুর চোখে আতঙ্ক ছায়া ফেলল। দমকা বাতাসে প্রদীপের স্থির শিখা কেঁপে গেল যেন। আমি দেখতে পাচ্ছি ভোর রাতে কড়া নেড়ে কারা বলছে: দরজা খোল, আমরা থানা থেকে আসছি। ঘুম জড়ানো চোখে ঝুনু ছিটকিনি খুলে দিলেন, ঘুম জড়ানো চোখে নিতাই উঠে বসল। তারপর চেনা-অচেনা অনেকে পাইপগান হাতে ঢুকল। ঝুনুর চোখের সামনে, বুলার চোখের সামনে ·

'ছটফট করে উঠে বললাম, হ্যাঁ একথা আপনি বলতেই পারেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, পরের ছ-বছর ওরা তো একঘরে হয়ে কাটাল।

'শান্ত স্বরে ঝুনু বললেন, ঘর ভেঙেছে। শাস্তি ঠিকই পাচ্ছে।

'তারপর কিছুটা যেন আত্মগতভাবেই বললেন, দুঃখের মূল্যেই তো ওঁরা আমাদের কষ্ট ও নিজেদের ভুলও বুঝবে।'

রিপোর্টাজ পড়ে দীপেন্দ্রনাথকে বলেছিলাম, 'কালান্তর'-এর আর দশটা লেখার চেয়ে আপনার রিপোর্টাজ যে অনেক বেশি ক্ষুরধার হল।

দীপেন্দ্রনাথ হ্যাঁ-না সেদিন কিছুই বলেন নি।

দূর ও নিকট এই দ্বন্দ্ব বড় সাংঘাতিক। স্বপ্ন দেখেই কাজ শেষ নয়। স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য মাটিতে কোদাল চালানো বড় কঠিন।

তবে, নির্বাচনে জয়লাভের পর সি পি-এম নেতারা আব পুরোনো হানাহানির পুনরাবৃত্তি নয় বলে যতটুকু বলেছেন তাতে দাপেন্দ্রনাথের স্বপ্নেরই জয়ের সূচনা।

দীপেন্দ্রনাথের চেষ্টা

অসীম রায়

দীপেন্দ্রনাথের শোকসভায় এমন এক ঘটনা ঘটেছিল যা ইদানীংকালে কম ঘটেছে। এ সভায় বিভিন্ন মত বিভিন্ন পথের লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ-বৃদ্ধ-যুবা-কিশোর এসেছিলেন দলে দলে। কী এমন ছিল দীপেন্দ্রনাথের কর্মে কল্পনায়, তাঁর সাহিত্যে জীবনচর্চায়, যার ফলে অগ্রজ-অনুজ অনেকের কাছেই তিনি বাঙালি সংস্কৃতি জগতের এক অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? তাঁর অকালমৃত্যুর স্তম্ভিত শোকের মাঝখানে এই প্রশ্নটা অনেকের মনেই নাড়াচাড়া করেছিল সেদিন।

সত্যিই তো খুব দীর্ঘ সময়ব্যাপী তন্ময় সাহিত্যচর্চা দীপেন্দ্রনাথের ছিল না। সাংগঠনিক রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন এবং সেজন্যে গর্বিতও ছিলেন। সাংগঠনিক রাজনীতির যে অপরিসীম ও অবশ্যম্ভাবী আবদার তা পুরোপুরি বছরের পর বছর ধরে নিরলসভাবে রক্ষা করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জগতের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট জগতের অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা কাঁটার মতো তাঁর বুকে বিঁধত, কখনও কখনও মনোমালিন্যের ঝড়েও কাতর বোধ করতেন। ফলে সাহিত্যকর্মের জগতের পরিমাপ ছিল বিশেষ সঙ্কুচিত। বনের মোষ তাড়াতে অনেক সময় ব্যয় করেছেন। তাছাড়া শরীরও খুব জোরদার ছিল না। এই সব প্রবল প্রতিকূলতা অসুবিধা সত্ত্বেও দীপেন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকর্মে ও মেজাজে এমন এক মূল ভিত্তির ওপর এসে দাঁড়িয়েছিলেন যা খুব কম বাঙালি লেখক, বিশেষ করে গদ্য লেখক সাম্প্রতিককালে দাঁড়িয়েছেন। দীপেন্দ্রনাথ

একই সঙ্গে যেমন তাঁর কালের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে জড়িয়েছিলেন, লেখকের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মীর সমাজজিজ্ঞাসা যেমন অনন্ত জীবন-জিজ্ঞাসা রূপে উপলব্ধি করেছেন, তেমনি সাহিত্যের নিরলস দুনিয়াব্যাপী প্রচেষ্টায় যে প্রবল পরাক্রান্ত শিল্পোৎকর্ষে সমুজ্জ্বল গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে তার ঐতিহ্যে বাংলা গদ্যচর্চাকে যথেষ্ট পরিমাণে কালোপযোগী আধুনিক রূপ দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

অর্থাৎ যে দুটো জগৎকে সচরাচর আমাদের মানসিক আলস্যে অসহিষ্ণুতায় দুটো গ্রহ বলে চিহ্নিত করে থাকি সে দুটো যে আসলে একটাই অখণ্ড ও সামগ্রিক জগত, দীপেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মে-কল্পনায় এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করেছেন এবং সেইভাবে কাজ করেছেন।

কথাটা বলতে যত সহজ কাজে তা যে মোটেই নয় তা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গত দু দশকের বহুল পরিচিত ও সমাদৃত গদ্য লেখকের কাজের চেহারা দেখলেই স্পষ্ট। আধুনিকতা চর্চা বাংলা কবিতায় অনেকটা শিকড় নিয়েছে। এখন যাঁরা তরুণ কবি তাঁদের প্রকাশভঙ্গিতে কুমুদরঞ্জন মল্লিক কিংবা কালিদাস রয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবেন না। বিশেষ করে আধুনিক বাঙালি কবিদের কর্মকাণ্ডে নতুন ভাবনা ও প্রকাশভঙ্গির এক সচেতন সমন্বয়ের প্রয়াস বারেবারে ঘটেছে। বাংলা গদ্যে এই স্বাভাবিক পারিক্রমা, অন্তত জনপ্রিয় লেখকদের ক্ষেত্রে, মোটেই স্পষ্ট নয়। সেই পুরনো ভাবাবেগ আপ্লুত আগোছাল গদ্য; কিছু কিছু চাতুর্য ও কৌশলের আশ্রয় নিলেও আধুনিকতা গদ্যে প্রায় নিরালম্ব। আসলে প্যাচপেচে ছোট্ট কান্না ও ছোট্ট হাসিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সাহিত্যের সংসার।

সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সচেতনতা কাব্যে বেশ কিছু পরিমাণে বিধৃত হলেও গদ্যে তাকে গড়ন দেবার দুরূহ দায়িত্ব পালনের চেষ্টাও কম। গদ্য যেহেতু অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা দরকার, তলিয়ে বলা দরকার, সেজন্যে তার স্থাপত্য নিয়ে ভাবনা কম। কবিতায় কতগুলো নির্দিষ্ট ছেদ আছে কিন্তু গদ্যে যে অনির্দিষ্ট যতিহীনতা, বিপরীত ভাবাবেগের সংঘর্ষ এবং অনেক সময় সেই বিপরীত ভাব-ধারার ঝাড়াঝাপ্টা সমন্বয়ের বদলে অন্তহীন সুখদুঃখের সমান্তরাল সঞ্চরণ, তার সঙ্গে সমাজ সচেতনতার চেনা মামুলি ছকের অনেক অমিল।

তাই দীপেন্দ্রনাথের ব্রত ছিল দুরূহ। প্রাণপণে তিনি আধুনিক হবার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক গদ্যকারদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেরণা তাঁর জীবনের গোড়ায় জল ঢেলেছে, তেমনি তিনি আমাদের এই দুঃখে বিদীর্ণ বাঙালি

জীবনের শরিক হয়েছেন। ছুটেছেন সর্বত্র। দেশের বিপদে আপদে দুঃখে আনন্দে। যেমনভাবে তিনি দৌড়েছেন খরাক্লিষ্ট বন্যায় ভাসা মানুষের কাছে, পূর্ব বাংলার মানুষের দুর্বিপাকে, তেমনি একাগ্রতায় হাত বাড়িয়েছেন যেখানেই ভালো উপন্যাস গল্প নাটক ফিল্ম। সাহিত্যে সমাজবাদী চিন্তাধারাকে যেমন সমৃদ্ধ, আরও ঐশ্বর্যশালী করে তুলবার চেষ্টায় তিনি ছিলেন সচেষ্ট, তেমনি চেষ্টা করেছেন আধুনিকতা যেন একটা বহিঃরঙ্গে পর্যবসিত না হয়, আঙ্গিকের সন্ধানে ছোটো না হয়। বাস্তবের অদ্বৈত চেহারার বিরাট স্পন্দমান পরিবর্তনশীল রূপকে তাঁর ছোট্ট শরীর আর প্রচণ্ড হৃদয় দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

আলোচনায় দীপেন্দ্রনাথের কৃতি সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে কোথাও কোথাও মনে হয়, লেখাতে আরও তন্ময়তার অবকাশ আছে, যেসব কথা বলেছেন তা আরো জড়িয়ে বিস্তৃত ক্যানভাসে সাজালে যেন আরও ভালো হত। কিন্তু লেখকের অবিরত প্রয়াস এবং তাঁর মেজাজের লড়াই আমাদের আলোচ্য। মহৎ লেখকদের ক্ষেত্রেও কি একথা প্রযোজ্য নয়?

দীপেন্দ্রনাথের নিজস্ব সাহিত্যকর্ম ছাড়াও আর একটা বিস্তৃত ও ব্যাপক জগত ছিল — তাঁর সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্র। সেখানে সমাজ সচেতন উচ্চমানের লেখা সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম দায়বোধ বিস্ময়কর। তাঁর সীমাবদ্ধ সামর্থ সত্ত্বেও অবিরত উৎসাহ দিয়েছেন লেখকদের, তাঁদের একলা চলার অনিশ্চিত পথ আলোকিত করেছেন বছরের পর বছর। অগ্রজদের কাছেও সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর নেতৃত্ব ছিল তাই অপরিহার্য।

দীপেন্দ্রনাথ সাংগঠনিক রাজনৈতিক কর্মী হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক মস্ত বড় মিলনের স্বপ্ন দেখতেন। এ কারণে তিনি কিছু কিছু অসহিষ্ণু বামপন্থী লোকজনের কাছে ছিলেন সন্দেহের বস্তু। আসলে মানুষের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল অনেকখানি বেশি। যাঁদের লেখা তাঁর পছন্দ হত না তাঁদের কাছেও তাঁর ছিল অবিরত প্রত্যাশা। এতগুলো গুণের সমন্বয় খুব লোকের ক্ষেত্রেই ঘটে। দীপেন্দ্রনাথের স্মৃতি আমাদের ক্লিষ্ট দীন জীবনের এক মস্ত সঞ্চয়।

ছিন্ন-পক্ষ ও পূর্ণচ্ছেদ

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

নেত্যচরণের সঙ্গে জটায়ুর শরীরী সাদৃশ্য একটাই, নেত্যচরণের দুটি হাত কনুই পর্যন্ত কাটা।

জটায়ু পৌরাণিক, জটায়ুর পৌরাণিক অনুষঙ্গ এরকম: জটায়ু বায়ু-বেগ-গামী পাখি বিশেষ, পক্ষিরাজ। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যসারথির এক পুত্র জটায়ু, অর্থাৎ জটায়ুতে সূর্যের অংশ আছে. জটায়ু ভ্রাতা সম্পাতির সঙ্গে ইন্দ্র-জয়ের বাসনায় আকাশমার্গে যাত্রা করেছিলেন, সীতা-রক্ষার্থে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধকালে জটায়ু ছিন্নপক্ষ, সীতাকে অপহরণ করে রাবণ দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেছেন—এই জরুরী-সংবাদটুকু রামচন্দ্রকে দেওয়ার পরই জটায়ুর মৃত্যু হয়।

নেত্যচরণ দুর্গাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিল, সুপুরির চোরাই ব্যবসা, ছুটন্ত গাড়িতে তড়িৎ গতিই তার যাবতীয় সংগ্রাম। যার নাম নেত্য, কেন যেন সে নাচতে পারত, যে নাচ ওড়ার সামিল, যে নাচে সে উড়তে পারত। নেত্যচরণ ধুনচি নিয়ে দেবী-প্রতিমার সামনে নাচত, ধুনচিতে আগুন, চারপাশের পাট-কাঠির বেড়ায় আগুন। ফলে সে আগুনের অধিকারও পেল, নেত্যচরণ জটায়ু হয়ে গেল: 'এই যে, এই যে, এইখানে।'

অথচ সে ত নেত্যচরণ, সামান্য নেত্য। নেত্য পৌরাণিক নয়। দেশত্যাগ দেখেছে। অনাহার দেখেছে। হয়ত বা যুদ্ধও। দুর্গা পৌরাণিক নয়, তাকে কেবিনের (হোটেলের) ভেতর আটকে রাখা যায়, ধর্ষণ করা যায়, তার মাথার ওপর তখন বৈদ্যুতিক-পাখা ঘোরে।

আর যা কিছু সবই আগুন।

ফলে সেই পৌরাণিক জগত একেকবার গড়ে ওঠে ধোঁয়ায়, আগুনে, অন্ধকারে আবার তা মুহূর্তেই ধূলিসাৎ। এই জগত নির্মিত হয় একেবারে সূচনায় ('ট্রেনের শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে ঝিঁ-ঝিঁর ডাকের সঙ্গে মিলে গেল')। ট্রেনটি চলে গেলে, ক্রমে, ট্রেনের শব্দ ঝিঁ-ঝিঁর ডাকে স্থিতি পায়। তখন যেমন লুট অন্ধকার ফিরে আসে পূর্ববৎ, আকাশ, গাছ, মাটি ও শূন্যতা সমেত সেই প্রাকৃত জগত উঠে আসতে থাকে, তেমনি ট্রেনের শব্দটা .....ঝিঁ-ঝিঁর ডাকে···মিশে' কি ভ্রমাত্মক! 'আজ জোনাকিও ছিল না। অমাবস্যায়··· অবিশ্বাস্য···' সেই জগত উঠে আসতে থাকে। হ্যাজাক জ্বলছিল বলে ঐ পরিবেশ ভিন্ন মাত্রা পায়, এবং হ্যাজাকটি যেহেতু এই পরিবেশে গৃহীত হয়ে যায়, ফলে ঐ অলৌকিকতা 'আরো অবস্থাব'। আসরটি 'অবস্থাব'। পৌরাণিক জগতের সীমায় তখন বর্তমান প্রবিষ্ট, বা বর্তমানে সেই পৌরাণিকতা এসে যাচ্ছে। যেহেতু বর্তমান আদিম-নির্দয়, তারা অতিক্রম করে যেতে চায় এই কাল, তাদের আগ্রহে আকাঙ্ক্ষায় সেই প্রাচীন-তীব্রতা, অদম্য বাঁচার আলোড়ন। মৌল মানবিক উপাদানের প্রহারে তারা নির্যাতিত। উপরন্তু এই অন্ধকার, অন্ধকার কাল, তারা প্রজ্জ্বলিত করতে চায়। আবার দুর্গাকে প্রলোভিত করে কোথাও দেশলাই কাঠি জ্বলে, সমস্তই তছনছ করে দেয়, সম্পূর্ণ অ-পৌরাণিক এক ঝড়ে। এই ঝড়ের 'চশমা ছিল কি·?' তার পরনে কি ছিল, প্যান্ট না ধুতি, সে কোন স্টেশনে নামত!

অথচ...'তাকে বীর মনে হচ্ছিল।' ঢাকের মাথায় সুসজ্জিত পালক 'বীরছত্র' সাদৃশ্যে নেমে আসছে নেত্যচরণের মাথার ওপর, পরিস্থিতি বীরত্ব দাবি করে, বীরত্বের প্রয়োজন থেকে যায়। বিশ শতকী বেচা-কেনা, যন্ত্রে ও যান্ত্রিকতায়, পেষণে যা অতীতের বস্তু, পুরাকালীন সেই বীরত্বের প্রয়োজন পুনরায় রচনা করতে থাকে মায়া। ধোঁয়ায়, অন্ধকারে, নির্বাসিত অস্তিত্ব বীর হতে চায়, প্রকাশ চায়। এই উপাদান ত তার শরীরে, রক্তে ছিল বংশানুক্রমিক নৃত্যছন্দ। মানুষের যাবতীয় কাজ ও আনন্দে এই নাচ কি প্রাচীন! অথচ 'ও এবার নাচবে কেউ ভাবে নি।'

আবার নেত্যচরণ মহিমা-বর্জিত তুচ্ছ মানুষ। 'বৌয়ের রোজগারে খায়' এই অমোঘ বাক্যাংশে বড় মামুলি সে, সে কি করে বীর হবে, বীর হয়। যদিও নির্দয় অমাবস্যায় তার অস্তিত্ব ফিরে পাওয়া, সে যে আছে তা শরীরে,

পেশীতে, পায়ের তলার মাটি ও পারিপার্শ্বিকে আনন্দময় করে তুলতে পারে সেই প্রাচীনত্ব। নির্বাসিত, প্রায়-বিস্মৃত ঐ অশ্ব-শক্তি।

এভাবেই নেত্য চলে যাচ্ছে নৃত্য ছন্দে, আগুনে, আগুনের স্রোতে। আগুন স্রোতে সে বুঝিবা অর্জনও করতে থাকে সেই গতি ও ক্ষিপ্রতা যা বায়ু-বেগ-গামী। হয়ত বা তার বিনাশ হয়। সমগ্র কাহিনীতে এই নির্ঘাতিত স্বপ্নের মুক্তি-ছন্দ ও প্রহার, ফলে বিমূর্ত। প্রায় কোনো কাহিনী নেই, যা আছে সেটুকু তথ্য, কয়েকটি অসম্মানজনক সন্ধি (আধুনিকতা), যার শর্ত মেনে নেওয়া। যার শর্ত গ্লানি ও অপাবগতা বিস্মৃত হওয়া—সেখানে এই স্বপ্নটি অনিবার্য গেঁথে নিয়েছে কাল, পুরাণ-সম্পর্ক, অথচ এমনকি স্বপ্নেও কোনো পলায়ন নেই, যে-জন্যে স্বপ্নটি ঐ পৌরাণিকতা বারবার গড়ে ওঠে ও ভেঙে যায়। যুগপৎ তা মায়া ও বাস্তব বলে বড় অনাশ্রিত আমরা।

কলকাতায় এক লেখকের খোঁজে

অরুণ কৌল

তাঁকে আমি কখনো দেখি নি। দেখার পরিচিত হওয়ার সুযোগ একবার এসেছিল, কিন্তু এক বন্ধুর কৃপায় তখন হয়ে ওঠে নি। এর দিনকয়েক পরেই আমাকে বোম্বাই-এ ফিরে যেতে হয়েছিল। কয়েক মাস পরে আবার এলাম। কিন্তু আমি এখানে পৌঁছবার ঠিক তিনদিন আগে তিনি চলে গেছেন। আর আমি এখন এই মহানগরীতে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

খুঁজতে বেরিয়ে প্রথমেই আমি পৌঁছে যাই তাঁর বাড়িতে, নিউ আলিপুরে এক বাংলোর মতো বাড়ির পেছনের অংশে যেখানে তাঁর পরিবার এখনো বাস করেন। আমার সঙ্গে দুই বন্ধু। শীতের রোদ, সন্ধ্যা হতে তখনো একটু দেরি, বাতাস তখনো স্বচ্ছ—আশপাশের বসতিতে কাঁচা কয়লা, ঘুঁটে আর কাঠের উনুনের ধোঁয়া ছড়াতে শুরু করে নি তখনো। আমরা তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। সাধারণ ঘর, সাধারণ আসবাবপত্র। আমার সঙ্গের বন্ধুরা এখানে যাতায়াত করেন, তাঁরা বেশ সহজ। আমি প্রথম এসেছি বলেই হয়তো ঘরটা একটু অন্ধকার অন্ধকার ঠেকে। কেমন শান্ত, নীরব নিঃশব্দ—অদ্ভুত এক গুমোট, উদাসীন ভাব। ঘরের ভেতরে আর বাইরে কত তফাৎ!

ষোল-সতেরো বছরের একটি মেয়ে আমাদের যত্ন করে বসায়। সম্ভবত বাড়ির লোকেরা জানেন আমি বোম্বাই থেকে এসেছি। মেয়েটি আমাকে প্রণাম করে। বাবার বন্ধু—বাইরে থেকে এসেছেন তাঁকে সম্মান দেখানোটা

আগে হলে হয়তো আমার ভালো লাগত। কিন্তু এখন, এই পরিস্থিতিতে অস্বস্তি হয়। মেয়েটি বলে, শান্ত ধীর কণ্ঠস্বর, পরিমিত শব্দ, 'না, মা এখনো ফেরে নি, দাদুর শরীর ভালো নেই, তাঁকে দেখতে গেছে···বাবার কাগজপত্র মা গুছিয়ে রেখেছে, কিন্তু তার মধ্যে কোনো নোটবই আমি দেখি নি।' একটা পাণ্ডুলিপি দীপেনবাবু হাসপাতালে দেখছিলেন—কথাবার্তা তাই নিয়েই।

আমি ভাবতে থাকি, মানুষটা তিনি কেমন ছিলেন, চেতনার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, হাসপাতালে শুয়ে শুয়েও যিনি কাজ করে গেছেন। জানা যায় তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়ার পর তাঁকে যখন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে পাঠানো হয়, তাঁর বালিশ এবং তোষকের নিচে থেকে নানা লেখা বইপত্র, পাণ্ডুলিপি জড়ো করে একটা পুঁটলি করা হয়েছিল। আমার বন্ধুরা সেই পুঁটলির মধ্যে একটা পাণ্ডুলিপির খোঁজ করছেন।

সজীবা মেয়েটিকে কি সব বোঝান। চিনুবৌদির (শ্রীমতী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়) জন্যে একটা চিরকুট লেখেন। আমি গোটা ঘরটা, ঘরের উদাসীন গুমোট পরিবেশ এক নিঃশ্বাসে পান করতে চাই। এই নিশ্চয়ই সেই তক্তপোষ যার ওপর তিনি বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়তেন, শুয়ে থাকতে থাকতে কাত হয়ে উঠে বসতেন। শরীরের কষ্ট হাড় আর মাংসপেশীর ব্যথা, গ্রন্থির যন্ত্রণা, কাশির দমক, ক্ষীণ শরীর এই তক্তপোষের ওপর—এইটেই হয়তো ছিল তাঁর কর্মভূমি। এই হয়তো তাঁর ধর্মক্ষেত্র। এই চেয়ারগুলোতেই নিশ্চয়ই সকালসন্ধ্যায় এসে বসতেন তাঁর সাক্ষাতকারীর দল—সাহিত্যকার, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, চিন্তাবিদ, গায়ক—তাঁর অনেক ভক্ত—সন্ত্রস্ত, সর্বহারা, শ্রমজীবী—সবাই। মৃত্যুকে যিনি নিয়ত তাচ্ছিল্য করতেন সেই দীপেন্দ্রনাথ হয়তো এখানে বসেই সবাইকে জীবনের সঙ্গে লড়াই করার, ঠিকভাবে বাঁচার উৎসাহ যোগাতেন। আমি এমন অনেক মানুষের দেখা পেয়েছি দীপেনবাবু যাঁদের প্রেরণার স্রোত ছিলেন—শুধু তাই নয়, বন্ধু, সখা, সহযাত্রী এবং আচার্যও ছিলেন। এঁদের অনেকেই দীপেনবাবুর চেয়ে বয়সে বড়।

দীপেনবাবুর বাড়ি থেকে আমরা চলে আসি বন্ধুর বাড়িতে। কাছেই! কিন্তু আমাদের তিনজনকে ঘিরে থাকে এক দমবন্ধ পরিবেশ। সন্ধ্যা নামছে। চারপাশে নীল, কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা চলে। জমে না। একজনকে পরিচয়-এর দপ্তরে যেতে হবে, আমি তাকে বাস স্টপে পৌছতে যাই।

দীপেনবাবুকে চেনার জন্যে আমাকে পরিচয়-এর দপ্তরে যেতে হয়। মহাত্মা গান্ধী রোডের এক বাড়িতে, চাপা গলির মধ্যে দিয়ে দোতলায় উঠে যাই আমরা। পাশের ঘরে উচ্চকণ্ঠের কলরব, ইংরিজি মেশানো বাংলা আর বাংলা মেশানো ইংরিজিতে বাকযুদ্ধ। কলকাতার স্কুলশিক্ষক, কলেজের লেকচারার ও প্রফেসরদের সমিতি।

তার ঠিক সামনে শান্ত একটি ঘর। ধুলোয় ধূসর। মাকড়সার জালে ঘেরা, মলিন দরজা-জানলা—'পরিচয়'-এর দপ্তর। একদিকের দেয়ালে দু-তিনটে র‍্যাক, কয়েকটি আলমিরা তার ভেতরে ইতিহাস—প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে যে-পত্রিকাটি বাংলা-সাহিত্যের দর্পণ আর দিগদর্শনের ভূমিকা পালন করেছে সেই 'পরিচয়'-এর নানা সংখ্যা। সময়ে আর ধুলোতে ক্ষয়ে যাওয়া নানা সংস্করণ।

দরজা পেরিয়ে ঘরে পা দিতেই উলটো দিকের দেয়ালে কালো একটি পোস্টার—সাদা রঙের সুন্দর হরফে দীপেন্দ্রনাথের প্রতি ছোট্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি। অন্যদিকের দেয়ালে বেঁটে একটি আলমিরার ওপর গোর্কির ছোট্ট একটি মূর্তি—প্লাস্টার অফ প্যারিসের—কোনোদিন হয়তো তার রঙ ছিল সাদা। তার ঠিক ওপরে কোনো শিল্পীর আঁকা লেনিনের ছবি। পাশের দেয়ালে তিনটি ছবি, সাদায় কালোয়, রবীন্দ্রনাথ—সাদা ঢেউতোলা দাড়ি, সুবিন্যস্ত কেশরাশি; মাঝখানে তরুণ কবি সুকান্ত—দু'চোখে অদ্ভুত দীপ্তি; তার পাশে মাঝবয়সী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—একই সঙ্গে সময়ের মার আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তাঁর মুখে। একই সময়ে একই সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে বাংলা সাহিত্যের তিন ধারা। পরস্পরের থেকে কত পৃথক আবার পরস্পরের কত পরিপূরক—ক্ল্যাসিকাল রবীন্দ্রনাথ, ঘোর বাস্তববাদী মাণিকবাবু, তাঁদের মাঝখানে যৌবনের অনির্দিষ্ট আবেগ, অদম্য আশাবাদ আর বিপ্লবের বার্তাবহ সুকান্ত—'তারপর হব ইতিহাস'।

তার ঠিক নিচে টেবিলে একটি ছবি—দীপেন্দ্রনাথের। এখনও টেবিলের ওপরেই আছে, কিছুদিন পরেই হয়তো দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। টেবিলের সঙ্গে একটি চেয়ার—এখনো খালি। দীপেন্দ্রনাথ বসতেন চেয়ারটিতে। চারপাশে ছড়ানো দু-একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার, কয়েকটি বেঞ্চি—বৃত্তাকারে বসে আছেন কয়েকজন মানুষ। এঁরাই দীপেনবাবুর সহকর্মী, সমকালীন লেখক, বন্ধু। শুনেছি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাতে তিনি লিখতেন না, তাদের থেকে দূরে দূরেই থেকেছেন। এঁদের

হালও তাই। ছোটখাট শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, কলেজের অধ্যাপক, বেসরকারি দপ্তরের চাকুরিওয়ালা। জনাকয়েক মহিলাও আছেন। মনে হয় 'পরিচয়' নিছক একটি মাসিকপত্রই নয়, 'পরিচয়' একটা আন্দোলন।

এখানে সকলেই শান্ত, স্থির, সহজ। মাঝেমাঝে হাসিঠাট্টাও শোনা যায়। এঁদের মধ্যে এক অদ্ভুত সচেতনতা আছে, পরস্পরের প্রতি আছে এক ধরনের সৌহার্দ এবং আপনতাবোধ। কথাবার্তা বাংলাতেই চলে, আমি এখন অল্পস্বল্প বুঝতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু পটভূমি জানা না থাকায় অনেক কথাই ধরতে পারি না। মাঝেমাঝেই দীপু, দীপেনদা, দীপেনবাবুর উল্লেখ—ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু এঁদের কথাবার্তা শুনে একথা একবারও মনে হয় না, এঁরা কেউ তাঁর অন্ধ ভক্ত বা উপাসক। বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে তিনি থাকলে কি করতেন এবং এখন আমাদের কি করা উচিত—এই নিয়েই আলোচনা।

টেবিলের ওপর দীপেনবাবুর ছবি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সাধারণ চেহারা, দাড়িতে আবৃত মুখ। চোখ দুটি যেন একটু বেশি বড়—হয়তো ফ্ল্যাশবালবের কল্যাণে, যেন বিস্ফারিত। চোখ দুটি বুঝি শুধু চোখ নয়, মানসচক্ষু—যেন তিনি নিজের প্রজন্ম, বন্ধুকুল এবং সময়ের ওপর ঠিক ঠিক নজর রেখে চলেছেন।

পরিচয়-এর মহ্‌ফিল শুরু হয় সন্ধ্যে ছ-টা নাগাদ। বাংলাভাষার আড্ডা শব্দটিই বেশি উপযুক্ত। সম্পাদকীয় বিভাগের সব কাজই অবৈতনিক বিনে পয়সায় খাটতে কারো কোনো কষ্ট হয় এমন আভাসটুকুও আমি পাই নি। অন্যরা আসেন সাহায্য করতে, কিন্তু তার তেমন প্রয়োজন হয় না। আলোচনা, চর্চা চলে নিয়মিতই, তার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই, নির্দিষ্ট পদ্ধতিও কিছু নেই, কথাবার্তা শুরু হতে পারে যে কোনো জায়গা থেকেই, আলোচনাকারীদের যে একমত হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কোনো সিদ্ধান্ত বা আনুগত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও নেই, কোনো প্রস্তাবও পাস হয় না।

আমাকে বলা হয়েছিল দীপেন ছিলেন ক্ষুদ্রাকৃতি। এ-ও বলা হয়েছিল, শরীরের সীমাবদ্ধতাকে তিনি কখনোই বাধা বলে মানেন নি। এবং এই না-মানার ব্যাপারটাও ছিল কোনপ্রকার প্রয়াসহীন, সম্পূর্ণ অনায়াস। শুনেছি সাহিত্য এবং বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চতা ছিল বিপুল। নিজের শারীরিক অক্ষমতা অথবা শরীরের ভেতরে ক্রমাগত বাড়তে থাকা রোগ-ভোগ—কোনোটাই তাঁকে কাবু করতে পারে নি। এইসব কথা আমাকে

বলেছিলেন বাংলা ভাষার এক নবীন গল্পকার। তখন মধ্যরাত্রি, শেষ বাস চলে গেছে, কলকাতার রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে হিন্দি-ইংরিজি মিশিয়ে অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন তিনি, খেয়ালই নেই বাড়ি ফিরবেন কি করে। তাঁর সব কথা আমি বুঝেছি কিনা জানি না, তবে তাঁর প্রতি তৃতীয় বাক্যে একবার করে দীপেনদা আসার কারণটা অনায়াসে অনুভব করছিলাম তাঁর চোখের মণির দীপ্তিতে।

দীপেনবাবু কতটা ক্ষুদ্রাকৃতি ছিলেন টেবিলের ওপর রাখা ছবি থেকে বোঝা যায় না। কিছুদিন পরে তাঁর আরো কিছু ছবি দেখার সুযোগ পেয়ে—একটি বিশেষ সংখ্যার জন্যে ছবিগুলি সংগৃহীত হয়েছিল—তাঁর শরীরের মাপ সম্পর্কে একটা আন্দাজ করতে পারলাম। সাধারণ আকৃতির একটা মানুষ চেয়ারে বসলে যতোটা, ততোটাই লম্বা ছিলেন তিনি। আমি সেইসব সভা-সমাবেশের ছবিও দেখেছি যেখানে দীপেনবাবু বক্তৃতা করেছেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সেই ছবিটিও দেখলাম, চিলির শহীদ আলেন্দের পত্নীকে তিনি সম্মান জানাচ্ছেন। প্রত্যেকটি ছবিতেই তিনি কতো সহজ !

গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। ব্যক্তিগত একটা কাজে আটাত্তরের অগাস্টে আমি কলকাতায় এসেছিলাম। তখন দীপেন্দ্রনাথ এবং পরিচয় দুটো নামই আমার অপরিচিত ছিল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ এ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। পুরনো বন্ধু, বিশ-পঁচিশ বছর বোম্বাই-এ কাটাবার পর কলকাতায় ফিরে এসেছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে আমাকে জানাল, যেন একটু ইতস্তত করেই, কলকাতায় সে একটা কাজ নিয়ে পড়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফিল্ম ? বলল, হ্যাঁ। কৌতূহল বা হিংসে কোনোটাই আমি অনুভব করলাম না। এক বন্ধু বহুদিন হোঁচট খাওয়ার পর একটা কাজের কাজ করছে দেখলে আর এক বন্ধু যতটুকু উৎসাহ বোধ করে ততটুকু খুশি হলাম। আমি আর-কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে প্রস্তাব করল, চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারে আমি কি তাকে সাহায্য করব ? আমি বললাম, 'আমার ওপর তোমার জোর আছে বলে যদি মনে কর তা হলে আর জিজ্ঞেস করছ কেন ? আর যদি সে জোর না থাকে আমার কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব রাখ, আমি ভেবে বলব।' সে হেসে ফেলল, অনেক দুঃখ আর কঠিন সংগ্রামের দিন বোম্বাই-এ আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। সে

ছিল এক সহকারী ক্যামেরাম্যান—বেকার; আমি ছিলাম সহকারী পরিচালক—অর্ধবেকার।

গল্পটা কি জানতে চাই। 'গল্পটা বলে বোঝানো যাবে না', সে জবাব দিল, 'তবে নামটা তোমার মনে ধরবে, অশ্বমেধের ঘোড়া।' 'কার গল্প?' দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর!' আগেই বলেছি, নামটা আমার কাছে অপরিচিত। আমি আর-কিছু প্রশ্ন করার আগেই সে তার বাংলামেশানো হিন্দী আর ইংরিজিতে বলল, 'কলকাতার পটভূমিতে দু-জন মানুষের গল্প, এই শহর তাদের না দেয় একসঙ্গে মরতে, না দেয় একসাথে বাঁচতে।' 'গল্পটা ঘটনাপ্রধান নয়?' আমি যেন নিশ্চিত হতে চাই। 'না, কিছু প্রতীক, কিছু অনুভূতি, কিছু প্রতিক্রিয়া—এই নিয়েই গল্প। এইটুকু শুধু বুঝে নাও, একটা বিশেষ দিনে মানুষ দুটি কয়েকটা ঘণ্টা একসাথে কাটাতে চায়, সফর চৌরঙ্গি থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত।' 'প্রেমিক?' 'বটেই তো, তবে এখন স্বামী-স্ত্রী-ও, আজ তাদের বিবাহবার্ষিকী!' 'তা হলে?' 'তাদের এই সফর অসফল দু-জনেই আবার নিজের নিজের ডেরায় ফিরে যায়।' 'তার মানে একসঙ্গে বাস করে না, কোনো অসুবিধা আছে?'... একটু একটু করে যেন বুঝতে থাকি আমি।

তা হলে এই হল সেই গল্প যা নিয়ে ছবি করার স্বপ্ন দেখছে আমার বন্ধু। বাংলাতে এবং হিন্দীতেও। অগাস্টের সেই ঝিরঝির বৃষ্টির সন্ধ্যায় সে আমাকে তার নিউ আলিপুরের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। লম্বা-চওড়া একটা নকশা এঁকে যাওয়ার রাস্তাও আমাকে বুঝিয়েছিল। নানা চিহ্নের সাহায্যে যতই সে বোঝাচ্ছিল ততই আমার গুলিয়ে যাচ্ছিল। নতুন জায়গায় একলা যেতে আমার বড় অসুবিধা হয়। আমার করুণ অবস্থা দেখে সে বলল, আরো একজন যাবেন। আমি যেন তাঁর সঙ্গেই যাই। রাত্রে ওই বাড়িতেই দীপেনবাবুর সঙ্গেও দেখা হবে। আগেই বলেছি, এই 'আরো একজন'-ই সব গণ্ডগোল করেছিলেন। তিনি নিজে শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু দীপেনবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার ছিল না, দেখা হল না।

বোম্বাই-এ পৌঁছে বন্ধুর সঙ্গে চিঠি চালাচালি চলল, তার বাড়িতে যেতে না পারার জন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম। ক্ষমাও চাইলাম। সে লিখল, তাতে কি হয়েছে, পরের বার কলকাতায় এলে দীপেনবাবুর সঙ্গে প্রতিদিনই দেখা করতে হবে।

মাসকয়েক পরে উনআশি সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় এসে মৃণাল

সেনের বাড়িতে বসে কথা প্রসঙ্গে জানা গেল আমি এখানে যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তিনি আর নেই।

এখন 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র চিত্রনাট্য রচনার কাজ চলছে। এ কাজের ব্যবস্থা দীপেনবাবু হাসপাতালে যাওয়ার আগে করে গিয়েছিলেন। আজকাল যখনই আমরা কোনো জায়গায় এসে আটকে যাই তখন তার মীমাংসা হয় এই কথা দিয়ে যে দীপেনবাবু থাকলে এক্ষেত্রে কি করতেন। নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবন নিয়ে লেখা তাঁর অন্যান্য গল্পের পরিপ্রেক্ষিতেও জট ছাড়াবার চেষ্টা করি আমরা। এইসব সময়ে আমার মনে হয় দীপেন আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যান নি। তাঁর ভাবনা, তাঁর বিশ্বাস এবং তাঁর রচিত চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছেই আছেন।

দীপেনের চরিত্র কাঞ্চন বলে, 'আমার আদি ও অকৃত্রিম শত্রু দেখি এতটাই, এই সময়। চরিত্রবান থাকতে দেয় না, চরিত্রহীন হতে দেয় না, ছুঁতে পারি না অথচ প্রতি মুহূর্তে নানা ছদ্মবেশে দেখি।'

চিত্রনাট্য রচনার কাজ করতে গিয়ে মাঝেমাঝেই মনে হয় দীপেনবাবু যেন জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই খোঁচা দেন, দিতে দিতে বলেন, আমাকে চেনো বন্ধু, আমি তোমাদের কাছে আছি, তোমাদের সাথেই আছি।

আমি আমার সীমাবদ্ধতা জানি, নিজের দুর্বলতা সম্পর্কেও আমি সচেতন। এ-ও জানি আমার বন্ধুকে আমি আর বেশি সময় দিতে পারব না। কিন্তু আমি তার সাহসের ভেতরে দীপেন্দ্রনাথকে দেখতে পাই এবং হাজার চাইলেও এই দেখা-না-হওয়া বন্ধুকে আমি ফেরাতে পারি না।

দু' মাস হয়ে গেল এই মহানগরীতে আমি দীপেনকে খুঁজছি। আশ্চর্য, আমি তাকে আগে চিনতে পারি নি। সে সত্যিই আমার আশেপাশে, আমার কাছে, আমার সাথেই ছিল—কখনো উৎসাহ হয়ে, কখনো বিশ্বাস হয়ে, কখনো বা বাঁচার ইচ্ছে হয়ে।

দীপেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেছে। এখন আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

দীপেন

বিষ্ণু দে

দীপেনের বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা খুব কষ্টকর।

অনেক বছর ধরে আমি ওকে চিনি—কবে থেকে ঠিক মনে নেই। অনেক কাজের ফাঁকে, আমার কাছে প্রায়ই সে আসত, ওর মনের কথা বলত, প্রশ্ন করত, অনেক সময়ে চুপ করে বসেও থাকত। ওর সে চুপ করে বসে থাকাতে কোনো অস্বস্তি ছিল না। অনেক সময়ে, কলেজ থেকে ফিরেছি, দেখি চুপ করে বসে আছে, আমাদের বসবার ঘরে। "আপনি কি খুব ক্লান্ত?" এসে জিজ্ঞাসা করত। আমরা দু-জনে বসে একটু চা বিস্কুট সন্দেশ খেতুম, তারপর ও নিজের প্রশ্ন বা কথা বলত। ওর চরিত্রে প্রচণ্ড দৃঢ়তা ছিল, আবার শিশুসুলভ সহজ-সরলতাও ছিল। একদিনের কথা মনে পড়ে—আমরা একবার এক যুব উৎসবের কবিতা পড়ার আসর থেকে ফিরছি—একটু আগেই, চুপিচুপিই, আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম, ভীড় এড়াব বলে,—মনে করেছিলুম একটু হেঁটে ফাঁকা ট্রাম ধরে বাড়ি ফিরব—হঠাৎ কোথা থেকে দীপেন আমাদের দেখে ফেলে, ধরে ফেলল। একটু ব্যথিত স্বরেই যেন বলল, 'চলে যাচ্ছেন?' আমি বুঝিয়ে বলতে কোনো বাধা দিল না। আরেক সন্ধ্যায়, খুব বড় একটি সভার পর আমরা চলে আসছিলুম, অসম্ভব ভীড় ঠেলেই, অত্যন্ত আবেগ ভরে, দীপেন বলল, 'আপনাকে প্রণাম করতে বড্ড ইচ্ছা করছে!' আমি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। এরকম অনেক দিনের, অনেক ছোটখাটো ঘটনা মনে পড়ে।

আমাদের সম্পর্কটা এখন আমার কাছে তাই খুব ব্যথাময় স্মৃতি হয়ে রয়েছে। রিখিয়ায়ও দীপেনের নিয়মিত চিঠি লিখে আমাদের খোঁজ-খবর রাখার কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। অনেক সময়ে কোনো বিষয়ে খুব বিচলিত হয়ে আসত, 'আপনার কাছে একটু বসি' বলে, বসত, আলোচনা হত, আমার খুব ভালো লাগত। বিশেষ করে সেই দিনগুলির কথা খুবই মনে পড়ে—দুপুর রোদে, বা সন্ধ্যায়, বা আরো দেরিতে এসে হাজির হতো—রুক্ষ চুল, চেহারা প্রায় পাগলের মতো, মুখে প্রচণ্ড আলোড়নের ছাপ—সেই যখন কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হলো! তখন, আমি দীপেনকে কি সান্ত্বনা দেবো বা স্তোকবাক্যে বোঝাবো—আমার নিজের মনেই কোনো শান্তি পাচ্ছি না। শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি, ওর মনে কি প্রচণ্ড আঘাত! সেই আবেগময় মূর্তি আমাকেও প্রচণ্ডভাবে বিচলিত করত। কি করে যে সেই সঙ্কটময় দিনগুলি অতিক্রম করে আবার সে স্থির অবিচল কর্মপন্থায় ফিরে এল জানি না, কিন্তু ওর দৃঢ়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে, সর্বদাই।

গত বছর, আমরা যখন রিখিয়া থেকে এসেছিলুম, একদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে হাঁপাতে হাঁপাতে এল। আমরা ওকে দেখে সকলে ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'তোমার তো খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁপানিতে!' ও বললো, 'না, ও কিছু নয়, আমি ভালো আছি। আমার খুব আপনার কাছে আসতে ইচ্ছা করছিল ক-দিন ধরে—আজ সময় পেলুম।' কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই সেটাও মানল না। ভালো করে বসতেই পারছিল না—ওকে দেখে আমাদেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। বাড়ি যাবার সময়ে নাতিনাতনীদের নিয়ে আমি সঞ্জিতের (আমাদের ছোট জামাই) গাড়ি করে সকলে ওর সঙ্গে ওদের নিউ আলীপুরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলুম। দীপেন নিজেও খুব খুশী হয়েছিল, আমাদের সকলেরও খুব আনন্দ হয়েছিল।

'৭৮-এর ডিসেম্বরে গোর্কি সদনে নবজীবনের ও জ্যোতিরিন্দ্রের অন্যান্য গানের বইয়ের প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী যে অনুষ্ঠানটি করেছিলেন, সেইখানেই দীপেনের সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, দীপেন, কেমন আছ? এবং সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে স্মিত উত্তর—'আমি ভালোই আছি।' সেই ছবিই আমার মনে গেঁথে আছে। তখনও, ওর উত্তরে মনেপ্রাণে ভেবেছিলুম—খুব ভালো, ভাল থাকুক দীপেন। যদিও, আমার মনে সর্বদা আতঙ্ক ছিল, ওর ছোটখাটো শরীরটিতে

কি যে ব্যাধি আছে জানি না, কখন সেটা বেরিয়ে পড়ে তাকে আক্রান্ত করবে! ওর মনের প্রচণ্ড শক্তি সেই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় নি—মনের জোরে ঠেকিয়ে রেখেছে। শত দুঃখগ্লানি কত কষ্ট পেরিয়ে এসেছে! কিন্তু এবার শরীরটা আর নিষ্কৃতি দিল না—তাকে আমাদের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আমাদের যে কি অসীম ক্ষতি হল, তা কি আমরা নিজেরাই জানি?

অনুলিখিত : প্রণতি দে

দীপেন

মণীন্দ্র রায়

মাস চার-পাঁচ আগের কথা। পরিচয়ে দীপেনের সঙ্গে দেখা। দীপেন সেই সময়ে মারাত্মক একটা রসিকতার কথা বলে। আর তারপর—

না, এর একটু পেছনের কথা আগে বলে নেওয়া দরকার।

দীপেন ছিল আমার চেয়ে পনের বছরের ছোট। তার যখন বছর কুড়ি বয়স, তখন থেকে তার সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু প্রথম দিকে আজ্ঞে-আচ্ছা দিয়ে শুরু করলেও সে পরিচয় গত পঁচিশ বছরে সখ্যতায় এসে নোঙর ফেলেছিল। ফলে দীপেনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে ইংরেজিতে যাকে বলে টীজ করা, এটা আমার বহুদিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর দীপেনও এভাবে পেছনে লাগলে মজা পেত বেশ। কখনো-কখনো ইন্ধনও জোগাত।

তা যে কথা বলছিলাম। পরিচয় অফিসে সেদিন গিয়ে দেখি, রাজগীর থেকে ফিরেছে দীপেন। পুজোর ছুটিতে হাওয়া বদলাতে গিয়েছিল। চেহারাতে তার ছাপ ছিল, বেশ টাটকা সতেজ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল তাকে। সে সময়ে আরো কেউ-কেউ ছিলেন সেখানে। সকলের মুখ স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু অমিতাভ দাশগুপ্ত ছিল তা এখনও স্মরণ করতে পারি। উত্তর দিকের বেঞ্চ-এ আমি বসেছিলাম দীপেনের মুখোমুখি, অমিতাভ ছিল আমার বাঁ পাশে। পুরো সেটিং ছিল এই রকমই।

আমি বললাম, এই যে দীপেন, চেঞ্জ-এ বেশ কাজ দিয়েছে দেখছি। খুব ভাল লাগল।

দীপেন বলল, কলকাতায় থেকেও তো আপনার কম কাজ দেয় নি মনে হচ্ছে।

আমি—দেখ, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, মোটাকে মোটা বলতে নেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলে গেছেন।

সকলে হেসে উঠলেন।

আমি—শোনো দীপেন, একটা জরুরি কথা বলছি। অনুরোধই বলতে পারো। মানে তুমি তো আমাকে দেখতে পার না, বেঁচে থাকতে তোমার কাছ থেকে ভাল কিছু শুনতে পাব না। কিন্তু একটা কাজ অন্তত করো। আমি যখন মারা যাব, প্রবন্ধ লিখো এ-অনুরোধ করার সাহস নেই, ছোট একটা প্যারাগ্রাফ অন্তত লিখো।

দীপেন হাসল। হাসতে হাসতে বলল—আপনাকে যে কত শ্রদ্ধা করি বোঝাতে পারি নি দেখছি।

আমি—সে জানি। কিন্তু শ্রদ্ধার কথা তো বলি নি। আমি বলছিলাম ভালোবাসার কথা। ভালো তুমি আমাকে মোটেই বাসো না।

দীপেন বলল—সময় পেলে লিখে জানাব। কিন্তু এবার বলুন ত, আমি মারা গেলে আপনি কি লিখবেন?

ছি দীপেন, ও-রকম কথা বলতে নেই—আমি এবং আমরা সকলেই প্রতিবাদ করে উঠলাম একসঙ্গে। যদিও জানি ঠাট্টা। তবু কেমন যেন বেসুরো শোনাল দীপেনের কথা। হয়তো নিজেকে নিয়ে কখনো কিছু বলত না, সেজন্যেই আরো অস্বাভাবিক লেগেছিল। আমি তো বেশ একটু ধমক দিয়েই বলে উঠেছিলাম, ও-রকম বলতে নেই। বিশেষ করে বড়দের কাছে। তাতে তাদের অপমান করা হয়।

দীপেন কিন্তু প্রতিবাদ করল না। এমনিতে খুব কম কথা বলত। কিছু না-বলে চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

তারপর মাসখানেকও পার হল না। বড় বিশ্রী ভাবে সত্যি হয়ে গেল দীপেনের রসিকতা। আর সেই থেকে মাঝেমাঝেই যেন দীপেনের সেই তাকিয়ে থাকা দেখতে পাই।

কিন্তু দীপেন, কী লিখি বল তো? তোমার সঙ্গে আমার লেখালেখির ব্যাপার ছাড়াও অন্য সম্পর্ক ছিল। নিউ আলিপুরে আমি যখন তোমার প্রতিবেশী ছিলাম, দিনের পর দিন আমরা গল্প করেছি। হয় তুমি আসতে

আমার কাছে, নয়তো আমি যেতাম। তখনো তোমার বিয়ে হয় নি। কিন্তু চিন্ময়ীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল বোধহয় এর আগেই। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক দেখতাম। তাই নিয়ে ঠাট্টা করেছি, তুমিও অপ্রস্তুত ভাবে হেসে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে। সেই থেকেই শুরু অসমবয়সী আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব। আর তারপর ৫৯ সালের সেই রক্তক্ষরা দিনে, হাজার-বারো শ মানুষকে যখন পিটিয়ে মারা হল, সারা সন্ধ্যা, রাত প্রায় বারোটা অবধি, তোমার কী ক্রোধ আর যন্ত্রণা, যন্ত্রণা আর অভিশাপ। বয়সের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বড় হয়ে গিয়েছিলে সেদিন তুমি। মানুষের জন্যে তোমার ঐ ভালোবাসা দেখে মাথা নুইয়েছিলাম। পরিচয়ে বসে তুমি শ্রদ্ধার কথা বলেছিলে না? তুমি জানতে না, তোমার জন্য আমার যে ভালোবাসা, সেও ছিল অনেকটা শ্রদ্ধারই মতো।

আমি জানি, এইসব ব্যক্তিগত স্মৃতি আমার সঙ্গেই শেষ হবে। কিন্তু আমার মতো আরো অনেকেরই মনে তুমি যে আত্মসম্ভ্রম জাগিয়েছ, সংক্রামিত করেছ মানুষের জন্য ভালোবাসা, তার কোনো ক্ষয় নেই। তোমার প্রতিদিনের কাজে, তোমার কর্তব্য করে যাওয়ার নিষ্ঠায়, তুমি নতুনদের সামনে আদর্শ। আমার দুঃখ হয়, তুমি বেশি লিখলে না বলে। লিখলে তুমি আরো অনেক খ্যাতি পেতে, হয়তো টাকাও। কিন্তু যখন ভাবি সাহিত্য রচনা আর দৈনন্দিন জীবন দুটোই ছিল তোমার একই বিশ্বাসের দুটি দিক, তখন আর ক্ষোভ থাকে না। কারণ আমি বুঝতে পারি, তুমি কোনো টবের গাছ ছিলে না। তুমি ছিল পাথুরে মাটির শালগাছ। তোমার যতটা লড়াই ছিল মঞ্জরী ফোটানোর দিকে, ততোটাই ছিল মাটির গভীরে শিকড় ছড়িয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে। সাহিত্যে স্মরণীয় হবার দৃষ্টান্ত আরো অনেক আছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মে, কাজের জন্য তোমার এই আত্মদান—এর তুলনা সহজে মিলবে না। আমি অবাক হয়ে যাই দীপেন, তোমার ঐ কোমল মনের মধ্যে এতখানি জোর তুমি কী করে পেলে!

সেও কি তোমার ঐ মানুষের জন্য ভালোবাসায়।

দীপেন

মৃণাল সেন

দীপেনের এক নতুন পরিচয় পেলাম দীপেনের স্মৃতিসভায়।

কথায়, লেখায়, প্রাত্যহিক আচরণে অথবা অগুন্তি আড্ডার আসরে কিংবা হালকা হাসির হিড়িকেও কখনোই দীপেনকে ওর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ভেঙে বেরিয়ে আসতে দেখি নি। অবশ্যই, স্বাচ্ছন্দ্যের ঘাটতি কখনো পাই নি তার মধ্যে, কিন্তু, যে কোনো কারণেই হোক, সবসময়েই মনে হয়েছে মানুষটা যেন ভয়ানক ইন্‌টেন্‌স। অন্তত আমি তাই দেখেছি। কিন্তু সেদিন ওর স্মৃতিসভায়, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যখন ওর কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ পড়িয়ে শোনানো হচ্ছিল তখন, একসময়ে, দীপেনের একটি অপ্রকাশিত এবং হয়তো বা খানিকটা লুকোনো লেখায় এসে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আত্মকথনের মতো একটি লেখা, যা সিদ্ধেশ্বর সেনকে দিয়ে পড়ানো হয়েছিল, যে কথনটি শুরু হয়েছিল একটি 'লোক'-কে নিয়ে, যার নাম দীপেন, যে নামটিকে নানা ভাবে বানান করা যায়, বানানের কারণে যে নামের অর্থ পালটে যায়, অর্থ পালটাতেই, স্বভাবতই, একের মধ্যে বহু-র এবং হয়তো বা নানা বিরোধিতার সমারোহ ঘটে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আপাত হালকা চালে, সরস ঢং-এ নিজেকে নিয়ে যে এ-ভাবে নেড়ে-চেড়ে দেখা এবং রসিকতা করা চলে এবং এই অসামান্য আটপৌরে এবং আলগা সরসতার মধ্য দিয়েও যে এক স্থির প্রজ্ঞায় পৌঁছানো সম্ভব, আজকের

দলবদ্ধ ইন্‌টেলেকচুয়ালরা তা প্রায় ভুলেই বসেছেন। দীপেনের অপরিপূর্ণ জীবদ্দশায় আমিও দীপেনকে এঁদেরই একজন মনে করেছিলাম—শিক্ষিত, মার্জিত, তীক্ষ্ণধী এবং অবশ্যই শিল্পের রাজ্যে নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশায় উদ্বেল। কিন্তু সেদিন, স্মৃতিসভায়, যা শুনলাম, দীপেন নামক একটি 'লোক'-এর আত্ম ব্যাখ্যানে, তা আমাকে এবং হয়তো উপস্থিত আরো অনেককেই চমকে দিয়েছিল, মুগ্ধ করেছিল। সেদিন, সেই মুহূর্তে, অনুপস্থিত দীপেনের মধ্যে আন্দাজ পেয়েছিলাম এমন এক বিশিষ্টবোধের যে বোধ আজকের ইনটেলেকচুয়াল পরিমণ্ডলে প্রায় দুর্লভ।

বেঁচে থাকতে দীপেন আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে গেছে। মৃত্যুর পরে স্মৃতিসভাতেও শেখাল। হাজার কারণে দীপেন আমাদের শিক্ষক এবং অবশ্যই বন্ধু।

পুনশ্চঃ আমার এই সশ্রদ্ধ লেখাটুকু পরিচয়-এর ধূলি-ধূসরিত অগোছালো দপ্তরে পৌঁছোবে, কিন্তু দীপেনের হাতে নয়। ভাবতে কেমন অবশ লাগে।

দীপেন্দ্রনাথ : আন্দোলন ও সংগঠনে

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেদিন আমার দেখা হতে পারত সেদিন হয় নি। কলেজ শুরু হওয়ার পর প্রথম দিকে দিনকতক আমার যাওয়া হয় নি। তাঁকে জানানো হয়েছিল আমি ভর্তি হয়েছি, আমাকেও বলা হয়েছিল কলকাতায় পৌঁছেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যোগাযোগ হল এবং অবিলম্বেই আত্মীয়তাও। কমিউনিস্ট পার্টির কেউ হলে দীপেন্দ্রনাথের আত্মীয় হতে বেশিক্ষণ লাগত না, যেমন হয় কমিউনিস্টের বেলায়। কিংবা হয়ত বলা উচিত—যেমন হওয়ার কথা, যেমন হত তখন।

স্কটিশে ঢুকে দিনকয়েকের মধ্যেই বোঝা গেল দীপেন্দ্রনাথ একটা ব্যাপার। তিনি কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন না, এমনকি ক্লাস থেকে নির্বাচিত সাধারণ প্রতিনিধিও না—এবং তখন কলেজ থেকেও বেরিয়ে গেছেন, তবু তাঁর ছায়া কিছুতেই পার হয়ে যাওয়া যায় না।

পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ায় কলেজের ছাত্র ফেডারেশন এবং পার্টি ইউনিট ভেঙেচুরে গুলিয়ে যায়। তারপর একজন দু-জন কমিউনিস্ট এসেছেন ডাইনে-বাঁয়ে হাতড়েছেন, বড় একটা এগোতে পারেন নি। তিপান্ন নাগাদ তাঁরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের আন্দোলন নিয়ে এলেন কলেজে, দলও পাকালেন খানিকটা। পরের বছর চুয়ান্ন সালে, দীপেন্দ্রনাথ এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে, বি-এ পড়তে। তিনি আসার আগেই তাঁর নাম এসে পৌঁছে গিয়েছিল, লেখকের নাম। ভূগোলটা পালটে গেল। ছাত্র ফেডারেশনের

সদস্য করা শুরু হল, সম্মেলন করে কমিটি হল, কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলহ করে দেয়ালপত্রিকা বেরল এবং স্টাফরুমের গায়ে অনার্স লাইব্রেরিটা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের ঠিকানায় পরিণত হল। সবচেয়ে বড় কথা, প্রথমে পার্টির এ. জি. এবং পরে সেল গড়ে উঠল। এই সেলেই দীপেন্দ্রনাথ পার্টি সদস্যপদ পান। মজার কথা, সেই বছরই, চুয়ান্ন সালেই ভারতসভা হলে সভা করে অতুল্য ঘোষমশাই-এর প্রেরণায় ছাত্রদের-রাজনীতি-করা-উচিত-নয়-এর দল জন্ম দিল ছাত্র পরিষদের—কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন।

'ইংরের পর, বছর দুয়েকের মধ্যেই স্কটিশ চার্চ কলেজে নির্বাচনে জিতে ছাত্র ইউনিয়ন দখল করে নেয় ছাত্র ফেডারেশন। পার্টির ইউনিটও অনেক বড় হয়, প্রভাব প্রতিপত্তিও বাড়ে। আমরা অনেকেই এই পর্যায়ে নানা কাজে ও দায়িত্বে বাঁধা থেকেছি কিন্তু আসল কথা হল দীপেন্দ্রনাথের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর হাতে গড়া সংগঠনের জোর—এই ছিল দুই মূলধন যার ওপর ভিত্তি করেই সব বাড়বাড়ন্ত।

কি বিনয়ে মনে নেই স্কটিশের গেটে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে নামতেই, হিন্দুস্থানী দারোয়ান—লম্বাচওড়া চেহারা, মোটা গোঁফ—একটা জানলা দেখিয়ে আমাকে বলছিল,

আপনাদের নেতা, দীপেনবাবু এইখানে দাঁড়িয়ে একবার এক ভাষণ দিয়েছিলেন······

ঘটনাটা পরেও অনেকবার শুনেছি—পুরোন ছাত্রদের কাছে, দীপেন্দ্রনাথের সহপাঠী কমরেডদের কাছে, কোনো-কোনো অধ্যাপকের কাছে, এমন কি ডঃ টেইলর—রাশভারী প্রিন্সিপ্যাল—যাঁর সঙ্গে আমাদের প্রায় প্রতিদিনই খিটিমিটি লেগেই থাকত, তাঁর কাছেও। কলেজের একদল ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছিল, স্থানীয় কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে। আর-এক দল বিরোধিতা করছিল। ছাত্র ফেডারেশন তখন তেমন কিছু শক্তিশালী নয়। তবু তারা এক তৃতীয় অবস্থানে দাঁড়াল। তারা ধর্মঘটের পক্ষে নয়, আবার ধর্মঘট ভাঙারও বিরুদ্ধে। ঠিক হয়েছিল নিজেদের কথা গেটে দাঁড়িয়ে বলা হবে। দলের সবাই দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় এবং স্লোগানে জানিয়ে দিচ্ছিল ছাত্র ফেডারেশনের বক্তব্য, জানাতে জানাতে অসীম মজুমদারের গলা থেকে হঠাৎ রক্ত পড়ল। তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল সবাই। এই ফাঁকে অন্য দুই দলে হাতাহাতি, ঘুষোঘুষি, তারপর পাথর আর ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি। মুহূর্তে কলেজটা যুদ্ধক্ষেত্র। হঠাৎ সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল, সেই যুদ্ধের মধ্যে

দীপেন্দ্রনাথ লাফ দিয়ে জানলায় উঠে 'বন্ধুগণ' বলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন আকাশের দিকে—যেখান থেকে পাথরবৃষ্টি হচ্ছে। 'আমাকে না মেরে, মেরে না ফেলে, কলেজের কোনো ছাত্র, কোনো ছাত্রীর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না, আমি দিতে দেব না।' যেন নির্দেশ অমোঘ, গোলমাল থেমে গেল।

কেন থামল? কি করে থামাতে পারলেন দীপেন্দ্রনাথ?

একেবারে এক না হলেও অনেকদিন পরে একই রকম পরিস্থিতি হয়েছিল শিল্পীসাহিত্যিকদের এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে। প্রবল গোলমালে সব গুলিয়ে যাওয়ার দশা। দীপেন্দ্রনাথ লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে মাইকটা টেনে নিয়ে ডাকলেন ফ্রেণ্ডস্! কয়েক মিনিটের বক্তৃতা, সভা আবার শান্ত, সম্মিলিত হল। বিভিন্ন সময়ে দেশের হয়ে সাহিত্যিকদের নানা আন্তর্জাতিক সভাতে যোগ দিয়েছেন তিনি। স্কুল ছাড়ার পরেই যান পূর্ব বাংলায়, তখন পূর্ব পাকিস্তানে, পরে একবার সোভিয়েতে একবার লেবাননে। নানা তর্ক-বিতর্কে বাতাস গরম হতে হতে বেইরুটের সম্মেলন প্রায় ভেঙে যাওয়ার অবস্থা হয়। দীপেন্দ্রনাথ বিশেষ অনুমতি নিয়ে মাইকে দাঁড়ান—মিনিট কয়েকের জন্যে। সম্মেলনটা রক্ষা পায়। কি করে পারতেন তিনি? অথচ তিনি এমন কিছু বক্তা ছিলেন না। তাঁর কি কোনো গোপন মন্ত্র জানা ছিল? না তাঁর আবেদনের সততা আর আন্তরিকতা, তাঁর স্বভাবের নিষ্ঠা আর তাঁর চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল প্রাণের টান—তারই জন্য?

*   *   *

দীপেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগের বছর ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে ছাত্র ফেডারেশনের হার হয়েছিল, অনেক বছর পরে। তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ছাত্র আন্দোলনের নেতা, হয়তো তাঁর চেয়ে বড় নেতাই। সে বছর ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রচারের সবকিছুই —পদ্ধতি, ভঙ্গি আর মেজাজ—একেবারে পালটে গেল। গালমন্দর জায়গায় শোনা গেল ব্যঙ্গ কবিতা, খেউড়ের বদলে আঁকা হল কার্টুন, ছবিতে কবিতায়-ছড়ায় ভরে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লন, আড়াল হয়ে গেল প্রাচীন বিলিতি তালের মোটা মোটা শরীর। অবস্থা এমন দাঁড়াল, যাঁদের জন্যে প্রচার তাঁরা তো বটেই যাঁদের জন্যে নয় তাঁরাও এসে ভিড় করতে লাগলেন। স্টেটসম্যানে ছবিসহ রিপোর্ট বেরলো সেই প্রচারের। ছাত্র ফেডারেশনের জয় হলো। দীপেন্দ্রনাথ পর পর দু-বছর ক্লাস থেকে জিতলেন, স্ট্যাণ্ডিং কমিটির

সদস্যও নির্বাচিত হলেন। দ্বিতীয় বছর প্রথম কলেজ স্ট্রিট অটোনোমাস ইউনিয়ন সংগঠিত হলে তিনি তার সভাপতি হলেন। এর মধ্যেই হলো বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান, তাতেও তিনি। সাতান্ন সালে সাধারণ নির্বাচনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে পার্টির প্রার্থী মহম্মদ ইসমাইলকে যাঁরা বৌবাজার থেকে প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন। কলাবাগানের বস্তি অঞ্চল তোলপাড় করার কাজে তিনি তাঁর পুরোন কলেজ স্কটিশের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দল বেঁধেছিলেন।

তখন তিনি শুধু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরই নন, সংগঠনেরও নেতা, ছাত্র ফেডারেশনের কলকাতা [illegible] কমিটির সহ-সভাপতি, রাজ্য কমিটির সদস্য। কথাটির মানে বুঝতে হলে [illegible] মনে রাখতে হবে, ওই কমিটির নেতৃত্বেই তখন কলকাতা এবং সমস্ত জেলার দু-একটি ছাড়া প্রায় সব কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে জিতে দখল করে নিয়েছিল ছাত্র ফেডারেশন। কিন্তু দীপেন্দ্রনাথের প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র তখনো শিল্প সাহিত্য। পথের পাঁচালির পাঁচালির পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে সম্বর্ধনা জানানো হলো সেনেট হলে। খুবই বড় মাপের ব্যাপার, সেই সময়ে অভিনবও বটে। সাজানো হলো হল, বাতাসে রুচি আর স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পরিচালিত হলো অনুষ্ঠান। অমন অনুষ্ঠান তার পরেও কলকাতা শহরে আর বড় একটা হয় নি। পথের পাঁচালি দিয়ে শুরু। দীপেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলির একটি হলো 'জন-অরণ্য' নিয়ে। দ্বিতীয় ঘটনা দীপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র 'একতা'-র প্রকাশনা। একতা-র কাছে পাঠকদের চিরকালই কিছু প্রত্যাশা থাকে। সেবারের সংখ্যাটি সব প্রত্যাশার সীমা ভেঙে দিল। পরিকল্পনার সাহসে লেখার মানে, শ্রম আর যত্নের সংযোগে। সম্পাদনার কাজে তিনি চিরকালই—বাল্যকাল থেকেই—সিদ্ধহস্ত। কাজটা তাঁর প্যাশন। একেবারে ছোটবেলায়, রোগশয্যা থেকেও, একদিকে যেমন নিজের লেখা লিখেছেন, তেমনি সম্পাদনা করেছেন নিজের পত্রিকা—সবুজের অভিযান। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে বের করেছেন উজান। কিন্তু 'একতা'-র সম্পাদনাতেই পরিণত, পরিপক্ক একজন সম্পাদক এসে দাঁড়ালেন সামনে, যাঁকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতেই দেখা গেল পরের যুগে 'পরিচয়'-এর সহসম্পাদক হিশেবে, যৌথ ও একক সম্পাদনার দায়িত্বে, শারদীয় 'কালান্তর' ও নানা ধরনের সংকলন সম্পাদনার কাজের মধ্যে দিয়ে। প্রায় বিশ বছর ধরে এই কাজে তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনায়াসেই

তাঁকে বাংলা পত্রপত্রিকার শ্রেষ্ঠ সম্পাদকদের সারিতে স্থান করে দিয়েছে।

ছাত্রজীবন শেষ হতে না হতেই দীপেন্দ্রনাথ যুব আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেন। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল যুব উৎসবের স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ। তখনকার সেই স্মারকগ্রন্থগুলি দেখলে বোঝা যায় স্বল্প-পরিসরে দীপেন্দ্রনাথ একটি স্মারকপত্রকেও সাহিত্য মর্যাদায় উন্নীত করতেন।

ছাত্র আন্দোলন থেকে শিল্প-সাহিত্য, দীপেন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের বাইরে কোনোটিই নয়, সঙ্কল্প ও কর্তব্যের বাইরে কিছুই নেই।

হয়তো এইসব কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছাত্রনেতা হলেও, তখনকার কথা মনে করতে গেলে অনেক ছবির মধ্যে তাঁর একটা ছবিই দেখতে পাই। অল্প আলো, অল্প অন্ধকার, হিম পড়ছে, বাতাসে শীত। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের কাছে উঁচু লরি, লরিতে খাট, খাটভরা ফুল, ফুলের ভেতর শুয়ে আছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দীপেন্দ্রনাথ, খাটের কোণ ধরে, 'মেহগনির পালঙ্ক।' আমাদের মালা তিনি হাত বাড়িয়ে নিলেন। মানিকবাবুর ছেলে খাটের অন্যপ্রান্তে, দাঁড়িয়ে অথবা বসে, শীতে কাঁপছিল। কাদের যেন খেয়াল হলো, একটা গরম চাদর এলো, চাদরটা জড়িয়ে দেওয়া হলো তার গায়ে। আমি এখনও দেখতে পাই দীপেন্দ্রনাথ তার পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে চাদরটা ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন।

* * *

দীপেন্দ্রনাথের একটা স্বপ্ন ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি পোস্টার আঁকছেন, টুল পেতে বক্তৃতা দিচ্ছেন কিংবা রাত জেগে পার্টি মিটিং করছেন অথবা তৃতীয় ভুবন লিখছেন তখন, সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা নিয়ে আর কোনো বিতর্ক নেই। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' থেকে 'ঘাম', বস্তুতঃ 'জটায়ু'-ও লেখা হয়ে গেছে। দীপেন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাসে—রাজনীতিতে কিংবা শিল্পে—কড়া ধাতের হলেও নিজেকে কখনোই সীমাবদ্ধ হতে দেন নি। আর সেই জন্যেই তাঁর কর্মকুশলতা অন্য মত, অন্য ধারার শিল্পীসাহিত্যিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে। একদিকে যেমন তিনি সহমতের শিল্পীসাহিত্যিকদের সংগঠন গড়ে তুলেছেন, ছুটে গেছেন দিল্লীতে আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সম্মেলনে। সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন আসামে, বিহারে, সংগঠনের কাজে, পশ্চিম বাংলায় প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে তুলতে প্রাণপণ খেটেছেন, তেমনি সারাক্ষণ

দেখেছেন একটা স্বপ্ন। কমিউনিস্ট শিল্পী এবং শিল্পী কমিউনিস্ট হিসাবে দীপেন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল এমন এক সম্মিলনের যেখানে সৎ সাহিত্য আর সৎ শিল্পের পটভূমিতে জড়ো হবেন সবাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা নিয়ে। তাঁর এই স্বপ্নের মধ্যে এমনই একটা প্রাণদেওয়ানেওয়া তীব্রতা ছিল, সততার এমন শক্তি ছিল, আন্তরিকতার এমন টান ছিল যে কেউ-ই তাঁকে অস্বীকার করতে পারতেন না।

ষাটের দশকের গোড়ায় রবীন্দ্র স্মরণে সাহিত্যিকদের একটি কমিটি হয়েছিল। পরে তাকে একটি স্থায়ী সংগঠনে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তার সভাপতি এবং অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন দীপেন্দ্রনাথ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে তিনি তখন অনিবার্যভাবেই পার্টির হোলটাইমার হয়েছেন এবং কাজ করছেন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে—প্রধানতঃ পরিচয়-এ। কড়া ধরনের এই কমিউনিস্ট হোলটাইমারটিকে তার ওপরে বয়সে তরুণ, নিজেদেরই একজন এবং নেতৃস্থানীয় একজন বলে মেনে নিতে কোনো শিল্পীসাহিত্যিকেরই কখনো বেধেছে বলে শুনি নি।

সবাই যেন জানতেন সময় হলেই দীপেন্দ্রনাথ ডাকবেন, অকারণে, অসময়ে ডাক পড়বে না এবং যখন ডাক আসবে তখন যেতেই হবে। একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ডেকেছিলেন। সবাই এসেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে কঠোর কমিউনিস্টবিরোধী যাঁরা তাঁরাও না এসে পারেন নি। দীপেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে তাঁরা গড়ে তোলেন বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি। বাংলাদেশ থেকে ভেসে আসা শত শত শিল্পীকে, সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীকে আশ্রয়, খাদ্য বস্ত্র আর, সবচেয়ে বড় কথা, ভরসা এবং সম্মান দিতে পেরেছিল এই সমিতি। বাংলাদেশের যে কোনো জেলার, যে কোনো শহরে কয়েক ডজন মানুষ পাওয়া যাবেই যাঁরা এই সমিতির সম্পাদক ছোটখাট চেহারার দীপেন্দ্রনাথকে আত্মার আত্মীয় বলে মানেন। আর এই কলকাতায় মানুষকে উদার হতে শিখিয়েছিল, বড়ো হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল সমিতি। সেই ঝড়ের দিনে কেউ তার বাড়তি ঘরটি ছেড়ে দিয়েছেন চারজন অতিথির জন্যে, কেউ চারজনকে বাড়িতেই নিয়ে তুলেছেন পরিবারের সদস্যের মতো, কেউ নিয়মিত প্রতিমাসে রোজগারের একটা অংশ তুলে দিয়েছেন সমিতির হাতে, কোনো শিল্পী তাঁর হারমোনিয়মটাই উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশী এক শিল্পীর রেওয়াজ করা হচ্ছে না দেখে। দেওয়ার মতো যাঁর কিছুই নেই তিনিও গোপনে

দীপেন্দ্রনাথের ঝোলায় গুঁজে দিয়ে গেছেন নিজের ব্যবহারের দুটি ধুতির একটি। ওপার বাংলার মানুষ যেমন দীপেন্দ্রনাথকে নিতান্ত তাঁদেরই লোক বলে ভাবেন, এপার বাংলার বহুজন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাই বোধ করেন, বড় হয়ে ওঠার খানিকটা সুযোগ দেওয়ার জন্যে।

আর-একবার। এমন সার্বজনীন আবেগের ব্যাপারে নয়, বরং খানিকটা বিতর্কিতই, রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ে। পঁচাত্তরের এপ্রিলে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন করার ভার নেন দীপেন্দ্রনাথ। জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন তখন তুঙ্গে। দীপেন্দ্রনাথ ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কলকাতার রাস্তায়। অবিশ্বাস্য সাড়া পাওয়া গেল। যাঁদের স্বাক্ষর পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তাঁরাও ফেরালেন না দীপেন্দ্রনাথকে। যে দু-একজন ফেরালেন, চলচ্চিত্র জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা মনে পড়ছে, তাঁরাও 'পরিচয়'-এর দপ্তরে এসে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করে গেলেন কেন স্বাক্ষর দিতে পারছেন না, 'ভুল বুঝো না, দীপেন'। বাংলার মঞ্চ জগতের এক প্রধান পুরুষ তিনদিন এলেন পরিচয়-এ, ব্যাখ্যা করতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে এসে স্বাক্ষর দিয়ে গেলেন। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে সম্মেলন হলো, এমন বিশাল ব্যাপার যে স্বাক্ষরকারী এক নামকরা সাহিত্যিক মঞ্চের কাছে পৌঁছতেই পারছিলেন না।

দীপেন্দ্রনাথ ডাকলে তাঁরা আসতেন আর দীপেন্দ্রনাথ যেতেন তাঁরা ডাকার আগেই, কারণ সম্ভবত:, তিনি তাঁর জোরের কথাটা জানতেন এবং জানতেন বলেই এক ধরনের দায়িত্ব বোধ করতেন। তাঁর কথায় ও আচরণে যে-বিনয় কখনো হারিয়ে যেত না—খুব দুর্যোগের মুহূর্তেও না—একমাত্র ক্ল্যাসিক্যাল চরিত্রেই মানায়—তার উৎস কি এই দায়িত্ববোধ? দায়িত্ব তাঁর বিশ্বের যাবতীয় অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাবতীয় শিল্পীসাহিত্যিকের হয়ে লড়াই করার। আমরা, নিতান্ত আধুনিকরা তাঁকে ঠাট্টা করতাম বিবেকবাবু বলে, তাঁর সামনে এবং আড়ালেও। শুনেছি, ঠাট্টাটা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই চলে আসছে।

দীপেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর বাড়িতে, শেষবারের মতো। অনেক মানুষের ভিড়, বাড়ির উঠোনে, রাস্তায়, ফুটপাথে, কেউ দাঁড়িয়ে কেউ মাটিতে বসে। বিখ্যাত একজন সাহিত্যিক যিনি হাসপাতাল থেকেই দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন, নীরবে গিয়ে দাঁড়ালেন দীপেন্দ্রনাথের এক বন্ধুর পাশে।

আলতো করে হাত রাখলেন তার কাঁধে, স্নেহে এবং সান্ত্বনায়, জরুরি সব মুহূর্তে মানুষ যেমন রাখে। দীপেন্দ্রনাথের বন্ধুটি ভাঙেন কিন্তু মচকান না। তিনি হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে হাসলেন—যেমন হাসি তখন হাসা যায়—তারপর গলায় হালকা ভঙ্গি এনে, যেন তেমন কিছুই হয় নি, বললেন, আমাদের তো যা যাওয়ার গেল, আপনাদের কি হবে এখন, বলুন তো!

সেই সাহিত্যিক কি জানতেন যে, দীপেন্দ্রনাথ টেবিল চাপড়ে, গলার শিরা ফুলিয়ে তাঁর জীবনের শেষ ঝগড়া করে গেছেন সরকারের এক কমিটির সভায় যেখানে সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে অশ্লীল লেখার অভিযোগে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পাশ হয়ে যাচ্ছিল? কমিটির লড়াই মন্ত্রী পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব ভেঙে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছিলেন তিনি।

দীপেন্দ্রনাথ তাঁর খুব অল্প সময়ের জীবনে একটা কিছু বুঝাতে-বোঝাতে চেয়েছিলেন। এখন তাঁর অভাবে ভেবেচিন্তে দেখে ঠেকে আমাদেরই বুঝতে হবে সেটা কি ছিল?

এই লেখার তথ্য সংগ্রহে দীপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ, সমবয়সী ও কনিষ্ঠ সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। লেখক

দীপেন্দ্রনাথ

কুমার রায়

ওর অসুখের খবরটা পাইনি,—হাসপাতালে থাকার খবরটাও, তাই মৃত্যুর খবরটা বড় আকস্মিকভাবে আঘাত দিল। অসংখ্য অনুরাগীর সঙ্গে আমিও শোকগ্রস্ত হলাম।

আজ সেই দীপেনের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে একটা লেখা তৈরি করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। যে মানুষটা সাজান গোছান নয়—যে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে, আবেগ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে সত্যের সারাৎসার ও সারল্যকে হৃদয়ঙ্গম করেছিল, ঝকঝকে মসৃণ প্রতিষ্ঠার পথকে পরিহার করেছিল —তাকে নিয়ে কলমবাজি করতে ইচ্ছে করছে না। যে যে বিষয়ে পারদর্শিতা সে দেখাতে পারত, বুদ্ধি ও বিদ্যা জাহির করতে পারত, তাকে সে তার জীবনে আচরণের সৌজন্যে ঢেকে রেখেছিল, তাকে নিয়ে কথা সাজান যায় না।

একালে এরকম মানুষের শুদ্ধতার দায় বড় মর্মান্তিক। নিছক সত্য কথাতো একমাত্র সত্য নয় এখন—মর্মে মর্মে অনুভবে একান্ত নিরালায় হয়তো বিশ্বাসের শক্ত শিরদাঁড়ায় টান পড়ত কখনো কখনো, তাই ওর মুখে সে সব মুহূর্তে একটা বিষণ্ণ হাসি,—নইলে এমনিতে তো ওর হাসিতে একটা অভিজ্ঞতা মেশানো তৃপ্তিই আমরা দেখেছি। চশমার ফাঁক দিয়ে চোখের দৃষ্টি বড় গভীর লাগত তখন। শিশিরমঞ্চে সেদিন ওঁর স্মৃতিসভায় মঞ্চে সাজান ফটোটা দেখেও তাই মনে হচ্ছিল, ও বড় গভীর কিন্তু বন্ধ পুরু ঠোঁটের ফাঁকে একটা দুষ্টুমিও বোধকরি উঁকি দিচ্ছিল; ছবিটাতে একটা ডঙ্কা বাজিয়ে চলে যাবার দম্ভও বোধহয় ছিল। এর সবটাই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেদিনকার সভাতেই বোঝা গেল দীপেনকে অগণিত মানুষ ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। কি দিয়ে সে এই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আদায় করেছিল—কোন্ গুণে? সে কথাশিল্পী ছিল বলে,—সে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক ছিল বলে,—সে সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিল বলে—? হয়তো সবগুলোর জন্যেই—কিংবা তার চেয়েও বড়, সে একজন সৎ মানুষ ছিল, সাধনায় একনিষ্ঠ ছিল।

অনেকদিন আগে, তখন ওর সঙ্গে পরিচয় হয়নি,—'চর্যাপদের হরিণী' গল্পটা পড়েছিলাম। আর সেদিন পড়লাম 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। শুনলাম 'জটায়ু'। ধরা বাঁধা ছোট গল্পের ধারায় পা দেয় নি দীপেন—সেটা শুধু গল্পেই নয় জীবনেও। তাই সে দিন শিশির মঞ্চ থেকে বেরিয়ে কেবলই মনে হচ্ছিল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামীয় একজন ছোটগল্পের শিল্পীকে আমরা অনায়াসেই অজস্র ফসল ফলাতে দেখতে পেতাম—প্রতিষ্ঠার সোপান বেয়ে নামী দামী হতে দেখতে পেতাম—কিন্তু না, বাঁধা পথে, সাধারণ প্রথায় সে চলে না।

সে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক হিসেবে অনেকদিন কাজ করেছে। 'সম্পাদকীয়' লিখেছে কমই। কিন্তু সম্পাদনা করেছে অশেষ নিষ্ঠা নিয়ে। ১৩৩৮-এ 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, 'স্ব-কে জানিবার জন্য অপরের প্রয়োজন, আত্ম ও পর কুজমুক্তের মতো অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। তাই সে অপরের সান্নিধ্য চায়; তাই সে সাহিত্য চায়।...দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সাহিত্য জগতেই সমধর্মী মন পরস্পরের সহিত করকম্পন করে, বিপরীতমুখী ঝটিকাবর্তের মধ্যেও তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারে।'

আবার লেখা হয়েছিল, 'কবিতা, কথাশিল্প, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব—পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে, এ বিষয়ে 'পরিচয়' সাধ্যমত চেষ্টা করিবে।' দীপেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'পরিচয়'-এর এই প্রাথমিক আদর্শ বজায় রাখার নিরলস প্রয়াস দেখতে পাওয়া গেছে। দীপেনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় এই 'পরিচয়'-এর আসরে এবং সূত্রটা অবশ্যই নাটক।

নাটক দেখতে দীপেন ভালোবাসতো। সেই ভালোবাসা পেয়েছে 'বহুরূপী'। সেই সঙ্গে আমরাও। অভিনয় শেষে সাজঘরে সে ভীড়ের মধ্যে নিঃশব্দে এসে বসতো। সকলের কথা বলা শেষ হলে একটি-দু-টি কথা বলতো। সারাক্ষণ অন্যের কথা শোনাই যেন ওর কাজ। একটু বিস্ময়, একটু মুগ্ধ ভাব আর অস্ফুটে কিছু কথা—এই হল ওর ভালোলাগার প্রকাশ। বরং

সৃষ্টি যত সামান্যই হোক, এ যুগের বহু নামজাদা লেখকের সমগ্র সাহিত্য রচনাকে ম্লান করে দিয়েছে। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনা, সৃজনশীল সাহিত্য রচনা ছাড়া দীপেন আরো একটি বড় দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ছিলেন সর্বভারতীয় সংস্থা ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ প্রোগ্রেসিভ রাইটার্সের সম্পাদক। সংস্কৃতি-ফ্রন্টের একনিষ্ঠ নিরলস কর্মী হিসেবেও তিনি নিজেকে চিহ্নিত করে গেছেন।

প্রায় সাত বছর আগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্রগতি লেখক ও শিল্পী প্রতিনিধিদের সমাবেশে তাঁর তেজঃদৃপ্ত ভাষণ শুনে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে পড়ি। সেই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। যদিও এর অনেক আগে আমি তাঁর নাম শুনেছি। আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, প্রগতির বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের আহ্বানে সমাবেশের গোটা আবহমণ্ডল সম্পূর্ণ বদলে যায়। আত্মসন্তুষ্টির একটি ছিমছাম ধারণা নিমিষে সম্পূর্ণ উবে যেতে বাধ্য হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ অনেক সতর্কতা নিয়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন। আমার যতদূর মনে পড়ে এ ঘটনা ঘটেছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘের গয়া সম্মেলনের প্রাক্কালে। দীপেনের খোলামেলা অথচ দৃঢ় বক্তৃতা আমার মতো অনেকেরই মনে এই সঙ্ঘের আন্দোলনের প্রতি আরো আগ্রহ জুগিয়েছিল একথা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়বার দেখা হল গয়া সম্মেলনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম সেই এক সরলতা, সাথীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ও সঙ্ঘের কর্মসূচীর প্রতি গভীর নিষ্ঠা। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলে আমাদের ধ্যান-ধারণা নতুন নতুন দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ত। অনুষ্ঠানে সকলেই তাঁর অনুভবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতেন। এমনি ছিল তার দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও অপূর্ব বাচনভঙ্গী।

পাটনা, কলকাতা, দিল্লীতে প্রায়ই বৈঠক বসত। প্রতিটি সভাই, আমার কাছে মনে হত, তাঁর ব্যক্তিত্বের নতুন প্রকাশ। তাঁরই সম্পাদিত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের একটি বড় সংকলন-গ্রন্থ (প্রতিরোধ প্রতিদিন) তিনি আমাকে দিলেন। তখন আমরা দুজনেই পাটনাতে। এ-সময়ে ইংরেজিতে অনূদিত তাঁর দুটি গল্পও আমাকে পড়তে দিলেন। মনে আছে, মধ্য এশিয়ার কোনো একটি দেশে, আফ্রো-এশিয়ার কোনো একটি সম্মেলনে যোগদানের পর তিনি একটি রিপোর্ট আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বহু সম্ভাবনাপূর্ণ লেখক। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। আবেগে অস্থির এক দীপ্ত পুরুষ লেখক।

আমরা আবার জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের গভীর পরিতাপ, এ-বছর আর তাঁকে দেখতে পাব না। তাঁকে বাদ দিয়ে সম্মেলনের চেহারা কেমন হবে, বড় দুঃখ লাগে সে দৃশ্য কল্পনা করতে। মানুষ সব ক্ষতিই ধীরে ধীরে সয়ে নেয়। শুভার্থী বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুর মতো গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলেও নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে পারে। কিন্তু সংগঠনের ক্ষতি? তা কি আদৌ কোনোদিন পূরণ হবে? তাঁর প্রগতি-শীলতা চারপাশের সব কিছু এমনি করে বদলে দিয়ে যেত যা আমাদের প্রগতি লেখকদের আন্দোলনের এক মস্ত বড় বিস্ময়, নির্ভরও বটে।

একথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে বাধ্য, আমি বরাবরই ওর কাছ থেকে শুধু পেয়েই এসেছি। ওর মূল্যবান সমালোচনা ছিল আমার কাছে এক নতুন প্রেরণা। দীপেনের ছিল এক 'ডেডিকেটেড কমিটমেণ্ট'। এরই আকর্ষণে আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। ভালোবাসতাম। আজকে ওর অভাবে আমরা অসহায় বোধ করি।

দীপেনকে দেখলে সবসময়ই বিষণ্ণ ও অসুস্থ বলে মনে হত। এ নিয়ে আমরা মজা করে বলতাম, 'ছোট্ট রুগ্ন মানুষের মধ্যে যদি এত আগুন, আর এত তেজ লুকিয়ে থাকতে পারে, ভাবা যায় না, দীপেন, আপনি যদি পরিপূর্ণ সুস্থ দেহ পেতেন তাহলে না জানি কি হত?' ওর ঐ বিষণ্ণতা ও অসুস্থতাকে ধরে নিয়েছিলাম একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্তেরই মতো। ভাবতাম, বছরের পর বছর এমনি করেই কাটবে। কিন্তু কখনো ভাবি নি দীপেনকে এত শীঘ্র, এত দ্রুত হারাতে হবে। তাঁর রুগ্ন বিষণ্ণ মুখখানি আমাদের সামনে থেকে কখন চুপিসাড়ে মিলিয়ে গেল। টের পেলাম না।

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ প্রোগ্রেসিভ রাইটার্সের তরফ থেকে আমরা দীপেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

অনুবাদ : শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

দীপেন

মহাশ্বেতা দেবী

দীপেনের সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। প্রথম বোধহয় দেখি ওকে বিয়ের পরে, কলেজ স্ট্রীটে, চিন্ময়ীও সঙ্গে ছিলেন। কোনদিনই পরিচয় আলাপে পৌঁছয় নি। বয়সের পার্থক্য তো ছিলই। তা ছাড়া কলকাতায় সব সময়ে একই কাজের মানুষদের দেখা হয় না। আরো কোথাও দেখা হবার কথা ও পরে বলত, আমি মনে করতে পারি নি, এখনো পারছি না। আমি মনে করতে পারতাম না বলে ও বেজায় অবাক হয়ে যেত, কিন্তু ওকে বলেছিলাম দশ-বারো বছর আগে হলে আমার ঠিকই মনে পড়ত। ১৯৭৩ থেকে বাড়িতে বহু মৃত্যুর অভিজ্ঞতার জন্তেই হয়তো এখন আর পেছনের কথা মনে করতে পারি না তেমন।

দীপেনের সঙ্গে আমার সংলাপ-সংঘর্ষের কথা কিছু বেশ মনে আছে। বাংলাদেশ সহায়ক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সমিতি (সমিতির উদ্দেশ্য তাই, আমার শব্দস্মরণে ভুল হতে পারে) গঠনে ও আমার নাম দিতে চায়, বোধহয় চিঠিও পাঠায়। আমি 'না' বলি, বা লিখি। অন্য কেউ হলে এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। দীপেন কিন্তু ফোন করে। আমি যা বলি, তার বক্তব্য এ রকম—বাংলাদেশ বিষয়ে যাঁরা স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করছেন, তাঁদের আমি জিনিসপত্র জোগাড় করে দিচ্ছি এবং আমার ধারণা আমি স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে রি-অ্যাক্ট করছি। দীপেন তখন খুব হেঁড়ে গলায় (কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল না) বলল, কিন্তু আপনি লেখকও তো বটেন? তখন আমি সিধে কথায় এলাম। বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা নিন্দনীয় একশোবার। কিন্তু সেখানে অস্বাভাবিক অবস্থায় অস্বাভাবিক নৈগুণ্য চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতার ছেলেরা, এপাড়া থেকে ওপাড়ায় যেতে নিত্য নিহত হচ্ছে।

সে বিষয়ে উক্ত সমিতির কোন ইনভলভমেণ্ট নেই যখন, তেমন সমিতির সঙ্গে আমি থাকতে নারাজ। পশ্চিমবঙ্গে কি স্বাভাবিক অবস্থার মুখোশের পেছনে অস্বাভাবিক বর্বরতা চলছে না? দীপেন জাত ভদ্রলোক। ও আমার স্বযুক্তিতে স্থির থাকার ব্যাপারটি মেনে নেয়। মনে ও কিছুই পুষে রাখে নি। কেননা 'দ্রৌপদী' পড়ার পর নিজেই এগিয়ে আসে বন্ধু পাতাতে। এ রকমটি কলকাতায় ঘটে না। কে কাকে পনের বছর আগে কি বলেছিল, কে কার লেখার সমালোচনায় রূঢ় সত্যভাষী কঠোর হয়েছিল, তার ভিত্তিতেই মানুষ অন্য মানুষের সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে। দীপেন ছিল সব ক্ষুদ্রতার ওপরে।

তারপর ১৯৭৭ সালের কথা। কিন্তু তার আগেই বলে নেওয়া ভাল, দীপেনের বিষয়ে আমি যা লিখব, তাতে ১৯৭৭ সালের পুজো থেকে পরের পুজো অবধি আমি যা যা লিখেছি, সে সব কথা খুব এসে পড়বে। তার কারণ হল, ওই সব লেখার ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে একটা আশ্চর্য বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমার লেখা পড়া, সবজায়গায় তা নিয়ে কথা বলা যেন ওর একটা কাজ হয়ে উঠেছিল। তা করতে গিয়ে ও নিজেকে, নিজের স্বাস্থ্যকে আরো ক্ষয় করেছিল কিনা, তা ভাবলে পরে আমার বেজায় কষ্ট হয়। দীপেন খুব গভীর একটা ক্ষত রেখে গেছে তো। এখনো কত সময়ে বসে বসে ভাবি, এখন যা লিখব, লিখছি, সে সব কথা বলতে পারলে ওর কাছে, আমার কত ভাল লাগত। কত সময়ে মনে হয় আবার দেখা হবে। আবার এও মনে হয়, তাই যদি হবে, তাহলে চেনা মানুষদের মতো দীপেন বা ছবি হয়ে গেল কেন। বয়স হলে এলোমেলো চিন্তা বাড়ে।

দীপেন ও আমার নতুন করে পরিচয় হতও না, যদি না একদিন নবারুণ যেত তার কাছে 'পরিচয়' অফিসে, এবং প্রসঙ্গত আমার কথা না উঠত তাতে-দীপেনে। যা বললাম, তা আমি খুব বিশ্বাস করি. কেন না ৭০-৭১ সালের ভূমিকায় বহু গল্প—হাজার চুরাশির মা, অরণ্যের অধিকার, আরো আগে কবি বন্দ্যঘটী, সবই লিখেছি, এবং দীপেন তখনো লিখতে বলে নি আমাকে। এগুলি কিছু সাহিত্যের অমূল্য রত্ন নয়, তবু এর ভিত্তিতেও ওর মনে হতে পারত। কিন্তু সব কিছুরই সময় থাকে জীবনে। আমার লেখা প্রসঙ্গে ও নবারুণকে বলে, আমি 'পরিচয়'-এ লিখছি না কেন? নবারুণ বলে, আপনি কি লিখতে বলেছেন? লিখে একথা জানাব? দীপেন একটি চিঠি লেখে আমাকে, এবং আমি 'দ্রৌপদী' লিখে

সচিঠি পাঠাই। দীপেন উত্তরে উচ্ছল প্রশংসা জানিয়ে লিখেছিল 'শাবাশ মহাশ্বেতা দেবী'। দুটো তালব্য 'শ' দিয়ে 'শাবাশ' লেখা সঠিক হলেও শব্দটা দেখতে মজার। খুব হেসেছিলাম এবং সত্বর ভুলে গিয়েছিলাম। তবে 'দ্রৌপদী'র সঙ্গে যে চিঠি লিখি, তা বেশ কঠিন ছিল, এবং, আমি ওকেও বলেছি পরে, আমি ভাবি নি 'পরিচয়' ও গল্প ছাপবে। জরুরি অবস্থায় আমার একাধিক অপ্রিয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যা হোক, 'দ্রৌপদী' গল্প দীপেনকে যেন আমার প্রতি আগ্রহী করে। ওর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত অথচ আশ্চর্য এক বন্ধুত্বের জন্যে আমি নবারুণের কাছে ঋণী।

আটাত্তরের জানুয়ারিতে (?) দূরদর্শনে এক প্রোগ্রামে বিজয়গড় কলেজ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটছি। দীপ্তি সিনেমার মোড়ে দেখি দীপেন। ট্যাক্সি খুঁজছে। আমরা একসঙ্গেই গেলাম, এবং দীপেন যথারীতি ভাড়া অফার করল। সেদিন খানিক গল্প হয়। তখনো আমরা কথায়-বার্তায় খুব অন্তরঙ্গ নই। সেদিন ও, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় খুব গল্প করে, তিনজন একসঙ্গেই ফেরে।

তারপর ৭৮-এর পুজোর লেখা। এর আগে থেকেই ও খুব সিরিয়াসলি পড়তে থাকে আমার লেখা। মুখফিরতি শুনতাম। মার্চে অনীশের মৃত্যু। আমি এমনিতেই যাই না কোথাও, তখন তো মোটে নয়। এমন সময়ে, পুজোর পর, একটি গল্প সংকলনের পরিকল্পনা করি। ওর সঙ্গে কথা কইব বলে ভাবছি, কলেজ থেকে ফিরে শুনি, সত্য গুহ এবং দীপেন এসেছিল। শুনে খুব ভয় পাই, সত্যর ওপর হয় রাগ। আমার ঘরে ওঠার সিঁড়িটি ঘোরানো সিঁড়ি আর ওই সিঁড়ি থেকে পড়েই অনীশ চলে যায়। সত্যকে খুব বকে জানাই, দীপেনের দরকার থাকলে আমি দেখা করতে যাব। সে এ-হেন সিঁড়ি ধরে উঠবে না, বা নামবে না। আর দীপেনকে, একই কথা জানিয়ে, পরিকল্পিত বইয়ের কথাও লিখি। ইচ্ছা ছিল, ওর কাছে বসেও এ-বিষয়ে কথা কইব। উত্তরে এই চিঠিটা এল,—

S. S. K. M. Hospital
C. I. Block
Room : 31
Calcutta.

মহাশ্বেতাদি,

আপনার ৯।১২।৭৮ তারিখের চিঠি আমি ১৫ তারিখে পেয়েছি। ১৮

তারিখে কিছু চেক্‌-আপের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। এইসব নানা কারণে উত্তর দিতে দেরি হল।

১. আপনার কথামতো দুটি গল্পের নাম জানাচ্ছি। (ক) 'পরিপ্রেক্ষিত': আমার 'হওয়া না-হওয়া' গল্প সংকলনে আছে। (খ) 'শোকমিছিল': সম্ভবত ১৯৭৪ সালের শারদীয় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

২ 'শোকমিছিল' গল্পেই নকশালপন্থীদের প্রসঙ্গ আছে।

৩. গত রবিবার কুশল নাগের (ইনি প্রকাশক। দীপেন পাঠিয়েছিল: ম. দে.) সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও কিন্তু আপনার কোনো চিঠি পায় নি।

মনে হচ্ছে আমাকে মাসখানেক থাকতে হবে। সুতরাং, মহাশ্বেতাদি, পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে তাহলে তো আপাতত দেখাশুনো হয় না। চারটে থেকে ছটা দেখা করার সময়। মনে হয় আমার ঘর তখন লোকবোঝাই থাকবে। আপনার ছুটির দিনে দুপুর নাগাদ একদিন আসুন না।

হাসপাতালে পড়ার জন্য আপনার দু-দুটো বই নিয়ে এসেছি—'অরণ্যের অধিকার' ও 'অগ্নিগর্ভ'। সহজে শুরু করছি না, বেশ তারিয়ে তারিয়ে পড়ব।

সম্প্রতি একদিন সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। কথায় কথায় তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় আপনার সাম্প্রতিক রচনার প্রসংসা করলেন। একদিন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গেও নানা বিষয়ে দু-ঘণ্টার ওপর আলোচনা হল, একান্তে। বুদ্ধদেবও প্রসঙ্গত বললেন 'মহাশ্বেতা দেবীর এখনকার অনেক লেখা পড়েই বাঙলা সাহিত্যের এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা জাগে।' আবার খুব সাধারণ পাঠকও আপনার অনেক লেখা পড়ে অভিভূত হচ্ছেন। এই যে নানা ধরনের মানুষ ও নানা স্তরের পাঠককে আপনি ছুঁতে পারছেন—এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগছে।

তবে, আপনার প্রচণ্ড গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও, আমার মনে আপনার এবারের লেখা সম্পর্কে কিছু কিছু সমালোচনা জন্মেছে। সেসব কথা সাক্ষাতে বলা যাবে।

আপনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিন বাঁচুন এবং লিখুন। নিজেকে দ্রুত পুড়িয়ে ফেলবেন না।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯.১২.৭৮

পুনশ্চ: চিঠির উত্তর বাড়ির ঠিকানায় দেবেন। ঠিকানা নিশ্চয়ই লেখা আছে, তবু আবার জানাচ্ছি।

612/1
Block—O
New Alipur
Calcutta-53
700 53

চিঠিটা যথাযথ তুলে দিলাম। দীর্ঘকাল কারো চিঠি রাখি না। পাই, জবাব দিই, ছিঁড়ে ফেলি। দীপেনের চিঠিটা থেকে যাবার কারণ হচ্ছে, ওটি দেখে হাসপাতালে যাই। তারপর ব্যাগে রেখে দিই, ভুলে যাই। ও চলে যাবার পর আবিষ্কার করলাম, ওটা আছে। তারপর আর ছিঁড়তে হাত ওঠে নি।

হাসপাতালে যাই ২৫শে ডিসেম্বর। কবিতা সিংহ ও আমি। সে ওর কত কথা, কত হাসি, আর শুধু আমার কথা। 'বিহন' পড়েছে, আরো আরো লেখা। 'অমৃত' জোগাড় করেছিল। সে পরের দিন দেখি। শেষ যেদিন যাই। ১০ই জানুয়ারি। প্রথম দিনে অনেকে এলেন একে একে। বেচারা গেটম্যান ভাবত, ৩১নং ঘরে কে এসেছে। এত ভিড় কেন? আমি ও কবিতা ভিজিটিং কার্ড ছাড়া, স্রেফ ভাপ্পা দিয়ে ঢুকে গেলাম। সেদিন চিনুকে দেখলাম কত দিন পরে। জ্যোতি ও মালবিকা এসেছিলেন। আরো কয়েকজন। সেদিন কি ও আমাকে ছাড়ে? যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। এ সব ভাবলেই ওর ওপর আমার রাগ হয়। পারতপক্ষে আমি কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হই না। দীপেন কেন বন্ধু পাতাবার সব দায় স্বীকার করে, অনেক স্মৃতির টুকরো দিয়ে আমার মন ভরে রেখে চলে গেল? যত কথা হয়েছিল, তার মধ্যে আমি কয়েকটা পয়েন্ট ছাড়ি নি, যেমন ওর প্রথম কর্তব্য লেখক দীপেনের প্রতি। 'পুজোর 'পরিচয়' কাগজে লেখা চাই' লিখে নাম সই করা যথেষ্ট নয়। এবং সেজন্য ওকেই নির্মম হতে হবে। আমার যা মনে হত তাও বলেছিলাম—মনে করবি কিছুই লিখিস নি। যথেষ্ট ভালো লেখা কিছু লিখলেও আমার মনে হয়েছিল দীপেন অপচিত

হচ্ছে। ও কিন্তু আমার কথার প্রতিবাদ করে নি, আর যে লেখা লিখবে, তার কথা বলেছিল। আজ মনে হয়, যারা তাকে মানুষ হিসেবে জানে তারাও তো থাকবে না সবাই। একজন লেখক তো বাঁচবেন তাঁর সৃষ্টিধর্মী লেখায়? দীপেনের বেলা কেন হিসেব উলটে যায়? অন্যেরা তো রাজনীতি করতে পারেন। লিখতেও পারেন? দীপেন হয়তো নিজের জন্য নিজে যথেষ্ট সময় দিতে পারে নি। সেখানে কি কারো কোনো দায়িত্ব ছিল না? দীপেন তো জাত লেখক মানুষ। একজন দীপেনকে কেন অপচিত হতে হয়? কত বছর লেখেনি ও? আর, একজন দীপেনের না-লেখার অপরাধ যে সকলের থেকে যায়! ওর মত ছিল, বিশেষ কোনো সময় নিয়ে আমি যা লিখেছি, তারপর আর লেখার কিছু নেই। আমি প্রথমে ওকে বলি, 'তোর ধারণা হয়েছে আমার বিষয়ে', তারপর ওকে বলি, বেশ কিছু তরুণ লেখকের লেখা আমার কাছে কত আশাপ্রদ, আমার আর একলা লাগে না। এদের অনেককে দীপেনও চিনত। কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে ও বিশ্বাস করেছিল। ওকে এদের লেখা নতুন করে পড়তে হবে। ও আমার কাছে অনেক পুরনো কথাও শুনতে চাইত, যেসব সময় ওর বয়সীরা চোখে দেখে নি। সেদিন যত কথা হয়, তা অন্যদের হয়তো মনে থাকবে। আমার শুধু মনে পড়ে ওর আনন্দে অবিশ্বাসে উজ্জ্বল মুখ আমাকে দেখে। ও তো বলতই, আমি নাকি ওর সামনে সব বলতে কইতে পারি, আমার সাত খুন মাপ। প্রথম দিন দু-ঘণ্টার বেশি ছিলাম।

তারপর 'সোভিয়েত দেশ' আপিসের পরেশ দাশ মশাইয়ের অসুখের কারণে হাসপাতালে গেলেও ওর কাছে যাওয়া হয়নি। দুজনে দু-প্রান্তে। ফোন করে নিত্য খবর নিতাম। ১০ই জানুয়ারি বুধবার আবার যাই। সেদিন ও ভাল বোধ করছে না। অক্সিজেন দেখলাম নামানো। রত্না গিয়েছিল। সেদিন দীপেন ব্যক্তিগত অনেক কথা বলে। আমি ওকে, ওর শুভার্থে অনেক কথা বলি, আজ সে-সব কথায় ফিরে যাব না। সেদিনই বলে, 'অমৃত' কাগজটা নিয়ে রেখেছি, পড়তে পারি নি।' চলে আসার আগে ও কয়েকটি কথা দেয়। তাতে বোঝা যায়, শরীর যাই বলুক, মনের জোর অটুট ছিল। কত কথা সেদিন বলেছিল। কত কথা দিয়েছিল।

এই তো দীপেনের কথা। খুব অল্প সময়ে ও আমাকে ওর খুব কাছে যেতে দিয়েছিল, আমার সৌভাগ্য। নিজের সবটুকু যেন মেলে ধরেছিল, আমার সৌভাগ্য। তারপর ১৪ই জানুয়ারি।

সংসারে যে আদায় করে নিতে পারে চেঁচিয়ে, বা অন্যের মদতে, তারাই সব পায়। দীপেন তেমন মানুষ ছিল না। ১৪ই জানুয়ারি আমার কাছে এখনো খুব ধোঁয়াটে। খারাপ ভয়ের ফিল্মের মতো। সেদিন আমার জন্মদিন। হঠাৎ এল সোহাগ, পিণাকী, ওদের ছেলে। মহানন্দে দিন কাটল। সকালে ফোন করে খবর নেব। কানেকশানই পাই না। বিকেলে ফোন করতে অচেনা গলায় উত্তর। তারপর নবারুণকে ফোন। ও নিজেও তখনো জানে না। 'কালান্তর' থেকে ফোন করে ও জানাল কখন কি হবে। ছুট ছুট, ট্যাক্সি। তারপর সেই অদ্ভুত দৃশ্য। দীপেন। কিন্তু বোধহয় চোখে তুলসীপাতা, পায়ের নিচে আলতা, এদিকে আন্তর্জাতিক গান। আর সমস্ত ভয়াবহতাকে সুগোল করতে আকাশবাণীর অসীম-অসহ-অশেষ ঔদ্ধত্য—সন্ধ্যার স্থানীয় সংবাদে দীপেনের নাম নেই। অথচ খবর মিলছিল না বলে মকর সংক্রান্তিতে ধর্মপ্রাণ মানুষের হাসিমুখের কথা পাকা কলের মতো স্বাদু গলাতে বার বার বলা। আকাশবাণীই করতে পারে এই অসৌজন্য। যদিচ দানশীলা বৃদ্ধা বা অমুক ব্যবসায়ী মরলেই স্থানীয় সংবাদ হন। দীপেনের খবর না বলা মানে নিজেরা ছোট হওয়া, তাও বোধহয় আকাশবাণী জানেন না। এমন মানুষের খবর দুপুরে বলা যথেষ্ট নয়, সন্ধ্যার খবরই সবাই শোনে।

একথাও যেমন সত্যি, তেমনি এও তো সত্যি, দীপেন গেছে রাজার মতো। রাজনীতিক দল বা কাগজ ভাঙিয়ে নিজের সুবিধার্থে কিছুই করে নি কোনোদিন। তাই সকলের ভালবাসা আর সম্মানও নিয়ে চলে গেল। আর আমাকেই লিখেছিল, 'নিজেকে পুড়িয়ে শেষ করবেন না।'

আত্মার দীপ্তি

গোপাল হালদার

দীপেন নেই—তার কথা লিখতে হবে। তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী' গল্পটার কথা মনে পড়ে।

মানুষ যখন আপনার হয়ে পড়ে তখন তার সম্বন্ধে কথা বলা দুরূহ। কারণ, তখন সে দশজনের মতো আর নয়, তখন যে সে অপরিমেয়। দশজনের সামনে তার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারে শিল্পীর তুলি— যে-তুলিতে বুকের রক্ত ও মনের রং মিশে এক হয়ে যায়। আরো বুঝি চাই, প্রেমের নিগূঢ়তাকে ধ্যানের নিশ্চয়তার দ্বারা রূপান্বিত করে তোলার মতো শক্তি। না হলে, সে-আপনার মানুষের কথা বোঝানো যায় না। সেই অপরিমেয় মানুষের কথা এখন থাক। এখনো তার নাগাল পাব না। দশজনের সঙ্গে এক হয়েও যেখানে সে একক, অপরিমেয় ছাড়াও যেখানে তাকে অনন্য বলে অনুভব করেছি, সেই একান্ত প্রিয় অনুজের বিশিষ্ট রূপটিই স্মরণ করতে চাই।

সৃষ্টির জন্মগত অধিকার নিয়ে দীপেন জন্মেছিল। সেই সঙ্গে ছিল সাহিত্যবোধ। সাহিত্যিক মাত্রেরই যে সুস্থির সাহিত্যবোধ থাকে, তা নয়। সৃষ্টির ও দৃষ্টির সব সময় মিলন ঘটে না। কিন্তু যথার্থ স্রষ্টার থাকে সেই সুনিশ্চিত দৃষ্টি, আরো থাকে গভীরতর সত্যবোধ ও প্রেম। প্রথম থেকেই দীপেনের ছিল এই সব—সৃষ্টির শক্তি ও দৃষ্টির নিশ্চয়তা, সত্যবোধ ও প্রেম—

ছিল সবই—ছিল আপনাকে প্রকাশের বিকাশেরও সংকল্প। তাই সাহিত্যে যখন সে পা দেয় নিতান্ত তরুণ বয়সে, তখনই দেখা যায় সত্যের সেই প্রভাতী দৃষ্টি তার চোখে, তার ললাটে আর তার কথায় ও কলমে। বোঝা যায় জীবনের আশ্চর্য সত্য তাকে আহ্বান করেছে, পৃথিবীর এ যুগে স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে তার দ্বিধা নেই—সে মানুষকে ভালোবাসে। তাই প্রথম থেকেই কোথাও ছিল না তার আড়ষ্টতা, কোথাও কৃত্রিমতা। বিপ্লবই যুগের সাধনা, আর সে বিপ্লব সাম্যবাদের বিপ্লব, সকল দেশের বঞ্চিত মানুষের মুক্তি—সাম্যবাদে, সৌভ্রাত্রে, প্রেমে সকল জাতির আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠায়।

অথচ এই পথে দীপেনের পক্ষে বাধা কম ছিল না—জন্মাবধি বাধা তার নিজের নাতিদৃঢ় দেহ, ব্যাধি প্রতিবন্ধ। এক মুহূর্তের জন্যও সে সব কোনো বাধা সে মানে নি। আবাল্য বাধা তার পারিবারিক পরিস্থিতি—যাতে সাম্যবাদের দিকে পদক্ষেপই ছিল অনভিপ্রেত, আত্মীয় ও হিতৈষীদের প্রাতিকুল্যাচরণ। সাংসারিক ও বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আবেষ্টনিতে সমাজসম্মত পথে আপন প্রকাশের প্রলোভন কি কম বাধা হতে পারত সাহিত্য যশঃপ্রার্থীর পক্ষে? অদূর সংকটের দিনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠাকামী সাহিত্যিকদের সে প্রলোভন বা আত্মছলনা তো কতভাবেই কুক্ষিগত করেছে। এ-সব কিছুই দীপেনকে এক নিমেষের জন্য দ্বিধান্বিত করে নি। প্রথম থেকেই দৃঢ়চিত্তে সে জেনেছে—তার পথ মানুষের মুক্তির পথ, তার তপস্যা সৃষ্টির তপস্যা, সর্বব্যাপী প্রেমের তপস্যা। জীবনের এই সত্যকে অঙ্গীকার করেই তার যাত্রারম্ভ, তার সৃষ্টিশক্তির ক্রমপ্রকাশ।

অনেকদিন পরে দীপেন একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল এই অগ্রজকে, 'কী মনে হয়—রাজনীতির দাবি কি সাহিত্যের পথে বাধা হয়ে ওঠে?'

'তা নির্ভর করে প্রত্যেকের স্বভাবের ও উপলব্ধির ওপরে। এমন মানুষ আছে যাদের স্বভাবের মধ্যে ও-দুই পথ অভেদ, তাদের জীবনের মধ্যে দুই পথ এক হয়ে ওঠে—যেমন গর্কি। অনেকের স্বভাব আবার তা নয়, তাতে দুই পথ জড়িয়ে থাকে, পৃথক হলেও সমগ্রের মধ্যে অঙ্গীভূত, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তাই। আবার কারো স্বভাবে দু পথ দু পথই—সেই ভেদরেখায় তাদের জীবন খণ্ডিত না হোক, সীমিত। তবে একালে, জীবনের সত্য এতই অখণ্ডিত আকারে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সীমা টানা যেন মনুষ্যত্বকেই সীমাবদ্ধ করা। কারো কারো স্বভাবই এমন যে, রাজনীতি

ও সাহিত্য দুইয়ে মিলেই যেন সে 'আমি' হয়। অবশ্য স্বভাবের সঙ্গেই আছে উপলব্ধির দাবি—মাত্রাহীনতা, প্রমত্ততা, মতবাদের ঝোঁক সেই উপলব্ধির দিকটাকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে—ক্ষণে ক্ষণে দেয়ও। রাজনীতি কেন, সকল ঝোঁকই তা করে—ধর্মের ঝোঁক, এমন-কি কলা-কৈবল্যের ঝোঁকেই কি তা হয় না? আসল কথা জীবন-সত্যকে গ্রহণ, দৃষ্টির মধ্য দিয়ে সৃষ্টির উজ্জীবন। স্বভাব তার মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে ওঠে, পরিণতির দিকে পৌঁছায়—Ripeness is all।

এ-যুগের সৃষ্টি ও এ-যুগের দৃষ্টির সঙ্গে এই বন্ধন-রচনা এ-যুগের জীবনের অপরিহার্য নির্দেশ। তাতে, আচ্ছন্ন নয়, সচেতন হওয়া, তারই দাবি—জীবন-সত্যের দাবি।"

কি বলেছিলাম, বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলাম কি না তা জানি না। কারণ তার প্রয়োজন ছিল না—আমার সামনেই ছিল সেই দৃষ্টির ও সৃষ্টির সচেতন সাধক—দীপেন্দ্রনাথ। দেখছিলাম শুধু দেহের পুষ্টিতে, বেশবাসে অমনোযোগী সেই যুবককে নয়, দেখছিলাম—আপন দৃষ্টি ও সৃষ্টি-প্রতিভার চিহ্নাক্রান্ত সেই 'হরিণকে'—যে 'আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী।'

সে প্রতিভা দীপেনকে শান্তি দিত না। দীপেন শুধু আপনার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও সৃষ্টিকে সুস্থির করে তুলেই নিশ্চিন্ত নয়—দু হাতে ও ঝুলিতে রাশি রাশি বই ও সংবাদপত্র, পক্ষ-প্রতিপক্ষের কোনো কথাই সে খুঁটিয়ে না পড়ে ছাড়বে না, অনুকূল-প্রতিকূলে কোনো লেখকের সাক্ষ্যকেই সে বিচার না করে নিশ্চিন্ত নয়, সামনের সঙ্গে বন্ধন-রচনায় সে বদ্ধপরিকর—বদ্ধপরিকর গৃহবৃত্তের সঙ্গে মানববৃত্তের প্রেমের সর্বাঙ্গীন বন্ধন রচনায়। আবার শুধু সেই উপলব্ধিতেও সে ক্ষান্ত নয়। জীবন-সত্য তাকে সৃষ্টির দাবিতেই টেনে নিয়ে চলল সৃষ্টির অনুকূল দৃষ্টির স্বচ্ছতা-সাধনে, সংগঠনে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠান রচনার কর্মে। তাতে প্রমাদ গণি নি—বিস্মিত হয়েছি তার অভাবনীয় কর্মতৎপরতায়, অদ্ভুত কর্মদক্ষতায়, অদম্য তার উৎসাহে, অপরাজেয় মনোবলে। আমার মতো ক্লান্ত অগ্রজেরা তাকে দেখে তখন আশ্বাস লাভ করতে চেয়েছি, আবার সম্পূর্ণ আশ্বস্তবোধও করি নি।

যুদ্ধান্তের মুক্তি-অভিযান দেশে-দেশে রঙে-রূপে আর অম্লান অক্ষত থাকছে না। সাম্যবাদের ব্যাপ্তির মধ্যেই দেখা দিয়েছে ভেদরেখা, সোভিয়েত-চীনে, আর স্বদেশে-সর্বদেশে। তাতে সাম্যবাদের প্রেরণা আর সৃষ্টির সুশৃঙ্খল উজ্জীবন অব্যাহত থাকতে পারছে কি না, জানি না। জানি, ইতিহাসের পথ,

জীবন-সত্যের বিকাশ, ঘাতে-প্রতিঘাতেই ও পতন-অভ্যুদয়েই দুর্বার গতি, শত বিঘ্ন সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টির দাবি। কিন্তু এ-ও জানি, আপাতত সে পথ উপল বন্ধুর। কর্মে-সংগঠনে এই বহু জটিলতায় পীড়িত আত্মঘাতী দেশে এ-পর্বে যতটা শক্তি ব্যয়িত হবে তদনুরূপ ফল লাভ হবে না। সেই দুরূহ সাধনায় তারাই এখন আহরণ করবে, যাদের মনের ঐকান্তিকতার সঙ্গে আছে দুর্ভার বহনের মতো দেহ, শুধু সঙ্কল্প নয়—সেই সঙ্গে বজ্রকঠিন স্বাস্থ্য, বাহুতে বল, সংগঠনে কৌশল। দীপেন সেই দিকে এগিয়ে গেলে আত্মবলিই দেবে—আর তার ফলে আমরা, অগ্রজরা, হারাব বর্তমানের সংবেদনশীল এই ছায়া সুন্দর চিত্তের আশ্রয়, আমাদের ভাবী দিনের রূপকারকে—তার সৃষ্টিপ্রতিভার দানে রচিত হবে আমাদের অভিজ্ঞান।

দীপেনের কর্মোৎসাহে তাই মনে মনে সম্পূর্ণ স্বস্তি বোধ করতে পারি নি। বরং চেয়েছি—দীপেন লিখুক, লিখুক, আরো লিখুক। 'জীবনে জীবন যোগ' সে করেছে, সে এখন লিখুক। লেখাই তো তার স্বধর্ম। এক-একটি তার লেখা হাতে পৌঁছতে লাফিয়ে উঠেছি, 'হওয়া না-হওয়া' পড়তে পড়তে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছি—লিখুক, দীপেন, লিখুক। তার গভীরে যে-আত্মপ্রত্যয় ছিল, সংগঠন কর্মে যে-কুশলতাও ছিল, তার অজস্র প্রমাণ পেয়ে তখন চমৎকৃত না হয়েছি, তা নয়। শেষ পর্যন্ত তাকে না-লিখে পারি নি, 'বিবাহ-বার্ষিকী' পড়ে—দীপেন, লেখো, লেখো, লেখো—যা কেউ লিখে উঠতে পারছে না, হয়ত লিখতে পারবেও না, তুমিই তা লিখবার অধিকারী, তোমারই আছে সে শক্তি, ঘরের সঙ্গে বাহিরের এমন প্রেম-সমন্বয়ের সাধনা তোমারই মধ্যে রূপ লাভ করছে—জীবনকে সম্পূর্ণ করে দেখার মতো দৃষ্টি, অখণ্ড করে উপলব্ধি করার মতো আত্মার দীপ্তি। আর তোমার সেই প্রকাশের মধ্যেই উজ্জ্বল হবে যুগের তপস্যা, সঞ্জীবিত হবে আমাদের প্রতিভা, আমাদের পরিচয়।

'পরিচয়' চালনার ভার যখন দীপেন নেয় তখন তার চেয়ে যোগ্যতর কাউকে আমি দেখি নি। তবু নিজের অভিজ্ঞতার ফলে আমি তাতেও সর্বাংশে আশ্বস্ত বোধ করি নি। আমার অভিজ্ঞতা একেবারে মিথ্যা নয়, কিন্তু আশঙ্কা যে কতটা অমূলক তা আমার কাছেও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল 'পরিচয়' চালনায় দীপেনের অসামান্য কর্মকুশলতায়। আমি যাঁদের দিয়ে 'পরিচয়'-এ লেখাবার কথা ভাবতেও সাহস করি নি, তাঁদের দিয়ে সে লেখাল, নিয়ে এল তাঁদের স্বাক্ষর 'পরিচয়'-এর পাতায়—এ শুধু তার অদম্য পরিশ্রম না, আত্মপ্রত্যয়

ও সৌজন্য নয়, আন্তরিকতারও প্রমাণ। তার রাজনীতির পরিচয় কারো নিকট অজানা নয়, কারো কাছে সে 'পরিচয়'-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেনি। তথাপি প্রত্যেককে সে আকৃষ্ট করলে নিজের ঐকান্তিকতায়। দীপেনের সঙ্গে, তার নীতির সঙ্গে একমত না হয়েও তাঁরা 'পরিচয়'-এ লেখা দিয়েছেন, তা দিয়ে উঠতে না পারলে দীপেনের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, যে মত, যে পথ দীপেনের মতো মানুষের এই চারিত্রশক্তিকে সচেতন ও সবল করে তাকে তুচ্ছ ভাবতে পারেন নি।

দীপেন যখন এক-একটি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনার প্রস্তাব নিয়ে আসত আমি তখন তাতে সায় দেয়ার অপেক্ষা যা করতাম তা হচ্ছে প্রকারান্তরে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা। মনে হত, দুশ্চেষ্টা—আমাদের সে সামর্থ নেই। বারেবারেই চমকিত ও চমৎকৃত হয়ে বুঝেছি—তার আত্মপ্রত্যয় শুধু আত্মপ্রত্যয় নয়, তার আত্মার দীপ্তি।

এই সত্যটা আরো অনুভব করতে হয়েছে যখন 'প্রগতি লেখক সংঘ' পুনর্গঠনে তার উৎসাহ ও আয়োজন দেখি। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝতাম, এ দুঃসাধ্য। এ বিষয়ে আমার একটা তাত্ত্বিক ধারণাও ছিল—এখনো তা যায় নি। অনেক প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানেরই জীবন বিশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। পরিস্থিতি বদলে গেলে প্রতিষ্ঠানের প্রাণও আর স্ফূর্তিলাভ করতে পারে না। এ কথা অনেকটা সত্য—সর্বত্র নয়। তবে, এ প্রসঙ্গে আরো একটা ধারণা আমার মনে ঠাঁই পায়—হয়তো তাও সচরাচর মিথ্যা নয়। যেমন—প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই এক ধরনের প্রাণধর্মের অধীন, যৌবন-জরা ছাড়িয়ে তাকে টিকিয়ে রাখতে চাইলে কি হবে? তা প্রাণশক্তিতে আর সচল থাকে না, বড় জোর 'establishment' রূপে 'অচলায়তন' বা 'চার্চে' পরিণত হয়। কতকগুলি আয়োজন উপকরণের জোরে কোনো কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান তার পরেও টিঁকে থাকতে পারে, কিন্তু হয়ত নবকলেবর ধারণ করতে হয়, নয় তা ফসিলত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে মরবার অনেক আগেই অনেক প্রতিষ্ঠান মরে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দলাদলিতে পচ ধরে! হয়তো এদেশে পঞ্চাশ বৎসরের বেশি কোনো প্রতিষ্ঠান জীবিত থাকে না—যুগের প্রয়োজনে তখন নতুন উদ্যোগ ও নতুন আয়োজন নতুন প্রতিষ্ঠানকে জন্ম দেয়। নতুন দৃষ্টিতে তাকে নতুন সৃষ্টিতে উদ্যোগী হতে হয়—পুরনো নামরূপ চলে না। 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর যে-ঐতিহ্য তা গৌরবের। সে সময়ে প্রাণমন্ত্রের ধারক হিসাবে বাংলায় প্রায় একটা রিনাসেন্সের সূত্রপাত হয়েছিল। শুধু সাহিত্য

নয়, সংস্কৃতি সৃষ্টির বাহন হয়েছিল তখন প্রগতি আন্দোলন। কিন্তু আজ সে-রিনাসেন্স নেই। নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে নতুন রিনাসেন্সের। কিন্তু সে জন্য এখন প্রয়োজন সর্বজনীন শিক্ষার উদ্বোধন, নবজীবন সৃষ্টির তপস্যা। দীপেন সে বিষয়ে অন্ধ ছিল না—সে তপস্যাতেই ছিল তার আগ্রহ, সুদূর হলেও। বিপ্লবী সংস্কৃতিকে সন্নিকট করার জন্যই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। স্বাস্থ্যের বাধা-বিঘ্ন ও সকল দুর্যোগের মধ্যেও সেই নবজীবনের গানকে দীপেন দিতে চেয়েছে রূপ। লেখার মতোই যখন সভায়-সম্মেলনে সে দাঁড়িয়েছে তখন তার মুখে, তার কণ্ঠে, তার সুস্থির বাণী-রচনায় দেখেছি তার আত্মার দীপ্তি। শুধু তার নিজ বিশ্বাস নয়—জীবন সত্যের উপলব্ধিতে তা উজ্জ্বল। বারেবারে তখন আমারও মনে হয়েছে, প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউশান) পুনর্জীবিত না হোক, সেই প্রগতি আন্দোলন নবজীবন সৃষ্টির প্রতিজ্ঞায় অমর। সেই ভবিষ্যতের আভাস বহন করে এনেছে তাঁর সৃষ্টির তপস্যায় এই অনুজ। আমাদের ভবিষ্যৎকে তার সাধনায় দেখতাম মূর্ত।

দিনের পর দিন—কথায়, আলোচনায়, উদ্যোগে, আয়োজনে, সৃষ্টির সুগম্ভীর মহিমায় আর আত্মার দীপ্তিতে আমাদের এই একান্ত অনুজ হয়ে উঠেছিল আত্মার আত্মজ, অপরিমেয়, অপরিমেয় তার আত্মার দীপ্তিতে।

মুখোমুখি

সমরেশ বসু

দীপেন,

সম্বোধনটা এই রকমই থাক। আজ, যখন তুমি জীবন্ত শরীর নিয়ে আর উপস্থিত নেই, আর হবে না কোনোদিন, তখন একটু মুখোমুখি কথা বলা যাক। কারণ, তুমি মানুষ ও সাহিত্য রচয়িতা হিসাবে কেমন ছিলে, সে-বিচারের ভার নিতে আমি অক্ষম। সেইজন্য তোমাকে নিয়ে বিশেষ কোনো রচনায় হাত দিতে চাই না। আজ একটু নিভৃতে, মুখোমুখি কথা বলা যাক।

সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়াটা যে-কোনো রকমের সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই নাকি ক্ষতিকর। হতে পারে। আমি তোমাকে কোনোদিক থেকেই সৃষ্টি করতে বসি নি, অতএব আমার সে-ভয় নেই। তোমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে বসে যদি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ি, জানবো, সেটাই আমার চরিত্রের লক্ষণ।

এ সংসার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়াটাই শেষ যাওয়া না। মানুষ তার জীবের পরিচয়ে এখানেই বিশিষ্ট, তাই না? কেবল কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের নিয়ে কথাটা অর্থপূর্ণ না, সকল মানুষের ক্ষেত্রেই। সকল শ্রেণীর মানুষই গতায়ু আত্মীয়র কথা স্মরণ করে, তার চিহ্ন রেখে দেয়। মুখোমুখি কথা বলাটাও, অতএব, প্রিয়জনের সঙ্গে ঘটে থাকে। এমনটা তুমি আমি আমরা অনেক দেখেছি। সদ্য লোকান্তরিতকে স্মরণ করে, মানব-মানবী মাত্রেই কতো কথা বলে ওঠে। তারা হয়তো মহাপুরুষ বা মহামানবী না।

নিতান্ত সাধারণ মানুষ। অসাধারণরা তো সহজে বিচলিত হোন না। হোন কী? হলে কি তাঁদের চলে?

যেদিন সকালে আমার বাসার সামনে ঘন ঘন গাড়ির হর্ন বেজে উঠলো, আর সেই সঙ্গে নাম ধরে ডাক, তখন ভাবতেও পারি নি, দরজায় ঘা না মেরে কে ডাকছে? এতো তাড়া কিসের? তার কিছুদিন আগেই, বারেবারেই মনে হচ্ছিল, আমার কাছে তোমার আসার সময়ের যে একটি অয়নবিন্দু তুমিই প্রায় স্থির করে দিয়েছিলে, তার অস্ত হয়ে যাচ্ছে কেন? তোমার দেখা নেই কেন? আসছো না কেন? 'জরুরি দরকার হলে এই ঠিকানায় একটা কার্ড ড্রপ করে দেবেন। অথবা কালান্তর অফিসে একবার ফোন করে জেনে নেবেন। সন্ধের দিকে পরিচয়ের পাশের ঘরে টেলিফোন করেও ডাকতে পারেন। নাম্বারটা লিখে রাখুন…।' একটু দ্বিধা, কয়েক মুহূর্তের, তারপরে, 'আলিপুরের বাড়ির ফোন নাম্বারটাও লিখে রাখতে পারেন, জরুরি কোনো দরকার পড়লে, ফোন করবেন…।'

তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে জরুরি ব্যাপার যে-গুলো ছিল, আমি নিজে সে-সব বিষয়ে খুব ভাবিত ছিলাম না, কিংবা বলা চলে, সেইসব জরুরি ব্যাপারগুলোর সবই ছিল হঠাৎ হঠাৎ। আচমকা। হয়তো দুপুরেই তোমার হাতে দরজার কড়া বেজে উঠতো, দরজা খুললেই, চোখের দিকে তাকিয়ে সেই একটু হাসি, 'কি, ব্যস্ত ছিলেন, বিরক্ত করলাম তো?'

'এসো এসো।' জবাব তো আমার একটাই ছিল। বিরক্ত করতে কী না, সে-জবাব তো আমার থেকে তোমারই ভালো জানা ছিল। ছিল না? 'বসো বসো।'

'ব্যাপারটা জরুরি।' বসেই তুমি কাঁধের ঝোলা থেকে কিছু কাগজপত্র বের করতে, 'আপনাকে কোনো পার্টির ব্যাপারে অংশ নিতে বলছি না, কিন্তু ফ্যাসিবিরোধী এই আন্দোলনে সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে আপনার নামটা থাকা উচিত। কাগজটা একটু চোখ বুলিয়ে নিন, তা হলেই বুঝতে পারবেন…।'

আমি ততক্ষণে কলম তুলে নিয়েছি। লাখে না মিলল এক, এরকম কারো কারো সততা, অকপটতা এমনই প্রশ্নাতীত, চোখ বুলিয়ে নিয়ে কিছু বোঝবার দরকার হয় না। অথচ দীপেন, তুমি তো জানতে, এমারজেন্সির সেই দিনগুলোকে আমি অশুভ অন্ধকারের দিন বলেই জানতাম। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সময়ও ছিল তখনই, কিন্তু তোমার

কাছে দলের দিক থেকে সেটা ছিল বিপরীত দিকে। তুমি অবিশ্যি আমাকে বলেছিলে, 'জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে আপনাকে কিছু বলতে বা লিখতে বলছি না। আমরা পৃথিবীর সব সাধারণ মানুষই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, আপনি শুধু…।' তুমি বৃথাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলে। আমি তার মধ্যে সই করে দিয়েছিলাম। তুমি হেসেছিলে।

আমাকে কেউ অন্ধ ভাবতে পারে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে, ব্যক্তিবিশেষে আমাকে অন্ধ বলা যায়, কারণ আমি জানতাম, তুমি যখন বলছো, তখন, সেটাই ঠিক। এটা কোনো সম্মোহিতের উক্তি না, অকৃত্রিম বিশ্বাসের কথা। এই বিশ্বাসের দরুন আমার ভূমিকা হয়তো অন্যের ভ্রূকুটি ও অবিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমি নির্ভয় ও দ্বিধাহীন। তার কারণ, তুমি। আমার যে অটল বিশ্বাস, তুমি কখনো অন্যায় করতে পারো না। আমি অন্ধ? তবে বলি, সব অন্ধত্বই মূঢ়তা না। আমি অবিবেচক? সব ক্ষেত্রেই বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ খুব একটা বিবেচকের কাজ না। তোমার মতো নিষ্ঠাবান সৎ মানুষের মুখোমুখি হয়েই একমাত্র এসব কথা বলা যায়।

ক'মাস আগের কথা, ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠা টেলিফোনের রিসিভার তুলতেই, তোমার কিছুটা উদ্বিগ্ন উত্তেজিত স্বর শোনা গিয়েছিল! 'একটা বিশেষ জরুরি ব্যাপার, আপনার একটা বই আমার আজ এখুনিই চাই…।' তুমি আমাকে অবাক করে দিয়ে এমন একটি বইয়ের নাম করেছিলে, যে-বইটি আমার রচনায় কোনো উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠতার চিহ্ন বহন করে না। সমাজের একটা ব্যাধি, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া দুটি নর-নারীর প্রেম-সম্মোহনের কাহিনী। তোমার উত্তেজিত স্বর শোনা গিয়েছিল, 'বইটা আপনি বের করে রাখুন, আমি লোক পাঠাচ্ছি, তার হাতে দিয়ে দেবেন…।' কিন্তু বইটা তো তখন এক কপিও বাড়িতে ছিল না। শোনা মাত্র তুমি একটু ঝেঁজেই বলেছিলে, 'তা হলে বইটির প্রকাশককে এখুনিই টেলিফোন করে জানিয়ে দিন, আমার নাম করে যে যাবে, তার হাতে যেন এক কপি বই দিয়ে দেয়। ব্যাপারটা জরুরি। বুঝলেন, খুবই জরুরি…।' তুমি লাইন কেটে দিয়েছিলে।

আমি মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নি। প্রকাশককে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর তিনদিন বাদে তুমি এলে। আমি তোমার চোখের দিকে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকিয়ে আছি। তুমি হেসে বললে, 'ফরগেট দ্যাট ম্যাটার, ওসব ভুলে যান, ও কিছু নয়। এখনো

অনেক সৎ আর চিন্তাশীল মহিলা-পুরুষ আছেন। বৃথাই শুধু কিছু তর্ক আর কথা কাটাকাটি। তবে বইটা আপনি এমন কিছু ভালো লেখেন নি।' হাসতে হাসতে বললে, 'চা খাব।'

নিশ্চয়ই। কিন্তু বইটা যে আমার লেখা হিসাবে তেমন কিছু না, সেটা তো আমিও জানতাম। তবু, ব্যাপারটা কী?

'কিছুই না। ভুলে যান।' তুমি তোমার মতো করেই হেসে বললে, এবং তবু, দু-একটি অস্পষ্ট ঝাপসা কথা বললে, যা থেকে স্পষ্ট কিছু না বুঝলেও একটা ঝাপসা অনুমান করে, বিষণ্ন হয়ে পড়লাম। তুমি হঠাৎ বর্তমান সরকারের এক নবীন বয়সের মন্ত্রীর নাম করে বলে উঠলে, 'ও কিন্তু রিয়্যালি খুব ভালো ছেলে। ওর সম্বন্ধে যে-যা বাজে কথা বলুক, আপনি একদম বিশ্বাস করবেন না...।'

আচমকা একথাটা এতোই অপ্রাসঙ্গিক মনে হলো, আমি তোমার দিকে অবাক চোখে তাকালাম। তুমি হো-হো করে হেসে উঠে বললে, 'আমি জানি, আপনি এসব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। তবু বললাম, মনে হলো, তাই।'

দীপেন, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, হয়তো বুঝতে পেরেছিলাম। কিংবা বুঝিনি। তবু অনেক কথা মনে আসছিল। সে-সব কথা বলার দরকার নেই, কারণ, তা হলে নিজের কথাই সাত কাহন বলা হয়ে যাবে। আজ তোমার সঙ্গে, কেবল তোমারই কথা।

দীপেন, তোমার এমনি নানান জরুরি কথার মধ্যে, ইদানিং কয়েক বছরের সব থেকে জরুরি কথাটা জুনের গোড়াতেই, কিংবা মে মাসের মাঝামাঝি শোনা যেতো' পরিচয়ের পুজোর লেখাটা কিন্তু অগাস্টের গোড়াতেই চাই। আরো আগেই বলতে পারতাম, তবে আমি জানি, আপনার ঠিক মনে আছে। অবিশ্যি, আপনাকে আমি মাঝে মাঝেই তাগাদা দিয়ে যাবো।'...কথার শেষেই হাসি, আসলে 'তাগাদা' কথাটা তোমার ভয় দেখানো আমি জানতাম। কারণ তুমি জানতে, তাগাদা ব্যাপারটাকে আমি সত্যি ভয় পাই। যদিও তুমি যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিতে, এবং প্রায় শেষ মুহূর্তে কোনো সুবোধ তরুণের হাতে তোমার চিরকুট আসতো, 'আর একদিনও সময় নেই, গল্পটা এর হাতে দিয়ে দিন। লেখা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে? আমি কিন্তু তাগাদা দিই নি।'...

সত্যি কত বড় অস্বস্তি আর অসহায় বোধ করতাম এবং আমাকে লিখতে হতো, 'আর আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দাও...।' কিন্তু তোমার প্রেরিত দূত বলতে

ভুলতো না, 'আপনারটাই শুধু বাকি—।' আমি আটচল্লিশ ঘণ্টাকে বাহাত্তর করার চেষ্টা করতাম না, বরং কমাবার চেষ্টাই করতাম। পরিচয়ের মাঝখানে অনেকগুলো বছরে কী ঘটছিল, কিছুই জানি না। আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। কী কারণে, তাও আমি জানি না। ধরেই নিয়েছিলাম, আর বোধহয় কখনো যোগাযোগ ঘটবে না।

কিন্তু দীপেন, আমার ধরে নেওয়া বিশ্বাসটাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়ে, তুমিই নতুন করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে, 'পরিচয়ে আপনি লিখবেন না, এটা হতেই পারে না। পরিচয় আপনার আঁতুড় ঘর—লেখক হিসাবে। বেশি দাবী করবো না, বছরে অন্তত একবার, শারদীয় সংখ্যায় একটি গল্প, চাই-ই চাই।'

কেবল সত্যি বলোনি, 'আঁতুড ঘর' কথাটি খুব লাগসই বলেছিলে, এবং লেখাটাও তোমার দাবী ছিল প্রত্যেক শারদীয় সংখ্যাতে। ১৯৭৬ এ শারদীয় পরিচয়েই আমার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই নতুন যোগসূত্রটা ক বছরের? চার পাঁচ বছরের হবে? কিন্তু এই একটিমাত্র কারণেই তোমার যাওয়া-আসা ছিল না। আরো কারণ ছিল, তেমন জরুরি না হলেও। কিন্তু দিন চলে যাচ্ছিল, তুমি আসছিলে না কেন? এদিক ওদিক খোঁজখবর নিতে, ঠিক মনে করতে পারছি না, কে যেন বলেছিল, তুমি পি. জি. হাসপাতালে আছো। কেন? না, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, নিতান্তই চেক্ আপ্-এর জন্য। অসুখ বিসুখ কিছু করেনি।

আমি তোমার দু-একটা শারীরিক কষ্টের কথা জানতাম। কিন্তু হাসপাতাল, চেক আপ্, শব্দগুলোকে ইদানিং মোটেই ভালো লাগতো না। হ্যাঁ, একরকম কুসংস্কারই বলতে পারো। তোমার বয়সের সঙ্গে শব্দগুলো আরোই বেমানান। আজকাল কথায় কথায় হাসপাতাল, চেক আপ্। হয়তো ভালোই। তবু, সবকিছুরই একটা সময় আছে তো। আমি তাড়াতাড়ি তোমার চেক আপ্ সেরে ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলাম। তার মধ্যেই একদিন সকালে মোটরের হর্ন বেজে উঠলো। দরজায় ঠক্‌ঠক্ নয়, বাইরে থেকে ডাক, 'সমরেশবাবু।'

বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, প্রসূন—প্রসূন বসু। ওর মুখে সেই চিরাচরিত হাসি নেই। চশমার আড়ালে দু চোখে তখনও যেন অবাক জিজ্ঞাসা। ডাকলাম, 'এসো।'

'না, আপনি আসুন।'

'কোথায় ?'

'পি. জি.-তে।'

'কেন ?'

'দীপেন—।'

'দীপেন ?'

'দীপেন—।' প্রসূনের চশমার কাঁচের আড়ালে, ওর বড় চোখ দুটো যেন ভাবলেশহীন। ঠোঁট দুটো ফাঁক করা।

মুহূর্তেই অমঙ্গলের কালো ছায়া আমাকে গ্রাস করল। দীপেন, এতে কোনো চমক নেই, ঝলক নেই, তোলপাড় করা নেই। অমঙ্গল সূচিত হয় যেন চেতনার গভীরতর অন্ধকারে। ঘরে ঢুকে জামাটা গায়ে চাপিয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম। প্রসূনের গাড়ি ছুটল পি. জি.-র দিকে। সেখানে পৌঁছে শুনলাম, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আলিপুরে তোমাদের বাড়ির সামনে দেখলাম, শববাহী শকটের কাঁচের আধারে তুমি শুয়ে আছো। তোমার মাথার কাছে ফুল। ফুলের মালাও কি ছিল? মনে করতে পারি না। এগিয়ে গিয়ে তোমার মুখের দিকে তাকালাম। তোমার চোখ বোজা। কিন্তু আমি কি ভুল দেখলাম ? একটা কেমন কষ্টের অভিব্যক্তি যেন তোমার মুখে ফুটে রয়েছে। তোমার বাঁ নাকের ছিদ্রটা পরিষ্কার করে দিতে ইচ্ছা করল।

দীপেন, কোনো মানে হয় না, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করবো, 'তুমি কি সত্যি আর কথা বলবে না···?' চিরদিনের জন্য বাকরুদ্ধ তুমি, আর কথা বলবে, না। কিন্তু যে-সব কথা বলে গিয়েছো, সে-কথাগুলোই এখন মনে আসছে। সে-সব কিছু কম কথা না। মুখোমুখি বলতে গেলে, অনেক সময় বয়ে যাবে। ইতিমধ্যে তোমাকে কাঁচের আধার থেকে বাড়ির ভিতর দরজার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাস্তার দু-পাশে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন তোমার অগণিত কমরেডস, অনুরাগী, গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবেরা। তোমার মেয়ে একটি লবঙ্গ শাদা চন্দনে ডুবিয়ে তোমার কপালে পরাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর চোখের জলে সব ধুয়ে যাচ্ছে। দেখে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। অপরাহ্নে আবার— আর একবার তোমাকে দেখতে গেলাম কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। তখন বৈদ্যুতিক চুল্লির কাছে তুমি শায়িত। তোমার গায়ে জড়ানো লাল পতাকা।

তোমার ছেলের গায়ে পিতৃদশার পরিচ্ছদ। পুরোহিত ওকে মন্ত্র

পড়াচ্ছেন। তারপরে মুখাগ্নির পালা। তোমার কমরেডরা ইণ্টারন্যাশনাল গেয়ে উঠলেন। আমি মন্ত্র শোনবার চেষ্টা করছিলাম। তখন যুগপৎ আমার বাবা, আমার পুত্রদের কথা মনে পড়ছিল।

দীপেন, এপ্রিল শেষ হলো, আজ মে মাসের প্রথম দিন। সব জেনেও, আমি কিন্তু দ্বিপ্রহর অতীত না হতেই, দরজায় করাঘাতের জন্য রোজ অপেক্ষা করবো। কাঁধে ব্যাগ, ছোটখাটো মানুষটি তুমি, দরজা খুলতেই হাসি। আমি শোনার অপেক্ষায় রইলাম, 'ব্যস্ত করলাম না তো? মনে করিয়ে দিতে এলাম, গল্পটা···।'

১ মে, ১৯৭৯

তোমার চির প্রীতার্থী

সমরেশবাবু

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

রচনা—সমগ্র

দুই বা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে

আনুমানিক মূল্য ৬০৲

অক্টোবরের মাঝামাঝি প্রথম খণ্ড বেরবে

গ্রাহক করা হচ্ছে

গ্রাহক চাঁদা ১০৲

২০% ছাড় দেওয়া হবে।

পরিচয়

উপন্যাস

শব্দের খাঁচায় : অসীম রায় ৬·০০

মস্তক বিনিময় : (Thomas Mann-এর Transposed heads-এর বঙ্গানুবাদ) অনুবাদক ক্ষিতীশ রায় ৪·০০

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস ১৫·০০

নীল নোট বই (ইমানুয়েল কাজাকোভিচের ব্লু নোটবুক-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক : নৃপেন ভট্টাচার্য ৪·০০

বেনিটোর চাওয়া পাওয়া (আনা সেগার্স-এর—Benito's Blue-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৪·০০

মানুষ খুন করে কেন : দেবেশ রায় ৩০·০০

গোবিন্দ সামন্ত : লালবিহারী দে-র 'Bengal Peasants Life'-এর বঙ্গানুবাদ সাধারণ ৪·৫০

কমরেড : সৌরি ঘটক ৪·৫০

পরিচয়

৪৮ বর্ষ ৯ম সংখ্যা চৈত্র ১৩৮৫ এপ্রিল ১৯৭৯

শরাফী ১০১, পুরুষোত্তম যশোবন্ত দেশপাণ্ডে: 'শুকনো ফুল'। নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩, প্রদীপ সিংহ: Calcutta in Urban History। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪, মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ১১২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ১১৪, শুক্লপক্ষ ১১৫

বিবিধ প্রসঙ্গ

অরুণ মিত্র ও রবীন্দ্র পুরস্কার। সিদ্ধেশ্বর সেন ১১৬, জামসেদপুরে রক্ত আর আগুন। ধনঞ্জয় দাশ ১২১, শম্ভু মিত্র, নান্দীকার ও দীপেন্দ্রনাথ-আমরা। দেবেশ রায় ১২৫

প্রচ্ছদ

পারী কম্যুন-এর স্মৃতিতে ইংরেজ শিল্পী ওয়াল্টার ক্রেন অঙ্কিত

পরিচয় প্রাঃ লিমিটেড-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক—গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

ভাষাশিক্ষা ও সরকারি হুকুম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন—এখন থেকে বি. এ. ও বি. এস সি ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে কোনো একটি বিষয় পড়তে হবে ও পরীক্ষায় পাশ-নম্বরের অতিরিক্তটুকু মোটের সঙ্গে যুক্ত হবে। বাংলা ও ইংরেজি এখন থেকে 'বাধ্যতামূলক ঐচ্ছিক' বিষয় গণ্য হবে।

প্রস্তাবটি বেশ কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ শিক্ষার সংশ্লিষ্ট মহলে শোনা যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্বাচিত সংস্থাগুলি বাতিল করে দেন। এর পর থেকে মনোনীত কাউন্সিলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চালাচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল তেমনি একটি মনোনীত সংস্থা। এই কাউন্সিলের মনোনীত তিন বা পাঁচ জনের এক উপসমিতির পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবটি প্রথম আনা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল এ-বিষয়ে একমত হয় নি। কলেজ শিক্ষকদের ভেতরে অনেকে এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরকারে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের একমাত্র সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বিষয়টি আলোচনার জন্য একটি সাধারণ সভা সংগঠিত করেন। সেই সভায় ও তাঁদের শেষ সম্মিলনে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবে এমন গুরুতর বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করতে ও ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাগুলির নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়।

এত আপত্তি সত্ত্বেও সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের ভাষানীতিকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শিক্ষার কোন স্তরে কোন ভাষা পড়ানো হবে এ-নীতি সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও সমতুল্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সরকার যখন এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন তখন বোঝা যায় অ-সাধারণ কোনো পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সরকার বাধ্য হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বি. এ. ক্লাশের পাঠ্য ভাষা নিয়ে তেমন কোনো সংকটের পরিস্থিতি হয় নি। সুতরাং সরকারের এই সিদ্ধান্ত আপতিক নয়, সরকারের কর্মসূচির স্থির অংশ। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের সমগ্র কর্মসূচি কারো জানা নেই।

বি.-এ-বি.-এস সি ক্লাশে ভাষাশিক্ষায় নীতি কি হওয়া উচিত এ-বিষয়ে আমরা এখানে কোনো আলোচনা করছি না। আমাদের আশা ও প্রস্তুতি ছিল এ-নিয়ে সম্ভাব্য ব্যাপক আলোচনার সময় আমরা মত দিতে ও মতামত বিনিময় করতে পারব। এই সরকারি নির্দেশ, অনেকের মতো আমাদেরও আশা ও প্রস্তুতি অবান্তর করে দিল।

আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিতদের ভাষাজ্ঞানের ও ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার অভাব এতই প্রকট এবং সাহিত্যের অনুভূতির পরিধি থেকে জনসাধারণের বিপুলতম অংশের দূরত্ব এতই বেশি যে সেই নিদারুণ বাস্তবতায় 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি', 'বিদেশী শিক্ষাদর্শ' ইত্যাদি বিমূর্ত ও বিতর্কসাপেক্ষ তাত্ত্বিকতা অবান্তর হয়ে যায়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের পেছনে তত্ত্বের ও বাস্তবতার কোনো সমর্থন নেই।

কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় আপত্তি হুকুম জারির সরকারি পদ্ধতির বিরুদ্ধে। আলাপ-আলোচনার সমস্ত সম্ভাবনা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারি নির্দেশ জারি করা গণতান্ত্রিক ব্যবহারবিধির বিরোধী, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার বিরোধী, রুচি ও সৌজন্যের বিরোধী। 'গণতান্ত্রিক অধিকার' শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনেরই আবশ্যিক শর্ত নয়—এই অধিকার ছাড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে কোনো বিকাশ, এমন-কি স্থিতিশীলতাও সম্ভব নয়। সরকার সেই গণতান্ত্রিক নীতি লঙ্ঘন করলেন।

বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি উচ্চশিক্ষার পাঠ্য-ভাষা নিয়ে অনেক দিন ভাবনা-চিন্তা করছেন ও এ-বিষয়ে তাঁদের একটি মত গড়ে উঠেছে—তেমন প্রমাণ নেই। তাই, এত গুরুতর একটি বিষয় সরকারি হুকুমের জোরে সমাধান করে ফেলার পেছনে রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের অপরিচ্ছন্ন এক মতলব হাসিলের আভাস মেলে যেন।

আমরা সরকারি এই নির্দেশের প্রতিবাদ করি। সঙ্গে সঙ্গে ভরসা করি: পরিণততর রাজনৈতিক বিবেচনায় এই নির্দেশ প্রত্যাহারে বামফ্রন্ট সরকার সংকোচ করবেন না।

গানে গানে পারী কম্যুন

অবন্তীকুমার সান্যাল

...Paris Commune, where the proletariat for the first time held political power for two whole months··· F. Engels, 24 June 1872.

১৮৭১ সালের পারী কম্যুনের আয়ু স্বল্পকালের হলেও, তা অমরত্ব লাভ করেছে যেমন মানুষের বিপ্লবের ইতিহাসে, তেমনি গানের ইতিহাসেও। পারী কম্যুন আর গান যেন হাত ধরাধরি করে চলেছিল। 'একটি গান, একটি কবিতা / একটি বোমা একটি পতাকার মতো ; / একটি জাতকে ধুলো থেকে তুলতে পারে।'—মায়াকভস্কির কথাগুলো পারী কম্যুনের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য সত্য হয়ে উঠেছিল। প্রুশিয়ান আক্রমণ, জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ—পটপরিবর্তনের দ্রুততার সঙ্গে তাল রেখে গান গেয়ে উঠেছিল গোটা পারী। সে গান লেখা হয়েছে, ছাপানো হয়েছে, দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো হয়েছে, হাতে. হাতে বিলি হয়েছে ; জানা কোনো গানের সুরে বসানো কথাগুলো সহজেই আয়ত্ত করে নিয়ে সেই গান ফিরেছে মুখে মুখে. গান গাইতে গাইতে ব্যারিকেডের শেষ গুলিটি ছুঁড়েছে কম্যুনের সৈনিক। বহু গান আজ লুপ্ত, কিছু গানের দু-একটি কলি মাত্র টিকে আছে, তবু সম্পূর্ণ গান এখনো যা বেঁচে আছে, তার পরিমাণ কম বিস্ময়কর নয়।

পারীর কম্যুনকে ফ্রান্সের পাঠ্য ইতিহাসে আজো দেখানো হয়ে থাকে একদল উন্মাদের কাণ্ড কিংবা বড়ো জোর একটি বেদনাদায়ক অধ্যায় বলে।

সমকালীন মার্কসের কথা কজনই বা মন দিয়ে বুঝেছিল। ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের সরব অংশটি ছিল খড়্গহস্ত, নয়তো বিদ্রূপাত্মক। বৃদ্ধ উগো, 'অপ্রকৃতিস্থ' ভেবলেন, কিশোর র‍্যাবো আর লুইজ মিশেল ছাড়া বড় বিশেষ আর কোনো কবি বা বুদ্ধিজীবীকে পারী কম্যুন গভীরভাবে নাড়া দিতে পেরেছিল বলে জানা নেই; যদিও অনেক অখ্যাত কবি কম্যুন নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ব্যাপার ঘটেছিল। অখ্যাত অজ্ঞানাদের বাদ দিলেও পারী কম্যুনের গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন চিরকালের স্মরণীয় গীতিকার পতিয়ে, ক্লেমাঁ, জুল জুভঁ, শাৎল্যাঁ—বিপ্লব আর গানকে যাঁরা একসূত্রে বেঁধেছিলেন।

পারীর গানের ইতিহাসে chanson des rues 'রাস্তার গানের' স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইসব গান ছাপা হয়ে বেরুত প্রকাশক সাৎ, মাদ্র, লিভি, ছেমান থেকে। সব প্রকাশনাই ছিল মঁমার্ত্র্ এবং স্যাঁ-মার্তাঁর শহরতলিতে, র‍্যু দ্যু ক্রোয়াসাঁয়। এগুলোতে ছবিও থাকত, কোনো পরিচিত গানের সুর দেওয়া থাকত, লোকে সহজেই শিখে নিতে পারত; তারপর সবাই মিলে গাইত রাস্তায়, ঘরে, কাফেয়, কিংবা কাজের ছুটির পর রাস্তায় রাস্তায় ভিড় করে পেশাদার গায়কের মুখে শুনত। এসব গান ছিল মুখ্যত পেশাদারদের লেখা এবং নিচের তলার মানুষদের আনন্দদানের পেশাদারী চেষ্টা।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে স্বাভাবিকভাবেই এইসব গানে স্থান পেয়েছিল উগ্র দেশপ্রেম, জার্মানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপ, জাতীয়তাবাদী বাহ্বাস্ফোট। কিন্তু সেডানের পরাজয়ের অনেক আগে থেকেই গানের মধ্যে ফুটে উঠতে থাকে রিপাবলিকান মনোভাব। পেশাদারী গানের চরিত্র বদলাতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম দিকের একটি গানের বাহ্বাস্ফোট:

ওরে প্রুশিয়ান, পালা, চম্পট দে
আমাদের ঝাণ্ডা আর
বন্দুকের সামনে:
হ্যাঁ, আমাদের গর্বিত ঈগলের একটাই মাথা,
সে জিতবেই,
যদিও তোদের ঈগলের দুটো মাথা।

কিন্তু বহু গানেই ফুটে উঠেছিল রাজতন্ত্রের প্রতি বিদ্রূপ। এই বিদ্রূপ মুখ্যত ছিল তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিয়ে। সেডানের পরাজয়ের পর বিদ্রূপাত্মক গানের ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেদিনের একটি বিখ্যাত গান '*Le Sire de Fisch-ton-kan*', তাতে তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি নির্মম উপহাস :

তাঁর ছিল এক বিরাট গোঁফ,
এক ঢাউস তলোয়ার আর ক্রুশ সর্বত্র
সর্বত্র সর্বত্র।
কিন্তু এ সবই লোক দেখানো ভড়ং,
কাজে লাগত না কিছুই
লাগত না কিছুই।
তিনি ছিলেন জাঁদরেল সেনাপতি
সবার আগে বাঁচাতেন তাঁর চামড়া
গায়ের চামড়া।
একদিন খোঁচা লাগল তলোয়ারে
শত্রুকে দিলেন সেটা উপহার
আহা কী সুন্দর উপহার!

কিন্তু এই জনপ্রিয় পেশাদারী গানের মধ্যে থেকেই আত্মপ্রকাশ করে নতুন জাতের গান, যা হয়ে ওঠে জনতার গান—গণসংগীত, যার মূল জনজীবনের গভীরে। এই গানগুলো হয়ে ওঠে এক-একটি বোমা, একটি পতাকার মতো'। এমন কিছু গানের অস্তিত্ব অনেক আগে থেকেই ছিল। যেমন অনেক আগে লেখা পিয়ের দ্যুপঁ-র 'শ্রমিকের গান'। বাপের মুখ থেকে এ গান উঠেছিল ছেলের মুখে। ১৮৩০, ১৮৪৮, ১৮৫২ এমন কিছু দূরের স্মৃতি নয়, তাই ১৮৭১ সালেও ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে পারীর মজুর সেই গান গেয়েছে :

হাড়ভাঙা খাটুনিতে কী পাই বলো ?
রোগা শিরদাঁড়া তাতে কুঁজোই হয়।
কোথায় যায় আমাদের ঘামের স্রোত ?
আমরা যন্ত্র ছাড়া কিছুই না।
আমাদের বাবেল উঠেছে স্বর্গের দরজা অবধি,
ধরিত্রী তার বিস্ময়ের জন্যে আমাদের কাছে ঋণী :
বিস্ময়ের মধু যখন শেষ হয়

প্রভু তাড়ান মৌমাছিদের।

(ধুয়া)

আমরা ভালোবাসব, আর যখন আমরা
এক হতে পারব দল বেঁধে মদ খেতে,
কামান থামুক কি গর্জাক
আমরা মদ খাবো!
দুনিয়ার স্বাধীনতার সঙ্গে!

ক্লেমঁা তখন দিন কাটাচ্ছেন পুলিশের চোখ এড়িয়ে, কখনো পারীর শহরতলিতে, কখনো-বা বিদেশে। কিন্তু তিনি গান লিখে চলেছিলেন, পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন (*La Carmagnole, Le Casse-tête*) প্রতিকূলতার মধ্যে। ১৮৬৬ সালেই তিনি পারীর আসন্ন ব্যারিকেডের আভাস পেয়েছিলেন, গান লিখেছিলেন: 'আন্, বোন আমার, কিছুই কি দেখতে পাচ্ছ না?'। ১৮৬৭ সালে তিনি লিখেছিলেন ব্যাঙ্গাত্মক 'বন্ আভঁাতুর':

বেঁচে থাকুন সম্রাট, আহা কী মজা,
বেঁচে থাকুন সম্রাট!

তৃতীয় নেপোলিয়ন স্থপতি হোস্‌মানকে দিয়ে পারী গড়ছিলেন নতুন করে; ঘিঞ্জি এলাকা, সরু রাস্তা ভেঙে বড় বড় সোজা চওড়া বুলভার আর শিল্পকর্ম দিয়ে পারীকে করে তুলছিলেন নয়নমনোলোভা। কিন্তু পারীর এই মোহিনী রূপের আড়ালে যে কি ক্রূর অভিসন্ধি গোপন ছিল তা এঙ্গেলসের আগেই ধরা পড়েছিল ক্লেমঁার গানে:

তিনি বানাচ্ছেন নতুন নতুন এলাকা
তীরের মতো সোজা।
সেদিন যখন তাঁর জহ্লাদরা
ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলবে,
দেখবে ওই সুন্দর এলাকায়
বুলেট ছুটছে একেবারে সোজা।

পুলিশফাঁড়ি ছাড়া কোনো রাস্তা বানান না তিনি।
১৮৬৮ সালেই ক্লেমঁা গেয়েছিলেন 'রিপাবলিকান বসন্তের' গান:

যে কুয়াশা নামছে তা যদি
ভবিষ্যতের বাড়িয়ে দেওয়া হাত
ছুঁড়ে না দেয় কবরখানায়,
জীবন্ত, আমরা আনতে পারব
এক রিপাবলিকান বসন্ত
আমাদের জনগণের ফ্রান্সে।

পারী কম্যুনে ক্লেমাঁ জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁর মঁমার্ত্র্-এর ১৮নং ব্লক থেকে, এবং শেষ দিন পর্যন্ত ব্যারিকেডের পাশে ছিলেন। তাঁর গান ইস্তাহার হয়ে হাতে হাতে ঘুরত, দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা হতো, অভিজাত অট্টালিকার গেটে লটকে দেওয়া হতো। সেনসার বাঁচিয়ে রিপাবলিকের প্রতীক্ষার গান লিখেছিলেন পতিয়ে: 'কখন আসবে সে'। এক আশ্চর্যসুন্দর প্রেমের গান, সেনসার বুঝতে না পারলেও শ্রোতার কিন্তু বুঝতে একটুও অসুবিধা হতো না, এ প্রতীক্ষা কার:

আমি প্রতীক্ষায় আছি এক সুন্দরীর,
এক সুন্দরীর।
তাকে ডাকি, তাকে ডাকি
তারই কথা শুধাই পথের পথিককে।
আহা, প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা করে আছি!
এখনো প্রতীক্ষা করব বহুকাল?

সে ছাড়া আমি কী? যন্ত্রণায় কাতর।
পথ হাঁটি নগ্নপদে, দাঁতে কুটোও কাটি না,
আহা, প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা করে আছি!
এখনো প্রতীক্ষা করব বহুকাল?

তুষারে অসাড় হই, রাতের আস্তানা নেই,
মগজে শুধু কথা আর হাওয়া···
আমাকে জন্তুর মতো ওরা স্রোতে,
ক্রীতদাসের মতো বেচে কেনে।
আহা, প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা করে আছি!
এখনো প্রতীক্ষা করব বহুকাল?

যুদ্ধ কী নিষ্ঠুর, সুদখোরের শক্ত মুঠো,
একজন হাড় চোষে, অন্যে খায় রক্ত।
আহা, প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা করে আছি!
এখনো প্রতীক্ষা করব বহুকাল?

আমার দুর্দশা এমনই,
তাতে হয়ে উঠি অমানুষ,
আহা, এসো তাই সুন্দরী
নিরাময় করো প্রিয়কে
আহা, প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা করে আছি!
এখনো প্রতীক্ষা করব বহুকাল?

পতিয়ের প্রতীক্ষা করা রিপাবলিকের জন্ম হল ৪ সেপ্টেম্বর, সেডানের পরাজয়ের দুদিন পর। তিয়েরের নেতৃত্বে নতুন এ্যাসেমব্লি তৈরি হল শান্তি-চুক্তির জন্যে: আলসাস-লোরেন যাবে, পারীতে প্রাশিয়ান সৈন্য বাহিনী ঢুকবে। কিন্তু অবরুদ্ধ পারী আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করল। পতিয়ে ডাক দিলেন: 'প্রতিরোধ গড়ো, পারী':

এক বাহিনী আসছে পায়ের শব্দ শুনছো, পারী?
এক নিদারুণ অভিশাপ!
টিলার ওপারে দেখো ধোঁয়া
জার্মানদের অগ্রবাহিনীর।
এইতো সাম্রাজ্যের দাম,
এই পরাজয়, এই ডামাডোল,
তবু তোমাকেই আটকাতে হবে পথ
প্রতিরোধ গড়ো পারী, গড়ো প্রতিরোধ

... ...

ওরা যদি ভাসিয়ে নেয়! কাজটা কঠিন,
প্রতিটি হৃদয় যখন জোয়ারে জাগে।
মেয়েদের হাতে আছে গলানো পিচ,
পাথর গড়িয়ে আনছে দামাল-শিশুরা।
এসো পারী, পুরনো সাথী,

দড়িতে টান দাও গির্জার ঘন্টার,
গ্র্যানিট হয়ে ওঠো...হও ব্যারিকেড
প্রতিরোধ গড়ো পারী, গড়ো প্রতিরোধ !

... ...

বিদ্রোহ করেছে ফরাসীর ক্রান্স,
ভয়ের দিনগুলোয় নতুন করে হও
৯৩-এর আগ্নেয়গিরি।
প্রতিরোধ গড়ো পারী, গড়ো প্রতিরোধ !

১৫ ফেব্রুয়ারি পারীর ন্যাশনাল গার্ড এ্যাসেমব্লির নির্দেশ মানতে অস্বীকার করল। সমস্ত পারীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হল 'ন্যাশনাল গার্ডের রিপাবলিকান ফেডারেশন'। সিদ্ধান্ত হল এই ফেডারেশনই পারীকে রক্ষার সম্পূর্ণ ভার নেবে। পত্তিয়ে গান বাঁধলেন :

হে বীর তরুণ
বন্দুক উঁচিয়ে ধরো
রিপাবলিকের জন্যে রক্ষীদল
এগিয়ে চলো।

সেডানের পরাজয়ের পর পারী-জনসাধারণের আশা জেগেছিল নতুন রিপাবলিকের নেতারা শত্রু বিতাড়নের পথ ধরবেন। কিন্তু একটু একটু করে বোঝা গেল নেতারা পালটালেও, নীতি পালটায়নি। শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনো ইচ্ছাই তাঁদের নেই। পারীর ক্রোধ তুঙ্গে উঠল। পারীর কমাণ্ডার ত্রশু জার্মানদের যত না ভয় পেলেন, তার চেয়ে বেশি ভয় পেলেন পারীর জনসাধারণকে, জার্মানরা চলে গেলে তারা সেডানের বিশ্বাসঘাতকদের রেহাই দেবে না। তাই বিসমার্ককে অবরুদ্ধ পারীকে দেখিয়ে তিয়ের এবং জুল ফাভর্ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

পারী অবরুদ্ধ ছিল ১৮৭০ সালের আগস্ট মাস থেকে। অবরুদ্ধ পারীর সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা খুব কমই আছে অভিজাত ফরাসী সাহিত্যে। কারণ অভিজাতরা আগেভাগেই পারী ছেড়েছিল এবং যারা ছিল তাদের জন্যে ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। পারীতে ছিল নিরবচ্ছিন্ন খাদ্যাভাব, অন্ধকার আর দুর্জয় শীত। একটি গানে মেলে সেই দিনগুলোর কথা :

আমাদের সব রাস্তার চেহারা
কী করুণ, কারণ, হায়রে,
গ্যাসবন্ধ ঘণ্টাখানেক আগেই,
সন্ধেবেলায় দোকানপাট সবই
দেখলে কান্না পায়।

... ...

কত যে হিংস্র মানুষ আছে!
রক্ত গরম হয়ে ওঠে, ব্যবসায়ীরা
রক্ত শোষে গরীব লোকের,
পচা বাঁধাকপির দাম তুলেছে ৬ ফ্রাঁ ১০ স্যু।

লোকে খাচ্ছে ভাগাড়ের
বেড়াল, কুকুর, ইঁদুর।
তাই বেচছে স্তূপ করে
যা ফেলে দেয় আস্তাকুড়ে।
তাই খেতে হয় অবশেষে
নইলে মরতে হবে খিদেয়।

গানের শেষ স্তবকে যোগ করা হয়েছে: 'নীতিবাক্য':

তা হোক। এই সব লুটতরাজ
আমরা সইব দাঁত চেপে;
আমাদের হতাশ করার চেয়ে
এসবই বাড়িয়ে তুলবে সাহস;
যদি আমরা এককাট্টা থাকি
কেউ জয় করতে পারবে না পারী।

সহজ ভাষায় বলা গানের কথাগুলো ছিল অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ন্যাশনাল গার্ডের দৈনিক বেতন ছিল ১'৫০ ফ্রাঁ, আর চিজের দাম উঠেছিল ১ কিলো ৬০ ফ্রাঁ, চর্বি ৪৪ ফ্রাঁ; একটা বেড়াল বিক্রি হত ১৫ ফ্রাঁ-তে, ইঁদুরের দাম পড়ত ২'২৫ ফ্রাঁ; ১টি ডিমের দাম তার চেয়ে কিছু বেশি ২'৭৫ ফ্রাঁ; ১টি শালগম ১'৫০ ফ্রাঁ। ১৮৭০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পারীর অধিবাসী মারা গিয়েছিল ৩০ হাজার, শতকরা ৯০টি শিশু মারা গিয়েছিল খাদ্যাভাবের অপুষ্টিতে।

কিন্তু পারীতে যে স্বল্পসংখ্যক অভিজাতরা ছিলেন তাঁদের কিন্তু নিত্য ভোজ হয় কুখ্যাত ব্রেবাঁর বাড়িতে। আর তা কারুর অজানা ছিল না। বহু গানেই এই কুখ্যাত ব্রেবাঁ নামক ব্যক্তিটির উল্লেখ আছে। ফ্রাঁসিস্ক সার্‌সে তো বলছিলেনই : 'প্রাশিয়ানরা আছে, তাই তো নিশ্চিন্ত আছি।' কম্যুন পরাজিত হবার পর এই সার্‌সে এবং তাঁর বন্ধুরা—তেওফিল গোতিয়ে, দ্য সাঁ্যা-ভিক্তর, এর্নেস্ত রনা, পল বের্তলো, এদমঁ দ্য গঁকুর ইত্যাদি অনেকে মিলে ব্রেবাঁকে একটি পদক উপহার দিয়েছিলেন, যাতে এই কথাগুলো খোদাই করা ছিল : 'পারীর অবরোধের সময় কিছু লোক মঁ ব্রেবাঁর বাড়িতে এসে... একবারের জন্যেও বুঝতে পারতেন না যে তাঁরা ভোজ খাচ্ছেন এমন এক শহরে যেখানে কুড়ি লক্ষ লোক অবরুদ্ধ হয়ে আছে।' ব্রেবাঁকে নিয়ে লেখা একটি গানের কয়েকটি স্তবক :

আলসাস আর লোরেন দিয়ে কী হবে ?
ওখানে আমার জমি নেই, সম্পত্তিও নেই।
জার্মানরা আমাদের ছাড়ুক আর নিক,
থোড়াই কেয়ার করি, ওতে কিছুই হারাব না।
ত্রাসবুর্গের চেয়ে ভোজনে আমার বেশি টান ;
মেৎসের দাম তিতিরের একটা ঠ্যাঙের বেশি নয় ,
আর সব কিছু আমার মেয়েমানুষের মেজাজ খিঁচড়ে দেয়।...
একটা বিফ্‌স্টেকের জন্যে, মশাইরা, পারী দিয়ে দিচ্ছি !
শুনছি পাগলগুলো প্রতিরোধের কথা বলে,
আমৃত্যু লড়াই, স্বদেশ আর ইমানের কথা বলে !
আমার পেট শুধু একটা প্রতিশোধ ই চায় :
ভুঁড়ির মধ্যে আমি নামিয়ে রেখেছি মন।
ছোটোলোকগুলো দেশপ্রেমিক হয় তো হোক,
শত্রুর গুলিতে মরতে চায় তো মরুক ;
আমি কিন্তু অনেক ভালোবাসি রসুনবাঁটা চাটনি...
একটা বিফস্টেকের জন্যে, মশাইরা, পারী দিয়ে দিচ্ছি !

এখনো বলা হচ্ছে ফ্রান্স মরো মরো :
বিদেশীরা দুই পাশ থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে ;
রক্তমাখা বুটের নিচে উলহানরা সর্বত্র,

আমাদের পিঠ বাঁকাচ্ছে দাসের মতো।
এ দৃশ্যে যে কাঁদে সে কাঁদুক,
শান্তিই চুপ করাবে চেঁচামেচি !
আমার কনুইখানায় টান পড়েছে মাংসের...
একটা বিফস্টেকের জন্যে, মশাইরা, পারী দিয়ে দিচ্ছি !

কিন্তু শান্তিচুক্তি পারীর চেঁচামেচি চুপ করাতে পারল না। শান্তিচুক্তি অনুমোদিত হল ২৬ ফেব্রুয়ারি। সেদিনই পারীর উত্তেজিত জনতা বাস্তিই-এর কাছে পুলিশের লোককে জলে ফেলে দিল। জনতাকে শান্ত করতে পাঠানো দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য দলত্যাগ করল। পারীর একটা অংশ অবশ্য সরকারের অধীনে এল। তিয়ের তড়িঘড়ি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করালেন। ১ মার্চ জার্মানরা ঢুকল পারীতে। দোকানপাট সব বন্ধ রইল, প্লাস দ্য কঁকর্দের সমস্ত মূর্তি ঢেকে দেওয়া হল। কিন্তু ৩ মার্চ আবার জার্মান সৈন্যরা পারীর বাইরে চলে গেল। আর সেদিনই গঠিত হল ন্যাশনাল গার্ডদের কেন্দ্রীয় কমিটি।

১০ মার্চ সিদ্ধান্ত হল ন্যাশনাল এসেমব্লি বর্দো থেকে পারী আসবে না, ভের্সেইতে যাবে। ১১ মার্চ পাশ হল বাকি বাড়িভাড়া শোধের আইন, ন্যাশনাল গার্ডের বেতন বন্ধের আইন। ন্যাশনাল গার্ডের হাতে ছিল কয়েক শো কামান, তার মধ্যে ২২৭টি কামান বসাল পারীর পুব দিকের মাথার উপরে। সেদিনই জেনারেল ভিনোয়া দুটি বামপন্থী সংবাদপত্র বন্ধ করে দিলেন, সেই দিনই ব্লাঁকি আর ফ্লুরাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হল। তিয়ের প্রতিজ্ঞা করলেন বিদ্রোহীদের হাত থেকে কামানগুলো কাড়বেন, কারণ সেটাই বিসমার্ক আর ফরাসী ব্যবসায়ীদের দাবি। সরকারী ঘোষণা বেরুল: 'সরকার আঘাত হানতে বদ্ধপরিকর...সৎ নাগরিকরা অসৎদের থেকে দূরে থাকুক। যারা নিজেদের হাতে সরকার নিতে চাইছে সেই অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

১৮ মার্চ সকালে নিয়মিত বাহিনীর দুই ডিভিশন সৈন্য এসে পৌঁছল মঁমার্ত্র, বেল-ভিল এবং বুৎ-লোমঁতে কামানগুলো রক্ষা করতে। নারী ও শিশুর জনতায় ঘেরাও হয়ে হতভম্ব সৈন্যরা অবশেষে সরে গেল কেন্দ্রাঞ্চলে, মাত্র ১৭টি কামান নিয়ে, অনেকগুলো বাহিনী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল, বাদবাকিকে নিরস্ত্র করা হল। ৮৮তম বাহিনী জেনারেল লকঁতের নির্দেশ অমান্য করল।

১৮ মার্চ সিদ্ধান্ত হল পারী পরিত্যাগের। মন্ত্রীরা, ফৌজী ধুরন্ধররা, অভিজাতরা—প্রায় ১৮ হাজার লোক তড়িঘড়ি পারী ছেড়ে গেল। ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের বাধা দেবার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওতেল-দ্য-ভিলের দখল নিল: পারীর কম্যুন ঘোষিত হল। পারীর সমস্ত কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে নির্বাচনের ডাক দেওয়া হল। নির্বাচন হল ২৬ মার্চ: ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হল, বেতনের উর্ধ্বসীমা বাঁধা হল, ব্যক্তিগত সঞ্চয় নিষিদ্ধ হল, রুটির কারখানায় রাত্রের কাজ বন্ধ করা হল। পারীর গরীবদের বাকি বাড়িভাড়া মকুব করা হল। শাৎলাঁ গাইলেন:

যখন সেদিন আসবে
কোনো পরিবারে শিশুরা
ঘুরবে না খালি পায়ে,
ছেঁড়া ঝুলিঝুলি গায়ে।
প্রত্যেকটি মানুষ পাবে রুটি,
কাজ আর মদ।
বেঁচে থাক কম্যুন,
শিশুরা
বেঁচে থাক, বাঁচুক কম্যুন।

এবার সত্যিই কম্যুনের বাঁচার প্রশ্ন। এবার কেবল বিদেশী শত্রু আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্ন নয়, দেশীয় শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়েরও প্রশ্ন। কম্যুন পারীর শ্রমিক-সৈনিক ও দরিদ্র জনতার অভ্যুত্থান, রাষ্ট্রযন্ত্র দখল। আগের সমস্ত অভ্যুত্থান থেকে পারী কম্যুনের চরিত্রই পৃথক। এই পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই গানেও ধরা পড়ল। সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে অবরুদ্ধ পারীর সবচেয়ে প্রিয় গান ছিল 'লা মার্সেইজ'। একদিন যা ছিল জাতীয় সংগীত, সে গৌরব থেকে নেপোলিয়ন যাকে বঞ্চিত করেছিলেন, পারীর জনতা প্রতিটি অভ্যুত্থানে সে গানই গেয়েছে প্রকাশ্যে। ১৮৭০ সালের জার্মান আক্রমণের পর্বে সেই গান যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, ১৮৭০ সালে যেন ১৭৯৩ সালেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। কিন্তু এবার শত্রু বাইরে ও ভিতরে, এবার শুধুই জাতীয় সংগ্রাম নয়, শ্রেণীসংগ্রাম। এবার তাই আহ্বান

সর্বহারাকে, জাতীয় গৌরব রক্ষার দায়িত্ব তারই। তাই কম্যুন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল নতুন গান : 'কম্যুনের লা মার্সেইজ' :

ফরাসীরা, আর দাস হয়ে থেকো না।
জড়ো হও পতাকার নিচে
পায়ে পায়ে ভাঙো শেকল।
জেগে ওঠো ৮৯!

স্বাধীনতার গান গাও,
পারীকে বাঁচাও।
এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো,
জনগণ পাবে রুটি।

কম্যুনের রক্ষায় ডাক দিয়ে সেনেশাল গাইলেন :

ফ্রান্সের মানুষ, রিপাবলিককে বাঁচাও,
উৎসাহে ছুটে এসো আমাদের ডাকে ;
নিরো পুড়িয়েছিল প্রাচীন শহর,
পারীকে বাঁচাও।

কম্যুন মারাত্মক ভুল করেছিল সরকারী বাহিনীকে বিনা বাধায় পারী ছেড়ে যেতে দিয়ে, তাকে আক্রমণ না করে। তাই প্রথম থেকেই কম্যুনের লড়াই ছিল আত্মরক্ষামূলক, কোনো ক্ষেত্রেই তা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে নি। প্রথম পর্বেই কম্যুন মঁভালেরিয়াঁ দুর্গের দখল বজায় রাখতে পারেনি। কম্যুনের ছিল ২ লক্ষ ন্যাশনাল গার্ড, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যোদ্ধা ছিল হাজার চল্লিশের মতো। ভের্সেই নতুন সৈন্য সংগ্রহ করল চাষীদের মধ্যে থেকে। তাদের উত্তেজিত করা হল এই বলে যে, তাদের দেশপ্রেমিক ভাইরা জার্মানদের বন্দী, সেই সুযোগে গুণ্ডাবদমাশরা পারী দখল করেছে লুটপাট করার জন্যে। তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, পারীর চোর-ডাকাতদের হটাতে পারলে ফৌজী চাকরি পাকা হবে। জার্মানির সমস্ত দাবি মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে বিসমার্ক সমস্ত যুদ্ধবন্দীর মুক্তি দিলেন। ভের্সেই-এর স্মৃতিকথায় লেজ্যঁস দ্যুপঁ লিখেছেন : 'বিজিতদের দাবি হঠাৎ মেনে নেবার জন্যেই, জার্মানি যুদ্ধবন্দীদের আমাদের জন্যে ছেড়ে দিল, নইলে পারীতে ঢুকতে মার্শাল ম্যাক-মোহনের অনেক দেরি হত।' একটি গানেও একথা বলা হয়েছে :

পরম প্রিয় বন্ধু আমার, হে মহাশয় বিসমার্ক,
যে তিন লাখ ফরাসীকে মুক্তি দিলেন আপনি
পারী গুঁড়োতে তাদের আমার দরকার।

ভের্সেই প্রতি-আক্রমণ করল। ২ এপ্রিল কুর্ব-ভোয়াই দখল করে নিল। ভের্সেই-বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে ধাতুশ্রমিক জেনারেল দ্যুভাল দখল করলেন ভিলা-কুবলেই, কিন্তু শাতিঅঁ মালভূমিতে ঘেরাও হয়ে ধরা পড়লেন জেনারেল ভিনোয়ার হাতে। ব্লাঁকিপন্থী এমিল উ্যদের বাহিনী ম্যদঁ দিয়ে বেরিয়ে বেলভ্যুতে পৌঁছে আবার পিছিয়ে গেল। ফ্লুরঁ্যার সহায়তায় বের্জরের কাহিনী ন্যুঈ এবং ই থেকে বেরিয়ে ব্যুজিভাল আক্রমণ করল, কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয়ে পারীর দিকে হটল। এক অফিসারের তলোয়ারের ঘায়ে ফ্লুরঁার মৃত্যু ঘটল। জেনারেল গালিফে যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করলেন। ৫ এপ্রিল কম্যুন ঘোষণা করল: 'ভের্সেই যুদ্ধে ও মানবতায় সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়েছে। ভের্সেই--এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহজনকদের গ্রেপ্তার করা হবে। একটি যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হলে, পাল্টা হিসেবে একজন প্রতিভূকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।' ১৭ থেকে ৩৫ বছরের সকলকে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে ডাক দেওয়া হল।

মে মাসের প্রথম দিকেই ভের্সেই দখল করে নিল ক্লামার, ইসি, ভাঁভ্-এর দুর্গগুলো। ২১ মে রবিবার সকালে ঢুকে পড়ল স্যাঁ-ক্লু্র ফটক দিয়ে। তিয়ের খবর পাঠালেন: 'আমাদের কামানের গোলায় স্যাঁ-ক্লু্র ফটক এইমাত্র গুঁড়িয়ে গেল।' আসলে এক মিউনিসিপাল কর্মী বিশ্বাস-ঘাতকতা করে শাদা রুমাল দেখিয়ে অরক্ষিত অংশ দিয়ে ভের্সেই বাহিনীকে ঢুকিয়েছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে পারীর ১৬ এবং ১৫ নং ব্লক দখল করে নিল।

'রক্তাক্ত সপ্তাহ' শুরু হল ২২ মে থেকে। জুল ভালেস তাঁর 'ক্রি দ্যু প্যপল'-এ লিখলেন: 'আত্মসমর্পণ করার চেয়ে পারী বেছে নিয়েছে যে কোনো পন্থা। মঁতিয়ের যদি কেমিস্ট হন, তাহলে তিনি তা বুঝবেন।' দেলেসক্লুজ জনগণকে ডাক দিলেন: 'বিপ্লবী যুদ্ধের ঘণ্টা বেজেছে। নাগরিকরা অস্ত্র ধরো।' ভের্সেই বাহিনী এগিয়ে এলো স্যাঁ-লাজার, পালে-বুরবঁ, মঁ-পারনাস রেল স্টেশন পর্যন্ত, তেমন কোনো প্রতিরোধের মুখে পড়ল না। একমাত্র ২৩ মে প্রতিরোধ প্রচণ্ড হল পাঁচশো ব্যারিকেডে ঘেরা এলাকায়, লড়াই হল রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে।

মঁমার্ত্র, বাতিঞেলের পতন হল। লড়াই শুরু হল তুইয়েরিকে ঘিরে।

আগুন লাগল তুইয়েরিতে, পালে দ্য জুসতিস, প্রেফেকত দ্য পোলিস, ওতেল-দ্য-ভিল, পালে দ্য লেজিয় দ্যনর এবং কুর দে কঁৎ-এ। দেলেসক্লুজ ঘোষণা করলেন: 'সেভানের চেয়ে মস্কো ভালো।' ২৪ মে পারীর আর্কবিশপসহ বেশ কয়েকজন নামকরা বন্দী জেলের মধ্যে নিহত হল। ২৫ মে কম্যুনের হাতে রইল আগুনে ঝলসানো পারীর মাত্র পূর্ব প্রান্ত। প্রচণ্ড লড়াই হল শাতো-দো, বাস্তিই-এ। বুলভার ভলতের-এর এক ব্যারিকেডে শত্রুর বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিলেন দেলেসক্লুজ। ২৬ মে শুক্রবার কম্যুনের যোদ্ধারা কোণঠাসা হল বেলভিল, শারোন, লা ভিলেতে, হাতে রইল মাত্র দুটি ব্লক ১৪ আর ২০ নং, আর ২১ নম্বরের একটা অংশ। ২৭ মে শনিবার বুৎ-শোমঁ-র পতন হল। শেষ লড়াই হল পের-লাশেজ কবরখানায়, বৃষ্টির মধ্যে, কবরের প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াই। ২৮ মে রবিবার রাঁপনোর শেষ ব্যারিকেডের পতন হল।

কম্যুনের গ্যারিবল্ডিপন্থী পোলিশ জেনারেল জারোস্লাভ দমব্রস্কি ২৩ মে নিহত হয়েছিলেন মীরার ব্যারিকেডে। বন্দী অবস্থায় পথেই হত্যা করা হল মিলিয়েরকে, ভারলঁ্যাকে মারা হল ব্যু দে রজিয়ে-র। বন্দীদের মধ্যে রিগোকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হল, তাঁর মৃতদেহ সারাদিন পড়ে রইল রাস্তায়। ভের্সেই বাহিনীর হাতে পড়ল শ-খানেক কামান আর ৪ লক্ষ বন্দুক। ২৮ মে জেনারেল ম্যাক-মোহন সদম্ভ ঘোষণা করলেন: 'যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা, কাজকর্ম এবং নিরাপত্তার নতুন জন্ম হতে চলেছে।'

কম্যুন পরাভূত হল। তার পর শুরু হল প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহ প্রতিহিংসা। ১৭ হাজার বন্দীকে বিনা বিচারে গুলি করে মারা হল। জেনারেল গালিফে পাকাচুল বন্দীদের আলাদা করে নিলেন, বললেন: 'তোমরা ১৮৪৮ দেখেছ, তাই অন্যের চেয়ে তোমরাই বেশি দাগী।' তাদের সবাইকে গুলি করে মারা হল। যাদের হাতই কালো দেখলেন, তা সে বারুদেই হোক কি অন্য যে কোনো কারণেই হোক, গুলি করে মারলেন। একটি গানের কলি:

দেয়ালে দাঁড়াও!
ক্যাপ্টেনের মুখে বুলি,
মদ গিলিছে ঢক ঢক করে,

মদ খেয়ে চুর,
দেয়ালে দাঁড়াও।

তথাকথিত 'কঁসেই দ্য গ্যের' মৃত্যুদণ্ডসহ শাস্তি দিল ১৪ হাজার বন্দীর। তেওফিল ফেরে এবং নাতানিয়েল রসেল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পারীর মৃত্যুসংখ্যা হল সবশুদ্ধ ৩০ হাজার। তিয়ের প্রিফেক্টদের জানালেন: 'মৃতদেহে মাটি ঢাকা পড়েছে, এই ভয়াবহ দৃশ্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে।'

গতিয়ে, ক্লেমঁ, শাৎলঁ্যা তখনো পারীতে আত্মগোপন করে। ক্লেমঁ লিখেছেন: 'পারীতে যেখানে আমাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, ২৯ মে থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত রোজ রাত্রে শুনতাম গুলির আওয়াজ, গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, নারীশিশু আর্তনাদ করছে। তা ছিল বিজয়ী প্রতিক্রিয়া, যা নিধনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আবার ক্রোধ ও বেদনা এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যা সংগ্রামের সুদীর্ঘ দিনগুলোতেও কখনো অনুভব করি নি।' এই পরিস্থিতির মধ্যে ক্লেমঁ লিখলেন: 'রক্তাক্ত সপ্তাহ', তাতে কিন্তু আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠল বেদনার পরিবর্তে ভবিষ্যতেরই প্রত্যয়:

শুধু ঘুরছে পুলিশ আর গুপ্তচর,
চোখের জলে-ভাসা বৃদ্ধরা ছাড়া
আর কোনো লোক নেই রাস্তায়,
শুধু বিধবা আর অনাথ শিশুরা।
দুর্দশা উপচে পড়ছে পারীর।
যারা সুখী তারাও কাঁপছে,
পায়ে চলা সব পথ রক্তে ভেজা।

(ধুয়া)

তা ঠিক, কিন্তু...
এ অস্তিত্ব টলাতে চায়।
এ দুর্দিনেরও একদিন শেষ হবে,
খেয়াল রেখো প্রতিশোধের
যখন সমস্ত গরিবরা তা ফিরিয়ে দেবে।
ওরা খুঁজে বার করছে, শেকল পরাচ্ছে, গুলি করছে
যাদের জড়ো করছে এলোমেলো:
'মেয়ের পাশে মা, বুড়োর কোলে শিশু।

লাল ঝাণ্ডার চাবুকের জায়গা নিয়েছে আজ
অন্ধকারের জীব, রাজার সেবাদাস,
আর সম্রাটের সন্ত্রাস।

(ধুয়া)

তা ঠিক, কিন্তু...
এ অস্তিত্ব টলাতে চায়।
এ দুর্দিনেরও একদিন শেষ হবে,
খেয়াল রেখো প্রতিশোধের
যখন সমস্ত গরিবরা তা ফিরিয়ে দেবে।

আর জুন মাসেই আত্মগোপনকারী পতিয়ে লিখলেন একটি গান, যা মানুষের গানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। কম্যুন প্রমাণ করেছিল বিদেশী শত্রু আর স্বদেশী শত্রু সমগোত্রের, স্বদেশের সর্বহারার বিরুদ্ধে তারা এক। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত থাকবে ঠিকই, কিন্তু তা কি বারবার পারীর ব্যারিকেডেই থেমে থাকবে? পারী কম্যুন কি শুধু পারীরই কম্যুন হয়ে থাকবে? পতিয়ে লিখলেন: 'ইনটারন্যাশনাল'। পারী কম্যুনই ইঙ্গিত দিয়েছে 'শেষ যুদ্ধের', সেই শেষ যুদ্ধের গান শুধু পারীই গাইবে না, গাইবে দুনিয়ার সমস্ত 'অনশন বন্দীরা', দুনিয়ার সমস্ত অভিশপ্তরা এক জাত হবে—সে 'মানবজাত'।

ওঠো, ওঠো দুনিয়ার যত অভিশপ্তের দল!
ওঠো, ওঠো অনশন বন্দীর দল!
যুক্তি গর্জন করছে তার অগ্নি-গহ্বরে,
এ সব কিছু শেষ করার বিস্ফোরণ।
একেবারে সাফ করে দেব অতীতকে,
ওঠো, ওঠো ক্রীতদাসের দল!
ভিত্তিমূল থেকেই বদলাবে দুনিয়া:
আমরা কিছুই না, আমরাই হব সব।

(ধুয়া)

শেষ যুদ্ধ আজ, দল বাঁধো দল
আর আগামী কাল
মানবজাত হবে ইন্টারন্যাশনাল।*

* ধুয়ার ৪ লাইনের স্তবকটি বাদেই গানটিতে ৬টি স্তবক, প্রতি স্তবক ৮ লাইনের।

পত্তিয়ে মার্কসকে জানতেন না।

পত্তিয়ে, ক্লেমঁাকে দেশ ছাড়তে হল। শাৎলঁ্যা নির্বাসিত হলেন। অন্যরা আশ্রয় নিলেন সুইজারল্যাণ্ডে, বেলজিয়ামে। কিন্তু তাঁদের গান থামল না। জেলখানায় বসেই ক্লভিস উ্যগ্যু লিখলেন :

যে রক্ত বয়ে চলেছে, টগবগ করছে
তার নামে,
দরজায় আঘাত করছে যে বাতাস
তার নামে,
নির্বাসন যাদের ছিনিয়ে নিল
তাদের নামে,
ওঠো, ওঠো, ওঠো!
আমাদের মৃতদের প্রতিশোধ নাও। (ধুয়া)

... ...

হৃদয়ের কপাট খুলছে, প্রভাত নামছে
গৃহযুদ্ধের কঙ্কালের স্তূপে ;
চেতনা দানা বেঁধেছিল রক্তে
সে রক্ত গড়িয়ে গেছে রাস্তায় রাস্তায়,
আলোর অভিবাদন করি কবুতরের ঝাঁকের
নিষ্পাপ ফিরে আসা।

... ...

ওঠো, ওঠো, ওঠো !
তোমাকে আশীর্বাদ করি, হে হতভাগ্য মৃত।

শাৎলঁ্যা লিখলেন : '১৮৭১-এর নির্বাসিত' :

আমি লড়েছি আমার চিন্তার জন্যে,
ন্যায়বিচার আর অবিচারের জন্যে,
লড়েছি স্বার্থপর জনতার বিরুদ্ধে
যাদের মূলধনই হচ্ছে রাজা।
আমি ভেবেছি পুরনো সমাজের
অপরাধের বিরুদ্ধে
যে শহীদ করে তোলে তার বলিকে
সম্পত্তির নামে।

প্রথম এ্যামনেষ্টি ঘোষণা হল ১৮৭৯ সালে। আর সেই বছরেই মার্সেই-এর কংগ্রেসে গঠিত হল ফ্রান্সের প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। ফিরে-আসা নির্বাসিত বন্ধুদের সঙ্গে সকলে মিলিত হলেন ফ্লুর্‌রার সমাধিতে ৩ এপ্রিল। ২৩ মে আবার সমবেত হলেন সেই শারোনের দেয়ালের সামনে। পতিয়ে গাইলেন :

এই তো সেই শারোনের দেয়াল
মে মাসের পরাজিতদের হাড়গোড়ের স্তূপ ,
প্রতি বছর নিরস্ত্র পারী
এখানে তার মুকুট নামায়।

... ...

মজুরের জাতের মধ্যে—
তোর লুটেরা রক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া—
কজন নারী শিশু আর বৃদ্ধ আছে,
যাদের দুঃখ মেশিনগানের জন্যে ?

কোনটা ভালো : পিঠ কুঁজো হয়ে
দাসত্বে গুমরে মরা—
অসম্মানে, উপবাসে, বিনা আস্তানায়—
না কি এইখানে
হাড়গুলো রাখা

(ধুয়া)

বুর্জোয়া, তোর ইতিহাস,
লেখা রইল এই দেয়ালে,
সেটা অজানা কোনো পাঠ্যবস্তু নয়,
তোর হিংস্র ভণ্ডামি লেখা রইল
এই দেয়ালে।

পতিয়ে গানটি উৎসর্গ করেছিলেন সেভ্‌রিনের নামে। শারোনের দেয়াল হয়ে উঠেছিল কম্যুনের প্রতীক। বহু গান লেখা হয়েছিল এই দেয়ালকে উদ্দেশ করে। জুল জুই লিখেছিলেন :

পারী যখন চোখের পাতা বোজে,
রোজ রাতে, ওই অন্ধকার গণ্ডীতে,

গুমরানি ওঠে দেয়ালের পাথরে পাথরে।
খুনীর দল ভবিষ্যতকে তোরা ডরাস!
বিদ্রোহ নতুন করে সবুজ করছে,
এই মাটিতে, প্রতিটি মৃতদেহ থেকে
স্মৃতির ঘাস উঠছে উৎসারিত হয়ে,
তার মুকুটের বিদ্রূপ জাগানো ফুলকারি।
ভবিষ্যতে গুলিতে মরবে যে দামাল কিশোর
এখানে লিখছে ফাঁত্রনের কথা,
পরে যা চিৎকার করে উঠবে:
বুর্জোয়া, যখন প্রতিশোধের গম
ওই কবরগুলোয় পেকে উঠবে
তোদের ফ্যাকাশে মুখগুলো
কাস্তেয় কাটা হবে ওই দেয়ালে।

১৮৮৫ সালে ওই দেয়ালের সামনেই পুলিশ আক্রমণ করেছিল শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত জনতাকে। পতিয়ে গর্জন করে উঠেছিলেন:

খুন করছে, খুন!
বাঘ ছাড়া পেয়েছে, চোখের সামনে
পুলিশ ছুটছে তলোয়ার হাতে। খুন!
তাড়া করছে, ঘুরছে, থেমে পড়ছে,
মানুষ মারছে পিটিয়ে
ফুর্তি জেগেছে বেয়নেটে।
পাগলা ঘণ্টি বাজাও! কম্যুন!
খুন করছে, খুন!

ফ্রান্সে ফিরে এসে পতিয়ে এবং ক্লেমঁা দুজনের মনেই সাময়িক নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল। ইংলণ্ডে নির্বাসনকালে চরম দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যেও তাঁদের মনের আগুন নেভেনি। কিন্তু দেশে ফেরার পর পরাজিত কম্যুনের প্রত্যক্ষতায়—হাজার হাজার মৃত্যুর স্মৃতিতে তাঁরা কেমন যেন সাময়িক অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ক্লেমঁা গান লিখেছিলেন: 'এসব কিছুই মধুর নয়':

দু দুবার আমি দেখেছি ব্যারিকেড,
তিনটে বিরাট বিপ্লব,
আমি দেখেছি সাথীরা

লড়াই করেছে সিংহের মতো ;
হাড়ভাঙা খেটে গেছি, ছুটি নেই, রবিবার নেই,
রোদে শীতে, সব সময়,
আর এই ষাট বছর বয়সে
ঘরে আনতে পারি নি এক টুকরো রুটি।

এ সব কিছুই মধুর নয়,
হায়রে! আমি কী ক্লান্ত!

পত্তিয়ে লিখেছিলেন : 'জঁা মিজের' :

একদিন আলোকিত হয়ে উঠেছিল স্বর্গ,
অন্ধ কুঠুরিতে ঝলমল করেছিল সূর্য,
আমি তুলে নিয়েছিলাম এক বিদ্রোহীর বন্দুক,
আমি পেছনে চলেছিলাম লাল ঝাণ্ডার।
আহা! তবু…
এর কি শেষ হবে না কখনো?

হাজারে হাজারে আমাদের গাদা করেছিল
চাঁদের আলোয় সে কী বীভৎস ভয়াবহ,
গাদা থেকে যখন টেনে বার করেছিল
চিৎকার করেছিলাম : দীর্ঘজীবী হোক কম্যুন।
আহা! তবু…
এর কি শেষ হবে না কখনো?

পত্তিয়ের মৃত্যু হয় ১৮৮৭ সালে। ১৮৭৯ সালেই ফরাসী রিপাবলিক 'লা মার্সেইজ'-কে জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকার করে নিয়েছিল। যে 'লা মার্সেইজ' ১৭৯৩ থেকে বিপ্লবের গান, নেপোলিয়ন ও রাজতন্ত্র তাকে জাতীয় গৌরবের আসন থেকে বঞ্চিত করলেও, তা ১৮৮০, ১৮৪৮, ১৮৭০-৭১-এর ব্যারিকেডের গান হয়েই ছিল। এবার নতুন শাসকশ্রেণী তাকে অভিজাতের সম্পত্তি করে তুলতে চাইল। রাজতন্ত্রী ও বোনাপার্টিস্টরা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিল : 'ওই গান দিয়ে ওরা কম্যুন করেছিল, ওই গান দিয়েই ওরা নতুন কম্যুন করবে।' কিন্তু নতুন কম্যুন গড়ার গান আর 'লা মার্সেইজ' রইল না। ফ্রান্সের মজুর শ্রেণী নতুন কম্যুন গড়ার নতুন গান

বেছে নিল পতিয়ের 'ইনটারন্যাশনাল'—যার জন্ম পারীর রক্তাক্ত কম্যুনের গর্ভ থেকে। আট বছর পরে ১৮৮৭ সালে সরকারী নির্দেশে আঁত্রোয়াজ তম্মা কেটেছেঁটে 'লা মার্সেইজ'-এর একটি সরকারী সংস্করণ তৈরি করলেন। আর তার পরের বছর ১৮৮৮ সালে ফিভ্-লিলের মজুর পিয়ের দগেতে সুর দিলেন 'ইনটারন্যাশনাল'-এর। বিপ্লবের ঐতিহাসিকতা পূর্ণ হল: ১৭৯৩ সাল ১৮৭১ সালকে অঙ্গীকার করে আগমনী হয়ে উঠল ১৯১৭ সালের। এ গানের সুর পতিয়ে শুনে যান নি। কিন্তু তিনি নিজেই গেয়ে গেছেন কম্যুনের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে:

> পরম প্রিয় স্মৃতি আমরা জ্বালিয়ে রাখবো!
> ইতিহাসে এর কোনো তুলনা নেই;
> আর যে আগামীকাল দেখতে পাচ্ছি,
> ১৮ মার্চ তারই উপক্রমণিকা।

পতিয়ে শুনে গিয়েছিলেন পল ব্রুসের 'লাল ঝাণ্ডার গান':

> দেখো দেখো, তাকিয়ে দেখো!
> উড়ছে, পৎপৎ করছে গর্বভরে,
> ভাঁজে ভাঁজে ওর প্রস্তুত সংগ্রাম;
> স্পর্ধা থাকে তো প্রতিদ্বন্দ্ব জানাও
> আমাদের মহিমান্বিত লাল ঝাণ্ডাকে,
> শ্রমিকের রক্তে রক্তে লাল।

কম্যুনের আগে ক্লেমঁা একটি গান লিখেছিলেন। গানটি প্রেমের, তার তিনটি স্তবক: 'ল্য তঁ দে সেরিজ'—'চেরির কাল', বসন্তের গান:

> যখন আমরা পৌঁছুব চেরির কালে,
> মাতোয়ারা নাইটিঙ্গেল আর ব্ল্যাকবার্ড উৎসবে মাতবে,
> সুন্দরীদের মাথায় জাগবে পাগলামি,
> প্রেমিকের হৃদয়ে ঝলসাবে রোদ।
> যখন আমরা পৌঁছুব চেরির কালে,
> মিঠে শিস দিয়ে গাইবে ব্ল্যাকবার্ড।

সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে এ গান গাওয়া হয়েছে কম্যুনের ব্যারিকেডে। কম্যুনের পতনের পর পারীতে ও নির্বাসনে যখনই এ গান গাওয়া হত, চেরির কালই কম্যুনের কাল হয়ে উঠত শ্রোতার কাছে। রক্তের কৌটার

মতো লাল চেরি মনে পড়িয়ে দিত কম্যুন আর লাল পতাকাকে। দ্বিতীয় স্তবক :

কিন্তু বড়োই স্বল্পায়ু যে চেরির কাল,
যখন দু-জনে মিলে কুড়াতে যায়
কানের দুলের স্বপ্ন দেখে,
প্রেমের চেরি একই বেশবাসে,
পাতার নিচে ঝরে রক্তের ফোঁটার মতো।
কিন্তু বড়োই স্বল্পায়ু যে চেরির কাল,
প্রবালের দুল, কুড়ায় যা স্বপ্ন দেখে।

চেরির কাল দ্রুত চলে যায়, যেমন দ্রুত চলে গেছে কম্যুনের কাল। স্বপ্নে দেখা রক্তের ফোঁটার মতো লাল, প্রবালের মতো লাল দয়িতার কানের দুল পাতার আড়ালে হারিয়ে যায়। তৃতীয় স্তবকে তিনি গেয়েছিলেন :

যখন আবার পৌছব চেরির কালে,
যদি প্রেমের দুঃখের ভয় করো
সুন্দরীদের এড়িয়ে এসো!
আমি ভয় পাই না নিষ্ঠুর বেদনাকে,
যন্ত্রণা না সয়ে আমার একটি দিনও কাটবে না।
যখন আবার পৌঁছুবো চেরির কালে
তুমি পাবে প্রেমের বেদনাকেও।

শ্রোতা জানত এ গান যিনি গেয়েছেন তিনি শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন কম্যুনের ব্যারিকেডের পাশে। চেরির কাল স্বল্পায়ু হলেও আবার সে কাল ফিরে আসবে; প্রেমের বেদনাকে বহন করে তারই প্রতীক্ষা।

১৮৮৫ সালে ক্লেমাঁ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর গানের সংকলন, আর তখন 'চেরির কাল' গানটিতে যোগ করেছিলেন চতুর্থ স্তবকটি। তাঁর প্রতীক্ষা, তাঁর প্রত্যাশা, তাঁর সারা জীবনের সংগ্রাম ট্রাজিক মাধুর্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে শেষ স্তবকটিতে :

আমি চিরকাল ভালোবাসব চেরির কাল,
সেই কালের জন্যেই হৃদয়ে বয়ে চলেছি
এক উন্মুক্ত ক্ষত,
সৌভাগ্যদেবী যদি স্বয়ং প্রসন্নাও হন,

শান্ত করতে পারবেন না আমার শোক,
আমি চিরকাল ভালোবাসব চেরির কাল
আর সেই স্মৃতি যা বয়ে চলেছি হৃদয়ে।

ক্লেমঁা গানটি উৎসর্গ করেছিলেন একটি তরুণীর উদ্দেশে, ২৮ মে রবিবার র‍্যু-ফঁতেন-ও-রোয়ার শেষ ব্যারিকেডে তরুণীটি এসেছিল আহতদের পরিচর্যা করতে। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন: 'আমরা শুধু জানতাম তার নাম ছিল লুইজ, আর সে ছিল মজুরের মেয়ে। স্বাভাবিকভাবেই তো সে বিদ্রোহী আর ক্লান্ত-জীবন মানুষদের সঙ্গিনী হবে। কী হল তার? আরো অনেকের সঙ্গে তাকেও কি গুলি করে মেরেছিল ভেসেঁইর?'

পারী কম্যুনের গানের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না যদি কম্যুনবিরোধী গানের সম্পর্কে কিছু না বলা হয়। প্রতিক্রিয়ার অর্থপুষ্ট কলমধারী চিরকালই থাকে, বিপ্লবের উত্থান পতনের সঙ্গে অনেক কলমধারী রং পাল্টায়, আর থাকে কিছু অন্ধ স্তাবক। পারী কম্যুনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। যে সেনেশাল কম্যুনের জন্মমুহূর্তে লিখেছিলেন:

নগদ চাঁদির আওয়াজে তাল রেখে ওরা বলে:
কম্যুন চায় ভাগ করে নিতে তোমার সম্পত্তি, টাকা।
বিদ্বেষের প্রেরণায় এইসব কাগজ মিথ্যে বলে,
আমাদের একমাত্র কামনা স্বৈরতন্ত্রকে হটাবো,
কাঞ্চনমূল্যে যে বেচে দিয়েছে দেশ।
তরুণ রিপাবলিককে গলা কাটবে পণ করেছে,
ধ্বংস করবে পারী।

কম্যুন পরাভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভোল পালটে গেল, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনি বললেন:

এই তো তোর ফলাফল রক্তখেকো কম্যুন,
হ্যাঁ,...তুই চেয়েছিলি ধ্বংস করবি পারী।
ভণ্ড ডাকাতের দল খোয়াব দেখেছিলি আমাদের সম্পত্তির।
হ্যাঁ,...তোরা চেয়েছিলি ধ্বংস করবি পারী।

কম্যুনের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ: কম্যুন আগুন লাগিয়েছে, ভাঁদমের স্মৃতিচিহ্ন ভেঙেছে, আর্কবিশপকে খুন করেছে। এবার তাদের উপর আর্কেঞ্জেলের তরবারি নেমে এসেছে। আগুনে পুড়িয়ে মারার ভয়াবহ

কাহিনী বেরুল গদ্যে পদ্যে। এক অজ্ঞাতনামা গীতিকার কম্যুনের অপরাধের ফিরিস্তি দিতে শুরু করেছেন এই ভাবে :

ইউরোপের মানুষ কেঁপে ওঠো,
আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষও কাঁপো,
যে কাহিনী আজ শোনাতে চাই
তা বানানো কোনো গপ্পো নয়,
তা খুনে ডাকাতদের কাহিনী
পারীর কম্যুনের কাহিনী।

ছোটো জাতের ছোটো লোকেরা
শাসন করতে লোভী ছিল,
ভয় দেখিয়ে ঘুস দিয়ে ভুল বোঝাল মানুষকে,
কাজ গোছাতে কেইনরা
নাম নিয়েছিল রিপাবলিকের।

ওরা মন্ত্রীদের বাড়ি পুড়িয়েছে, লুটপাট করেছে, চুরি করেছে, সব কিছু ধ্বংস করেছে। হঠাৎ তারা বড় লোক বনেছে পরের সম্পত্তি লুট করে। ওরা বাকি বাড়ি ভাড়া ফাঁকি দিতে চেয়েছে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে ওরা হাজার হাজার হতভাগাকে দলে টেনেছে, ওদের ভয়ে, রুটির লোভে তারা যোগ দিয়েছে ওদের দলে। ইতিহাসে এ হেন শয়তানের দলের নজির নেই। ওরা গির্জা অপবিত্র করেছে, পাদ্রী-পুরুতদের খুন করেছে। এবার আইন শৃঙ্খলার রাজত্ব ফিরে এসেছে :

কী লজ্জা কী লজ্জা ফ্রান্সের
এক দঙ্গল বদমাইসের হাতে পড়েছিল!
ওরা চেয়েছিল ফ্রান্সের অবক্ষয়।
হে ফ্রান্স, হে মহান দেশ!
তোমার সে শত্রুরা আর নেই।
আমাদের বীর সেনাবাহিনীই
বাঁচিয়েছে তাদের মুঠো থেকে।
সাহসী সেনাদের সাধুবাদ দাও
ওরা না থাকলে এতদিনে ধ্বংস হতে।

তারপর আবার অপরাধের আর এক দফা ফিরিস্তির পর :

ওরা উড়িয়েছিল লাল ঝাণ্ডা,
ওই নামী লোকের রক্ত খেকোরা,
ওই লুটেরা, ওই সব-হাতানোর দল,
যাদের বেশির ভাগই
বেরিয়েছিল বস্তির খোঁয়াড় থেকে।
ওই খ্যাপা বাঘের দল
সর্বত্র ছড়িয়েছিল বিভীষিকা।

ওদের মতবাদ ভালো করেই জানা।
সেটা হচ্ছে : 'পরিবার নেই, ভগবান নেই !'
খুন করা আর আগুন লাগানো,
বিনা লজ্জায়, বিনা দ্বিধায়।
এই তো ছিল ডাকাতগুলোর লক্ষ্য
যারা ধ্বংস করেছিল পারী।

পরিশেষে অজ্ঞাত গীতিকার গম্ভীরভাবে ভরতবাক্য উচ্চারণ করেছেন :

আগেই হোক পরেই হোক, ন্যায়ের ভগবান
মানুষকে যিনি পাহারা দেন,
হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেন,
তাদের ছুঁড়ে ফেলেন অতল খাদে
সেখানে অনন্তকাল কাঁদে
মানুষের শত্রুরা।

গীতিকারের দুর্ভাগ্য তাঁর এ গানের শ্রোতা জোটে নি সেদিন, সমকালীন ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ দেওয়া যায়। সেদিন পরাভূত পারী গেয়েছে শাৎর্ল্যার গান, ক্লেমাঁর গান, গলা মিলিয়েছে পতিয়ের সঙ্গে :

কম্যুনের জন্যে লড়তে গিয়ে
জেনেছে : মাটি একটাই,
তাকে ভাগ করা চলবে না,
প্রকৃতি একই উৎস,
মূলধনের একটিই ভাণ্ডার

সবারই তাতে খরচের অধিকার।

...   .

তোমার সামনে, আদিম দুর্দশা
তোমার সামনে, কুঁজো-করা দাসত্ব
বিদ্রোহী,
উঠে দাঁড়ায় গুলিভরা বন্দুক হাতে।

বিদ্রোহী যে তার সত্যিকারের নামই তো মানুষ।

প্রবন্ধের গানগুলোর জন্যে Georges Coulonges-এর গ্রন্থ La Commune en Chantant এবং পারী কমুানের তথ্যাদির জন্যে Maurice Baumont-এর La folle tragédie de la Commune (Historia, Hors Serie No. 36) প্রবন্ধের কাছে ঋণী।

কবিয়াল প্রসঙ্গে

শেখ গুমানী দেওয়ান / হরিচরণ আচার্য / নকুলেশ্বর সরকার

দীনেশচন্দ্র সিংহ

'পরিচয়' ৪৬ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৮৩/ডিসেম্বর ১৯৭৬) 'বিয়োগপঞ্জী' কলমে শেখ গুমানী দেওয়ান প্রসঙ্গে রবীন্দ্র মজুমদার লিখেছেন "শেষ পর্যন্ত গত ৯ই মে ১৯৭৬, প্রায় একাশি বছর বয়সে তিনি প্রয়াণ করেছেন পদ্মশ্রী খেতাব, তাম্রপত্র বা অকাদেমি পুরস্কারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। কবি গুমানীর এই অবহেলিত মৃত্যু যথারীতি আমাদের আত্মবিস্মৃতিপরায়ণ জাতীয় চরিত্রকে আরেকবার শোচনীয়ভাবে প্রমাণিত করেছে।"

ঠিক দুই বছর পর আবার 'পরিচয়' ৪৮ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৮৫/ ডিসেম্বর ১৯৭৮) 'কর্ণফুলীর কবিয়াল' প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র শীল সম্পর্কে সাধন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "এই মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশ রমেশচন্দ্র শীলের শততম জন্মবর্ষে তাঁর স্মৃতিকে কতটুকু মর্যাদা দিয়েছেন জানি না। পশ্চিমবঙ্গের স্মৃতির দুয়ার কতটা উন্মুক্ত তাও অজ্ঞাত।'

লোককবিদের নিয়ে আলোচনা, তাদের উপেক্ষায় ক্ষোভ প্রকাশ একমাত্র 'পরিচয়' ছাড়া আর কোনো পত্র পত্রিকায় তেমন চোখে পড়ে না। রমেশ শীল প্রগতিশীল আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হেতু কিছুটা প্রচার পেয়েছেন। আর ১৯৪৫ সালে ফ্যাসি-বিরোধী সাহিত্য-শিল্পী সম্মেলনে রমেশ শীলের প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল রূপে গুমানী দেওয়ানের নামও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। অথচ এঁদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর গুণের অধিকারী

হওয়া সত্ত্বেও বহু কবিয়াল লোকলোচনের অন্তরালে রয়ে গেছেন শুধুমাত্র প্রচারের অভাবে।

রমেশ শীল ও শেখ গুমানী ব্যতীত আর কোনো কবিয়ালের জন্ম শত-বার্ষিকী তো দূরের কথা জীবিত বা মৃত্যাবস্থায় তাঁদের নিয়ে কোনো আলোচনা পর্যন্ত হয় নি। সাধন দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ, তিনি রমেশ শীল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হরিচরণ আচার্য সম্বন্ধে দু-চার কথা বলেছেন। হরিচরণ আচার্য পূর্ববঙ্গের কবিগানের লোকোত্তর পুরুষ। তাঁর কবি-প্রতিভা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ লোকজন যেমন কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে খনার বচন প্রবাদবাক্য আওড়ায় তেমনি পূর্ববঙ্গের সাধারণ নরনারী আলাপ-আলোচনার মাঝে মনুষ্য সমাজ ও মানব চরিত্র সম্পর্কে রচিত হরি আচার্যের ছড়া বা গানের কলি উল্লেখ করত। সাধনবাবু নিজেই যে এ বক্তব্যের সাক্ষী তা তার বক্তব্যেই বোঝা যায়,—"আমার বাল্য-কালের অভিভাবিকা আমার পিতামহীর মুখে হরিচরণ আচার্যি মশাইয়ের গান শুনেছি।"

গাঙ্গেয় উপত্যকায় ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে কবিগানের সৃষ্টি এবং কলিকাতার উন্নতির সাথে সাথে তার প্রতিপত্তিলাভ ঘটে। ক্রমে বিদেশী শিক্ষা প্রসার ও আমোদ-প্রমোদের নতুন নতুন চটকদার উপকরণের আমদানির ফলে কবিগান জন্মস্থান থেকে প্রায় উচ্ছেদ হয়ে মুর্শিদাবাদ-বীরভূম এলাকায় রূপান্তরে ও ক্ষীণ কলেবরে আত্মরক্ষা করল। সময়স্রোতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কবিগানে আকৃতি-প্রকৃতি ও পরিবেশনগত বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা দেখা দেয়। এ সম্পর্কে গুমানী সাহেব ৯।৬।৬৯ তারিখে এক চিঠিতে আমাকে লেখেন—"কবিগান সত্যই টপ্পা, আসর বিষয়ের গান, ছড়া পাঁচালীতে পূর্ণতা লাভ করে, অতিরিক্ত ভৈরবী, প্রভাতী, গোষ্ঠ, সখী-সংবাদ প্রভৃতিতে জড়া ছিল। উহা পূর্ববঙ্গে গায়কগণ এখনো রেখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সেটি আর নাই।"

নাগরিক সংস্কৃতির ছায়া থেকে সুদূর অবস্থিতির ফলে পূর্ববঙ্গে কবিগান সুদীর্ঘকাল সগৌরবে প্রচলিত রইল। কিন্তু কালক্রমে তার দেহে অবক্ষয়ের চিহ্নসকল ফুটে উঠলে কবিগান ভদ্রসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হলো। তার পতিতাবস্থার কবিগানে হরিচরণের আত্মপ্রকাশ। প্রাক-আচার্য কবিগানের অবস্থা ও হরিচরণের হাতে তার সংস্কার বর্তমানে বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকারের (বরিশাল-ঝালকাঠি, জন্ম ১৩০১) মুখেই শোনা যাক :

১। পূর্ববঙ্গ কবির ক্ষেত্র — সরস্বতীর বরপুত্র
কবিগান দিবারাত্র — মজায় সবার মন।
তার ভিতরে সর্বপূজ্য — নরসিংদীর হরি আচার্য
অভিনব কবির রাজ্য — করেছেন পত্তন ॥

২। পূর্ববর্তী কবি যারা — আদিরসের ভক্ত তারা
শ-কার ব-কার বাক্য ছাড়া — চায়না তাদের মন।
মায়ে-ঝিয়ে পিতা-পুত্রে — সকলে মিলে একত্রে
যেত না সে কবির ক্ষেত্রে — শুনতে কবিগান ॥

৩। ছাড়া ভিটায় বটের তলা — নয়তো কোন শ্মশান খোলা
বসাত এই কবির মেলা — ধনীরা সকল।
বিছানা দেয় না কবিরে — ধুলা-কাদা মাটির পরে
বসে পড়তো পাছা গেড়ে — খেউড় কবির দল ॥

৪। কবির যখন এই অবস্থা — করতে একটা সুব্যবস্থা
ধরলেন একটা সরল রাস্তা — আচার্য রতন।
ছিঁড়ে ফেলে খেউড়ের খাতা — ভারত পুরাণ চণ্ডী গীতা
হরি-কথা কৃষ্ণ-কথা — জুড়িলেন কীর্তন ॥

৫। দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে — রসাল ছন্দে রসাল সুরে
রসাল কথা কীর্তন করে — মজায় শ্রোতার মন।
মিষ্টি মধুর সন্ধান পেলে — মন যায় কি বাঘা তেঁতুলে
খেউড় কবি গেল ভুলে — যত শ্রোতাগণ ॥

৬। গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার বাক্যে — দাঁড়ায়ে কবির সপক্ষে
আচার্য দেব শ্মশান বৃক্ষে — পারিজাত ফোটায়।
ঘৃণ্য কবি সসম্মানে — স্থান পেল উচ্চ আসনে
মাটির কবি টেনে এনে — পাটিতে ওঠায় ॥

ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার সাথে সাথে হরিচরণ দেশ-মানুষ-সমাজ এবং প্রাকৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সকল প্রসঙ্গই কবিগানের আসরে টেনে আনলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : "কবিগানের 'সরকারগণ' সাধারণ ব্যক্তি। যারা আমাদের গান শুনতে আসেন তারাও সরল-সোজা সাধারণ ব্যক্তি। তারা দারিদ্র্য হতাশা অভাব অনটন অশিক্ষা কু-শিক্ষার নিত্য

শিকার। তাদের মূক মুখে ভাষা ফোটে না, নিজেদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা চুপচাপ সয়ে যায়। তাদের ব্যথা-বেদনার ভাষা যদি আমাদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে তাহলে কবিগানের প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা তো আছেই, তৎসহ দরদও জাগবে। পূর্ববঙ্গে মরা কবিগান এসব কারণেই আবার পুনর্জীবন লাভ করেছে।" (দ্রঃ কবিয়াল : কবিগান)

ধর্মীয় বর্মাচ্ছাদিত কবিগানে জনজীবনের পদধ্বনি এমন সুন্দর ভাবে আচার্য কর্তা মিলিয়ে দিলেন যে পূর্ববঙ্গের সাধারণ নরনারী কথাপ্রসঙ্গে 'হরি আচার্য কইছে' বলে তাঁর গানের কলি বা ছড়ার অংশ 'কোট' করত। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, শিক্ষিত বেকার, ঝড়-তুফান, বিবাহে পণ-প্রথা, বিধবা-বিবাহ, বৃদ্ধের পুনর্বিবাহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলিম মিলন, চাষীর শত্রু কচুরিপানা, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, জাতীয় জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, সিগারেট খাওয়া ও ফুটবল খেলার প্রবর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি সরস গান রচনা করেছেন। হরি আচার্য রচিত এ জাতীয় গানের মধ্যে নমুনা-স্বরূপ কয়েকটির আংশিক উধৃতি দেওয়া গেল :

(ক) হ'ল ইউরোপে প্রলয়চিহ্ন চল্লিশ অক্ষৌহিনী সৈন্য
যুদ্ধের জন্য জীবন দিতে বাধ্য,
তাতে সমুদ্রের পথ রুদ্ধ।
তাইতে জার্মানী আর সার্ভিয়ারে অকালে সৃষ্টি সংহারে
রাম রাবণের যুদ্ধের পরে, হয় নাই এমন যুদ্ধ ॥
র'ল পাট বদ্ধ গৃহস্থের বাড়ী নাই ধান চাউল টাকা কড়ি
বাড়ী বাড়ী হাহাকার ধ্বনি,
খাদ্য কি দিয়ে মা কিনি।
অনধিকার চর্চায় থেকে যুদ্ধের কথা সবার মুখে
এবার ঘুমালে লোক স্বপ্নে দেখে, বিলাত আর জার্মানী ॥

(খ) শক্তি দে মা শিবশক্তি করে শক্তিসাধন।
যেন শক্তিহীন ভারতে হয় মা নন্-কোপারেশন ॥
এমন ভারত পুণ্যভূমি মোদের জন্মভূমি
শুধু গোলামীতে করি জীবন যাপন।
মাগো! খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে
পদে পদে দুঃখ পরের পদাঘাতে

প্রতিদিন প্রতিপত্তিহীন
মাথে পরের পাদুকা করতেছি বহন ॥
মাগো! মুক্ত কর মা মুক্তকেশী, মোরা পরপ্রত্যাশী
যেন আশু করতে পারি বিদেশী বর্জন ॥

(গ) একে ভারতমাতার বৃদ্ধ দশা, নাই কোন সুখের আশা,
ভরসার মুখে পড়ল ছাই।
বড় কুক্ষণেতে জন্মেছিলেম মায়ের কুসন্তান,
হিন্দু মুসলমান, বেইমান এই দুই ভাই ॥
একই মায়ের কোলে দুই ভাই থেকে—
ভাইয়ে তো ভাইকে করি খুন,
এই কি বুদ্ধিমানের গুণ?
চীন জাপান ফ্রান্স রুশে, কলহ দেশে দেশে,
শুধু দেশবন্ধুর অভাবে দেশে, জ্বলছে এই বিদ্বেষের আগুন ॥
মোরা ভারতমাতার দুটি ছেলে—
হিন্দু আর মুসলমান দুই জাত;
ধর্মের মত দুটি তফাৎ।
যার যে ধর্মানুসারে, যেতেছি কর্ম করে,
কেন দুই ভাইয়েতে অস্ত্র ধরে,
করতেছি মার বুকে আঘাত ॥
দেশে হিন্দু মুসলমানের লড়াই,
কি বড়াই বাড়ায়ে অন্ধ,
পরের দাসখতে বদ্ধ ॥
হিন্দুরা যত পার ভারত ইতিহাস পড়,
এখন মুসলমানে স্মরণ কর,
সিরাজের পলাশীর যুদ্ধ ॥

(ঘ) মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারতভূমে, কালক্রমে কত লীলা হয়।
মা তোর পূর্ববঙ্গ রঙ্গস্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল,
হল অপূর্ব লীলার অভিনয় ॥
শুনলেম অতিপ্রিয় পুত্র তোমার, জয়দেবপুরের মধ্যম কুমার,
মরেছিল দার্জিলিং পাহাড়ে,
রাজার শবদেহটি সৎ লোকেরা এল সৎকার করে।

হায় হায়, চাঁদের বাজার আঁধার হলো,
শ্রাদ্ধশান্তি ঘুচে গেল গেল,
মরা মানুষ ফিরে এল, আবার বার বৎসর পরে ॥
রাজার স্বার্থের বন্ধু যারা যারা, স্বার্থ সাধন করতে তারা,
রাজকুমারকে বিষ খাইয়েছিল;
আবার শ্মশান-বন্ধু হয়ে তারা শব শ্মশানে নিল।
বিষম শিলাবৃষ্টি ঝড় বাতাসে,
শব ফেলে পালাল ত্রাসে,
নাগা বাবা ধর্মদাসে এসে, পুনর্জীবন দিল ॥

(ঙ) দেশের দুঃখের দশা দুঃখহরা, তারা তোর চরণে জানাই।
ক'রে এলে বি এ, এম. এ পাশ,
ঘরে ভাত নাই পরের দাস,
শুধু হা হুতাশ সুখের মুখে ছাই ॥
মাগো! একটি ছেলে মানুষ করতে,
স্কুল কলেজে দিলে পড়তে,
বহু অর্থ খরচ হয় তার ফলে,
একটি ব্রিটিশ মন্ত্রে দীক্ষিত হলে উচ্চ শিক্ষিত বলে।
তবু চাকুরী পাওয়া বিষম ঠেকা,
উমেদারী আর তেলমাখা,
বাড়ী থেকে গেলে টাকা—
বাবুর বাসা খরচ চলে ॥

(চ) দেশের ছেলেপেলে নষ্ট হল, দিনরাত্র সিগারেট টেনে,
মাথা গরম হয় ঘ্রাণে।
বাড়ির লোক উপস আছে,
কাপড় ত নাইক কোঁচে,
কেহ দুই পয়সার কলা বেচে,—
এক পয়সার সিগারেট কিনে ॥
আবার অশিক্ষিত লোকেরা যখন, শ্রীমুখ সিগারেটে লাগায়,
মুখে ম্যাচ বাতি জ্বালায়।
অনেকের কর্মভোগে, বাতাসের প্রবল বেগে,

কারো নাকের আগায় আগুন লাগে,
কারো বা দাড়ি পোড়া যায় ॥

পূর্ববঙ্গের কবি সমাজের নমস্য এবং কবি-সম্রাট বলে স্বীকৃত কবিগানের নবরূপদাতা তথা সমাজদরদী হরিচরণ আচার্যের জন্মশতবার্ষিকী ১৯৬১ সালে বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিকীর ডামাডোলে নীরবে অতিবাহিত হয়ে গেল। যার গানে একদা সমগ্র পূর্ববঙ্গের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছিল তাঁর নাম আজ কয়জনেই বা জানে!

হরি আচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য রাজেন্দ্র সরকারও ১৩৮০ সালের ২৬শে মাঘ বিরাশি বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজেন্দ্র সরকার দুর্জয়ী কবিয়াল ছিলেন। সঙ্গীত রচনায় তাঁর নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত। এখনো আসরে আসরে তাঁর গান গীত হয়ে থাকে। খুলনা-যশোহর-ফরিদপুরে এক ডাকে লোকে তাঁকে চিনত। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও পূজায় বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম কিংবদন্তিতে পরিণত। অথচ কোথাও তাঁর মরণোত্তর উল্লেখ চোখে পড়ল না। এমনিভাবেই আর এক সুরসিক কবি হরিচরণ নাথ পঁচানব্বই বছর বয়সে গত ২রা মাঘ ইহলীলা শেষ করলেন।

আধুনিক ও প্রাচীন ধারার কবিগানের সার্থক সমন্বয় সাধনকারী অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার ছাড়া সর্বগুণসম্পন্ন কবিয়াল কেউ আর বর্তমান নেই। পঁচাশি বছর বয়সে তিনিও শেষ দিনের অপেক্ষায় আছেন। গানের আসরে বাগবৈদগ্ধ্যে তখনো তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৫০ সালের বরিশালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্বহারা কবির কণ্ঠে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অন্তর্বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল :

মোদের সোনার বাংলা জংলা হল
কোন্ বিধাতার কোন্ বিধানে।
তাইতে হিন্দু-মুসলিম হয়েছি ভাগ
শয়তানের ডাক শুনে কানে ॥
স্বাধীন হয়ে শান্তি কত   কাঙালী বাঙালী যত
সোনার বাংলা পরিণত হল শ্মশানে।
পাকিস্তানে নির্যাতিত   পূর্ববঙ্গের হিন্দু যত
হিন্দুস্থানে সমাগত ঠেকিয়ে বিষম নিদানে ॥
স্বাধীনতার ফলে বুঝি   পূর্ববঙ্গের রিফিউজী
হারায়ে সর্বস্ব পুঁজি রয় অনশনে।

শরণার্থী করতে পোষণ নাম করিয়ে পুনর্বাসন
চিরতরে দেয় নির্বাসন, দণ্ডকবন আর আন্দামানে ॥

আধুনিক শহুরে কবিদের গুণপনায় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির হরেক ব্যবস্থা রয়েছে—পুরস্কার, পদক, খেতাব, মানপত্র, এওয়ার্ড, নগদ অর্থ সাহায্য ইত্যাদি কত কি! কিন্তু বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ কবিগানের শিল্পীদের ভাগ্যে সেসব কিছুই জোটে নি—উন্নাসিক নাগরি সংস্কৃতির বেসাতীদের তাচ্ছিল্য ও নাসিকা কুঞ্চন ছাড়া। কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কেহই এই লোক-কবিদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিদানের কথা ভাবেন নি। একমাত্র ব্যতিক্রম বিখ্যাত ঢোল-বাদক ক্ষীরোদ নট্ট। কি কারণে জানি না, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত করে বসে। তাছাড়া আর সবার ভাগ্যেই শূন্য। এসব প্রচারবিমুখ পল্লীবাসী লোককবিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মতো দরদী সংবাদপত্র বা সাংবাদিকই বা কোথায়! সেই দুঃখেই চারণ কবি মুকুন্দ দাস গেয়েছেন :

এডিটর খোঁজ রাখে ক'জনার ?
চল্লিশ কোটি মায়ের ছেলে
নাম ছাপে সে দু'চার জনার ॥
নামটি যেথায় টাইটেল-যুক্ত
লেখনীটি সেথায় মুক্ত
তবেই লেখার উপযুক্ত ;
আছে কিরে আর ॥
রামা আজ দিল্লী যাবেন
শ্যামা যাবেন কাছাড়
স্টারে নাচবে কুসুমকুমারী
আ-মরি খবরের বাহার ॥

লোককবিরা বনের কোকিল; বনে বনে ডাকাডাকি করেই একদিন তাদের অমিয় কণ্ঠ নীরব হয়ে যায়। স্মৃতিসভা, জন্মজয়ন্তী, জন্মশতবার্ষিকী গুণীজন হিসেবে সংবর্ধনা তাঁদের জন্য নয়।

জোনসটাউনের ট্রাজেডি : বিলয়ের অভিভাবন

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(ক)

বেদীর ওপর উচ্চাসনে উপবিষ্ট রেভারেণ্ড জিম জোনস। জোনসটাউনের একহাজার অধিবাসী—রেভারেণ্ডের ভক্তরা তাদের পুত্রকন্যা সমেত হাজির। জোনসের সামনের টেবিলে সায়নাইড মিশ্রিত পানীয়—'কুল-এইড'। ভক্তরা জানে কেন এই সমাবেশ। এই দিনের জন্য তারা প্রস্তুত। তাদের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকালে মনে হয় তারা মোহাবিষ্ট। কালিফোর্নিয়ায় পিতার মহান আদর্শ রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় পরমপিতার পার্থিব অবতার রেভারেণ্ডের নির্দেশে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। তাঁর আদেশে তারা গুয়ানার জঙ্গলে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। দিনে বার-তেরো ঘণ্টা পরিশ্রম করেছে। পার্থিব পিতার ওপর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা তাদের দেহমনে উৎসাহ ও শক্তি জুগিয়েছে। পিতা জোনসের কাছে তারা চুক্তিবদ্ধ। জোনসের ইচ্ছা পূরণে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। বিফল হলে তাঁরই নির্দেশে স্বেচ্ছায় নরদেহ ত্যাগ করে দিব্যলোকে প্রয়াণ করবে। কালিফোর্নিয়ায় তাদের আত্মবিকাশের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হওয়ায় জোনসের নির্দেশে জঙ্গল-শিবিরে বসতি স্থাপন করেও তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। যুক্তরাষ্ট্রের অবিশ্বাসীদের প্ররোচনায় সরকারী প্রতিনিধিরা তাদের উপনিবেশের শুচিতা নষ্ট করতে চায়। তাদের আত্মিক উন্নতির গোপনীয়তা, তাদের সাধনার গুহ্য রহস্য উদ্‌ঘাটনে বদ্ধপরিকর। সেই

প্রতিনিধিদের অধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে বাধাসৃষ্টির প্রয়াস পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নি। এই পৃথিবী এখন তাদের কাছে তাই আর বাসযোগ্য নয়। অন্তলোকে বসতি স্থাপনের সব আয়োজন রেভারেণ্ড জোনসের নির্দেশে সম্পূর্ণ।

বেদির আসন থেকে জোনস ঘোষণা করলেন: সময় উপস্থিত। তোমরা একে একে উঠে এস। ঐ 'কুল-এইড'-এর পূর্ণ পাত্র নিঃশেষ কর। আগে সন্তানদের পান করাও, তার পর পান কর নিজেরা। আমার আশীর্বাদে তোমাদের মরদেহ থেকে প্রাণবায়ু অনায়াসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নির্গত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। আমার সন্তানরা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবে না। এই দুর্নীতির দুনিয়া, এই পাপ-পঙ্কিল পৃথিবী, এই অসম সমাজ আমার সন্তানদের জন্য নয়। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। তোমাদের পথ দেখিয়ে সাম্যভূমি শান্তি রাজ্যে নিয়ে যাব। এই গ্রহ ধ্বংস হতে চলেছে। প্রজাতিকে আমরা পাপ পথ থেকে ফেরাতে পারলাম না। এদের বিলুপ্তি অনিবার্য।

গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। পিয়ানোতে বিলয়ের বিলাপ বেজে উঠল। সুশিক্ষিত সৈনিকের দল মন্থর গতিতে সারিবদ্ধভাবে শান্তিবারিপূর্ণ সুদৃশ্য আধারটির দিকে এগিয়ে চলল। তখনও কিন্তু তাদের চোখে মুখে কোনো ভাবব্যঞ্জক রেখাপাত দেখা গেল না।

না, কোনো কল্পিত কাহিনীর ভূমিকা নয়। অধুনা অনুষ্ঠিত একটি সুইসাইড প্যাক্ট-এর শেষ দৃশ্যের নাটকীয় বর্ণনা। ট্রাজেডির ঘটনাস্থল দক্ষিণ আমেরিকার একটি রাজ্যের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের একটি শিবির। সংবাদ-পত্রে বিবৃত প্রতিবেদন সবসময় নিখুঁত সত্য হবে, এমন কোনো কথা নেই। প্রতিবেদকদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সংস্কার, সংবাদ সংস্থার মালিক পরিচালকদের স্বার্থ সংবাদকে অনেক সময় বিকৃত করে, পাঠকদের বিভ্রান্ত করে।

গুয়ানার জঙ্গলের এই গণ-আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে স্বভাবতই অনেক সুদূর কল্পনা ও অনুমানভিত্তিক বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে এবং হবে। কেন না এই ধরনের রোমাঞ্চকর ঘটনা খুবই বিরল। জোন্স-অনুগামী একহাজার জনের মধ্যে প্রায় ৯০০ ব্যক্তি একই ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, অল্প কয়েকজনকে—যাঁরা আত্মবিসর্জনে ভয় পেয়েছিলেন বা ইতস্তত করেছিলেন, হত্যা করা হয়েছে, আর প্রায় ৮০ জনকে পরে জীবন্মৃত অবস্থায় পাওয়া

গেছে। সংবাদটির সত্যাসত্য বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত গণ-আত্মহত্যার ঘটনাটিকে সত্য বলে মেনে নিলে, এর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান ও প্রসঙ্গত বিলয়ের অভিভাবনের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা সেই চেষ্টাই করব।

প্রতিবেদকরা সংবাদ পরিবেশনের ওপর গুরুত্ব দেবেন, এটাই স্বাভাবিক। ঘটনার সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান তাঁদের কাজ নয়। সংবাদ নাটকীয় ভাবে প্রকাশিত হলে ও তার মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা সন্নিবিষ্ট হলে পাঠকদের আকর্ষণ বাড়ে। সেদিক থেকে এই সংবাদটি মনে হয়, ২৩শে নভেম্বরের বেশির ভাগ সংবাদ-সন্ধানীদের আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্রেক করেছে। আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক মহলেও সাড়া জাগিয়েছে। সংবাদটিকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য প্রতিবেদকরা কিছু কিছু সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণের উল্লেখ করেছেন, রেভারেণ্ড জোন্‌সকে একাধারে ধর্মীয় গুরু ও রাজনৈতিক নেতা রূপে চিত্রিত করেছেন। 'ক্যারিজমা' 'সুপারম্যান' তত্ত্বের সাহায্যে ঘটনাটির আংশিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন; আবার জিম-জোনসকে 'প্যারানয়েড' (Paranoid) কল্পনা করে তার ধর্ষকাম-মর্ষকাম প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফলে ট্রাজেডিটি অনুষ্ঠিত হয়েছে—এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা আমেরিকায় বিদেশী 'কাল্ট'-এর আমদানি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমাদের বক্তব্য পরিবেশনের পূর্বে এই ট্রাজেডির টুকরো খবরগুলোকে সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে।

জোনসের 'পিপলস টেম্পল চার্চ' ক্যালিফোর্নিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান। ক্যালিফোর্নিয়া বিদেশী 'কাল্ট'-এর কর্মকেন্দ্র। ভারতের মহেশ যোগী, দক্ষিণ কোরিয়ার রেভরেণ্ড মুন, হরেকৃষ্ণ-সম্প্রদায় ইত্যাদি বেশ কয়েকটি খ্যাত-অখ্যাত প্রতিষ্ঠান এখানে প্রভাব বিস্তার করে অনেক সভ্য ও সমর্থক সংগ্রহ করেছেন। পিপ্‌লস টেম্পল চার্চ-এর খবর ২৩শে নভেম্বরের আগে বোধ হয় আমাদের দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। জানা গেছে যে, এই প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সভ্যই শিক্ষিত, প্রভাবশালী ও বিত্তবান। বেশ কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এই 'চার্চের' সমর্থক। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই নাকি জোনস-এর ভক্ত। এই প্রতিষ্ঠানটির বিশেষত্ব রাজনীতি ও সমাজনীতি চর্চা এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ও

সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। তিনি আর্থিক বৈষম্য, বর্ণবৈষম্যের অবসান চান। তাই কৃষ্ণকায় নাগরিকদের মধ্যে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যাধিক্য। ভক্তদের ওপর তাঁর প্রভাব অপরিসীম। তাঁর নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই 'পেনসন' বর্জন করেছেন। সংবাদ সংস্থার সূত্রে আরো জানা গেছে যে, রেভারেণ্ডের ভক্তের চেয়ে বিরোধীর সংখ্যা বেশি হওয়ার দরুন পাঁচ বছর আগে অতি-অনুগামী ১০০০ ভক্ত নিয়ে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ত্যাগ করে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তিক এক দুর্ভেদ্য জঙ্গলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। শত্রুপক্ষের অভিযোগ রেভারেণ্ড ভণ্ড ও প্রতারক। দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের অভিনয় দেখিয়ে তিনি সাধারণকে অভিভূত করেছেন। ভক্তদের অর্থ আত্মসাৎ, বলাৎকার ও অন্যান্য যৌন অপরাধ, ব্ল্যাক-মেইলিং, অনুগামীদের ওপব দৈহিক নির্যাতন, অপরের মনকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বশীভূত করা, অন্যের উপর ইচ্ছা সঞ্চারণ ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগ তার বিরুদ্ধে শোনা গেছে। জোনসটাউন পত্তনে গুয়ানা সরকারের সম্মতি ও সহানুভূতি ছিল এবং দুর্গম জঙ্গলকে একটি কৃষি-উপনিবেশে পরিণত করার কাজে ভক্তদের তিনি ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করেন। দিনে বারো ঘন্টা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়ে তারা পেয়েছে কোনো মতে বেঁচে থাকার মতো খাদ্য ও পরিধেয়। এইসব খবর ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত ভক্তদের আত্মীয়স্বজনকে বিচলিত করে। তারা নানাভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে এই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বারবার আবেদন জানায়। গুয়ানার জর্জটাউনে অবস্থিত আমেরিকান কনসুলেট অভিযোগের সমর্থনে কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের সন্ধান না পাওয়ায় এতদিন তদন্ত করাও হয় নি। বরং, জোনসটাউনের অধিবাসীদের উক্তি থেকে জানা যায় বলাৎকার, দৈহিক নির্যাতন তো দূরের কথা, কোনো প্রকার দুর্ব্যবহারই তাদের ওপর করা হয় নি; তারা স্বেচ্ছায় নির্বাসনে আছে। বিরোধীপক্ষের বিশেষ তদারকিতে শেষ পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেস সদস্য তদন্তের উদ্দেশ্যে সদলবলে জোনসটাউন পরিদর্শন করতে মনস্থ করেন। এবং তার ফলেই হত্যা-আত্মহত্যাঘটিত এই নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়।

(খ)

ট্রাজেডির প্রথম পর্বের বলি রায়ান ও তাঁর কয়েকজন সহযাত্রী। প্রধান

নায়ক জোনস-এর আদেশ ছিল নাকি রায়ান-এর সকল সহচরকে নির্বিচারে হত্যা করা। তাঁর হত্যার আদেশ সম্যকভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় অনুষ্ঠিত হল ট্রাজেডির শেষ পর্ব। জোনসটাউনের সকল অধিবাসীকে 'কুল-এইড' সেবন করে মহিমান্বিত মৃত্যুবরণের নির্দেশ দিলেন সর্বাধিনায়ক জিমি জোন্‌স। এই মৃত্যুবরণের মহড়া নাকি আগে থেকেই দেওয়া ছিল। জোনস-অভিভাবিত অধিকাংশ ভক্ত স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। প্রথমে সন্তানদের গলায় বিষ-পানীয় ঢেলে দিলেন, তারা পিতামাতার কোলে ঢলে পড়ার পর বিষপান করলেন। যারা অব্যাহতি চাইলেন, তাদের গুলি করে হত্যা করা হল। ট্রাজেডির পরিলেখক ও সর্বাধিনায়ক একইভাবে এই মরণযজ্ঞে আত্মাহুতি দিলেন।

সংবাদপত্রের এই বিবরণটির শেষ অংশটি সত্যিই নাটকীয় এবং অভিনব। প্রথম অংশটির মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নেই। আমাদের দেশেরও কোনো কোনো বাবাজি দাদাজির নামে নানা ধরনের প্রচার শোনা গেছে। দু-চারজনের নামে জাল-জুয়াচুরি, যৌনাপরাধের মামলা মোকর্দমাও চলেছে; কারুর অলৌকিক বা ঐশীশক্তির অভিব্যক্তি জাদুকর কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে, অনেক মানসিক রোগীদের মধ্যে মহাপুরুষদের ভাবাবেশের উপসর্গ দেখা গেছে—তা সত্ত্বেও তাঁদের পসার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয় নি। তাঁরা তদন্ত বা মোকর্দমা স্থগিত রাখার জন্য অথবা মামলায় জয়লাভের জন্য বিচারকদের প্রভাবিত করা, বিরোধীপক্ষকে উৎকোচদান, সাক্ষীদের ভীতি ও লোভ প্রদর্শন ইত্যাদি আমাদের সমাজের প্রচলিত পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তদন্তকারীদের সকলকে একসঙ্গে হত্যার চেষ্টা ও বিফল হলে গণ-আত্মহত্যা যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্যে সত্যিই নতুনত্ব আছে। আমরা সকলেই জানি যে প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের ব্যবসায়ে কম মূলধনে সব থেকে বেশি মুনাফা পাওয়া গেছে। ডলারের দেশেই সব ব্যবসায়ে মুনাফার হার বেশি। কাজেই ধর্মব্যবসায়ীদের ভিড় আমেরিকায় বাড়ছে বলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। প্রায় তিরিশ বছর আগে প্রকাশিত কলিন্‌স-এর 'দি আউটসাইডার' বইটিতে প্রাচ্যদেশীয় রহস্যবাদের প্রতি পশ্চিমী দুনিয়ার মনস্তাত্ত্বিকদের অনুরাগবৃদ্ধির কারণ বর্ণিত হয়েছে। 'ইস্টার্ন মিস্টিসিজম', 'জেন বুদ্ধিজম' (Zen Budhism)-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে কিছু চতুর ব্যবসায়ী নতুন নতুন 'কাল্ট' ও 'স্পিরিচুয়ালিজম'-এর পসরা নিয়ে আমেরিকার বাজারে হাজির হয়েছেন।

এক দশকের মধ্যে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় পণ্যেরও চাহিদা বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিতরণকারীর সংখ্যা। জোন্‌স-টাউন ট্রাজেডির প্রতিবেদকরা প্রসঙ্গত 'কাল্ট'-এর প্রভাববৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধেও দু-একটি মন্তব্য করেছেন। গত কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকাবাসীর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, পুরনো বিশ্বাস ভেঙে পড়েছে, মূল্যবোধ নষ্ট হয়েছে। তারা নতুন বিশ্বাস, নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে চায়। নতুন ধর্মগুরুর আশ্রয়ে নিরাপত্তার সন্ধান চায়। অণিমা-লঘিমা ইত্যাদি বিভূতি-সমন্বিত গুরুর কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে, সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে নিজেদের মানসিক অস্থিরতা-উদ্বেগ দূর করতে চায়। রেভারেণ্ড জোনসের মধ্যে তারা নিশ্চয়ই বিভূতির সন্ধান পেয়েছিল, জোনসের 'ক্যারিজমা' তাদের মোহবিষ্ট করেছিল। অপরের মনকে নিয়ন্ত্রিত করার ও ইচ্ছাশক্তিকে প্রভাবিত করার বিশেষ ক্ষমতা ছিল জোনসের। তিনি তাদের জীবন মরণের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী করে তুলেছিলেন এবং রায়ান ও তার সহযাত্রীদের হত্যাকার্যে প্ররোচিত করেছিলেন। আবার এই জীবনকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করার অভিভাবন দিয়ে তাদের মৃত্যুপ্রেমে আবিষ্ট করেছিলেন।

নিউজার্সির মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: সুখদেও জোন্‌স-অনুগামীদের সম্পর্কে প্রায় একই রকমের মন্তব্য করেছেন। ডা: সুখদেও বহুদিন ধরে 'কাল্ট' নিয়ে গবেষণা করেছেন। কোনোক্রমে মৃত্যু এড়িয়ে যাওয়া ৮০ জন জোন্‌স-ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এরা সকলেই প্রায় জোন্‌স-অভিভাবিত। এরা বর্তমানে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ—বিষাদগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, বিহ্বল। এদের নিকটতম আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হয়েছে, এরা সর্বস্ব হারিয়েছে, কিন্তু জোন্‌স-এর ওপর অগাধ বিশ্বাস এখনও অটুট আছে। তারা আর পুরনো সমাজে অর্থাৎ সুখদেও-এর বুর্জোয়া সমাজে ফিরে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। সুখদেও মনে করেন জোন্‌স এদের মগজে আমেরিকার স্বাধীন সমাজ সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা ঢুকিয়ে এদের বিদ্বিষ্ট করে তুলেছেন। চিকিৎসার ফলে সুস্থ হলে এরা খুব সম্ভব জোন্‌স-নির্দেশিত আত্মবিলয়ের পথই বেছে নেবে; এদের মনে আত্মধ্বংসের জোরালো অভিভাবন অনুপ্রবিষ্ট করেছেন জোনস। আমরা এই অভিমত সমর্থন করতে পারি না।

(গ)

জোন্স-এর পিপলস টেম্পল চার্চের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যান্য আশ্রমের তুলনা-প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা বলেছেন যে, অন্যান্য আশ্রম-প্রধানরা কোনোদিন হিংসার প্ররোচনা দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো কুৎসিত অভিযোগ শোনা যায় নি। তাঁরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুধু ভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করে যাবেন। কেউ যোগ প্রাণায়াম বা তান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনীর শক্তিকে জাগ্রত করান, কেউ বা আত্মোন্নয়নকর ধ্যানাভ্যাস করান, কোনো সংস্থা আবার নামমার্গে ভক্তদের বৈকুণ্ঠে পৌছে দেবার মহলা দিয়ে থাকেন। রাজনীতি সমাজসংস্কার ইত্যাদি ধর্মবহির্ভূত কোনো ক্রিয়াকলাপে এঁরা আগ্রহী নন। এ-বিষয়ে আমাদের কোনো কিছু বলবার নেই; কেননা আমেরিকা সম্পর্কিত তথ্যাদি তাঁরাই ভালো জানেন। তবে, আমাদের দেশের দু-একটি এই জাতীয় আশ্রমের সঙ্গে বিদেশী গোয়েন্দা-সংস্থার সম্পর্কের কথা এদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে। দু-একটি সংস্থা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেও জানা গেছে। পিপলস টেম্পল চার্চকে সংবাদ সংস্থা 'সমাজতন্ত্র' প্রচারের একটি কেন্দ্র বলে মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবং বুর্জোয়া সামাজিক ব্যবস্থার সমালোচনা ও বিরোধিতার জন্যই সংস্থাকে ক্যালিফোর্নিয়া ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল—এই অনুমান করা কি খুবই অসঙ্গত হবে? জোনসটাউনের অধিবাসীদের নিকট আত্মীয়-স্বজনরা অবসরপ্রাপ্তদের অর্থ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার দরুন জোন্সকে ভণ্ড-প্রতারক পরস্ব-অপহারক প্রতিপন্ন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন—এই ধরনের অভিমতও দু-একজন পোষণ করতে পারেন। এ-সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা করবার কোনো উপায় থাকলে জোনসটাউনের এই গণ-আত্মহত্যার কারণ নির্ণয়ের সুবিধা হত। এই ট্রাজেডির অভিনবত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ঠিক এই প্রকারের গণ-আত্ম-বিসর্জনের ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া যায় না। জোন্স্ ও তাঁর চার্চের সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ এ পর্যন্ত পেয়েছি, তা থেকে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়, তবে বর্তমান সমাজ-মানসিকতা সংক্রান্ত আলোচনা করা চলে। সব ঘটনার বিশ্লেষণে বা ব্যাখ্যায় অতীতের নজির টেনে আনার প্রয়োজন আছে কি? বহু নজিরবিহীন ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে এবং ঘটবে। রুশ-বিপ্লবের কোনো নজির অতীতের ইতিহাসে নেই। প্রথম খৃষ্টাব্দে মাসাদার

দুর্গে ইহুদিদের ও চতুর্দশ শতাব্দীর চিতোরগড়ে অবরুদ্ধ বীর রমণীদের নজির টেনে আনলে জোনসটাউনের গণ-আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টায় কোনো বিশেষ ফল হবে না। কিন্তু তা বলে আমরা মনে করি না যে মাসাদার ইহুদি ও চিতোরের বীরাঙ্গনাদের স্বেচ্ছামৃত্যুর মৌলিক কারণের সঙ্গে জোন্‌স্‌-টাউনের গণ-আত্মহত্যার একেবারেই কোনো সম্পর্ক নেই। শত্রুকবলিত হলে অত্যাচারিত হবার মর্যাদা হারাবার ভয়ে ইহুদিরা এবং চিতোর-রমণীরা আত্ম-হত্যা করেছিলেন—এই সিদ্ধান্ত জোনসটাউনের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু মর্যাদা হারাবার পর বাঁচবার কোনো সম্ভাবনা ইহুদিদের ছিল না, চিতোররমণীরা সম্ভ্রম হারাবার পর বেঁচে থাকা পাপ মনে করতেন—এই ধরনের কোনো কিছু কারণ জোনসটাউনের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। জোন্‌স্‌ টাউনের গণ-আত্মহত্যার ব্যাখ্যা বা কারণ অনুসন্ধানে অতীতের নজির এ দিক থেকে খুব বেশি সাহায্য করছে না। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সাম্প্রতিক সঙ্কটের বিশ্লেষণ ছাড়া এই ট্রাজেডির ওপর আলোকপাত সম্ভব নয়।

(ঘ)

সম্ভাব্য প্রকল্প ও বিশ্লেষণ: 'পিপলস টেম্পল চার্চ' একটি নতুন ধরনের বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়। জিম জোন্‌স্‌ ও তাঁর সম্প্রদায় আমেরিকার সমাজ-সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্নবোধ করার ফলে ক্যালিফোর্নিয়া তাঁদের কাছে বাসযোগ্য মনে হয় নি। আধুনিক সভ্যতার সুখসুবিধা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে তাঁরা দুর্গম জঙ্গলে নিজেদের নির্বাসিত করেছিলেন। সভ্য-সমাজ, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ ও গ্যাজেট-নির্ভর জীবনকে অস্বীকার—এর আগে আমরা হিপিদের করতে দেখেছি। তাঁরা কিন্তু আশ্রম বা গুরুভক্ত ছিল না। তাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ ছিল আরো গভীর। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও ভবঘুরেবৃত্তি তাদের বৈশিষ্ট্য। জোন্‌স-অনুগামীরা সমাজের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও সমধর্মীদের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করে জীবনের নতুন অর্থ নতুন মূল্য সন্ধানে ব্যাপৃত। হয়তো বা নতুন কোনো 'ইউটোপিয়া' গঠনের অভিলাষ গায়ানায় 'কৃষি কমিউন' সংগঠনে তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ধনী-নির্ধন, শাদা-কালো, মালিক-শ্রমিক, স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-জীর্ণ পুরনো সমাজের সংস্কার তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজকে ভেঙে নতুন করে গড়বার মতো সাংগঠনিক শক্তি তাঁদের নেই; কাজেই স্বপ্ন-উপনিবেশ গড়ে তাঁদের মনের

অভিলাষ পূরণ করতে চেয়েছিলেন। আদর্শকে অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রূপায়িত করতে মনস্থ করেছিলেন। নয়া বামদের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়েও তাদের পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। রায়ানের তদন্তের উদ্দেশ্য তাঁদের পাঁচবছরের সযত্নে লালিত অভিলাষ ও কঠোর শ্রমে গড়ে তোলা স্বপ্ন-উপনিবেশ ভেঙ্গে চুরমার করা —এই ধারণা তাঁদের মনে কোনোভাবে বদ্ধমূল হবার দরুন তাঁরা চরমপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই পন্থা গ্রহণের প্রথম পর্বে ঘটল রায়ান-হত্যা, আর শেষপর্বে ঘটল গণ-আত্মহত্যা। এই পন্থা গ্রহণের কোনো যৌক্তিকতার সন্ধান মেলে না। রায়ানের অভিযান হিংসাত্মক পদ্ধতিতে সাময়িকভাবে ব্যর্থ করতে সক্ষম হলেও জোনসটাউন বাঁচতো না। যুক্তরাষ্ট্রে তদন্তকারীর অভাব ঘটত না। জোনসের পরিকল্পনানুযায়ী রায়ানের দলের সকলকে হত্যা করলে জোন্সের নির্দেশ পালনই করা হত, স্বপ্ন-উপনিবেশ রক্ষা করা যেত না। এই অযৌক্তিক পন্থা গ্রহণ অস্বাভাবিক। অসুস্থ মস্তিষ্কের ভ্রান্তিমূলক (delusional) চিন্তাপ্রসূত বলে মনে হতে পারে।

জোন্স ও তাঁর সম্প্রদায়ের এই নাটকীয় হত্যা ও আত্মঘাতী কার্যকলাপের পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের দুর্নীতিবিরোধী আদর্শবাদী, স্বপ্নবিলাসী, সাম্যসমাজ গঠন-অভিলাষী, 'ডেডিকেটেড' (dedicated) বলে ভাবা চলে। বুর্জোয়া সমাজ পরিত্যাগী স্বেচ্ছানির্বাসিতদের কার্যকলাপে সমাজ-অনুগামিতার পরিচয় না মিললেও মানসিক অসুস্থতার বা উন্মত্ততার কোনো নিদর্শন দেখা যায় না। গতানুগতিক চিরাচরিত পথে যারা চলে না তাদের অনেকেই 'ক্ষ্যাপা' 'পাগল' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকেন। অসুস্থ বুর্জোয়া সমাজে যারা নিজেদের মানিয়ে নিয়ে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে তারাই সুস্থ? না যারা দূষিত বিষাক্ত সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার দরুন অন্য পথে চলে, অন্য চিন্তা করে তারাই সুস্থ? এ বিষয়ে আমেরিকার মনোরোগ চিকিৎসকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও, একদল চিকিৎসক মনে করেন স্কিজোফ্রেনিক এই অসুস্থ সমাজের রীতিনীতি প্রতীককে পরিহার করে বলে স্থিতাবস্থা (Statusquo) রক্ষাকামী আত্মীয়স্বজন ও চিকিৎসকরা তাদের 'উন্মাদ' আখ্যা দিয়ে পাগলাগারদে পাঠাতে চান। তাঁদের বিচারে জোন্স ও তাঁর অনুগামীদের বোধহয় অসুস্থ বলা চলবে না। তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বৃহত্তর সমাজের হিংসাশ্রয়ী ধ্যান-ধারণার প্রতিক্রিয়ামাত্র। রায়ান অসুস্থ দুর্নীতিদীর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে তাদের আদর্শ, তাদের সংগঠন

ধ্বংস করতে চেয়েছিল। আদর্শ ও সংগঠনের সঙ্গে একাত্মীভূত জোন্‌স ও তাঁদের অনুগামীরা এই প্রচেষ্টাকে তাঁদের সামগ্রিক বিলোপ-প্রচেষ্টা মনে করে আত্মরক্ষার্থে হিংসার পথ গ্রহণ করেছিলেন: এছাড়া তাঁদের আর কোনো উপায় ছিল না। এই আত্মরক্ষামূলক আক্রমণমুখিনতা মানব-প্রজাতির স্বভাবধর্ম বা সহজাত প্রবৃত্তি।

আর একটি অনুমিত প্রকল্পের সাহায্যে জোনসটাউন ট্রাজেডির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। জোনস ও তাঁর সহচরদের আমরা রহস্যবাদী আচার-অনুষ্ঠানে রত গোপনীয়তা রক্ষাপ্রয়াসী এক ধর্মোন্মাদ সম্প্রদায় বলে কল্পনা করতে পারি। কোনো ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ে, তখন এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গড়ে ওঠে। তারা লোকচক্ষুর অগোচরে পুরনো দিনের বিশ্বাস সংস্কারের বশবর্তী হয়ে পুরনো ধর্মবিশ্বাসকে অদ্ভুত ও উদ্ভট আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। শাসকদল ও নবধর্মে দীক্ষিত জনসাধারণ থেকে তারা যতদূর সম্ভব দূরে থাকতে চায়। কৌম সমাজ ভেঙে যাবার পর গ্রীসে এই ধরনের অনেক গুপ্ত সম্প্রদায় রহস্যবাদী অনুষ্ঠানে রত ছিল জানা যায়। তখন সেখানে রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ধর্মের সম্পর্ক বড় হয়ে উঠছে। কৌম সম্প্রদায়ের রক্তসম্পর্কভিত্তিক একাত্মবোধের বদলে ধর্মভিত্তিক একাত্ম গঠনের প্রথম পর্বে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের উদ্ভব ঘটে। ফলে এই সব গুপ্ত সঙ্ঘের সভ্যদের মধ্যে গণ-হিস্টিরিয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই সময় সঙ্ঘপ্রধানের ভূমিকা ছিল সময় বিশেষে এদের সম্মোহিত করে গণ-উন্মাদনা সৃষ্টি অথবা গণ-উন্মাদনা বা হিস্টিরিয়া নিরাময়। এই ধরনের 'ম্যাজিকো-মেডিক্যাল' গুপ্ত সমিতি পরিবৃত্তিকালীন পরিস্থিতির অঙ্গবিশেষ; সব দেশেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের সময় এদের উদ্ভব ঘটে। এই সময় গণ-হিস্টিরিয়া ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। জিম জোন্‌স কি এই ধরনের কোনো সংস্থার অধিনায়ক? তিনি কি তাঁর শিষ্যবর্গকে সম্মোহনের সাহায্যে হিস্টিরিক করে হত্যা ও আত্মহত্যার অভিভাবন দিয়ে জোনসটাউনের ট্রাজেডির অনুষ্ঠান করেছিলেন? এই অনুমানও যুক্তিগ্রাহ্য মনে হতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে গুয়ানার জঙ্গল-উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোপনীয়তা রক্ষা করে সেখানে আচার-অনুষ্ঠান পালন করা যাবে। গুহ্য রহস্য প্রকাশ হবার সম্ভাবনা জোন্‌স-এর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চিতোর রমণীদের সম্ভ্রমহানির সম্ভাবনার থেকে কম

গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'ক্যারিজমা' তত্ত্বের সমর্থকরা বলতে পারেন জোনস 'ক্যারিজমা' হারাবার ভয়েই এই ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা করেছিলেন।

(৬)

এই দুটি প্রকল্পের কোনোটিকেই fool proof বলা চলে না। দুটির বিরুদ্ধেই নানা রকমের প্রশ্ন উঠতে পারে। এঁরা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার ও সাম্যবাদী ধাঁচের 'কমিউন' প্রতিষ্ঠা করে চললেন পাঁচ বছর ধরে, অথচ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষ গুপ্তচর সংস্থা'র তীক্ষ্ণ ও সর্বত্রগামী নজরে পড়লেন না এই প্রশ্নের জবাব কি? এঁদের বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার নাগরিকদের অভিযোগে পাঁচ বছর ধরে কর্তৃপক্ষ সাড়া দিলেন না কেন? যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউনস্থিত কনস্যুলেট জেনারেলের মহল থেকে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলে গণ্য করা হল কেন? দ্বিতীয় প্রকল্পের ভিতটাই দুর্বল—এই প্রশ্ন অনেকেই তুলবেন। গুপ্ত আচার-অনুষ্ঠানরত রহস্যবাদী ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ সম্পর্কে আকর্ষণ ও আগ্রহ সম্ভাব্যতার পর্যায়ে পড়ে কি? উত্তরে মাত্র একটি কথাই বলা চলে: এই ট্রাজিক ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য অসম্পূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী; তা-থেকে কোনো অভ্রান্ত প্রকল্প গঠন করা চলে না। প্রায় ৯০০ মানুষের স্বেচ্ছায় একযোগে প্রাণ বিসর্জনের ঘটনা অভিনব বলেই অসম্পূর্ণ সংবাদ ও তথ্যের উপর নির্ভর করে আমরা প্রকল্প গঠন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। তবে নির্দ্বিধায় এবং অনায়াসে মনে করা যেতে পারে যে আমেরিকায় তথা প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে পরিবৃত্তিকালীন সংকট চলেছে; এই সংকটের মোকাবিলা করতে এইসব দেশের চিন্তা-নায়করা নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করছেন; একচ্ছত্র পুঁজি ও তার বশংবদ সরকার নানাবিধ উদ্ভট পরিকল্পনার সাহায্যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থাকে জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, ফলে জনমানসে উদ্ভট ও অসুস্থ প্রতিক্রিয়া ঘটছে। জোনসটাউনের ট্রাজেডি এই পরিবৃত্তিকালীন সংকটের আংশিক প্রতিচিত্র। এই ট্রাজেডির কুশীলবদের আচরণে স্বাভাবিকত্ব ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খোঁজা বৃথা। হিপি-চরিত্র, নয়া-বাম মানসিকতা, 'ডেথ্-স্কোয়াড'দের ধ্বংসকামিতা এবং আমাদের আলোচ্য ট্রাজেডির নায়ক ও অন্যান্য অভিনেতার আচরণ অতীব জটিল। এ-সবের মূলে, আমাদের মনে হয়, বিশেষভাবে কাজ করছে বিলয়ের অভিভাবন।

বিলয়ের অভিভাবনের (suggestion of annihilation) নানা দিক

থেকে জনমানসকে প্রভাবিত করছে। হিরোসিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপের ঘটনার অনেক আগে থেকে বুর্জোয়া মনস্তাত্ত্বিকদের বেশির ভাগ প্রচার করে আসছিলেন যে যুদ্ধবিগ্রহ মানবমনের অন্তর্নিহিত হিংসাত্মক প্রবৃত্তির ফলে ঘটে এবং এর অনিবার্যতা রোধ করার সাধ্য মানুষের নেই। মানুষের মধ্যে জৈব-প্রবৃত্তির প্রাধান্যতত্ত্বের সমর্থক ছিলেন শক্তিশালী পররাজ্যলিপ্সু দেশগুলির অধিনায়করা। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তকের (A study of war ; Chicago) লেখক Q. Wright প্রচুর উপাত্ত সংগ্রহান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুদ্ধবিগ্রহ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোট যুদ্ধের সংখ্যা ছিল ৮৭, উনিশ শতকে সেই সংখ্যা বছর বছর বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫১-তে গিয়ে দাঁড়ায়; আর বিশের শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪০) পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট ৮৯২টি যুদ্ধ ঘটে। তারপর থেকে মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ না ঘটলেও, এমন একটি দিন বোধহয় যায় নি, যেদিন কোথাও না কোথাও যুদ্ধে প্রাণহানি ঘটে নি। এর প্রতিক্রিয়া কি ঘটতে পারে সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, মানুষের মনে যদি আদিম জৈব প্রবৃত্তির প্রাধান্য থাকত, তাহলে বর্বর যুগে ও প্রাক্-যন্ত্রসভ্যতা পর্বেই যুদ্ধের সংখ্যা বেশি হত। লেখকও এই ধরনের মন্তব্য করেছেন, কিন্তু সে মন্তব্য খুব কম লোকের নজরে পড়েছে। হিরোসিমার পর ধ্বংসযন্ত্র আরো শতগুণ নিপুণ ও শক্তিশালী হয়েছে। প্রজাতি-বিলয় সম্ভাবনা সেই অনুপাতে বেড়েছে। যুদ্ধছাড়া অন্যান্য হিংসাত্মক ধ্বংসাত্মক ঘটনার সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে; সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। জীবনের মূল্য কমছে, অস্তিত্বরক্ষা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

গত কয়েক বছরে আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রজাতি-বিলুপ্তির অন্যান্য সম্ভাবনার অভিভাবন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য, বাসস্থান সংকট নিয়ে সব দেশের (সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া) চিন্তাবিদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সংবাদপত্র ও পুস্তকের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে অনবরত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যের মনোভাব সৃষ্টি করেছে। 'পপুলেশন এক্সপ্লোশান'-এর সঙ্গে আবহাওয়া ও সমুদ্র দূষিতকরণের সংবাদ সাম্প্রতিককালে বিলয়ের জোরালো অভিভাবনরূপে মানবমনকে প্রভাবিত করছে। এ-ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন ও দ্রুত অপচয়ের ফলে অতি শীঘ্রই কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা অচল হয়ে উঠবে—এই সম্ভাবনার অভিভাবন পুঁজিবাদী দেশের মানুষকে বিশেষভাবে

চিন্তাক্লিষ্ট করছে। মানুষের লোভ ও ভোগস্পৃহা মানুষ ও প্রকৃতির স্বাভাবিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে প্রজাতি ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করছে—এই অভিভাবনের গুরুত্বও কম নয়। তেল-কয়লা গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানি ও যন্ত্রপাতি চালানোর উপাদান অতি শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়ে আসছে—এই অভিভাবনের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রতিদিন সাধারণ মানুষ নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অবহিত হচ্ছে। ভবিষ্যদ্বক্তাদের (futurologist) সকলেই নৈরাশ্যের ছবি তুলে ধরছেন না—একথা সত্যি। আশার বাণীও অনেকে শোনাচ্ছেন। কিন্তু অসম প্রতিযোগিতায় রত শোষণভিত্তিক সমাজের অধিকাংশ মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র চাপা-উত্তেজনায় (tension) পীড়িত, তাদের মনে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ প্রবণতার আধিক্য। এই অবস্থায় নেতিবাচক ও নঞর্থক অভিভাবনই বেশিমাত্রায় সক্রিয় হয়, সদর্থক উদ্দীপক মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় না, মনে দাগ কাটে না। বিলয়ের অভিভাবন আজ মানসিক-প্রবণতা গঠনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জীবন সম্পর্কে মানুষ আজ অনীহ, জীবন সম্পর্কে উদাসীন। আজকের মানুষ তাই একটা দিনের মতো বাঁচতে চায়, প্রতিমুহূর্তে উত্তেজনা খোঁজে। তাই মদ-মাদক-জুয়ার প্রতি এত আসক্তি, তাই আক্রমণমুখিনতা ও আত্মধ্বংসকামিতার ক্রমবৃদ্ধি। পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কটে সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তি জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবস্থিত সৈনিকের মনোবৃত্তির মতো হয়ে উঠেছে। অপরকে আঘাত করা আর নিজেকে নিঃশেষ করার মনোভাবের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না।

বিলয়ের অভিভাবন 'পিপল্‌স টেম্পল চার্চ'-এর অনুগামীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল—তাই তারা অনায়াসে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে। জোন্‌স-এর অভিভাবনে শিষ্যরা বিষপান করেছিল, এ কথা হয়তো ঠিক; কিন্তু আমার মনে হয় জোনস ও তাঁর সহযাত্রীরা একইভাবে অনুভাবিত হয়েছিলেন।

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

উঁচু মেঝে ডুববে না : নিষ্ফল দুরাশা !
যখন জাজিম ছোঁয় জল, প্রতারক
কোথায় ?   কে জানে ?   দেখি সিঁড়ির আলিসা
যদি ভরসা দিতে পারে !   নিচে
শঙ্খিনী ছোবলায়,—তাকে ডাঙার প্রশ্রয়
দেবে কোন লখিন্দর ?   পায়ের তলায়
মাটি পায় না রহিম, হারান কিংবা লছমনের মোষ

দুর্বল দেওয়াল ধ্বসে পড়ে।   তরল বিদ্রোহে
বিগলিত ভিত।
বৃষ্টির বল্লমে কাত অভিজ্ঞ পাকুড়…

চিতা নেই, কবর উধাও ॥

সহোদর ধান

কামাল চৌধুরী

অন্ধকারে যে আমার পাশে বসে থাকে
জেগে জেগে কথা বলে পলাশের গাঢ়স্বরে
নিদ্রার হাতে রাখে বিনিদ্র গোলাপ

প্রেমিকার তীব্রক্ষিপ্র রক্তবীথি শিরার আগুন
সে আমার প্রিয় ভাই, প্রিয় সহোদর।

অন্ধকারে আমি ও আমার ভাই জেগে থাকি রাতজাগা
অনাহারী চোখে
আমাদের কতদিন রুটি ও প্রেমিকা দেখে শুধু গন্ধ শুঁকে
ফিরতে হয়েছে ঘরে
কতকাল এই চোখ ফসল দেখেনি
আমাদের প্রিয়ধান, প্রিয় সহোদর।

জন্মদাত্রী মাকে আমি বহুদিন একাকী বলেছি
কোথায় আমার সেই সহোদর ভাই
ঘুম ঘুম চোখে আর কতকাল বিনিদ্র কাটাবো
যদি সে মাঠের পাশে অনুর্বর শস্যক্ষেতে পড়ে থাকে শুশ্রূষাবিহীন
আমাকে সেখানে নাও
আমি তাকে আমাদের দোচালা দেখাবো।

অন্ধকারে যে আমার পাশে জেগে থাকে
সে আমি আমার সহোদর
আমার অনিদ্রা তাই তার স্বরে কথা বলে
পুষ্টিহীন সারারাত ছিঁড়ে খায় ক্ষুধার আগুনে।

অন্ধকারে আমিও আমার ভাই একজন সহোদর খুঁজি
একজন প্রিয় ধান, প্রিয় সহোদর।

আমাদের কথা

সুদীপ্ত চক্রবর্তী

আমাদের কোন সিন্দুক নেই
বন্দুকের ব্যবহার শেখা হল না তাই!
আমাদের কোন ঘরবসত নেই

বাপ ঠাকুর্দার গালগপ্পে শুনেছি
আমাদেরও শিকড় ছিল মাটির গভীরে !
শিকড়বিহীন ডালপালায়
আমরা বাস করি
আমাদের কোন ওজন নেই
ঝড় এলে পাতায় ঠেস দিয়ে
ঝড়ের অনুকূলে ভেসে ভেসে যাই…
হোমা পাখির মত আমাদের ডিম
শূন্যে ফুটে যায়
আমাদের কাচ্চা বাচ্চার শরীরে
কোন ওজন নেই
হাড়ের মত কিছু দুমড়ে বেঁকে
অবিকল ট্রিগারের ফিগারে
বড় হ'তে থাকে !

এখন সরীসৃপ

অনুরাধা মহাপাত্র

আশির নখে দর্পে নতুন ফুল, নদীর পারে শ্যামল সম্মোহন
জিতে রাখলো শহর জুয়ার নারী
পায়ের কাছে কাচের শৃঙ্খল
বুকে লাগে আড়কাটারীর ভয়
টেবিল জুড়ে দুরন্ত হাত তুমুল মাংসময়
তিনরাত্রির তিনপ্রহরে এমন জাগরণ
দৃপ্ত উঁচু গর্দান তার এখন সরীসৃপ !

মহাপ্রভুর মৃত্যুর পরে

শৌনক লাহিড়ী

মহাপ্রভুর মৃত্যুর পরে আমাদের তাবৎ সংসার
গতবারের রাসমেলায় এক বিপত্নীক পাহাবাদার সস্তায় কিনে
বহুদিন শহর ছেড়েছে…

মেলা ভাঙার পর সেই গল্প নিয়ে দোতারায় গান গেয়ে
সাধক বাউলকে দেখেছি কোঠা তুলতে—
অনেকদিনের কথা…

মেলা ভাঙার পর আমাদের ভিটেয় ঘর বেঁধেছিল
তেরটি বিষাক্ত সাপ আর সাপুড়ের দল…

মেলা ভাঙার পর নতুন সরকার হয়ে মুছে গেছে
সেইসব সাপের ল্যাজের দাগ,
পচা মাংসের গন্ধ, মহল্লাজুড়ে শীত শীত ভাব...

মেলা ভাঙার পর আর কিছু মনে নেই !

আদিম্মীন, যেন

সিদ্ধেশ্বর সেন

আমার মধ্যে যেন কিছু একটা
ঘটছে
আমি টের পাই

আর, আল্‌গা হ'য়ে পড়ি

ভীড়ের মধ্যে মানুষ যেমন

আল্‌গা হ'য়ে পড়ে
ঘোর-লেগে-গেলে

কিম্বা হাঁটিতে হাঁটিতে গন্তব্য নয় আর, শুধু যাওয়া—
এতো বড় হয়

আমার মনে পড়ে
প্রথম মীন

যে ভেসেছিল
আদি সমুদ্রের জলে, মহৎ প্লাবনে

কিছু ধারণ করতে চেয়ে, কোনও
সংরক্ষণে ?

সে কী সৃষ্টি,
সে কী লয় !!

উপন্যাস

যবনিকার আগে

আশীষ বর্মন

কুমার লজ্জা পেয়ে যায়। আচমকা বোধহয় ওর মনে মার কোলে বাবা চেপেছেন অথবা অনুরূপ বৈপরীত্যমূলক কোনো ছবি ভাসে। ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে। আমি তাড়াতাড়ি বলি 'তুমি বড় হয়ে গোঁফ রাখবে?

'হ্যাঁ।'

'ছোটো না বড়ো?'

'ব্রীজেশ প্যাটেলের মতো।'

'সে-কে?'

'জানেন না? ক্রিকেট খেলে···খুব ভালো।'

'আর গোঁফটা?'

'চীনে ডাকাতের মতো।'

'বাঃ!'

'মা বলেন তাই।' কুমার বলল, তারপর নিজের দুই ঠোঁটের পাশ দিয়ে দুই আঙুল থুতনির দিকে আনতে আনতে দেখায় 'এই দেখুন, এই আসতে আসতে...এই পর্যন্ত...।'

'একেবারে চৈনিক।'

'দুৎ।'

আমি হাসি। কিছু বলার আগেই কুমারের মা ঢুকলেন। হাতে চায়ের কাপ। বললেন, 'তোর পড়া হলো ?'

'হ্যাঁ মা।'

'কটা গোল্লা ?'

'একটা, মাইনাসের অঙ্ক ভুল।'

'খুব !' উনি চা আমার সামনে রাখলেন, বললেন, 'যাও, এবার খেলা কর।'

'মাস্টারমশাই যাচ্ছি···।'

'এসো।'

ও দৌড়ে বেরিয়ে গেলে ভদ্রমহিলা হাতের সাদা খামটি আমায় দিলেন। আজ ছ' তারিখ। পাঁচ কিংবা ছ' তারিখে খামটি পাই, ভিতরে থাকে চল্লিশটি টাকা। আমার একমাত্র উপার্জন। আগের টিউশান দুটো এখন হাতছাড়া। আর টিউশান খুঁজে-খুঁজেও পাই নি; ভালো ইস্কুলে পড়ালে নাকি অনেক পাওয়া যায়। এমনি ইস্কুলে থাকলেও সম্ভবত কিছু কিছু। কিন্তু আমার কপালে এখনো জোটে নি। এটাও জুটেছিল বিমলের দৌলতে; বিমল কুন্তলার সঙ্গে পড়তো। ভদ্রমহিলার কথায় আমি তাকালুম, উনি বললেন, 'আপনার ছাত্র কেমন ক'রছে ?'

'ভালোই তো।'

'বড্ড দুষ্টু, না ?'

'না-না, দুষ্টু কোথায়, চঞ্চল ··।'

'ওই জন্যেই পরীক্ষায় নম্বর যায়।'

'ও কিছু না...সবে তো ক্লাস ওয়ান...ওর বুদ্ধি খুব।'

'আপনিও ওর বাবার মতো···উনি বলেন এ-বয়সে চাপ দিতে নেই।· একবার মন বসলে ছেলে নাকি দিগ্‌গজ হবে।'

'তা হবে।' আমি বলি।

উনি হেসে ফেলেন, তাতে আমারও হাসি আসে। উনি হাসিমুখেই বলেন, 'আর একটা ভালো খবর আছে···শুনেছেন ?'

'কৈ না।'

'সামনের মাসে কুন্তলার বিয়ে।'

'তাই বুঝি, বাঃ !'

'নিজেরাই ঠিক করেছে...রেজিস্ট্রী হবে ..।'

'বেশ।'

'ধূমধাম, অনুষ্ঠান আড়ম্বর সব মানা··· ।'

'ভালোই তো।'

'আপনাদের ভালো লাগে...আমাদেব বয়েস হয়েছে···।' উনি ঈষৎ চুপ করেন, তারপর বলেন, 'ওঁর অবশ্য পুরো সায়···কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, আমার বাপের বাড়ি...।'

ভদ্রমহিলা চুপ করে গেলেন। হঠাৎ হয়তো মনে হয়েছিল একটু বেশি কথা বলে ফেলেছেন। এমনিতেই উনি স্বল্পবাক্, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব। অথচ এতো বছর পরও, একটা গোটা সংসার গড়ে তোলার প্রান্তে দাঁড়িয়ে, ওঁর মন থেকে বাপের বাড়ি মোছে নি। মোছে নি আত্মীয়-স্বজনের পরোক্ষ, অব্যক্ত প্রভাব। নইলে ওঁর মুখে এই সামান্য চিন্তার ছায়া পড়ত না। পাত্র সম্বন্ধে ওঁব নিশ্চয়ই আপত্তি নেই, স্বামীর তো নয়ই। নিজের মেয়েকেও খামখেয়ালী, অবিবেচক মনে কবছেন না স্পষ্টতই, তবু চৈতন্যে কেবল ওঁর অনুষ্ঠানগুলোর জন্মে অভাববোধ থেকে যাচ্ছে। কোনো দুঃখ বা অনুযোগ নয়; আপত্তির কথা তো আবো নিরর্থক, শুধু একটা সঙ্গোপন শূন্যতাবোধ। আশ্চর্য!

ওঁর কথা ভাবতে ভাবতেই আমি রাস্তায় বেরুই, মনে তন্ময় নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা। মানুষের জটিলতার বোধই ছেয়ে থাকে ভিতরে ভিতরে আমার। সংস্কার অভ্যাস সামাজিক প্রথা জড়িয়ে মানুষের নানান্ বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা।

ছোটো পথ, ফাঁকা ফাঁকা। হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হয় পথে অন্ধকার নেই, আছে একটা মিহি আভা। সম্ভবত পঞ্চমীর চাঁদ আকাশের ঢালু প্রান্তে। সারাদিনের গুমোটের পর হাওয়া দিয়েছে। অকস্মাৎই এলো বাতাস, অথবা আমি সচেতন হলুম একটা ঝোড়ো দমকে। হঠাৎ পিছন থেকে উঠল ধুলো; ধুতিটা পালের মতো ফুলে উঠলো। ন্যাড়া পায়ে এসে বিঁধল ধুলো-বালি; আর ঠিক তখনই, আচমকা একটা সর্‌সর্ শব্দ তুলে রাস্তায় দ্রুত ধেয়ে গেল কিছু শুকনো জঞ্জাল, পাতা, সিগারেটের খালি প্যাকেট। আমার গায়ে-পায়ে ঝাপটা দিয়ে গেল এই ঘূর্ণি; আমি সরে দাঁড়াই, তারপর দেখি সামান্য সামনে গিয়ে আচমকা, খবরের কাগজের একটা বড় পাতা, সটান রাস্তায় ফানুসেব মত খাড়া হয়ে উঠল। মনে হলো তখুনি ফুৎকারে উড়বে, ভাসবে শূন্যে। কিন্তু হঠাৎ হাওয়া চুপসে গেল, আর কোনো ঝাপটা উঠল না; এবং কাগজটা মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তায়।

ঠিক তখুনি আমার নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব বিস্রস্ত হয়ে গেল। অকস্মাৎ

টের পেলুম একটা তীক্ষ্ণ সূচাগ্র বেদনা। স্থাণু, স্থিত, নয় সে অনুভব, গতিময় এবং আকস্মিক বিদ্যুৎ ঝলকের মত তীব্র। আর সেই তীব্র অনুভূতি থিতিয়ে গেলে নিঃশেষিত টিকের স্ফুলিঙ্গের মত একটা অস্ফুট বেদনাবোধ ছেয়ে রইল অন্তঃস্থল। শরীর লাগল অবসন্ন, মন রিক্ত। সেই আচ্ছন্ন রিক্ততার মধ্যেই আমি হাঁটতে থাকলুম, চোখে লোকজন দেখলেও মনে কোনো প্রতিধ্বনি উঠল না। বরং সম্পূর্ণ বিমুখ, আত্মগত রইল মন। একাকী পার্কে এসে বসলুম।

এমন রিক্ততার অনুভব আগে কখনো হয়নি আমার। ভাবাক্রান্ত বিষাদ ইদানিং অহরহই টের পাই, তখনো মনুষ্যসঙ্গ ভালো লাগে না, নিভৃতই খুঁজি। কিন্তু স্বতঃই কেউ এসে গেলে, পলটু বা স্বরূপ যখন নাছোড়বান্দা, তখন অন্য কথায়, আলাপে চিন্তার ক্রমান্বয়ে মনের চাপ কেটে যায়। জড়তা বা ভাব আস্তে আস্তে মেলায়। শেষ পর্যন্ত হাসিও।

সমস্ত অবলম্বনই হারিয়ে গেছিল একদা, জেল থেকে বেরুবার পর কিছুদিন মনে হত আমি ছিন্নমূল। উদ্দেশ্যহীন ভাসছি। কিন্তু তখনো ছিল শূন্যতাবোধ, বাইরের কোনো গভীর অবলম্বনের অভাব। কিছু ধরতে পারলেই যে অভাব ঘোচে, যে অভাব ভিতরের রিক্ততা নয়, শুধু মাত্র বৃহৎ একটা উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান, চাহিদা।

এখন কিন্তু মনে হল আমি ভিতরে ভিতরেই ফুরিয়ে গেছি। এ রিক্ততা-বোধ শারীরিক, আত্মিক, একান্ত ব্যক্তিগত নিজস্ব নিঃস্বতা। বহির্বিশ্বের জাগতিক কোনো অবলম্বনের পতন নয়, ভিতরে ভিতরে নিবিড় এক আত্মক্ষরণ, সম্পূর্ণ একাকিত্ব।

প্রেমে পড়েছি একথা আমি কোনোদিন মানি নি। ইতিপূর্বে কখনো স্পষ্ট টেরও পাইনি ব্যাপারটা। এক অপরিচিত সচেতনতা জাগে প্রথম কুন্তলার সান্নিধ্যে। ওর অনায়াস যাতায়াত, কথা, উন্মুক্ত চাউনি, মুখের শুদ্ধ ডৌল ক্রমশ, বনের কুয়াশায় চাঁদিনীর আলোর মতো আমার মনে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু সে-কথাও সরাসরি স্বীকার করি নি, উপেক্ষা দিয়ে ঢেকেছি। ঢাকলেও, না মেনেও অবশ্য অশান্তির হাত থেকে পার পাইনি। এবং যেহেতু সে অশান্তিও অস্বীকারে অহরহ ঢাকার চেষ্টা করেছি, তাই হয়তো তার স্বরূপ হয়েছে বক্র। বেশির ভাগ সময়ই তা আত্মসম্মানকে, অহংকে আঘাত করেছে, বেদনা ছাপিয়ে উঠেছে অক্ষম বিরক্তি কিংবা রাগ। নিজের অসহায়তার উপলব্ধি।

মূলত এই অক্ষমতার জন্যেই আমি সঙ্কুচিত হয়ে থেকেছি সারাক্ষণ, আত্মরক্ষার নানাবিধ ব্যূহ রচনাই করিনি শুধু, মনকে চোখও ঠেরেছি। কেননা আমার অবস্থায় প্রেমে পড়া বাতুলতা একথা কেউ না বললেও নিজের কাছে ছিল স্পষ্ট। অথচ আত্মজ্ঞান ও বুদ্ধিই মানুষকে সর্বাবস্থায় বাঁচায় না। যেমন জলহীন মরুতেও তেষ্টা পায়, খাবার না থাকলেও খিদে, যুদ্ধের মধ্যেও ঘুম। এ-ও তাই হল, আত্মরক্ষা বলিদান, ঔদাসীন্য শুধু দাঁড়াল ভেক। সে ভেক ভেঙে গিয়ে, ক্রমশ টের পেতে থাকলুম, হঠাৎ হঠাৎ আমার চৈতন্য উন্মুক্ত ভাস্বর সত্তার মুখোমুখি হচ্ছে।

একদিন আচমকা কুন্তলা বলেছিল, 'মাস্টারমশাই, আপনি খুব ভাবেন, না?'

'কি জানি, কেন বলুন তো?'

'আপনার চোখ দেখে মনে হয়।'

ওর নির্নিমেষ, স্বচ্ছ, হাল্কা দৃষ্টির সামনে আমি অকস্মাৎ তাল হারাই। ওর মুখের ডৌলে, ত্বকের মসৃণ নম্রতায়, অকপট চাউনির আলোয়, নিজেকে একান্ত অগোছালো লাগে। সেই অন্তর্লীন বিস্রস্ত ভাবটুকু লুকোবার চেষ্টায় হাসি, তাড়াতাড়ি বলি 'ভাগ্যিশ নিজের চাউনি দেখা যায় না।'

'হাসি নয়, সত্যি বলুন দিকি।'

'কি বলব···এসব কথা...।'

'এতো কি ভাবেন?'

'ভাবে তো সবাই... এক একজন এক এক রকম।' কুন্তলা অনাবিল হাসল, ওর মুখের অভিব্যক্তি বরাবর একই রকম খোলামেলা, অকাট্য। বলল 'আপনি এড়াচ্ছেন।···আচ্ছা, একটা কথা বলুন, মানুষ কি নিজেতে নিজে ভালো থাকতে পারে না?'

'চেষ্টা তো করে···তার থেকেই প্রগতি।'

'প্রগতি-ট্রগতি বুঝি না...সুখী থাকতে পারে?'

'সেটাও তো প্রয়াস, সবারই তাগিদ, ইচ্ছে।'

'আমি ইচ্ছে করলে সুখী থাকতে পারব?'

এবার আমি হেসে ফেলি, স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে মন ছেয়ে যায়, বলি 'নিশ্চয়ই।'

'আপনি?'

'জানি না।'

'বাঃ, আমারটা জানেন নিজেরটা জানেন না!'

জবাবে কিছু বলি নি। তখনো আমার মুখে হাসি ছিল, তাই উত্তর এড়ানো যায় অনায়াসে। এবং কুমার এসে অন্য কথায় টেনে নেয়। কিন্তু জবাব দিতে হলে সত্যিই আমি মুস্কিলে পড়তুম। বলতে পারতুম না যে কিছু কিছু দিব্যকান্তি আলোর রেখার মতো, যেমন তুমি। ভোরে যে রেখা গগনে ফোটে। তাকে দেখেই মনে হয় সে সুখী, শিশিরে শিউলি যেমন।

দিন তিনেক স্বকু বেপাত্তা। আমি ওর বাড়িতে গিয়ে ডাকি না বহুকাল। হঠাৎ গগনজ্যাঠা বেরিয়ে এলে মাটিতে মিশে যাব। স্বকুও জানে আমার অবস্থা, তাই অলিখিত নিরুচ্চার ব্যবস্থা ছিল আমাদের। ডাকত ওই, আমি রাখতুম নজর। একটু খেয়াল রাখলেই, সময়মতো ও-বাড়ির পানে দৃষ্টি দিলেই, ওর দেখা পেতুম। ওর ডাকাডাকির তো কোনো সময়-অসময়ই ছিল না।

কিন্তু ক'দিন যাবৎ ও আর ডাকে নি। নজর রেখে রেখে বুঝেছি সে দুপুরে ও থাকে না। বিকেলে ও সম্ভবত বাড়ি ফেরে আমি টিউশানে যাবার পর। সকালে পলটু যখন বেরোয় তারও আগে নিরুদ্দেশ। অন্তত রকে দেখি নি তাকে, চোখে পড়ে নি ওদের জানলায় বা সদরে। রাতে কখন আসে তাও জানি না। আমার নিজেরও ফেরার সময় ইদানিং অনিশ্চিত। তাই পলটুর সঙ্গেই এ-ক'দিন তেমন কথা হয় নি। পলটুও এখন বোধহয় অফিস শেষে ছায়ার সঙ্গে সময় কাটায়!

আমার মন অবসাদে ভার। বিক্তাবোধই শুধু নয়, তার তলায় থাকে সঙ্গোপন রক্তক্ষয়ের বেদনা। এ-বেদনা অন্তক্, কোনো আদান-প্রদানের পথ নেই। নিজের কাছেই যা অস্বীকৃত, যা অন্তত এতদিন ছিল রুদ্ধ, চাপা; তাকে মেলে ধরা অসম্ভব। তা ছাড়া করুণা আমার শ্লাঘায় লাগে, এমন কি স্বকু বা পল্টু সব জেনে বস্তুতই অনুকম্পা, সহানুভূতি বোধ করবে এ-কথা ভাবতেও আমার মর্যাদায় বাধে। এ-সহানুভূতি শুধু আমার অক্ষমতাকেই তুলে ধরবে। কুণ্ঠার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে না পারার অক্ষমতাই নয় শুধু, সেটা অন্তত বন্ধুদের কাছে লাগবে স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বাভাবিক লাগার ভিতরেই থাকবে আমার অবস্থার প্রতি করুণা। আমার দুঃস্থ

পরিস্থিতি ভেবে পড়বে দীর্ঘশ্বাস। সে-আমার সইবে না; তাই আমি বহুক্ষণ একা-একা পার্কেই কাটিয়েছি এ-কদিন।

হঠাৎ সেদিন পল্টু ধরল, বলল, 'স্বকুর ব্যাপার শুনেছিস ?'

'কিসের ?'

'ও চাকরি পেয়েছে…বুধবার থেকে।'

'যাক্!…বাঁচল তাহলে।'

'তুই জানতিস্ ?'

'না, ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।'

'হবে কি করে…শালা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে…আজই আমার সঙ্গে মুখোমুখি পড়ে গেল।'

পল্টুকে সত্যদার কাছে যাওয়ার কথাটা বলি নি। বিশেষ কোনো কারণও ছিল না বলার, উপরন্তু তারপর থেকেই আমার মন প্রায় উৎসন্ন, ভবঘুরে। ওর সঙ্গে সময়ও কেটেছে কম। তবু আমি যে এ-রকমই একটা অনুমান করেছিলুম তাও ওকে বললুম না। বললেই কথা বাড়বে, আলোচনার চক্রে সত্যদার প্রসঙ্গও উঠে পড়তে পারে। তাতে অনর্থক পল্টু মাতামাতি করবে, হয়তো যা-তা বলবে স্বকুকে। তাতে কারুর লাভ হওয়া তো দূরের কথা, আমার আর স্বকুর মধ্যে অহেতুক ব্যবধান বাড়বে। এমনিতেই হয়তো ও মরমে মরে আছে, এবং আছে বলেই এ-কদিন সযত্নে আমাদের এড়িয়ে গেছে। কিন্তু পল্টু এসব মনোভঙ্গির ধার ধারে না, সে একবগ্গা তার স্টিম রোলার চালিয়ে যাবে। বিশেষত এ-ক্ষেত্রে, সত্যদা বা কংগ্রেসকে এক হাত নেওয়ার সুযোগ পল্টু সহজে ছাড়বে না।

এমনিতেই সে স্বকুকে পরিত্রাণ দেয় নি। বাড়ি থেকে ধরে এনেছিল। আমাকে বলেছিল 'তুই রকে বস্…আমিআসছি।' আমি জানতুম ওর উদ্দেশ্য, তবু অপেক্ষা করেছিলুম। কারণ আজ না হয় কাল স্বকুকে আমার মুখোমুখি হতেই হবে। একপাড়ায় পাশাপাশি সারাজীবন উটপাখী হয়ে কাটানো দুঃসাধ্য। যত সত্বর সম্ভব ওর ব্রীড়া ভাঙাই ভাল, তাতে উভয়ত মঙ্গল।

স্বকুর এগিয়ে আসার মধ্যে অল্প সঙ্কোচের আভাস ছিল। সেটা আসবার সময় আমার চোখ এড়ানোয় যত না স্পষ্ট লাগে তার থেকে বেশি মনে হয় ওর পল্টুর সঙ্গে হাসতে হাসতে এগনোর অস্বাচ্ছন্দ্য ভঙ্গিতে। কিন্তু কাছে এসে ও সোজাই তাকাল আমার দিকে, চোখে ঈষৎ অনুনয়, সিধে বলল, 'আই অ্যাম সরি…বাদ্‌লা!'

আমি বলি 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে...বস্।

'না সত্যি...বিশ্বাস কর।'

'কী আশ্চর্য! তুই কি করবি...চেষ্টা তো তুই-ই করেছিলি।'

'এখনো করছি ..সত্যদাও বলেছেন দেখবেন।'

'ফাইন।'

পল্টু বিপরীত পাশে নিঃশ্চুপ বসেছিল। কোনো কথা না বলে নাকের চুল ছিঁড়তে লাগল সে একাগ্র মনে। ওকে অনেক করে বুঝিয়ে পাঠিয়েছিলুম। এখন বুঝলুম ও আপ্রাণ প্রয়াসে নিজের কথা রাখছে। কোনো গালিগালাজ ও উচ্চারণ করবে না, অন্তত এখুনি।

কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা হল না। দুঃখ প্রকাশের প্রাথমিক পর্বের পর স্বকুও যেন কেমন ছোটো, ম্রিয়মান হয়ে গেল। আমিও তখুনি কিছু বলার পেলুম না। এমন কিছু যা এই স্তব্ধতার মধ্যে শোনাবে স্বাভাবিক। বরং অর্ধবিস্ময়ে টের পেলুম যে স্বকুকে দেখে, ওর মুখের সসঙ্কোচ প্রসাদে, অনুনয়ের ছায়া সত্ত্বেও, আমার মন ধ্বক্ করে উঠল। ঠিক তপ্ত অঙ্গারের অনুভূতি অথবা সোজা রাগের বিষ নয়, কিন্তু একটা অন্তর্নিহিত জ্বালার রেশ খেলে গেল ভিতরে ভিতরে। অনেকটা বিদ্যুতের শক-এর মতো চিনচিনে উপলব্ধি।

স্বকু হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙল। নিম্নস্বরে, স্বগতোক্তির মতো বলল, 'কোয়ালিফিকেশন হিসেবে কাজটা তোরই পাওয়া উচিত ছিল, বাদল।'

সঙ্গে সঙ্গে পল্টু প্রায় লাফিয়ে উঠল, ওর সামনে সটান দাঁড়িয়ে বলল, 'তো পেলো না কেন? ..শালা! হারামী।'

'আমিই বাগড়া দিয়েছি।'

স্বকুর স্পষ্ট জবাবে আমি শুধু না, পল্টু বেসামাল হয়ে গেল। শুধু ওর জবাবে বলা ভুল, আসলে ওইটুকু স্বীকারোক্তির নির্জীব ভঙ্গিমায়, গলার মৃদু স্বরে, আর ওর রক্তহীন, ফ্যাকাশে মুখ দেখে। এক পলক নির্বাক, পাংশু, ক্লিষ্ট স্বকুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পল্টু, আমি তাও পারি নি। তারপর সে নিঃসাড়ে ফুটপাত থেকে একটু মুখ বাড়িয়ে রাস্তার নালীতে থুতু ফেলল। ফেলে এসে বসল সে স্বকুকে এড়িয়ে, আমার পাশে। কেউ কিছু বললুম না, অন্ধ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলুম তিনজনেই, পাশাপাশি বসে থেকে একই র'কে। তারই মধ্যে হঠাৎ পল্টু সিগারেটের

প্যাকেট বের করে নির্বাক ধরলো আমার সামনে ; পরে, অল্প ঝুঁকে, আমাকে পেরিয়ে সুকুর দিকে। তিনজনেই সিগারেট ধরালুম।

অল্পক্ষণ পরেই সুকু উঠল। পল্টু বলে, 'যাচ্ছিস ?'

'হ্যাঁরে, আমায় একবার পার্টি অফিস যেতে হবে।'

'সন্ধেবেলা আসছিল তো ?'

'আসব...চলিরে বাদলা।'

'আয়।'

সুকু চলে গেল। ওর মনের অশান্তি কাটে নি এখনো। হয়তো আড়ালে কমবে, কিংবা কেটে যাবে সম্পূর্ণ। কিন্তু আমার মুখোমুখি ওর অস্বস্তি সহজে যাবে না। অথচ এখন, এ-মুহূর্তে, আমার জ্বালাটা অন্তর্হিত। যা রইল তা অবসাদ, এক ক্লান্ত শূন্য মন।

পল্টু কথা বলল আবার, সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, সেটা ফেলে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল 'বাবা ফের এসছিল জানিস ?'

'শুনলুম !'

'এদিকে মা তো টসকাচ্ছে।'

'কি বলছেন ?'

'মুখে বলছে না কিছু, কিন্তু হাবেভাবে, কাঁদুনিতে বোঝাচ্ছে।'

'সে-মহিলার কি খবর ?'

'সে-মাগীকে বিদায় দিয়েছে···তাই তো মার কাঁদুনি···সংসার কে দ্যাখে · সাত-পাঁচ ঘ্যানোর ঘ্যানোর।'

'উনি ফিরে যেতে চান ?'

'আর একবার সাধিলেই খাইব।'

আমি ওর কথায় হেসে ফেলি, বলি 'ভালোই তো।'

'কিসের শালা ভালো ?...বুঝলি, টাকাই আসল জিনিস···আর সব ঝুটা।'

আমি চুপ করে থাকি। ওর মর্মবেদনা আমার অজানা নয়। বাবার কাছে মাথা নোয়াতে ওর যত আপত্তি এ-দিকের সমস্যাও ততটা ঘোরতর। একদিকে মায়ের ফেরার ইচ্ছে, নিজের ফাঁকা সিংহাসনে আবার অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ওদিকে প্রেয়সী ছায়ার অন্ধগলি। মেয়েটি চাকুরিজীবী, কিন্তু আর-দুটি ভাই-বোন ও বাপ-মার আশ্রয়স্থল। তারই জীবিকায় তাঁদের জীবন-ধারণ।

প্রথমে এ-ব্যাপারে পল্টু গা করে নি। অত ভাবা ওর ধাতে

আসে না। ভবিষ্যৎ সে কোনোকালেই চিন্তা করে নি, কোনো বৃহৎ পরিমণ্ডলে তার মাথা চলে না। কিংবা চলে তখনই যখন সেটা ব্যক্তিগত সমস্যায় পরিণত হয়। বিয়ের ভাবনায় তাই তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, বুঝল ছায়া অকস্মাৎ বিয়ে করে গৃহিণী হলে তার বাপের বাড়ি ডুবে যাবে। এবং যাবে বলেই, অন্তত অনির্দেশ্য সময় অবধি, সে-কথা সে নিজের হৃদয় থেকে সরিয়ে রাখে।

মেয়েটির সঙ্গে আমারও আলাপ করিয়ে দিয়েছিল পলটু। ও সিনেমা দেখে একদিন রেস্তোরাঁয় খাবার ব্যবস্থা করে। খাবার জায়গায়ই ছায়াকে আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করি। রং কালো কিন্তু সুশ্রী, বেশ দীঘল। কথাবার্তায় কোনো জড়তা নেই, না প্রগলভতা। স্থিতধী, এবং স্বভাবতই শান্ত হোক বা না হোক, সংবৃত। হাসিটি সুন্দর, আর যখন হাসে তখন হঠাৎ তার দৃষ্টিতেও ছড়িয়ে যায় হালকা খুশী। কিন্তু এমনিতে ওর চাউনিতে ছিল বিষাদ, গভীর অভিজ্ঞানের ছায়া। জীবন যে অনেক আগে-আগেই ওর উচ্ছ্বাস, বিহ্বলতা আকাশ কুসুম অবিন্যস্ত করে দিয়েছে তা স্পষ্ট।

আমি বলেছিলুম 'ছবি কেমন লাগল?'

'ভালো···আপনার?'

'বেশ রং চড়ানো।'

'আমার এ-রকম ফিল্মই ভাল লাগে।' ও হাসল, তারপর পলটুর দিকে ইসারা করে বলল 'আপনার বন্ধু তো কিছু বলছেন না।'

'ও চিন্তা করছে।' আমি বলি।

'চিন্তা! ওর কোনো চিন্তাটিন্তা আছে নাকি?' পলটু বলল 'এক তোমার চিন্তা।'

'ইস্‌স্‌, আমার কথা কত ভাবো!'

'তোমার না, তোমার গুষ্টির।'

হঠাৎ যেন ছন্দপতন হয়ে গেল। আচমকা কথাটা বলে ফেলে পলটুও সম্ভবত আফশোষ করে। অন্তত তৎক্ষণাৎ চোখ নামায় খাবারের দিকে। ছায়ার মুখটাও শুকনো হয়ে আসে। পরিষ্কার বোঝা যায় তার ত্বকের উপর দিয়ে ছড়িয়ে যাওয়া ম্লান আভা। আমি তাড়াতাড়ি বলি 'আপনারা বাড়িতে ক-জন?'

'পাঁচ...আমরা দুই বোন এক ভাই, মা-বাবা।'

'আপনি বড় না ছোটো ?'

'আমি সবার বড়, আমার ছোটো বোন সেকেণ্ড ইয়ারে, ভাই ক্লাস এইটে··· দুই বোন মারা গেছে।'

এরপর আমি আর কথা বলতে পারি না ; চুপ করে যাই। খেতে খেতে ভাবি কি বলব, কিছু একটা বলতে পারা উচিত যা কানে সহজ লাগে। অথচ যত বিলম্ব ঘটে, সময় যায় নীরব থাওয়ায়, ততই সব যেন অবিন্যস্ত হয়ে ওঠে। শেষে ছায়াই কথা বলে, বাঁচায়। এবং তার কথা কওয়ার ভঙ্গিতে, প্রসঙ্গ নির্বাচনে, স্বরে স্পষ্ট বোঝা যায় তার বুদ্ধি পরিণত, সংবৃত মন, সে বলল 'আপনি কিছু বলুন ?'

'আমি ?'...আমার কি বলার আছে ?'

'নিজের কথা ?'

'নিজে বেকার, একটা টিউশান করি এবং আরো খুঁজি।'

'চাকরি আপনি পেয়ে যাবেন...আর কে কে আছেন বাড়িতে ?'

'মা, অসুস্থ-অক্ষম বাবা...আমায় তো দেখছেনই।'

ছায়া মৃদু হাসল। তারপর হয়ে গেল গম্ভীর, চিন্তাচ্ছন্ন। আমার দিকে তাকিয়ে থাকা ওর দুই চোখ যেন বিষাদে ভাসে। ও বলে, 'আমরা সবাই অক্ষম।'

'সবাই মিল্‌লে আর থাকবো না।'

'কি জানি।'

আমি কি বলতে গেছিলুম আমি জানি। কিন্তু কথাটা মুখ থেকে বেরোয় নি। বেরোয় নি কেননা অন্তঃস্থলে সংশয় ছিল, অজানা ছিল কবে এ-অঘটন ঘটবে, আর সেই অনির্দেশ্যবোধে কোনো কথা চলে না। অন্তত এ-অবস্থায়। এ-কথার কারচুপি কেমন অসংলগ্ন শোনায়, প্রয়োজন আশু সম্ভাবনার, আশার। পল্টু বলল 'আর কিছু নেবো ?'

'আমার জন্যে না।'

'বাদ্‌লা, তুই কি নিবি ?'

'কিছু না...এনাফ্‌।'

'চিকেন দো-পেঁয়াজা...?'

'না থ্যাঙ্কস্‌।'

'শালা খেয়ে নে...রোজ তো ডাঁটা চিবোস্‌।' ছায়া বলল, 'তুমি নাও না।'

'হ্যাঁ তুই নে...বেয়ারা।' আমি ডাকি।

'নেহি-নেহি...না ভাই কিছু চাই না।'

বেয়ারা সরে গেলে ছায়া বলল, 'এটা কি হলো?'

'আমি কি একা খাবো নাকি?' পলটু বলে।

'খেলেই বা...আমরা গল্প করব।'

'কি না আমার গল্প, আহা!'

সেদিন আর জমে নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা উঠে পড়েছিলুম। আসলে অন্তর্নিহিত কোনো সমস্যার চাপ নিয়ে কিছুই জমে না, এহেন আলাপ তো নয়ই। তাই দোকান থেকে বেরিয়ে, পান মুখে দিয়ে, আমরা দু-দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলুম। পলটু গেছিল ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে, আমি উঠলুম অন্য বাসে। পরে পলটুকে বলেছিলুম 'মেয়েটি খুব ভালো।'

'তাতে আমার কি শালা...।'

'সে কি-রে!'

'ও নিজের খোঁয়াড় ছাড়তে নারাজ।'

'তুই মাসীমাকে ফেলতে পারিস?'

'না পারি না, তাতে কি?'

'তবে ছায়াকেই ত্যাগ কর।'

'শালা! শুয়োর...!'

আমি হাসি, চেয়ে থাকি ওর দিকে কিছুক্ষণ। আর হঠাৎ দেখি পলটু রক্তাভ, নম্র হয়ে গেছে। মুখে সলজ্জ হাসি এবং সে অন্য দিকে দৃষ্টি সরিয়েছে! আমি সহাস্যে ওর কাঁধে তখন চাপড় বসাই, বলি, 'যাক্, তুই মানুষ হয়ে গেলি!'

'হারামী কোথাকার!'

'আমায় গালাগালি দিয়ে কি লাভ?...এবার পার পাওয়া শক্ত।'

'ব্যাটা, কোনো বুদ্ধি দিতে পারিস্ না...শুধু প্যাঁচ!'

'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা।' আমি বলি। ও তাকায়, বলে, 'তার মানে?'

'ছায়ার টাকা ও বাপ-মাকেই দিতে পারবে · তোর বাবার সংসারে লাগ্‌বে না।'

'ঠাট্টা করছিস?' পলটু নির্নিমেষ চেয়ে থাকে।

'না-না সত্যি। তাছাড়া তোর বাবা যখন...?'

'তুই থাম্ তো!'

অগত্যা আমি থেমে গেছিলুম। আজ পলটুর মুখ দেখে মনে হল ওর আগের সেই বিদ্বেষ অনেক ম্রিয়মান. বাবার কথা বলার সময় ওর নির্বিকার অভিব্যক্তি। আগের মতো মুখ কঠিন, গনগনে হয়ে ওঠে না। প্রথমত ওদের সংসারের নিছক ব্যক্তিগত যে-ঘটনায় ও গোড়ায় উন্মত্ত বোধ করেছিল, সেটা ক্রমান্বয়ে কালক্ষেপে, নানান গালিগালাজে, পৃথক থাকায়, মাসীমার মেরুদণ্ডহীনতায় এবং সর্বোপরি পিতার আপাত পরাজয়ে এখন কেমন অভ্যস্ত গতানুগতিকতায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ইদানিং উদ্ভূত ওর নিজস্ব, একান্ত, অন্তরঙ্গ কিন্তু গভীর নিরন্তর অনুভূতি। যা ওকে আজ অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি যেমন জোগাচ্ছে, যেমন দিচ্ছে চিন্তার খোরাক, তেমনি আবার ব্যক্তিগত আকর্ষণে দীর্ণ করছে অহরাত্র। এই দো-টানা যে শুধু ওর পক্ষে নতুন অভিজ্ঞান তাই নয়, হয়তো ওর ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং বাবার সম্বন্ধে বিদ্বেষকেও পাণ্ডু করে দিচ্ছে।

এবং ইতিমধ্যে মাসীমা আমায় ডেকেছিলেন। তখন দুপুর, পলটু অফিসে। আমি আমার কাচা সার্ট দড়ি থেকে তুলছিলাম। হঠাৎ উনি দাওয়ার ওপাশ থেকে ডাকলেন,

'বাবা বাদল, শোন।'

আমি জামা হাতে এগিয়ে গেলে বললেন 'ঘরে এসো...কথা আছে।' ওঁর পিছন পিছন গেলুম ঘরে। মনে মনে অস্বস্তি হল কিন্তু কোনো আশঙ্কা ছিল না। ইদানিং মাসীমা ভালোই আছেন। মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করেন, মাকে খেয়ে নেওয়ার তাগাদা দেন; এমন-কি মাঝে মাঝে আমাদের ঘরেও আসেন। মুখে হাসি আছে। কান্না ঠিক না, তবে কাঁদুনি যেটা গান সেটা ছেলে রাতে বাড়ি ফিরলে। তাকে খেতে দিয়ে কিংবা শোবার সময় অবশ্য শুধু একটা গুঞ্জনের মতো আওয়াজ ওঠে, নিম্নকণ্ঠে পাশের ঘরে এক নাগাড়ে কিছু বলে গেলে যেমন শোনায়। তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

অর্থাৎ ওঁর সেই পাগলামি, আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত, একেবারে গত। ওর উন্মত্ত গালিগালাজের কথা ভাবলে আজকাল অবাকই লাগে। মানুষটা যখন স্বাভাবিক আছে, আছে আপনমনে কিংবা সাধারণ সাংসারিক আদান-প্রদানের মধ্যে, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। অবুঝ, স্বার্থপর তো নয়ই, বরং মানবিক ও সহানুভূতিসম্পন্ন। তাই যখন উনি আমায় ঘরের

তক্তপোষে বসালেন, এবং নিজে বসলেন পাশে, তখন আমার শঙ্কা দূরের কথা ঈষৎ বিমূঢ় লেগেছিল।

উনি বললেন, 'তুমি বাবা একটু বোঝাও ওকে...পল্টু তোমায় ভীষণ ভালোবাসে।'

আমি হাসলুম, বললুম, 'আপনার থেকে বেশি না, মাসীমা।'

'তা হোক···তোমায় মান্য করে। বলে তুমি খুব জ্ঞানী···।'

'কি বলব বলুন ?'

'এই আর কি, বুঝতেই তো পার···ও হল সাহা পরিবারের বড় ছেলে, আশা...বাপ কি ভুল করল তার শাস্তি ভগবান দেবেন···কিন্তু ও-কেন মুখ ফিরিয়ে থাকবে সারা জীবন, বল ?'

'মাসীমা আমি ওকে আগেই বলেছি···।'

'ভালো করে বোঝাও দাদা আমার' উনি হঠাৎ আমার হাত ধরলেন, বললেন, 'তুমি বোঝালে ও নিশ্চয়ই বুঝবে...ছেলে আমার খারাপ নয়।'

'মোটেই না, পল্টু খুব ভালো ছেলে।'

'তাই বলছি বাবা...তুমি একটু বোঝাও ওকে···আমার অনুরোধ···আমি তোমার মায়ের মতো।'

'এ-ভাবে বলবেন না। আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।'

'তোমার মঙ্গল হবে বাবা, দেখ, ভগবান তোমায় অনেক বড় করবেন।'

আমি উঠে পড়ি। উনিও ওঠেন, বাধা দেন না। শুধু নিম্নস্বরে বলেন, 'আর একটা কথা বলব দাদা...কিছু মনে করো না।'

'না-না, বলুন।'

'মাসে মাসে আমি একশ' টাকা তোমায় পাঠিয়ে দেব...।'

'সে আবার কি, মাসীমা ?'

'ত্যাখ বাদল, আমি তোমার মায়ের মতো...মায়ের থেকেও বয়েসে বড়··· আমার দুটি না হয়ে তিনটি ছেলেও তো হতে পারত...তার সংসারও আমারই সংসার···নয় কি ?'

আমি কিছু বলতে পারি নি। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে চলে এসেছিলুম। তেজ দেখাবার সামর্থ আমার অনেককালই গত। মিনিমাসীর সাহায্য, বন্ধুদের দান, পলটুর বাড়িভাড়ার ছুতোয় বেশি টাকা দেওয়া, সবই ক্রমান্বয়ে ধীর প্রাত্যহিক ঘর্ষণে আমায় ভোঁতা করে দিয়েছে। মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়ার যে দুর্মর বাসনা তার হাত থেকে আমিও পার হতে

পাই নি। নিছক বাঁচার তাগিদই যে ভিক্ষাবৃত্তির উৎসে মৌল কারণ, একথা আমি হাড়ে হাড়ে মানি। তাই দারিদ্র্য ও বেকারী যে-সব দেশে নেই, ভিক্ষুকও সেখানে নির্মূল।

উপরন্তু মাসীমার গলার স্বর, অভিব্যক্তি, দৃষ্টির অনুনয় ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে দিয়েছিল। ঘটনাটা আর নিছক সহায়তা হিসেবে ওঁর কাছে থাকে নি, থাকে নি আকস্মিক বদান্যতাবোধ। প্রতিদানের যে-আবেগ ও অভ্যাস মা ও সন্তানে দাঁড়ায়, গড়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রীতে বা ভাইয়ে-ভাইয়ে, ভাই-বোনে, তারই রকমফের ওঁর সত্তার উৎসে। আসলে স্বামী সংসার ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায়, আশু সম্ভাবনায়, ওঁর মমত্ববোধ ব্যাপ্তি পেল। আর সেই মমত্ববোধের মূল উৎস শক্ত করেছিল আপন অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত দুঃসময়—যা ওঁকে শুধু অন্তরের যন্ত্রণা এবং বিদ্বেষেই শতধা ছিন্ন করে নি এতদিন—সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের চেহারাও দেখিয়েছিল, তা সমাচ্ছন্ন ওঁর চৈতন্যে এখন।

পল্টুর কাছে প্রসঙ্গটা পাড়বই স্থির করেছিলুম মনে মনে। মাসীমারও তাগাদা ছিল। কিন্তু আমি কথাটা পাড়ার আগেই একদা পল্টুই কথা তুলল। রাত্রে খাওয়া শেষ করে একদিন আমায় ডেকে নিয়ে গেল রকে। সিগারেট দিয়ে এবং ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আজ বাবা আমার অফিসে গেছিল, বাদ্‌লা।'

'তাই নাকি...কি বল্লেন?'

'সে অনেক ধানাই-পানাই···ওস্তাদ লোক!'

'তাতে তোর কি...আসল কথাটা বল্।'

'আসল কথা ফিরে যেতে বলছে...বলছে মা নাকি পা বাড়িয়েই আছে··।'

'মাসীমা আমাকেও বলেছেন...।'

'কি বলেছে?'

'এই তোকে বোঝাতে...বড়োদের শাস্তি ভগবানই দেন···তুই পরিবারের বড় ছেলে···।'

'বালের ছেলে...শালা! শোন্, ও-সব ভড়কির কথা রাখ। মোদ্দা কথা হচ্ছে আমায় অফার দিয়েছে ভালোই...। মানে ছায়ার যা সংসারের প্যাঁচ, তাই বলছি...।'

'কি বলেছেন তোর বাবা?'

'বলেছে ওর ব্যবসা দেখাশুনো করতে হবে...মানে রেলের যে কন্ট্রাক্টারী, তাতে সুপারভাইজাররা খুব মারে, ধ্বসায় আর-কি...আমায় সে-সব দেখতে হবে···মাসে হাজার টাকা দেবে··· ।'

'ছায়ার কথা বলেছিস ?'

'সব বলেছি ঝেড়েকেশে···বলব না কেন?···কিছুতেই আপত্তি নেই। শুধু বউমা চাকরী করবে এটা নাকি ওঁর পছন্দ না। নাই হোক, আমি সাফ বলেছি ওকে বাড়িতে টাকা দিতে হবে, চাকরী ও ছাড়বে না।'

'তখন ?'

'তখন আর কি···বুড়ো ভাম, তুই চিনিস না মালটি···চুপ মেরে থেকে বলল, সে দেখা যাবেখন।'

'ছায়াকে বলেছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলে ?'

'বলল, তোমার বাবা তুমি যা ভালো বোঝো করবে...সবই তো বলেছ।'

'তাহলে, কি করবি ঠিক করলি ?'

'তুই বল্ ?'

আমি বললুম, 'মাসীমাকে রাখা যাবে না···ওঁর মন ওখানে পড়ে আছে। তোদেরও গভীর সমস্যা। তোর যাওয়াই ভালো।'

'তাই ভাবছি।' পল্টু বলল।

পল্টুরা যেদিন চলে গেল তার পরের দিন থেকেই বাবার অবস্থা সঙ্গীন দাঁড়ায়। এখন তিনটে ঘর, রান্নার জায়গা সবই আমাদের, তাই পল্টুর ঘরটায় আমি রাত্রে শুই। অর্থাৎ রাতে বাড়ি ফিরে দেখি মা আমার বিছানা পেতেছেন ও ঘরে। খাওয়ার পর বললেন, 'পাশের ঘরে তোর বিছানা করেছি।'

'হঠাৎ ?'

'ঘর তো ফাঁকাই...রাতে তোর অসুবিধেও হয়।'

'তুমি কি করবে ?'

'আমি ওঁর কাছেই থাকব।'

তাই থাকলেন মা। উনি যে ও-ঘর ছাড়বেন না সে বলাই বাহুল্য। সেটা

সম্ভবও না, নার্স থাকলে যা স্বাভাবিক হতো আমাদের অবস্থায় তা অচল। অবশ্য নার্স থাকলেও মার মন পড়ে থাকত ও-ঘরে, যেখানে রুগী। সারারাতে বারংবার হয়তো ঘুরে ঘুরে যেতেন মাঝে মাঝে, সম্ভবত পাশে বসে বাবার পিঠে-পাঁজরে হাত বুলোতেন। তাতে ফল কি হয় জানিনে, অন্তত দেখে তো মনে হয় না ক্লেশের কোনো উপশম ঘটে। বরং হঠাৎ কখনো কখনো বাবা উত্যক্ত হন, হাত সরিয়ে দেন রূঢ়ভাবে। অবশ্য সেটা সাধারণত দেখা যায় অন্য কোনো অশান্তির প্রকোপে, অথবা অক্ষম প্রতিবাদে। যাতেই তা ঘটুক না কেন মায়ের কিন্তু বিশেষ বিকার হয় না. নিশ্চুপ ক্ষণকাল বসে থেকে আবার হাত বোলান। অবিলম্বে না হোক, সময় গেলে তো বটেই। এ-দিকে মা নিজে ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছেন। শীর্ণতার কথা বাদই দিলুম, কিন্তু কোটরের চাউনির ক্লান্তি, চোখের তলার কালিমা, দুই রিক্ত হাতের হাড়, সবই অভিন্ন ইঙ্গিত দেয়।

এই নৈরাত্ম্য নিবেদন, নিঃশব্দ সেবার প্রেরণার উৎস কি, মাঝে মাঝে ভেবে আমি থৈ পাই না। এ-যে কেবল নিরাপত্তার অবলম্বনকে আঁকড়ানো, যে প্রাণের পুষ্টি যোগায় তাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা, তা ভাবা মুস্কিল। বাবা অনেককালই সে-দিক থেকে অক্ষম, পেনশান্ যা পান তা বিন্দুবৎ; সংসার বহুদিন হলো চলে মিনিমাসী ও পল্টুর ঔদার্যে। তবু মার নৈরাত্ম্য সাধনায় কোনো ভাঁটা পড়ে নি, আত্মত্যাগ দিনে দিনে হয়েছে আরো আয়ত, ব্যক্তিগত সাধ ও আকাঙ্ক্ষা আরো সুদূর। কিংবা হয়তো আপাতত সমস্ত ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রে বাবা; বাবার আরোগ্য না হোক অন্তত ক্লেশের যন্ত্রণার উপশম।

কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক আত্মত্যাগের প্রেরণা আসে কোথা থেকে কে জানে। বাবা-মা কখনো প্রেমে পড়েছেন মনে হয় না। অথবা হয়তো প্রেমের নানা রূপ। বিয়ের পর অপরিচিত দুই নর-নারী, সঙ্গে-সাহচর্যে প্রাত্যহিক জীবনের নানান অভিজ্ঞানে, চৈতন্য ও অভ্যাসের বিভিন্ন স্তরে, শুভ-অশুভের মূল্যবোধে কালক্রমে একাকার হয়ে যায়। দেহ এবং সত্তা থাকে ঠিকই বিচ্ছিন্ন, পৃথক। তাই অনুভূতি বুদ্ধি আর রাগ অভিমানও ভিন্ন। অথচ তৎসত্ত্বেও, নিবিড় অন্তরে জন্মায় এক অচ্ছেদ্য টান। অথবা এটাও কি অভ্যাস? তাহলে এই অভ্যাসই ব্যক্তি মানুষের কোনো না কোনো অবলম্বনের উৎসে। মার সম্ভবত বাবাই মৌল অবলম্বন। কারুর অবলম্বন হয়তো বা একাধিক। কিংবা সবই কি ভ্রান্তি?

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। শুধু এটুকু নিশ্চিত যে ঘুমিয়েছিলুম অঘোরে। এ-ঘরের একান্ত নিরালা পরিবেশ বহুকাল পর আমায় বাবার যন্ত্রণার আশু অনুভবের পরিমণ্ডল থেকে নিস্তার দিয়েছিল। তন্দ্রায় ও ঘুমের ঘোরে টের পাই নি ওঁর ক্লেশ, ওঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিশ্রম। এমন কি অনবচ্ছিন্নকরা কাশিও কানে আসে নি ঘুমের অবচেতনায়। তাই মা যখন নাড়া দিয়ে ডেকেছিলেন তখন আমি ধড়মড়িয়ে উঠেছিলুম। এক মুহূর্ত সব লেগেছিল ঝাপসা, ঘরটা অপরিচিত, তারপর কানে গেছিল মার গলা, মা বলছেন, 'বড়ু ওঠ্-ওঠ্...উনি কেমন করছেন বাবা।'

'কে ?'

'উনি···তোর বাবা।'

'কি হয়েছে ?'

'জানি না, তুই ছাখ...মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।' আমি দৌড়ে ও-ঘরে গেলুম। আলো জ্বলছে, বাইরেও আকাশ পরিষ্কার, রোদের আভাস। দেখলুম বাবা হেলান দেওয়া উঁচু অবস্থা থেকে একপাশে এলিয়ে গেছেন। হাত দুটো অশরীরী হাওয়ায় বাড়ান, মুখে কালশিটে। চোখ বিস্ফারিত এবং প্রচণ্ড শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্ষেপেও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়লুম, গায়ে গেঞ্জি, খালি পা, মা পিছন থেকে ডুকরে উঠলেন 'কী হবে-রে বড়ু ?'

'কিছু না···তুমি বসো।'

ডাক্তার তরফদার আমার চেহারা দেখেই বোধহয় বিরক্ত হলেন না। তখুনি উঠেছেন, বললেন, 'তুমি এগোও···আমি আসছি।'

'একসঙ্গে যাবো'খন।'

'না না, সময় নেই···তুমি বরং দৌড়ে অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ব্যবস্থা কর·· লিখে দিচ্ছি।'

উনি কি দ্রুত লিখে দিলেন। কাগজটা আমি হাতে নিয়ে তাকিয়ে রইলুম। হঠাৎ কে গেঁথে দিল আমায় মাটির সঙ্গে। শুধু পা দুটো মনে হল কাঁপছে।

উনি বললেন, 'শিগ্‌গির যাও...দেজ্-এ কিংবা কুণ্ডুতে পাবে...দুশ আড়াইশ টাকা ডিপজিট লাগবে বোধহয়।'

ওঁর কথায় আমার চমক ভাঙল, বললুম 'পাঁচটা টাকা দেবেন আমায়... দিয়ে দেবো... ।···হাতে কিছু নেই।'

উনি টাকা এনে দিতেই আমি ছুটলুম। সামনেই পেলুম একটা ট্যাক্সি। একপলক ইতস্তত করে চেপে বসি। ড্রাইভার এক মুহূর্ত অবাক হয়ে গাড়ি ছাড়ে। সোজা মিনিমাসীর বাড়ি। আমায় দেখে উনি থতমত খেয়ে যান, তারপর চকিতে তিনশ টাকা এবং ছেলের একটা পুরনো জামা এনে দেন, বলেন 'এটা পরে নে...পায়ে আমার চটিটা গলা···আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

আমি যখন অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে বাড়ি পৌঁছলুম, মিনিমাসী তখন পাশের ঘরে বসে একা কাঁদছেন। বাবার কাছে ডাক্তার, মা এবং ছোট্‌কি। সিলিণ্ডার বসিয়ে, রবারের নল লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার বাবার নাকে সেটা গুঁজে দিলেন। নাসারন্ধ্রে থাকল অক্সিজেনের নল। ডাক্তার বেরুবার সময় আমায় ডাকলেন। বাইরে গিয়ে বললেন, 'অবস্থা খুব খারাপ... আত্মীয় স্বজনদের জানিয়ে দিও।'

'ওষুধ দেবেন না?'

'ইন্‌জেকশান দিয়েছি···প্রেস্‌ক্রিপশান মেয়েটির হাতে···কিন্তু আই ডোন্ট হ্যাভ মাচ্‌ হোপ...দড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

উনি আর দাঁড়ান না, পা বাড়ান। আমি পিছন পিছন বলি 'ডাক্তারবাবু আপনার ফি-টা... ।'

'ও পরে হবে···ভেব না... ।'

উনি থামেন নি একবারও। সোজা বেরিয়ে গেলেন। আমি নিশ্চুপ স্তব্ধ হয়ে থাকলুম কয়েক মুহূর্ত। অতঃপর ছোট্‌কিকে ইসারায় ডেকে বললুম, 'তোদের ড্রাইভার আছে?'

'হ্যাঁ।'

'দিদিকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাব।'

'এখন পোষ্ট অফিস খোলা পাবে?'

'C.T.O.-তে যাই...তুই একটু দেখিস্‌।'

'আচ্ছা।'

তারপর আরো দু-দিন কাটল কি করে মনে নেই। মিনিমাসী আর বাড়ি ফেরেন নি ইতিমধ্যে। রাতদিন মায়ের সঙ্গে পালা করে জেগেছেন রুগীর শিয়রে। ছোটকি গেছে-এসেছে। পল্টু আর স্বকু দৌড়েছে বাইরে বাইরে, স্টেশানে গিয়ে দিদিকে এনেছে, খবরাখবর দিয়েছে সর্বত্র। অতঃপর যেদিন মেশোমশাই নিজে এসেছেন আমার চাকরীর নিয়োগপত্র হাতে, শুধু

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সংজ্ঞাহীন, অক্‌সিজেনে সংস্থিত, বাবার শায়িত জরাজীর্ণ শরীরের দিকে, সে-সন্ধ্যাতেই তাঁর তিরোধান ঘটল।

সেই অবর্ণনীয় মুহূর্তে, হাঁটু গেড়ে বসা ডাক্তার যখন প্রায় নতমস্তকে উঠে দাঁড়ালেন, মেশোমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন ঈষৎ, এবং ডেথ সার্টিফিকেট লিখলেন দ্রুত, তখন গোধূলির আলোও নিভেছে। বাইরে বিস্তৃত ছাইরঙের আভা।

সেই ক্ষণে গগনজ্যাঠা ছিলেন ঠিক আমার পাশে, তাঁর একহাতেই আমার কাঁধ সাপটে তিনি বললেন, 'তোরাই থাকবি বহু...আমরা সবাই যাব একে-একে।'

সঙ্গে সঙ্গে কান্নার বাষ্পাবেগে আমার গলা বুজে গেছিল, চোখ জলে জলে দৃষ্টিহীন। আর কবে কোথায় কি হয়েছিল আমি দেখিও নি, বুঝিও নি কিছু।

আপাতত বর্তমান আমি, বিধবা মা, আমাদের তিনটে চোরা কুঠুরী এবং এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আমার চাকরী। সঙ্গে একটা বেড়ালও এসে জুটেছে, ছোটো পুষি, যে মায়ের কোলে দিনে ঘুমোয় এবং রাতে থাকে পায়ের কাছে। জানালার পুরোনো পাল্লাগুলো দমকা বাতাসে অকস্মাৎ আছাড় খেলে, হাওয়া যখন শূন্য ঘরে পাক দিয়ে আবার কপাটে ধাক্কা মেরে উধাও হয়, তখন ও সচকিত হয়ে ওঠে, ছোট্টো কান নেড়ে অবাক তাকায়। আর ওর কাণ্ড দেখে আমার ক্ষীণ হাসি পায়।

বহির্বিশ্বেও উল্কাপাত ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। চীনে মাও-সে-তুং পরলোকগত, এবং যাঁদের আমরা বিপ্লবী স্বীকারে স্বপ্ন রচেছিলুম তাঁরা নাকি হয় ক্যাপিটালিস্ট রোডার নয় গ্যাং অফ ফোর, এবং যাঁর পরিচয় ছিল অনবহিত তিনিই আজ ওদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। স্বদেশেও বজ্র-বিদ্যুতের লীলা গেছে। জরুরী অবস্থার ঝড়, গগন জ্যাঠার গ্রেপ্তার হওয়া ইত্যাদি। অতঃপর হালে ইন্দিরা গান্ধী অস্তমিত, কংগ্রেসের পতন, মোরারজীভাই ও চরণ সিং সিংহাসনে সমাসীন, জনতা পার্টির বিজয় ধ্বনি। গগন জ্যাঠা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বলেছিলেন 'তোকে তো আমি বারবার বলছি, এদেশে মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদরাই কেউ রক্ষণশীল, উদারনৈতিক অথবা প্রগতিশীল। রাজনীতিক্ষেত্রে বিভেদ-বিরোধ এদেরই লীলা। ধনীরা থাকে পিছনে, সমর্থনে বা প্রতিপক্ষীয় প্রভাবে। তাই আজ যাঁদের বুর্জোয়া জমিদার পার্টি বলস

তোরা কাল তাদেরই সঙ্গে অন্য নামে হাত মেলাস। ফলে তোদের শত্রু-মিত্র চিন্‌তে থেকে-থেকেই ভুল হয়।'

এ-সব কথা ইদানিং আমায় আর ক্ষিপ্ত করে না। এমন কি বিতর্কেও মন বিমুখ। নৈঃসঙ্গের অভিজ্ঞানের অন্তরালে শুধু টের পাই অজস্র জিজ্ঞাসা, এবং গগন জ্যাঠার টুকরো-টাকরা কথা, সস্নেহ অভিব্যক্তি, মাঝে-মাঝে সেই প্রশ্নময় প্রান্তরে অনুরণন তোলে, আবার অনেক সময় জাগায় অন্যমনস্ক অবসাদ। এই অবসাদ ক্বচিৎ কখনো দীর্ণ হয় পলটুর আকস্মিক আগমনে, অথবা কুন্তলার স্মৃতিতে। যদিচ ওদের আর কোনো খবর রাখি নি বহুকাল। সুকু একদিন এসে বলেছিল 'পলটু কমিউনিস্ট হয়ে যাবে বল্‌ছে।'

'হঠাৎ?'

'আরে সে-দিন রাস্তায় দেখা, বলল, সব জোচ্চুরি...বাপের ব্যবসা...হাতি...বুড়ো ভাম ব্যাটা একটি শয়তান, ঠগ।'

'বাপের উপর এখনো ওর রাগ!'

'ভীষণ। বলে ছোটো ভাইটাও বিচ্ছু...সমান জোচ্চর হয়েছে...পলটু নাকি গাঁড়ে লাথি মেরে একদিন হাওয়া দেবে।'

পাগল! পলটুর কথা ভাবলেই মনটা হাল্কা হয়ে আসে। ও একদিন ঝড়ের মতো এসেছিল রাত্রে, বাইরে খাওয়ানোর তাগিদে আমায় টেনে বের করেছিল। বাড়ির সামনেই ছিল নতুন গাড়ি। তাতে বসে চালাতে চালাতে আমার দিকে এক লহমা তাকিয়ে বলেছিল 'যাই বল তুই, গাড়ি চড়তে শালা আরাম খুব!'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা কমিউনিজমে সবার গাড়ি হবে?'

'হয় তো।'

'শালা সেই ই ভালো···এমন একা একা চড়তে খারাপ লাগে।' আমি তখুনি কিছু বলিনি, মৃদু হেসেছিলুম। সেই ক্ষণিক যতির মধ্যে হঠাৎ মনে হয়েছিল পলটু যেন সামান্য আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওর পরিচিত জলপ্রপাতের মতো বাক্যস্রোত স্থগিত। তাই আবহটা হাল্কা করার জন্যে আমি বলেছিলুম, 'এ-গাড়িটা বাবা নতুন কিন্‌লেন?'

'হুঁ।'

'তা তুই এত গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিস কেন?'

'সব জোচ্চুরির রমরমা।'

ও আবার চুপ করে গেল। তৎক্ষণাৎ আমারও মুখে কিছু জোগাল না। অথচ নৈঃশব্দ্য এক্ষেত্রে মনোরম নয়, পরন্তু থমথমে ও শ্বাসরোধকারী। অগত্যা আমি কথা পাড়ি, বলি, 'দেশের এত বড় ঘটনায়ও কোনো ব্যতিক্রম হয় নি?' পল্টু আমার দিকে তাকাল, বলল, 'ঘটনা মানে?'

'জনতা রাজের প্রতিষ্ঠা।'

'দূর…! অবিনাশ সাহার ফড়ে চতুর্দিকে।'

'তিনি কে?'

'বুড়ো ভাম আমার বাপ।'

আমি কথা বলিনি, মৃদু হাসি এসেছিল শুধু মুখে। অনিমেষ কয়েক মুহূর্ত রাস্তার পানে তাকিয়ে থেকেছিলুম। শেষে পল্টু যখন পার্কস্ট্রীটে গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে অল্প-অল্প হাসতে লাগল তখন আমি তার দিকে ফিরি।

সে-সময় ও বলল, 'আমিও বাপের ব্যাটা, বুবা্লি,…পল্টুও দাঁও মারতে শিখে গেছে…ভাবিস্ নে।'

আমি কিছু উত্তর না দিয়েই গাড়ি থেকে নেমেছিলুম। ও ভিতরে ঝুঁকে আমার দিকের দরজার কাচ তুলে ছিল দ্রুত। অতঃপর অনেক কাল ওর সঙ্গে আর দেখা হয় নি, শুনেছি আছে ভালোই।

সমাপ্ত

ঋত্বিককুমার ঘটকের 'জ্বালা' ও বের্টোল্ট ব্রেশ্ট এর 'বিধি ও ব্যতিক্রম'। প্রযোজনা : ক্লাশ থিয়েটার। নির্দেশনা : রমেন সরকার। সমালোচিত অভিনয় : ২৩ মার্চ ১৯৭৯

আমন্ত্রণলিপিটি হাতে পেয়ে একটু অবাক হওয়ারই ব্যাপার ছিল—এরকম অদ্ভুত সমন্বয় কেন? ব্রেশট না হয় বোঝা গেল, আজকাল চলছে। কিন্তু এই বিদেশী রূপান্তরের সঙ্গে ঋত্বিককুমার ঘটকের দিশি জিনিস কেন? কিছুকাল আগে বেতারে ঋত্বিকের এই নাটকটির অভিনয় শুনে প্রায় আতঙ্কগ্রস্ত ছিলাম। ঋত্বিকের আর যাই হোক ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে খুব একটা নজর ছিল, এমন তো বলা যায় না। কিংবা হয়তো উল্টো করেই বলা যায়, অগোছালো, খানিকটা উল্টোপাল্টা আতিশয্যবহুল প্রাণময়তাই তার শক্তিও বটে, আবার দুর্বলতাও। তার শেষের দিককার চিত্রকর্মে ভাষণে জীবনাচরণে যেটা বেশি করে প্রকাশ পেত। 'জ্বালা' নাটকটিতেও, অন্তত বেতাররূপে, সেই আতিশয্যের প্রায় উৎকট প্রকাশ। তাই ঐ নাটকটি মঞ্চস্থ হবে জেনে কিছুটা ভয়মিশ্রিত ঔৎসুক্য জাগল। আর জিজ্ঞাসাও এল কিভাবে তাঁরা ঐ নাটকটির সঙ্গে ব্রেশ্ট-কে মেলাবেন।

প্রথমে অভিনীত হল 'জ্বালা'। বেতার অভিনয়ের উদ্ভটত্ব এখানেও প্রথম কৌতুকাবিষ্ট করছিল। কিন্তু, মানতেই হবে, ক্লাশ থিয়েটারের প্রযোজনার গুণে সেই আবেশ কেটে গিয়ে নাটকটি দর্শকদের মনে ক্রমশই একটি সার্থক এক্সপেরিমেন্ট রূপে প্রতিভাত হতে থাকল। নাটকটি দেখলে বা পড়া থাকলে বোঝা যাবে কি আন্তরিক নিষ্ঠা থাকলেই তবে এটা করা সম্ভব। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করে কয়েকজন নারীপুরুষ মরণোত্তরলোকে একত্রিত হয়েছে। মর্ত্যলোকের বৈশিষ্ট্য বা স্মৃতি তারা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না—মমতা রয়ে গেছে, রয়ে গেছে ক্রোধ দুঃখ অপমানবোধ—অথচ ফেরার উপায় নেই। অবশেষে মর্ত্য থেকে ছিটকে-আসা একটা পাগল মারফৎ খবর পাঠাল তারা: আত্মহত্যায় পরিত্রাণ নেই, জীবনেই লড়াই চালাতে হবে পরিত্রাণের জন্য।

মানুষগুলো ভাঙাচোরা, আত্মহননে দগ্ধ মুখ, অনুশোচনায় জর্জর ভাবভঙ্গি—তাদের বিকৃত শরীর-চালনায়, আকস্মিক কান্নায়, উদ্ভট চিৎকারে বা জান্তব গোঙানিতে তৈরি হয় মরণোত্তর জগতের বিভীষিকা। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুররিয়েলিস্টিক মঞ্চসজ্জা। কিছুক্ষণ পরাজিত বিকৃত অপ্রকৃতিস্থ মানুষের যথেচ্ছ অভিনয়ে—সংলাপ ও হাঁটাচলার প্রায় উন্মাদ স্বেচ্ছাচারিতায়-মঞ্চটি হয়ে ওঠে যন্ত্রণাভূমি। নাটকটিতে ঋত্বিকের উদ্দেশ্য ক্রাশ থিয়েটার এভাবে দৃশ্যগ্রাহ্য না করলে অনেকের কাছেই বিশ্বাস্য হতে পারত না।

স্বভাবতই অভিনয় অত্যন্ত চড়া, আবেগের অতিরেক। বিচ্ছিন্নভাবে এ অভিনয় খুব দৃষ্টি বা নয়ন সুখকর হয়তো নয়—কিন্তু সব মিলিয়ে তারা একটি আবহ তৈরি করে ফেলে। আর সে-কথা মনে রাখলে খোকা চরিত্রে গৌতম মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ করে পাগল চরিত্রে পংকজ (পঙ্কজ ?) প্রামাণিক যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের এই হুল্লোড়ে তাঁর সাবলীল অভিনয়ে পংকজবাবু সত্যিই দর্শকদের মন জয় করে নেন। আর তাঁর উপস্থিতিতেই এই শ্বাসরুদ্ধ আবেগাতিশয় নাটকটির গুমোট ভেঙে সঙ্গত কৌতুক সৃষ্টি হয়—হয়তো তার ফলেই নাটকটির প্রতীকার্থ এক্সপেরিমেণ্টকেও সদর্থক করে তোলে।

দ্বিতীয় নাটক 'বিধি ও ব্যতিক্রম'। ব্রেশ্‌টের ইংরেজিতে অনূদিত *Rules and Exception*। নাটকটি বলা হয় ব্রেশ্‌টের নীতিশিক্ষামূলক নাটকপর্বের শেষ নাটক—চরিত্রগুলিকে যেখানে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের বা বক্তব্যের জাঁতাকলে ফেলে দেওয়া হয়—তৈরি হয় একটা ফ্রেম—নিখুঁত, চৌকো, প্রায়-যান্ত্রিক একটা ছক। আর মজাটা তৈরি হয় তত্ত্বের বা নীতিশিক্ষার ঐ যান্ত্রিকতার চৌহদ্দিতেই—সংলাপ ও পরিস্থিতির অনিবার্যতার কৌতুকে।

ব্যাপারটা এই রকম: ব্যবসায়ী খাড়া মশাইকে (বর্তমান অনুবাদে) দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পার হতে হবে তেলের খনির কন্‌ট্রাক্ট পাওয়ার আশায়—সঙ্গে কুলি এবং পথনির্দেশক ছড়িদার। অবশেষে এমন একটা জায়গায় তারা এসে পড়ে, যেখানে পুলিশ-চৌকিদার নেই। ফলে খাড়া মশাই ভয় পেয়ে যায়, কারণ কুলি ও ছড়িদারের প্রতি সে তো যারপরনাই দুর্ব্যবহার করেছে এতকাল, এবার যদি তারা একসঙ্গে বদলা নেয়! ফলে তাদের আলাদা করে দিতে চায় সে। কিন্তু ছড়িদার সচেতন মানুষ,

সে সবই বোঝেসোঝে। মালিকের ফাঁদে পা দেবে না। ফলে তাকে চাকরিটি খোয়াতে হয়। কিন্তু তাতে মালিকের ভয় ও নৃশংসতা আরো বাড়তে থাকে। পথ হারিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সে অকস্মাৎ দেখতে পায় কুলিটি তার দিকে এগোচ্ছে—আসলে কুলিটি তার জলের পাত্রটি এগিয়ে দিতেই চেয়েছিল—ভয়ার্ত হয়ে মালিক তাকে খুন করে। এর পর যথারীতি বিচার দৃশ্য। অনেক সওয়ালের পরে রায় বেরোল : খাড়া মশাইতো আত্মরক্ষার্থে ন্যায়সংগত কাজই করেছে। কারণ কুলিটির অবস্থা বিচার করলে অত্যাচারী মালিককে আক্রমণ করাই তো স্বাভাবিক, সেটাই বিধি—কিন্তু তার ব্যতিক্রম যদি সে ঘটিয়ে থাকে (তৃষ্ণার্তকে জল দান ইত্যাদি), সেটা এখানে বিচার্য নয়। অতএব খাড়া মশাই নিরপরাধ ও মুক্ত। মানতেই হবে, বিচারকের কথাবার্তা ও রায়কে যেরকম শীতল যুক্তির বন্ধনে সাজিয়েছেন ব্রেশ্‌ট তার মধ্যেই আছে তিক্ত বিদ্রূপ—নিষ্ঠুর আক্রমণ আমাদের সমাজের শ্রেণী-বৈষম্যের ভিত্তিমূলে। আমাদের খুনী সমাজব্যবস্থায় খুনটাই বিধি। মানুষের ভালোত্ব বা সদিচ্ছাটাই ব্যতিক্রম।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনূদিত এই নাটকটিকেই ক্লাশ থিয়েটার উল্টে-পাল্টে উপস্থিত করেছেন। অবশ্য 'উল্টে-পাল্টে' শব্দটি এখানে যতটা নিরীহ শোনাচ্ছে আসলে তা নয়। প্রথমত ৬টি অতি-চপল নৃত্যপরায়ণ জোকারকে বারবার অনেকক্ষণ স্টেজে নামিয়ে প্রযোজক কি একটা করতে চেয়েছেন! মনে হয়, ব্রেশ্‌টকে তাঁরা বোধহয় যথেষ্ট ব্রেশ্‌টীয় মনে করেন নি। ফলে খামতি পূরণ করতে অতিরিক্ত হুল্লোড় জমিয়ে খোদার ওপর খোদকারি করেছেন। ব্রেশ্‌টের প্রতি এ কী ব্রেশ্‌টীয় ব্যবহার!

আবার এক-একবার মনে হয়, তাঁরা 'জ্বালা' নাটকটির মেজাজকে ভুলতে পারেন নি। ফলে 'জ্বালা' নাটকের উদ্ভট স্বেচ্ছাচারিতার ধরনে ব্রেশ্‌টকেও হাজির করেছেন। খাড়া মশাই, ছড়িদার, কুলি, পুলিশ-এর হাত-পা ছোঁড়ার ঢঙে তাই মনে পড়ে যায়। নাটকটির অতিব্যস্ত গতি এবং ঘন ঘন কোরিও-গ্রাফি সৃষ্টির দিকে ঝোঁক দেখে মনে হয় প্রযোজক নাটকটি থেকে তথাকথিত ব্রেশ্‌টীয় রঙ্গরসকে স্বতন্ত্র বস্তু হিসেবে খুঁজে নিতে ও দেখাতে যতটা উদ্‌গ্রীব, তাকে বক্তব্য-উপস্থাপনার অনিবার্যতায় স্বাভাবিক করতে ততটা তৎপর নন। ফলে ব্রেশ্‌টীয় কৌতুক হয়ে যায় এখানে প্রায় প্রথাগত কমিক উপাদান। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জগতটাকে মোটা দাগে, প্রায় ফর্মুলার আকারে উপস্থিত করতে গিয়ে ব্রেশ্‌ট এই নাটকে (বস্তুত মধ্যপর্বের 'নীতিশিক্ষামূলক'

অনেক নাটকেই) যে আটোসাঁটো সুনিরূপিত নকশা তৈরি করেছেন, তার ফ্রেমিং এখানে অত্যুৎসাহের চাপল্যে লঙ্ঘিত হয়েছে।

অথচ খাড়া মশাই চরিত্রে সন্দীপ দাস যে সক্ষম অভিনেতা তা বোঝা যায়, কিন্তু তাঁকে প্রযোজনার ঐ নীতি অনুসারে সরে আসতে হয়েছে 'শিক্ষাদানে'র সচেতন পরোক্ষতা থেকে, বারবার নামতে হয়েছে টাইপ চরিত্রাভিনেতার ব্যস্ত ও লিপ্ত নাটকীয়তায়।

এ-নাটক দুটি দেখে কিন্তু ক্লাশ থিয়েটার সম্পর্কে আশান্বিত হতে হয়। 'জ্বালা' নাটকটি তো বটেই, এমনকি 'বিধি ও ব্যতিক্রম' দেখেও একটি উদ্যোগী, চিন্তাশীল, কল্পনাসমৃদ্ধ নাট্যদল হিসেবে তাদেরকে চিনতে ভুল হয় না—তাঁদের চিন্তা বা কল্পনা কখনো কখনো যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট বলে আমাদের মনেও হয়, তবুও।

অরুণ সেন

পরিচয়। আর্নল্ড ওয়েস্কার-এর 'কিচ্‌ন্' অবলম্বনে হিন্দি রূপান্তর: উষা গাংগুলি। নির্দেশনা: রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। আলোচিত অভিনয়: কলামন্দির, জানুয়ারি ১৯৭৯

বেশ ছোটবেলায় পৃথ্বীরাজ কাপুর-এর 'দিদার', 'আহুতি', 'পাঠান', ডাঁটো হয়ে দিল্লিতে নেমিচাঁদ জৈন আর শীলা ভাট-এর দু-চারটে প্রডাকশন, কলকাতায় এন এস ডি-র একটি নাটক, পুনে এ্যাকাডেমির 'ঘাসীরাম', অনামিকার 'সখারাম বাইণ্ডার' আর ইদানিং উষা গাংগুলির দাক্ষিণ্যে রঙ্গকর্মী-র 'পরিচয়'—হিন্দি নাটক দেখার এই সামান্য পুঁজি। তাই শেষোক্ত নাটকটি সম্পর্কে হিন্দি নাট্য-নিরীক্ষার ধারাবাহিক জ্ঞান-ব্যতিরেক কিছু সাধারণ আলোচনা, যাকে আলোচনা না বলে বিচ্ছিন্ন মন্তব্য বলাই ভালো, তার বেশি কিছু করায় আমি অক্ষম।

একটি মেয়ে বাইরে চাকরি করে। ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে। বাবা ড্রাইভার, জামাইবাবু ড্রাইভার, ছোটভাই বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে মা-র সঙ্গে অ-বনিবনায় আলাদা থাকে, ফুর্তিবাজ ছেলে। বেশ মোটা দাগের, দরিদ্র-পরিবেশের মানুষ এরা সবাই।

মেয়েটি কিন্তু এহেন পরিবার থেকে সদর্থেই ছিটকে পড়েছে বড় পরিবেশের ভেতর। সেখানে তার প্রেমিক এক বামপন্থী আদর্শবাদী। মেয়েটি শুধু প্রেম নয়, তার কাছ থেকে সমাজনীতি রাজনীতি অর্থনীতির পাঠ নিয়েছে, পড়ে দেখেশুনে অনুভব করার চেষ্টা করেছে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার ধন-বণ্টনের অসামঞ্জস্যজনিত পাপের চেহারা। তাছাড়া সুকুমার রুচি তৈরি হয়েছে তার—ভালো গান বাজনা ছবি কবিতা—এসবের সমঝদার হয়ে উঠেছে সে।

আলোর জন্য গড্ডুরের তীব্র ক্ষুধা—এই নবজায়মান অর্জন নিয়ে বাড়ি ফিরে সে পদে পদে হোঁচট খায়। সে তার পুরোপরিবারের রুচির দৈন্য ঘোচাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। অথচ স্বাভাবিকভাবেই একটা বড় মাপের কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে তার ও বাড়ির অন্যান্যদের মধ্যে। তার ভাষা, কথা, সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার শরিক অন্যদের পক্ষে কিছুতেই হওয়া সম্ভব হয় না। মেয়েটি ক্রমশ মরীয়া হয়ে উঠতে থাকে। নিছক ক্ষুন্নিবৃত্তি মেটানোর তাগিদে দিশেহারা একটি শ্রেণীর কাছে রুচির চেয়ে রুটির প্রশ্ন, কত বড় ও মর্মান্তিক—বিভিন্ন অপ্রীতিকর অথচ অনিবার্য ঘটনায় তা প্রায়ই নগ্নভাবে প্রমাণিত হতে থাকে। এবং এই টালমাটালের মধ্যে খবর আসে মেয়েটির প্রেমিক তাদের বাড়ি আসছে।

বাড়ি ও বাড়ির লোকজনকে ঘষেমেজে সভ্য করে তোলার কাজে মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবুজ পর্দায় বিছানার চাদরে ঘরের শ্রী ফেরানোয় যেমন সে লাগে, তেমনি ছেলেটি এলে কি ভাবে বলতে হবে কেমন আচরণ করতে হবে—এ নিয়ে সবাইয়ের টিউটর করার ব্যাপারে সে অক্লান্ত হয়ে ওঠে।

যেদিন ছেলেটির আসবার কথা, একফালি ঘরে, অনভ্যস্ত বাবু পোশাক-আসাকে তৈরি হয়ে, এমনকি মেয়েটির ছোটভাই তার বাঙালি বৌ সমেত—সবাই অপেক্ষা করতে থাকে। শেষ মিনিটের কিছু মহড়াও চলে। কিন্তু শেষমেশ প্রেমিক আসে না। আসে তার চিঠি। যা প্রমাণ করে, আসলে ঐ তথাকথিত আদর্শবাদী ছেলেটি স্রেফ একটি কাগুজে মানুষ রিয়্যালিটিকে যে মুখোমুখি মোকাবিলা করতে ভয় পায়।

নাটকের অস্তিমে অন্যান্যদের প্রবল কট্‌-কাটব্য সমেত অজস্র মন্তব্যের ভেতরে আলাদা একখণ্ড দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে মেয়েটি স্বগত সংলাপে প্রবৃত্ত হয়। তার তখন শ্যাম-কূল দুই-ই গেছে। নিজের পরিবারের সঙ্গেও রুচি

ও মানসিকতার সেতু ভেঙে গেছে তার। আবার যাকে সে নতুন জীবন ভেবেছিল—সেও ছায়া মারীচের মতো দ্রুত অপসৃয়মান।

নিঃসঙ্গতার এই কঠিন পাথরে রঙ্গকর্মীর 'পরিচয়' নাটকের প্রতিষ্ঠা। সন্দেহ নেই, এই তত্ত্ব আমাদের নগর, মফস্বল-শহর এমনকি গ্রামজীবনেও ক্রমশ সত্য হয়ে উঠছে। বিদিশিয়ানা বলে এখন আর একে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কঠিন। তাছাড়া নতুন নতুন জট-জটিলতার ভেতর দিয়ে সত্য আর আদর্শকে নিয়তই কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক হবে কি যদি আমি সাম্প্রতিক চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা স্মরণ করি?

আসলে প্রশ্ন, রঙ্গকর্মী এই তত্ত্বকে তাঁদের উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন কিনা। এবং আমার ধারণা সেদিক থেকে তাঁদের সাফল্য গৌণ নয়।

ডিটেলস-এর দিকে পরিচালকের প্রখর নজর আমাকে খুশি করেছে। আমার মতো কম হিন্দিজানা লোক মোটামুটি পুরো নাটকের সংলাপ অনুসরণ করতে পারে এটা রূপান্তরকারীর পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। দু-চার জায়গায় অনাবশ্যক ভাঁড়ামো আছে চরিত্রগুলির কথায় ও আচরণে, তাছাড়া প্রায়ই যথাযথ বলে মনে হয়েছে। দুটি জায়গার কথা এখনো বেশ স্মরণে আছে। মেয়েটির মা কুটনো কুটছেন, খাঁটি দেহাতি ভাষায় তাঁর কথাবার্তা এরই ফাঁকে ফাঁকে এবং মঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি রেকর্ড প্লেয়ারে চালিয়ে দিয়েছে রবিশংকর, বাজনা জলঙ্গে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে মৃদু কাঁপুনি, ঐ বাজনা দিয়ে মা-কে প্রাণপণে ইমপ্রেশ করতে চাইছে সে। আর একটি ছবি—মেয়েটি তাঁর দিদিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দিদির প্রথম যৌবনের প্রেমের স্বপ্ন। দু-বোন বসে আছে, ঘরে আর কেউ নেই, জ্যোৎস্নাপ্রতিম আলো কোত্থেকে এসে পড়েছে জ্যেষ্ঠার মুখে, স্বপ্নজড়িত অর্ধস্ফুট কিছু কথার মোহময় উচ্চারণ, আর তারপর সেই স্বপ্ন ভেঙে ওঠা। ঘর-সংসার স্বামী-পুত্র—এর চেয়ে বেশি আর কিইবা চাওয়ার থাকতে পারে একজন সাধারণ ঘরের মহিলার—এই চিরাচরিত সত্যের পায়ে নিজেকে সমর্পণ—স্বপ্ন দূরে, দূরে মিশে যায়।

নাটকটিতে একটি বৃদ্ধ মদ্যপের চরিত্র অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। তাঁর মাতলামো নিয়ে যে ধরনের মজা সৃষ্টি করা হয়েছে তা রীতিমতো স্থূল। মালিকের মস্তান ও মেয়েটির বাবার সংলাপ-বিনিময়ের মধ্যেও যথেষ্ট

অতিরেক চোখে পড়ে। বাড়ির ছোট ছেলের বাঙালি বৌ-এর সংলাপে হিন্দি-বাঙলার জগাখিচুড়ি মোটেই শ্রুতিসুখকর ও বাস্তব হয় নি।

অনেকেই ভালো অভিনয় করেছেন 'পরিচয়'-এ। তবে মেয়েটির মা, জামাইবাবু ও দিদি চমৎকার। সর্বোপরি মেয়েটির ভূমিকায় ঊষা গাঙ্গুলি চেহেরায়, অভিনয়ে, ব্যক্তিত্বে এতই প্রধান যে আমার খুব আশা, বাংলা মঞ্চে নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রীদের মধ্যে তিনি স্থান করে নেবেন।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আত্মজা। রচনা: চিত্তরঞ্জন ঘোষ। প্রযোজনা: দ্যুতি। পরিচালক: জগন্নাথ বসু।
আলোচিত অভিনয়: অ্যাকাডেমি মঞ্চ, মার্চ ১৯৭৯

"বমি পেলেও বমি চেপে রাখা—তারই নাম বোধহয় বড় হওয়া।" পলিকে একথাগুলো জানতে যে অভিজ্ঞতার বৃত্তটা সম্পূর্ণ করতে হয়েছিল, তাই আত্মজা নাটকের কাহিনী। জগন্নাথ বসুর পরিচালনায় নূতন নাট্যদল 'দ্যুতি' সেদিন মঞ্চস্থ করলেন অ্যাকাডেমি মঞ্চে। আর এ প্রযোজনা, যারা ভালো নাটকের খোঁজে ঘোরেন তাঁদের কাছে নূতন স্বাদ নিয়ে আসে।

অনেকদিন আগেই ডিভোর্স হয়ে গেছে মিত্রা আর রণবীরের। পলি তাদের মেয়ে। বিশেষ কাজে, অর্থাৎ গোপনে পলির অলকা মাসিকে বিয়ে করতে যাবার জন্য পালকে কয়েকদিনের জন্য মিত্রার বাড়িতে রেখে যায় রণবীর। সেখানে সেই কয়েকদিনের মধ্যে মিত্রা-পলি-অভিজিৎ-সুজয়-লালু-আবিরের পারস্পরিক সম্পর্কের নাটকীয়তায় উন্মোচিত হয় একদিকে নারী হিসেবে নিজের ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক পরিচয়ের অন্বয় ঘটাতে মিত্রার আপ্রাণ লড়াই, আর অন্যদিকে খুব ছোটবেলায় মার মমতায় বঞ্চিত থেকে নষ্ট হয়ে যাবার বোধে মিত্রার প্রতি পলির ঘৃণা। সব শেষে নির্মম অভিজ্ঞতা যখন পলিকে জানিয়ে যায় কত ধানে কত চাল তখনি সে ঘৃণার সঙ্গে সন্ধির এক সিনিক দর্শনে পৌঁছতে পারে। নাটকটাও শেষ হয় সেখানেই।

কিন্তু দর্শক হিসেবে সমস্যাটা শেষ হয় না। কারণ নাটক শেষ হবার পরেও পলির সমস্যাটাই দর্শকের কাছে আদল পায় না। নাটকের সংকটও।

ফলে, খুব দীক্ষিত নন এমন কোনো দর্শক একে বিবাহ বিচ্ছেদের কুফল বিষয়ক নাটক ভেবে ফেলতে পারেনও বা। আসলে, নাট্যকার যতখানি সংবেদনশীলতার সঙ্গে পলির অসহায় শৈশব আর যন্ত্রণাক্ষুব্ধ কৈশোরের ছবি এঁকেছেন ততখানি সচেতনতার সঙ্গে তার সংকটের বিন্দুকে রূপায়িত করেন নি।

মিত্রা-রণবীরের বিবাহ বিচ্ছেদের পরিণতিতেই পলির মনে সে বৈকল্য জন্মায় যার জন্য সে প্রায় নিম্ফোম্যানিয়াক। খুব নিঃসঙ্গ মুহূর্তে সে আত্মসমর্পণ করে যে-কোনো ছেলের কাছে।

কিন্তু শুধু মনোবিকারের যোগ্যতাতেই কি একটি নাটকের মূল চরিত্র হয়ে ওঠা যায়? অন্য কোনো বোধ বা প্রয়াস বা খুঁজে বেড়াবার যন্ত্রণা না থাকলেও?

পলিকে তো ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে না তেমন কোনো তাড়না বা প্রেম যা তার বিকারগ্রস্ততার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তার ভেতরে লড়াই করতে পারত। যে লড়াই-এ নাটকটা পেতে পারত তার সত্যিকারের টেনশন। ফলে, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়ায় খুব সাধারণ মানুষের পলিদের মতো মেয়েদের সম্পর্কে মন্তব্যের মতো। ঝাপসা আর অস্পষ্ট।

তাই, এমন হয় না যে, পলি তার সমস্ত প্রত্যাশা আর উদ্যম নিয়ে একটি ছেলের কাছে গেল ও তার কাছে ব্যর্থ হবার পর চাইল নূতন আশ্রয়ের খোঁজ। তার কাছে ব্যাপারটাই যেন মজার। যন্ত্রণার এক টানে সে আবিরকে বিয়ে করতে চাইছে আবার সেই একই যন্ত্রণার অন্য টানে তাকে বিয়ে করতে পারছে না—এমন হতেই পারে। কিন্তু সেই একই সময়ে সে যে অন্য ছেলেদের সঙ্গে শরীর-সম্পর্ক চালিয়ে যায় তা কোনো উৎক্রান্তির তাড়নায়? আবার অন্য ছেলেদের সঙ্গে পলির সম্পর্ক জানা থাকা সত্ত্বেও তা আবিরের মনে কোনো প্রতিক্রিয়াই আনে না—যদিও তার মনের সঙ্কীর্ণতাকে বেশ প্রখর করেই ফুটিয়েছেন নাট্যকার। অন্যদিকে সুজয়ও কোথা থেকে যেন পেয়ে যায় সেই দিব্য কবিমানা যার দৌলতে অন্তঃসত্ত্বা পলিকে বিয়ে করার প্রস্তাবে তার দোটানা স্মরণীয়রকম সাময়িক ও সম্মতি প্রায় মুনি-ঋষির মতো মহাজ্ঞানীর ধরনে ঘটে।

এসব সত্ত্বেও কাহিনীর বুনন বা গতির তীব্রতা বা চরিত্রসমূহের তাৎক্ষণিক সজীব উপস্থাপনা নাটকটিকে এত টান টান করে রাখে যে,

শেষ হবার আগে পর্যন্ত ফাঁকগুলো খুব বড় হয়ে দেখা দেয় না। বিশেষত মিত্রার সমস্যা চমৎকার মুন্সিয়ানায় ধরা দেয়। বোঝা যায়, নাট্যকার পলিদের তেমনভাবে বুঝতে না পারলেও মিত্রাদের বেশ বুঝতে পারেন।

পলি চরিত্রের নাটকীয় সামর্থের অভাব কিন্তু অভিনয়ে অনেকটাই ভুলিয়ে রাখেন শ্রীলা মজুমদার। খুব বড় অভিনেত্রীর সম্ভাবনা তার চলায়, দাঁড়ানোয়, প্রত্যেক অভিব্যক্তিতে, সংলাপের ওঠাপড়ায়। এক মেজাজ থেকে অন্য মেজাজে যাবার সহজ ভঙ্গিতে, আবেগের প্রত্যেক কোণে প্রতিফলিত অভিব্যক্তির উজ্জ্বলতায়, এই-আলো-এই-ছায়ায় মেশানো মুহূর্তগুলির রূপায়ণে তিনি আমাদের বারবার মুগ্ধ করেন। সে মুগ্ধতা প্রায় বিস্ময়ের পর্যায়ে পৌছোয় যখন টেলিফোনে কথা বলবার সময় অনায়াস দক্ষতার এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় যাতায়াত করেন অনাটকীয়তার নাটকে।

ভালো অভিনয় করেছেন মিত্রার ভূমিকায় উর্মী বসুও। এক পিছিয়ে-থাকা সমাজ কাঠামোয় স্বাধীনচেতা এক মহিলার লড়াইকরা ও মানিয়ে চলার প্রায় অসহায় অথচ প্রবল ঋজু ভঙ্গিটা যে নাটক শেষের পরেও বহুক্ষণ দর্শককে অন্বিত রাখে তার জন্য তাঁর সংযত সহজ অভিনয়ের ভূমিকা কম নয়। বিশেষত তাঁর 'দিস ইজ নট দ্য রুল অফ দ্য গেম, পলি'—উচ্চারণ বহুদিন মনে রাখবার মতো।

তুলনায় হয়তো কিছুটা ম্লান পলির প্রেমিকেরা। অভিজিতের চেহারা চলাফেরা কথাবার্তায় যেন কিছুতেই আজকের দিনের প্রায় প্রবাদপুরুষ অর্থনীতির ছাত্রের উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে না। সুজয় চরিত্রের কবিয়ানা তার চেহারার সঙ্গে অবশ্য মেলে। কিন্তু প্রেমিকের ভূমিকায় তিনি নানা ভঙ্গিতে খুব অস্পষ্ট হলেও কিছুটা রোমিও ধাঁচ এনে ফেলেন। আবিরের ভূমিকায় জগন্নাথ বসু কেন যেন চোখেমুখে অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। তাই তাঁর চোখমুখ কিছুটা পাথুরে লাগে। বরং লালুর ভূমিকায় নিমাই দে-র চেহারা ও ভঙ্গি নাটকটির উপযুক্ত মাত্রা পায়। তার মুখচোখের প্রাণবন্ত সজীবতাও তাকে যথাযথ রূপে ধরে।

পরিচালক হিসেবে জগন্নাথ বসু নাট্যকারের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। অভিনয় রীতি, মঞ্চ-পরিকল্পনা, আলো সমস্তই নাটকটির মেজাজকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে—যার অবলম্বন অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা।

তবে, পলি যেখানে তার স্বপ্নকে বর্ণনা করে সেখানে সে স্বপ্নে অনুকরণে ছোটা বা মঞ্চে ছায়াছন্নতা দেখানোর প্রয়োজন ছিল না। স্বপ্নটা দৃশ্যত প্রত্যক্ষ না করে বরং সোজাসুজি বর্ণনায় পলির মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির ওপর জোর দিলে ভালো হত। অভিজিৎ-লালু-সুজয়-পলির টুইস্ট দৃশ্যের আলোছায়া পরিবেশগত ও বিষয়গত আদিমতাকে চমৎকার ফুটিয়েছে।

তবে, আবহ সঙ্গীতের কাছে সম্ভবত আরো কিছু দাবি ছিল।

শুভ বসু

প্রবন্ধ

বিষ্ণু দে : যামিনী রায়, তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক। আশা প্রকাশনী, কলকাতা। ১৫ টাকা

এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে, শিল্প-সাহিত্যের এক বিভাগের একজন দিকপাল অন্য এক বিভাগের আর এক দিকপাল সম্বন্ধে লিখছেন, এবং তা গ্রথিত হয়ে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটা গোটা বই—বিষ্ণু দে-র 'যামিনী রায়' তেমন এক ব্যাপার। ঘটনাটি আরও চিন্তাকর্ষক হয় যখন জানতে পারি যামিনী রায়ের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র ঘনিষ্ঠতা ছিল দীর্ঘকালের, প্রায় বন্ধুর মতো হলেও সে ঘনিষ্ঠতায় মিশে ছিল পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। যামিনী রায়ের অসামান্য চিত্র রচনায় যেমন বিষ্ণু দে ছিলেন অভিভূত, তাঁর চিঠি পড়ে বুঝি যে শুধু বিষ্ণু দে-র কবিতারই নয়, তাঁর প্রবন্ধেরও তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী। উভয় শিল্পীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য প্রচুর থাকা সত্ত্বেও বয়ঃকনিষ্ঠ স্বাভাবিক কারণে সম্ভ্রমে তাকালেও বয়োবৃদ্ধ যামিনী রায় সস্নেহেও কখনো জ্যেষ্ঠত্বকে প্রশ্রয় দেন নি; প্রবীণ রঁদা ও নবীন রিলকের মধ্যে নবীনটি অথচ রঁদাকে মনে মনে গুরুরূপে মেনে নেন। রঁদা রিলকের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়জন কেবল বিস্মিত নন মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন মহান ভাস্করের অবিরাম ও অফুরন্ত কাজে, তাতে কবি নিশ্চিতভাবে ঋদ্ধ হয়েছিলেন, এই যোগাযোগে অবশ্য রঁদার প্রতিক্রিয়া কি হয় তা আমরা সঠিক জানি না; তবু রঁদা-রিলকের সাক্ষাৎ অ-সম ছিল, কারণ রঁদা তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কৃতী শিল্পী, অন্যপক্ষে রিলকে শিল্পরাজ্যে সবে মাত্র ঠিকমতো প্রবেশ করছেন কিংবা কয়েক পা এগিয়েছেন।

যামিনী রায়-বিষ্ণু দে সংযোগে সেই অ-সমত্ব বোধহয় ছিল না, আর,

একজন অন্যজনকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেন কবিতা ও চিত্রে বিষ্ণু দে-র 'যামিনী রায়' বার হবার পর তা গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধান এবং গবেষণার বিষয় হয়ে যায়। অবশ্য চিত্র ও কাব্যে যাঁর সম্যক সূক্ষ্ম জ্ঞান ও বোধ আছে তিনিই কেবল পারবেন আমাদের ওয়াকিবহাল করতে বিষ্ণু দে-র কবিতার কোথায় এবং যামিনী রায়ের ছবির কোন অংশ বা আবেগে উভয় উভয়কে সমৃদ্ধ করেছিলেন শিল্পের স্বাভাবিক টানে।

চিত্র ও কাব্য রচনার আবেগ ও লক্ষ্যের মধ্যে কোথাও কিছু মিল থেকে গেছে, বিশেষ করে আধুনিক কবিরা অনেক সময় ভাব / অনুভবকে স্পষ্ট করার জন্য শব্দ সাজিয়ে চিত্র রচনা করে থাকেন, আর চিত্রকল্প, বাক্-প্রতিমর পরীক্ষা আজকাল সমালোচক ও গবেষকের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে। যামিনী রায় প্রসঙ্গে তথ্যটি তাৎপর্য পায় এইজন্য যে তিরিশের প্রধান কবিদের মধ্যে কয়েকজন যামিনী রায় সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, তখন তিনি কৃতী চিত্রশিল্পী হলেও অভিজাত কিংবা তাঁর সৌহার্দ্য সামাজিক পদমর্যাদা, প্রতিষ্ঠার সমর্থক ও প্রতীক হয়ে ওঠে নি।

নিঃসন্দেহে শুধু ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে এর ব্যাখ্যা মেলে না। কোন্ আবেগ ও প্রেরণায় কবি ও চিত্রশিল্পীর এমন মিলন ঘটে, যামিনী রায় প্রসঙ্গে তা বিবেচ্য হয়ে পড়ে এভাবেও। তাই যামিনী রায় বিষয়ক রচনা সম্বন্ধে সকলে বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকরা এত আকর্ষণ বোধ করেন। যাঁদের কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করে পরবর্তীরা বয়স্ক হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাঁদের যামিনী রায় সম্পর্কে উৎসাহ ও আগ্রহের কারণ কি তা জানা নিছক কৌতূহলই নয়, সে-জানা আমাদের প্রিয় কবিদের সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণার পরিধিও বাড়ায়। আর এ প্রশ্ন তো জাগে মনে, কেন একজন শিল্পী তার শিল্প-সীমা ডিঙিয়ে অন্য শিল্পী ও শিল্প সম্পর্কে এত ব্যগ্র হয়ে ওঠেন?

চিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি মানবিক কৃতিগুলি, তা অভিজাত হোক বা লৌকিক, বিষ্ণু দে-কে বারবার টেনেছে নিদারুণ, 'তিনি তো (যামিনী রায়—সংযোজন আমার) নিজেই বলতেন, দুনিয়ার অনেক কিছু তাঁর মনোমতো হয় না, কিন্তু সবই জানতে হয়, কারণ সবই মানুষের।' একথা 'মানবিক কোন কিছুই আমার বৈরী নয়' সেই অমোঘ অব্যর্থ উচ্চারণের প্রায় সমতুল, ফলে নিজের পছন্দর চেয়ে মানবিক সমস্ত কিছু আত্তীকরণের মধ্যে আছে মুক্তির আস্বাদ। নিজের আবেগ-অনুভূতি তাৎপর্যময় করতে গেলে তো ছুৎমার্গী হওয়া চলে না, আর যে কবি-শিল্পীর দৃষ্টি শতকরা পঁচানব্বই কি

তার চেয়ে বেশি মানুষের প্রতি নিবদ্ধ, তাঁর মানবিক নানা কাজকর্ম সম্পর্কে অভিহিত থাকা, নিজের সৃষ্টিতে তা জারিত করা আবশ্যিক কেবল নয়, স্বাভাবিকও বটে।

'যামিনী রায় চান ঘরোয়া মানুষকে আনন্দ দিতে। এ আনন্দ শুধু বিশ্রাম নয়, এ প্রতিবাদে ভেঙে গড়ারই পরোক্ষ প্রেরণা।' উক্তিটির মধ্যে আমরা তবু খুঁজে পাই বিষ্ণু দে কোন প্রেরণায় ঝুঁকেছিলেন যামিনী রায়ের দিকে, তার ইঙ্গিত। যামিনী রায় আনন্দের শিল্পী ছিলেন, কিন্তু এ-আনন্দ শুদ্ধ আনন্দবাদীর আনন্দ যে নয়, তা বিষ্ণু দে যেন আনন্দ-কে বিশেষিত করে বুঝিয়ে দেন 'এ আনন্দ শুধু বিশ্রাম নয়,...' বাক্যে।

যামিনী রায় গ্রামের মানুষ, তরুণ বয়সে কলকাতা এসেছিলেন ছবি আঁকা শিখতে, অথচ কলকাত্তাই হওয়ার রোখ্ তাঁর কোনোদিন চাপে নি। তিনি কলকাতাবাসী শৌখিন দাদার ডাক উপেক্ষা করে উত্তর কলকাতার এক গলিতে ঠাঁই নিয়েছিলেন ভাই রজনীকে সঙ্গে নিয়ে, যে জীবন একান্ত অনিশ্চিত, তবু তাতে স্বনির্ভর হবার প্রচণ্ড দার্ঢ্য থাকে। তখুনি কেবল নয় এমন "এক সময় গেছে যখন ছেলেমেয়েদের শুধু (তখনকার) ১ পয়সার মুড়ি খেতে দিতেন।' অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা তাঁকে দীর্ঘ দীর্ঘদিন কাবু করে নি, পরবর্তী সময়ে তিনি যথেষ্ট সুখের মুখ দেখেছিলেন, কিন্তু ঐ গ্রামের ছেলে হওয়া ও আত্মমর্যাদা বিঘ্ন না করে শহরে অস্বচ্ছল জীবন যাপনের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল সেই কথাটি যা শিল্পীকে বিশ্বসেব সরল ভূমিতে লগ্ন অথচ দৃঢ় রাখে, বিষ্ণু দের ভাষায় 'শিল্পের প্রাণ সন্ধান এবং সামাজিক জীবনের আত্মসম্পূর্ণতার স্বপ্ন তাঁর এই গ্রামীণ পটভূমিতেই আরম্ভ। এরই স্মৃতি তাঁকে ভুলতে দেয় নি কলকাতার নকল বুর্জোয়া জগতের পশ্চিমা প্রাকৃতবাদী শিল্পমার্গের অসারতা। তাঁর নিজের হাতের অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও।'

'অত্যন্ত বন্ধুবৎসল উদার মানুষ' যামিনী রায়ের জীবন আর একভাবে আমাদের অবিচল শ্রদ্ধা কাড়ে। যামিনী রায়ের জনপ্রিয়তা ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে বেশ কিছু সময় যায়, কিন্তু একবার তা ছড়িয়ে পড়লে তাঁর পসার বাড়ে এবং প্রতিপত্তিও, তবু তিনি আশ্চর্য মাথা ঠাণ্ডা রাখেন ঐ উত্তেজক মুহূর্তসমূহে। পসারের সঙ্গে ভালো কাজের সম্পর্ক, অনেকের মতে, ব্যস্ত অনুপাতের; অথচ সুনাম ও পসার তাঁকে আত্মপ্রসাদী করে তোলে না, তিনি স্পষ্ট বুঝে নেন তাঁর ক্রেতাদের শৌখীন বিলাসীপনা, ফলে চলে অবিরাম অনুসন্ধান।

জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত হতে পিছিয়ে পড়েন না, কারণ তিনি জানেন জনপ্রিয়তা তো মুষ্টিমেয়র খেয়াল-খুশিনির্ভর, প্রায় ফাটকাবাজির খেলা ; তিনি 'তাঁর সুলভ্য বা দুর্লভ সব ছবিই সাধারণ মানুষকে নন্দিত করতে হাতে দিতে চান', কারণ তাঁর মতে 'যত বেশি মানুষ ঘরে ছবি রাখবে, ততই জীবন ও শিল্পে রুচিবিস্তার ও আনন্দের প্রসার।' এ-টা কেবল কথার কথা ছিল না, তাঁকে যে ছবির জন্য দাম নিতে হতো, এজন্য যামিনী রায় অস্বস্তি বোধ করতেন—তা বিষ্ণু দে আমাদের জানিয়েছেন।

বোধহয় যামিনী রায় জীবিকার জন্য যে সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন তা সব এমনই বাস্তবিক ও নিরেট যে কোনো সময়ই তাঁকে বাস্তব থেকে বিশ্রামের আরামে ক্ষণিকের জন্য হলেও ঠাঁই দিতে রাজি হয় নি, আর অভিজ্ঞতাগুলি যেহেতু স্বেদের বদলে অর্জিত, তাই 'সবই তাঁর চোখের হাতের জ্ঞানে পড়ে সার্থক হয়ে উঠেছে।' তবে বলব না যে যামিনী রায়ের শিল্পজীবনের ইতিহাস তাঁর ক্রমপরিণতির কাহিনী, কারণ তাঁর মতো মহৎ শিল্পীর রচনা কেবল বিবর্তিত নয়, পরিবর্তিত হতে পারে। তিনি যখন ভঙ্গি পালটাচ্ছেন আসলে তখন চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন অনুযায়ী ছবি এঁকে চলেছেন, পিকাসোর মতো বললে কথাটা এমন দাঁড়ায় যে, যখন তিনি বলার মতো কিছু খুঁজে পান, তখন এমন ভঙ্গিতে তাকে প্রকাশ করেন যা তার যোগ্য ও ঠিক। ফলে যামিনী রায় এক জায়গায় এসে থেমে যান নি, তিনি শুধু তথাকথিত চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, একেবারে শ্রমিকের মতো নিরবচ্ছিন্ন কাজ করার অফুরন্ত শক্তি এবং ক্ষমতা তাঁর ছিল, তাই তিনি নিজের ছবির একাধিক কপি করতে আড়ষ্ট বা জাড্য বোধ করতেন না। এমন অফুরন্ত কর্মীর কাজের সঙ্গে সঙ্গতভাবে পিকাসোর কর্মক্ষমতা তুলনীয় হতে পারে, যদিও স্বীকার্য পিকাসোর মতো তিনি একাধিক শিল্পমাধ্যমে কাজ করেন নি—ভাস্কর্য ও লেখাতেও পিকাসো তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমন কোনো পরিচয় আমরা যামিনী রায়ে পাই না। তবে পিকাসোর মতোই তিনি কেবলই অতৃপ্ত থেকেছেন—বারবার নিজের রীতি-পদ্ধতির ধারা পালটেছেন, ভেঙে ফেলেছেন নিজের রচিত স্বকীয় রীতি, নিজেকে নতুন সমস্যার সম্মুখীন করেছেন খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেও, আত্মসংকট মোচনের জন্য নিমগ্ন হয়ে গেছেন একেবারে নতুন কিন্তু অনিশ্চিত রীতিতে। তবু সাফল্য আসে এইজন্য যে তিনি কখনো বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি, সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হয়ে বীরের মতো পরিশ্রম করে গেছেন আমৃত্যু।

'তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক' গ্রন্থনামের সঙ্গে এই উপশীর্ষ জোড়া থাকলেও 'যামিনী রায়' পুস্তকটি এই মহান শিল্পীর চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে সংহত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আলাপচারিতায় প্রকাশ করে সামগ্রিকভাবে তাঁর শিল্প-ব্যক্তিত্ব ও অন্তরঙ্গ মানুষটিকে। শিল্পীও যে সমাজ-সংসারের মানুষ, তার চিন্তা-ভাবনায় গভীরভাবে ছাপ ফেলে তাঁর পরিবার-পরিজন ও পরিবেশ, বৃহৎ আর্থসমাজ—তা বিষ্ণু দে অনুধ্যানে রাখেন বলে খুব সহজে তাঁর শিল্প-ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতে পারেন আমাদের সামনে :

'যামিনী রায়ের অর্ধশতাব্দী ব্যাপী চিত্রকর্মে দেখা যায় এক প্রতিভাদৃপ্ত শিল্পীর একক তীব্রতায় একটি ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পরিণতির পর্বে পর্বে দীর্ঘ ইতিহাস, যে শিল্পী তাঁর টেকনিক বা কলাকৌশল এবং তাঁর স্বকীয় রূপদ্রষ্টা ব্যক্তিত্বকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে চান নি। তাঁর ঈসথেটিক অর্থাৎ নন্দন-প্রেরণা সর্বদাই দাবী করেছে সংহতি ও সংলগ্নতায় স্বীয় একাত্মতা। যে সব দুর্লভ শিল্পীর স্বকীয়তা অনস্বীকার্য, তিনি নিশ্চয়ই সেই স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে একজন। তার কারণ তিনি অনেক চিত্রকরের মতো তথাকথিত স্বকীয়তার পিছনে মরীচিকা-সন্ধান করেন নি, কারণ তিনি সমানে ছবি এঁকে গেছেন, প্রয়োগ পরীক্ষা করে গেছেন প্রকৃত নন্দশিল্পীর বা জাত আর্টিস্টের ব্যক্তি-স্বরূপের গভীর উৎস থেকে। এ-রকম জাত আর্টিস্টদের চৈতন্যে ভর করে থাকে সরল কিন্তু দুর্নিবার, এমনকি নির্মম, এক সৌন্দর্যের দর্শন, তার সমস্ত রকম আকার-প্রকার সমেত, যাতে আর এ-রকম শিল্পীদের মনে কখনো স্থিতির শান্তি থাকে না। এবং এই সংগ্রাম সাধনায় যামিনী রায়ের মনে তাঁর চিত্র-ধর্মের অন্বিষ্ট তাঁর জীবন-দর্শনের ছন্দে সম্পূর্ণতা পেয়েছে।' যামিনী রায়কে সম্পূর্ণ অথচ সহজভাবে তুলে ধরার জন্যই হয়তো গ্রন্থটিতে এক অভিনব পরিকল্পনা গৃহীত হয়—বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয় শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা, রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যামিনী রায়ের লেখা, আর অনবদ্য তীক্ষ্ণ সেই প্রবন্ধ : পটুয়া শিল্প। এগুলি যুক্ত করে যেন একই সঙ্গে বলা হয়ে যায় যে যামিনী রায় আমাদের কালেরই শুধু নয় সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ রচয়িতা সম্পর্কে যেমন অভিহিত ছিলেন, তেমন নিবিড়ভাবে অতি মনোযোগে লক্ষ্য করেছিলেন খুবই অনাদৃত এক সৃজনশীল সম্প্রদায়কে যারা 'সংহত কোনো পৌরাণিক জগতে স্থিতি পেয়েছিল।' তাঁর রবীন্দ্র-স্মৃতি-চারণ যেমন অন্তরঙ্গ ও অকপট, তেমনি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' প্রবন্ধটি, যা পড়ে রবীন্দ্রনাথ গভীর স্বস্তি বোধ করেছিলেন। হয়তো তাঁর ছবি যামিনী

রায়ের মতো একজন শিল্পীর স্বীকৃতি পায় বলে তিনি তাকে পুরস্কাররূপে গণ্য করেন, রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।' নিশ্চিতভাবে আমাদের দেশ আবৃত দৃষ্টির দেশ, না হলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর চিত্রকলার স্বীকৃতির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে হয় কেন? 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখা', যেমন আমরা কিছু সচকিত হতে পারি 'পটুয়া শিল্প' পড়ে, কারণ ঐ প্রবন্ধে যামিনী রায় খুব সোজা কথা বলেন, 'আধুনিক মনে কোনো জীবন পুরাণই আর ধরছে না। তাই অশান্তির শেষ নেই। মূল পটুয়া ছবির পুরাণ-নির্ভরতা তাই লক্ষ্য করবার।'

তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম যে একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে স্পৃষ্ট সে-কথা আরও বিশদ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিষ্ণু দে-কে লেখা চিঠিতে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত যামিনী রায় অসংখ্য চিঠি লেখেন বিষ্ণু দে-কে, তা থেকে এখানে ৭১টি মাত্র চিঠি ছাপা হয়েছে। ঘরোয়া চিঠি, আন্তরিক ও অকপট, তাতে লেখা হয় এমন এক ভাষায় যা খুবই স্বকীয়, আর ঐ ভাষাতে তাই সহজে যামিনী রায়ের চিন্তা-ভাবনা-মন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে অবলীলায়—

'এইটুকুর মধ্যে লিখে সবটুকু প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। চোখ এবং কান দুই অবিশ্বাসী, ইন্দ্রিয়। এবং ইহাই এই দুই ইন্দ্রিয়ের গুণ। এই গুণ না থাকলে মায়ার ফাঁদে পড়ে না, মানুষ, ও সৃজনও হয় না।...'

বা, 'দুদিন হলো জনের বিয়ের কার্ড পেলাম, কার্ডের আঁকা সাজনটি দেখে সারা ইউরোপকেই দেখা যায়। বিভ্রান্ত। মঙ্গল, শান্তি, শুভ, কোনো রসই দেয় না, এত শুধু বিভ্রান্ত—...'

বা, 'আমার কাজ যে বিপরীত ধর্ম্মী আজকার শিল্পধর্ম্মীয় পটভূমিতে, এটা আমি না বললেও চলে, তবে এই দৃষ্টিই যে আজকের দিনের পক্ষে একমাত্র উপযোগী কিংবা যা আঁকি তাই ভালো, এরকম মতিগতি আমার নয়, এ হলপ কোরে বলা চলে। আমি...আমি শাক অন্নবিশ্বাসী, এখনও আমার এই শেষ সময়েও ভগ্নস্বাস্থ্যেও এমন প্রবল বিশ্বাস আছে। যাহা শুধু জীবন ধারণের জন্য আড়ম্বরশূন্য শাক অন্ন, সমস্ত দিন পরিশ্রম করলে যতই বিপরীত পরিবেশ হোক না তবু বাঁচতে পারা যায়, ইহা বিশ্বাস করি, এবং ইহাই আমার ধর্ম মনে করি।'...এবং আরও বহু চিঠির অংশ কিংবা চিঠি উদ্ধৃত করা যায় এমন।

বিষ্ণু দে-র 'যামিনী রায়' গ্রন্থ যে ভাবে বিন্যস্ত হয়, তাতে আমাদের প্রচলিত ও আভ্যাসিক সাহিত্যবিভাগের (যেমন প্রবন্ধ, স্মৃতি-চারণমূলক রচনা ইত্যাদি) কোনো একটিতে একে খাপে খাপে বসিয়ে দেওয়া চলছে না, বোধহয় যামিনী রায়কে সব দিক থেকে মোটামুটি স্পষ্ট তুলে ধরার জন্য দরকার ছিল এমন পারিপাট্যের। বিষ্ণু দে-র লেখা বারবার আমাদের চেতনা উদ্দীপ্ত করেছে, তাঁর সদাজাগ্রত নান্দনিক দৃষ্টিতে জগৎ-সংসার উদ্ভাসিত হওয়ায় আমাদের অভ্যস্তবোধ নাড়া খেয়ে অথচ গভীর অতলে শিকড় চালায়। আর লেখার গুণে যামিনী রায়ের ছবি দেখার অদম্য ইচ্ছা জেগে ওঠে, তখন 'আপনার যামিনীদাদা'-র চিঠি থেকে অংশ তুলে বিষ্ণু দে-কে জানাতে ইচ্ছে করে—'আপনার লেখার মধ্যে এত সংযম, মুগ্ধ হই।'

কার্তিক লাহিড়ী

প্রবন্ধ

সাময়িকী। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। অধ্যয়ন, কলকাতা-১২। কার্তিক ১৩৮৪। দাম ১২ টাকা

গ্রন্থের মুখবন্ধ 'আভাষ'-এ আশি বছরের বৃদ্ধ লেখক বলেছেন: 'সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এই লেখাগুলির সাময়িক মূল্য কোনো কালে কিছু ছিল কি না জানি না। তবে এর স্থায়ী মূল্য কিছু নেই সে-কথা অকপটে ঘোষণা করছি।...এই শ্রেণীর গ্রন্থ একটা পারিবারিক বিলাস মাত্র।' নিজের সম্পর্কে কতটা নির্মোহ হলে এরকম বাক্য রচনা করা যায়, তা আমরা অনুমান করতে পারি, কিন্তু এর প্রতিপাদ্য বিষয়ে একমত নই। 'সাময়িকী'-র নানা বিষয়ের প্রবন্ধগুলি শুধু সুখপাঠ্যই নয়, তাঁর অতিশয় যুক্তিনির্ভর রচনার প্রত্যেকটি মন্তব্যে পাঠক চিন্তার খোরাক পান। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলির সংকলনটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রকাশনা সন্দেহ নেই।

'রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা' প্রবন্ধটির কথাই ধরা যাক। এ-বিষয়ে তো অনেক লেখাই হয়েছে, কিন্তু পড়া শুরু করলেই বোঝা যায় এ ভিন্ন ধরনের রচনা। রবীন্দ্রনাথ যে ঈশ্বর-ভাবনার দিক থেকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্টত

অজ্ঞাবাদী বা aguostic ছিলেন, অন্তত 'বৈজ্ঞানিক মনের যুক্তিতর্কের' দিক থেকে, যতই কেন তাঁর হৃদয়ে থাকুক বিশ্বাসপ্রবণতা—সেই বক্তব্যকে দীর্ঘ ও ব্যাপক উদ্ধৃতিব মধ্য দিয়ে লেখক প্রমাণ করেছেন তাঁর ভাবাবেগ-হীন যুক্তি ও বোধের সাহায্যে। এটাই তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ। সহজভাবে সোজাসুজি সব কিছুকে দেখা এবং যুক্তির ব্যাপারে আপোষহীন নির্ভরতা শুধু এই লেখাতেই নয়, প্রায় সব কটি লেখাতেই একটা ঋজু সাবলীলতা এনে দিয়েছে।

বেশ কয়েকটি লেখাতে স্মৃতিচারণ আছে এবং এই প্রাণবান বৃদ্ধের কাছ থেকে তা শোনাও সৌভাগ্যের ব্যাপাব। বিশেষ করে ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের নানা কাহিনী—'অতি সাধারণের কাছে' রচনায়—সত্যিই উপভোগ্য—নিজেকে কখনই তিনি উৎকটভাবে প্রকট করেন নি, এ-জাতীয় লেখায় প্রায়শই যা ঘটে থাকে। এরকমই উপভোগ্য তাঁর অন্যান্য লেখাতেও নানা অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ কাহিনী শোনা।

সব রচনাই যে স্মৃতিমূলক তা অবশ্য নয়। 'অনাথনাথ বসু স্মৃতি বক্তৃতা'-য় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার পরিচয় পাই। আবাব 'অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভারের ভূমিকা' বা 'আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়' বচনা দুটিতে বরিশালের দুই প্রাতঃস্মরণীয় গুরু-শিষ্যের চরিত্র চিত্রণে তাঁর শ্রদ্ধাবনত আদর্শবাদী চিত্তেব প্রকাশ ঘটেছে। শুধু এই লেখা দুটিতেই নয়, আরো কিছু কিছু রচনাতেও নিজের 'দেশ' বরিশালের প্রতি তাঁর, মমতা যদি না বলি, গভীর মনোযোগের নিদর্শন আছে। সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বেতার-ভাষণ 'বরিশালের উপভাষা'।

লেখকের স্বাদেশিকতার একটা সুস্থ অভিব্যক্তি এসব লেখায় আমাদের মনে গেঁথে যায়। এবং প্রত্যক্ষ থেকেই তিনি পৌছন তাঁর এই দেশচেতনায়। ধোঁয়াটে ভাবাবেগের বদলে এই যে প্রত্যক্ষের জ্ঞান ও চর্চা—জীবন্ত ভাষার ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা তারই অন্তর্গত—আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় তাঁর লেখায়।

শিক্ষণীয় অনেক কিছুই। হয়তো তাঁর পরিহাস বা ব্যঙ্গ ও সে কারণে আমাদেব উপরই বর্ষিত হয়—কারণ আমরা অনেকেই তো 'N.P.P. অর্থাৎ না পড়ে পণ্ডিত' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব এই সংজ্ঞা তাঁর একটি প্রবন্ধের শিরোনাম)। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে এমনকি ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা পণ্ডিতদের তথ্যভ্রান্তি তিনি অকাট্য যুক্তিতে প্রমাণ করেছেন।

'সাময়িকী' গ্রন্থের বেশ কটি প্রবন্ধ ভাষা বা বানান বিষয়ক। উপরন্তু তাঁর এ-বিষয়ের অন্যান্য প্রবন্ধগুলি নিয়েও প্রকাশিত হয়েছে আরেকটি বই: 'বাংলা বানান'। দুটি বইয়েরই এই প্রবন্ধগুলিই হয়তো তাঁর প্রধান রচনা বলে বিবেচিত হবে—যদিও বর্তমান সমালোচক অন্য প্রবন্ধগুলিও কম উপভোগ করেন না। বানান-বিচার—অর্থাৎ বানান সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন, সমস্যা, এমনকি ত্রুটি সংশোধন—এ সব নিয়ে লিখিত প্রবন্ধ অবশ্যই ছাত্র-শিক্ষক-লেখকদের কাছে বিশেষভাবেই সহায়ক রচনা হিসেবে আদৃত হবে। কিন্তু এর অতিরিক্ত আকর্ষণ এখানেই যে, ব্যাকরণকূটকেও তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রাঞ্জলতায়, যুক্তির নিষ্ঠায় এবং সবচেয়ে বড় কথা পরিহাসতরল ভঙ্গিমায় সুখ-পাঠ্য করে তুলেছেন। শেষোক্ত কারণে মনে হয়, 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'-র লেখক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়েরই তিনি উত্তরসূরি।

ব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনায় মুক্তমনা পণ্ডিতব্যক্তিও যে সংকটে পড়েন, তা হল, কিছু কিছু ব্যতিক্রম, অর্থাৎ ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ কিন্তু অতি-প্রচলনের ফলে স্বীকৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে তাঁরা গ্রহণ করতে বাধ্য হন বাস্তব জ্ঞানে, কিন্তু তারপরই বুঝতে পারেন না কত দূর পর্যন্ত এই উদারতা চলতে পারে। ফলে কতকগুলি ক্ষেত্রে তাঁরা প্রশ্রয় দেন, কিন্তু তার পরেই নিজেরাই একটা বেড়া তৈরি করে তর্জনি উঁচিয়ে বলেন, এ চলবে না! বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যিনি উদার, তিনিই হয়তো অন্যক্ষেত্রে রক্ষণশীল। এই 'স্ববিরোধিতা' বর্তমান লেখকের ক্ষেত্রেও ঘটেছে কিনা তা চিন্তনীয়।

মণীন্দ্রবাবু নিজেই বলেছেন, 'পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ভাষার ব্যাকরণদোষ অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়।' সুতরাং ভাষার ব্যাপারে তথাকথিত রক্ষণ-শীলদের সংবেদনশীল সহৃদয়ভাবে অনুভব করলেও তাঁকে ঠিক কঠোর 'শুদ্ধতাবাদী' বা purist বলা চলে না। তবে 'যাহা আসে, আসিতে দাও' এ-মতেরও তিনি অংশীদার নন। বরং তাঁর ঝোঁকটা বোধহয় খানিকটা রক্ষণশীলতার দিকেই—সংগতভাবেই স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল বিরোধী তিনি।

জীবন্ত ভাষায় বিদেশী বাগ্‌রীতির প্রভাব যে পড়বেই সে-বিষয়ে মণীন্দ্র-বাবু একমত। বহু সময়ই সাহিত্যিক লেখকরা কোনো কোনো শব্দের প্রতি এমন আকস্মিক অনীহা, মণীন্দ্রবাবুর ভাষায় 'জুগুপ্সা', কেন প্রকাশ করে বসেন তা ঠিক বোঝা যায় না। এমনকি রবীন্দ্রনাথও 'তাসের দেশ' নাটকে বা অন্যত্র যে শব্দগুলি নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন, তার কিছু কিছু তো বেশ ভালোভাবেই

ভাষায় চলে এসেছে। কোনো শব্দ সুখশ্রাব্য কিনা তা কি আলাদা করে বিচার করা যায়?

এ সমস্ত বিষয়ে মনস্থির করে ওঠা বড় মুশকিল। ফলে 'যোগদান', 'রুচিবান', 'সংস্কৃতিবান', 'প্রবহমাণ', 'সক্ষম', বিসর্গবর্জিত 'বিশেষত' 'ক্রমশ' ইত্যাদি শব্দগুলির বিরুদ্ধে মণীন্দ্রবাবুর দীর্ঘ বৈয়াকরণিক যুক্তি সত্ত্বেও মন তো মানে না! অবশ্য মণীন্দ্রবাবু কোনো ফতোয়া দিতে চান নি কখনো—তিনি শুধু প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি শুধু ভাষাপ্রেমী মানুষদের মধ্যে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক মত বিনিময়ের সূত্রপাত চান সিদ্ধান্তে পৌছতে। অবশ্য বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি, তা যেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতির নিয়মাবলির মতো অতি-উদার ও নিষ্ফল না হয়।

দেবমিত্র বসু

কবিতা

তাসের পেখম। মৃগাঙ্ক রায়। সারস্বত লাইব্রেরি, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। মূল্য: পাঁচ টাকা

আপশোষ, মৃগাঙ্ক রায়ের 'সমুদ্রকন্যা' আমার পড়া নেই। কিন্তু মাঝেমধ্যে তাঁর কিছু কবিতা অনেক বছর আগে ইতস্তত পড়তে পেতুম কয়েকটি সাময়িকপত্রে। তা থেকে তাঁর গলা শনাক্ত করা আমার পক্ষে সঙ্গত কারণেই সহজ আর উচিত ছিল না। শুধু বিচ্ছিন্নভাবে মনে হত ধীর অনুচ্চ কণ্ঠ, কিছুটা বা লিরিক্যাল। তবে সে সময় তাঁকে নিয়ে তাঁর বন্ধুমহলে একটি সসম্ভ্রম জনশ্রুতি ছড়িয়েছিল মনে পড়ে। এসব কমবেশি বছর কুড়ি আগের কথা। মৃগাঙ্ক রায় নামটিই আমাকে অবধারিতভাবে পিছিয়ে নিয়ে গেল এখন, যখন তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থ 'তাসের পেখম' (জুলাই ১৯৭৮) আমার হাতে এল। তাঁকে আজকের দিনের অর্বাচীন কবিতা লেখক আর পাঠক সম্ভবত চিনতে পারবেন না, দোষ ঠিক দেওয়া যায় না তাঁদের, কারণ বেশ কিছুকাল তিনি স্বেচ্ছানির্বাসিত। নিশ্চুপ, বিরলপ্রজ আর অন্তরালপ্রিয় এই কবি যেন দীর্ঘ সর্পনিদ্রার পর এখন নড়েচড়ে উঠলেন, যেন মনে হল তাঁর স্বভাবতই বিস্মৃতিপ্রবণ ধাঙালি

পাঠকসমাজে একটু আত্মপ্রকাশ না করলে তিনি নিজের কাছেই হয়ে উঠবেন অপরাধী। এসবই আমার অনুমান। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁর এই বইখানি খুবই জরুরি ছিল। শ্রুতিসঞ্জাত সমীহার সত্যাসত্য যাচাইয়ের দিক থেকে চমৎকার একটি সুযোগ জুটে গেল আমার।

প্রথমে, কবিতার বইয়ের ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে—ওপর-ওপর পাতা উল্টে যাওয়া, দু-এক জায়গায় একটু থামা, কিন্তু না, তারপরই রেখে দেওয়া নয়। মনস্তাত্ত্বিক কারণে, স্মৃতিগ্রস্ত আকর্ষণে ক্রমে ক্রমে ঘন হতে থাকে আমার মনোযোগ, যাকে, অন্যভাবে, গতিবেগও বলা যেতে পারে। এইভাবে বইখানি আমার সাহচর্য পেতে থাকে বেশ কয়েকটা সকাল আর মধ্যরাত, আর মৃগাঙ্কবাবুকে যতটা সম্ভব চিনে নিই, অন্তত আমার মতন করে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ এই পঁচিশ বছরের মধ্যে লেখা তাঁর কবিতাসমূহের থেকে বেছে নেওয়া একচল্লিশটি কবিতায়, অথবা, আশ্চর্য নয়, এই কটিই হয়তো তিনি লিখে উঠতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন কবিতা জিনিসটা হৈ-চৈ করার মতো কোন ব্যাপার নয়, পংক্তি-রচনার কারিগরি বিদ্যা নয়, ফ্যাশনদুরস্ত চকরাবকরা কল্পচিত্র ব্যবহার করে নগদ হাততালির ধান্দাবাজি তো নয়ই। এ খুব ধীরে-সুস্থে আত্মশুদ্ধির কৃত্য, চেনা জনপদ থেকে অচেনাকে নিষ্কাশন করার মরমি দায়িত্ব সেধে নেওয়া, অর্থাৎ এক বয়সহীন বিষাদের আদল গড়ে তোলা। তাঁর শব্দব্যবহার, কল্পপ্রতিমার যোজনা প্রকৃতপক্ষে এমনিতর দুঃখেরই অভিজ্ঞতায় রক্তিম।

'তুমি গান গাইলে', মৃগাঙ্কবাবু লিখেছেন, 'যেন কোনো সুদূর নির্জনতায় / কোনো ভগ্ন জনশূন্য প্রাসাদ আমাদের ডাক দিল, / যেন তার ক্ষুধিত নৈঃশব্দের মধ্যে / স্মৃতি আর বিস্মৃতির, জন্ম আর মৃত্যুর / কুয়াশাঢাকা মনোরম মরুভূমি / হঠাৎ হাহাকার করে উঠল। (আমরা চারজন)। অথবা 'দিন যায়' কবিতা থেকে 'এ কার প্রকাণ্ড ধনুক এ দিগন্ত / পুবের পাহাড় থেকে মুক্ত করে শর / এখনো কাঁপছে। তারই তীক্ষ্ণ মুখে / দিন যায় / যায় আমার দিন যায় / আদি-অন্তহীন ভীষণ বিষণ্ণ নির্জনতায়।' উদ্ধৃতি দুটির ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু 'হাহাকার' আর 'আদিঅন্তহীন ভীষণ বিষণ্ণ নির্জনতা' প্রয়োগ দু'টির তলায় আমরা দাগ না দিয়ে পারি না। স্বীকার করতেই হয়, লাইনগুলি তেমন আহামরি কিছু নয়, সমর সেনের মধ্যে

এসব ইঙ্গিত আমরা আগেই পেয়ে গেছি, আর আপাতত মৃগাঙ্কবাবুর কাব্যোৎকর্ষও উদ্দিষ্ট নয় আমার। এখানে ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে চিনে নেওয়াটাই মূলত বিবেচ্য। সেদিক থেকে সম্বোদ্ধৃত লাইনগুলি অনেকখানি সাহায্য করবে আমাদের। না, শুধু আত্মপাক্ষিক বিষণ্ণতাই নয়, দুঃখী জনসমাজও তাঁর চৈতন্যে ছায়া ফেলেছে স্বাভাবিক। যে কোনো সৎ কবির মতো সহানুভূতি তাঁরও অন্যতম নির্ভর, নিজের সংবেদনা দিয়ে মানুষজনের ভেতর-দরজা খুলে তার আসল চেহারাটা খুঁজে বার করা তাঁরও ব্রত। বলাই বাহুল্য, সেই চেহারা খুবই বিক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, বিপ্রতীপ সমসাময়িকতার চাপে থ্যাৎলানো। তাই হিতৈষী প্রতিবেশীর মতো, বন্ধুর মতো ঈশ্বর অথবা নিজের সত্তার কাছেই তাঁকে মেগে নিতে হয় পরিশ্রমের সু-বাতাস: 'এই ব্যস্ত বধির মানুষগুলোকে / একটু করুণা কর, কখনো-সখনো একটু / প্রেম দিও /···কিছু জিজ্ঞাসার যন্ত্রণা দিও রক্তের ভিতরে—কতদূর গেলে মানুষের দূরত্বের কাছে যাওয়া যায় / বলে দিও। এই আধপোড়া / মারমুখী মানুষগুলোই একদিন / একগুচ্ছ রঙিন বেলুন হাতে পৃথিবীর উজ্জ্বল প্যাণ্ডেলে এসেছিল॥ (একটু প্রেম দিও)। অনুরূপ আত্মসম্প্রসারণের আর একটি দৃষ্টান্ত মিলবে 'কর্ণের রথ' কবিতায় যার শেষটা এই রকম: 'আমাদের বিশ্বাস কর্ণের অভিশপ্ত রথ। / এখন প্রতিটি দিন / আমাদের ঘাড়ের মাংসের ওপর / বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে॥' এমনিভাবে মৃগাঙ্কবাবু ব্যক্তি ও সমাজের কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ সম্পর্কে নিজের কবিসত্তাকে সমর্পিত রেখেছেন।

গোড়ার কথার জের টেনে বলা যায়, ঠিকই শুনেছিলুম মৃগাঙ্ক রায়ের কবিতা আদৌ উচ্চকণ্ঠ নয়, কোনখানেই তিনি রাগে ফেটে পড়েন নি দৃশ্যত, ভেঙেও পড়েন নি নৈরাশ্যে। এই দুটি পরস্পর বিপরীত প্রক্ষোভ তাঁর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়ে স্থৈর্যের প্রাজ্ঞতা পেয়েছে। প্রায়শই কথা বলেন ঠারেঠোরে, পরিমিত শব্দে আর চিত্রকল্পে যা অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্যভেদী। 'এইখানে এই অট্টালিকাহীন জলের গভীরে / বসে আছে সে, সেই মনুষ্য যুবক' দারুণ উদ্যত / হঠকারী, অহঙ্কৃত রাজহংস যেন সূর্যাস্তবেলায়। / জল, নীলাভসবুজ জল ঘিরে আছে তাকে, তার কটি / উত্তাল উরুদেশ, বাহুমূল, বুকের পাথর। সে বসে আছে, সেই মনুষ্যযুবক যে ভেবেছিল / ভিত খুঁড়ে অটল অট্টালিকা বানাবে এক ..(মনুষ্যযুবক)। দশ লাইনের এই কবিতার

প্রথম ছ'লাইন এখানে তুলে দিলুম ; তাতে, সামান্য মন্থনের পরই ঠাহর হতে পারে ভবিষ্যৎপ্রত্যাশী এক যুবকের বিমূঢ়তা, এক স্বপ্নচালিত মানুষের পরিণতিহীন বসে থাকা ; নীলাভসবুজ জলের বেষ্টন মনে হতে পারে তার বিবিধ আকাঙ্ক্ষারই প্রতিরূপ এবং নির্বিশেষ প্রথম পুরুষে 'মনুষ্যযুবক'-এর ব্যবহার কবিরই ছদ্মবেশ বই অন্য কিছু নয়। অনুমান। বস্তুত মৃগাঙ্ক রায়ের ভাবাভঙ্গি অনেকখানিই আমাদের কল্পনাপ্রবণ করে, প্ররোচিত করে শব্দের বাচ্যার্থ উন্মোচনের দায়ে। শব্দ সাজানোর ক্ষমতা তাঁর আছে ; দুঃখ চারিয়ে দেবার কান্তিবোধে তিনি অর্জন করেছেন বিরল আভিজাত্য। যেখানেই তিনি একটু একা হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, ধরা যাক 'ঘটনাচক্র' কবিতায়, সেখানে তাঁর কলম মুহূর্তেই পাঠকবিজয়ী। তাঁর চূড়ান্ত স্ফূর্তি, আমার মনে হয়েছে, প্রেমের কবিতায়। লিরিকসম্ভব অনুভবের ক্ষেত্রে তাঁর ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর সুন্দরভাবে কাজ দেয়। 'স্বপ্নস্বেদমৃত্যু' কবিতামালা থেকে একটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করি: 'আমার চোখের নিচে তোমার চোখ—/ এক একটি দিন এক একটি ভিন্ন দৃষ্টি / এক একটি রাত ভিন্ন মুখ, / তার তরঙ্গিত কণ্ঠনালী প্রতিদিন নতুন অন্ধকার॥' একটা কথা এখানে জুড়ে দিচ্ছি, মৃগাঙ্ক রায়ের প্রেমের কবিতায় নায়িকাকে তেমন শরীরী, ব্যক্তিগত ও স্পর্শগ্রাহ্য মনে হয় না, তাঁর 'তুমি' প্রায়শই পৃথিবী অথবা ভবিষ্যতের মানসছবিতে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে। এটা—যদি আমার স্মৃতি প্রতারণা না করে—শেষচল্লিশ আর প্রথমপঞ্চাশের অনেক বাঙালি কবিরই মধ্যে লক্ষ্য করেছি। সম্ভবত তা তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক গরম হাওয়ার তির্যক বিক্রিয়ারই পরিণাম। আধাসামন্ততান্ত্রিক শোষণ-প্রধান বন্দোবস্তে ব্যক্তিগত প্রণয়ের স্বর্গ, তাঁরা ভেবে থাকবেন, ভুলস্বর্গ। যাই হোক এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

তিনফর্মার এই বইখানায় কোথাও একটিও বাঁধাছন্দের কবিতা নেই। সবই মুক্তছন্দে, নয়তো পয়ারভাঙা অসমমাত্রিকে, লিপিকার ঢঙে ঢালা গদ্যেও বেশ কয়েকটা। এ নিয়ে আমার কোনো অনুযোগ নেই ; কারণ এসব একান্তভাবেই নির্ভর করে মেজাজ আর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। অবশ্য যথাবিহিত বিনয় নিবেদন করে বলতে ইচ্ছে করে, সেদিক থেকে তাঁর কবিতার সংলাপের ঢঙ, ছবি, ইঙ্গিতময়তা প্রায়ই অরুণ মিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। সমর সেনও অল্প করে উঁকিঝুঁকি দিয়েছেন যেন 'দিন যায়', 'আমরা চারজন', 'একটি দৃশ্য' ইত্যাদিতে। মৃগাঙ্ক রায় খুবই প্রথম্ববাম

কবি। যা লেখেন এবং যেটুকু লেখেন তাতে সুন্দর করে মেলে ধরেন বিন্যাস আর সংযমের প্রমিতি। কবিতা-পাঠক হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা এর চেয়েও বেশি হলে খুঁজে নিতে হয় কবির অনন্যতা, দার্শনিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় প্রাতিস্বিকতা। 'তাসের পেখম'-এ সে জিনিস না পেলেও পেয়েছি কিছু পরিষ্কার ঝরঝরে কবিতা, মাঝেমধ্যে 'অনসূর্য', 'আকাশের নীলঝিনুক', 'কান্নার কারুকার্য'-এর মতো নির্ব্যঞ্জক ও বেমানান শব্দের স্খলন দেখেও না দেখে।

উপসংহারে লিখতে ভালো লাগছে মৃগাঙ্ক রায় সম্বন্ধে প্রচারিত সসম্ভ্রম জনশ্রুতির অনেকখানিই সত্য বটে।

শিবশম্ভু পাল

উপন্যাস

শালবনি। গুণময় মান্না। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬। দাম : ১৫ টাকা

গুণময় মান্না বাংলা উপন্যাসের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করেছিলেন 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাস প্রকাশ করে ষাটের দশকের গোড়ায়। 'লখীন্দর দিগার' ১৯৩৫ সালের মেদিনীপুর জেলার গ্রাম্য কৃষকের জীবন সংগ্রাম নিয়ে লেখা। বাংলা উপন্যাস তার জন্মলগ্নেই ঐতিহাসিক কারণে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আজও শহুরে ধনী বা মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েই সিংহভাগ উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে। এমন কি রাজনীতিও যেখানে উপন্যাসের কেন্দ্রবস্তু বা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, সেখানেও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কর্মকাণ্ডই প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' থেকেই ব্যাপারটা চলে আসছে। এমন কি ইদানিংকার কিছু খ্যাতনামা লেখকের উপন্যাসেও লক্ষ্য করা গেল যে, যন্ত্রণাময় সত্তর-একাত্তর-এর বাংলাদেশকে ধরতে উদ্‌গ্রীব হয়ে লিখে ফেললেন শহুরে ধনীপুত্রের পারিবারিক ব্যভিচার থেকে জাত নৈরাশ্য এবং তজ্জনিত রাজনীতির কথা। গুণময়বাবু তাঁর উপন্যাসগুলোতে—'লখীন্দর দিগার', 'কটাভানারি', 'জুনাপুর ষ্টীল' এবং সর্বশেষ প্রকাশিত 'শালবনি'তে কৃষক বা শ্রমিককে, তাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তবকে উপন্যাসের ন্যায্য সমগ্রতায় ধরতে চেয়েছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি মেদিনীপুরের চাঁদশোল গ্রাম। সময়টা সত্তরের দশকের গোড়ার দিক। পাত্র-পাত্রীরা গ্রাম্য নিচুতলার মানুষ, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত, জোতদার-পুলিশ-মহাজন। অন্যায় রক্ত উৎকোচ কানাঘুষো ভয়ের শিকার এই গ্রামের মানুষগুলো এ উপন্যাসে সে সবের বিরুদ্ধেই লড়াই-এ নেমেছে। নেতৃত্ব প্রাথমিকভাবে দিয়েছে শহর থেকে আসা প্রেসিডেন্সি কলেজের একদা ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র অমলেশ চ্যাটার্জি, মোহন নামক কৃষক হয়ে গিয়ে, নিজের শহুরে সত্তা ভুলে। গ্রামজীবনের সঙ্গে নিজেকে সনাক্তিকরণে সে এমনই সমর্থ যে গ্রাম্য মানুষগুলোও তার আসল পরিচয় ধরতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে গ্রামের 'মাহাতদের বিটি' শামলিকে বিয়ে করে এই স্বাঙ্গীকরণ সম্পূর্ণ করে। তার নেতৃত্বেই গ্রামের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয়—সে নিজে জোতদার হত্যায় অংশ নেয়, সাঁওতাল-মাহাত-দুলেদের জড় করে অস্ত্রশিক্ষা চালায়, অস্ত্রে শান দেয়। জোতদারের উচ্ছিষ্ট-ভোগী তারক হালদার গ্রাম্য মেয়েদের ওপর বিকারগ্রস্ত যৌনক্ষুধা মেটাত। শামলিকে নির্জনে বলাৎকার করতে গেলে তারকের হাতে ধরা কাপড় ফেলে শাম্লি উলঙ্গ অবস্থায় ছুটে আশ্রয় নেয় মোহনের কাছে—সম্ভবত শাম্লির এই প্রতিরোধ ও সংগ্রামই মোহনকে শাম্লিকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়। মোহন ধরা পড়ে, ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের আরেক প্রাক্তন ছাত্র, এখন পুলিশ ইন্সপেক্টর-এর হাতে—নিহত হয়, অনতিদূরে শাম্লি ধর্ষিত হওয়ার পর।

এখানে উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব, যার নাম 'ঘূর্ণি'। সেটা শেষ হয়, তৃতীয় পর্ব 'পূর্বাহ' শুরু হয়, যখন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই গ্রামের মানুষরাই কাঁধে তুলে নেয়, নেতৃত্ব দেয় মথুর কৌড়ি। কিন্তু প্রথম ধাক্কা সামলে অত্যাচারীরা সংগঠিত হয়, লড়াই লাগে—মথুর কৌড়ি নিহত হয়। ধান কাটার লড়াই-এ হেরে যায় কৃষককুল। আর শাম্লির শুরু হয় সংশয় যে তার গর্ভে যে সন্তান এসেছে সে কি মোহনের ভালবাসার না পশু-কুলের ধর্ষণের ফল এবং সে নিজেও সিং-বাড়িতে আশ্রিত মায়ের বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণের ফল না বাবা-মায়ের ভালোবাসার? শেষ পর্যন্ত সে তার নিজের জন্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে, কিন্তু সন্তান সম্পর্কে নিশ্চিত হয় নি, যতক্ষণ না প্রসব করেছে, এইসব সংগ্রাম রক্তাক্ত প্রতিরোধ প্রবল দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছে মোহনের সন্তান, মথুর কৌড়ির বংশধর।

এসব ঘটনা লড়াই সংঘাত সংকট বড় বেশি নাটকীয়তায় আক্রান্ত হলেও,

গুণময়বাবু উপন্যাসোচিত বিস্তৃত পটভূমির জীবনসামগ্র্যের পরিচয় উপস্থাপনে সর্বদাই উৎসাহী! মেদিনীপুরের এই অঞ্চলের জীবন গুণময়বাবুর নিবিড়ভাবে পরিচিত, উৎসব ও দৈনন্দিন জীবন, মহত্ত্ব ও নিচতা—এমন কি মেয়েলি জীবনের খুঁটিনাটিও তাঁর জানা, ব্যবহার করেন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে, ফলে এক-ধরনের আঞ্চলিক দলিলও হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাস। সাঁওতাল-দুলে-মাহাত, কৃষক-ক্ষেতমজুর, ধানকলের মেয়েশ্রমিক জীবন্ত হয়ে ওঠে—তাদের বাস্তব-পরিবেশ, মুখের ভাষা রঙ্গ-রসিকতা সমেত। বিশেষত মেয়েলি জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি এ উপন্যাসে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ। ধানকলের কর্মরত মেয়ে মজুরদের বর্ণনার বাস্তবতা নিখুঁত। অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসে যখন মধ্যবিত্ত জীবনের আত্ম-কণ্ডুয়নের দায়িত্বজ্ঞানহীন অমনোযোগী অর্থলুব্ধতা ব্যাপক তখন এমন রচনা পড়ে হতাশা কাটে।

কিন্তু, গুণময়বাবুর রচনায় আগেও যেটা মনে হয়েছে, এ উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম হল না: জীবনসামগ্র্যের সন্ধানে তিনি শিল্পরূপের প্রতি ততটা মনোযোগী নন। জনজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ঐশ্বর্য, উপন্যাসে প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে জমাট দানা বেঁধে ওঠে না। ফলে, মন্থরতার অভিযোগ তাঁকে আগেও শুনতে হয়েছে, এ উপন্যাসেও হবে। অথচ এ বিষয়ে তিনি যে একেবারেই উদাসীন বা তাঁর চরিত্রই অমন—এ কথা বলা চলে না। ফলে কোথাও কোথাও তিনি অনাবশ্যকভাবে নাটকীয় হয়ে যান। না হলে নারীমাংসের অভিজ্ঞ সুযোগসন্ধানী তারক হালদারকে দিয়ে শুধু একটা মেয়ে হাত থেকে পিছলে গেছে এই আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করাবেন কেন? উলঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটারই শাড়িতে ফাঁস লাগিয়ে? কেনই বা মোহন ওরফে অমলেশ চ্যাটার্জি মরার আগে অমন বিদগ্ধ ইংরেজিতে তর্ক করে?

এ-উপন্যাসে মোহনকে কখনো রাজনীতির আলোচনা করতে দেখা গেল না, একবার সে একটা গলা কেটেছে বটে, কিন্তু তার বিশ্বাসের, মূল্যবোধের সংগঠনশক্তির পরিচয় কই? কি বিশ্বাসে, কিসের জোরে এতগুলো মানুষ হঠাৎ প্রতিবাদে সংগঠিত হয়ে যায়? উপন্যাসের পুরুষচরিত্রগুলো প্রায় তাৎপর্যহীন। শামলি ছাড়া আর কোনো পুরুষ বা স্ত্রী চরিত্রের কোনো আত্মিক সঙ্কট নেই। ঘটনাগুলো ভীষণভাবে উপরিতলে আবদ্ধ। কিন্তু 'জুনাপুর স্টিল' উপন্যাসে তো শ্রমিক শিবলাল দাস জটিল আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল: 'নিজেকে পাওয়া তার নিজের মধ্যে হলেও তার সার্থকতা তার নিজের বাইরে, তার বিকাশ উন্মুক্ত সূর্যালোকের মধ্যে—পরিবার, সমাজ, সঙ্ঘ, পঞ্চায়েত বা

পার্টি যে নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন।' 'শালবনি'তে তিনি রাজনীতির জটিলতায় গেলেন না, ঘটনাও অনেক ক্ষেত্রে অতি সরলীকরণে দুষ্ট হয়ে গেল। সমাজ ও ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক কোথাও উন্মোচিত হলো না।

আশীষ মজুমদার

গল্প

কমিউনিস্ট পরিবার ও অন্যান্য গল্প। সৌরি ঘটক। মনীষা, কলকাতা-১২। দাম: ১২ টাকা

মজুর, চাষী এবং নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের নরনারীকে নিয়ে লেখা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের কয়েকটা ঘটনাকে ধরা হয়েছে এই ছোটগল্পের বইটিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'হারামের ভাত' গল্পটি রেলশ্রমিকের বস্তি থেকে তোলা। 'অরণ্যের স্বপ্ন' সুন্দরবনের বাদা এলাকার চাষীর ঘর থেকে আনা। 'লজ্জা' নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। নাটকীয় ঘটনাতে যেমন এরা প্রত্যেকেই সত্য, মজুর, চাষী কিংবা নিম্নবিত্ত নরনারী চরিত্রচিত্রণেও এরা সত্য। এদের মধ্যে যদি কোনো ছক থেকেও বা থাকে, যে রং দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে সেগুলো পুরোপুরি জীবন থেকে নেয়া। মজুর, চাষী এবং নিম্নবিত্তের ঘরের পুরুষ ও মেয়েরা উঠে এসেছে যার যার ঘর থেকে, কথা বলেছে যার যার ভঙ্গিতে। সৌরী ঘটক শুধু ঘটকালিটা করেছেন, তারপর ওদের কথা বলতে দিয়েছেন যার যার তার তার মতো। 'হারামের ভাত' পড়ে মনে হয় সত্যি সত্যি শ্রমিক বস্তি। 'অরণ্যের স্বপ্ন' গল্পটি পড়ে মনে হয় সত্যি সত্যি সুন্দরবনের বাদা এলাকা। লজ্জা পড়ে মনে হয় নিম্নবিত্তের ঘর।

বই-এর তেরটি গল্পের মধ্যে চাষী ও নিম্নবিত্ত জীবনের ঘটনাই চোদ্দ আনা। চাষীদের নিয়ে গল্পের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ লড়াই-এর গল্প, নিম্নবিত্তের অধিকাংশই প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদের গল্প। তবে নিম্নবিত্ত নিয়ে লেখা 'কমিউনিস্ট পরিবার' যেমন ষোল আনা রাজনৈতিক, চাষীদের নিয়ে লেখা 'ভাঙা নৌকার মাঝি' তেমনি নিতান্ত অরাজনৈতিক। অর্থাৎ, বইটি ফ্রেমে বাঁধানো নয়। যদিও বই-এর নামটির ওপর সঙ্গত কারণেই জোর দেয়া হয়েছে, তবু, লেখক কোনো গল্পই অরাজনৈতিককে জোর করে রাজনৈতিক

করেন নি। এতে অবশ্য কোনো কোনো গল্পের পরিণতি সাদামাটা ও মামুলি ধরনের হয়ে গিয়েছে।

ষাটের দশকের পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় ঘটনা নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট পরিবারের অগ্নিপরীক্ষা। দুরন্ত সংকটকে অতিক্রম করার ডাক রয়েছে 'কমিউনিস্ট পরিবার' গল্পে। লেখক সচেতন কমিউনিস্ট। এরই পাশা-পাশি নিম্নবিত্ত ঘরের দুটি মেয়ের গল্প একই সময়ের ফসল। লেখক মানবতাবাদী। দুটো ব্যাপার পরস্পরের পরিপূরক।

আরও যোগসূত্রের টানাপোড়েন রয়েছে সমস্ত গল্পকে মিলিয়ে। লেখকের নিজস্ব শৈলী এই ঐক্যের বাহক। মেজাজ কিংবা বলবার ধরনে পুনরুক্তিও যে আসে নি তা নয়। আকাড়া কথা বলার ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে বিভিন্ন অসতর্ক মুহূর্তে। অথবা, হয়তো এটা ইচ্ছাকৃত? হয়তো লেখকের ধারণা, বিশেষ করে চাষী-জীবনে রূঢ় ভাষণ একটা বড রকমের উপাদান, ঠিক যেমন নিম্নবিত্তজীবনে কোমল আলাপ। অবশ্য, রূঢ় ভাষণ ছাড়া সমগ্র বইটিতে অশালীনতা বা অশ্লীলতার অন্য কোনো ছায়াটুকুও নেই।

অশ্লীলতা ছাড়া বাস্তবতা হয় না বলে যে একটা ধারণা রয়েছে সম-সাময়িক মহলে, সৌরি ঘটক সেটাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছেন, বিশেষ করে নিম্নবিত্তঘরের গল্পগুলোতে। 'লজ্জা' ও 'অনূঢ়া' দুটিই অবচেতন মনের চাপা ক্ষোভের ফুলকি। এখানে একছিটে যৌনতা নেই, কিন্তু তাতে বাস্তবতার কণামাত্র চিড় খায় নি।

এ-প্রসঙ্গে আরেকটা কথা। সহানুভূতি বস্তুটাকে বিপ্লববাদী লড়াকু লেখক তাঁর শৈলীর মধ্যে যতই না কেন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে থাকুন না কেন, এইটে তাঁকে শুধু নিম্নমধ্যবিত্তদের নয়, মজুর চাষীর গল্পেও উতরে দিয়েছে। 'হারামের ভাত' গল্পে রহমের স্ত্রী ও নাতনীর যে ছবি এঁকেছেন লেখক, তাতে পাওয়া গিয়েছে গভীর অন্তর্ভেদী দরদ। লেখকের গদ্যরীতি 'কোদালকে কোদাল বলার' জন্যে সবসময়েই সরাসরি ধরনের। কিন্তু এর মধ্যেও কাব্যের ছড়াছড়ি। রাজনৈতিক আখ্যান হিসেবে 'কমিউনিস্ট পরিবার' গল্পের পাশাপাশি 'পরিচয়' পাঠকপাঠিকাকে চমকে দেবে। একজন রাজনৈতিক বন্দীর কয়েক পৃষ্ঠার কাহিনী আমাদের ছোট গল্পের সাহিত্যে একটা অসাধারণ সংযোজন। ট্রেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে বর্ণনার গতি।

সব মিলিয়ে বলব, 'কমিউনিস্ট পরিবার ও অন্যান্য গল্প' বইটিতে এমনি একাধিক চমক রয়েছে।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদপট পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের যুগদর্পণ।

জামিল শরাফী

উপন্যাস

শুকনো ফুল। পুরুষোত্তম যশোবন্ত দেশপাণ্ডে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, ১৯৭৮; দাম ৪.৭৫ টাকা

হরিভাউ আপটের জমজমাট ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের যুগ শেষ হবার পর মারাঠি সাহিত্য ধীরে ধীরে রোমান্টিসিজমের দিকে ঝুঁকছিল। এই পরিবর্তনের পথিকৃৎ হিসেবে পুরুষোত্তম দেশপাণ্ডের বিশেষ অবদান আছে। অবশ্য এই ধারার হাল্কা প্রেমের গল্প সুপাঠ্য ও জমাট করতে যে বুনিয়াদ বা পালিশ আবশ্যক হয়, দেশপাণ্ডে সেগুলি দখল করে উঠতে পারেন নি। সেই কারণেই তিনি কোনো দিন ফড়কে বা খাণ্ডেকর প্রভৃতি লেখকদের মতন দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারলেন না। 'শুকনো ফুল' উপন্যাসে লেখকের মূল দুর্বলতা স্পষ্টই ধরা পড়ে। এই উপন্যাসের গল্প কিঞ্চিৎ অবাস্তব ও বিশৃঙ্খল। চরিত্রগুলি রং চড়ানো কিন্তু সূক্ষ্মতার অভাবে ভালো নাটকীয় পরিস্থিতিগুলি বারবার কৃত্রিম ঠেকে। নায়ক-নায়িকাদের সমস্যাতে অভিভূত হওয়া তো দূরের কথা, পাঠক মাঝে মাঝেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

আপটে, দেশপাণ্ডে কিংবা তাঁদের সমকালীন মারাঠি লেখকদের মস্ত বড় গুণ ছিল কথ্যভাষাতে স্বাচ্ছন্দ্য। তাদের যুক্তি যতই ঘোরালো প্যাঁচালো হোক না কেন তা তুলে ধরতে তাদের ভাষায় কখনই টান পড়তো না। দুঃখের কথা, ভাষার এই লালিত্য অনুবাদে সর্বতোভাবে লুপ্ত হয়েছে।

তা সত্ত্বেও আমি বলবো যে বাঙালি পাঠকের কাছে এই ধরনের ভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য তুলে ধরার একটা বিশেষ মূল্য আছে। দেশপাণ্ডে শরৎচন্দ্রের সমকালীন সাহিত্যিক। শরৎচন্দ্রের বাংলা সমাজচিত্রের সঙ্গে

দেশপাণ্ডে-অঙ্কিত—যদি-বা অপটু—মারাঠি সমাজচিত্রের পার্থক্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। 'শুকনো ফুল'-এর নায়িকা উচ্চবর্ণের বিধবা। বৈধব্যের পরে পরিবারের সম্মতি নিয়ে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে সে একা বোম্বাই যায়। তার পুনর্বিবাহের প্রস্তাবে পারিবারিক বা সামাজিক কোনো ধরনের আপত্তির লক্ষণ নেই। তাছাড়া আরেকজন সন্দেহজনক চরিত্রের যুবকের সাথে নায়িকা সহজভাবে মেলামেশা করে এইটাও কারো চোখে বিসদৃশ ঠেকে নি।

লক্ষ্য করবার বিষয়, ঔপন্যাসিক শুধু ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী রূপায়িত করতে চেয়েছেন, নারীমুক্তির প্রশ্ন তাঁর লক্ষ্য নয়। নায়িকাকে তিনি বিদ্রোহী হিসাবে দেখাতে চান নি, চেয়েছেন মননশীল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে। এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে কয়েকটি নারীচরিত্রের তুলনা করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদেরও কয়েকজন আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করছে, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থার সামগ্রিক চাপে তারা নিষ্পেষ্ট, পরাভূত।

নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

Calcutta in Urban History, Pradip Sinha, Firma KLM Private Ltd., Rs. 65·00

শ্রীযুক্ত প্রদীপ সিংহর 'ক্যালকাটা ইন আরবান হিস্ট্রি'র প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই বলতে হবে। গবেষণার তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে দেশ-কাল-চেতনার, পদ্ধতিগত জিজ্ঞাসার সচেতনতা মিলে ব্যতিক্রম গ্রন্থ প্রদীপ সিংহ লিখেছেন—এ গ্রন্থ একই সঙ্গে আধুনিক বিশ্লেষণ ও আকর গ্রন্থ। গ্রন্থের অনেক সিদ্ধান্তের সমর্থনের জন্য আকর রচনাটি তিনি পরিশিষ্টে যোগ করেন—মূল পাঁচটি অধ্যায়ের পর আঠারোটি পরিশিষ্ট অংশ—তারপর আবার দুটি অধ্যায়। অর্থাৎ আঠারোটি পরিশিষ্ট—যা আসলে আকর-রচনার সংকলন—বইটির উপসংহার। উপসংহারের পর আরও দুটি সংযোজন—পোস্টস্ক্রিপটস। অর্থাৎ পরিশিষ্ট বইটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—ঠিক প্রচলিত অর্থে পরিশিষ্ট নয়। এ পরিকল্পনা তাৎপর্যপূর্ণ—ইতিহাসের অতীত-বর্তমান মিলিয়ে বোধের দৃষ্টান্ত। মূল রচনার অনেকখানিই স্পষ্ট হয়ে আকর অংশগুলি পড়লে।

অনেকদিন আগে নির্মলকুমার বসু কলকাতার ওপর একটি প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন—'ক্যালকাটা : এ প্রিম্যাচিওর মেট্রোপলিস'। সেই প্রবন্ধটিতে তিনি মন্তব্য করেন, 'দি মডর্ন মেট্রোপলিস' নামক প্রবন্ধে হান্‌স্‌ ব্লুমেনফেল্ড যে গ্রাম থেকে শহরে জনপরিযাণের কারণ স্বরূপ শ্রমের সমবায় ও বিশেষীকরণের দ্বৈত প্রবণতাকে দেখেন, কলকাতার ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। তাঁর কাছে মূল কারণ মনে হয়েছে, ম্যালেরিয়া। নির্মলকুমারের সচেতনতা লক্ষণীয়, আবার ঔপনিবেশিক পট সম্পর্কে নীরবতাও চিন্তনীয় : ম্যালেরিয়া নয়, কলকাতার ঔপনিবেশিক বিকাশের কথা 'হিন্দু সমাজের গড়নে'র লেখকের চোখ এড়িয়ে যায়—সেখানে প্রদীপ সিংহের, ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্পর্কে চেতনা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঔপনিবেশিক পটচেতনাই তাঁকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে কলকাতার সংকট অনেকটা অনন্য, তার কারণ, ঐতিহাসিক বিকাশের একটি স্তরে ভারতবর্ষের নাগরিক ইতিহাসের প্রবণতা থেকে কলকাতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কলকাতার ঐতিহাসিক পট হিসাবে ঔপনিবেশিক এশীয় ভারতীয় ও আঞ্চলিক সব স্তরকেই দেখেন। জটিল তাঁর বিশ্লেষণের সবটা জানতে হলে বইটিই পড়তে হয়—আমরা কেবল তার কয়েকটি সিদ্ধান্তের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের বিশ্বজনীন বাজার-জালের সদর্থক ও নঞর্থক দু-দিকই কলকাতার নাগরিক বিকাশে ছিল। কয়েক শতাব্দী ধরেই ভারতবর্ষে উপকূলবর্তী বন্দর নগর ও বিশ্বজনীন বাজার শহর ছিল (টাউন অর্থে নগর শহর দুইই ব্যবহার করছি, একটু শিথিল ভাবে)। নাগরিক বা পৌর অর্থাৎ আরবান ঐতিহ্যে এ ধরনের নগরের নানাধর্মিতাই দুর্বলতাই—কলকাতায় আঠারো শতকের শেষে এই দুর্বলতা কেটে, সেই কেন্দ্রায়ন এল, যাতে বাজার এল পৌর অঞ্চলের বড় অংশের নাভিবিন্দুতে। দ্রুতবিকাশের মধ্য দিয়ে নগরের উত্তরাঞ্চলের রূপান্তর ঘটে, বাজারের বেগ কম্প্রাডর অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই কম্প্রাডররা, অর্থাৎ দেওয়ান ও বেনিয়ানরা মধ্যস্থদের ওপর স্তরের ব্যক্তি, বাজার-শহর নির্মাণ করে, এই বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। বাজার ও বস্তী নতুন সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হতে থাকে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পর্যায়ে কম্প্রাডররা, জমিদার রাজারা তাদের রাজ্যে যে ভূমিকা পালন করত, সেই ভূমিকাই পালন করল। স্থানীয় সমাজের চূড়ায় বেনিয়ানরা নিজেদের পৌরাণিক রাজাই ভাবত। কম্প্রাডর হস্তক্ষেপে জাতিবর্ণ-ভিত্তিক মধ্য-আঠার শতকীয় কলকাতার ভৌত পরিবেশ

পালটাতে থাকে। কম্প্রাডর জমি কিনত, ভাড়া দিত, খাজনা নিত। বিরাট আকারে পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ করত। কম্প্রাডর সিনক্রিটিজম, পরম্পরাগত জমিদারদের থেকে আরও গভীরে শিকড় ছড়িয়েছিল। বাজারের অপেক্ষাকৃত তরল অবস্থা থেকে নাগরিক সমাজের বিকাশে কম্প্রাডররা প্রধান সামাজিক ভূমিকা পালন করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কলকাতার বড় বড বাড়িগুলির করণকৌশলে যে হিন্দু, মুসলমান ও বৃটিশ প্রভাব একই সঙ্গে দেখা যায়, তাতে এই কম্প্রাডর সমন্বয় লক্ষণীয়। মিশেলটা নিশ্চয়ই আপতিক ছিল। কম্প্রাডর-রাজাদের হাতে নগরের যে চিত্রকল্প রচিত হল, তা নদীসংলগ্ন গ্রাম থেকে বেশি দূরে নয়। বিভিন্ন সামাজিক দলের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা এই চিত্রকল্পকে পরিষ্কার চিত্র করে তুলল। আরো বস্তুগত স্তর ইয়োরোপীয় শহর থেকে ভৌত পরিবেশে, ভারতীয় শহর ক্রমশ পৃথক হয়ে উঠতে লাগল। বাজার হয়ে উঠল এ নগরেব কেন্দ্রভূমি। মিশ্রিত বিপুল জনসমাগম এখানে: ইয়োরোপীয় কলকাতার প্রবণতা অন্যদিকে আদান-প্রদানরত জনগণের সংখ্যা অর্থনৈতিক সংগঠনে কমল বাজারের সঙ্গে, ভারতীয় শহব কলকাতায় বস্তী, নাগরিক নামধর্মিতাব সৃষ্টি কবেছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তবে। বস্তুত এই কম্প্রাডর বিকাশেই বেনিয়ান-রাজত্ব গড়ে ওঠে: প্রদীপ সিংহ অবশ্য সতর্ক করে দেন বেনিয়ান ও দেওয়ান প্রায় এক-অর্থে আঠারো শতকের কলকাতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। বিচাব ও রাজস্ব বিভাগের মধ্যস্থ দেওয়ানরা বেনিয়ানদের থেকে অনেক কম নাগরিক, আকারে অনেক ছোট ও কম জটিল চারিত্র্যের। বড় বড দেওয়ানদের যুগ বড় বড় বেনিয়ানদের যুগের অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়।

কলকাতার সোস্যাল ইকলজি-র অন্যতম প্রধান উপাদান ধনী কম্প্রাডরদের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা। এই প্রধানত হিন্দু ও বাঙালি পরিবাররা শহরের উত্তরাঞ্চলেই বাস করত। মধ্যবর্তী বা ইন্টারমিডিয়েট অঞ্চলে অর্থাৎ ধর্মতলা স্ট্রীটে এসে এটা অকস্মাৎ থেমে গেল। নানা বৃত্তির মুসলমানেরা বাস করত এখানে। এরই উত্তর-পশ্চিম দিকে নানা ব্যবসায়ীদের বাস—পারসিক, আরব, পার্শী, আর্মেনীয়, ইহুদী, গ্রীক, গুজরাটি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদীপ সিংহ এদের—ইউরেশীয়দের সম্পর্কে চমৎকর আলোচনা করেন কলকাতার আঠারো-উনিশের শতকের জাতি ও বৃত্তির বিশ্লেষণে। ইতিহাস-সচেতন মন্তব্য করেন, নিখিল-ভারতীয় বাজার

অঞ্চল থেকে ধীরগতিতে বাঙালিরা যে নিজেদের গুটিয়ে নিল, তা তাদের দুর্বলতারই প্রকাশ, আবার অন্যদিক দিয়ে আরো তাৎপর্যপূর্ণ নাগরিক কাঠামো নির্মাণের দিক থেকে অর্থপূর্ণ। এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি—দ্বান্দ্বিকও বলা চলে, প্রদীপ সিংহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একমুখী সরল ব্যাখ্যায় তিনি সহজ পথে যান না। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল'-এর মতোই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনের দিকটা সর্বদা লক্ষ্য রাখেন, এ গ্রন্থেও আধুনিকতার আপাতজয়ের আড়ালে পরম্পরার, ঐতিহ্যের বনেদই দৃঢ় হয় এখানে—একথা তিনি প্রমাণ করেন। তবে বর্তমান গ্রন্থে আধুনিকতা পদটা তিনি এড়াতে চান—উপনিবেশ, কলোনির অভিজ্ঞতাই তিনি বড় করে দেখেন। প্রথম গ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় গ্রন্থে এই বোধের সঞ্চার, অগ্রগতিই : এখন পরম্পরা-আধুনিকতার ডাইকটমির রচনা করে, অনেকেই সর্বনাশা উপনিবেশিক পর্ব এড়াতে চান। বিদেশীরা হয়তো অস্বস্তিকর ভেবে, তাদের একেলে উদ্ধারকারীর ভূমিকার সঙ্গে খাপ খায় না বলে এটা করেন কিংবা ধারাবাহিক শোষণকে আড়াল করতে চান। কিন্তু ভারতীয়রা করেন কী কারণে—ফ্যাশনেবল হওয়ার জন্য? ইয়োরোপ—আরো বলা ভালো ইংলণ্ড-নির্ভর ভাবনা চিন্তার জন্য? নিজ বাসভূমে পরবাসী পরগাছা অস্তিত্বের জন্য? প্রদীপ সিংহ এ হীনমন্য ভ্রান্তি এড়িয়ে যান, ঔপনিবেশিক ইতিহাসের প্রতি সামগ্রিক মনোযোগে, দ্বান্দ্বিক সচেতনতায়।

এই সচেতনতা থেকেই তিনি কলকাতার বিকাশের কম্প্রাডর বৈশিষ্ট্য সহজেই তুলে ধরতে পারেন, আবার দেখাতে পারেন কম্প্রাডরদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কলকাতার আঠারো-উনিশ শতকের ধনী পরিবারদের সকলকেই কম্প্রাডর শিরোনামের অন্তর্গত করা যায়। বৃটিশদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমেই শেঠ, বসাক, মল্লিক, দেব, ঘোষাল ও ঠাকুররা ধনী, ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী হন। কিন্তু এঁদের মধ্যে তিনটি প্রবণতা লক্ষণীয়। শেঠ, বসাক ও মল্লিকেরা প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগেই অর্থ ও পণ্য ইয়োরোপীয়দের কয়েক শতাব্দী ধরেই সরবরাহ করত। ঠাকুররা ঔপনিবেশিক শাসনের অপেক্ষাকৃত পরিণত স্তরে যথেষ্ট জটিল ইণ্ডো-ইয়োরোপীয় সহযোগিতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। দেব ও ঘোষালরা অবশ্য অর্থ উপায়ের নানাবিধ মাধ্যমকে, প্রথম দিকের ঔপনিবেশিক শাসনের তরল অবস্থায় সর্বাপেক্ষা বেশি কাজে লাগান। ঠাকুরদের মতো এদের কম্প্রাডর

ভূমিকায় পরম্পরাগত বণিক-ব্যবসায়ীর বাণিজ্যিক মাত্রা ছিল না। অবশ্য খাঁটি মধ্যস্থ ছিল দেব ও ঘোষালরা। নবকৃষ্ণ, গোকুল ঘোষাল ও গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ সুবিধাবাদের প্রাথমিক প্রতিনিধি। তাদের ফার্সীভাষায় ও রাজস্ব ব্যবস্থায় জ্ঞান এই সুবিধাবাদের অস্ত্র ছিল। রাজনৈতিক বেনিয়ান নবকৃষ্ণ ভারতীয় রাজা ও কোম্পানির মধ্যে মধ্যস্থ ছিলেন, রাজস্ব কমিটির দেওয়ান হিসাবে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বেপরোয়া তারের খেলার সুবিধাবাদিতা দৃষ্টান্ত। কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র পরবর্তী প্রজন্মের অনুকরণ করার মতো সুযোগ সন্ধানীর মধ্যস্তর দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। গোবিন্দরাম ছিলেন ১৭৩৯ থেকে ১৭৫২-এর মধ্যে কলকাতার ডেপুটি কলেক্টর বা ব্ল্যাক জমিদার। এই কম্প্রাডরদের মধ্যে অনেক পরিবারই কালক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তবে ঠাকুর, দেব, ঘোষাল, সিংহরা উনিশ শতকের শেষ পর্যন্তও তাঁদের অবস্থা বজায় রেখেছিল। অবশ্য ক্রমে ক্রমে শিক্ষা-নির্ভর এলিটরা এদের জায়গায় প্রভাবশালী হয়, কিন্তু বৃহত্তর জনজীবনে কম্প্রাডর-জমিদারদের ভূমিকা অনেকদিনই টিঁকে থাকে।

প্রদীপ সিংহ লিখেছেন, কলকাতা—একটি বাণিজ্যকেন্দ্র, দূরবিস্তৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে অকস্মাৎ পরিণত হয়েছিল। এই রূপান্তরকে কেউ দেখেছেন ঐতিহ্যের বিযুক্তি হিসাবে, কেউ দেখেছেন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা হিসাবে। বিযুক্তি অর্থে রাজনৈতিক পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা অর্থে একই জাতি-ধর্ম বা উপজাতিবর্ণের পরিবারের মধ্যেই অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রতিপত্তি, উত্থান থাকা। সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অন্যতম উপায় ছিল একজাই : কুলীন, ঘটক ইত্যাদির সমাবেশ। এই সমাবেশই নিজেদের সংগঠককে গোষ্ঠীপতি করার চেষ্টা করে। একজাই-এর সম্মেলন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। একজাই-কে কেন্দ্র করে নানা দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। কলকাতায় একজাই-এর উত্থান-পতন নাগরিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ইতিহাস খানিকটা। নাগরিক পরিবেশে অতিরিক্ত বেশি সংখ্যক লোক অত্যন্ত অল্পসময়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়। সামাজিক স্তরায়ন ঠিক করার এই পরম্পরাগত ব্যবস্থা সাধারণ মানুষ সকলেই বুঝত। সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়নের পর সামাজিক শক্তিগঠনে পরিবর্তনের বাস্তবতা একজাই স্বীকার করে নিয়েছিল। অবশ্য এর ফলে সে জটিলতা সৃষ্টি হয় নি, তা নয়। একজাই খুব সীমাবদ্ধ সংখ্যক পরিবারের উচ্চাশা চরিতার্থ করতে পারত : গোষ্ঠীপতি সাধারণত এক পরিবার থেকেই হত। কিন্তু কলকাতায়

সামাজিক নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক—ক্রমশ গোষ্ঠীপতির ক্ষমতা কার্যত কমে, দলপতির ক্ষমতা বাড়তে লাগল। নাগরিক পরিবেশেই সম্ভব হল দলপতির ক্ষমতা-প্রসারণের—বাংলা পত্রিকার পণ্ডিত সম্পাদকও প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন, যিনি আবার গোঁড়া ধর্মীয়সভার সম্পাদকও ছিলেন। এই দলের মধ্যেই আবার প্রতিদ্বন্দ্বী, ক্লিক্ বা উপদল দেখা গেল। ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে অবশ্য পুরনো গোষ্ঠীপতির মতো দলপতির কোনো ক্ষমতাই রইল না—দলাদলি শব্দটির অর্থ-পরিবর্তন হল।

এই অবস্থায় মধ্যে জায়মান বাঙালি বুর্জোয়াসির উদ্যোগী ভাবাদর্শও দেখা গেল। প্রদীপ সিংহর অভিমতে, স্থানীয় বাস্তব অবস্থা থেকে এই আদর্শ অনেক এগিয়ে ছিল। কয়েকজন নতুনের বাণিজ্য উদ্যোগ অবশ্য লক্ষণীয়, কিন্তু খুব দ্রুত তারা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করল, জমির নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল। এ সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে এন্ট্রিপ্রন্যাল উদ্যোগে গেছে—ত্রিশ-চল্লিশের দশকে ইয়ংবেঙ্গলদের একটি শাখার মধ্যে এই উদ্যোগে বিশ্বাস দেখা যায়—অন্তত একজন রামগোপাল ঘোষকেও অন্তত পাওয়া যায়। কলকাতার মধ্যশ্রেণীর প্রত্নপ্রতিমা অবশ্য উদ্যোগী শিল্পপতি নয়, সরকারী আপিস, আইন-ব্যবসা, চিকিৎসা-শিক্ষাজগতের হোয়াইট-কলার দল। একদিকে নির্দিষ্ট আকার শূন্য কলকাতা নগরবাসী, অন্যদিকে পুরনো ধনী পরিবারের মাঝখানে খাঁজ হিসাবে ছিল এই মধ্যশ্রেণী। আয়ের দিক থেকে হয়তো নিম্ন আয়ের এই শ্রেণীর অর্গানিক ঐক্য ও শ্রেণীগত চরিত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল কয়েকদিকে। নিশ্চিত আয় ও চাকুরীর নিরাপত্তায় এই শ্রেণী অন্যদিকে দৃষ্টি দিতে পেরেছিল—রাজনীতিতে, সাহিত্যে, ধর্মে। তারা অবশ্যই পরম্পরাগত বণিক জাতি-বর্ণের সঙ্গে বা প্রদীপ সিংহের ভাষায় 'ম্যাক্রো-ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট'দের সঙ্গে কোনো সংযোগ রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে কলকাতার 'আরবানিটি'র বিকাশে তাদের ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয়—কারণ দল-একজাই, এ সবই এই শ্রেণীর কাছে ছিল অপ্রাসঙ্গিক, অনুপযোগী। তাদের সংগঠনের নীতি আরও জটিল। হয়তো এই নীতিই পুরনোকে না সরিয়ে, তার ওপরই, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইয়ংবেঙ্গল বা জাতিবর্ণ সম্পর্কে নীরবই ছিলেন প্রধানত, জনজীবনে জাতিবর্ণকে স্বীকার না করলেও রামমোহন রায়বাদীরা ব্রাহ্মণবাদকে অস্বীকার করেন নি। মধ্যশ্রেণীর প্রভাব বিস্তারে জনজীবনে জাতিবর্ণের প্রভাব কমলেও, বিবাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে থেকেই যায়। অবশ্য এই শ্রেণীর সাহিত্য, শিক্ষা, বুদ্ধিগত কাজকর্মের আর্থিক বনিয়াদ, জমিদারে

রূপান্তরিত কম্প্রাডর পরিবারের সাহায্যে যেটুকু দৃঢ়তা পেয়েছিল, নচেৎ ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু এ ধরনের সাহায্য জনপ্রতিষ্ঠান ও ঐচ্ছিক অ্যাসো-সিয়েশনের বাঁচার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যখন নিজের শক্তিতে এগিয়েছে, তখনই প্রাথমিক উৎসাহ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গেছে। সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ-এর ইতিহাস একথা প্রমাণ করে। রাজনীতি এর বিকল্প হিসাবে ভাবা হয়। নব্যদলের অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর মূল কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় রাজনীতি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পর্যাবৃত্ত উৎসবের মতো হয়—নতুন মনোভঙ্গী, নতুন রুচি আশ্রয় পেল আড্ডায়। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের বিরাট বিবাহ, পূজা অথবা শ্রাদ্ধের বিপরীত চিত্র এটি। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠিকই—যদিও নাগরিক প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ করা হয়েছিল কমই। শহরের ধনীদের মুখপাত্র বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র পঞ্চাশ-ষাট দশকে একজন সরকারী কেরানীর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। এই সময়ই এ পত্রিকার সব থেকে সুসময়—কিন্তু পত্রিকার পাতা ওল্টালে দেখা যায়, কত কম ছিল বিজ্ঞাপন, কত কম ছিল গ্রাহক—মনে রাখতে হবে প্রায় দু-দশক ধরে শিক্ষিত নাগরিক বাঙালীর প্রধানতম পত্রিকা ছিল এটি। এই বাধার মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালীকে বাগ্মিতা, নাগরিক রুচির চর্চা করতে হয়েছিল। অ্যাংলি-সিজমের, স্বায়ত্তশাসনের, ভারতীয় সমাজে নারীর দুর্দশার ভাবনা এরই অঙ্গ। এই সচেতনতার, চেতনার প্রতিনিধি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এমন কি নাগরিক সমাজেও প্রথমাবধিই যিনি ছিলেন 'ডিসেন্টার', সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী। তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিরোধিতার যেমন সম্মুখীন হয়ে-ছিল, তেমনি সমর্থনও পেয়েছিল অনেক। কিন্তু, এই মানবিকতা নিতান্তই ভাবাবেগ ছিল, কর্মের ভাবাদর্শে পরিণত হয় নি : বিদ্যাসাগরের আন্দোলন তাই সার্থক হয় না, তাঁকে ফিরতে হয় নাগরিক 'সোফিস্টিকেশন' থেকে কর্মাটাড়ের প্রাকৃতিক সারল্যে। অবশ্য বিদ্যাসাগরই প্রমাণ করেন শিক্ষার মূলধনে মানুষের ওপরে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, যেমন নিম্ন জাতিবর্ণের মানুষও পশ্চিমী নাগরিক এলিট হচ্ছে। যদিও কার্যত এই শ্রেণীর দরজা মুক্ত ছিল না, কারণ শিক্ষার দরজায় নিম্নবর্ণরা তখন খুব কমই পৌঁছাত। প্রদীপ সিংহ পুরনো শক্তি ও নতুন শ্রেণীর চিত্র একসঙ্গেই দেখান, কলিকাতা কমলালয় ও অনেক ইয়োরোপীয় পর্যবেক্ষক, মুখার্জীস ম্যাগাজিন ও হিন্দু পেট্রিয়ট থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে। এর মধ্যেই এই দুটি দিক, যার পরিণতি আজকের জগা-কলকাতা—স্পষ্ট হয়।

প্রদীপ সিংহের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি যেমন ভারতীয় ইতিহাসের জাতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অচেতন থাকেন না, তেমনি ঔপনিবেশিক বিকাশে যে এই ভিত্তি শিথিল হয়ে শ্রেণীর ইতিহাসও আরম্ভ হয় তাও দেখেন। আবার এই শ্রেণীর ইতিহাসও যে ঔপনিবেশিক বিকাশে অনেক পঙ্গু, বিকৃত, পরম্পরার সঙ্গে টানাপোড়েনে দ্বিধাগ্রস্ত, সে সম্পর্কেও মনোযোগী থাকেন। এখনো পর্যন্ত এই ধারা চলছে : জাতিবর্ণের স্থাণু ছাড়িয়ে, শ্রেণীর সচলতায় ভারতবর্ষ এখনো পৌছায় নি, অবশ্য কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ এর মধ্যে এই চেতনার বিকাশে হয়তো কিছুটা অগ্রসর : তার কারণ নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ ইত্যাদির ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। আর এই অগ্রসরতার জন্যই হয়তো হরিজন পোড়ানো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি, (যা আসলে জাতিবর্ণের, লুই দুমর্‍াঁ যার হায়ার্কার্কি, শুদ্ধতা, গণতন্ত্র দেখে মুগ্ধ, তারই অন্যমুখ) ইদানীং এখানে নেই। প্রদীপ সিংহর বইটি, আমাদের সামাজিক ইতিহাসের সন্ধিক্ষণকে, তার জটিলতাকে স্পষ্ট করে তোলে, স্বচ্ছ ভাষায়, অযথা আপ্তবাক্য না ছড়িয়ে, তাঁকে অভিনন্দন জানাই : কেবল কলকাতাকে যদি তার পশ্চাৎভূমি ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একটু যুক্ত করে, বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে বোধহয় এই বিকাশের জটটা আরো ধরা যেত। তাঁর গ্রন্থে যেন কলকাতাকে কেমন বিচ্ছিন্ন লাগে, যেমন আমাদের ইতিহাসের বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথ একক কীর্তিতে বিচ্ছিন্ন। অথচ সবটা মিলিয়ে না দেখলে তো এই বিচ্ছিন্নতার তাৎপর্য বোঝা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৬৮-তে অনিল শীলের ও ব্রুমফিল্ড-এর বই প্রকাশিত হবার পর কেম্ব্রিজ ও অস্ট্রেলিয়াকে কেন্দ্র করে ভারত ইতিহাস সম্পর্কে অনেক গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি যে কিছুটা নতুনত্ব, কোনো কোনো দিক সম্পর্কে সচেতনতা এনেছে, তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু অন্য অনেক দিকেই যে অসম্পূর্ণ, রক্ষণশীল, ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন, তাও সত্য। এঁদের পাশে প্রদীপ সিংহ প্রাণের দায়েই অবশ্যপাঠ্য, নতুন প্রাণময়।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকা প্রসঙ্গ

মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ। ভারতী পরিষদ বার্ষিকী ১৩৮৫। সম্পাদক: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। দাম: ৪ টাকা

ভারতী পরিষদ উত্তর কলকাতার একটি পুরনো ও ঐতিহ্যসম্পন্ন 'সাধারণ' গ্রন্থাগার। ইদানীং প্রতি বছর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পরিষদ এক-একটি মূল্যবান সংকলন বের করেন। এবারে, অর্থাৎ ৮৯তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলনটির নাম 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ'। বিষয়-নির্বাচন, লেখক-নির্বাচন, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদির কারণে পত্রিকাটি হাতে নিয়েই বিস্মিত হতে হয়।

সম্পাদনা সত্যি উঁচু মানের। আগাগোড়া সম্পাদকের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ: সংশয়, জিজ্ঞাসা, নিরীক্ষা' প্রবন্ধে সম্পাদক এই সংকলনটির উদ্দেশ্য বিশদ করেছেন। 'নাটক নয়, থিয়েটার। গানের মতোই, নাটক যে পড়ার নয়, করার জিনিস—এ বোধটা আমাদের এখনো তেমন পাকা হয় নি। তাই 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ' বিষয়টি বুঝতে ও বোঝাতে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছে। আলোচনাগুলি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: এক ॥ রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিনয় ও প্রযোজনা / দুই ॥ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটক / তিন ॥ গ্রুপ থিয়েটার ও অন্যান্য নাট্য দলের প্রযোজনা / এর সঙ্গে একটি আলোচনাচক্র: রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ করার সমস্যা। প্রাসঙ্গিক বোধে যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক একটি প্রবন্ধও দেওয়া হল। অবশেষে তথ্যপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি।' বিষয়ভাগেই স্পষ্ট রবীন্দ্রানুরাগী ও বাংলা নাটকের উৎসাহী পাঠকের কাছে গ্রন্থটি কতখানি মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। সাফল্য বিষয়ে সম্পাদক খুবই বিনয়ী, কিন্তু যে বিপুল পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের চিহ্ন রয়েছে তথ্যসংগ্রহে ও বিশ্লেষণে তাতে সকলের কাছে অকুণ্ঠ সাধুবাদই তাঁর প্রাপ্য।

হিরণকুমার সান্যালের 'পরিচয়' থেকে পুনর্মুদ্রিত লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: প্রযোজক ও অভিনেতা' খুবই ভালো নির্বাচন। আরেকবার মনে করিয়ে দেয় এই জাতশৌখিন লেখকের হালকা-চালে লেখার মাহাত্ম্য। হরীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথ: স্মৃতিচারণ' অসাধারণ উপভোগ্য রচনা—পুরনো কলকাতার ছবিটা আরো ফুটে উঠেছে লেখকের কলকাত্তাই মুখের কথাকে অনুলিখন করার ফলে।

বেশ কটি প্রবন্ধ আছে ঠাকুরবাড়ির অভিনয়, রবীন্দ্রনাথের অভিনয়,

ও প্রযোজনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। স্বভাবতই ঠাকুরবাড়ির অভিনয় ও সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়ের কথা বারবার উঠেছে, তুলনামূলকভাবেও।

'রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ করার সমস্যা' এই গ্রন্থের একটা প্রধান থিম। এই বিষয় নিয়ে কয়েকজন নাট্য-সমালোচক, প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা নিজেদের মতামত লিখে পাঠিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের মতামতের মধ্যে কোনো ঐক্যই নেই। কিরণময় রাহা বা কুমার রায় সত্যিই সমস্যাটাকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন, ঐতিহাসিক জ্ঞান ও আত্মসমালোচনার বিনয় প্রকাশ করেছেন—তার পাশাপাশি শেখর চট্টোপাধ্যায় বা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্বিনীত, তাঁদের সিদ্ধান্তে শিক্ষার কোনো ছাপ আছে বলে মনে হয় না। কিরণবাবু অস্বীকার করছেন এই চালু বক্তব্য যে, রবীন্দ্রনাটক মঞ্চাভিনয়ের উপযোগী নয়—তাঁর মতে অক্ষমতা আমাদের, প্রযোজকদের। নইলে বহুরূপীর 'রক্তকরবী' অভিনয়ের মতো ঘটনা ঘটবে কেন? কিরণবাবুর এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমরা কি আরো যোগ করতে পারি না বহুরূপীর 'ডাকঘর' বা 'রাজা'-কে, এমনকি লিটল থিয়েটারের 'অচলায়তন'-কে? কুমার রায়-ও রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়-অসাফল্যের কারণ নির্দেশ করেন আমাদের বোধের অভাবে, অনুশীলনের অভাবে। তিনি মনে করেন "রবীন্দ্রনাটককে আজকের জীবনচর্যার সঙ্গে মিলিয়ে" প্রযোজনা করতে হবে। এর পাশে শেখর চট্টোপাধ্যায় শেষ করেন তাঁর বক্তব্য এই বলে যে "রবীন্দ্রনাথের নাটক relevant কিন্তু living নয়।···সাধারণ মানুষের জন্য তিনি লিখতে জানতেন না—বা চাইতেন না।...তাই বর্তমান তাঁর কাছে বা তিনি বর্তমানের কাছে মূল্যহীন।" সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও কম নির্বোধ নয়। 'অচলায়তন'-এর দাদাঠাকুরের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, কৃষক-বিদ্রোহের নেতা এ-ভাষায় কথা বলেন না, 'রক্তকরবী'র অধ্যাপকের মতো কোনো অধ্যাপক কথা বলেন না, ইত্যাদি। বোঝা যায়, বাস্তবতার ধারণা এখানে কতো যান্ত্রিক এবং গোঁড়া।

নির্মল ঘোষের 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি থেকে জানা যায় গণনাট্য আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাটক কিভাবে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, রবীন্দ্রনাটককে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে গণ-নাট্যের ভূমিকা কতটুকু। এই প্রবন্ধেই আমরা জানতে পারি ১৯৪৯ সালেই গণনাট্য-শিল্পীরা 'রক্তকরবী' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

সংকলনের শেষাংশে ৪টি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যপঞ্জি আছে: ১. রবীন্দ্রনাথ

অভিনীত ও প্রযোজিত নাটকের তালিকা, ২. সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের তালিকা (প্রথম অভিনয়, স্থান ও অভিনেতাদের নাম সহ), ৩. বিভিন্ন নাট্যদলের রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের তালিকা, ৪. যাত্রায় রবীন্দ্র প্রযোজনার তালিকা। খুব মস্ত কাজ।

স্মৃতিচারণা ও মেজাজী রচনা দিয়ে যে সংকলনের শুরু, তার শেষ এ-রকম মূল্যবান তথ্য সমাবেশে—মাঝখানের প্রত্যেকটি রচনাই সুচিন্তিত ও সুলিখিত। পরিকল্পনা ও সম্পাদনার দিক থেকে এরকম প্রকাশনা সত্যি খুবই বিরল ঘটনা। কয়েকটি দুর্লভ ও প্রাসঙ্গিক ছবিও ছাপা হয়েছে গ্রন্থের শেষে।

পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা। ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা। পৌষ ১৩৮৪ / ডিসেম্বর ১৯৭৭ ও আষাঢ় ১৩৮৪ / জুন ১৯৭৮। সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

সম্পাদক-প্রেরিত পত্রিকার এই দুই সংখ্যা 'পরিচয়'-এর দপ্তরে পৌঁছেছে। এই মোটাসোটা সুমুদ্রিত সংখ্যা দুটি দেখলে খুব ঈর্ষা লাগে, একটু বিষণ্ণও হই। কারণ, এই বঙ্গে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'-র মতো ঐতিহ্যসম্পন্ন পত্রিকাটিও এখন যখন অনিয়মিত ও অকিঞ্চিৎকর, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' প্রায় অবলুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আর নাই তুললাম, বাংলা ভাষায় অ্যাকাডেমিক সিরিয়স প্রবন্ধনিবন্ধ প্রকাশের জায়গা প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না—তখন 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা'-র নিছক বিষয়বৈচিত্র্য ও নিষ্ঠা আমাদের সত্যিই মনোযোগ কাড়ে। সাধারণত বাঙলাদেশের গ্রন্থে অজস্র বানান ভুল দেখতে আমরা অভ্যস্ত, এই পত্রিকা সেই ত্রুটি থেকেও অনেকটাই মুক্ত।

কয়েকটি প্রবন্ধের নাম করা যেতে পারে। পৌষ-সংখ্যায় : আহমদ শরীফ-এর 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ', ওয়াকিল আহমদ-এর 'বাংলার বিদ্বৎ সমাজ : আঞ্জমন ইসলামী', সিরাজুল ইসলাম-এর 'গ্রাম বাংলা : অপরিবর্তনের ঐতিহ্য', এম. এ. মান্নান-এর 'বাংলাদেশের চা-শিল্পে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক'। আষাঢ় সংখ্যায় : তাজুল ইসলাম হাশমী-র 'বাংলার কৃষক ও রাজনীতি : ১৮৮৫-১৯২৩', কে. এম. মোহসীন-এর 'বাংলাদেশের স্থানীয় ইতিহাস', মাহমুদ-উল-আমীন প্রমুখের 'এনোফিলিস...মশার জীবনাচরণ এবং বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক' ইত্যাদি।

শুক্লপক্ষ। ৪র্থ সংকলন, জুলিয়াস ফুচিক সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। সম্পাদক: ফণিভূষণ পাত্র। ময়না, মেদিনীপুর। দাম: ৩ টাকা

ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে চেক্ সাহিত্যিক ও কমিউনিস্ট নেতা জুলিয়াস ফুচিকের আত্মত্যাগ ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাঁর জেলের রচনা ও চিঠি 'ফাঁসীর মঞ্চ থেকে' দেশে দেশে সংগ্রামী মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছে দীর্ঘ দিন। আজকের নতুন প্রজন্মের তরুণদের কাছে এই নাম, এই ইতিহাস হয়তো ততটা স্পষ্ট নয়। তাকে আজকের তরুণ সমাজের কাছে পৌছে দেবার জন্যই—সম্পাদকের ভাষায় "তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করার জন্য"—সুদূর মফঃস্বল থেকে এই প্রকাশনা শুধু অভিনব নয়, কালোপযোগীও। উপলক্ষটা ফুচিকের ৭৬তম জন্মদিন।

ফুচিককে অবলম্বন করে প্রবন্ধ-কবিতা যেমন আছে—তেমনি তাঁর কিছু কিছু লেখার পুনর্মুদ্রণও করা হয়েছে। লেখকের তালিকায় কলকাতার নামী লেখকেরা আছেন, স্থানীয় লেখকরাও আছেন।

সব মিলিয়ে সংকলনটি সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। শুধু মুদ্রণপ্রমাদ একটু বেশি চোখে পড়ে এই যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কবি অরুণ মিত্র ও রবীন্দ্র পুরস্কার

তিনি তখন এলাহাবাদে, অধ্যাপনায়—অনেকদিনের কথা—স্নেহ ও আলাপ-পরায়ণ, তাঁর সেই ছোট্ট ছবির মতো বাড়িটি থেকে (আমার তাই মনে আছে) এগিয়ে দিতে দিতে কবিতার কথায় এসে বলেন: এই ছোট্ট গাছটি যেমন (রাস্তার ধারের একটা হেলানো শাখার), তার ছায়ার মধ্য দিয়ে যাবার আগের ও পরের একই মানুষ কি একটু বদলে যায় না?

কবি অরুণ মিত্র দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি আমাদের কাব্যের অভিজ্ঞতা!

তুলনাহীন তাঁর চলা। এতদিনে পুরস্কার তাঁর নাগাল পেল।

ঠিক এই কথাটাই 'নাগাল'—আমি বলতে চাই। কবি অরুণ মিত্র ও সাহিত্য পুরস্কার—এই দুয়ের সম্বন্ধপাতে এর থেকে ভালোমতো কিছু এক্ষুণি আমার মনে পড়ছে না।

আমাদের এই কবির মুখ সেই কবে থেকেই 'পুষ্টির অপরিমেয় উৎসের দিকে ঘোরানো' ('অপরিমাণে', 'উৎসের দিকে'), বলেই না কত সহজে তিনি উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন অতিরিক্ত অনেক কিছু পাওয়া ও না-পাওয়াকে। যেমন, এখনকার চলতি রেওয়াজ সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। তবু, এ বছর রাজ্য সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার তাঁকে আর এড়িয়ে থাকতে দেয় নি। তো ভালোই হয়েছে।

ভালো? অরুণ মিত্রের দিক থেকে? তবু, পুরস্কার, এই রসে-টসটসে পরিণত প্রবীণ অথচ প্রত্যেকবারই কী আশ্চর্য তরতাজা প্রায় সদ্য-নতুন হয়ে-ওঠা কবির, এই সত্যি বড় কবির, কতটুকু ক্ষতিই বা করতে পারে, কতটা বৃদ্ধি?

অবশ্য তাঁর কাছে তা হয়তো এখন কিঞ্চিৎ মূল্যবান (আর্থিক মূল্যে), আর আমাদের কাছে তো এই ঘটনাটিই মূল্যবান (তাঁর বাহ্যিক সম্মাননার মূল্যে, যা সরকারি ও যা বিশেষ দরকারিও হয়ে পড়েছিল বৈকি—,এই উপলক্ষে তাঁর কতগুলি প্রকাশ্য সম্বর্ধনার আয়োজন হল, তাছাড়া সংবাদপত্র, সাক্ষাৎকার, দূরদর্শন ও আকাশবাণীর আতিথেয়তা)।

অবশ্য এর অভাবে এতদিন তাঁর যে কিছু আটকাচ্ছিল তাও নয়। তবু পুরস্কার এই অসামান্য কবির প্রতি, যে দার্শনিক-মানবিক প্রত্যয়ে তাঁর কবিতা আশার দিকে উজ্জীবিত—আমাদের কৃতজ্ঞতার সাক্ষ্য কিছুটা রাখতে পারল হয়তো, অতি-বিলম্বে হলেও।

সেই 'প্রান্তরেখা' থেকে অরুণ মিত্র আজ এসে পৌছন 'শুধু রাতের শব্দ নয়'-তে। মাঝখানে থাকে 'ঘনিষ্ঠ তাপ' ও 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'। তাঁর পারাপারের নৌকাটিতে ফসলের খুব ভার কি ? কিন্তু সব ফসলই এত সুবর্ণ পাকা। আমাদের তা মনের অন্ন, স্বাভাবিক, অনিবার্য বাড়তির দিকে পুষ্টি : "সেই যৌতুক আমরা চাই / অন্ধ জীবনের কাছে···" ('ছয় ঋতু সঞ্চয় করি', 'উৎসের দিকে')।

আর তাঁর হাত থেকে এই যৌতুক, জীবনেরই যৌতুক, কিন্তু তাঁরই হাত-ফিরতি হয়ে তা নিতে, তাঁর কাছে আমাদের যাওয়াটাও হয় বড় কিছু আবিষ্কারের মতোই। মনে হয় বুঝি বেশ সহজ; কিন্তু অরুণ মিত্রের কবিতা আপাত-সহজের আড়ালে আমাদের এক কঠিন বিপন্ন সময়ের আর তা থেকে উৎরে জীবনের স্বতোৎসারিত এক নির্ঝরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যে-পাথরে এই নির্ঝরের মুখ, সে কিন্তু শক্ত নিখাদ পাথরই। এক প্রচ্ছন্ন অথচ খর দ্যুতিতে তাঁর কবিতা অনেক কিছুই তখন আমাদের দেখে জেনে নিতে বলে। আর এই কবি এক প্রগাঢ় মমতায় আমাদের সেই ধরা-ছোঁয়ার জগতটিতে পৌছে দিয়ে যান।

কবি অরুণ মিত্রের জগৎ এই ধরা-ছোঁয়ার জগতই। আধুনিক বাংলা কবিতায়, এইখানে তাঁর জুড়ি নেই। এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, বিশেষ করে স্পর্শগ্রাহ্যতা। মাপা-বাঁধা ছন্দের বাঁধনটি শেষ পর্যন্ত তিনি খুলে দেন, চলে আসেন গদ্যছন্দের আটপৌরে, ঘরোয়া এক বিন্যাসে, অন্তরঙ্গ কথকতার মধ্য দিয়ে তিনি কবিতার এক আশ্চর্য রূপবদল ঘটিয়ে দেন, "মুখের ভাষা যে ফুলের মতো জীবন্ত হতে পারে / তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয়।"

অথচ এই বিশ্বাস তাঁর ও সেই সঙ্গে আমাদের, অনেক ভাঙচুরের পথ বেয়ে আসে। সেই যে গোড়ার দিকে তিনি দেখিয়ে দেন "প্রাচীর পত্রে পড়োনি ইস্তাহার, লাল অক্ষরে আগুনের হল্কায় ঝলসাবে কাল জানো", কি 'ভূমিকা'য় লেখেন,

"তীক্ষ্ণ বাঁশীতে সুর কেটে গেছে সকাল বেলা—
রোদের ফালিতে হাড়ের গুঁড়ো…"

শোনেন ও আমাদের শোনান 'কসাকের ডাক', কিন্তু তার কিছু পরেই 'শিশুর কান্নার ঘর', যেখানে, "এ কী ভাষা / মৃতবৎসা পৃথিবীতে / এ কী আশা / শিশুর কান্নার ঘরে.' কিংবা "পাঁচিলে গুলির দাগ স্ফীত হয় / জলে ভিজে, / দৈত্যের প্রকাণ্ড লুব্ধ মুঠির আকারে" ('বর্ধমান'), অথবা "পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বেঁচে…('এ জ্বালা কখন জুড়োবে'), "প্রতিমাগুলো বয়ে এনেছিলাম / মাথা ভরে কাঁধ ভরে এত উঁচুতে / তারা এখন ভাঙল"…, আমরা এসবও দেখতে পাই।

তবু অরুণ মিত্র আমদের এর পরও দেখাবেন যে জগৎ, যেখানে "আমি এক পলকেই দেখে নিই / ভাঙাচোরা সমস্ত ঘর / ভবসার সমস্ত দুর্গ / কোনো বিদ্রূপের এত জোর নেই তাদের কখনো ধূলিসাৎ করে' ('আমার কাছে বদলে যায়')…, আমাদের আশ্বস্ত করে বলবেন "আমি হাটে হাটে ভেসে এসেছি / মাটিতে পা গেড়ে দিয়েছি", মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করবেন "এই তো নিশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি মানুষ" ('আর এক আরম্ভের জন্য'), তখন আমরা বুঝে যাই যে এই কবি আমাদের 'দোসর' মেনেছেন, সঙ্গী করে নিয়ে যেতে এসেছেন তাঁর সেই ধরা-ছোঁয়ার আর-এক জগতে।

ধরা-ছোঁয়ার জগতই তো, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যেমন করে তিনিই একমাত্র বলতে পারেন "প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে, দেখার মতো করে বলো। আমার স্নায়ুতন্তুধমনী নিয়ে আমি এক অভিন্ন সমতলে আছি। অক্ষরগুলো কাগজে বন্ধ করে এসে তুমি যদি গোধূলিতে নিজেকে আচ্ছন্ন করো এবং অন্তত একটা কুড়োনো পাপড়িও আমার ত্বকমুখের অন্ধকারে রাখো তাহলে আমি তোমাকে ঠিক শুনতে পাব।…দু-একটা ঘাসের ডগা কখনো-সখনো গভীর থেকে এক অপূর্ব সম্ভাবনাকে ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যে নিয়ে আসে। আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি

রয়েছে। যদি ছাখো বহুতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো, আমরা অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরা-উপশিরা বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাব।"...('প্রাজ্ঞের মতো নয়', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')।

এ অসাধারণ কবিতার প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলাম। কারণ অরুণবাবুর কবিতা এখন আমাদেব যে-জগতে এনে ফেলেছে, সেখানে আর সবই বাহুল্য, শুধু এই তীব্র মুগ্ধতা, "মুগ্ধতার একটা চেহারা বোধহয় কোনো এক মুহূর্তে আমার নজরে এসেছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। তোমার জলছোঁয়া হাত কি তাকে নতুন করে গড়ে দিতে পারবে?" ('বৃষ্টিব দেশ থেকে এলে')। বলছেন, আমরা প্রায় স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে এখন কবিকে না শুনে পাবি না :

"...সময়ের গম্বুজের নিচে আমি দাঁড়িয়ে।
পাথরগুলো খুঁটিয়ে দেখি
যদি কোনো ঝর্ণার ছোপ কোথাও লেগে থাকে,
তাদের উপর বাব বার কান রাখি
যদি তারা গুঞ্জন করে।..." ('উন্মুখ', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')

আমরা হতবাক হয়ে যাই কবির এমন করে সব বলতে থাকায় : 'এই কথার পর ঘুণধরা হুড়কোটা নামিয়ে আমবা বেরোই। ...এক এক জায়গায় রোদ জমে জমে যেন স্ফটিক হয়েছে। তা দিয়ে কতগুলো গৌরবের স্তম্ভ তোলা যেতে পারে ভাবি। অনেক চিৎকারের এক বিশাল প্রপাতের সামনে গিয়ে পড়ি।...শহরের মাঝখানে দেখি রাবণের চিতার মতো আকাশ রাঙা। আমাদের সব উত্তাপ বুঝি ঐ কেন্দ্রে জমা থাকে। অথচ এক কোণে, অনুমান করি, কোনো গাছ মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে নগ্ন হয়ে আছে, তাকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু কাছাকাছি অনবরত মগ্ন গুঞ্জন। এবং মনে হয় সূর্যের ভিতরে মধু জমছে।..." ('ঝাঁপিটা কাল খোলা হবে', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')।

এই বইয়েরই আর-এক অংশ 'বেনামা সময়ে' আমরা তাঁর কাছ থেকে 'উপরে-ওঠা' 'পুতুল নাচ' কি 'মুখোশ খুলে রেখেছি'র মতো ("আমি মুখোশ খুলে রেখেছি / এখন আমি তোমাদের মতো নই") তিক্ত, তির্যক কিছু কবিতা পাই বটে, কিন্তু 'ঘরের পৃথিবীতে' এসে আমরা আবার ফিরে পাই তাঁর সেই প্রশান্তি, বুলার দুটো বছরকে ঘিরে, "ধরুক বদলে বদলে নতুন সুর।

কথার রাজ্যে টলমল করতে করতে যে পা দিয়েছিল, সে যেন এক জাদুকরী।"

এই অরুণ মিত্র। তাঁর চতুর্থ ও সাম্প্রতিকতম প্রকাশ 'রাতের শব্দ নয়' বইটি কবিকে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মাননার উপলক্ষ হয়েছে। এই বইতেও তাঁর নানান মেজাজের কবিতা, যেমন, 'স্বস্তির কথা কে বলে' ("আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে? ভাখো না আমার হাসিমুখ, বুলা হঠাৎ হঠাৎ কি যন্ত্রণার মূর্তি হয়।"), যেমন, 'দেয়ালের বাইরে' ("আমি আঙুল মুঠো করে ইঁটের উপর মারছি আর আমার বুকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে") যেমন, 'সাইকেলে ভর করে' ("যতবার সে উচ্চারণ করেছে 'ক্লাউন' ততবার তার চোখমুখ বিরল আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে।")

কিন্তু 'গর্জনের সামনে' কবির সেই চলাটিকেই আমরা আবার দেখতে পাই যেখানে তিনি বলে যাচ্ছেন, "আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূর এসেছি? যতদূরই হোক, ফিরবার ভাবনা আমাদের মাথায় নেই। কিন্তু ঐ তারা এখন কাঁপছে। আমি বুলার হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছি। আমরাও গর্জনের সামনে।"

আর নাম কবিতায় তো আমাদের সেই অভিষিক্ত কবি আবার শিউরে দিয়ে বলে ওঠেন :

"প্রথম সমুদ্র আমার ভোরবেলার।
অন্ধকার তাঁবুটা ভেঙে দিয়ে
আমি তাকিয়েছিলাম যেখানে সূর্য ওঠে,
এক মুঠো ঝিনুকে শুধু রঙ নয়
মাস্তুলের হেলানো ছায়া···
শেষ সমুদ্র সূর্য ডোবার।
আদিগন্ত ঢেউ কি সমস্ত দুঃখকে নাচায়?
·· শুধু কি রাতের শব্দ?
আমি নিশ্চিত শুনি ভোরবেলার যাত্রার আয়োজন
আমার শেষ সমুদ্রে।"

কবি অরুণ মিত্র 'পরিচয়'-এর আপনজন। রবীন্দ্র পুরস্কারে তাঁকে সম্বর্ধিত করেছেন রাজ্য সরকার। আমরা আনন্দিত।

সিদ্ধেশ্বর সেন

জামসেদপুরে রক্ত আর আগুন

এপ্রিল মাসের ১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত জামসেদপুরের ম্যাঙ্গো, সাকচি, দাদশিধ, ধুব, আদিত্যপুর, কদমা প্রভৃতি অঞ্চলে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেল। তারপর সেই দাঙ্গার আগুনে জামসেদপুরের পথে-প্রান্তরে, বস্তি-ব্যারাকে, ভালোবাসার সাজানো সংসারে ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যুর আতঙ্ক।

কিন্তু কেন? কেন স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পরেও ভারতবর্ষের মানুষ—হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান একে অন্যের বুকে ছুরি বসাবে? কেন বর্ণকৌলীন্যে অন্ধ মানুষ অন্ত্যজ জ্ঞানে হরিজন কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারীকে হত্যা করবে কিংবা পুড়িয়ে মারবে? ভারতবর্ষের কোন স্বাধীনতার অন্তঃসার এইসব ঘটনা অথবা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রায় ধারাবাহিক-ভাবে নিত্যদিন দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন না করে কোনো সুস্থ মানুষ কি আজ বসে থাকতে পারে?

না, পারে না। জামসেদপুরের দাঙ্গা, রক্ত আর আগুন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে যা ঘটেছিল বারাণসীতে, ১৯৭৮ সালে সম্বলে এবং ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে যা ঘটে আসছে আলিগড়ে, সেই একই প্যাটার্ন জামসেদপুরেও অনুসৃত। ধর্মের জিগির তুলে মানুষের সহজাত ধর্মচেতনাকে বিভ্রান্তির অন্ধ খাদে টেনে নামিয়ে, তারপর সেই বিভ্রান্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিচার-বুদ্ধি-রহিত মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে শাণিত ছুরি তুলে দিয়ে জান্তব জিঘাংসা চরিতার্থ করার ঘৃণ্য খেলায় শামিল হচ্ছে একদল স্বার্থান্ধ মানুষ। সাম্প্রতিককালের সব দাঙ্গার ইতিবৃত্তই প্রমাণ করছে—এই দাঙ্গাবাজদের একাংশ আজ ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারও বটে।

জামসেদপুরে সংঘটিত দাঙ্গার পশ্চাৎপটে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কালো হাতের কারসাজি যে ক্রিয়াশীল ছিল, এ-কথা সরেজমিনে তদন্তকারী প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিই তাঁদের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন। আর, এই স্বয়ংসেবক-সংঘীরাই যে ভারতরাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জনতা পার্টির অন্যতম অংশীদার প্রাক্তন জনসংঘ পার্টির আধা-সামরিক বাহিনী এবং এরাই যে মতান্ধ উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জন্মদাতা ও তার লালনকর্তা, এই বাস্তব সত্য আমরা কি করে ভুলে থাকতে পারি?

এই জনসংঘীরা চায় ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিকতার আদর্শকে

টলিয়ে দিতে। দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়ার বর্তমান মৃগয়া-ভূমি এই ভারতবর্ষে রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশীদার হয়ে তাই স্বয়ংসেবক সংঘীরা এখন অনেক বেশি সক্রিয়, তাই জনতা সরকার গঠিত হওয়ার পর গত দু-বছরে ভারত জুড়ে একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব, বর্ণ ও জাতি-বিদ্বেষের খড়্গে বলিপ্রদত্ত অসংখ্য হরিজন ও আদিবাসী নর-নারী। জামসেদপুরের মর্মান্তিক ঘটনা এই পরম্পরায়ই সাম্প্রতিক অভিব্যক্তি মাত্র।

কি ঘটেছিল জামসেদপুরে? রামনবমীর মিছিল কোন পথ দিয়ে যাবে তাই নিয়ে মতান্তর। মিছিলের সংগঠক জনসংঘী এম-এল-এ দীননাথ পাণ্ডে দাবি করলেন এবারকার মিছিল চিরাচরিত পথ দিয়ে যাবে না, মিছিলটিকে যেতে দিতে হবে ১৪ নম্বর সড়ক ধরে। এই পথের পাশেই আছে একটি মসজিদ। সুতরাং ডেপুটি কমিশনার ডাঃ এস, কে সিংহ নাকচ করে দিলেন জনসংঘী এম-এল-এ-র দাবি। এর প্রতিবাদে নির্ধারিত দিনে, অর্থাৎ ৬ এপ্রিল, রামনবমীর মিছিল পরিচালনা করতে অস্বীকার করলেন এর সংগঠকরা। বিভিন্ন ক্লাব ও আখড়ার হিন্দু সভ্যদের ধর্মীয় মনোভাবকে উস্কে দিয়ে একটা তেন্সনেস্ত করার দিকেই জনসংঘীরা অতঃপর এগিয়ে গেলেন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল। আর সেই দাহ্য অবস্থাকে সামাল দিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রূপে স্থানীয় প্রশাসক গ্রেপ্তার করলেন কিছু পরিচিত দুষ্কৃতকারীকে। এই গ্রেপ্তারের তালিকায় ছিল জনসংঘী এম-এল-এ দীননাথ পাণ্ডের ঘনিষ্ঠ সাকরেদ ত্রিবেদী নামে জনসংঘের জনৈক কর্মী।

এরপর জনসংঘ ও আর. এস. এস. কর্মীরা প্রকাশ্যে পথে নেমে এলেন। ইস্তাহার ছড়িয়ে মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে আহ্বান জানালেন তারা জামসেদপুরের হিন্দুদের কাছে। এই পরিস্থিতিতে ডেপুটি কমিশনার জামসেদপুরের নাগরিকদের একটি সভা ডাকলেন এবং সেই সভা থেকে ১১ এপ্রিল নির্দিষ্ট পথে রামনবমীর মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

আপাত শান্ত পরিবেশে সেই মিছিল ১১ এপ্রিল তার যাত্রা শুরু করলেও জনসংঘ পরিচালিত মিছিলটির অভ্যন্তরে লুকিয়েছিল অনেক অশান্ত মানুষ অসংখ্য গুপ্ত অস্ত্র হাতে। তাই সেই বিতর্কিত ১৪ নম্বর সড়কে পৌঁছেই দীননাথ পাণ্ডে মিছিলটি থামিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, শ্রীত্রিবেদী সহ অন্যান্য জনসংঘী কর্মীদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত মিছিলটি আর এক পা-ও নড়বে না।

কিন্তু মিছিলটি অল্প পরেই আবার চলতে শুরু করেছিল, তখন তার পরিচালন-ভার ন্যস্ত করা হয়েছে উত্তেজিত জনতার হাতে। সেই উত্তেজিত জনতা যখন মুসলিম অধ্যুষিত আজাদ-বস্তি অঞ্চলে পৌঁছলো তখন কে বা কারা কোনো এক স্থান থেকে নাকি ইষ্টক বর্ষণ করেছিল। তারপরেই পরিকল্পিতভাবে যা ঘটাতে চেয়েছিল উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী জনসংঘীরা, তাই ঘটে গেল। শিল্প-শহর জামসেদপুরে, শ্রমিক-আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যবাহী জামসেদপুরে, পশুশক্তি সাময়িকভাবে গ্রাস করল সব কিছু, রক্ত আর আগুনে ভূলুণ্ঠিত হলো মানবমহিমা।

এই হচ্ছে জামসেদপুরে সংঘটিত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস। এই ঘটনা ভারতের কোনো পশ্চাৎপদ অঞ্চলে ঘটলে হয়তো এতখানি বিচলিত হত না কেউ—যদিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তা যেখানেই ঘটুক না কেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের কলঙ্কচিহ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়, তবু তা আমাদের চেতনাকে জামসেদপুরের ঘটনার মতো এমন করে আমূল নাড়িয়ে দিত না। কারণ, ভারতবর্ষের মানচিত্রে জামসেদপুর একটি প্রধানতম শিল্প-শহর। তার শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্পের অনুপ্রবেশ কখনো স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই শহর সংগঠিত শিল্প-শ্রমিকদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের পতাকা দীর্ঘকাল সগর্বে বহন করে আসছে। সুতরাং আমরা তো আশাই করতে পারি, সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকে ধর্মের আফিং দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা জামসেদপুরে অন্তত সহজ হবে না, কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারের জীবদের পাশবিক চেতনাকে বৈজ্ঞানিক মানবিক চেতনার শাণিত অস্ত্রে স্তব্ধ করে দিতে জামসেদপুরের সচেতন শ্রমিকশ্রেণী বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, কিছু বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত জামসেদপুর আমাদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ করে নি। দাঙ্গাবাজরা ধর্মের নামে শ্রমিকশ্রেণীর এক বৃহৎ অংশকে সাময়িকভাবে হলেও নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষে ধর্মীয় কুসংস্কার কত গভীরে প্রোথিত; সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের অজ্ঞাতে অথবা বলা ভালো—বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরও অজ্ঞাতে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও আজ কিভাবে কতখানি সংক্রামিত। ঠিক এই কারণেই জামসেদপুরের দাঙ্গা আমাদের ভীষণভাবে বিচলিত করেছে।

একথা সত্যি, অত্যল্পকালের মধ্যে, বিশেষ করে এ. আই. টি. ইউ. সি. ও সিটু-র উদ্যোগে এবং আই. এন. টি. ইউ. সি নেতৃবৃন্দের একাংশের সহযোগিতায় প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে সামগ্রিকভাবে জামসেদপুরের শ্রমিকশ্রেণী দাঙ্গাবাজ-দের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হেনেছে, সংগঠিত করেছে দাঙ্গাবিরোধী মিছিল, সক্রিয় সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে দাঙ্গা বিপন্ন মানুষের দিকে। কিন্তু এরও আগে, যখন অন্ধকার বিবর থেকে পশুরা বেরিয়ে আসার উপক্রম করছে, পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে, তখন জামসেদপুরের হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ সেই পশুশক্তির বিরুদ্ধে সচেতনভাবে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন. সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো মানুষের কাছে এই সংবাদ ঘন কালো মেঘের আড়ালে এক ঝলক আশার আলোকরেখায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার সংকল্পে অটল প্রগতিশীল উর্দু-সাহিত্যিক অধ্যাপক জাকির আনোয়ার এবং তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক মুজ্জর কাজমি, অধ্যাপক হাশেমি, শ্রীযুক্ত ভার্মা প্রমুখের নাম আমরা সগর্বে স্মরণ করতে পারি। এঁরা দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে ৭ এপ্রিল অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেন। আর যখন দাঙ্গা বাধল তখন দাঙ্গাবাজদের হাতে শহীদ হলেন মানবিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিবেক প্রখ্যাত ঐ উর্দু-সাহিত্যিক অধ্যাপক জাকির আনোয়ার। ঠিক এমনিভাবে দাঙ্গা-প্রতিরোধে জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিলেন জামসেদপুরের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা, আমাদের অনেকেরই সুপরিচিত, ডাঃ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় এবং তাঁরই নেতৃত্বাধীন সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ একদল দুঃসাহসী মানুষ। এঁরা কার্ফ্যু-কবলিত জামসেদপুরে পুলিশ আর মিলিটারির রক্তচক্ষু, বন্দুক-বেয়োনেট উপেক্ষা করেও মুসলিম ভাই-বোনদের ধন-প্রাণ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিভাবে এঁদের অভিনন্দিত করব জানি না। কিন্তু এটা জানি, ভারতরাষ্ট্রের লজ্জা আর কলঙ্কের গ্লানি শহীদ আনোয়ার এবং বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়দের মতো মানুষদের রক্তধারায় কিংবা মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার অভিযাত্রায় একদিন না একদিন নিশ্চিহ্ন হবে।

সেই অভিযাত্রায় সচেতনভাবে প্রস্তুত হবার দিন সমাগত। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরাধীনতার যুগে যে-বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির বত্রিশ বছর পরেও তা উৎপাটিত করা যায় নি। সামন্ত-

তান্ত্রিক কুসংস্কারের মায়াজালে মানুষকে এখনো যে মোহমুক্ত করা সম্ভব হয় নি ১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে সংঘটিত বারাণসী, সম্বল, আলিগড় আর জামসেদপুরের রক্ত আর আগুনের সাক্ষ্যে তো সেই সত্যই উদ্‌ঘাটিত। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতিতে এমনি ঘৃণ্য ঘটনা ঘটবার মতো দাহ্য উপাদান এখনো যথেষ্ট পরিমাণে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। শুধু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নয়, 'আমরা বাঙালী', আনন্দমার্গী কিংবা বিনোবার মতো ব্যক্তিমানুষও গো-রক্ষার নামে এখানে সেইসব দাহ্য-উপাদানে যে-কোনো মুহূর্তে অগ্নিসংযোগ করতে পারেন। সুতরাং মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে মানব-বিবেকের কারিগর যাঁরা—সেই শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সচেতন প্রয়াসকেও যুক্ত করা প্রয়োজন।

জামসেদপুরে জাকির আনোয়ার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যে-মহত্তম আদর্শকে চির উজ্জ্বল করে গেলেন, তাঁর সমধর্মীরা সেই আদর্শকে আরও সাহসের সঙ্গে অনুসরণ করবেন, রক্ত আর কান্নার ইতিহাসকে পবিত্র ঘৃণার আগুনে দগ্ধ করবেন, এটা নিশ্চয় আমরা আশা করতে পারি।

ধনঞ্জয় দাশ

শম্ভু মিত্র, নান্দীকার ও দীপেন্দ্রনাথ-আমরা

'দীপেন্দ্রনাথ রচনা-সমগ্র' প্রকাশের ব্যাপারে সাহায্য করতে 'নান্দীকার' নাট্য-সংস্থা আমাদের কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। আর, দীপেন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত যে-কোনো উদ্যোগেই নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্র-এর মুক্ত সমর্থন।

এই তিনের সম্মেলন ঘটে গেল শম্ভু মিত্র অভিনীত, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত পরিচালিত, 'নান্দীকার'-এর 'মুদ্রারাক্ষস'-এ। ৩ জুন, রবিবার বেলা ৩টায় 'দীপেন্দ্রনাথের রচনা-সমগ্র' প্রকাশ-কল্পে এই অভিনয় হল। বিক্রয়লব্ধ টাকায় এই প্রকাশনার কাজ শুরু হতে পারবে।

যদিও পারস্পরিক ধন্যবাদ আদান প্রদানের এটা কোনো উপলক্ষ নয়, তবু ভাবতে ভালো লাগছে এমন মহৎ সমবেত কর্তব্যে আমরা মিলিত হতে পারি। শম্ভু মিত্রের উপস্থিতি ও নেতৃত্ব, রুদ্রপ্রসাদের প্রয়াস ও

সংগঠন, 'নান্দীকার'-এর কর্মকুশলতা ও আন্তরিকতা, দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্য ও আমাদের, এই প্রায় অর্ধশতকবয়সী সাহিত্য-পত্রিকাটির, অস্তিত্ব—এই সব মিলে বেশ আত্মবিশ্বাসই আনে।

আর, রচনা-সমগ্রের প্রকাশক হিশেবে আমাদের ত গ্রহীতার মুগ্ধ কৃতজ্ঞতা আছেই।

দেবেশ রায়

পরিচয়

বিষ্ণু দে-র সপ্ততিবর্ষ পূর্তি সংখ্যা

উপন্যাস

শব্দের খাঁচায় : অসীম রায় ৬·০০

মস্তক বিনিময় (Thomas Mann-এর Transposed Heads-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—ক্ষিতীশ রায় ৪·০০

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস ১৫·০০

নীল নোট বই (ইমানুয়েল কাজাকোভিচের ব্লু নোটবুক-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—নৃপেন ভট্টাচার্য ৪·০০

বেনিটোর চাওয়া পাওয়া (আনা সেগার্স-এর Benito's Blue-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৪·০০

মানুষ খুন করে কেন : দেবেশ রায় ৩০·০০

গোবিন্দ সামন্ত (লালবিহারী দে-র 'Bengal Peasants Life'-এর বঙ্গানুবাদ) সাধারণ ৪·৫০

কমরেড : সৌরি ঘটক ৪·৫০

বিষ্ণু দে-র বই

প্রবন্ধ

জনসাধারণের রুচি	১০·০০

কবিতা

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর	৫·০০
ঈশাবাস্য দিবানিশা	৬·০০
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত	৮·০০
জ্ঞানপীঠ ও অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত	
মাও ৎসে তুং-এর কবিতা	
সংবাদ মূলত কাব্য	৪·০০
অন্বিষ্ট	৫·০০
সেই অন্ধকার চাই	৫·০০

সংকলন

বছর পঁচিশ	৩০·০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯।১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা

পরিচয়

৪৮ বর্ষ   ১০-১২ সংখ্যা   বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৫   মে-জুলাই ১৯৭৯

কাব্য সমালোচনা ১৯৩৩-১৯৫৮ / পুনর্মুদ্রণ

কাব্য আলোচনা ১৯৬৬-১৯৭৭

কয়েকটি কবিতার নিবিড়পাঠ

ক্রোড়পত্র

প্রচ্ছদচিত্র : রথীন মৈত্র

['সন্দীপের চর'-এর প্রচ্ছদ

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয় প্রাঃ লিমিটেড-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক—গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বিষ্ণু দে'র জন্মের (১৯০৯, ১৭ জুলাই) ৭০ বছর পূর্তির এই সংখ্যার সঙ্গে 'পরিচয়'-এর ৪৮ বর্ষ শেষ হল। এই সংখ্যা প্রকাশে যাঁদের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি—সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

'পরিচয়'-এর আগামী সংখ্যাটি শারদীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বেরুবে। আশা করি, 'পরিচয়'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি তার ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারবে।

কর্মসচিব, পরিচয়

চৈতন্যের সহোদর : 'পরিচয়' ও বিষ্ণু দে

দেবেশ রায়

এক

গোপাল হালদারই প্রথম এই ঐতিহাসিক তুলনা ব্যবহার করেন—বাংলার শিল্প-সংস্কৃতিতে চল্লিশের দশকে প্রায় যেন আরেকটি রিনাসান্সই ঘটে গিয়েছিল।

রিনাসান্স নিশ্চয়ই দশকে-দশকে ঘটে না, শতকেও একবার ঘটে না হয়তো। এই প্রতিতুলনার তেমন কোনো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌছনোর অবলম্বন ছিল না তাঁর পক্ষে। কিন্তু তিনি বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসে এই ঘটনাটিকে চিহ্নিত করতে চাইছিলেন—মার্ক্সবাদের তত্ত্ব, কমিউনিস্ট সংগঠন ও জাতীয় আন্দোলনের সমন্বয়ের এক মহামুহূর্তে বাংলা শিল্প-সংস্কৃতি যেন সহসা সাবালক আধুনিকতায় পৌছে গিয়েছিল ঐ চল্লিশের দশকে। গল্প-উপন্যাস-কবিতায়, নাচে-গানে-নাটকে, ছবিতে-ভাস্কর্যে—চল্লিশের দশকের সেই সাংস্কৃতিক ঘটনার কোনো ইতিহাস এখনো রচিত হয় নি। কিছু স্মৃতিকথা, কিছু তত্ত্বকথা, কিছু পুনর্মুদ্রণ হয়তো হয়েছে। আবার, এর সম্পূর্ণ বিপরীত মতও হয়তো শোনা গেছে পরবর্তীদের মুখে। এই বাংলাদেশে, কলকাতা শহরে—অগাস্ট আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের ভেতরে জন-জাগরণের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল—তার সঙ্গে অব্যবহিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যোগ ছিল কার্যকারণের। খুব কম সময়ের জন্য হলেও, বাঙালি সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা ব্যক্তিগতের নিভৃতি থেকে সমষ্টির অনুভবে

অন্বিত হয়েছিল। আর, সমষ্টির এই অনুভবই শিল্পচর্চায় বাংলা গানের, নাটকের, ছবির, উপন্যাস-কবিতার আত্মসচেতন আধুনিক টেকনিকের জন্ম দিয়েছিল।

সম্পূর্ণ নতুন এক মৌলিক উপাদানের সংশ্লেষে পরিস্থিতির এমন মৌলিক বদল ঘটে যায়। এই মৌলিকতার অর্থে ও তার ব্যাপকতার প্রসঙ্গে 'রিনাসান্স' শব্দটিই ফিরে-ফিরে আসে। শেষ-ত্রিশ থেকে চল্লিশের দশকের গোড়ায় এই মৌলিক উপাদানটি ছিল মার্ক্সবাদ ও কমিউনিস্ট সংগঠন। মধ্যবিত্ত বাঙালির চৈতন্যে সেদিন বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। শ্রেণী-সচেতনতা আর আত্মসচেতনতা হয়ে উঠেছিল একই ঐতিহাসিক দায়। আমাদের পরাধীনতার কারণে, আমাদের শিক্ষাহীনতার ফলে, আমাদের সামগ্রিক চরিত্রের জন্যও হয়তো বা—এই সচেতনতা অর্জনে আমাদের পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার অতিরিক্ত তাড়াও কোথাও কোথাও কাজ করেছিল হয়তো। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক ব্যত্যয় সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত বাঙালির চৈতন্যের সেই বিপ্লবের চিহ্ন তো ছড়িয়ে আছে বাঙালি সংস্কৃতির নতুন উপাদান-সমাবেশেই। গোপাল হালদার-ই, আবার, বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই তত্ত্বকে খুঁজেছিলেন ব্যক্তিজীবনের সত্যে—একদা-অন্যদিন-আর এক দিন এই তিনখণ্ডের উপন্যাসে কমিউনিস্ট চৈতন্যের দিকে অগ্রসরমান একটি চরিত্রের কাহিনীতে।

বিষ্ণু দে ও 'পরিচয়'—এই জাতীয়-কাহিনীরই দুটি অংশ। একজন কবির ক্ষেত্রে দায় ছিল চৈতন্যের বিপ্লব থেকে শিল্পকর্মের টেকনিকের বিপ্লবে উত্তরণের। আর, একটি সাহিত্য-পত্রিকার ক্ষেত্রে দায় ছিল শিল্পকর্মের প্রয়াসের সঙ্গে সামাজিক মননের নাড়ীর যোগ সৃষ্টিতে ও রক্ষায়।

দুই

'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যায় তখনকার বাইশ বৎসরের যুবক বিষ্ণু দে-র একটি কবিতা ও একটি অনুবাদ-গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। বিষ্ণু দে-র সপ্ততি-বর্ষ পূর্তিতে এই বিশেষ সংখ্যাটির সঙ্গে 'পরিচয়'-এর ৪৮ বর্ষ শেষ হলো। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অকালমরণের এই দেশে এ প্রায় দুর্লভ ঘটনা। আর-কোনো তুলনা তো মনে পড়ছে না।

যে কাগজের প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন তাকে ৫০ হতে দেখাও কোনো লেখকের পক্ষে প্রায় দুর্লভ দৃশ্য। এমন আর-কোনো দৃষ্টান্ত তো জানা নেই।

আমাদের এই বিশেষ সংখ্যাটি যেন আগামী বৎসরের বিশেষ উপলক্ষটির ভূমিকা—তখন, 'পরিচয়'-এর পঞ্চাশ বর্ষ প্রাপ্তি পালন করবেন 'পরিচয়'-এর

লেখক ও পাঠকরা। আমাদের সেই বর্তমান লেখকদের মধ্যে আছেন অন্তত চারজন যাঁরা 'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যারও লেখক—গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার, অন্নদাশঙ্কর রায় ও বিষ্ণু দে। এঁদের মধ্যে তিনজন আবার 'পরিচয়'-এর উপদেশকমণ্ডলীর-ও সদস্য।

'পরিচয়' কোনোদিনই কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাগজ নয় বা কোনো ব্যক্তির ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের সঙ্গেও কোনো কালে এর কোনো যোগ নেই। যদি তেমন হতো, তা হলে না-হয় এই প্রায় অর্ধশতকের ধারাবাহিকতার পেছনে পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিক জোরালো সংগঠনের সামর্থ্য প্রমাণ হতো। এবং এমন-কি এই উদ্যোগের পেছনে বা ধারাবাহিকতায় কোনো একজন ব্যক্তির ভূমিকাও সর্বেব নয় কখনোই।

শুরু থেকে কোনোদিনই 'পরিচয়' ব্যবসায়িক আইন-কানুনে চলে নি। প্রতিষ্ঠানিকতাও কখনোই খুব প্রধান নয় - যেন আর-একটু চলনসই গোছের হলেও মাসচলা-দিনচলার মতো নিত্য-নৈমিত্তিক একটু স্বচ্ছন্দ হতো। এমন বাঙালিয়ানায় অগোছালো এই কাগজ পঞ্চাশ বছরের অবাঙালি, অভারতীয়, প্রাতিষ্ঠানিক আয়ুর দিকে চলে এল কি করে?

বোধ হয় এর কারণ নিহিত আছে সামাজিক প্রয়োজনবোধে। কি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের, আর কি এমন সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায়, তেমন একটি সামাজিক প্রয়োজনকে অনুভব করা ও সেই অনুভবকে আকার দেবার ভেতরই তো ঘটে যায় ইতিহাসে জীবনের হস্তক্ষেপ!

'পরিচয়'-এর আরম্ভে কয়েকজন তরুণ লেখক-কবি ও বুদ্ধিজীবী সাহিত্য আর মননচর্চার একটা নিরিখ তৈরির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। সেই প্রয়োজন থেকে তাঁরা সৃষ্টিশীলতাকে মেলাতে চেয়েছিলেন সমালোচনায়, সাহিত্য রচনার ব্যক্তিগতকে মেলাতে চেয়েছিলেন দর্শন-ও ইতিহাস-চিন্তার সামাজিকে।

হয়তো এই প্রয়োজনবোধের ও এই চেষ্টার পেছনে ছিল তখনকার, দুই মহাযুদ্ধ-মধ্যবর্তী ইংলণ্ড-ইওরোপ-আমেরিকার, শিল্প সাহিত্য চর্চার মনন-নির্ভর আধুনিক ধারার প্রতি অনুরাগ। সাম্রাজ্যের দেশ-মহাদেশগুলির পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত ভাষা-সাহিত্যের সেই নিরিখকে আমাদের এই প্রাদেশিক ভাষা ও পরাধীন জীবনযাপনের সীমায় আনবার চেষ্টা ছিল বই কি একটু নিরুপায় করুণ! কিন্তু সে তো আমাদের কলোনির জীবনের আত্মিক বিকাশেরই দায়। ভভদিনে অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাহিত্যের বিশ্বভূমিকা এই নেহাত

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের ভেতর সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছে স্বাধীন বিকাশের যুক্তি ও আবেগ। শিল্প-সাহিত্য ও ওতপ্রোত সামাজিকের এই বিপরীতগতি ইতিহাসে বহুবারই ঘটেছে।

শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সমালোচনার এই অন্বয়ের তাড়া আসে লেখক-কবি-বুদ্ধিজীবীদের আত্মসচেতনতার দায় থেকে। অপব্যয়ী স্বতঃস্ফূর্ততা তাতে সঞ্চিত হতে পারে বিদ্যুতের প্রবল ভোল্টেজে। নির্বিচার আবেগ তাতে বাঁধে বাঁধে সেচের কিউসেকে লক্ষীভূত হয় অববাহিকার নষ্ট উচ্ছ্বাসের বিপরীতে। এই প্রয়োজন-সাধায় সমালোচনা শুধু আর শিল্প সাহিত্যের সীমায় বদ্ধ থাকে না, তার শিকড় প্রোথিত হতে থাকে সমাজ-ইতিহাসের অতীত-বর্তমানের স্তর-স্তরান্তরের গভীর থেকে গভীরতরে। তখন মননের আন্দোলন আর সৃষ্টির আন্দোলন হয়ে ওঠে একই আত্মসচেতনতার আন্দোলন।

প্রথম থেকেই এই আত্মসচেতনতা ছিল 'পরিচয়'-এর লক্ষ্য ও লক্ষণ দুই-ই। সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে-র মতো কবি, সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র মতো বিজ্ঞানী, ধূর্জটিপ্রসাদের মতো সমাজ-বিজ্ঞানী, সুশোভন সরকারের মতো ঐতিহাসিককে এই আত্মসচেতনতাই মিলিয়েছিল। এঁরা প্রত্যেকেই তখন নিজ নিজ বিষয়ে তরুণ বিশেষজ্ঞ। কিন্তু বিশেষজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসা বা বিশেষজ্ঞতা উতরোনোর আর-একটা সতর্ক তাড়াও ছিল। যে-বিশেষজ্ঞতা ও বিশিষ্টতা ব্যক্তির ও সমাজের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় তার বিপরীতে 'পরিচয়' সেই শুরু থেকেই আত্মসচেতন সমগ্রতার এক নিরিখ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় সমগ্রতার এই আত্মসচেতন সন্ধান খুব স্পষ্ট ও সংগঠিত হয়ে ওঠে নি মার্ক্সবাদ চর্চার আগে, যদিও তার মানবিক পূর্ব-সূচনা দেখা গেছে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথে। ইতিহাসে তেমনই তো হওয়ার কথাও। মার্ক্সবাদই তো রিনাসান্সের যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পরিণতিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ শ্রম-বিভাগের শৃঙ্খলার অনন্বয়ের ভেতর থেকে উদ্ধার করে আনে মানবিক অন্বয়ের সমগ্রতা।

আমাদের পরাধীনতার দুর্ভাগ্যে তো বিশেষজ্ঞতা আর সমগ্রতা ব্যুরো-ক্রেসির পথ বেয়ে হয়ে দাঁড়ায় টেকনোক্রাট আর ব্যুরোক্রাটের পদমর্যাদার লড়াই। জীবন ও জীবিকার পরাধীনতা ও ব্যক্তিবিকাশের দ্বন্দ্বে হয়তো আমাদের সমাজে বিশেষজ্ঞতার সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় একটি ভূমিকা ছিল ও আছে—তার পূর্ণ ব্যবহার এখনো ঘটে নি। বরং উল্টোপথে সেই বিশেষজ্ঞতা ডাক্তারির

নামে গরিব মানুষের গলা আর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নামে কনট্রাক্টরের পকেট কাটে। ব্রিটিশ আমলের বুরোক্রাসির ধারাবাহিকতায় আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর বিশেষজ্ঞও হয়ে ওঠেন আমলা-ই। অথচ হওয়ার কথা ছিল আমলা থেকে বিশেষজ্ঞ। উনিশ শতকে ভালো চাকুরে হয়ে ওঠাটা শুধুই ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার অংশ ছিল না, দক্ষতা-নিপুণতায় সাহেবদের সমকক্ষ হয়ে ওঠার স্বাদেশিক দায়ও তাতে মিশে ছিল। বিজ্ঞানের গবেষণায়, উৎপাদনের কৃৎ-কুশলতায় আমাদের স্বদেশী উদ্যোগ যখনই বিদেশী বিশেষজ্ঞতার প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে তখনই তাতে যেন তড়িত-সঞ্চার ঘটে যায়। অথচ সেই একই পরাধীনতার দাযে তো সমগ্রতার ধ্যান-ধারণাহীন এক বিপুল মধ্যশ্রেণীর ওপরই গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার লৌহ-কাঠামো। সেই মধ্যবিত্ত সমাজে 'আত্মসচেতনতা'র চেষ্টাও শেষ হয়েছে আত্মগৌরবের মিথ্যায়, মোহে।

শিল্প-সাহিত্যের চর্চায় এই আত্মসচেতনতার প্রয়োজনীয়তা প্রথম বুঝেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই গল্প-উপন্যাস-কবিতা-সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ-সামাজিক নকশা-পুস্তকসমালোচনা-মতামতের বিতর্ক—এই সবগুলি ফর্মে চেষ্টা করেছিলেন মননের ও আবেগের এক অন্বয় সন্ধানের। সেই আবেগ-সংহত মননে নেহাত সাংবাদিক প্রয়োজনেই সৃষ্টি হতে পারে কমলাকান্তের মতো চরিত্র। এ-ও ছিল তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে সবসময় পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত রাখার চেষ্টা। এই শতকের শুরুতে 'বঙ্গদর্শন'-এর নবপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথেরও ছিল সেই একই অন্বেষণ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের নিজস্ব পত্রিকা দুটির লেখক সংগঠিত করতে হয়েছিল। কারণ, আমাদের অভ্যাস ও ঐতিহ্যের বাইরের এই চেষ্টার সঙ্গেই যুক্ত ভাষার নতুন ব্যবহারের ও রচনার নতুন রীতির প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ পরে একবার এই চেষ্টায় তাঁর সমর্থন দিয়েছিলেন—'সবুজপত্র'-এ। ও শেষে, আরো একবার—'পরিচয়'-এ।

সৃষ্টিশীলতা আর সমালোচনার এই সহাবস্থানের ঐতিহ্যে 'পরিচয়' তো এই দীর্ঘ সময় পাড়ি দিল। আর, এই পাড়ির মধ্যে নাটকের কৌতুকও নেহাত কম নয়। কোনো কোনো কবি-লেখকের কখনো মনে হয়েছে 'পরিচয়'-এ সৃষ্টির প্রশ্রয়ের চাইতে বুদ্ধির চর্চার প্রাধান্য যেন বেশি। বোধ হয় বুদ্ধদেব বসুই লিখেছেন কোথাও—'পরিচয়'-এর ঝোঁকটা ছিল সমালোচনার দিকেই। কোনো-কোনো সময় মনে হয়েছে—'পরিচয়' যেন বড় বেশি উঁচ্‌কপালে ভারি পত্রিকা, তাকে নামিয়ে আনা উচিত সাধারণ পাঠকের রুচির কাছা-

কাছি। বা, নামানো-ওঠানো বাদ দিয়েও, পড়তে ভালো লাগে এমন লেখা বেশি প্রকাশ করার কথাও কখনো ভাবা হয়েছে। কখনো-বা 'পরিচয়'-কে সমকালীন ঘটনাবলি প্রসঙ্গে মতামত সংগঠনের দায়ও বহন করতে হয়েছে। কিন্তু সে-রকম অদলবদলের যত চেষ্টাই হয়ে থাক না কেন, 'পরিচয়'-এর একটা ধরন কিন্তু এমনই ওতপ্রোত হয়ে গেছে তার অস্তিত্বে ইচ্ছে করলেও তা থেকে 'পরিচয়'-কে আর সরানো যায় না। যে-গল্প-উপন্যাস-কবিতায় সতর্ক-সচেতন সৃষ্টিচেষ্টা যুক্ত নয়, আর যে-আলোচনা সমালোচনা সৃষ্টির আবেগে সংহত নয়—'পরিচয়' তেমন লেখার খুব সমর্থক হয়ে উঠতে পারে না। তাই সেই প্রথম থেকেই 'পরিচয়'-এর সংগঠক-কর্মী এমনই গোষ্ঠী যার বেশির ভাগ কবি-লেখকই সমালোচক আর বেশির ভাগ সমালোচকই কবি-লেখক। 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠা থেকে এর বিপরীত উদাহরণও অজস্র উপস্থিত করা যায়। বা, এমন কিছু 'বিখ্যাত' রচনাও 'পরিচয়'-এ বেরিয়েছে যেখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্য নিরূপণের বিভ্রাট ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু এই বিপরীত রীতি আরো নিশ্চয়তা দিয়েছে 'পরিচয়'-এর প্রকৃত রীতিকে।

'পরিচয়'-এর ইতিহাসকে অনেক সময়ই সুধীন্দ্রনাথের ও 'কমিউনিস্টদের'—এই দুই ভাগ করা হয়। যাঁরা সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়'-কে স্বীকার করেন তার স্বাতন্ত্র্যের জন্য বা পরবর্তী 'পরিচয়'-কে একটু হেয় করতে আর যাঁরা 'কমিউনিস্টদের' 'পরিচয়'-কে স্বীকার করেন তার নির্দিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্ববিশ্বাসের জন্য আর পূর্ববর্তী 'পরিচয়'কে একটু হেয় করতে—এই দুই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিপরীত পক্ষ ইতিহাসের এই বিভাগ সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ একমত। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 'পরিচয়'-এর ইতিহাস নয়, 'পরিচয়' গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরে নিজের ধারাবাহিক অস্তিত্বকে কোন অর্থ দিয়েছে সে-বিষয়ে কিছু আন্দাজ করা মাত্র। সে দৃষ্টিতে কি 'পরিচয়'-এর প্রাক্-কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট পরিচ্ছেদের ভেতর বা সুধীন্দ্রনাথীয় ও সুধীন্দ্রনাথোত্তর পর্যায়ের ভেতর এমন কোনো আবশ্যিক ছেদ ছিল না। যদি তেমন কোনো ছেদ অবধারিতই থাকত তা হলে 'পরিচয়'-এর স্বত্ব হস্তান্তরিত হতে পারত না কমিউনিস্টদেরই কাছে। তার অন্য দাবিদারও ছিল।

আত্মসচেতন ও পরস্পরসাপেক্ষ যে সৃষ্টি ও সমালোচনা হয়ে উঠেছিল 'পরিচয়'-এর অন্তর্গত প্রবর্তনা—একমাত্র মার্ক্সবাদ ও তার চর্চা অনুশীলনেই তার সম্প্রসারণ ঘটতে পারে নিত্য-নব অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে। রাজনীতি-

সীমার অস্পষ্টতায় তিরিশের দশকের গোড়ায় যা ছিল শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ-ইতিহাস সম্পর্কে আধুনিক সচেতনতার মুখপত্র, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিবেশে তাকে যদি কিছু হয়ে উঠতে হয়ই নেহাত, তাহলে হতেই হয় মার্ক্সবাদে সংলগ্ন। 'পরিচয়' যারা শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ, বা অনেকেই তো, এই সমস্ত সময়টা জুড়েই, 'পরিচয়'-এর কর্মী ও লেখক। তাই তাঁরা সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রথম দিকের 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় ইতিহাস-সম্পর্কে বা সমাজ-বিচারে মার্কসবাদের যে-চাবিকাঠি ব্যবহার করতেন, সুধীন্দ্রনাথের পরবর্তী 'পরিচয়'-এও তাই-ই করে যেতে থাকেন ইতিহাসের সেই বিশেষ মুহূর্তের দায়-দায়িত্ব নিয়ে। 'পরিচয়' মার্ক্সবাদ-চর্চার মুখপত্র কিনা, কমিউনিস্ট পার্টির লেখকদের কাগজ কিনা, শুধু পার্টি-সাহিত্যরচনার প্রকাশক কিনা—এ-নিয়ে গত প্রায় বছর-তিরিশ নেহাত কম তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক তর্ক-বিতর্ক তো হয় নি। শ্রীভবানী সেন, শ্রীসুশোভন সরকার ও শ্রীগোপাল হালদার-এর নানা লেখায় এ-বিষয়ে সাক্ষ্য, ছড়িয়ে আছে। 'পরিচয়'-এর ইতিহাস-রচনায় সে-সব কাজে লাগবে। তাঁদের সাক্ষ্যে ও কাগজের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায়, রচনায়-রচনায় রচিত ইতিহাসে দেখা যাবে—আত্মসচেতন সৃষ্টি ও মননের যে-অন্বয় ছিল 'পরিচয়'-প্রকাশের প্রধান প্রেরণা তাই-ই মার্ক্সবাদের সঙ্গে যুক্ততায় গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে হয়ে উঠেছে 'পরিচয়'-এর চলমানতার প্রধান খাত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে উৎস ও প্রবাহের এই অবিচ্ছিন্নতা 'পরিচয়'-কে করে তুলেছে অদ্বিতীয় ও অনন্য। তাই 'পরিচয়'-এর সংগঠন সবসময়ই থেকে গেছে লেখকদের লেখার সংগঠন। রাজনৈতিক কারণেই প্রধানত, কখনো-বা অন্য কোনো কারণেও, ওর ব্যত্যয় যখন ঘটেছে, তার প্রতিকার হতেও সময় লাগে নি। তাই 'পরিচয়'-এর বিকাশ সবসময়ই তার লেখকের আত্মসচেতনতার বিকাশ। কোনো আচ্ছন্নতায় সে-বিকাশ কখনো ব্যাহত হয়ে থাকতে পারে—কিন্তু তার বিপরীত গতি কখনো সম্ভব হয় নি। তাই বাংলা সাহিত্যে 'পরিচয়' কোনো সময়ই একটি সাহিত্যপত্র মাত্র কখনোই নয়, তত্ত্বপত্র তো নয়ই—একজন ব্যক্তি-লেখকের মতোই তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আগু-পিছু প্রতিজ্ঞা ও পশ্চাদপসরণ, আর এই সব কিছু মিলিয়ে ব্যক্তিত্বের নিরন্তর বিকাশ।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ে এমন দু-একজন লেখক সংগঠক তো ছিলেন যাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্মকে সামাজিক কাজই মনে করতেন,

হয়তো বা প্রয়োজন বোধ করতেন প্রকাশের ও বিনিময়ের। তাঁদের নিজস্ব চিন্তা ও কর্মের আধার হিসেবে তাঁরা কিছু পত্রপত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা' ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'-র কথা মনে পড়ে। কিন্তু সাহিত্যচর্চার সেই সামাজিক সংগঠন এতই ব্যক্তিনির্ভর ছিল যে তাঁদের জীবৎকালেই সেগুলো বন্ধ করে দিতে হয়। অথচ সেক্ষেত্রে 'পরিচয়' যে নিয়মিতই প্রকাশ হয়ে যেতে পারে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্যের কোনো হানি না ঘটিয়ে আর হয়ে থাকতে পারে লেখকদের কাগজ, শিল্প সাহিত্যের কাগজ, সমালোচনার কাগজ—তার প্রধান কৃতিত্ব হয়তো সেই মার্ক্সবাদী লেখককর্মীদেরই যাঁদের ওপর 'পরিচয়' পরিচালনার দায় ন্যস্ত হয়েছিল। সে-কারণেই 'পরিচয়' একই সঙ্গে আত্মসচেতনতা আর সমাজ-সচেতনতার সমন্বয়ে শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার এক চলমান মুখপত্র।

তিন

এই সমন্বয় বড় সহজ নয়। মার্ক্সবাদ বলতে কোনো একরোখা, একবগ্‌গা মত বা অমত বোঝায় না। কলোনির এই দেশে আত্মসচেতনতা আর সামাজিক দায়ের এলাকা সবসময় খুব চিহ্নিত নয়। আর, সর্বোপরি, কবি-লেখক-সমালোচকের সৃষ্টিক্রিয়ায় তাঁর স্বকীয় ফর্মের একান্ত নিজস্ব টেকনিক সন্ধানের গভীর গোপন চরম লড়াই-এর সঙ্গে বাইরের সব কাজকর্ম, এমন-কি তাত্ত্বিক সংগ্রামেরও, থাকতে পারে বৈপরীত্য—সাহিত্যসৃষ্টি বড় বেশি ব্যক্তিগত এক প্রক্রিয়া অথচ তার সব উপকরণ ও সেই উপকরণের ব্যবহার চরম সামাজিক—এর ভেতর এক দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই চলছে পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো।

সেদিন বিষ্ণু দে-ই তো ছিলেন অন্যতম কনিষ্ঠতম, 'পরিচয়' যখন বেরতে শুরু করে। কবিতায় প্রবন্ধে, সমালোচনায়, গল্প-অনুবাদে স্বনামে-বেনামে এই কনিষ্ঠ সদস্যের অংশ সংখ্যার দিক থেকে ছিল অতিশয় মুখ্য—যেমন অনেক সময়ই হয়ে থাকে, খ্যাতি-প্রতিপত্তির দায় বহন করতে হয় বয়স্কদের প্রতিটি লেখায়, তাই কনিষ্ঠের ঘাড়েই চাপে পত্রিকার অনেক কাজের দায়। বা, তিন মাস পর-পর হলেও, পত্রিকার লেখার প্রয়োজন তো সবসময়ই। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র লেখা চিঠিগুলিতে ('এই মৈত্রী! এই মনান্তর', শ্রীঅরুণ সেন) বোঝা যায় 'পরিচয়'-এর সম্পাদক কী আনুষ্ঠানিক বন্ধুতার মর্যাদা দিতেন সেদিনের এই তরুণ কবি-কে। সেই আনুষ্ঠানিকতা

ছড়িয়ে আছে প্রায় সব চিঠিতেই—লেখার তাগাদা বা বৈঠকের আমন্ত্রণ—ব্যক্তিগতকে এড়িয়েই গেছেন সুধীন্দ্রনাথ। সেই মর্যাদার প্রমাণ আছে তাঁর নিজের 'অর্কেস্ট্রা'-র বিষ্ণু দে-কৃত আলোচনা ও বিষ্ণু দে-র গ্রন্থগুলি সম্পর্কে উল্লেখে-মন্তব্যে। বয়সে প্রায় এক দশকের পার্থক্য নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার এই দুই কর্মী 'পরিচয়'-এ বাংলা কবিতার আধুনিকতার এক বিশিষ্ট চর্চা করে যাচ্ছিলেন একই কাগজে, সহকর্মে কিন্তু একটু অভিজাত পার্থক্যে। সুধীন্দ্রনাথের দুটি-একটি চিঠির প্রসঙ্গ ধরে কেমন আন্দাজ আসে, হয়তো বয়ঃ-কনিষ্ঠ কবি-সহধর্মীর বন্ধুতার আবেগকে একটু সামলেই চলছিলেন শুরুতে সুধীন্দ্রনাথ—সেখানে তরুণ কবি তাঁর সঙ্গপ্রার্থী, মত-বিনিময়ে আকাঙ্ক্ষী, নতুন বইপত্রের সন্ধানার্থীও। আর সুধীন্দ্রনাথ একটু ব্যস্ত, একটু পরিণত-বুদ্ধিও বটে। কিন্তু তারপর, মাত্র কয়েকটি বৎসরে, 'পরিচয়' যখন তিরিশের দশকের গোড়া থেকে পৌঁছে যাচ্ছে দশকের উপান্তে, কাব্য-জিজ্ঞাসায় তৎপর, কাব্যচর্চায় বিরতিহীন, মননে-পঠনে অক্লান্ত বিষ্ণু দে-র বিকাশমান ক্ষমতার ও সৃজনশক্তির এক মুগ্ধ দর্শক হয়ে পড়তে থাকেন সুধীন্দ্রনাথ—সে-বিস্ময় তাঁর শেষ পর্যন্তও ছিল অম্লান, যার ফলে তিনি এমন উক্তি করেন, 'এ দিক থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়।' আর সুধীন্দ্রনাথের উচ্চকিত স্টাইলে মতপার্থক্যকে খুব বেশি দাগিয়ে মুগ্ধতাকে আরো স্বাধীন নিরপেক্ষ করে তোলার ভেতরে ভূমিকারই কেমন বদল ঘটে যায়—'পরিচয়'-এর সেই কনিষ্ঠ কবি তাঁর শিল্পকর্মের ভাষা-আবিষ্কারে, তাঁর বাক্‌ভঙ্গির সন্ধানে, তাঁর উপমা রূপকের খোঁজে হয়ে উঠতে থাকেন বাংলার অন্যতম প্রধান কাব্যকর্মী তাঁর বিশ-বাইশ থেকে ত্রিশ-বত্রিশ বয়সের ভেতর।

মাত্র সেই তারুণ্যেই এই কবি তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাকেই তো অবান্তর ভাবেন না। 'পরিচয়'-এর আড্ডায় তিনি কখনো-বা 'কল্লোল'-এর প্রতিনিধি, আবার, 'পরিচয়' থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধদেবের 'কবিতা'-র জন্য রচনা সংগ্রহ করেন সুধীন্দ্রনাথেরই কাছ থেকে। অভিজ্ঞতার এমন সম্প্রসারণ কি আরেক অর্থে তাঁর নিঃসঙ্গতারও ব্যাপ্তি? তা থেকে পরিত্রাণের কোনো আবেগই কি সংহত হচ্ছিল ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা অর্জনের আধুনিকতায়?

সেই আধুনিকতার বোধই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'র পর 'পূর্বলেখ'-কে করে তোলে এমন প্রবল। আর, এমন-কি কাব্যগ্রন্থটির

ফর্মাটিকেও কেমন নাটকীয়! বৈদিক শ্লোকে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করে উৎসর্গ—তারপর, কবিতার পর কবিতা একের পর এক নানা জনকে দিতে দিতে শেষের 'জন্মাষ্টমী', সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। মাঝখানে আছেন—আকৈশোর বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ক্ষিতীশ রায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়; কবি-সহকর্মী বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়; প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, কুমার, কাজলা, এমার্সনরা, শ-অডেন, অ-বন্দ্যোপাধ্যায়, অডেনের মেয়ে, অশোক মিত্র, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হমফ্রি হাউস—এমন বিচিত্র বিবিধ ব্যক্তি। যেন তাঁর কাছে কবিতারচনা এক সামাজিক কর্ম নেহাত বাস্তব অর্থেই—শুধু তাত্ত্বিক অর্থে নয়; যেন সেই সামাজিক কর্মের কারক তিনি হলেও বৃহত্তর সমাজে তিনি তো তাঁর জ্যেষ্ঠ, সমবয়সী, সহকর্মী ও কনিষ্ঠদের সঙ্গেই যুক্ত; ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা অর্জনের কঠিন চেষ্টায় তিনি কবিতাগুলিকে চিহ্নিত রাখতে চান সমষ্টির চিহ্নে—লক্ষ করলে দেখা যাবে বিষ্ণু দের উৎসর্গ নিছকই উৎসর্গ নয়, যাকে উৎসর্গ করা তাঁর সঙ্গে কবিতাটির কোনো এক ধরনের যোগ আছেই। আর কোনো কবিই কি প্রয়োজন বোধ করেছেন এত উৎসর্গের—শুধু কাব্যগ্রন্থ নয়, কবিতাগুলিও; শুধু কবিতাই নয়, একই কবিতার বিভিন্ন অংশও?

বাংলা কবিতার দুর্মর 'আমি'-কে ভুলতে এই 'আমরা'র সমষ্টিকে নিজের কাব্যকর্মের অঙ্গ করে নিয়ে বিষ্ণু দে তাঁর কবিতার বহুমাত্রিক অর্থের এক বাস্তব উৎসে পৌছতে চান। তাই 'পূর্বলেখ'-তে তাঁর কণ্ঠস্বরের বিচিত্রতা, তাঁর কাব্যবন্ধকে করে তোলে তাৎপর্যে তির্যক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের প্রসঙ্গ উপমান হয়ে আসে এই আধুনিক তির্যকের। কবিতায়-কবিতায়, বা একই কবিতার স্তবকে-স্তবকে 'আমি' 'তুমি'-র অর্থ বদলে-বদলে যায় এতই বেশি, যে তা থেকে বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রকৃত দুর্বোধ্যতা শুরু হয়। এ-ও তো শিল্পসাহিত্যসৃষ্টির ব্যক্তিগত আর সংলগ্ন সমাজের ভেতর সম্পর্কের এক কৌতুককর দ্বৈত—যখন বিষ্ণু দে ব্যক্তির 'বিলয়' ঘটান সামাজিকের সমগ্রে তখনই তিনি প্রকরণের জটিল থেকে জটিলতরে চলে যান।

কারণ, বিষ্ণু দে-র 'ব্যক্তি'ও তো শ্রেণীব্যক্তিই, এই কলোনির শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, চাকুরে বা ব্যবসায়ী, 'স্বধর্মে...সন্দিহান' বিভীষণ। তার নিজের আত্মধ্বংসের আস্থা ও সাহস কিন্তু আত্মসচেতন শ্রেণী-ভূমিকায় হয়তো আছে, মনে হয়, ইতিহাসের অনিবার্যতা মেনে নেয়ার কাণ্ডজ্ঞান, 'জানি

জানি তুমি শকুনের পালে পুলক আনো / তবু তুমি আনো মড়কের বনে দাবদাহের / মুক্তির আশা, শ্যাম জলধর!' এই তির্যক মধ্যবিত্ত মানসিকতার নৈরাজ্যের শৃঙ্খলাও আর সহজবোধ্য থাকে না, কবি যখন তাঁর কাব্যসিদ্ধান্তকেও এর অংশ করে নেন, 'প্রবল মরণে এ রোগ হানো।'

'পূর্বলেখ' জুড়ে, যেন উপন্যাসের পরম্পরায়, এক উপলব্ধিময় যুবা তার চারপাশ, এই চারপাশের শহর, এই শহরের চারপাশের হাইকোর্ট পাড়া, ডালহৌসি, লায়নস রেঞ্জ, রেড রোড, কারপোর সামনে, চৌরিঙ্গী, হাওড়া, খিদিরপুর, মানিকতলা খাল, ঢাকুরিয়ার দীঘি, এই সব কিছু দেখে দেখে তার দেশের কাছে পৌঁছতে চায়। সে পথে শহরের দেহাতি শ্রমিকের দেখা মিলে যায়, চঞ্চল লিরিকে একবার উঁকি দেয় রূপকথার নতুন অনুষঙ্গ,

ঘোড়া কেন বলো নাচে, হ্রেষাচঞ্চল
নাসাপুট উদ্ধত !
সে কোন পাহাড়ে চলেছে, নীলকমল
বলো কি তোমার ব্রত ?

সাগর সেঁচানো কড়ির পাহাড়ে চুনি
ডালিমের লালে লীন ?
প্রবা-চূড়ায় পারিজাত চাও শুনি !
তাই কি ওড়াও দিন ?

('বৈকালী' ২, 'পূর্বলেখ')

এই সব চঞ্চল লিরিকের একটু চাপা স্বরে, স্বগতোক্তির একটু-বা গুঞ্জরণে বিষ্ণু দে-র কণ্ঠস্বরের বহুধা বৈচিত্র্য নতুন প্রেমের গোপন প্রবল টানে নিবিড় হয়ে আসে 'তুমি আছ কোন্ সাত সাগরের পার, / বাতাস তবুও ভ্রমর তোমার কথায়।' ভালোবাসার এমন সামগ্রিক টানে সংহত হয়ে যায় উপমার মালা, 'প্রেম আমার তারা-তারায় লেগে / উল্কা, ভাবে, থমকে নিজ বেগে।'

যে-আবেগ এতদিন জমা থাকত নিজের সঙ্গে যুঝতে, বুঝতে, নিজের কাছ থেকে নিজেকে পেরোতে, সেই আবেগ এমন সমষ্টির, সমগ্রের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায়! এই স্বরটি পেয়ে গেলে 'পূর্বলেখ'-তেই বিষ্ণু দে-র

কবিতার আকার বদলে যেতে শুরু করে। আত্ম-উপহাস, শ্লেষ-ব্যঙ্গ আর এই নাগরিক বাস্তবতা যখনই তাঁর এই নতুন আবেগের সঙ্গে মিশে যায়—তখনই যেন কবিতা আর লিরিকের সীমায় বাঁধা থাকতে চায় না। কখনো-বা কবিতার অংশ থেকে অংশে, কখনো-বা একই অংশের স্তবক থেকে স্তবকে, কখনো-বা একই স্তবকের ভেতরেও, স্বর বদলে যায়, ছন্দ বদলে যায়, প্রসঙ্গের ব্যবহার বদলে যায়। কবিতার গড়ন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। পৌরাণিক উপমার তানবিস্তার অতীত প্রসঙ্গকে সংযুক্ত করে দেয় অনুভূত ভবিষ্যের নিশ্চয়তায়—আর, এই তান বিস্তার ঘটতে থাকে দু-শ বছরের কলোনির মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি আর ক্লেদের ভেতর দিয়ে, কখনো আত্মশ্লেষের পরিহাসে, কখনো আক্রমণের প্রত্যক্ষতায়, কখনো উপায়হীনতার স্বীকারে—কিন্তু সর্বদাই এক অন্তর্গত বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়তে চায়।

বিস্মিত তোরণে তব
অতিথি এসেছি আজ, পরপক্ষ অজ্ঞাত-অচেনা,
ছিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রুক্ষ বিভীষণ
শান্তিসেবী যুযুৎসুসমান।···

···হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এ সঙ্গীত আমাদের আর নাহি সাজে।
আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে
সাযুজ্য সঙ্গীতে,
অনিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয় আত্মীয়-সোদর,
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী জনতার উদ্গীথ-মুখর
এ কুৎসিৎ জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই,
কুম্ভীরক তাই॥

('জন্মাষ্টমী', 'পূর্বলেখ')

চার

'পূর্বলেখ'-র প্রথম কবিতায় বিভীষণ, শেষ কবিতায় বিভীষণ। রূপক-পৌরাণিক মিশে দেশকে সেই অনুভূতি-প্রবল কবিযুবাটির কাছে বড় গ্রাহ্য করে তুলেছিল আর দেশকে সেই চেনাজানায় সেই যুবকের মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতাই প্রধান—যার পুরাণ প্রতীক বিভীষণ। কিন্তু এরই ভেতর ঘটে যায় ২২ জুন, হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বদলে যায় জনযুদ্ধে। দেশকে জানার আত্মদীর্ণ প্রক্রিয়া গিয়ে মেশে ইতিহাসের সমসাময়িকের প্রচণ্ড জীবনে। 'পূর্বলেখ'-তে যে জানা ছিল ইতিহাসে, সেই জানা বদলে যায় '২২শে জুন', 'সাত ভাই চম্পা'-তে দুনিয়ার বদলটা চোখের সামনে যেখানে ঘটছে। কলোনির দেড়-দুশ বৎসরের গ্লানির ভার অবান্তর হয়ে যায় বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণীর অভূতপূর্ব ভূমিকায়। এই তো প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী তার প্রবল পরাক্রান্ত ভূমিকায় নেমেছে। তাই সেই ভূমিকায়, 'একাকার দেশবিদেশের গান', 'দূর স্তালিনগ্রাদ বাংলাদেশের প্রান্ত মিলায়', 'প্রাণের মর্মরে থরো থরো নৈর্ব্যক্তিক বেগে / বিদ্যুৎ আবেগে জাগে উদ্ভাসিত দেশ'।

কলকাতা শহরে কবিতা রচনার অভ্যাসে রত এই এক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের যুবক, আত্মপরিচয় সন্ধানে তাকে অনিবার্যত এই কলোনির মধ্যবিত্তের ইতিহাসে যেতে হচ্ছিল, উপহাস করতে হচ্ছিল নিজেকে, কখনো কৌতুকে কখনো শ্লেষে এই আত্মনিন্দায় তার কণ্ঠস্বর বেঁকে বেঁকে যাচ্ছিল, অবশেষে সে, মানবসভ্যতার ইতিহাসের এই এক ঘটনায় তার আত্মপরিচয়ের নির্দেশ খুঁজে পায়—ইতিহাসে প্রথম ও তখনো একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র সভ্যতায় ক্ষমতার দম্ভে নিজের ত্রিপাদভূমির দাবিতে পা ফেলেছে আর সেই একটিমাত্র পদক্ষেপে মুক্তি জুটেছে দুনিয়ার সব পরাধীন মানুষের, এমন কি কলকাতারও, এমন-কি কলকাতার এই কবিতা-তাড়িত যুবাটিরও। মুক্তির সেই টানে সেই যুবার বাঁকা কথা সোজা হয়ে গেছে, সেই যুবার আত্মশ্লেষ বদলে গেছে আত্মগৌরবে, কখনো মীড়ে কখনো গমকে নিজেকে ভালোবাসার কথা উচ্চারিত হয়ে যায়—এমন ভালোবাসা যাতে মিলে-মিশে যায় দেশ, শ্রেণী ও ব্যক্তি, রূপকথা ও ইতিহাস, পুরাণ ও বর্তমান, সোভিয়েত শহরে খার্কভের অবিনশ্বর প্রতিরোধ,

> অবকাশ কণ্ঠরোধ করে
> প্রেমের আবেশে দিশাহারা

জীবনের চরম বিশ্বাসে
সম্পূর্ণ আমারই নিঃশ্বাসে।

('খার্কভ', 'সাত ভাই চম্পা')

আর, এই দেশ, এই বাংলার বহু-বিড়ম্বিত আত্মপরিচয়ের বেদনা,

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুল-রাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র শত নদী হয় পার!

ঘোচাও চম্পা, তুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ্ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ।

('সাত ভাই চম্পা', 'সাত ভাই চম্পা')

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর উপমায় বিষ্ণু দে তাঁর দেশ-কে আবিষ্কার করেছিলেন। সেই দেশ-আবিষ্কার আর কবিত্বের আত্ম-আবিষ্কার একই উদ্বোধনে ঘটেছিল। সেই উদ্বোধন তাঁর জীবনব্যাপী কবিতাকর্মে কখনোই আর ভোলা গেল না। যায়ও না হয়তো। আমাদের বাংলা কবিতার আধুনিকতার মাত্র শ-খানেক বৎসরের ইতিহাসে এই তো হল নির্ঝরের দ্বিতীয় স্বপ্নভঙ্গ। সমুদ্রমুখী সেই নির্ঝরের কী প্রবল নদীতে রূপান্তর ৪০ থেকে ৪৬-এর মাত্র কটি বৎসরে। 'মৌভোগ' বার্ষিক-সম্মেলনে গৃহীত তেভাগার প্রস্তাবেরও কবিতায় কবিতায় উৎসারণ,

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান

সন্দ্বীপের চরের শাহদ লালমোহন সেন হয়ে ওঠেন শতমুখ নদীখাড়ির এই দেশের সমুদ্রান্ত প্রহরী, সেই মানবিকে প্রকৃতিও কি করুণ তুচ্ছ, আর শ্রেণীর জাগরণ কী প্রবল মানবিক প্রাকৃতিক,

ঘৃণার সমুদ্র নীল নীল জল আকণ্ঠ ঘৃণায়
নিশ্চিহ্ন সবুজ, লাল, হরিতের নয়নাভিরাম
শুধু নীল নীল অবিরাম নীল ঘৃণা সমুদ্রের মেঘনার
সরীসৃপ নীল

('সন্দ্বীপের চর', 'সন্দ্বীপের চর')

পাঁচ

যদি এই পর্যন্তই হতো বিষ্ণু দে-র আবিষ্কার, সেও তো হয়ে থাকতো আমাদের নন্দন-সৃষ্টির ইতিহাসে অতুলনীয়। এ তো বাংলা কবিতার গৌরব যে দেশকে সম্পূর্ণ ভুলে এ-কবিতার আধুনিক ধারা গড়ে ওঠে নি। ব্যক্তি আর দেশে গতায়াত ছিল এমন-কি লিরিকের আত্মসর্বস্ব রোম্যান্টিকতাতেও। কিন্তু সেখানেও দেশ তো হয়ে থাকত ব্যক্তির দুঃখ-হর্ষেরই আধারমাত্র। বিষ্ণু দে-ই আমাদের ভাষার সেই আত্মসচেতন নৈর্ব্যক্তিকতার প্রথম ও প্রধান কবি, যাঁর দেশ, শ্রেণী ও আত্ম-আবিষ্কারের ভেতরে আধার-আধেয়ের কোনো ভেদ নেই।

এমনই অখণ্ডতায় যাঁর কবিতার হয়ে ওঠা, তাঁর কবিতার মূল ভূমিই তো ধ্বংস হয়ে যায় যখন ভেদ উঠে আসে কবিতার, দেশের, শ্রেণীরই ভেতর থেকে। চল্লিশের দশকের শেষে আর ষাটের দশকের গোড়ায় মাত্র দেড় দশকে দু-দুবার বিষ্ণু দে-কে এই সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে—কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত কর্মসূচির ফলে আর চীন-সোভিয়েত মতানৈক্যে। যিনি আমাদের চৈতন্যের মার্ক্সবাদী বিপ্লবের কবি, তিনি এই দুই সংকটের মধ্য দিয়েও সেই চৈতন্যের শুদ্ধতাকেই রক্ষা করে যাচ্ছেন—কখনো নিজের অন্বেষণের একাকীত্ব থেকে সমষ্টিকে বেদনামথিত আহ্বান করে ('অন্বিষ্ট'), কখনো-বা আত্মহননের সমবায়ে বাঁচার করুণ প্রার্থনায় ('জল দাও'), আবার কখনো উপায়হীন তৎপরতার ব্যর্থতায় ('এল্‌সিনোরে'), কখনো উপমেয়ের আকুল সন্ধানে ('শালভদ্র পঞ্চমুখ'), কখনো আবার 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর নতুন ভাষ্যগর্ভ সমাবেশে।

কোনো কবিকেই পর্যায়ভাগ করা যায় না—তাতে আমাদের বোঝার একটু সুবিধে হয় মাত্র। 'পূর্বলেখ' থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র কবিতার যে প্রবল উত্তালতা, তা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'আলেখ্য' থেকে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ অবকাশময় অবলোকনের সুযোগে অভিজ্ঞতা আর দর্শনকে মেলানোর চেষ্টা করে যায়। বড় বেশিবার আসে মাত্র পঞ্চাশেও না-পৌঁছনো বা সবে-পৌঁছনো কবির প্রৌঢ়ি বা বার্ধক্যের কথা। এই অবলোকন আর মননের ভূমিকায় কবি যেন নিজেকে সাব্যস্ত করতে চান। মনে হয়, 'পূর্বলেখ' 'সাত ভাই চম্পা'-র 'আমরা', 'অন্বিষ্ট'-র 'আমি' হয়ে, 'আলেখ্য' আর 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ 'তোমরা' হয়ে যায়। তারপরে আবারও, 'সেই অন্ধকার চাই'

থেকে ট্রাজেডির একক উক্তির নির্বেদে অপসৃত হতে হয় যেন ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসে, অনিবার্য সেই পরম ঐক্যের অপেক্ষায় আপাতত মৌনে।

ট্রাজেডির নায়কের এই অজ্ঞাতবাস 'অন্বিষ্ট'-তেই তো বিষ্ণু দে-র কবি-জীবন। যেমন একাকী শোনায় প্রবল কোরাসের একক স্মরণ, তেমনি নিঃসঙ্গতায় একাকীত্বের চিরন্তন নায়ক হ্যামলেটের স্বগতোক্তির প্রতিধ্বনিতে এলসিনোর-দিনেমারের পরিপ্রেক্ষিত,

পিশাচেরা আর পিশাচসিদ্ধ দলে উদ্বায়ু সন্ত্রাসে
ছেয়ে গেল দেশ ..
এই প্রেতলোক ভাঙতে তো হবে স্বপ্নের হলাহলে

সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল
('এলসিনোরে', 'অন্বিষ্ট')

বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, বিষাদ, স্মৃতি—বাংলা কবিতায় সমৃদ্ধ অনুষঙ্গে, উপমায়-উৎপ্রেক্ষায় বড় কঠিন স্পর্শগ্রাহ্যতা পেয়ে গেছে। 'অন্বিষ্ট'-তে এ-সবই আছে, কিন্তু সে-বিষাদ আর স্মৃতি বারে বারে টেনে নিয়ে যায় সমগ্রে, সমষ্টিতে, ঐক্যে, যেন কর্ডেলিয়ার, কন্যার, মৃতদেহ থেকে চোখ তুলে লিয়ার জনসমাজের দিকে তাকান আর গলা থেকে উৎসারিত হয়, পিতার স্বগত খেদ, নাকি সমব্যথীর সমবেত আহ্বান,

আর তুমি—তুমিই কি মরণের কূট-ভ্রূকুটিতে
পায়ের ধুলায় পড়ে? বরণীয় তনু হিমপ্রাণ—
হীন প্রাণহীন পড়ে পথের ধুলায় পড়ে রক্তময় বসন্তের প্রাণ?
এ কিবা সূর্যাস্ত শেষ কোন সূর্যোদয়ে?
ওড়াও উর্মিল বীজকম্প্র হাহাকার, স্মৃতি
পাতো মর্মে মর্মে ভিতে ঘনিষ্ঠ সংবিতে
তোমার নিথর দেহ প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী!
সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে সূর্যে পরাক্রান্ত গান।
('অন্বিষ্ট', 'অন্বিষ্ট')

মার্ক্সবাদী চৈতন্যের এই কবির স্বরে বারবারই তো এসে গেল, সেই 'অন্বিষ্ট'-তে ও পরে, আবার তাঁর সাম্প্রতিকে, এই ট্রাজেডির নির্বাসিত নায়কের মহৎ বিষণ্ণতা আর অপূর্ব প্রণয়-ভালোবাসা

আমার যাত্রার পিছু দীর্ঘ পটভূমি
আমার সম্মুখে
তুমি।

...

আমি তো তোমায় বহুদিন চিনি,
তুমি জানো না কো আছি
তোমার হাওয়ায় শ্বাস টেনে কাছাকাছি।

..

তুমি জানো না কো তোমার পাশের কে সে
হাওয়ার মতন তোমাকে রয়েছে ঘিরে,
তুমি যাও ঘরে, বাথানের মাঠে কিংবা নদীর তীরে
পাশে পাশে চলে আলোর মতন
হাওয়ার মতন মেঘের মতন ভেসে
তোমার না-জানা সহচর, দিন গোণে
কবে যে জাগাবে জনতা কিংবা খুশি হয়, নির্জনে।

('অম্বিষ্ট', 'অম্বিষ্ট')

ছয়

রিনাসান্সের যে-আবহে, আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, ইতিহাস থেকে পুরাণের কালে—কালের এই প্রবাহে, আর নগর থেকে গ্রাম থেকে দেশ, মহাদেশ, ভূমণ্ডল ও সৌরজগতের স্থান বিস্তারে—স্থানের এই স্থাপত্যে নিজেকে সমগ্রের সঙ্গে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয়, মানবিক-মানবেতর-অধিমানবিক থেকে উপমেয় উপমান সংগ্রহে সাধ যায়, নিজের দেশকালধৃত মানব নিয়তির সঙ্কীর্ণতাকে তুচ্ছ করে দিতে জোর আসে -মানবমনীষায় ও উপলব্ধিতে তার পরম উপমা দান্তে—সেই আবহের মিলে, আমাদের এই শতাব্দীর প্রায়-রিনাসান্সের কবি বিষ্ণু দে-র প্রসঙ্গে বারবারই মনে আসে আমাদের আরেক খণ্ডিত রিনাসান্সের কবি মধুসূদনকে।

তাঁরও তো ছিল সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত থেকে আহরিত প্রসঙ্গ-প্রকরণের বৈভব। তাঁরও তো ছিল যা-কিছু মানবিক তাই-ই আমার, উত্তরাধিকারের এই চেতনা। দেবতাদের স্বর্গলোক থেকে গহন নরকে তাঁরও তো ছিল

চংক্রমণ রূপকের উপমার খোঁজে। 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'—নিজের কাছে এই তো ছিল তাঁরও শপথ।

তারপর তাঁরও তো এক উপায়হীন ট্রাজেডির বীরত্ব! কলোনির ক্লিন্নতা, আর কর্মের ব্যর্থতা থেকে তো মহাগীত উত্থিত হয় না, বীরত্বও সঞ্চারিত হয় না। তাই, স্বর্ণলঙ্কার ধ্বংস হয়ে ওঠে মহাগীতের 'ফিনাল', বীরত্ব শেষ হয় রাবণের বিষাদে। নিষ্কাম কর্মের বাধ্যতায় রাবণের সম্মতিহীন যুদ্ধযাত্রা। যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে রাবণের নির্বাসনভূমি।

মধুসূদনের কবিকল্পনারও তো এই একই পরাক্রম—'বীরাঙ্গনা'-য় আবার চলে বাইরের কর্মভূমির নেপথ্যে দৈনন্দিনের ব্রতে, ভালোবাসার অন্তর্সংগ্রামে বীরত্বের সেই মহাগীতের পুনর্সন্ধান। আবার, নদীতীরে দ্বাদশ শিবমন্দিরে, কপোতাক্ষ নদে, বটবৃক্ষে বা, বিস্মৃত পল্লীর আর-কোনো অনুষঙ্গে আমাদের বেঁচে থাকার বীরত্বের উপমার খোঁজাখুঁজি।

মধুসূদনের টেকনিকেরও এই একই প্রবল সন্ধান। উপমার পর উপমায় এপিকের দ্বার থেকে দ্বার খুলে যায় দেশ-কালে লেগে যায় কবিতার দেশকালহীন মাত্রা, পুরাণ থেকে চরিত্ররা নেমে আসে নতুন অনুষঙ্গে, দৈনন্দিন থেকে ঘটনা চলে যায় পৌরাণিকে।

আর, মধুসূদনের কবিতারও তো এই একই সমস্যা, পাঠের, স্মৃতির, অর্থবোধের। ইতিহাসের একটি বিশেষ লগ্নকে কবিতায় রূপান্তরণের দায়ে আমাদের এই জাতীয় কবির ট্রাজেডির হাহাকারেও যে মীড় লাগে কলোনির জীবনের আয়রনির আর উপমার দৈবনির্মাণে লেগে যায় পরাধীনতার মানবিক দুর্ভাগ্য।

এ-ও হয়তো মানব-সভ্যতারই বদলা! সাম্রাজ্যবাদ ও মানুষের ইতিহাস নয়, প্রাক্‌-ইতিহাস। মানবিক ইতিহাসের সেই ব্যত্যয়ে আমাদের বাংলার মতো ছোট্ট একটি ভাষা ও জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে মানবমহিমার এমন কবিতা উৎসারিত হয়—যার তুলনা দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বিশ্বসাহিত্য-ই। তাই কলোনির প্রায়-রিনাসান্সের ট্রাজেডির পর উল্লসিত উৎসারিত হয় রাবীন্দ্রিক মানবিক পরম প্রয়াস, 'প্রতিদিন রূপের রচনা', 'নিরন্তর সুন্দরের ধ্যানের উন্মেষ', 'নিরলস জ্ঞানের নিয়ম', 'কঠিন শিক্ষার শ্রম',

> বুদ্ধির নির্ভয় শুভ্র আলোকে আলোকে,
> আত্মস্বের শুদ্ধতায় শুদ্ধ অন্ধকারে
> শূন্যে শূন্যে ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে দীপ্ত গীতে

চৈতন্যের জ্যোতিষ্কে জ্যোৎস্নায়
উদ্ভাসিত সুদীর্ঘ জীবন

আর, মধুসূদন থেকে প্রায় সম্পূর্ণই বিশিষ্ট এই রাবীন্দ্রিক-নন্দনের দীর্ঘ শতাব্দী শেষে, আর-এক নন্দনে ধৃত বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ জীবনের কঠিন কাব্যপ্রয়াসে মূর্তিলাভ করে যুদ্ধ মন্বন্তর-শ্রেণীসংগ্রামের রক্তাক্ত আধুনিকতার এই আমাদের দেশ, বাংলা-ভারতবর্ষ ও এই আমাদের গ্রহ স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক।

আমাদের কর্মের সিদ্ধি যখন চৈতন্যের সিদ্ধিতে মিলবে সেই অনিবার্য আগামীর জন্য বাংলার এই কবিতা সঞ্চিত হয়ে থাকল। আরো সঞ্চিত হয়ে উঠছে। উঠুক।

সত্তা-সংকট, আগে-পরে জিজ্ঞাসা

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কবিতা প্রসঙ্গে

সিদ্ধেশ্বর সেন

কম বা বেশি, আমরা যে যার যে ভাবেই নিতে চাই বা পারি না কেন আমাদের মানসের প্রগতিতে, স্বদেশ ও বিশ্বের এক কঠিন, জটিল, পরস্পরবিরোধী আবার অন্তর্সম্পর্কিত, নিত্য সংঘাত ও রূপান্তরশীল অথচ পারম্পর্য-ধরা বাস্তবতাটিকে, তখন তা চেতনার বাস্তবতাই—আত্মসচেতনতাই যাকে বিষ্ণু দে বলেন, টেকনিকেরও সচেতনতা সমেত, পাঁচ দশকব্যাপী তাঁর কবিকর্মের স্রোতোৎসার ধারায় আমরা তা পেয়ে যাই বৈকি।

'নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক', তাহলেও—'একই হাতে কি দুর্জয় ভাঙা ও ভাসিয়ে যাওয়া তুলে তুলে পলির প্রান্তর' ('অন্বিষ্ট')। এবং ফের, যখন ঘর ছেড়ে দেশ খোঁজার 'হয়তো-বা যন্ত্রণাই সার' পর্বে উজ্জীবনের আশায় 'জল দাও' কবিতায়: 'শিরায়-শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে / অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির / অনিবার্য যতির স্তব্ধতা / শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে / কবিতার ছন্দের মতন / কিংবা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে…' শুনি, তখন কবি কি চিনিয়ে দিচ্ছেন না আমাদের তাঁর তন্নিষ্ঠ শিল্পরূপের, ছন্দোময়তার কিছুটাও রহস্য, যা চলতি জীবনের কথ্যস্পন্দকে ধরেই এক ক্লাসিক সংহতির অন্বেষা।

এ হয়তো চারপাশের খণ্ডিত ইতিহাসের জমিয়ে-তোলা বিশৃঙ্খলা থেকে এক শৃঙ্খলায়, মনন ও আবেগের সংহতিতে পৌঁছনোরই অভিপ্রায়; আর সে যাওয়াও হয় একই হাতে 'ভাঙা ও ভাসিয়ে যাওয়া', তবুও তাই কি 'একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ান্বিত ক্ষণে সাম্প্রতিক / অতীত ও আগামীর গান' নয়?

নয় কি 'তুমি রাখো চোখ দুটি একান্তিক, যুগান্তের কখন কি কল্পে / শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা, সাবালক, মানবিক, মানুষের আপন স্বভাবে'; তবু সেই…'মানুষের আপন স্বভাবে' সুপ্রতিষ্ঠা সেও তো এক তীব্র দ্বন্দ্ব-সংগতির প্রক্রিয়ারই ফলশ্রুতি হয়ে আসে, যদিবা যখনি আসে।

'অন্বিষ্ট' কবিতায় আমরা আরও-ই পেয়ে যাই এই কবির দীর্ঘায়ত পরিক্রমার অভিমুখিনতা, যেখানে 'আমার যাত্রার পথ দীর্ঘ ও ভঙ্গুর / সভ্যতার বহুদূর ঘিরে…', যখন থেকে যায় 'পিছনে নরকযাত্রা, দীর্ঘ পটভূমি / নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে ..' এবং 'গ্রাম-গ্রামান্তের লোক যদি কেউ শিল্পের বিষাদ / ভেঙে দেয়…', তবে 'নশ্বরের অমর প্রত্যাশা দুই চোখে' কবিও জেনে যান:

অন্বিষ্টের অমর পাথেয়

খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ, মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে।

তাই, বন্ধুদের এক ঘরোয়াতে, সেদিন, বিষ্ণু দে-র স্বকণ্ঠে, ই-পি রেকর্ডে, 'অন্বিষ্ট' কবিতার অংশত পাঠ শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, স্বাভাবিক প্রত্যাশাতেই, যদি এমন হতো যে আমরা অনুরূপভাবে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এরও কবিকণ্ঠকৃত পাঠটিও পেতাম বা এখনও পাই। আমার মনে হয় কবির নিজস্ব পাঠের ধরনটিও, সেই কথ্যচালের দ্যোতনাতেই, যেন তাঁর কাব্যের অন্তঃসারকে আরও বেশি অর্থময়তায় মেলে দিতে পারে, আর-এক মাত্রায়।

পরে কবি-সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুরারোপে—আবৃত্তি ও সুরে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর টেপটি আবার শুনে,

রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্য আকাশ

এই নিত্য অপঘাত দূর করো…

অংশটি মনের মধ্যে চারিয়ে গেলে, বিশেষ করে স্বরের বিশিষ্টতায় 'হে চৈতন্য আ-কাশ' সঞ্চারিত হয়ে গেলে, মনে হয় কবি কোনো গ্লানির পীড়নে মুক্তির শুদ্ধতায় অপার আর্তিতে এই প্রার্থনাময় আকুতির পঙ্‌ক্তি কটি রচনা করেছিলেন; তবে কী সেই গ্লানি?

এই গ্লানির কথা, এই আর্তি তো ঘুরে-ফিরেই আসে, আগে-পরে, যেমন 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর নাম-কবিতাতেই 'ধুয়ে দাও এই গ্লানি …..', এবং 'বারমাস্যা'য়, আর এক স্তরে, তার সমাধানও খোঁজেন ব্যষ্টির সমগ্রস স্ফূরণের তাগিদেই সাযুজ্য সন্ধানে: 'ব্যক্তির স্বরূপে ডুবি, ডুবি গুরু সমষ্টির হাঁকে, / সাযুজ্যের ডাক শুনি উন্মোচিত উর্মিল গাজনে';

কেননা অনেক আগেই যে জানা হয়ে গেছে এই 'হয়তো বা নিরুপায়' সত্য, 'হয়তো-বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস / বালিচড়া মরানদী জলহীন…' ('জল দাও')।

এই-ই তবে যুগব্যাপী সেই শ্রেণী-বিভক্তির সমাজের, আর আমাদের নির্দিষ্ট বাস্তবতায়, দুশো বছরের পরবশতার—বিদেশী ঔপনিবেশিকতার জগদ্দলের তলায়, বিড়ম্বিত মধ্যবিত্তের এক খণ্ডিত রেনেসাঁস সত্ত্বেও দ্বান্দ্বিকেরই নিয়মে—জমে-ওঠা বিচ্ছিন্নতার ট্র্যাজিক অস্তিত্ব, বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা ও গ্লানি, যার জের অন্যন্তরে রাজনৈতিক স্বয়ম্বশ স্বাধীনতার কতখানি স্বদেশী নিয়ন্তাদের শ্রেণীগত চারিত্রিক ডামাডোলের সুবাদে, আজও যা চলে বা অন্য প্রসঙ্গে আর-এক তীব্রতাই পায়।

'টাইরেসিয়স'-এর উক্তিতে, তাই আমরা আগেই জেনে গেছি: 'আমার দুচোখ অন্ধ অতীত ও ভবিষ্যৎ স্মৃতি শ্রুতি / তোমার উলঙ্গ রূপ তাই দেখি রোজ / তুমি তো দেখনি দেশ…'।

দুই

আমরা ক্রমেই সন্নিহিত হয়ে আসি, এই পরম্পরায়, শুধু বিষ্ণু দে-রই নয়, রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতারই এক তুঙ্গ মুহূর্তে তখন –'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ।

আমরা জেনে নিয়েছি তাঁর কবিতার, দীর্ঘ কবিতার বিশেষত, প্রসঙ্গ-প্রকরণের অন্তর্লীন পরতে পরতে মানবিক জিজ্ঞাসারই উচ্চাবচ স্তরন্যাস, সরলরৈখিক তো নয়ই বরঞ্চ বহুকৌণিক, সেই নির্মিতি। যে টেনশন বা আর্তি পদ্যবন্ধ ও বাক্যবিস্তারে 'সৎ পদ্যে হাতের-পায়ের উভয়ত বলিষ্ঠতার একটি অপরিহার্য গুণ' বলে কবি, অন্যতর প্রসঙ্গে জানান, তা তো এভাবেই এখানে বর্তাল।

কবিকে আভাসিত করতে হয় ব্যস্ত জীবনেরই পটে, তার সমগ্রার্থে—'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' এই দীর্ঘ কবিতাটিতে এখন, সত্তা-সংকটের উত্তরণেরই সমস্যা—রবীন্দ্রনাথের গল্পের আশ্চর্য রূপকে এ সেই 'বর', সত্তার অবৈকল্যেরই অভিলাষ ও অভীপ্সা—দুই ই, অনন্বয়ের অনন্বয়ে, বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা পেরিয়ে কবিতাটির চূড়ান্তে পৌঁছে 'বরকনে'-তে অন্বিত হয়ে ওঠার প্রতীক্ষায়।

কবি এ সূত্রটিকেই আবার উন্মোচিত করে দেন সেই সত্তা অন্বেষণেরই পর্বে যখন তিনি বলেন:

এ উপমা বহুমুখ, স্তরে স্তরে প্রয়োগে সরল
ব্যক্তিতে, সমাজে, দেশে......

বিচ্ছিন্নতার বৈকল্যে বর্তমানের জীবনের অসংগতির গ্লানির জটিল রূপাভাসের গরজেই আধুনিক কবিকে নিতে হল মুখচ্ছদ, সেই নৈর্ব্যক্তিকতার। এলিয়ট তো এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, কবিতা হবে 'ব্যক্তিত্বের মুক্তির বাহন', এই নৈর্ব্যক্তিকতায় কবিতা 'আবেগগত অভিজ্ঞতানিচয়ের সংগঠনে' আর-একটি মাত্রা পায়। সেই 'ইমপার্সন্যাল' বা 'ডি-পার্সনোলাইজড' কবিতায় এসে পড়ে কুশীলব, চরিত্রপাত। কবি ও পার্সোনা। কবিতাটি তখন আর কবির নিছক ব্যক্তিগত নয়, কবি-সৃষ্ট কবিতাটিরই সমন্বিত স্বর তখন আমরা শুনতে পাব। কবির তো পাব, তবে সে ভিন্নস্তরে। এই দ্বি-ঘাততলে কবিতাটি তার উন্মোচন ঘটায়, অনেকান্ত তাৎপর্যে।

'ইমপার্সন্যাল' কবিতা অনন্বয়েরও—'নিখিল নাস্তি'র যেমন সুধীন্দ্রনাথে। আবার প্রখর আত্ম-সজাগতায়, চারপাশের মানুষ-প্রকৃতি পরিবেশ সমাজ ও সম সময়ের প্রতি সচেতন দায়বোধে নেতির নেতিতে চলে, দ্বান্দ্বিকে, যেমন বিষ্ণু দে-তে। কবির 'ইনডিভিডুয়ালিটি'র হের-ফেরে তা অস্তিত্বের যন্ত্রণাময় বিষাদের মধ্য দিয়ে যায়।

'স্মৃতি-সত্তা'র বিষাদময় স্মৃতি—'ভবিষ্যৎ'-এর সমগ্রতায় অন্বিত হবার আগে, তাই চলে যায় আমাদের ইতিহাসের বহুদূর-সুদূর ব্যাপ্ত অতীতে—ঐতিহ্যচেতনারই সাক্ষ্যে—আমরা পাই সেই আদি মহীদাসকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় উপনিষদের উদ্গাতা ইতরার সন্তান—ঋষিপুত্র হয়েও পিতৃ-অবজ্ঞাত—কিন্তু মাতার প্রার্থনায় কুলদেবতা ভূমির বরে বৈদিক সূক্ত-নিচয় যার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাই 'স্মৃতি হানে আদি মহীদাস।' কিন্তু এই স্মৃতি 'উদাস বিষাদ' কেন? ইতিহাস-সংঘাতে এই কণ্টিত বর্তমানে এসে?

দীর্ঘায়ত, দু-শতাধিক পংক্তির এ-কবিতাটির শেষ পর্বের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কবির স্বগতোক্তিতে আমরা সেই আর্তি জেনে নিই:

দেশ, ভাবো, সুজলা সুফলা এই মলয়শীতলা মাতা দেশ,
ছিন্নভিন্ন, অথচ প্রাচীন পরিচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী
প্রজ্ঞায় সংহত স্মৃতির শিকড়ে ধন্য কালের বাগানে।
অথচ বিচ্ছিন্ন ছারখার, হাজার দাগায় আহত বিকল
যেনবা দেহের সব আছে,...

তবু—

শুধু স্নায়ু স্নায়ুকোষ,

অতৃপ্ত, অসুস্থ, কাটা, পঙ্গু শত শত স্নায়ু, স্নায়ুকোষ,

তাই আমাদের মনে, বাস্তব জীবনে কবন্ধের ছড়াছড়ি...

বর্তমানের বাস্তবতার নানারূপী কবন্ধ-অস্তিত্বই সেই চিত্তগত গ্লানি ও যন্ত্রণাকে উন্মথিত করে।

ফিরে আসি আবার কবিতাটির সূচনায় 'ভূমিদাস স্মৃতির যন্ত্রণা'য়, যদিও স্থির জেনেছি, তারই পরের পংক্তিতে, 'আমাদের চৈতন্যে আকাশ'।

কিন্তু, এই জানা কী বেদনাবহ জানা! এখনও তো স্বদেশীয় অনেক পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথ-গ্রন্থি পড়ে আছে বহু শতাব্দার—যা পার হয়ে আমাদের চৈতন্যের মুক্তিতে যেতে হয়।

সমগ্র দীর্ঘ কবিতাটিই টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই দীর্ঘ জটিল-কুটিল, আত্মধা অথচ তা থেকে নিয়ত পরিত্রাণ প্রত্যাশী স্বদেশ ও বিশ্বের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির সত্তা-স্বরূপের অন্বেষণেরই ভূমিতে।

কবিতাটির অবয়বগত ঘনসন্নিবদ্ধ প্যাটার্নটি নির্মিতির মধ্যে আমরা বিভিন্ন পর্বগত মুভমেন্ট বা চলনগুলিকে প্রতিন্যাসে, বৈপরীত্যে স্থাপিত দেখতে পাই। এ যেন সেই বিপরীতেরই ঐক্য খুঁজে নেওয়া—প্রতীত্যসমুৎপাদে—অপর তৃতীয় দ্বন্দ্বসমন্বয়টির উদ্ভব চেয়ে। আর এই সমগ্র অবয়বগত উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে আমরা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের গতায়াত জেনে নিই।

Burnt Norton-এ টি. এস. এলিয়ট 'Time Present and time past/ Are both perhaps present in time future/And time future present in time past'-এর কথা বলেন। কিন্তু তাতে সময়কে তিনি 'Neither from nor towards, at the still point'-এর নৃত্য-প্রতিমাতেই ধরে রাখেন। সময়ের গতি ওই স্থির-বিন্দুতেই উদ্দীপিত ও স্তব্ধ হয়ে যায়।

একদা এলিয়ট-উৎসাহী তরুণ বিষ্ণু দে কিন্তু সরে আসেন পরবর্তী ঘাত-প্রতিঘাতে মার্কসীয় অঙ্গীকারে, তাঁকে যা ইতিহাস-সময়ের দ্বান্দ্বিক উদ্বর্তন গতির নান্দনিক বোধে নিয়ে আসে; তাই এল উত্তরণের দিশা—বাস্তবের কুৎসিত বিকারকে ঘৃণা হানতে চেয়ে:

মৃত্যু তার নখরে বটে অর্থহীনতায় অসহ,

আকস্মিক, জয়ও তাই চাই।...

প্রারম্ভ থেকেই কবিতাটিতে নানান স্বর ও চরিত্রপাত। সত্তা-সংকটের জিজ্ঞাসায় আমাদের সদ্যঅতীতের কলোনিয়াল বিড়ম্বনা ও আজকের অর্ধোন্নত দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক গোঁজামিলই তো প্রকট। 'নানা অবান্তর নানা শিকারী-শিকার'-এ। বৈষম্য ও দ্বন্দ্বের পটভূমিও এসে গেল। চরিত্রগুলি সেখানে আনাগোনা করে।

স্মৃতিঋদ্ধ প্রাজ্ঞ কবি-চৈতন্যের সম্বোধনোক্তি স্তবকবদ্ধ প্রথম চতুষ্টয়ে :

তোমরা নবীন, আনাগোনা
কালান্তরে বাঁধে কি চেতনা ?…

—এ কী নতুন প্রজন্মের প্রতি প্রবীন কবির সম্বোধন, যা দীর্ঘ কবিতাটির ভূমিকা রচনা করেছে ? আমরা পরে যেন আভাস পেয়ে যাই এ শুধু সাধারণ-ভাবে নবীন প্রজন্মের কাছেই নয়, তাদেরই প্রতিনিধিস্থানীয় দুটি চরিত্রেরই উদ্দেশে—যে যুগের পরিচয় আমরা পেয়ে যাই রাজার মেয়ে—রাজার ছেলে'র রূপকথায়, যারা আসলে আমাদেরই সমসাময়িক, কিন্তু জেনে গেছে আজকের অসংগতির 'রাজ্যপাটে কিছুই নয় তারা আজ'। রাজার ছেলে মিছিলে যায়, রাজার মেয়ে 'ধর্মঘটে গৌরবে হৃদয় মেলে দেয়' আর আরও :

এরা যে ভালোবাসে, তাই তো ঘৃণাতে
আগুনে জ্বালে দেহ মন।
এদের অভাবের অগ্নিবীণাতে
জীবন পেল যৌবন।

এরাই কি আবার সেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের 'আশ্চর্য রূপকে'র পাত্রপাত্রী—সেই 'বরকনে'—সত্তার আত্মপরিচয়ই যেখানে অভীপ্সিত ? এরাই কি সুদীর্ঘ কবিতাটির পর্বান্তরগুলির মধ্যে সংযোজকের কাজ করে যায় ?

স্বগতোক্তি, সম্বোধনোক্তি, চরিত্রপাত ও বাস্তবতার গভীর অনুভবজাত সচেতন দায়বোধে কবিতাটি দীপ্ত গরিমা পায়। কবিতা পেল নাট্যেরও মাত্রা। বিভিন্ন পর্বে স্বরক্ষেপের তারতম্যে ছন্দও অক্ষরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্তের মিশ্র বুননি পেল। আর চলিত জীবনের ভাষার কথ্যস্পন্দের সজীবতাও কখনই ক্ষুণ্ণ হলো না।

গোটা কবিতাটিতে দুবার কবি আনলেন আবেগোন্নত 'ইনভোকেশন'-এর স্বর, 'মার্কসইজম্ অ্যাণ্ড পোয়েট্রি'-তে জর্জ টমসন সম্ভবত কবিতার যে 'হাইটেন্‌ড স্পীচে'র কথা বলেন :

রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্য আকাশ
এই নিত্য অপঘাত দূর করো ··

ঠিক এর অব্যবহিত আগের যে অংশটি থেকেই এই প্রার্থনাময়তা জেগে উঠতে পারে, সেটি হলো :

আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার
আর অন্যদিকে নাটুকে প্রলাপ নির্বোধ নিষ্ঠুর অমানুষিক অভদ্র।
কে দেবে ধিক্কার কাকে আঠারো তলায়
সারাদেশে চতুর্দিকে যত অবান্তর
উন্মাদ বিলাসী খেলা!

আর একবার, 'যেখানে রয়েছি আজ সে কোনও গ্রামও নয়, শহরও তো নয়' নরক-দর্শনের পর, যেখানে 'চৈতন্যেও মড়ক' লাগে এবং এমনকি যা 'নরকেও ব্যঙ্গ চিত্র, মৃত্যুরও বিকার' বলে মনে হয়, কবির প্রার্থনা তখন যন্ত্রণাবিদ্ধ আর্ত :

নরকের দাহ দাও নরকের আত্মগ্লানি হে যম জীবন
অশ্রু দাও প্রাসাদে প্রাসাদে বসতিতে লজ্জার মজ্জায় অবশ দে
যন্ত্রণার বাণী দাও মর্মে দাও সজল শিকড় ফুলে ফলে শাখায় পল্লবে
রূপান্তরে প্রাণ দাও স্বভাবের। ক্রোধে ক্ষুব্ধ
চৈতন্যের ক্ষুরধার ক্ষিপ্র প্রতিবাদে স্পষ্টবাক্...

তবু এর পরের পর্বেই সেই স্বপ্ন দেখাও এসে যায় :

ধ্যান আর বাস্তবের খেয়া পারাপারে
সম্মিলিত একদলে
আদিগন্ত মাঠে ট্রাক্টরের দীর্ঘ অভিসারে
মাটির যেমন ক্লান্তি আসন্ন ফসলে
সেই ক্লান্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মহাশয়··

এ কী স্বপ্নমগ্ন চোখে এক 'সাম্যের সখ্যের মহাদেশে যৌথ শ্রমের ক্লান্তিহীন উৎসবের সামাজিক অন্বয়েরই স্বপ্ন! জ্ঞানে ও বাস্তবে এক বিন্যস্ত জীবনে কর্মে ক্লান্তি নেই, আমরা সবাই ওরে ভাই / চাই সেই ক্লান্ত অবসর'—দীর্ঘায়ত পয়ারে গেঁথে বলা স্বপ্ন!

পর্বান্তরে আবার এলো বৈপরীত্য। স্বপ্ন নয়, ক্রূর, কঠিন অসঙ্গত বাস্তব-ই—রবীন্দ্রনাথের গল্পের রূপকে—সেই অদ্ভুত বরসভার ছবি আঁকেন আধুনিক কবি : যেখানে বিবাহের সব আয়োজনই সম্পূর্ণ—ভিয়েনে আগুন, দেউড়িতে

সানাই, বাতাস ভরপুর করে বিশ্বব্যাপ্ত শুদ্ধ সুর ..পাত্রীরও বুক দুরু দুরু, এয়োদের পানারাঙা মুখে হুলুধ্বনি, শিশুদের ছুটোছুটি সবই—শুধু বর নেই!

এমনকি বরযাত্রী, তারাও হাজির, আর তারাও সব বরযাত্রী তা-ও তো নয়—

ওই ভিড়ে আছে চোর, জুয়াচোর, গণ্যমান্য অথবা নগণ্য,
ভিখারীও নানান রকম, কেউ বাবু, কেউ বা সাহেব,
আত্মার দুয়ারে ·
দেহে মনে প্রাণে দুস্থ ··

তাহলে আর এই ঘোর সামাজিক দুর্গতির ঘেরাটোপে আমরা কী করে পেতে পারি তাকে, সে, সেই যে :

বর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয়
মাঠে গঞ্জে শহরে বন্দরে খোঁজে সে আপন সত্তা, সনাক্তিকরণ
দশের দর্শনে সমাজের আতশী কলমে
পায় না আপন সত্তা, যা শুধু ফুলের মতো
ফুটে ওঠে রৌদ্রজলে ছায়ায় মাটিতে
শিকড়ের শাখার পাতার প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রায়,
সত্তা যার নিহিত মাটিতে রৌদ্রেজলে শিকড়ে শাখায়...

যে নিজে খুঁজে ফিরছে 'সত্তা আত্মপরিচয়', খুঁজেছে 'আপন সত্তা, সনাক্তিকরণ', সেই 'বর' নিজেই আবার সত্তা-ও।

তারই বেদনায় কবির স্বরও কি দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে এল না :

তাই আত্মপরিচয় নেই, ব্যক্তি নেই সত্তা নেই,
লালনীলকমলের দেশে আজ বর নেই,
বিধবার দেশে অবক্ষণীয়ার সুন্দরীর বর নেই, সত্তা নেই···

সত্তার সংকটের প্রশ্নটিকে—'যে সত্তার স্বপ্ন দেখে মানবসভ্যতা চিরকাল'—আরও বড় বিশ্বপটেও স্থাপনা করে দেখবেন কবি, যখন কতবার

এরই ব্যথা এনে দেয় মিথ্যা লোভ, ভুল আত্মঅভিমান,
অসামান্য ক্ষমতার পায়ে, যেমন সাম্রাজ্যমরিয়া জার্মানি
রিলকের নিঃসঙ্গ যুগে করেছিল নাৎসিদের দুঃস্বপ্নের
পায়ে···

কিংবা একদা সাম্রাজ্য মদমত্ত ইংলণ্ডেরও অবক্ষয়ে এলিয়টীয় Birth, and copulation and death / that's all, that's all, that's all,

that's all—এর একঘেয়ে ক্লান্তিরই পুনরুক্তিতে 'তাই অনেকেরই মনে হয় জনন-মৈথুন-মৃত্যু এই তিনে ইংলণ্ডেও শান্তি নেই' অথবা ফরাসীরও 'আলজীরীয় অবসাদে অস্তিত্বের কাকবিষ্ঠা খোঁজা'য়...।

বিশ্বচিত্রের পরই আবার আমরা বিবাহসভাব রূপকের দেশীচিত্রেই ফিরে আসি। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর কবি এখন সত্তার অন্বেষণের দীর্ঘ পরিক্রমার শেষ চরণটিতে নিয়ে এসে আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে সরে যান :

> আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে
> তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নরকে আজ বর নেই,
> অথচ রাজার মেয়ে এবং রাজার ছেলে নরকের দেউড়িতে
> রাস্তায় প্রস্তুত আছে স্বাগতের প্রতীক্ষায়,
> শুধু স্বভাবে প্রতিজ্ঞা চায় প্রতিবাদে
> প্রাণ মান চায় বরাভয়, তারাই যে বরকনে॥

তিন

আমাদের এক তরুণ বন্ধু, শিল্প-সাহিত্যোৎসাহী, যখন বলেন যে, বিমূর্ত চিন্তা ও তত্ত্বে চিহ্নিত হওয়া বিনা বিষ্ণু দে-র উত্তরকালের কবিতার কাছ থেকে আর-কিছুই কি তাদের প্রাপ্য হয় না, তখন 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' গ্রন্থেরই আর একটি কবিতা থেকে আমি হয়তো পড়ে শোনাতে পারি :

> ...কারণ সে দুমর পিপাস
> মেটে শুধু একমাত্র দীর্ঘশ্বাসে সুদীর্ঘ নিশ্বাস
> পাওয়া না-পাওয়ার দীর্ঘ তীর্থপথে গেলে—কি দাঁড়ালে
> সব মিশে একাকার একাত্মের চির প্রতীক্ষায়...

('সর্বদাই সুগন্ধা বরদা')

আমাদের তরুণ বন্ধুটিকে সম্ভবত শুধু একথাই বলা যায়।

শব্দের অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্য

'ঈশাবাস্য দিবানিশা' কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

সংগীত আর সাংগীতিক প্রতিবেদনের কোনো-কোনো ভাস্বর মুহূর্ত যেহেতু বিষয়সাপেক্ষ একই আধার-আধেয় সম্বন্ধের বিপ্রতীপ অথচ একতান-লব্ধ, ঠিক অনুরূপ তাৎপর্যে, কবিতার নন্দনও তার শ্রুতি ও দৃক্‌শক্তির প্রতি একান্ত নির্ভর, এমনকি শব্দের সর্বাগ্রগণ্য ধ্বনিরূপ ও তারই অর্থাভাস ভিন্ন যার অস্তিত্ব এখনো অকল্পনীয়। একজন কবির দেশকালসন্ততির ধারণা এবং প্রকাশসংগতির ভিতরে থাকতেই পারে অমন আপাত আত্মবিরুদ্ধতা, যে-বিরোধ স্বভাবতই বস্তুজগৎ আর শিল্পায়ত্ত বাস্তবে দ্বন্দ্বসমাকুল। কবি কি বলবেন শুধু তাঁর 'অভিজ্ঞতার' বাস্তব? কেমন সে অভিজ্ঞতা? নিশ্চয়ই তার আড়াল আছে, প্রত্যক্ষ আঁচ থেকে উত্তীর্ণ প্রতিভাসে আছে তার আরো গভীরগোপন সমগ্রতা।

এবং এও হয়তো সেই ব্যক্তি ও সমাজচৈতন্যেরই বাহিরে লব্ধ কোনো একাগ্র-অখণ্ড উপলব্ধির স্বরগ্রাম, যা রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে তাঁর স্বকালসম্পৃক্ত লোকপুরাণ রচনার উপলক্ষে পুনঃপুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। যদি-না সে-বিশিষ্ট স্বরগ্রামেই মূর্ত হয়ে ওঠে কবির স্বদেশ, কবিতার স্বদেশ, তবে আর 'শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব' কেন। কেনই বা 'অভিধার স্বত্ব নিপাতনে / ধ্বনির মুক্তিতে গাই, ধ্বনি খুঁজি পথের ধ্বনিতে'।

বস্তুত বিষ্ণু দে-র কবিতা প্রসঙ্গে আমরা যে সাংগীতিক প্রতিবেদনসিদ্ধ

দ্বান্দ্বিকতার কথা বলতে চাইছি, তার সূত্রপাত তাঁর 'পূর্বলেখ'-'অন্বিষ্ট'-র একযুগব্যাপী কালব্যবধানে খুবই নিয়মিত ও বহুলদৃষ্ট। তার আগে ও পরে, এই বিশেষত্ব, বিবর্তনেরই পর্যায় অনুসারে, যথাক্রমে, বিরলতর এবং উত্তরোত্তর অভ্যস্ত প্রবণতায় পুনরাবৃত্ত ও পরিণামমুখী। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, এ কেমনতর সংগীত যা শুধুই কবিতার আবহ-অনুষঙ্গরূপে নয়, রীতিমতো তার থীম অনুযায়ী প্রতিদিন পর্যন্ত রচনা করে। প্রকৃতপক্ষে সংগীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ না-হয়েও আমরা যেহেতু এলিয়টেরই মতো কবিতায় শব্দের সংগীতে আগ্রহী, অতএব, তাঁরই ভাষায় বলতে পারি : এ সংগীত আমাদের দেশকালনিবদ্ধ বাক্‌ছন্দের প্রচ্ছন্ন সংগীত এবং 'It is a music of imagery as well as sound'।

প্রধানত রূপক ও প্রতীকেরই ভিন্ন ভিন্ন একমুখী বা বহুমুখী ব্যঞ্জনায়, বিষ্ণু দে তাঁর 'পূর্বলেখ' থেকে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর বিস্তীর্ণ পরিধিতে, কোনো এক 'প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের' সন্ধান, ক্রমেই তিনি এক সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেন। মার্কসীয় দর্শনে আস্থাবান তাঁর চিত্ত যে-সমাজপ্রগতির স্বপ্ন ও ভাষার নির্দ্বন্দ্ব রূপ প্রত্যাশা করে মানবিক নিসর্গে, সেই প্রত্যাশা বা প্রতীক্ষারও রূপকশোভিত 'মিশ্রসুর' (দ্র 'জীবন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় / প্রতীক্ষা, না এক মিশ্র সুর!'—'ক্লান্তি নেই', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার') নিশ্চয়ই তার সামাজিক বিরোধ-বিসংগতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। যদি ঐকতানই বলা যেত সে প্রতীক্ষাকে, তবে তো গল্প কথায় পাওয়া 'এক জাতি এক প্রাণ' সে-সুদূর ভারতবর্ষ, অধুনা তার ধৃষ্ট মুখে জাতিবৈর ও বিভেদেরই মধ্যে 'বড় হওয়ার' কথা অমন জাঁক করে বলত না। সম্ভবত এই ভ্রান্তিটুকু বেশ ভালো করেই চিনিয়ে দেবার জন্য তিনি বলেন 'একজন দুঃস্বপ্নে'র মতো একটি আর্কেটাইপ-উপাখ্যান। কবিতাটিতে মুকুরকুমারের রূপক ব্যবহৃত হয়েছে বলেই নয়, রূপকথায় আবিষ্ট এ-আখ্যানের পরতে পরতে স্বপ্নকবিতার পরাবাস্তব, বলাই বাহুল্য যে, রূপকের অনেক বেশি প্রতিমান ধরিয়ে দেয়। যদি কেউ মনে করেন, এখানে আত্মনিষ্ঠ ভাববাদ খণ্ডনেরই উপলক্ষে 'বিশ্বলোপী সাধকের ব্যক্তিস্বর্গে দর্পণ-দ্রষ্টাকে' যথাসাধ্য প্রতিফলিত করা হয়েছে, বা আরো স্পষ্টভাবে, সে-এক দুঃস্বপ্নের সাম্রাজ্যবাদী জারতন্ত্রকেই ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ করে দেবার জন্য 'এলো হাওয়া কার্তিকের ঝড়ের হাসিতে',

অর্থাৎ সেই সোভিয়েত অক্টোবর রিভোল্যুশন, তবে সেইটেই হবে এই আশ্চর্যসুন্দর কবিতাটির উপযুক্ত ব্যাখ্যান। আর এইভাবেই বিষ্ণু দে-র **স্বপ্ন** (দ্র 'ক্লান্তি নেই'; ও **দুঃস্বপ্নের** (দ্র. 'একজন দুঃস্বপ্ন') দুই প্রতিস্পর্ধী রূপ: যা সুনির্বাচিত রূপক-প্রতীক-প্রতিমা-পুরাণ-উল্লেখ ইত্যাদির বিচিত্র সমবায়ে, তাঁর কাব্যজগতের গহনজটিল দ্বন্দ্বরূপেরই সমগ্রতাকে একটা পরিণতি দান করে। এবং সে-পরিণতি 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এই একটি পর্বান্তরের সংকেতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, 'কোমল গান্ধার'-এই কবির সে-ভাববৃত্ত পরিপূর্ণ, তারপর আনিঃশেষ পুনরাবৃত্তি শুধু। তাহলে, 'আলেখ্য' ও 'তুমি-শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এ, এবং 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' থেকে 'ঈশাবাস্য দিবানিশা'-য়ও, গানেরই ধুয়ার মতো সে-প্রতিবেদন ও প্রতিজ্ঞা অমন 'মৌলিক শুদ্ধ মানব-স্বভাবের' অন্তর্গত প্রশ্নে থেকে-থেকেই জেগে উঠত না: 'উপমায় উপমিতে উপমেয় এক হবে কবে?'

বস্তুত তিনিই তো বলেন: 'বিরোধে সঙ্গীতে মাত্র সঙ্গত সার্থক উত্তীর্ণ সুষমা' ('ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে'), যেহেতু সে-বিরোধেরই দেশী বিদেশী ক্লাসিক প্রতিমার তাৎপর্য তাঁর জ্ঞাত: 'স্বরে মেলে প্রতিস্বর'। সুতরাং 'আলেখ্য'-র মানবিক নিসর্গে, 'পঁচিশে বৈশাখ'-এরই শতধার রবীন্দ্র-অনুষঙ্গে আমাদের 'আধুনিক আর্কেটাইপ' অনুসন্ধান, এমনকি 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-ও সে-অন্বিষ্ট রাবীন্দ্রিক সত্তার সংকটসূত্র যেমন উত্তরাধিকারবলেই এরিকসনের *Identity crisis* এর একাত্মতায় যুক্ত হয়, তেমন ঘটনা, বিষ্ণু দে-র কবিকর্মে শুধুই বহিরাশ্রয়িতার নজির হয়ে থাকে না। তিনি প্রবন্ধে যে-কথা বলেন: 'আমাদের শিল্পসাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, আমাদের ইতিহাসের মানসে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে, বিস্তৃতভাবে আধুনিকতার আর্কেটাইপ, মৌলিক প্রতিনিধি; এমনকি দেশোত্তরভাবে উচ্ছ্রিত তাঁর আধুনিকতা, তাঁর সত্তাসংকটের সৃষ্টিমুখর ব্যাপ্ত আর্তির ক্লান্তিহীন গায়ত্রীতে।' ('রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা')। আমাদের পক্ষে তারই শিক্ষণীয় সন্তাপ, তাঁর সমগ্র কবিকর্মেই যেন বা সাংগীতিক বিস্তারধর্মে অনুষঙ্গময় হয়ে থাকে। অতএব, প্রতিবেদন ও প্রতিজ্ঞারই বহুপর্বিক আন্দোলন ও উত্তরণে, অধুনা তিনি যে স্থিতপ্রাজ্ঞ প্রবীণ দ্রষ্টার মৌনীস্বভাবে উপনীত (দ্র 'উত্তরে থাকো মৌন'), তার সঙ্গে তুলনীয় বটে সে-ঔপনিষদিক আত্মজিজ্ঞাসা অনির্বচনীয় মানসিক ধৈর্য, নয়তো এক নচিকেতার রূপকই তিনি এ-যাবৎ কখনো একমুখী

রূপকে বা বহুমুখী প্রতীকে তাঁর দেশকালসন্ততির আধেয়স্বরূপ বলে গণ্য করতেন না, করলেন হয়তো এই কারণে যে, অধুনার 'সত্তা সংকটে' কতকটা 'মৌলিক প্রতিনিধি' হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁরই ঐতিহ্যপ্রীতিসূত্রে ঔপনিষদিক অনুষঙ্গ আমাদের অনেক আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার পরিপূরক হয়ে ওঠে। এ-তথ্য খুব বেশি চমৎকৃত করে না বটে, যেহেতু 'পুনর্বৃত্ত উপমা রূপকে ধন্য' যে-কোনো মহৎ কবির পক্ষেই এ-একটা বাঞ্ছিত প্রবণতা, তবু বিষ্ণু দে যখন 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এরই অভিজ্ঞাভূমিকে কমবেশি বিস্তীর্ণ করেন 'ঈশাবাস্য দিবানিশা'-য়, তখন তা এক অভিন্ন লক্ষ্যেরই ধ্রুবত্ব ও সামীপ্য সূচিত করে বৈকি :

এ যেন মেনকার পরম সমাদৃত
গৌরী উন্মুখ, কোথায় আসে বর!
সকলে উদ্‌গ্রীব, লগ্ন সমাহৃত ॥

('এ বড় রঙ্গ তো', 'ঈশাবাস্য দিবানিশা')

অতঃপর 'শব্দের চরম অন্বিষ্ট' যে সংগীত, unheard music বা melodies-এরই তুল্য কবিতার সংগীত, বিষ্ণু দে সে সংগীতের উৎসমূল নির্দেশ করেন 'অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যে'।

কবিতায়—বা গানেও খুঁজি শব্দের চরম অন্বিষ্ট,
খুঁজি অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যকে।
চাই ধ্বনির দুর্মর রেশ যেন ওই নাক্ষত্রিক ঐকতান
সূর্যেরও বা অনায়ত্ত যে তীব্র আলোকে
চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্চমাত্রা নিম্নতম-মাত্রাময় গান,

('নৈঃশব্দ্যকে', 'ঈশাবাস্য দিবানিশা')

প্রসঙ্গত মনে পড়ে 'অন্বিষ্ট'র পূর্বোক্ত 'জল দাও' নামক কবিতাটি। ঐ কবিতায় 'একরাশ শাদা বেল ফুল'-এর প্রতিমার অভ্রান্ত পূর্ণ মানবিক সত্তার উপমান ছিল একটি বিনীত পদ্ম; এবং ঐ উপমাসূত্রেই, কেন উৎপ্রেক্ষাবাচক নৈশ নাক্ষত্রিক আকাশ বর্ণিত হলো বেলফুলে, বাস্তবিক সে-রূপান্তর-রহস্য উন্মোচনেরই জন্য যেন কবি বলেন একটি রূপক : 'প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশ। পদ্মটি বড় বেশি পার্থিব, তার শিকড় তাই মাটিতেই। অপরপক্ষে, নক্ষত্রের প্রতিমানে ফুল আর আকাশ তাদের দুরন্ত অনুষঙ্গে মাত্র সম্ভাবিত করে তুলতে চায় যে 'অভ্রান্ত সম্পূর্ণ

সত্তা', তার অতীন্দ্রিয়তাই (transcendentalism) রূপকাবরণে উপমা-উৎপ্রেক্ষার সে-অনিবার্য দ্বান্দ্বিক রূপান্তরের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও তাদের মধ্যবর্তী যোগসূত্র রূপকটি, এই তিন উপাদানের মিশ্রণে, 'অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন একরাশ বেলফুল'-এর প্রতীকী-চিত্রকল্পটিই চূড়ান্ত রূপে ভাস্বর হয়ে থাকে। এখন, পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির যেখানে বলা হয়েছে—'চাই ধ্বনির দুর্মর রেশ যেন ওই নাক্ষত্রিক ঐকতান', তখন এহ বাহ্য যে, এও একটি উপমাত্মক উক্তি। কিন্তু তার প্রধান লক্ষণীয় বিশেষত্ব নিশ্চয়ই এই, শ্রুতিকর ধ্বনিরেখা যে-বিশাল দৃশ্যান্তরে পায় 'নাক্ষত্রিক ঐকতান'-এর সংহতি, বলতে গেলে, তারই ভিতর এ-শব্দবহ জগৎ যেন পেয়েছে নৈঃশব্দ্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। হয়তো কথা থেকে বিশুদ্ধ সুরে, কিংবা সুর থেকে চিত্রবৎ অনির্বচনীয়ত্বে, যখন 'সপ্তবর্ণ আমর্ত্য দ্যুলোকে' আমাদের সুরসপ্তককেই একটি দৃশ্যমান জ্যোতিস্বরূপ ভাস্কর্য বলে মনে হয়, তখনো কি জল থেকে জমাট বরফের রূপান্তরের মতোই এ-জীবন, তথা শিল্প, জেগে উঠতে চায় না সে-শব্দেরই চরম অন্বিষ্টলোকে, যেখানে, 'চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্চমাত্রা নিম্নতম-মাত্রাময় গান'?

একদা 'কোমল গান্ধারে'র মুকুরকুমারই তো স্বয়ং মূর্তিমান 'একজন দুঃস্বপ্ন', যে গড়েছিল তার স্বয়ংকৃত দুর্ভেদ্য দুর্গ: সাম্রাজ্যবাদের শৌখিন প্রাসাদ। অনেক 'লম্বা পাড়ি' শেষে, আজ কবি দেখছেন: 'সেই শৌখিন প্রাসাদ বুঝি ঐ একটি দেয়াল?' দেওয়ালই বটে, মাটির ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলে উঠবার আগে, শাদা চুল ভদ্রলোক যেন 'তারা-ঢাকা চোখে'ই ঠাহর করেন সে-ভুল।

'রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে' আজ সে-'শাদাচুল ভদ্রলোকের'-ই মতন যেন স্বয়ং কবিও, 'বিংশ শতাব্দীর প্রজ্ঞায় বিজ্ঞানে' 'ছন্দে মিলে মানবিক জীবনের প্রাকৃতিক পরম সঙ্গীত'টি (দ্র. 'রাত্রিতে শোনা যায়', 'ঈশাবাস্য দিবানিশা') বেঁধে দেন। জীবনকে মনে হয় তাঁর একটি 'দীর্ঘ মুক্তিস্নান'।

আর তাই প্রাচ্যপ্রতীচ্য ধ্রুপদী সংগীতের নানা অনুষঙ্গময় উদ্ভাবনায় বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যরীতির রূপকশোভিত প্রক্রিয়ার (metaphorical process) প্রত্যেকটি তরঙ্গে, তুলে ধরতে চান আমাদের সমাজবাস্তবের এই 'জঙ্গম সঙ্গীকরণ':

দ্বান্দ্বিক বটে তাই সর্বদা উত্তরণ
মননে অস্থিমজ্জায় শ্বাসবায়ুতে।
তাই যন্ত্রণা, কারণ বিরোধ আমরণ
যদি চলে ন্যায়ে অন্যায়ে,······
('অসম সমীকরণ', 'ঈশাবাস্য দিবানিশা')

এ বিষয়ে আর অনাবশ্যক ব্যাখ্যার দায়ে বিপন্ন হতে চাই না; পরিবর্তে, তাঁর 'ঈশাবাস্য দিবানিশা'-তেও allusiveness এবং musical elaboration-এর অনুকূল যে বিচিত্র আবহমণ্ডলটি উদ্‌ঘাটিত—তারই কিছু পঙক্তি অতঃপর উদ্ধৃত করছি।

১. ···যে দেশে চৈতন্যে ঝরে / মেঘ রৌদ্র, জল অবিরল গানের ত্রিধায় / ধারাস্নান সংহত গম্ভীর— / স্নায়ুর এবং বুদ্ধির অর্থাৎ চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর / মুক্তিস্নান ('দক্ষ স্মৃতির বাগান'); ২.··· একান্তই প্রাকৃতিক / অথচ বিশুদ্ধ এক মানবিকতার, / গান শুনি নানাবিধ ছবি দেখি হাতে হাতে গড়ি মূর্তি / যেন বা আমিও আঁকি যেন আমি সুরেরই মানুষ, ('ভিক্ষা দিয়ে ভিক্ষা মেগে মেগে'); ৩. কোথা রাবীন্দ্রিক প্রিয় গান ?···বেসুরে জীবন খান্‌খান্ (সাধে-সাধে'); ৪. মনে হয় সে রূপক, / দেখি শুনি তাকে মৃত্যুহীন প্রমেথীয় আদি রূপে ('উষার আঁধার ছন্দে'); ৫. উপমাও যেন মৃত আজ। জলে, স্থলে, বাতাসেও ছায় ছিন্নমস্তা, / এক নয়, শত শত। ('পরবাসীও যে নয়'); ৬. স্ব স্ব আত্মপর সঙ্গতে সঙ্গীতে ঘর-বাইরের সুর।...নানা কোমলে গান্ধারে নানা নিষাদে মধ্যমে নানা / নদী ক্ষেত পাহাড়ে মাটিতে সংলগ্নতা ('জীবনের ঘরে নেই'); ৭. সোঽহম অচেনা তাই, নিজেকেই নিজে / সমস্ত সঙ্গীতে মাত্র খুঁজে পাই, মানুষই পরমতম প্রাণী। ('সোঽহম অচেনা তাই' ; কবির মানস-বিবর্তনেরই প্রাথমিক ও পরিণত পর্যায় হিসেবে, যথাক্রমে, 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর 'সোঽবিভত্তস্মাদেকাকী বিভেতি'-নামক কবিতাটি এবং বর্তমান কবিতাটি তুলনার জন্যই স্মরণীয়); ৮. তোমার কথা মনে বাজায় উজ্জীবনী কোয়ার্টেট। ('তোমাকে দেখে স্পষ্ট হয়'); ৯. সিম্ফনির, শেষ তন্ত্রে উচ্চকিত যেন শেষ শব্দের আরতি, / যেন শরীর বা চৈতন্যের সব যন্ত্র একাকার এক অমোঘ শান্তিতে ('মৃত্যু চতুষ্পদক্ষেপে'); ১০. হে মৈত্রেয়, আত্ম-সহোদর, / এসো, আমরাই শুদ্ধতা ছড়াই / আকাশে বাতাসে মাঠে সৃষ্টিময় জলে স্থলে / ···বামে বা দক্ষিণে কোনো বাঁকা দাঁড়িপাল্লা কোনো দিকেই না হেলে ('যাকে বলি ধুলো মাটি'); ১১. নৈঃসঙ্গ্যকে সঙ্গীত উৎসবে নির্মাণের সঙ্গী

করো, কবি / হবে মানবিকে মানসিকে সমুত্তীর্ণ ভালোমন্দ ('নৈঃসঙ্গকে সঙ্গীত উৎসবে') ; ১২. সত্য / নান্দনিক সত্তা পায় নিবিষ্ট শিল্পের ধ্যানে, নয় ফাঁকা ঝোঁকে ('মহৎ শিল্পের শ্রম')।

দৃষ্টান্ত যথেষ্ট হলো। এসব উদ্ধৃতিতে, বিষ্ণু দে-র কবিতার পক্ষে প্রায়শই নিয়মিত ধরনের বহু দেশী-বিদেশী উল্লেখ ও অনুষঙ্গবহ সাংগীতিক-বিস্তার পর্যাপ্ত ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যত্র তিনি এখনো বিচিত্র বৈদেশিক অনুষঙ্গ প্রয়োগে ক্লান্তিহীন। সিমফনি, কোয়ার্ট্রেট, ফ্যুগ, কন্‌সার্ট ইত্যাকার প্রতীচ্য সংগীতের পারিভাষিকে আজও তাঁর প্রবল আগ্রহ। কিন্তু 'হাইলিগে দাংগেসাং' বা 'ক্যান্টিলেভর দ্বিতে', এমনকি লাটিন (?) পদ : 'Vera / Incessee patuit dea', দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের এখনো অচেনা লাগে! এমনকি চেনা বা আধোচেনা বৈদেশিক অনুষঙ্গগুলিও যে তাঁর কবিতার অন্তর্গত ধ্বনি-রূপের উৎকর্ষসাধনে খুব বেশি সহায়তা করছে, এমন তো মনে হয় না। তবু তিনি 'জর্মান গণতন্ত্রের জন্য' লেখেন এমন পঞ্চাশটি পঙক্তি, যার তেরোটি পদ জর্মান। কবিতার মধ্যে বাংলা হরফে জর্মান বচনকে ব্যবহার করে তিনি খুবই সংগত ধরনের শিষ্টাচার দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু পাদটীকায় ফের রোমান হরফে জর্মান, নিশ্চয়ই তাঁর একধরনের কৌতুকপ্রিয়তা।

সে যাহোক, তাঁর কবিতার নিয়মিত পাঠক হিসেবে আমাদের অন্তত মনে থাকে যে বিষ্ণু দে-র এই সাবেক প্রবণতাটি সর্বত্রই একটা শৌখিন ভঙ্গিমাত্র নয়, যে-কালে তিনি লিখেছিলেন—'বিলিতি বইতে খুঁজেছি আপন দেশ', সে-কালেও, তাঁর কবিকর্ম আদ্যন্ত বহিরাশ্রয়িতায় বিপন্ন ছিল, এমন ধারণা আমাদের কখনোই হয় নি।

অপরপক্ষে, একথা বলা ভালো যে, পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে বা উদ্ধৃতির বাইরেও তিনি যে সব অনুষঙ্গবহ কবিতার পরিচয় দেন, তা যে সর্বত্রই এক-একটা সাংগীতিক প্যাটার্নের অন্তর্ভূত, এমন নয়। এসব রচনার অধিকাংশ স্থলেই তাঁর ব্যবহৃত উল্লেখ-অনুষঙ্গগুলি কবিতার রূপক বা প্রতীক সৃষ্টির বহিরঙ্গ দাবি পূরণ করে মাত্র। তবুও এই জাতীয় উদ্ধৃতিগুলিই আমরা বিশেষভাবে এখানে মনে রাখছি এইজন্য যে, এর কয়েকটি অনুষঙ্গসূত্রেই বিষ্ণু দে ঠিক কী ভাবে তাঁর কবিতার থীম তৈরি করেন, তার বিচিত্র নজির পাওয়া যাবে। তাছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন প্রমাণও মিলবে যে, শুধুই দীর্ঘ কবিতাতে নয়, অনেক ছোটোখাটো মাঝারি কবিতাতেও কবি একটা সাংগীতিক প্যাটার্ন তুলে ধরেন। এ বিষয়ে প্রামাণ্য দৃষ্টান্তের তালিকা বিস্তৃত

না করে মাত্র কয়েকটি কবিতার উদাহরণে তথ্যটি পরখ করা যেতে পারে। আপাতত 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' থেকে 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' পর্যন্ত, এইসব কবিতাগুলি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'গান', 'আমি বাংলার লোক' ('তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'), 'সূর্যাস্ত বেলায়' ও 'পাখির ডাক' ('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'); 'ভৈরবীর পত্রাবলীর পাঠোদ্ধার' ('সেই অন্ধকার চাই'); 'বহু মুখ' ('সংবাদ মূলত কাব্য'), 'এ বড় বিচিত্র দেশ', 'তাও কি হয়' ('ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে') ইত্যাদি এবং বিশেষভাবে—'ঈশাবাস্য দিবানিশা'-র এইসব রচনা, যথা, 'একটি দেয়াল', 'একদা ভেবেছি যাঁকে', 'দক্ষ স্মৃতির বাগান', 'সেই কবে কোন এক ইস্টেশনে', 'মনে কেবা শান্তি চায়', 'কেবা যাত্রী কে পাটনী', 'ভিক্ষা দিয়ে ভিক্ষা মেগে', 'পরবাসীও যে নয়', 'জীবনের ঘরে নেই', 'সে আকাশ ঢালি ঘটাকাশে', 'বাংলাই আমাদের', 'নৈঃসঙ্গ্যকে সঙ্গীত উৎসবে', 'যেমন সঙ্গীত পায়' ইত্যাদি। এই সব রচনায় সাংগীতিক বিন্যাস যে সর্বত্রই একই ছাঁদের তা নয়। তবে অধিকাংশ কবিতাতেই নানা বিরুদ্ধ শব্দ ও ধ্বনির সংঘাতে, বিচিত্র মাপের বাকপর্বে ও স্পন্দেই যে তিনি এই সাংগীতিক প্যাটার্নটি গড়ে নেন, সে-তথ্য প্রণিধানযোগ্য। এই প্যাটার্নের প্রকৃতি অনেকটা আমাদের রাগসংগীতের আলাপে স্বরের বিস্তার ও তার সমে-ফেরার স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তের মতন। নানান মাপের বা মাত্রার বাক্‌পর্বে যে স্পন্দবৈচিত্র্য বিষ্ণু দে-র এই জাতীয় কবিতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ, বলতে গেলে, তারই সহায়তায় তিনি যেন বাদী-সম্বাদী স্বরের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেন এবং তাদের সাংগীতিক ঐক্যও স্থাপন করেন। সুতরাং কবিতায় কাউন্টারপয়েন্ট রিদম্‌ও একাধিক পঙক্তি-অনুচ্ছেদের ছন্দোবৈচিত্র্য ছাড়াই কিছুটা সম্ভব। সম্ভব একটি ৮+৬ মাত্রার পঙক্তির বিরুদ্ধে ৬+৮ বা ৬+৮+৪ বা ৬+৬+৬ কিংবা ৪+৮ মাত্রার অপর এক বা একাধিক পঙক্তি যোজনা করে। পঙক্তির ছোটবড় নানা আবর্তের বাক্‌স্পন্দে, পরুষকঠোর ও ললিতমধুর শব্দের প্রতিস্পর্ধী বিন্যাসে একটি সনেটেও এই কাউন্টারপয়েন্ট রিদম্ সম্ভব। তদুপরি, বিষ্ণু দে-র একেকটি পঙক্তির গঠনে গদ্যপদ্যের মিশ্রস্পন্দে, ঘরোয়া বাগভঙ্গি লালিত হ্রস্ব ও নাটকীয় গদ্যের অন্বয়ে, অন্ত্যমিলের ওপর তত নির্ভর না করেও অন্তর্মিলের পুনরাবৃত্ত ধ্বনিতে এবং বিপরীতধর্মী দুটি শব্দের অন্তর্বর্তী অপ্রত্যাশিত যতি ও গতির দ্বন্দ্বেও, এই রিদম্ অবশ্যই সৃষ্টি করা যেতে পারে। যথা,

চাই বয়সানুসারে I আর o সম্বন্ধ-যাথার্থ্যে I সমতাই, II

নানা কোমলে গান্ধারে I নানা নিষাদে মাধ্যমে I নানা

নদী ক্ষেত পাহাড় মাটিতে I সংলগ্নতা, II জানা বা অজানা।
প্রচুর রচনা, I কেন এক o শুধু শত্রু কিম্বা ভাই-ভাই! II
শুদ্ধ সভ্যতার মুক্তি I স্বপ্নে o ঘরে ঘরে, II বিশ্বের আকাশ—I
বিরাজিত রৌদ্রে স্বচ্ছ, I মেঘে শুভ্র, I নীলে নীল o বারোমাস ॥
('জীবনের ঘরে নেই', 'ঈশাবাস্য দিবানিশা')

ধ্বনির যথাক্রমে, আবর্তসূচক ও বেশবাহী চিহ্নে (I·II ও o) এবং বড় হরফ চিহ্নিত অতিপর্বের সংস্থানে, আলোচ্য উদাহরণটির মিশ্র তথা প্রতিস্পর্ধী স্পন্দ উক্ত ষোল লাইনের কবিতাটিতেও কী ভাবে স্বরের একটা বিস্তারধর্মে ও প্রত্যাবর্ত সমে কবিতার সংগীত প্রতিষ্ঠিত করে—তা যতটা উপলব্ধির বিষয়, ঠিক ততটাই কিন্তু বিচারবিতর্কের প্রসঙ্গ নয়।

আমরা লক্ষ করি, সাংগীতিক অনুষঙ্গ ও উপমাদি ভিন্ন বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় শব্দের সে-'অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যকে' আদৌ উন্মোচিত করতে চান না। বা করলেও, সে-হয়তো শব্দানুষঙ্গেরই স্বকীয় নৈসর্গিক বিভাবে। যেমন,

অথচ o যেখানে অন্তর্দৃষ্টি I জলধরশ্যাম o I অনেক হৃদয়ে I o
বজ্রে বজ্রে o I গাঙ্গনে o মণ্ডিত করে I বিদ্যুতের o নীলকণ্ঠ আশা, II
দূর্বাদল অভিরাম I এ-মাঠে ও-মাঠে, I ধানীরঙে o আদিগন্ত I
অরণ্যের o সংবৃত মিছিলে, I একত্র o সংহত I অন্বয়ে o অব্যয়ে, I
আশায় o ও নৈরাশের I পর্বে পর্বে I পুরুষার্থে I দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ ভাষা ॥ II
('অনেক হৃদয়ে', 'ঈশাবাস্য দিবানিশা')

এখানে স্বভাবতই গানের অনুষঙ্গ বা উপমাদি কিছুই নেই, ফলে প্রত্যক্ষ উপায়ে এ-রচনার ভাব ও রূপের অন্তর্বর্তী—একটু নিশ্বাস নেওয়ার মতো মুক্ত এ স্বাধীন নিমেষগুলিকে শুধুই সাংগীতিক প্রতিবেদনে স্পন্দিত করা হয়তো তত সহজ নয়। কিন্তু তবু ঐ উদ্ধৃতির চিত্রভাষা পারল সেই 'অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যকে' ছুঁতে। কেমন করে পারল? কয়েকটি দৃশ্যকল্প প্রতিমার সূত্রে, ঐ 'জলধরশ্যাম' বজ্রগর্ভ নীলকণ্ঠ বিদ্যুৎ, মাঠে মাঠে অভিরাম দূর্বাদল আর মাঠেরই ধানীরঙে অরণ্যের সংবৃত মিছিলের নিঃশব্দ প্রতিভাত মহিমা আমাদের মনে পড়িয়ে দিল, এইসব দৃশ্যের পটভূমিতে আছে ভিড়ের কোলাহল, আছে ব্যক্তিগত হতাশা বা কর্মিষ্ঠ মানুষের ন্যায্য ও উচ্চণ্ড কিছু দাবিদাওয়া। হয়তো চিৎকৃত মিছিলই

বয়ে গেল। একটি কবি তাঁর অভিজ্ঞতার এসব উপাদানকে মাত্র শব্দচিত্র করে তুলে ধরলেই তাঁর দায়িত্ব ফুরিয়ে গেল, বোধকরি এতটা সুগম নয় কবিতার চলাচল।

তবে একথা ঠিক যে, কবিতার বিভাবই খানিকটা পারে সে-সশব্দ প্রত্যক্ষতার হাত এড়াতে, জানে কিছুটা বাগর্থের অদ্বৈতসাধনও। তবু তার উপায়টা নিছক দু-একটা অলংকার বা প্রতীক-প্রতিমার যথেষ্ট বিন্যাসের ফলেই যে-সম্ভব তা নয়। বস্তুত, অলংকার, প্রতীক ও প্রতিমারও মৌলিক উপাদান শব্দ। এখন যে-ধরনের বিন্যাসে কবিতার শব্দান্তর্গত ধ্বনিসংঘাত তার বহুস্তর বিশেষত্বে কবিভাবই অন্তরঙ্গ ভাব ও রূপের, তথা বাগর্থেরও, আড়ালটি ঠিক মতো খুঁজে পায়, প্রত্যেকটি শব্দকে দেয় প্রত্যাশিত মড্যুলেশন-অনুযায়ী সংস্থান, একাধারে যতি ও গতির দ্বন্দ্ব এবং তদুপরি কথোপকথনের স্বচ্ছন্দ স্পন্দনটি, একমাত্র তখনই শব্দের সংগীত ওঠে ঘনিয়ে। ওপরের উদ্ধৃতিতে বিষ্ণু দে তাঁর কবিতার সাংগীতিক নিভৃতির পরিচয় দিয়েছেন একেকটি বাকপর্বের অন্তঃসংঘাতে, এমনকি কখনো-কখনো স্বতন্ত্র একেকটি শব্দের যতি ও গতির দ্বন্দ্বসংঘাতেও বস্তুত শব্দের পারস্পরিক সম্বন্ধে ধ্বনিসংঘাত কখনোই অর্থনিরপেক্ষ হতে পারে না। আর তা পারে না বলেই বাকস্পন্দের আবর্তনই তার অনেক ছোটখাটো কবিতার অন্তঃশীল সংগীত—সেকথা আমরা বলেছি। দীর্ঘ কবিতায় অবশ্য প্রতি পংক্তি-অনুচ্ছেদের ছন্দোবৈচিত্র্যে ও যতিস্বাচ্ছন্দ্যে সে-সাংগীতিক বিন্যাস আর-একটু সুনির্দিষ্ট হবার অবকাশ পায়। সব দীর্ঘ কবিতাতেই যে পায়, তা অবশ্য নয়। ওপরের উদ্ধৃত অংশটি ঠিক যে-ভাবে পড়লে তার 'ধ্বনির দুর্মর রেশ' ক্রমেই একটি সংগীতের সমগ্রতা পেতে পারে, সে-সম্পর্কে কেউ কোনো নির্দিষ্ট বিধান দিতে পারে না। তথাপি বাকস্পন্দের গতিক্রম অনুযায়ী আমরা মোটামুটি তার অন্তর্গত ধ্বনির আবর্ত রূপটি দেখানোর চেষ্টা করেছি। বলাই বাহুল্য যে, উক্ত বিশ্লেষণরূপ প্রচলিত অর্থে ছন্দোলিপি নয়। প্রধানত বাকপর্ব (I) অনুযায়ী দুটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বা পদের অন্তর্বর্তী ০-চিহ্নিত ক্ষেত্রে এক-একটি ধ্বনিবিভাগের রেশ ধার্য হয়েছে। হয়তো এমন বলা যেতে পারে, এইসব ধ্বনির রেশ আসলে একেকটি ছেদ বা ভাবযতির পরিপূরক। কিছুটা তা-ই বটে, তবে একটু তলিয়ে দেখলেই অনুভূত হবে যে, প্রকৃত অর্থে ছন্দোযতিও নয় ভাবযতিও নয় এরূপ বহুস্থলে, ধ্বনির প্রবহমানতা

হয় খানিকটা রুদ্ধ বা বাধিত, নয়তো ধ্বনির এক স্বর থেকে অন্য স্বরে যাওয়ার (modulation) এই একেকটা শ্বাসক্ষেপ থেকেই কবিতার সামগ্রিক সাংগীতিক প্যাটার্ন জেগে উঠেছে। কোনো প্রিয় গানের সুর আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে একটা তাৎক্ষণিক তৃপ্তিদান করেই তার সব কাজ শেষ করে দিল—তা তো নয়। গান শেষ হয়ে যাওয়ার পরও গায়ক ও শ্রোতার মাঝে এমন কোনো অনিঃশেষ সুর বা আবেগ থেকে যায়, থাকাটাই সংগত যে ঐ বিমূর্ত আবেগই ক্রমে মূর্ত মননে গায়ক-গান এবং শ্রোতার সম্বন্ধকে বিশেষ কোনো উত্তরণেরই অভিজ্ঞতা দান করে। বক্তা (এস্থলে, গায়ক-গান) ও শ্রোতার এই সম্বন্ধও এক অর্থে দ্বান্দ্বিক, আর তাই, বিষ্ণু দে-র মতো আমরাও বলি: 'দ্বান্দ্বিক বটে তাই সর্বদা উত্তরণ / মননে অস্থিমজ্জায় শ্বাসবায়ুতে।' হয়তো এইভাবেই কবি তাঁর রচনায় 'অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যকে' স্পর্শ করেন; অনুরূপ না হোক, অন্তত কিছুটাও সে-নৈঃশব্দ্যের প্রতিশ্রুতি যদি-না পাঠক বা শ্রোতার অন্তরে গ্রাহ্য হয়, তবে কবিতার মুক্তি আর কিসে? ক্বচিৎ একেকটি নয়নাভিরাম চিত্রকল্পও তার অপরাপর লাক্ষণিক বিশেষত্বসহ ঐ অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যকেই পায়।

> বলরাম কেউ পার্বণকালে গ্রামে ফেরবার তাড়ায়
> ফেলে চলে গেছে সোনার কাস্তে তারায় খচিত মাঠে।
> দশদিন (?) ঝোপে খুঁজবে পাড়ায় পাড়ায়॥

('দৃশ্যাবলী', 'ঈশাবাস্য দিবানিশা')

শব্দটি সম্ভবত 'দশদিন' নয়, দশদিশ বা দিক, সে যাই হোক, এই যে কালের রাখাল-এর প্রতীকী চিত্রকল্পটি তার অনুষঙ্গবহ সংগীতে বাঞ্ছিত আবেগকে আকর্ষণ করে, তারও এক অনিঃশেষ রূপ আছে আমাদের মননে। আর আবেগেরই স্তর থেকে শব্দের, তথা শব্দভুবনের এই অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যে বা মননে পৌঁছনোই আমাদের পক্ষে যে আজ এক শ্রেষ্ঠ উত্তরণ তাতে সন্দেহ কি।

সমসাময়িক দেশকালের বাস্তবতায় অপসংস্কৃতির উৎকেন্দ্রিকতা তাঁরও অসহ্য লাগে। তাই তিনি প্রায় স্বগত উচ্চারণে কোথাও বলেন: 'নববাবুভাষা ছাড়ো মন'। শুধু 'নববাবুভাষাই'?—উত্তরসাধকেরা নিশ্চয়ই বুঝবেন, এ-মাত্র বাবুভাষা নয়, বাবু-পয়ার থেকেও কিছুটা মুক্তি চাই। ছন্দোভাষার মুক্তি বিনা

আমাদের যে-কোনো উত্তরণই যে আজ অসম্পূর্ণ, তার শিক্ষণীয় প্রমাণ তো বিষ্ণু দে-র ছন্দোভাষার নিরন্তর পরীক্ষা থেকেই আমাদের পাওয়ার কথা। সুতরাং, নিছক আঙ্গিকসর্বস্বতা নয়, তবু ব্যাপক ও নিগূঢ় তাৎপর্যে, টেকনিকের ইতিহাসেই কবিতার ইতিহাস আজ আমাদের 'সম্বোধনে' নতুন কালযাত্রা যোজনা করবে। পল এলুয়ারে কবিতা প্রসঙ্গে যেমন বলেছিলেন আরাগঁ: 'Poetry is language, and for this reason nothing is so necessary for a poet than first to make the trial of language'; বিষ্ণু দে-র শব্দসাধনা, তথা জীবনচর্যা, সেই অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যকেই স্পর্শ করার সাধনা।

আরম্ভ ও তার পরে

অশোক সেন

বিষ্ণু দে-র অনূদিত 'এলিঅটের কবিতা' বেরোয় ১৯৫৩তে। বইটির ভূমিকায় তারিখ ছিল ১৯৪৭। সেখানে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা সম্বন্ধে কবি লিখেছেন: "রৌদ্রের এ-অভিযান আরম্ভ শিক্ষিত বাবু-সমাজের যে রাত্রিশেষে, সে রাত্রি আশা-ভঙ্গের, জিজ্ঞাসার, আত্মসচেতনতার, যে আন্দোলনের রাত্রিতে আসে সংগঠনের প্রভাত। এলিঅটের প্রভাব সেখানে রূপকবৎ, সে রূপক খুলল গান্ধীজির নীতির গোধূলিতে, রবীন্দ্রনাথের সমর্থ নিভৃতিতে লালিত খোলা হাওয়ার ধ্যানধারণায়। সাধারণ্যেই এলিঅট পেলেন সমব্যথী, যদিচ আমরা ছিলুম তখনো সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। আত্মসচেতনতা ছিল, তবে, তখনো সেটা বিচ্ছিন্ন—প্রুফ্রকের মতো। আত্মসচেতনতা তখনো তাই বিড়ম্বনা, বিরহী প্রেমিকের মতো। কিন্তু তা ছিল সৃষ্টিময়; প্রগতির প্রথম ক্ষেপ, যদিচ হয়তো আত্মসচেতনতা তখনো সেই সম্বন্ধস্বীকারের গভীরতায় পৌঁছয় নি। যেখানে দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। তখনো আমাদের পরোক্ষ ভাবনা স্বভুক, ভালেরির সাপের মতো, আমাদের আত্মস্থতা তখনো প্রায় হিনডেনবর্গ জার্মেনিতে রিল্‌কের সুদূরপিয়াসী টিউটনিক আত্মম্ভরী নৈঃসঙ্গ্য কিম্বা ইয়েটসের মতো তন্ত্রমন্ত্রের রাজা-রাজড়ার কুহকজালের যন্ত্রণাসম্ভোগ।"

শিক্ষিত বাবুসমাজের রাত্রিশেষ সমাজ-ইতিহাসের অনেক কথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একই আলোচনায় বিষ্ণু দে সুকুমার তরুণ প্রতিভাসম্ভব

ইংরেজ কবি অ্যালন লুইস-এর কথা বলেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লুইস ভারতে এসেছিলেন সামরিক কাজের বাধ্যবাধকতায়। এদেশে জীবন সমাজ ও প্রকৃতির যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল তাতে লুইস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মাথা কোটেন। বিষ্ণু দে-র কথায় "বিরোধে তাঁর জর্জর মন তাই ত্রাহি ত্রাহি করেছিল, তাই তাঁর করুণ শেষ হল ব্যর্থ মৃত্যুতে, আরাকানের খাদের ধারে দাঁড়িয়ে রিভলভারে নিজের প্রাণদানে।"

এক বন্ধুর কাছে চিঠিতে লুইস লিখেছিলেন—ইংরেজ ভারতকে দিয়েছে রুটি নয়, পাথর। এখানে পরিণতির পথে অনেক বাধা। মানবদৃশ্যে ক্রোধের কারণ জমেছে বিস্তর, সমাজচিত্র বহু আতঙ্কে সঙ্কুল, আর বিশ্বপ্রকৃতি তোমাকে বিনীত করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে লুইস-এর প্রশ্ন ছিল—ইওরোপে মালার্মের কাছে গোলাপ যেমন অলীক হয়ে গেছে, ভারতে পদ্মেরও কি সেই অবস্থা নয়? গ্রামে-শহরে সর্বত্র এক তীব্র, স্বেদাক্ত বাস্তবের সাধনাই কি ঠিক নয়? কেন তা কঠিন? প্রতিদিনের সূর্য তো এদেশে রোজ সেই শিক্ষা দেয়।

চল্লিশের দশক শেষ হয়ে আসছে। এলিঅটের কাছে বাংলা আধুনিক কবিতার ঋণ তখন বিষ্ণু দে-র মনে লুইস-এর ব্যাপক উপলব্ধিতে সংযুক্ত হতে পেরেছে। নিশ্চয় তার° বেশি। তখন 'পূর্বলেখ', 'সাত ভাই চম্পা', 'সন্দীপের চর' বই তিনটিতে বিষ্ণু দে-র কবিতার অন্তরে অন্তরে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'অন্বিষ্ট' বইটিও 'এলিঅট অনুবাদ'-এর আগে বেরোয়। তার বেশ কিছু কবিতা এলিঅট-অ্যালন লুইস ভাবনা নিয়ে লেখা ভূমিকাটির পূর্বে রচিত হয়েছিল।

তিরিশের দশকে অবস্থা ছিল আলাদা, বিশেষত গোড়ার দিকে যখন রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার শুরু হচ্ছে। সেকথাও বিষ্ণু দে লিখেছেন পূর্বোক্ত প্রবন্ধে: "বিশ দশকের সুখী যদিচ ফাঁপা যুগে প্রায় ঠিক লগ্নেই, বিষিয়ে ওঠার কিছু আগেই, স্নায়ু তখন এক পাহাড়ে চূড়ায়, বেটোফেনের অন্তিম সঙ্গীতের আলোয়, নেতিবাচক পুঙ্খানুপুঙ্খতার আর প্রবল নিরুদ্যমের মুখে। কিন্তু ফল তখনো তিক্ত নয়। অথচ আমরা তখনো প্রায় সেই তিমিরেই, আজ যে তিমিরে।" তিমিরের কথা মধ্যবিত্ত বাবু-সমাজের পুরো ইতিহাসটা স্মরণ করায়। আমাদের তথাকথিত ভাঙাচোরা রেনেসান্সের খণ্ডিত প্রেরণা তখন শেষ হওয়ার মুখে। শুধু সেই ঐতিহ্য ধরে এগোবার সুযোগ ছিল না বললেই চলে।

বিশ দশকের শেষ থেকে বিষ্ণু দে এবং অন্য যাঁরা কবিতায় নতুন পথের সন্ধান করেছিলেন, তাঁদের প্রাথমিক প্রয়াসে কাব্যজিজ্ঞাসাই প্রাধান্য পেয়েছিল। সমাজের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাদ দিয়ে কাব্যজিজ্ঞাসাও অবশ্য পূর্ণ অবয়ব পায় না। সে বোধে তাঁরা রিক্ত ছিলেন না। কিন্তু সমাজ-চেতনার প্রশ্ন তখনো ঠিক প্রত্যক্ষ গুরুত্ব পায় নি। সমাজকে পাল্টাবার কথা, দুঃখ-দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ও স্বাধীনতার সংকল্প নিয়ে সোজাসুজি লেখায় নজরুলের মতো পারদর্শী কবির দৃষ্টান্ত ভুলবার নয়। তাঁর বিদ্রোহী আবেগ পাঠককে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু যে আধুনিকতার প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে এলিঅটের রূপকবৎ প্রভাবের কথা বলেছেন, নজরুলের কবিত্বে তার কোনো ছাপ পড়ে নি।

তিরিশ দশক বা তার কিছু আগেই এক কঠিন সংকটের উপলব্ধি রবীন্দ্র-কাব্যেও প্রখর হয়েছিল। অলঙ্কারের সমারোহ ছাড়া অনেকটা নিরাভরণ কবিতা যে কত গভীর ভাবপ্রকাশের অনুকূল তার বহু সার্থক দৃষ্টান্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের নতুন লেখায় পেলাম। গদ্যরীতিতে তিনি কাব্যের অধিকারকে বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন মেনেছিলেন। পুনশ্চ-পত্রপুট-শেষ সপ্তক-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পেরিয়ে দেখা গেল ছন্দের ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথ আরেক স্বকীয়তার পরিচয় দিলেন যাতে চারপাশের নানা টুকরো ঘটনা, আটপৌরে জীবনের অজস্র চিত্রকল্প, এতদিন কাব্যে উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের আচার-আচরণ কবিতায় সুন্দর অঙ্গীভূত হতে পারে। আবার 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত বইগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর 'আমি'কে বাইরে থেকে দেখতে চান। তখন তিনি শুধু জীবনলীলার নায়ক নন, প্রায় যেন তার দর্শক-বিচারকও হতে চান। আর সে সাধনায় রোগযন্ত্রণা এবং আসন্ন মৃত্যুর চিন্তা ভূমিকা বিস্তার করলেও তাতে নিছক জীবন থেকে নিষ্কৃতির আগ্রহ কখনো প্রধান হয় নি। তাই আশি বছরের সমগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত কবি জীবনের শেষ পাঁচ বছরে বারবার শিশুমনের মুকুরে, শিশুর বিস্ময় ও রোমাঞ্চে ভরা আয়তদৃষ্টিতে পৃথিবীকে প্রাণময়, নির্লোভ আনন্দে দেখেছেন 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'সে', 'ছেলেবেলা', 'গল্পস্বল্প', 'ছড়া'-র মতো রচনাগুলিতে।

রবীন্দ্রকাব্যে এই বিবর্তনের পাশাপাশি কিছুটা সমান্তরালভাবে আধুনিক বাংলা কবিতা শুরু হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে থেকে সেই সূচনার কথা আমরা জানি। অনেকে বলেছেন এঁরা রবীন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র এবং সেই অর্থে

আধুনিক। রবীন্দ্রকীর্তি ও প্রভাব আমাদের সমস্ত সাহিত্যধারায় ধ্রুবসত্য। সেখানে আলাদা হওয়া শুধু চাওয়ার ইচ্ছায় ঘটে না। রবীন্দ্রকাব্যে অন্তিম সংকট ও উত্তরণের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু ন্যায়ের নিশ্চিতি, রুচিবোধের দৃঢ়তা ও অধ্যাত্মবিশ্বাসের সমগ্রতায় রবীন্দ্রনাথের স্বাবলম্বন সে সংকটেও নতিস্বীকার করে নি।

বিশতিরিশ দশকে আধুনিক কবিদের প্রথম পদক্ষেপ ঐ স্বাবলম্বনের ব্রতে আত্মীয়বোধ করে নি। রবীন্দ্রবিশ্ব যেন তাঁদের আয়ত্তাতীত এক স্বপ্নের ভুবন। কবির নিজের মনের কথা ও হৃদয়াবেগের প্রবাহ রূপেগুণে উদ্ভাসিত হলেও তা বড় অলীক লাগে; সুধীন্দ্রনাথ যাকে পরীর রাজ্য আখ্যা দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মালার্মের গোলাপ মিথ্যা হয়ে যাওয়া, অথবা লুইস্‌-এর ভারতীয় পদ্ম সম্পর্কে উক্তি মনে আসে। তবে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবিশ্বাস বা একাএকা দীপ্ত গীতে সৃষ্টি করা স্বপ্নের ভুবনকে অস্বীকার করবার ঝোঁকটা সব আধুনিক কবির ক্ষেত্রে একরকম বিকল্পের রূপ নেয় নি। জীবনানন্দের কথা এখানে তুলছি না, কারণ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তিকে তিনি গোড়াতেই আধুনিকতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভাবতেন না। কোনো কোনো কবির ধারণায় রাবীন্দ্রিক শুচিবিচার কাটিয়ে উঠতে পারাই ছিল আশু প্রয়োজন। তারও আবার বহুরূপ। বুদ্ধদেব বসুর সরল আকুতি, আর সুধীন্দ্রনাথের দর্শনভারাক্রান্ত পাপবোধ ও আত্মনাট্য তখন সমগোত্রীয় নয়। নীতিবাগীশের মতো তাঁদের কাজ নস্যাৎ করা অবান্তর। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজে সম্ভবত এসব দৃষ্টান্তে আমূল পরিবর্তনের আভাস পান নি। বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বিরূপ ছিলেন, বলতেন, "দেখ, ভোগ করব পুরোপুরি তারপর বলব কিছু না—এ আমার অসহ্য লাগে।" ('পরিচয়ের কুড়ি বছর', হিরণকুমার সান্যাল, পৃষ্ঠা ৭৩)।

বিষ্ণু দের কবিতা শুরু হয়েছিল অন্য এক বোধে। সেই সময়কে তিনি বলেছেন সুখী অথচ ফাঁপা যুগ। সুখ কিন্তু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত জীবনে সীমাবদ্ধ ছিল। ফাঁপা হওয়ার মূল কারণটাও তাই। সে যোগাযোগের সামাজিক-ঐতিহাসিক কার্যকারণ তখনো কবির কাছে স্পষ্ট নয়। অনেক মধ্যবিত্ত বাবুর সুখই বা কতটুকু? সস্তার বাজারে স্বল্প উপার্জনক্ষম মধ্যবিত্ত সংসারও মোটামুটি চলে যেত। কিন্তু শিক্ষিত বেকারের চাপও বাড়ছিল। সেন্সাসের তথ্য থেকে জানা যায় যে চাকরি ও অন্যান্য ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবিকার ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলিতে উপার্জনকারীদের তুলনায় বেকার পোষ্যদের সংখ্যা

ক্রমেই বেশি হয়ে পড়ছিল। ('সমাজ ও সাহিত্য', বিমলচন্দ্র সিংহ, পৃষ্ঠা ১১৬)। ফলে মধ্যবিত্ত সংসারের একান্নবর্তী অবস্থা নড়বড়ে হতে থাকে। দীর্ঘকালীন সংস্কারের বাধায় অনেক ক্ষেত্রে তার পুরো ভেঙে-পড়া তখনো ছিল সময়-সাপেক্ষ। জমিজমা, ঘরবাড়ি ইত্যাদির উত্তরাধিকার নিয়ে রেষারেষি, বিবাদ-বিসম্বাদ বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়ে পড়ে নিতান্ত খাপছাড়া, সদাব্যাহত।

তবু ১৯৪৭-এ বিষ্ণু দে বলেছেন তখন সুখী সময়। ৪৭ এর চোখে সেই স্মৃতিতে একটা বড সত্য আছে। চল্লিশ পঞ্চাশ ষাটের দশক ধরে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকট যত কঠিন হয়েছে তা তিরিশে অত প্রকটভাবে ধরা পড়ে নি। তখনো নিজেদের অর্থসামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানভক্তি নিয়ে তাঁরা শহর কলকাতায় স্বাভাবিক বোধ করবার সুযোগ পেতেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে এঁর ওঁর ভূমিকা নিয়ে গর্বিত হওয়ার কারণ ছিল। নিছক সন্ত্রাসবাদ পেরিয়ে অন্য ধরনের শ্রেণীবিপ্লবে সামাজিক রূপান্তরের মার্কসীয় ভাবনাচিন্তাও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। কিন্তু সবের মধ্যেই ছিল ঔপনিবেশিক পঙ্গুতার বিরোধ, যার ফলাফল পরে অ্যালন লুইস-এর চোখে অত প্রকট লেগেছিল—এখানে সব কিছুই কেমন দূষিত, কারণ ইংরেজ ভারতবর্ষকে দিয়েছে রুটি নয়, পাথর।

বিষ্ণু দের তরুণ কবিমনে অবক্ষয়ের বোধ ছিল প্রখর। কিন্তু প্রথমে স্থানকালইতিহাসের সম্পূর্ণ ধারণা, তাদের কার্যকারণে অবহিত সমগ্র চৈতন্যের অঙ্গীকার সম্ভব হয় নি। তখন মুখ্য ছিল যন্ত্রণায় আপ্লুত সেই নবীনবোধ—চারপাশের জীবন এক দুঃসহ গৌণতায় আকীর্ণ, তার বিরুদ্ধে শুধু আবেগময় অভিপ্রায় ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার জোরে এমন কোনো কাব্যবস্তু তৈরি হয় না যা সার্থক প্রতিবাদের তাৎপর্য অর্জন করবে। গৌণতার অভিজ্ঞতা এবং তার যন্ত্রণা এমন ভাবে, এমন রূপে প্রকাশ করা প্রয়োজন যাতে কবির উপলব্ধি একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্য হয়ে দাঁড়ায়। যে বহিরাশ্রয়ে কবির বোধ কবিতায় রূপ পেল তার তন্ময়তায় পাঠকের কাছেও সেই বোধ বাস্তব হবে।

এই প্রচেষ্টা ও তার কীর্তিতে বিষ্ণু দের কবিতা বিশিষ্ট। শুরু থেকেই তাই। ফলে তাঁর আরম্ভের বর্ণমালা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক হওয়া অনিবার্য ছিল। অর্থালঙ্কারের ব্যবহারে, শব্দালঙ্কারের ধ্বনিতে মন্ময় সমীকরণ যথেষ্ট হত না। প্রয়োজন ছিল কবিতার অবয়বে নৈর্ব্যক্তিকের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রপূর্ব ঐতিহ্যে মহাকাব্য-পুরাণের জগতকে মৌলিক শক্তিতে ব্যবহারের যে দক্ষতা

মধুসূদন দেখিয়েছিলেন তার অনুসরণ সমকালীন মধ্যবিত্ত পরিবেশে বিষ্ণু দের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত হত না। রোমান্টিক কাব্যধারায় হৃদয়াবেগ ও কবিকল্পনার যে নভশ্চারী ভূমিকা রয়েছে, তার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা বিষ্ণু দের কাছে খুব জরুরি ছিল। নানা প্রবন্ধে, আলোচনায় বিষ্ণু দে বারবার বলেছেন আমাদের লোকায়ত ঐতিহ্যের কথা, যেখানে সাধারণের বোধশক্তি সহজেই প্রত্যক্ষ থেকে প্রতীকে যাতায়াত করতে পারে। তার জন্য উপমা উৎপ্রেক্ষার মই বেঁধে বেঁধে এগোতে হয় না, প্রয়োজন করে না কবির ব্যক্তিগত কল্পনায় গড়া ভুবন। বিষ্ণু দের অনূদিত ছত্তিশগড়ী ও উরাওঁ গান থেকে দু-তিনটি দৃষ্টান্ত দেব।

কি করে ভাঙলে
সোনার কলসখানি
বলো তো কোথায়
হারালে তোমার জলজলে যৌবন ?

('ছত্তিশগড়ী গান', 'সন্দ্বীপের চর')

একটা কুকুর ডাকল কোথায় গাঁয়ে
স্বপ্নে ছিলাম ভেঙে গেল ঘুম—
কিছু নেই কেউ নেই।

(ঐ)

ঢোল কেনো ভাই লালু কেনো এক ঢোল
ভাববি বুঝিবা বৌ এনেছিস পাটে
ঢোল যদি ভাঙে লালু ভাই ভাববি রে
বৌটা পালাল কে জানে রে কোন্ হাটে।

('উরাওঁ গান', ঐ)

বন্দী পাখিরা, জন্তুরা সব জীব
জিব দিয়ে লেখে মুখের রক্ত চেখে।
ব্রিটিশ শাসন
আদালতে কড়া বিচার ভাষণ
লেখে সব যার যেমন খেয়াল লেখে।

(ঐ)

একই বইতে বিষ্ণু দের অনূদিত সাঁওতাল কবিতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ঘাস কাটি ঘাস বড়ো পাহাড়ের পরে
প্রেয়সী ক্লান্ত কণ্ঠে তৃষ্ণা ভয়ে
প্রেয়সী আমাকে নিয়ে চলো ফাটে গলা
তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঝর্ণাতলায়

তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঝর্ণাতলায়
জোঁকের রাজ্যি, কাজ নেই গিয়ে তায়
প্রেয়সী আমাকে নিয়ে চলো, ফাটে গলা
আমবাগানের পাশের ঝর্ণাতলায় !

আমবাগানের পাশের ঝর্ণাতলায়
প্রেয়সী রাখাল ছেলেরা জুটেছে নেচে
চলো যাই দোঁহে ময়নামতীর পারে
দীঘি থেকে জল খেতে দিও সেঁচে সেঁচে।...

ঘাটে ঘাটে আজ পল্টন মাঠে মাঠে
সাহেবে বাবুতে দুহাতে চালায় কোড়া
পাহাড়ের বুকে বন্দুক বুঝি হাঁটে
কোন্ ঘাটে বল নামাব আমার ঘোড়া।

নৈর্ব্যক্তিক বহিরাশ্রয়ের অনুসন্ধানে বিষ্ণু দে প্রথম থেকেই নতুন বর্ণমালায় কবিতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। জীবনে সংস্কৃতিতে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের চাপ মেনেই তাঁর সেই আরম্ভ ও বিকাশ। বাংলা বাক্‌রীতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী তিনি কাব্যোক্তির গঠনে মন দিলেন, তাকে উল্‌টেপাল্‌টে কবিতার আবেগ বিস্তারে নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে আজ পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগও অনেকটা এই বর্ণমালার বৈশিষ্ট্যের জন্য ঘটেছে। আমাদের চোখ কান মন বারবার কবিতার কাছে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আশা করে। তাই নৈর্বক্তিকের বিশেষ সাধনা এবং তার তাৎপর্য ঠিক মনে ধরে না।

বিষ্ণু দে-র প্রথম কবিতার বই 'উর্বশী ও আর্টেমিস'। অধিকাংশ কবিতাতে বয়ঃসন্ধির টেনশন ছাপ ফেলেছে, রয়েছে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে বিস্ময়াকুল সুকুমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রকাশ। বইয়ের প্রথম কবিতা 'পলায়ন' কবির উনিশ বছরে লেখা। তার প্রথম স্তবক

সফরী চোখের সরল চাহনি, চোখের
কোলের কালিমার মায়া চোখ ভুলিয়েছে—চিকণ কপোল,
সিল্‌কমসৃণ শাদা আর ছোট পাণ্ডু ললাট।
ঘ্রাণ টানি মৃদু শীতল আঁধারে সুরভি চুলের।

একটি মুখের বর্ণনা। প্রথম দুটি কথা 'সফরী চোখে'র ব্যঞ্জনাতেই আমরা ধরতে পারি কবি চিত্ররূপটাকে ফুটিয়ে তুলতে চান উপমার সেতু বাদ দিয়ে, নিছক দেখার স্পষ্টতায় মুখটির বৈশিষ্ট্য সোজাসুজি পৌঁছিয়ে দেন পাঠকের অনুভবে। পরের স্তবকে শেষ দুটি লাইন

দেখি মুহূর্তবিশ্বে চিরন্তনেরই ছবি
উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে।

উর্বশী, উমা দুজনেই পাঠকের জানা চরিত্র। সাবলীল উক্তি 'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে'—এতে উর্বশীর লাস্য ও উমার স্থৈর্যকে কবি বিচ্ছিন্ন করলেন না। দেহ আর মনের প্রয়োজনকে ভিন্ন ভিন্ন করে পুরুষের কল্পনায় মেয়েদের দু-জাতি (উর্বশী ও উমা) চিন্তার কল্পনাই যেন কবি মানতে পারছেন না। তরুণ কবিমন লাস্য ও স্থৈর্যের সংহতিতে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সমগ্রতা দিতে চায়, যা রোমান্টিক আবেগে উর্বশী আর উমার মধ্যে দোলাচলে আগ্রহী নয়। আর কবিতার অবয়বে সেই মন প্রকাশ পেল ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছারূপে নয়, একটি চিত্রকল্পের নিজস্ব যুক্তিতে যেখানে 'আমি' চিত্রটির অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো বিষয়ের মতো পরিস্ফুট।

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর প্রধান গুণ মনের এই অনাহত চরিত্র এবং তার প্রকাশের তন্ময় রীতি। কবিতায় ভাব ও রূপের এরকম সংগঠনে মধ্যবিত্ত নির্ধারণের সীমা পেরিয়ে যাওয়ার কথা অবান্তর নয়। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস-চেতনায় তখনো তা সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু সুকুমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির জোরেই মধ্যবিত্ত বিকার ও অবদমনের বিরুদ্ধে নিহিত প্রতিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। এসব কবিতায় অনুভূতি ও চিত্ররূপের সমন্বয়ে স্পষ্ট হয় যে রাবীন্দ্রিক 'পরীর রাজ্যের' ভাঙন অন্য কোনো মোহগ্রস্ত আত্মপীড়ন বা আত্মনাট্যের জগতে কবিকে আকর্ষণ করছে না। তাই তাঁর প্রথম বইতে আমরণ আসঙ্গলোলুপ উর্বশীর প্রতিমা শুচি কৌমার্যের তনু দেবী গ্রীক আর্টেমিসের বিপ্রতীপ পরিপূরণ বাদ দিয়ে উপস্থাপিত হয় নি। বিষ্ণু দের তরুণ কবিমনে নেতির দায়িত্ব যন্ত্রণার পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে, অদম্য সাহস ও সামর্থ্যে সংহত ছিল।

'চোরাবালি'তে সমকালীন নাগরিক জীবনের মধ্যবিত্ত অসঙ্গতি বিষ্ণু দে

সহাস জিজ্ঞাসায় তুলে ধরলেন। উইট-এর প্রয়োগে, হাসিকান্নার যোগবিয়োগে কবি যে সুস্থ অবজ্ঞা ও কৌতুকের পরিচয় দেন তার উৎসে লোকমানসের অন্যায়-বিরোধী স্বাভাবিক প্রতিরোধের ইচ্ছা ও নির্লোভ মনোবলের শক্তি আমরা চিনতে পারি। জীবনের কঠিন দ্বন্দ্ব ও সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকলে, ন্যায় অন্যায়, ভালোমন্দের প্রশ্নকে আত্মপ্রসাদ বা আত্মধিক্কারের ব্যক্তিগত বাহুল্যে কচলানো যায়। তা প্রতিদিনের অপরিহার্য সত্য হলে আত্মপ্রসাদ বা আত্মধিক্কারের অবকাশ থাকে না। সেখানে হাসিকান্নায় মেশানো জীবনে চলতে হয় জীবনযাত্রার নৈর্ব্যক্তিক নিয়মে। 'চোরাবালি'র অনেক কবিতায় লরেন্স-কথিত 'cocksure women and hensure men' দের কৃত্রিমতা কবির উপহাসের বিষয়। রসিক আয়রনিতে স্পষ্ট হয় যে নানা মুখোশের আড়ালে নরনারী সম্পর্কের অসঙ্গতি মধ্যবিত্ত জীবনের পরিব্যাপ্ত গৌণতায় জড়িয়ে।

আবার 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'র মতো কবিতায় প্রেম আর জীবনের আত্মসচেতন উপলব্ধি বৃহত্তর ব্যাপ্তি অর্জন করে। প্রেমের বিপর্যয় ও জীবনের পুরো পরিস্থিতি যেন অণুবিশ্ব ও মহাবিশ্বের অবিচ্ছেদ্য সমগ্রতায় গড়ে ওঠে, কখনো মহাযুদ্ধের সর্বনাশের সঙ্গে ট্রয়লাসের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার যোগাযোগে, কখনো বা ওফেলিয়ার মৃত্যুবৎ দীঘির নিথর গভীর নীলে হ্যামলেটের হৃদয়ের রূপকে যা এলসিনোরের জন্মপ্রভাবনায় হয়তো রাজ্যলোভের নরকেই চুরমার হয়ে গেল। কবিতার শরীরে অণুবিশ্ব ও মহাবিশ্বের এরকম বিন্যাসে আরেকটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। জীবনের স্তর থেকে স্তরান্তরের বিচিত্র বাস্তব কিভাবে একটি কবিতার নানা স্তবকে, বা এমন কি একটি স্তবকের সূক্ষ্ম বাঁধনায় গ্রথিত হতে পারে—'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'য় তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত আমরা পেলাম। তা হলে শুরুতেই বিষ্ণু দে-র কবিতায় ভাব ও আঙ্গিকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি হৃদয়াবেগ নয়, কাব্যানুভূতি প্রকাশের যোগ্য বহিরাশ্রয়ের তন্ময় অন্বেষণ; আত্মপ্রসাদ বা আত্মধিক্কারের পরিবর্তে উভবলি মনোভাবের পরিচয়; কবিতার সংগঠনে জীবনের বহুস্তরে ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার প্রকাশ; বয়ঃসন্ধির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতেও কবিমন প্রেমের সমগ্রতায় সংশ্লিষ্ট। এসবের অঙ্গাঙ্গী আরেকটি বিশেষ লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। নৈর্ব্যক্তিকের শৃঙ্খলা খুঁজতে বিষ্ণু দে বস্তুসত্য ও জীবনের প্রতিটি ধারণাকে তার বিপরীতের সঙ্গে মিলিয়ে একটা দ্বন্দ্বজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হন। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিপরীতের দ্বন্দ্ব ও তার উত্তরণে নূতনের আবির্ভাব তো ডায়ালেক্‌-

টিকৃস-এর আদি কথা। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ার আগেই বিষ্ণু দে-র কাব্যানুভূতি সেই দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের সত্য সম্পর্কে সজাগ হয়েছিল।

'ঘোড়সওয়ার'-এর কেন্দ্রস্থ চিত্রকল্প, দ্রুতগতি অশ্ব ও চোরাবালির গ্রাসে তার বিলুপ্তি। রিবংসা, ভক্ত-ভগবান, মধ্যবিত্তের বিপ্রবীতে রূপান্তর, বা য়ুং-বর্ণিত আদিম প্রজনন-পূজার নানা রূপকে এর ব্যাখ্যা খোঁজা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় এমন বিশেষ অর্থে বাঁধা রূপকের চেয়ে আরো সার্বজনিক তাৎপর্যে কবিতাটি সংলগ্ন রয়েছে। আত্মসচেতন তন্ময়তার আরম্ভেই বিষ্ণু দে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেছেন দ্বন্দ্বের বাধা পেরিয়ে মিলনের সমগ্রতা। বাস্তবের প্রতিটি উত্তরণেই প্রাথমিক প্রয়োজন দ্বন্দ্বের স্বীকৃতি। কবিতাটিতে ছন্দের ওঠাপড়ায়, চিত্রকল্প থেকে চিত্রকল্পে নানা বিপরীতের গতিপ্রকৃতিতে একটা রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় তীব্র হয়ে ওঠে প্রচণ্ড আকুলতার ব্যঞ্জনা। সব মিলে চরম বিপরীতের পরস্পরকে আকর্ষণ একটা উত্তরণের অস্থির আগ্রহে মূর্ত হয়ে ওঠে।

'পূর্বলেখ থেকে বিষ্ণু দের কবিতা মার্কসীয় সমাজচেতনা আর ইতিহাস-বোধে বিস্তৃত হল। যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা জীবনের যে স্তরেই সূচিত হোক, 'পূর্বলেখ'-এর বিভিন্ন কবিতা শ্রেণীসমাজের শোষণ ও মানবিক অসঙ্গতিতে তার যোগসূত্র নির্দেশ করে। তারপর চার দশক ধরে বিষ্ণু দে তাঁর সমকালের অভিজ্ঞতাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। সে ইতিহাস সংগ্রামের বীরত্বে বারবার উজ্জ্বল হয়েছে। —আবার দ্বিধাসংশয়, মারাত্মক সব ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত কম নেই। এমন কি সব মিলিয়ে আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলন সমাজকে পাল্টানোর উদ্যোগে উদ্যমে যথেষ্ট এগোতে পেরেছে কিনা তা নিয়ে আজ বিতর্কের অন্ত নেই। সমকালের এই জটিল অভিজ্ঞতার শুধু তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত, ইচ্ছার আতিশয্য বা সংবাদের সঞ্চয় দিয়ে কবিতার নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। পর্যায়ে পর্যায়ে অনিবার সৃষ্টিতে বিষ্ণু দে কিভাবে তার কবিতাকে জীবন-ইতিহাসের সত্যে ভরে দিয়েছেন তার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আমার বর্তমান সময় বা সামর্থ্যে সম্ভব নয়। শুধু কয়েকটি দিকের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১৯৩৭-এ কিষাণ সভার প্রথম প্রস্তাব থেকে শুরু করে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন, দাঙ্গার বিপর্যয়, স্বাধীনতার মিশ্র অভিজ্ঞতা, তেভাগা, তেলেঙ্গানার লড়াই, কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদের প্রথম বামপন্থী সরকার ইত্যাদি সমসাময়িক ঘটনাপরম্পরার প্রতিক্রিয়ায় বিষ্ণু দে বহু কবিতা লিখেছেন। নানা অধ্যায়ের অভিজ্ঞতায় এক গভীর অন্ধকারও তো এই তিরিশ-চল্লিশ বছরের ইতিহাসে প্রকট সত্য। সারা দেশ জুড়ে দুর্বিষহ শোষণ, লোভ আর অনাচার

ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হয়েছে। অথচ প্রতিবাদের, সংগ্রামের শক্তি ও চরিত্র সুদৃঢ় সংহতিতে স্থায়ী রূপ পায় নি। সেই অবস্থায় ইতিহাসের প্রগতি সম্পর্কে অটুট আস্থার জোর খুঁজতে বিষ্ণু দে মনুষ্যত্বের সমগ্র ঐতিহ্যে নিবিষ্ট হয়েছেন। যে সংবেদনার মানদণ্ডে তাঁর কবিতা সদাসর্বদা জীবন, প্রেম ও প্রকৃতির সংগ্রামী তাৎপর্যকে উজ্জ্বল করতে প্রয়াসী, সেখানে দেশীবিদেশী সাহিত্যসংগীতের সঞ্জীবনী শক্তি, রূপকথা-পুরাণের স্বপ্নপ্রয়াণ বা এমনকি দার্শনিক প্রতর্কের জটিল বিশ্লেষণও স্থান পেয়েছে।

কাজটা দুরূহ। অনেক সময় তাঁর আবেদনও। কিন্তু সে দুর্বোধ্যতা স্বেচ্ছাকৃত খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়। দৃষ্টান্ত দেখা যায় অনেক জটিল সূত্রের, দেশীবিদেশী কাব্যপুরাণ থেকে উল্লেখের, এবং এমন কি কঠিন সব শব্দপ্রয়োগের যা কবিতাকে দুর্বোধ্য করে দেয়। তলিয়ে দেখলে সে সব ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট আঙ্গিক ও বর্ণমালার অনুসন্ধান চেনা যাবে। প্রতিটি কবিতায় তা সম্পূর্ণ উৎরোবে এমন দাবিও যুক্তিসম্মত নয়। এই শতাব্দীর বিশতিরিশ দশকে মধ্যবিত্ত সংকট পুরো বিনিয়ে উঠবার পূর্বাভাসে যে কবির কাজ শুরু হয়েছে, আর তিনি নিজেও সমাজের সেই স্তরের মানুষ, তাঁর পক্ষে লোকায়তের অনুসন্ধানে গণকবি হয়ে উঠবার পথে ইতিহাস সমাজ সংসারের বড় বাধাই কাজ করে।

কাব্যজিজ্ঞাসার যে বৈশিষ্ট্যে বিষ্ণু দের কবিজীবনের সূচনা, মার্কসীয় আত্মীয়তার পরেও তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ ইতিহাস থেকে সহজ হওয়ার সুযোগ খুব বেশি আসে নি। সেই প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করবার উপায় সমাজের ভিন্ন স্তরে, অন্য জীবন সংসারে প্রতিষ্ঠিত কোনো কবির পক্ষে সম্ভব হত কিনা তা নিয়ে কল্পনা অনেকটা অবান্তর, কারণ সেরকম দৃষ্টান্ত বাংলা কবিতায় এখনো মেলে নি। আর সহজকে খুঁজবার অক্লান্ত সাধনা বিষ্ণু দে কোনোদিন ছাড়েন নি। কিন্তু তা ঘটেছে কঠিনকে না এড়িয়ে। দ্বন্দ্বময় জীবন-ইতিহাসের জটিল অভিজ্ঞতায় নিমগ্ন সেরকম বহু কীর্তির দৃষ্টান্ত তাঁর সৃষ্টিতে কম নয়।

আগেই বলেছি বয়ঃসন্ধির সুকুমার অনুভূতিতে বিষ্ণু দে-র কবিমন প্রেমের সমগ্রতায় জীবনের জোর খুঁজেছিল। 'রুচি ও প্রগতি' নামক প্রবন্ধ-সংকলনে তিনি প্রথম কাব্যজিজ্ঞাসা ও মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় যোগাযোগ আলোচনা করেন। বইটি আরম্ভের আগে বিষ্ণু দে তরুণ কবিকে লেখা রিলকের চিঠি এবং পিঅর্স ও ক্রোকার-এর 'পেকহ্যাম এক্সপেরিমেন্ট' থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। শেষোক্ত নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত ছিল যে

আলাদা দু-জন মানুষ অঙ্গে অঙ্গে অভিন্ন সত্তারূপে সক্রিয় হলে সব অভিজ্ঞতাই তাদের কাছে নতুন তাৎপর্য অর্জন করে। আর রিলকে লিখেছিলেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে আমাদের নিরাসক্ত তন্ময় ভাবনা শুরু হয়েছে মাত্র। তার কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আমাদের কাছে নেই। তবু এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা কালক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংজ্ঞ অবস্থায় আমাদের সাহায্য করবে।

মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তিমূল প্রেমে—পরস্পর বিদ্বেষে নয়, প্রতিযোগিতায় নয়। শ্রেণীহীন সমাজ তার অনুকূল পরিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করবে। তাই শোষণের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রেণীহীন সমাজের অনাগত-দর্শনে ভাস্বর। সেই অনাগতকে বিষ্ণু দে-র কবিতায় বর্তমানের মুকুরে দেখতে পাই। তাঁর কবিতায় প্রেমের ব্যঞ্জনা বিরহে-মিলনে, দাম্পত্য-স্নেহে, শরীরমনের সজীব অনুপ্রেরণায় মনুষ্যত্বের অপরাজিত সত্তাকে বড় করে দেয়। যে কথা এলুয়ার প্রসঙ্গে আরাগঁ বলেছিলেন: পুরুষকে আর নারী ছাড়া ভাবা যায় না, নারীকেও পুরুষ বাদ দিয়ে নয়। এখন প্রেমের সমুচ্চ প্রকাশ আর ভালোবাসার ভাবনামাত্র নয়, একাকীত্বের ইচ্ছা নয়, শুধু প্রেমিক নয়, যুগলেই তারা সত্য। তখনই যুগল নারীপুরুষের প্রেম একতানে পৌঁছয় যখন তারা এক অভিন্ন বিশ্বরূপের ধারণায় মিলতে পারে, সেখানে জীবনের অভিযান হয় বিস্তৃত, আর মানুষের পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হওয়ার ভালোবাসা আপন স্বরূপকে চিনে নেয়।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় এসব কথার তথ্যপ্রমাণ এত বেশি যে সেভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। দু-তিনটি উদ্ধৃতি দেব অন্য কারণে—প্রতিবাদের প্রত্যয় আর প্রেমের শক্তি তাঁর কবিতায় কিভাবে আমাদের অতিচেনা সব দৈনন্দিন দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, সামান্য সব অভিজ্ঞতাতেও চারিয়ে যায়। তা হয়ে যায় মস্ত বড়, স্থানকালের অনেকটা জুড়ে জীবনের মানচিত্র, সংগ্রামের সুদৃঢ় অবলম্বন—প্রক্ষিপ্ত ভাবাবেগের ঘোষণায় নয়, আন্তরিক বোধের স্তরে স্তরে সত্যের উন্মোচনে। কবিতা আর কি করতে পারে?

'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' বইতে 'মন যেন নিভন্ত অঙ্গার' কবিতাটির শেষ স্তবক উদ্ধৃত করছি। শেলীর উক্তিতে শুরু—কবিদের মন যেন নিভন্ত অঙ্গার, হাওয়ার আগুনে কবিতার শিখা জ্বলে। তারপর কলকাতার পথেঘাটে, শেয়ালদার উদ্বাস্তু দুঃস্থ জীবনের দৃশ্য থেকে দৃশ্যে ঘুরে,

অবান্তর কার্যকারণের ঝড়ে এলোমেলো হাওয়ার ধুলায়
তুমি ভাব পথে নয় ঘরে আছ
ভেবেছ মনের শুধু উদ্বাস্তু শিবির।
ভুল দেখ আঁধিয়া আঁধারে।
দমবন্ধ জমাট গভীর বুকচাপা অন্ধকারে কবে
নিভিয়েছে মনের অঙ্গার, মানবিক সমস্ত আগুন,
সেই কথাটাই জানা নেই আর।
এক সে হাওয়ায় আমরা সবাই জানি, আমাদের মনে মনে,
খড়কুটো কেউ খুঁটে, কেউ বা অঙ্গার,
অবশ্য সবার আর নেই মন, নাকি সবটা অকবির।
মনস্তত্ত্ব কারো মান, কারো বা জীবনের মানে।
হাওয়া চাই অবশ্য স্থির।

'সংবাদ মূলত কাব্য' বইয়ে 'পোলিং স্টেশনে' কবিতায় সেই অদ্ভুত লোকটি যে একান্তই লাজুক, খুব মিশুক নয়, যায় প্রত্যহ সে চিঠি লেখে গ্রামে দূরে প্রেয়সী যাকে —

আজ প্রাতঃসকালেই তার দেখা, নির্বাচনী অর্থাৎ পোলিং স্টেশনে,
লাজুক মেধাবী ব্যক্তি, বলি : কি ব্যাপার, তুমি যে এখানে ?
এই গণ্ডগোলে আজ পণ্ড করে দিলে তো তোমার বরাবরের ধ্যান ?
প্রায় মুখ না তাকিয়ে গাঢ়স্বর গলায় বলে : তার মানে ?

পাঁচটি বছর বাদে একদিন ভোট দিই এইখানে এসে,
আর প্রত্যহ পালন করি নির্বাচন দিন সেই নামেই।
তুমিও তো তাই, না ?—গলাটা নিচুই, কাছ ঘেঁষে
বলেই হঠাৎ দুই চোখ মেলে চায়, রোদ আলো বৃষ্টি হাওয়া ধোওয়া
শ্বেত পাথরের থামে।
চুপ করে থাকি, জানি পটলডাঙায় তার মেসে মাঝে মাঝে
চিঠি আসে, আর সেও প্রতিদিন চিঠি লেখে, যত্ন করে, খামে।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' বইতে 'শ্রাবণ' কবিতা। বর্ষা সন্ধ্যায় সমস্যাক্লিষ্ট কলকাতা বিষণ্ণ, বিপর্যস্ত। শেষ হচ্ছে

সন্ধ্যা দেখেছ ? বর্ষাদিনের নটমল্লারে সন্ধ্যা ?
মেঘের সপ্তবর্ণ আকাশে দিকেদিকে প্রাণ বহ্নি,

শত অশ্রুতে অক্ষত আশা বর্ষার রাঙা সন্ধ্যা।
তোমারও বন্ধ্যা ভাবনা, দেখবে, রাঙল।

রাত্রিগুলিকে জড়ো করে রাখো বীরজগতের গুন্ঠিত জিজ্ঞাবিষায়
যেখানে পার্থসারথি স্বয়ং ভদ্রাকে
প্রেরণা যোগান বীরের কাতর প্রেমিক হিয়ার তৃষায়।
আমরা কি ভীরু, যেহেতু হৃদয় রাজপথে-পথে ভাঙল ?

দিনগুলি গেছে একচ্ছত্র কর্মে, কে হারে কে জেতে।
ধর্মযুদ্ধে অন্নবস্ত্র চেয়ে, জীবনের জলসত্রে।
রাত্রি ঘনায়, পাড়ার যুগলমন্দিরে
মধ্যরাতের আরতি এবারে ডাকে।
আজ থেকে কালে চলো যাই ধীরে ঘুমের গঙ্গা বেয়ে।

'সেই অন্ধকার চাই' বইতে 'অঞ্জন ও রঞ্জনা' কবিতা। সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্তির পর দু-জনের দেখা হয় ময়দানে

সন্ধ্যা হয়ে গেল উষা প্রাথমিক সৃষ্টির গৌরবে আর রঞ্জনার সলজ্জ সাহসী
মুখে এল প্রথম সূর্যের সোচ্চার বিস্ময়। জাহাজের স্টীমারের ধোঁয়াও রঙিন
আর কেল্লার র‍্যামপার্টস হয়ে গেল অলকার কুঞ্জবন আর রঞ্জনাও রক্তিম
রূপসী।

জীবনে মৃত্যুতে মর্ত্য ভেদ মুছে গেল গঙ্গার সূর্যাস্ত স্রোতে,
অঞ্জন হারাল সত্তা অর্থাৎ জন্মাল, রঞ্জনার উপস্থিত অস্তিত্বে অবাক, সদ্য
সাবালক চৈতন্যের সত্যে দীপ্ত। হঠাৎ তাদের মুখে ভাঙা গদ্য
গান হয়ে পাখার ঝাপটে ছেয়ে দিল কলকাতার মামুলি আকাশ
আরেক আলোতে।

অঞ্জন কি রঞ্জনার হাতে পেল নক্ষত্রের কম্পিত আভাস
কিংবা চেনা মুখে পেল সাত সমুদ্রের রহস্যের আকস্মিক কূল ?
রঞ্জনা কি সেই রাত্রে শুনেছিল বাড়ির গঞ্জনা,
না কি তার মৃত্যুঞ্জয় বক্ষে ছিল সমুদ্রের ঝড়ের আশ্বাস ?
অঞ্জনের ঘর, রাত্রি, সেই রাত্রে হয়ে গেল সম্পূর্ণ রঞ্জনা॥

আর উনিশ বছরে 'সফরী চোখের সরল চাহনি' দেখে যে কবির মনে হয়েছিল 'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে', তিনি প্রৌঢ়ত্বের পারে এসে অবিচ্ছিন্ন সেই বোধের পরম নিশ্চয়তায়, চিরদিনের বাঁচার অনুরাগে লিখলেন—

উত্তরে তুমি সর্বদা থাকো মৌন।

হয়তো বা ভাবো। সঠিক বলাই শক্ত।
কেন তুমি ভাবো : এ আকৃতি শুধু যৌন ?

হতে পারে তাই। আবার মাধুরী মমতাও জেনো সত্য
কেন তুমি বাছো কোনটা মুখ্য গৌণ ?
তা কি খুঁজে পাবে ? এই প্রেম অবিভক্ত।

বিশ্বেই বাঁচে চৈতন্যের প্রণয়—
মানবিক গানে, আমাদেরই দোতারায়।
তাই তো তোমার সঙ্গে একাত্মতায়
নামকীর্তনে আত্মদানের প্রলয়।

আমার ঈপ্সা সদাজাগ্রত, চিরায়ুষ্মতী তন্বী।
তাই আদিকাল থেকে বাঁচি অনুরক্ত।

তুমিই বাহুতে হিমহৃদয়ের বহ্নি।
তুমিই প্রাণের সত্তা, স্বর্গে সত্য॥ ('উত্তরে থাকো মৌন')

শেষ করার আগে আরেকটি কথা। প্রত্যেক শিল্পের একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে তা কি করে যুক্ত হবে, শ্রেণী-চেতনার প্রয়োজনে কি করে সাড়া দেবে সে-চ্যালেঞ্জের সঙ্গে শিল্পকর্মের দায়দায়িত্বও জড়িয়ে আছে। বিপ্লবের আবেদন সহজ করবার দায়টা শুধু কবিদের ওপর, শিল্পীদের ওপর চাপানোর ঝোঁকে অনেক সময় এক ধরনের হুকুমদার বা পণ্ডিতসর্দার গোছের মনোভাব প্রকাশ পায়। এমন সমালোচনায় পাঠক এবং শিল্পী উভয়েই অবাক হতে পারেন। ভাবটা যেন সমালোচক নিজের কর্মক্ষেত্রে বিপ্লব করে ফেলেছেন, বাকি শুধু শিল্পের

ভূমিকাটুকু। এটা সাধারণ সমস্যা। শুধু বিষ্ণু দে-র প্রতিকূল সমালোচনায় তা পাওয়া যায় বলছি না। সত্যি বলতে কি বিষ্ণু দে-র প্রশংসায় পূর্ণ লেখা থেকেও এ ধরনের দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব। ইতিহাস তার মতো করে সত্যি বলে, কবিতা তার মতো। দু-জনের মিল হওয়া শুধু অভিপ্রেত নয়। তা অনিবার্য, হাঁ বা না যা করেই হোক। কিন্তু কবিতার নিজের মতো কথা বলার কাজটা বন্ধ করে নয়। তাহলে কবিতাই বাতিল হয়ে যাবে। ইতিহাসও উপকৃত হবে না।

কাব্য আলোচনা

১৯৩৩-১৯৫৮

পুনর্মুদ্রণ

আধুনিক বাংলা কবিতা * উর্বশী ও আর্টেমিস * চোরাবালি * পূর্বলেখ * সাত ভাই চম্পা * রুচি ও প্রগতি * সন্দ্বীপের চর * অন্বিষ্ট * নাম রেখেছি কোমল গান্ধার 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ * শ্রেষ্ঠ কবিতা

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ * রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর * ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় * সমর সেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় * বুদ্ধদেব বসু * অরুণ মিত্র * গোপাল হালদার * অরুণ কুমার সরকার * মণীন্দ্র রায় * সুধীন্দ্রনাথ দত্ত * জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থগুলি প্রথম প্রকাশের পর তাঁর সমকালীন কবি ও সমালোচকগণ পত্রপত্রিকায় অনেক সময় নানা আলোচনা করেছেন। কিছু কিছু চিঠিপত্রও লিখেছেন। তেমন বেশির ভাগ লেখাই এখন দুষ্প্রাপ্য—কয়েকটি আমরা এখানে পুনর্মুদ্রণ করছি।

আলোচকদের পরবর্তী মত, যা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে পরিণততরও, এ-ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। এই মতগুলিকে তাদের প্রকাশকালের পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রহণ করতে হবে।

লেখাগুলি অবিকল ছাপা হয়েছে—শুধু বানান ও ছেদচিহ্নের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হয়েছে।

এই রচনাগুলি সংগ্রহ করেছেন শ্রীঅরুণ সেন।

সম্পাদক, 'পরিচয়'

আধুনিক বাংলা কবিতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৯৪০

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

গত কুড়ি বছরের মধ্যে বাংলায় যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাছাই করা ১০৩টি কবিতা লইয়া এই কবিতা-সংগ্রহ। বাছাই কার্যের বিপদ এই যে, তাহা কখনও সর্ববাদীসম্মত হইতে পারে না। এক্ষেত্রেও যে রুচি ও খেয়ালভেদে নানামতের উদ্ভব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগৃহীত কবিতার মধ্যে সবগুলিই নিঃসন্দেহে 'রবীন্দ্রপ্রভাববর্জিত' বা 'সার্থক' (significant) কিনা এ বিষয়েও মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু সময়, প্রভাব ও সার্থকতার ত্রিধারা সত্বেও মোটামুটিভাবে এই গ্রন্থে আধুনিক কবিচিত্তের ও কাব্যরূপের যে একটি সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য কাব্যামোদীমাত্রেই সঙ্কলকদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন।

আধুনিকতার বিশিষ্ট লক্ষণ কি এক কথায় তাহা নির্দেশ করা যায় না। তবে এই বিশ বছরের কবিতার মধ্যে যে সমস্ত নূতন রচনারীতি, চিত্রকল্প ও ধ্বনিছন্দ কাব্যপ্রকাশের ধারা বদলাইয়া দিতেছে, আলোচ্য গ্রন্থে সেই কাব্য-জিজ্ঞাসার যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত।

যে রূপান্তরের কথা বলা হইল, তাহা যে কোনো জীবন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে যুগে যুগে বারম্বার ঘটিয়া আসিয়াছে। অবশ্য একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সর্বদেশে ও সর্বকালে মানুষের গভীরতম অনুভূতির বিষয়গুলি মূলত এক এবং মানুষের অভিজ্ঞতার প্রণালীও এক। সেই চিরপরিচিত আকাশ সমুদ্র পর্বত অরণ্য জনপদ লইয়াই চিরকাল মানুষের মন কারবার করিয়া আসিতেছে। সেই আশা-আশঙ্কা প্রীতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির বশে মানবচিত্ত আলোড়িত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং মানবের

কাব্যচেষ্টার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা নিত্যকালের। কিন্তু ইহাও সত্য যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষের অভিজ্ঞতারও রূপ বদলাইয়া যায়। এবং মানুষের কাব্যেতিহাসেও বিশেষ বিশেষ যুগের ও দেশের ছাপ পড়িয়া যায়। ইহা আক্ষেপের বিষয় নয়, বরং ইহাই জীবনের লক্ষণ, সুতরাং আশ্বাসের বিষয়। বাংলায় কাব্যজগতে এইরূপ একটি রূপান্তরের সূচনা দেখা দিয়াছে।

এই রূপান্তরের কারণ নির্দেশ করিতে হইলে যে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক তাহা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে দু-একটি কথায় ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। প্রথম কথা মনে রাখিতে হইবে যে কবি সর্বশক্তিমান স্বয়ম্ভু বিধাতাপুরুষ নন। যে বাহ্য পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি রূপগ্রহণ করে তাহা তাঁহার নিজের সৃষ্ট নয়। উনিশ শতকের মধ্যে ইওরোপের ব্যক্তিতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার সংঘাতে আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহা দ্বারা আমাদের জীবনের ধারা ঘুরিতে লাগিল এবং সেই পরিবর্তমান আবহাওয়ার মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য তথা আধুনিক বাংলা কাব্যের জন্ম। সাময়িক উত্তেজনার বশে আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে বিশ-শতকের সাহিত্য উনিশ-শতকের সাহিত্যেরই সন্তান, একটি আর একটির পরিণতিমাত্র। আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম মাইকেলের উদ্দীপ্ত উনিশ শতকেই।

আমরা অনেক সময় আক্ষেপ করি ইহা বিদেশী প্রভাবান্বিত, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে এই বিদেশী প্রভাব আমরা বাস্তবজীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছি এবং মানবমনের স্বাস্থ্য তাহার সততায় ও অখণ্ডতায়। আধুনিক পাশ্চাত্যজীবনের মূলতত্ত্ব যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাহা ব্যবহারক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব অথচ চিন্তারাজ্যে বিশুদ্ধ স্বদেশী ঐতিহ্যের অনুসরণ করিব, এই মনোভাব লইয়া আমরা ইংরেজোত্তর বঙ্গসাহিত্যে অনেক ভাবুকতা ও গোঁজামিলের সৃষ্টি করিয়াছি। বিদেশী শাসক ও বিদেশী বণিকের শাসন ও শোষণ কার্যে যন্ত্রস্বরূপ সহায়তা করিয়া আমরা মধ্যবিত্ত বাঙালি যে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠালাভ করিলাম, তাহার ফলে আমাদের মধ্যে যে পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটিল সেই পরিমাণে সমাজবন্ধন ও ঐতিহ্যবোধ শিথিল হইয়া পড়িল। সাহিত্যক্ষেত্রে বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিচিত্ত এক নূতন স্ফূর্তি লাভ করিল, উনিশশতকের রোমান্টিক কাব্যে এই নবস্ফূর্ত স্বাধীনতার পূর্ণবিকাশ। কিন্তু এ স্ফূর্তি স্থায়ী হইল না। যে ভাবরস লইয়া কবির কারবার, সমাজজীবনে

তাহার উৎস শুকাইয়া গেল, কবিকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল অন্তরাত্মার নিভৃত কোণে, কল্পরাজ্যে। ললিতাবিন্যস্ত ছন্দঝঙ্কারে অলঙ্কারসমৃদ্ধ রূপাবলীর স্বপ্নপ্রয়াণ কবিচিত্তকে চিরকাল ভুলাইতে পারিল না। বিফলতা কবি মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। নিঃসঙ্গতার বোঝা দুর্বহ হইয়া উঠিল। যে সব দুর্মর সমস্যা ও দুরপনেয় সংশয় কল্পরাজ্যের হালকা হাওয়ায় সহজ সমাধান লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আবার স্বপ্নাভিযানের পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিল। এ অবস্থায় যে মনোভাবের উদ্ভব হইল তাহার উপাদান ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, বিতৃষ্ণা, নৈরাশ্য বা নির্বেদ। অনেক সময়ে ইহাকেই সংক্ষেপে সমরোত্তর মনোভাব বলা হয়। কিন্তু মহাসমর একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যে সমস্ত জটিল কার্যকারণের সমবায়ে এই মনোভাবের উদ্ভব তাহা পূর্ব হইতেই সঞ্চিত হইতেছিল।

সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে এই বিড়ম্বিত অভিজ্ঞতাই বিচিত্র আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এ কবিতা কেবল অভ্যস্ত স্বপ্নসম্মোহমুক্ত জাগ্রত অভিজ্ঞতার যথার্থ ও যথাযোগ্য প্রকাশ। এই গ্রন্থের সর্বত্রই যে এই জাগ্রত-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নয়, ইহার মধ্যে এমন কবিতাও আছে যাহা কৈশোরসুলভ অসংযত উচ্ছ্বাসের শিথিল প্রকাশ, এমনও কবিতা আছে যাহার পিছনে টেকনীক-সম্পর্কিত পরীক্ষার কৌতূহল ভিন্ন অন্য কোনও তাগিদ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অনেক কবিতার মধ্যেই স্বপ্নভঙ্গের বিভিন্ন সুরের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমের কবিতায় আকর্ষণ আছে, জ্বালা আছে, কিন্তু মোহ নাই, আত্মবিস্মৃতির আরাম নাই। ভাগ্যের শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া লোকোত্তর সিদ্ধির পথে জয়যাত্রার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উন্মুখ হইয়া উঠে, যৌবনের স্মৃতি—

> পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি
> আমাদের স্মৃতির বাসরে
> অবিশ্রু ধমনী ক্ষিপ্র করে,

কিন্তু

> পার্থ যে তোমার
> অক্ষম বিকল, তন্দ্রা,
> গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
> আজ দেখি অসাধ্য যে তার!

যে আত্মদানের উৎস উজ্জীবনের একমাত্র আশা, সে আত্মদান চিরকালই বাকি থাকিয়া যায়। চারিদিকে মরুভূমির বালুকাশ্মশান, সমুদ্রের লবণাক্ত জল। অমাবস্যার আকাশ পাথরের মতো তমিস্রাজমাট। উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি গুমোটভাঙ্গা ঝড়ের জন্য, নূতন আশার মেঘসঞ্চারের জন্য, নবজাতকের জন্মাষ্টমীর জন্য। কিন্তু বিস্ময়বিমূঢ় প্রশ্ন উঠে—

যে পশুবলের হারে হয়েছিলে মৃত্যুঞ্জয়,
এবার কি তার উজ্জীবন ?
অন্তর্ভৌম সমাধিতে ছিলো সঙ্গোপন
যে-মিশরী শব—
তুমি নও,—আসে কি সে অর্ধপশু, অর্ধেকমানব
সঙ্গে করে দিগ্বিজয়ী মরু ?

এই যে দ্বন্দ্ব-সংশয়-নৈরাশ্যের অক্ষম নৈষ্কর্ম্যের আবহাওয়া ইহা অবশ্য কি জীবনে কি কাব্যে মানবচিত্তের চিরন্তন আবাসভূমি হইতে পারে না। আমরা যে এই বয়ঃসন্ধির বিষম ক্ষণে, যুগান্তের সঙ্কটে নিদ্রার প্রলোভন, স্বপ্নের আশ্রয়, অন্ধকার আত্মবঞ্চনা বর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, জাগ্রত চক্ষে রূঢ় বাস্তবের দিকে তাকাইতে শিখিতেছি, আপাতত এইটুকুই পরম লাভ। সিদ্ধি কোন্ পথে, স্বাস্থ্যের সন্ধান কোথায় সে প্রশ্নের কোনও সর্ববাদীসম্মত উত্তর আমরা এখনও পাই নাই। কেহ কেহ মনে করেন সাম্যবাদের বাণী এ যুগে এক নূতন আশার বার্তা আনিয়াছে। কেহ বা মনে করেন মানব-সভ্যতার চিরাগত ধর্ম ও ঐতিহ্যের মধ্যেই ভবিষ্যতের বীজ নিহিত। আমাদের কাব্যজিজ্ঞাসায় এ প্রশ্নের সমাধান এখন পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। কি সাম্যবাদী কি ঐতিহ্যবাদী কোনো প্রকার আস্তিক্যবুদ্ধিপ্রসূত মনোভাবই আমাদের কাব্যে বা সমাজজীবনে শক্তিমান হইয়া উঠে নাই। আপাতত যাহা আমাদের আধুনিক চিন্তায় পরিস্ফুট তাহা একটা নেতিমূলক চাঞ্চল্য বা একটা অস্থির আগ্রহ। এই চাঞ্চল্যের প্রতিধ্বনি বর্তমান কাব্যগ্রন্থে একটা সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এবং ইহাতেই এ গ্রন্থের সার্থকতা বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এতক্ষণ কবিতাগুলির বিষয়বস্তু ও বাস্তবপটভূমির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। কারণ আমার বিশ্বাস কাব্য সমাজ ও জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন আকাশকুসুম নয়। জীবনের প্রবাহই ইহাকে রসধারা জোগায়, বাস্তবের পঙ্কেই ইহার মূল প্রাণবান। কিন্তু কাব্যসম্পর্কে ইহাই শেষ কথা নয়। যে

অভিজ্ঞতার ঘাতপ্রতিঘাতে কাব্যের জন্ম, তাহা কাব্যে ধ্বনি, ছন্দ ও চিত্রকল্পের এবন্ধে যথাযোগ্য রূপ ধারণ করিলেই কাব্য সার্থক। ইহাই হইল কাব্যের অঙ্গবিন্যাস বা টেকনীক্। টেক্‌নীকের কোনও বিষয়নিরপেক্ষ স্বরূপ নাই। ইহা কাব্যশরীর, অভিজ্ঞতার বাহন মাত্র। যে টেক্‌নীক্ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির প্রেরণা ও গতিবেগ যথাযথভাবে প্রকাশ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ টেক্‌নীক্। যে টেক্‌নীক্ রোমান্টিক স্বপ্নাভিযানের সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাহন, অভিজ্ঞতার ধারা বদলাইলে তাহা আর ভাবপ্রকাশের সহায়তা করে না, বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা আত্ম-প্রকাশের জন্য যে নূতন পথ কাটিতে বাধ্য হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। "গদ্য-রীতির প্রচলন, কাব্যের বিশিষ্ট ভাষার বর্জন, কবিকুলপরিত্যক্ত 'অসুন্দর' প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশের গ্রহণ," এগুলি নূতন (নূতন অর্থে শ্রেষ্ঠ নয়) অভিজ্ঞতার যথাযোগ্য রূপদানের জন্যই আবশ্যক, ফ্যাশনের প্রলোভনে নয়।

এই সমস্ত নব্যরীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে কিনা তাহা এই নীতি অনুসারেই বিচার করিতে হইবে। যেমন ধরা যাক্ গদ্যরীতির প্রবর্তন। গদ্যরীতির বিপদ এই যে ইহাতে উচ্ছৃঙ্খল বাগ বাহুল্য ও শিথিল ভাবোচ্ছ্বাসের প্রলোভন প্রশ্রয় পায়। আমার মনে হয় আলোচ্য গ্রন্থে গদ্যরীতির যে সব দৃষ্টান্ত স্থান পাইয়াছে তাহার মধ্যে কোনো কোনোটিতে এই শৈথিল্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যঞ্জনা অপেক্ষা উক্তির বাহুল্যে ভাব অনেকস্থলে ঘোলো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন অনেক কবিতাও আছে যাহাতে গদ্যছন্দ জমাট হইয়া সুগঠিত কাব্যরূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কোনো কোনো কবিতায় গদ্যছন্দের সার্থকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কাব্যকে অর্থঘন বা জমাট করিবার জন্য আধুনিক কবিরা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কাব্যের দুর্বোধ্যতা কিছু বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু লাভের দিক দিয়া দেখিলে এ বিঘ্ন অনুল্লঙ্ঘ্যনীয় মনে হইবে না। উক্তিপরম্পরার শব্দার্থ গদ্যের ধর্ম, আধুনিক কাব্যে ধ্বনি ও চিত্রকল্পের বেগে অর্থের গুরু ভারই কবির লক্ষ্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র কবিতায় অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের বাহুল্য বা অভাবিত প্রয়োগ আপাতত বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু অনেকস্থলেই দেখা যায় ঐ শব্দগুলি বাগ্-বাহুল্যের বা অস্পষ্টতার প্রতিষেধক। বাংলায় দুর্বল ক্রিয়াপদের অত্যন্ত বাহুল্য, দুই একটি সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ শব্দের যথাযোগ্য ব্যবহারে বাক্যটি

বাহুল্যবর্জিত পরিপাটিরূপ গ্রহণ করে। এইরূপ, উল্লেখ-উদ্ধৃতির ব্যবহার, সিনেমাপ্রবর্তিত cutting-পদ্ধতির প্রয়োগ প্রভৃতি অন্যান্য কলাকৌশল সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যায়। মনে রাখিতে হইবে এ সমস্ত রীতি এখনও পরীক্ষাধীন। তবে এখনই নিপুণ ও দরদী কবির হাতে এই নব্যরীতি যে সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহাতে বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধিলাভ হইবে বলিয়াই আশা হয়। ফ্যাশনের কথা স্বতন্ত্র, অক্ষম অনুকারকের হাতে অনেক অমূল্য রীতিই যে বিকারের সৃষ্টি করে, সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

এতক্ষণ নব্যরীতির কথাই বলিলাম। কিন্তু প্রচলিত কাব্যছন্দের স্বচ্ছন্দ বিকাশ, পরিচিত রোমাণ্টিক ঐতিহ্যের নূতন রূপ এ সব দিক দিয়াও এ গ্রন্থের সমৃদ্ধি প্রণিধানযোগ্য। যাঁহারা মাসিক পত্রিকার মারফৎ পুরাতন সুরের প্রাণহীন অক্ষম প্রতিধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া কাব্যমাত্রেরই প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা এ গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই। কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনা বা প্রত্যেক কবির রচনার আপেক্ষিক মূল্য নির্দেশ বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। মোটের উপর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, যে নূতন সম্পদের সন্ধান পাইয়াছি, তাহারই সামান্য পরিচয় বাংলার কাব্যরসিকসমাজে নিবেদন করিয়াই এবং সম্পাদকের ভিন্নমত কিন্তু উভয়ত চিন্তাশীল ভূমিকা দুইটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমি সন্তুষ্ট।

১৩/১৭ জুলাই ১৯৩৩

উর্বশী ও আর্টেমিস

গ্রন্থকার মণ্ডলী, ১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু,

ব্যস্ততার মধ্যে তোমার বইখানি পড়েচি। খুব সাহসের পরিচয় দিয়েচ। সাহিত্যে অনেকে নতুনের বড়াই করে কিন্তু চলে পুরাতনের পিছু পিছু। তোমার মধ্যে যথার্থই নতুন পথ খননের অধ্যবসায় দেখা গেল।

কিন্তু প্রথম আরম্ভে জমিটা থাকে এবড়ো-খেবড়ো, সম্পূর্ণ সুগম হয় না, সেটা বোধহয় অপরিহার্য। মাঝে মাঝে উঁচোট খেয়েচি কিন্তু বুঝেছি যে জোরে চলবে কোদালখানা। কালের চলতি পায়ের তলায় পথটা ক্রমে সমান হয়ে আসবে। কিন্তু তখন আবার নতুন কালের জোরালো পথিক বেশি সমান পথ পছন্দই করবে না। আমাদের বয়সে সাহিত্যে শুধু কেবল জোর নয়, আরামেরও দরকার লাগে। কিন্তু সাহিত্যের লক্ষ্য আগামী কালের জন্যে—সাবেক আয়োজন যা অক্ষয় হয়ে আছে আমাদের শেষ বেলাকার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আশীর্বাদ করি তোমার কলম কীর্তির অভিসার পথে নতুন বা পুরানো কোনো সংস্কারেরই লতাপাশে জড়িয়ে পড়বে না। সৃষ্টিকার্যে নতুন কাল এবং পুরানো কাল দুটো কালকেই এড়িয়ে চলতে হয়—চিরকাল বলে আর একটা কাল আছে সেইটের পরেই ভরসা। ইতি ২৯ আষাঢ় ১৩৪০ [১৩ জুলাই ১৯৩৩]

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে চিঠি লেখার পরেই মনে হলো বিচার সম্পূর্ণ হয় নি। আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েচি—বোধহয় বয়সের প্রভাবে। কুঁড়েমিটা সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো জীবনে ঘনিয়ে এসেচে—তাই একদৃষ্টিতে যা দেখি তার বেশি আর যাইনে। তেমনি করেই উড়েচলা মন নিয়ে তোমার বইয়ের অংশে অংশে চোখ বুলিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল এর চালটা নতুন, সেই জন্য অভ্যস্ত আরাম নিয়ে এর সর্বত্র সঞ্চরণ করা চলে না। সেইটেই প্রথম ধারণা, আর সেই কথাটাই তাড়াতাড়ি তোমাকে লিখে কাজ সেরেচি—এও কুঁড়েমির লক্ষণ। চিঠি ডাকে রওনা হবার পর বইখানা আর একবার হাতে পড়ল—দেখলুম কবিতাগুলো এমনতরো সরাসরি বিচারের যোগ্য নয়। এ তাজা মনের লেখা, যৌবনের ঢেউ পাথুরে উপকূলের উপরে উদ্বেল হয়ে উঠেচে—কঠিনের সঙ্গে তরলের চলেচে লীলা। বাঁধা নিয়মে সুঠাম ভঙ্গিতে স্রোতের ধারা চলচে না—সহজে গা-ভাসিয়ে দেবার মতো প্রবাহ নয়, থেকে থেকে রূঢ়তা প্রকাশ পেয়ে ওঠে, ধাক্কা খেতে হয়। একরকম নূতনত্ব আছে যেটা কায়দার নূতনত্ব, সেইটের অতিকৃতিটাই চোখে পড়ে—আর একরকম আছে যেটাতে মানুষেরই নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে, মনে হচ্চে তোমার মধ্যে সেই বিশিষ্টতা আছে। নতুন কালের বিদেশী আদর্শ সামনে রেখে সযত্নে ভঙ্গি অভ্যাস করে নিজের রচনাকে নতুন

হাটে চালিয়ে দেবার প্রয়াস তোমার নেই এই আশা করি। কেননা, সেই হাট আজ বাদে কাল ভাঙবে—আজ সে ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে ঢাক বাজাচ্ছে প্রবলতার আড়ম্বরে, তার মধ্যে অচিরতার অশান্তি—বর্ষাকালের আকস্মিক স্রোতের মতো, যা নির্ভর করে দূরের কোনো গিরিমালার মধ্যে হঠাৎ বর্ষণের উপরে। ইতি শ্রাবণ ১৩৪০ [১৭ জুলাই ১৯৩৩]

'পরিচয়' বৈশাখ ১৩৪৫

চোরাবালি

ভারতী ভবন, ১৯৩৭

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণু দে-র কবিতা, সুধীন্দ্র দত্তের ভূমিকা ও আমার সমালোচনা, এই ত্র্যহস্পর্শের ফল কখনো মঙ্গলময় হতে পারে না। আমার ও সুধীন্দ্র দত্তের অমঙ্গলের জন্য আমি ততটা চিন্তিত নই যতটা বিষ্ণু দে-র জন্য। তাঁর ক্ষতি হলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে, অতএব তাঁর কবিতা-সমালোচনার ভার অন্যের গ্রহণ করাই উচিত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার মনে হয়, আমার নিজের বক্তব্য আমার কলম দিয়ে প্রকাশ হওয়াই শোভন। এবং বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রধান গুণ এই যে ভিন্ন রুচির ওপর সেগুলি পৃথক ভাবেই আঘাত করে, কেবল ভালো মন্দর ছকে পাঠকের মানসিক প্রক্রিয়াকে নির্বাচিত করা যায় না। 'চোরাবালি' বইখানি সমগ্রভাবে আমার ভালোও লাগেনি, মন্দও ঠেকেনি, মনে আমার ধাক্কা দিয়েছে। আমি তারই বৃত্তান্ত লিখছি। ধাক্কার স্বভাবই হলো সান্তবতা। একটানা ও এক-জোরের আঘাত স্থিতিরই সামিল, তাই এই বিবরণ একটু খাপছাড়া হতে বাধ্য। আবার উক্ত কারণেই আমার সমালোচনা চিঠির আকার আপনা থেকেই গ্রহণ করছে। অর্থাৎ, 'চোরাবালি' পড়ে যদি গ্রন্থকারকে চিঠি লিখতে হতো তবে খানিকটা এই ধরনেই লিখতাম :

"বন্ধুবরেষু,

চোরাবালি পেলাম। ধন্যবাদের কি প্রয়োজন আছে? যদি থাকে, দিলাম, গ্রহণ কর, যদি না থাকে তবে সহ্য কর। বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছ ও মানুষ হয়েছে, সহনশীলতা তোমার সহজ। অন্তত, তাই ভেবে প্রথম পাঠে যা মনে উঠেছে তাই লিখলাম। আচ্ছা, এই সহনশীলতার ক্ষতিপূরণ করতেই কি তুমি পাঠকবর্গের প্রতি নিষ্ঠুর হও? সে যাই হোক, পাঠান্তরে একটু-আধটু মত পরিবর্তনের স্বাধীনতা দিতে কার্পণ্য করবে কি?

এতদিনে বুঝি বা, এক হিসেবে, (কি রকম সাবধান লোক দেখেছ?) বাংলা কবিতা মোহমুক্ত হলো। তোমার চোখে মদিরাবেশ নেই, মনে আত্মরতির জড়তা নেই, ভাবে শৈথিল্য নেই। পড়তে পড়তে materiality কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেষ্টা করছি তাড়াতে, এই ভয়ে পাছে materialism-এর অর্থ গ্রহণ করে। বিষয়বস্তু থেকে তুমি নিজেকে বেশ খানিকটা দূরে রেখেছ নিশ্চয়। ব্যক্তিসম্পর্কহীনতার চিহ্ন কবিতায় ছড়ানো, তবু মনকে নাকচ করনি। এই দ্বৈত-বোধের ফলে একটা দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ পেয়েছি যেটা আর একটু অতিরিক্ত হলেই pose হতো। আত্মসচেতনতা আছে, কিন্তু সেটা মনের অস্তিত্বই জ্ঞাপন করে। তবু, তবু বলছি ঝোঁক তোমার রয়েছে ঐ ধারে, সতর্ক থেকো। যেখানে ঝোঁক নেই, সেখানে তুমি না সাবজেকটিভ, না অবজেকটিভ (লোকে ডেসক্রিপটিভ কবিতাকেই অব-জেকটিভ ভাবে) তুমি material—অর্থাৎ আমি যা চাই, তাই।

এই ধর 'ঘোড়সওয়ার'। প্রথম যখন পড়ি তখনই আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। এর গতি আমার মনকে উধাও করে নিয়ে যায় মধ্য এশিয়ার স্টেপ-এ। এমন সংহত আবেগ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। অবশ্য এই কবিতাটির ব্যাখ্যা আছে—এর যৌন প্রতীক আমার কাছে অজ্ঞাত নেই, নৃতত্ত্বও আমি কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু সে সব কথা অবান্তর—যেমন সুধীন্দ্র দত্তের 'উটপাখী' কবিতার অর্থ প্রথম ও শেষ পাঠে (শেষ কখন হবে জানি না) অপ্রয়োজনীয়।

তোমার শক্তি বিচিত্র বিষয়-নির্বাচনে এবং আঙ্গিকে। আত্মসর্বস্বেরাই প্রধানত একঘেয়ে লেখা লেখে। যদিও তোমার কবিতা দার্শনিক কবিতার শ্রেণীতে পড়ে না, তবু এই বৈচিত্র্যের কারণ খুঁজতে দার্শনিকেরই দ্বারস্থ হতে হয়। আমার বিশ্বাস তুমি জগৎকে মায়াময়ই বুঝেছ, কিন্তু সত্যের

সাক্ষাৎ পাওনি, বোধহয় পরোয়াও কর না। দুটি প্রমাণ দিচ্ছি—(১) তোমার বিষয়গুলি আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের অনুগামী। টুন্‌কো জিনিস নিয়ে খেলা করতে (যাকে লক্ষ্ণৌ-এ দো দো পয়সা কা চীজ, ইংরাজিতে যাকে haberdashery বলে), আজকাল কেউ ওদেশে ভয় পায় না, কি কবিতায়, কি চিত্রে। সেইটাই হল আজকালকার ফ্যাশান। ফ্যাশান খারাপ নয়, সেটা সাহিত্যের মায়া। তুমি বিদেশী বিষয়বস্তুগুলি নাওনি, সাহিত্যের ভারতীয় ও শহুরে মায়া নিয়ে 'নখ্‌ড়া' করেছ। নখাড়ার মানে জান? এর একটি চমৎকার বাংলা প্রতিশব্দ আছে—কিন্তু অব্যবহার্য। যে বড়র সন্ধান পেয়েছে সে কখনও এতে মজে না। অনেক তর্ক উঠতে পারে জানি, তবু topical, কিংবা pretty কবিতা মহান কবিতার সমধর্মী নয়। মহান কবিতা সেই লিখতে পারে যে রিয়ালিটির সন্ধানে থাকে। ব্র্যাডলের ভদ্রজনোচিত রিয়ালিটি নয় হে! সেটা অনেকটা রোলস্ রয়েসের রিয়ালিটি। (২) তোমার শ্লেষযুক্ত কবিতায় একটু গলা খাঁকারির আওয়াজ পাই। অথচ উইণ্ডহ্যাম লুইসের মতোপযোগী satirist তুমি নও। দূরে রাখার চেষ্টাতে যতটা বিদ্রূপ আসে ততটাই তোমার সামর্থ্য। বিদ্রূপের বিপদ কোথায় তোমাকে বলতে হবে না, বই বিক্রি হয় না তো বটেই, কিন্তু অ-সাধারণত্ব-বোধের জন্য সমাজ-বোধ থেকে বিদ্রূপকারী নিজেই সরে যায়, এবং তাহতে, আমার মতে কবিত্বশক্তির হ্রাস হয়। প্রকৃত satire-এ একটা ঐতিহাসিক বোধ, অর্থাৎ tragic sense থাকা চাই। তা তোমার নেই। 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'য় তুমি অনেক চেষ্টা করেছ। চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়—কিন্তু ঐখানেই এক বড় কথা ওঠে। সমাজ-বোধ না থাকলে ঐতিহাসিক বোধ আসে না, আবার ঐতিহাসিক বোধ না থাকলে tragic sense জন্মায় না। কি করে 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' আমার প্রাণের বস্তু হতে পারে? তোমার মতন কে অত বিদেশী সাহিত্যে পণ্ডিত বল? কে তোমার মতন সাহিত্যে sophisticated হতে পারে? আমি স্বীকার করছি ঐ দুটি কবিতাগুচ্ছে একাধিক স্তর (strata) আছে। তাদের ভাব-পরিবর্তন ও সেই অনুসারে আঙ্গিকের পরিবর্তন আছে। কিন্তু সেগুলি phase-এরই অদল-বদল, তার বেশি, যাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণে ডাইন্যামিক বলি তা নয়। তোমার দেশী মেয়ে আমার মনে ধাক্কা দেয় না কেন? কেন আমার মনে রঙ ধরে না, কেন মুখে তেতো স্বাদ থেকে যায়? (রসিকতা নয়।) মামুলী ব্যাখ্যা, তুমি বুর্জোয়া, গ্রহণ করি না।

আসল কথা, অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যা, তোমার সমাজ-বোধ নেই। সমাজতত্ত্বের জ্ঞান হয়তো প্রচুর, কিন্তু সমাজবোধ অন্য কথা। সুধীন্দ্র দত্তেরও সমাজবোধ কম, কিন্তু তার পরিকল্পনা বৃহৎ, সে large terms-এ ভাবে, তাই খানিকটা রক্ষা পায় – খানিকটা, তবু পুরোপুরি নয়।

তোমার গদ্য কবিতার মুণ্ডিত রূপ আমার পছন্দই। তার bleakness দার্জিলিঙের নয়, মধ্য ভারতের—ঘাস নেই, গরু পর্যন্ত চরতে পারে না—(কি করে সুখ্যাতি আশা কর?)। অন্য ভাষায়—তোমার একাধিক কবিতা রুষ্ট্যালের মতন।

চিঠি বড় হয়ে গেল। দেশে অনেকে কবিতা লিখছেন, তাঁদের কবিতা স্মরণীয় বাক্যের মালা গাঁথা। কবিতা কিন্তু স্বয়ম্ভূ ও সম্পূর্ণ হলেই আমার ভালো লাগে। তারই আশ্রয়ে বাক্য, শব্দ ও ঝঙ্কারের মহিমা খোলা চাই। কবিতার অর্গ্যানিক ইয়ুনিটি আমি প্রত্যাশা করি। সেটা অবশ্য ভাবের বেগেও আসতে পারে, অনেকের মতে সেইটাই একমাত্র ইয়ুনিটি। কিন্তু নাও হওয়া সম্ভব। সম্ভব, তুমি প্রমাণ করেছ। এইজন্য কৃতজ্ঞ। লোকে বুঝলে না বলে আপশোস কোরো না। যে যাই বলুক, আমার স্থির বিশ্বাস তুমি কবি। আমার বিশ্বাসের মূল্য আমার কাছে আছে—অতএব বই লিখলেই খবর পাই যেন।

ভালো কথা—একটা সন্দেহ হয়, তোমার মনের একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে যেটা ঠিক আমরা যাকে এতদিন কাব্য-ভঙ্গি বলে এসেছি তা নয়…বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকের। নয় কি? ঠিক জোর করে বলতে পারছি না। ইতি

ভবদীয়

এই ধরনের চিঠি শ্রীবিষ্ণু দে-কে লিখতে পারতাম। এটা সাহিত্যের D. O. কিন্তু তাইতে অফিশিয়াল চিঠির চেয়ে বেশি কাজ হয় দেখেছি। তাই রচনাটি পরিচয়ে 'চোরাবালি'র সমালোচনা হিসাবে ছাপানো অশোভন হবে না।

অরণি, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪২

পূর্বলেখ

কবিতা ভবন, ১৯৪২

সমর সেন

আমাদের কাব্যে বিদেশী প্রভাব যথেষ্ট থাকাটা অনিবার্য। জাতীয়তাব জয়গানে উদভ্রান্ত হয়ে অনেক রসিক কাব্যকে খাঁটি স্বদেশী করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ইতিহাসের গতিতে সেটা সম্ভবপর হয় নি। ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালি প্রথম বিদেশী ভাষার সাহায্যে বিদেশী শিক্ষা পায়, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের প্রাণধারা জাগ্রত ছিল বলে ভাবের সমন্বয় সম্ভব হয়। মাইকেল মধুসূদনের অসাধারণ কাব্য এ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে সেকালের শিক্ষা আমাদের মনে অনেক আজগুবি জিনিসের সৃষ্টি বরাবর করে চলেছে, এবং অনেক সময়ে আমাদের চিন্তাধারায়, আমাদের ব্যবহারে একটা নিরালম্ব, শূন্যজীবী ভাব এনেছে। ক্রান্তিকালে এ ভাবটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মেকী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিভাবানেরা প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু বিদেশী ভাব গ্রহণে তাঁরা কুণ্ঠিত বোধ করেন নি, কারণ সাহিত্যের জনযুদ্ধে বয়কট আন্দোলন বোধহয় চলে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিদেশী প্রভাবের অভাব নেই। তিনি নিজ বলে পরকে আপন করেছেন, একটি জাতির কবিতা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। কিন্তু যে প্রতিভার মুক্ত ধারায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে পরবর্তী নিকৃষ্ট লেখকদের হাতে সে ধারা কলের জলের মতো তরল গতিতে চলতে শুরু করল। কবিতা যে বুদ্ধিবৃত্তির উপর যথেষ্ট নির্ভর করে, হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্কের দাম যে কোনো অংশে কবিতায় কম নয়, এ কথাটা পরবর্তীরা বেমালুম ভুলে যেতে শুরু করেন। তাঁর জীবনদর্শন কালক্রমে অধিকাংশ লেখককে মানসিক পরিশ্রমের দুরূহ ভার থেকে মুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে লেখায় বরাবর মোড় নিয়েছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, নিত্য নতুন বিস্ময় জাগিয়েছেন, কিন্তু সাধারণ লেখকেরা তাঁর ভাব ও ভাষার টুকরো ভাঙিয়ে জীবনযাপন করতে লাগলেন।

এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে কয়েকজন সাহিত্যিকের আবির্ভাব বাংলায় হয়, যাঁরা লেখায় কঠিন সংযম ও বুদ্ধিবৃত্তি ফিরিয়ে আনতে

সচেষ্ট হন। তাঁরা বুঝলেন যে হৃদয়ের কল ঘুরিয়ে ছন্দের তোড় নামালেই কবিতা হয় না, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ঊনবিংশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার মনোনিবেশ করলেন, বুঝলেন যে আমাদের কাব্যজীবনে অলসতা ও অকর্মণ্যতা সম্ভবপর হয়েছে তার কারণ এই যে, বাকতাল্লা সত্ত্বেও আমরা অতীতের বাংলা ঐশ্বর্যের সন্ধান করি না, আমাদের সাহিত্যাগ্রজদের স্বচ্ছন্দ রসবোধ এবং সহজ আক্কেলজ্ঞান থেকে ক্রমশ আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেছি। এ সঙ্গে তাঁরা দেখলেন চারিদিকে ধ্বংসের রূপ, সমাজে সংহতির অভাব, মনের ও কর্মের জীবনে নৈরাজ্য জয়ী, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ থেকে সামাজিক জীবনের মূলসূত্র অদৃশ্য প্রায়। এ পরিস্থিতিতে আশাবাদী হওয়া ও তরলকণ্ঠে ছন্দে স্ফূর্তি করা বিরাট প্রবঞ্চনা, এ উপলব্ধি তাঁদের কাব্যে নৈরাশ্য ও বিদ্রূপের স্বর আনল। কোনো সম্পূর্ণ সক্রিয় জীবনদর্শন না মানলে এ বিদ্রোহ সস্তা সিনিসিজম-এ শুরু ও শেষ হত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩০-এর আন্দোলনের পর থেকে বামপন্থী ভাবধারা বাংলায় বিস্তারলাভ করে। বামপন্থী সমালোচনা কতদূর সার্থক হয়েছে জানি না, কিন্তু অন্তত এটা বামপন্থীরা বোঝাতে পেরেছেন যে সঙ্কীর্ণ কেন্দ্রে আসীন হয়ে সাহিত্যচর্চা করলে সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়, ঐতিহ্যের সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না সাম্প্রতিক জনজীবনের সঙ্গে কোনো রকম সংযোগ থাকে, উপরন্তু লোকায়তে নিজেকে বাঁধলে লোকোত্তরের সন্ধান মিলতে পারে। বামপন্থী চিন্তাধারা আত্মম্ভরিতার হাত থেকে অনেককে বাঁচিয়েছে।

বিষ্ণু দে-র 'পূর্বলেখ' প্রসঙ্গে উপরের ভূমিকা আবশ্যক। কারণ তাঁর লেখায় উপরে বর্ণিত কয়েকটি ধারার আবির্ভাব ও গতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বিদেশী প্রভাব মেনে নিতে, বিদেশী পুরাণের নিরন্তর উল্লেখ করতে তিনি কখনো ডরান নি, উর্বশী ও আর্টেমিস দ্রষ্টব্য। আমাদের মতো অনেকে তাঁর পূর্ব লেখায় অস্বস্তিবোধ করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরে নিয়েছেন যে অন্তত দেশী ও বিদেশী পুরাণের স্বভাবগত ঐক্যের সন্ধান তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় আছে। বিষ্ণুবাবু ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, তাঁর কাব্যে ব্যর্থতাবোধ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে যে অন্তত 'চোরাবালি' পর্যন্ত তাঁর বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি খুব সার্থক হয় নি, কারণ 'শিখণ্ডীর গানে' যে শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তারা এতই অসার যে তাদের সম্বন্ধে কবিতাও সার্থক হতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রতিক রচনায় বিষ্ণুবাবুর ব্যর্থতাবোধ আরো গভীর হয়েছে, কারণ তাতে বেদনাবোধের প্রমাণ আছে;

তাঁর আধুনিক লেখায় সক্রিয় জীবনদর্শনের নিদর্শন পাওয়া যাওয়া যায়, যে দর্শন কয়েকটি উগ্র বামপন্থীদের কাছে অসার হতে পারে, কিন্তু যার গতি সত্যিকারের বামপন্থী বা হিউম্যানিজম্-এ প্রতিষ্ঠিত।

বিষ্ণুবাবুর একটি মহৎ গুণ এই যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ। এ নিরপেক্ষতার জন্য তাঁর কবিতায় পরিবর্তন তিনি আনতে পেরেছেন, এবং হয়তো বামপন্থী প্রভাবে তাঁর নিরপেক্ষতা শেষপর্যন্ত আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয় নি। তাঁর সাম্প্রতিক লেখায় আমাদেব আশা নিরাশা ও বিক্ষোভ সংযত ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে এবং এ সবের পিছনে গভীর সূত্রের সন্ধান তিনি করেছেন। বাস্তবজীবনে দেশবিদেশেব কাব্যের প্রতিচ্ছবির সন্ধান কবি-কিশোরের থেমেছে,

> নাট্যকাব্যে সাঙ্গ হল নেপথ্যে বিহার।…
> বলিষ্ঠ বিলাসে ক্লান্ত স্বয়ম্বর মন।

আদিজননীর সহস্রবাহু নীড়ে তীর্থযাত্রী বামার সন্ধানী, কিন্তু চারিধারে সরীসৃপ ধূর্ত নাগরিক অর্থকামস্বর্গছিদ্র ঘুরে ফিরে খোঁজে, বক্রগতি উদ্ধত কৌরবের জয়পতাকা উড্ডীন, উপলব্ধি হয় আত্মম্ভরী কাজে স্বয়ম্ভূ প্রকাশ আর সম্ভব নয়, ব্যক্তির কৈবল্যে বাহুল্য ব্যক্তিও। বিষ্ণুবাবুব এ সব কবিতায় মহাভারতের শেষের দিকের কয়েকটি অধ্যায়ের উল্লেখ বারে বারে পাওয়া যায়, কারণ একদা গর্বিত বণিক—সভ্যতাব মুমূর্ষার সময় মহাভারতের সেই দৃশ্য স্মরণীয় যেখানে বিরাট প্রতিষ্ঠাব পর অর্জুন গাণ্ডীবধনু তুলতে অক্ষম হন। এই পৌরাণিক ঘটনাব সঙ্গে বর্তমান জীবনের সাদৃশ্য 'পদধ্বনি' কবিতায় বিষ্ণুবাবু মহৎভাবে আমাদের সামনে এনেছেন :

> ঘুমন্ত নগর, ঘরে ঘরে খিল,
> ঊর্দ্ধশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদবযুবাদল
> অতীতঅর্জিত সুখে এলোমেলো অলসভোগের
> স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল।

ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টিতে, দুটি যুগের প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যের ইঙ্গিতে এ কবিতাটি স্মরণীয়। বিষ্ণুবাবুর কাবতায় জন্মাষ্টমীর ঘটনা অনেকবার উল্লিখিত। সমাজের অন্তিম গ্লানির ছবি শুধু তিনি দেখেন নি, মুক্তির ইঙ্গিত করেছেন। 'জন্মাষ্টমী' অনেকটা সংগীতধর্মী, বিচিত্র স্বরে নানা ব্যক্তি ও ঘটনার স্রোতে প্রবাহিত। এর বিস্তারিত সমালোচনা সময়সাপেক্ষ। যে মুক্তি 'জন্মাষ্টমী'-র রূপকের

সাহায্যে তিনি দেখেছেন ফিনল্যাণ্ড-যুদ্ধের উপর লেখা 'পদধ্বনি'র শেষ কয়েকটি লাইনে সেটি আমাদের পরিচিত রূপ নিয়েছে :

চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজলা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বৃদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?

'পূর্বলেখ' এত বিচিত্র কবিতায় ধনী যে বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন। বিষ্ণুবাবুর কবিতায় সংগীতের প্রভাব যথেষ্ট আছে এবং সেটি তাঁর কাব্য-শক্তির অন্যতম উৎস। 'পদধ্বনি', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি ছাড়া 'সপ্তপদী' এ প্রভাবের নিদর্শন।

'পূর্বলেখে'র শেষাংশে কয়েকটি অনুবাদ আছে। এদের মধ্যে এলিয়টের কবিতাগুলির অনুবাদ সচল, লরেন্স-এর কবিতা বোধহয় অনুবাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ তাঁর গদ্যকবিতা অপেক্ষাকৃত তরল।

আমাদের প্রিয় অনেক আদর্শ ও দেশ আজ রাহুগ্রস্ত, মড়ক দিগ্বিজয়ী। বিষ্ণুবাবুর একটি সনেট নানা কারণে আমার স্মরণীয় লাগে, সেটি থেকে উদ্ধৃত করে এ সমালোচনা শেষ করা যাক।

মাতা তার পথচারী, অন্নের আদিম অন্বেষায়।
দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভবাহনে।
ঠগে ঠগে গাঁ উজাড়, বর্গী এল শ্রাবণ প্লাবনে।
গলিতবলভী ঘরে মুক্তদ্বারে যুগান্ত-হ্রেষায়
নির্বোধ নির্বোধ শিশু হাসে একা আনন্দিত মনে!

'কবিতা', চৈত্র ১৩৪৮

পূর্বলেখ

কবিতা ভবন, ১৯৪১

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'পূর্বলেখ' শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, বিষ্ণুবাবুর কাব্যবিকাশের দিক থেকেও তৃতীয় পর্যায় সন্দেহ নেই। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'চোরাবালি' এবং 'চোরাবালি' থেকে 'পূর্বলেখ'—প্রত্যেকবারই তিনি বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হয়ে চলেছেন।

প্রথম কবিতা 'বিভীষণের গান' যেন ফতোয়া কবিতা। রাক্ষসরা স্বর্ণলঙ্কা গড়েছিল লুণ্ঠিত অর্থে, বিভীষণ তাদের দিক ছেড়ে গেল মানুষের দিকে, নির্যাতকের শ্রেণী ছেড়ে নির্যাতিতের শ্রেণীতে। কবিও দিক বদল করেছেন। টীকায় সাধারণ শোনালো, কিন্তু বিষ্ণুবাবুর কাব্যে অপরূপ। সেটাই প্রতিভা, দিক বদলটুকু উপলক্ষ্য হয়তো। তবু সার্থক সন্দেহ নেই; কারণ এতদিন তাঁর কবিতায় বিশ্বাসের মূলসূত্র ছিল না, 'পূর্বলেখে' তা এল। এটা তাঁর অগ্রগতির প্রধান লক্ষণ বলে মনে করি, কারণ মহৎ কাব্যে বিশ্বাস, তা যে জাতেরই হোক, অনিবার্য: নইলে শেষ পর্যন্ত দানা বাঁধে না। এবং সবচেয়ে সুখের কথা বিষ্ণুবাবুর বিশ্বাস বিচারনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপ্রসূত।

> আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
> মন্থিয়া নীল অভ্রচক্র ঘর্ঘরে
> লুকাব না কেউ প্রাকারছায়ায় গহ্বরে!
> স্বাগত গেয়েছি স্বগতে নাচার দীর্ঘকাল,
> হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে মোরা সন্দিহান।

ঠাট্টা আছে কিন্তু আভিজাতিক ভঙ্গিটা নেই। 'চোরাবালি'-র চটুল ও চালিয়াৎ নায়কনায়িকাদের দেখা পেলুম না। আজকের মিছিলটা একেবারেই আলাদা—

> বীরদল চলে হাজারো মজুর
> লাখো কৃষাণ।

সামাজিক ক্ষয়ের চেতনা কবির মধ্যে অনেক বিশাল ও গভীর হয়েছে। একটা স্ফূর্তির ভাব অবশ্য আছে, কিন্তু সেটাও হাল্কা নয়, তাছাড়া পটভূমি 'চোরাবালি'র চেয়ে অনেক ব্যাপক। ধরুন 'মুদ্রারাক্ষস'। বিষ্ণুবাবু বলে নিয়েছেন, 'কবিতাগুলির অধিকাংশই ১৯৩৮-৪০ সালে সামাজিক উপলক্ষ্যে বা ফরমায়েসে লিখিত।' উপলক্ষ্যটা হয়তো হালের কোনো রাজনৈতিক সভা, অন্তত তাতে বাহান্নটি বলদের সঙ্গে একান্নটি প্রণামের যোগাযোগ ঘটিয়ে কৌতুক জমে বেশি। এর সঙ্গে 'চোরাবালি'র ব্যঙ্গ কবিতাগুলির তুলনা করুন ('কবিকিশোর' বা ওই ধরনের যাই হোক)— কবি সেখানে চঞ্চল ও অতৃপ্ত সন্দেহ নেই, তাঁর নায়কনায়িকারাও খেলো, অন্তঃসারশূন্য। তবু কবির জগৎ এদের নিয়েই। অর্থাৎ দৃষ্টি যথেষ্ট ব্যাপক হয় নি।

'চোরাবালি'র প্রেমের কবিতা বিস্ময় এনেছিল, সেখানে কবির সুকুমার মন ধরা পড়েছে। অভিজ্ঞতা আর চিন্তার দিক থেকে সে মন তখনো এত বিজ্ঞ হয় নি, কিন্তু প্রত্যেকটি কোমল বৃত্তি সৃজনশক্তিতে অপূর্ব। উদাহরণ— 'ঘোড়সওয়ার', 'ক্রেসিডা' ইত্যাদি। 'পূর্বলেখে' এ মন বিজ্ঞ হয়েছে, ভোঁতা হয় নি। আধুনিক মনে প্রেমের যে বিকাশ তা অবশ্য 'চোরাবালি'তেও ছিল, প্রেমের বিকৃতি নিয়ে বিক্ষেপও ছিল, কিন্তু মোটের উপর একটা হাল্কা ভাব—

> তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে
> উদ্বায়ু আজো হয় নি আমার মন।

এর সঙ্গে 'পূর্বলেখ'র তুলনা করুন,

> বিদায়! তন্বী! পৃথুল পৃথিবী তোমাকে ডাকে
> সভ্য লোকের প্রবল স্বার্থে, হে বন্দিনী!...
> তুমি ভেসে যাবে তুচ্ছ মেদের স্বচ্ছলতায়...

মন বিজ্ঞ হয়েছে, তাই বিপদটাও অনেক গভীর। ভাবালুতা নেই, কারণ কবি জানেন এ সমাজে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। তবু তিনি পাকা সংসারীর ভান করে সিনিক-সুলভ মুখোস খুঁজছেন না, ওটাও এক ধরনের বক্র ভাবালুতাই। ভাবুকভাবটুকু রইল শুধু।

'পূর্বলেখ'র প্রধান কবিতা 'জন্মাষ্টমী' আর 'পদধ্বনি'।

'পদধ্বনি' মহাভারতের মৌষল পর্বের শেষ দুটি অধ্যায়কে আশ্রয় করে লেখা: যদুকুল ধ্বংস হয়েছে, ধনঞ্জয় তখন যদুবংশীয় কামিনীগণ ও ধনরত্ন

নিয়ে পঞ্চনদ দেশে। এমন সময় দস্যুদল আক্রমণ করল, কুরুক্ষেত্রের বীর বাধা পর্যন্ত দিতে পারল না, তাও নিছক শক্তির অভাবে। মহাভারতের ঐতিহ্য যাঁদের মনে আছে তাঁরা বোঝেন কী বিরাট ট্র্যাজেডি। নাটকীয় পরিস্থিতির চূড়ান্ত। এই বিরাট নাটক বিষ্ণুবাবু মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় পুরে দিয়েছেন, মহাভারতের আবহাওয়া ছিল তাঁর গম্ভীর বলিষ্ঠ ছন্দে।

চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কানে তার মত্ত পদধ্বনি,
ক্ষমা করো অতিক্রান্ত জীর্ণ অসুয়ারে।
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার!
হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয়।

মনে মহাভারতের সংস্কার থাকলে এ-কবিতা পড়ে একটা প্রথম শ্রেণীর নাটক পড়বার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়, এবং এটুকুতে শেষ হলেও কম নয়। কিন্তু পুরো কবিতার প্রতীকটা যদি নেওয়া যায় তা হলে রস আরো জমবে সন্দেহ নেই, কারণ তা হলে এটা একেবারে আজকের দুনিয়ার কবিতা। ধনঞ্জয় তখন পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রতীক। যতদিন এ সভ্যতার শিরায় রক্ত ছিল যৌবনে চঞ্চল, ততদিন তার ইতিহাস শুধু দিনের পর দিন জয়ের ইতিহাস। এখন ভাঙন ধরেছে, পুরোনো শক্তি নেই, স্মৃতিটুকু আছে মাত্র। তাই অনার্য আক্রমণে বাধা দিতে পারে না, একে দস্যুবৃত্তি বলে অথর্ব অভিসম্পাত করে শুধু—

স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী, বার্ধক্যবাসরে
সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন
তবু অভিমানী
কেন অকারণ পক্ষ বিধুনন! আর সেই পদধ্বনি!
ও কি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাকপুরাণিক প্রাণী—

এই প্রতীকী অর্থ গ্রহণ করলে দেখব 'পূর্বলেখ' ঠাসবুনোনির চাদর, আর টানাপোড়েনে দুদিকের সুতোই চিন্তার পাকে মজবুত। অর্থাৎ ব্যাপ্ত দৃষ্টিতে প্রত্যেক কবিতায় যে বিশ্বাস সমষ্টিদৃষ্টিতে সমগ্র গ্রন্থে তারই বিকাশ। এতে প্রমাণ হয় বিশ্বাসটা গভীর আর ব্যাপক।

চিন্তার দিক থেকে 'জন্মাষ্টমী' বিষ্ণুবাবুর চরম রচনা। নানান ছবি,— এলোমেলো, অনেক সময়ে একান্তই খাপছাড়া। একেবারে আধুনিক মনের প্রতিচ্ছবি। শৃঙ্খলা দূরের কথা, একটা শান্তভাব পর্যন্ত নেই। প্রচ্ছদপটের

ছবিটা জলজলে হয়ে ওঠে, ভাঙাচোরা, বিশৃঙ্খলতা, বীভৎসতা। সেখানেও আধুনিক মনকে শিল্পী নগ্নভাবে এঁকেছেন। বস্তুত যামিনীবাবুর ছবির সঙ্গে আধুনিক কাব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; দুয়ের উৎস এক, প্রভেদ শুধু ভাষায়।

আধুনিক মনের ভগ্নস্তূপে সংলগ্নতা অন্বেষণ নিষ্ফল—সমাজের ভিত্তি প্রলাপের ভিত্তি, তার প্রতিচ্ছবিতে সংলগ্নতা জুটবে কোথা থেকে? অবশ্যই সচেতন শিল্পী জানেন এই প্রলাপই চরম কথা নয়, ইতিহাসের রথচক্র ঘুরবে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে আসবে নবজন্ম। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত প্রলাপটা প্রলাপই।

'জন্মাষ্টমী'-র কথাও এই। এ জীবনের ব্যর্থতা, পঙ্গুতা কবির মধ্যে প্রায় আবেশে পরিণত হয়েছে। অবশ্যই তিনি জানেন এতেই শেষ ..., তাই বলে এখন থেকে জয়গান ধরাটাও শৈশবসুলভ। 'জন্মাষ্টমী'তে নবজন্মের প্রার্থনা রইল, জয়গান নয়। বৈশ্য সভ্যতার শুরুতে যে জয়গান এসেছিল আজকের কবি তাতে সান্ত্বনা পেলেন না—"বন্ধু, ও গান নয়।" নতুন গান আসবে, নবজাতকের গান, জন্মাষ্টমীর গান। কিন্তু এখন তা কোথায়?

অগণন ভিড়াক্রান্ত এ সহরে, হে সহর স্বপ্নভারাতুর!
লেক আর খালপার, এস্‌প্লানেড্ আর চিৎপুর!

কবি তবু দৈনিক পত্রিকার কেরাণী নন, শুধু রিপোর্ট সংগ্রহই তাঁর কাজ নয়। বর্ণনায় শৃঙ্খলা না থাকলেও ব্যক্তিত্বের সংহতি রইল। এলোমেলো ভাঙাচোরার মধ্যেও তাই আর একটা একটানা সুর পাই, কবির সুকুমার মন থেকে সে সুর উঠ্‌ছে, সে মন সুন্দরকে চায়।

উদাহরণ—

আমি যেন গ্রাম্যজন
বসে আছি বিমূঢ়, উৎসুক,
সংসারের কচঙ্গনে বিকিকিনি বাকি থাকে,
কেটে যায় বেলা—ইত্যাদি

কিংবা

অমাকৃষ্ণ তমিস্রারে দুই হাতে ঠেলে ঠেলে কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে
চলেছে দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়ায়ে রিক্ততা—ইত্যাদি।

অথচ প্রতি পদে ব্যর্থতা, সব আশা ভেঙে চুরে মিশমার হচ্ছে। 'জন্মাষ্টমী' এই জুড়ি সুরের গান।

অবশ্যই 'জন্মাষ্টমী' ও 'পদধ্বনি'—এবং 'পূর্বলেখ'র প্রায় সমস্ত কবিতায়—সবচেয়ে আশ্চর্য বিষ্ণুবাবুর ছন্দকৌশল। সংগীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকায় সে আলোচনা বালিশভাষণে পরিণত হবার ভয়, তাই বিরত হলুম। যোগ্যতর সমালোচক ওদিকে মন দেবেন আশা করি।

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৫২

সাত ভাই চম্পা

ঈগ্‌ল পাবলিশার্স, ১৯৪৫

বুদ্ধদেব বসু

'সাত ভাই চম্পা' '২২শে জুনে'র পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। 'চোরাবালি' বা 'পূর্বলেখ'র মতো বিষ্ণু দে-র একটি প্রধান কাব্যগ্রন্থ এটি নয়, কিন্তু স্বল্প পরিসরের মধ্যে এটি তাঁর পরিণতির বেগবান বাঁক।

বিষ্ণুবাবুর শব্দচেতনা অতি প্রখর। তাঁর কবিতায় কোনো কথাই মড়ার মতো পড়ে থাকে না, প্রত্যেকটি কথাই নড়ে চড়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। পুরোনো কথায় নতুন প্রাণ আনতে পারেন তিনি, কথাকে সহজে পোষ মানাতে পারেন। এই কারণে তাঁর কোনো কবিতাই নীরস হয় না, নিছক প্রপাগাণ্ডার পদ্যও উপভোগ্য হয়, এবং এই একই কারণে অনুবাদে তাঁর সাফল্য প্রায় অবধারিত—এ-বইয়ের অনুবাদ-কবিতার প্রত্যেকটিতে কৃতিত্বের পরিচয় আছে। মূল কবিতাগুলি বেশির ভাগই জনযুদ্ধ, জাপানি আক্রমণ, চোরাইবাজার প্রভৃতি সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা: কবিত্বের চাইতে চতুরতার অবকাশই সেখানে বেশি—কিন্তু সাময়িককে তিনি মহিমান্বিত করেছেন প্রথম সনেটটিতে ('২২শে জুন ১৯৪১') এবং জাত কবিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন শেষ সনেটে ('সূর্যাস্ত')। এই শেষ কবিতাটির সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা বিদ্যুতের মতো মনের উপর দিয়ে ঝলসে যায়, কিন্তু বিদ্যুতের মতো তখনই নিবে যায় না। এ-

বইয়ের দীর্ঘতম কবিতা 'কোডা'য় এই আভা স্থানে-স্থানে লেগেছে, কিন্তু সমগ্র-ভাবে দেখতে গেলে, প্রথম ও শেষ সনেট দুটিই এ-বইয়ের উজ্জ্বলতম শিখর। তার মানে এই নয় যে বইয়েব অন্য কবিতাগুলি শুধুমাত্র প্রচারের বাহন। আকাঁড়া প্রপাগণ্ডাও বিষ্ণুবাবু করেছেন, কিন্তু 'ভারতীয় বিমানবাহিনী' ও 'মফস্বলে'র আবেগময় গাম্ভীর্য, 'বুড়ো-ভোলানো ছড়া' আর 'কতবার বল কত না দস্যু'-র হালকা ধারালো চাল মনের মধ্যে সেই অনুরণন জাগায়, কবিতা ছাড়া আর কিছুই যা দিতে পারে না।

'এক পৌষে শীত পালায় না' কবিতায় বিষ্ণুবাবু ছন্দ নিয়ে একটু নতুন রকমের পরীক্ষা করেছেন। একই কবিতার মধ্যে তিন মাত্রার ছন্দ আর পয়ার তিনি যথেচ্ছভাবে মিশিয়েছেন, মেশানোতে কোনো শৃঙ্খলাও রাখেন নি। আবার কোনো-কোনো পংক্তি এমন করেছেন যাতে দু-ভাবেই পড়া যায়। ফলে কবিতাটিতে একটি বিশৃঙ্খল চেহারা এসেছে, পড়তে গিয়ে বারে-বারে হোঁচট খেতে হয়, এবং সাধারণ পাঠক যে এ-কবিতা ছন্দ ঠিক রেখে পড়তে পারবে, তার কোনোই আশা আছে বলে মনে হয় না। এ-রকম মিশ্রণ অনুমোদন করা যায় না—এতে অনর্থক কবিতার রস-ঘনতাকে বিক্ষিপ্ত করা হয়। আর কোথাও-কোথাও ছন্দের বৈষম্য লক্ষ করলাম।

'বিষম মুক্তির শুনি আজ আহ্বান' ('জনযুদ্ধ') এ-লাইন যে-ভাবে পড়লে ছন্দ ঠিক থাকে, পুরো কবিতা সে-ছন্দে লেখা নয়, তাই এটিকে পয়ারই ধরতে হবে, এবং পয়ার ধরলে 'আহ্বান'-এ ছন্দ কেটেছে।

> 'কত বুলবুলি খেল কতো ধান,
> কত মা গাইল বর্গীর গান,
> তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
> এ-জনতার' ('এ-জনতার')

'অমর' এক মাত্রা কম আছে।

> 'রেলপথে তবু চলে বটে কিছু ওয়াগনের লেনদেন'
> (প্রতিরোধ')

> 'বাণপ্রস্থে বৃদ্ধ যযাতি, উধাও উর্জীর পিছে'
> *(I am Cinna the poet)*

> 'ভবিষ্যের অঙ্গীকার ছড়ায়। তোমার দিনগুলি
> ('জঙ্গী')

> 'পার্টির শ্লোগানে জোগান দেব তো, কিউ করো ভাই' ('চা')

প্রত্যেক পংক্তিতেই ছন্দ কেটেছে। তা ছাড়া 'কুইনীনহীন' কিংবা 'মহাহবে'-র মতো কথা আর 'বারেক' কথাটির পুনরুক্তি বিষ্ণুবাবুর অযোগ্য। এ-কথা মনে করা অসম্ভব যে তাঁর মতো আত্মসচেতন কবির রচনায় এ-সব শৈথিল্য দৈবাৎ ঢুকে গেছে, নিশ্চয়ই তিনি কোনো কারণে শৈথিল্যকে সজ্ঞানে প্রশ্রয় দিচ্ছেন—সেটা বিপজ্জনক।

'ক্রেন', 'ফার্নেস' প্রভৃতি কথায় মূর্ধণ্য ণ আর কেন?

অরণি, ২৫ মে ১৯৪৫

সাত ভাই চম্পা

ঈগ্‌ল পাবলিশার্স, ১৯৪৫

অরুণ মিত্র

আধুনিক বাঙালি লেখকদের, বিশেষত কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে দুটি বিরল গুণের অধিকারী। তাঁর উদ্যম প্রবলবেগ। প্রচুর কবিতা তিনি আগে লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। তাঁর সদ্য-প্রকাশিত পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'সাত ভাই চম্পা' (যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে '২২শে জুন') তার প্রমাণ। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তীব্র মানসিক সচেতনতা। সমসাময়িক সমাজ তাঁকে কাব্য রচনার অসাধারণ প্রেরণা জুগিয়েছে। পারিপার্শ্বিকের প্রতি তাঁর মনের অবিরাম সাড়া লক্ষ করবার মতো। এ গুণের ও সাক্ষী 'সাত ভাই চম্পা'। আমাদের দেশ যে ভাঙাচোরার মধ্যে দিয়ে চলেছে, ঘরে-বাইরে যে সংগ্রামে তার জীবন উদ্বেল হয়ে উঠেছে, যে অজস্র সমস্যা তাকে নির্মমভাবে টলিয়ে দিয়েছে গত কয় বছরে, তা অন্য কোনো কবির বেলাতেই এত কবিতার উপাদান হয় নি।

এই সজীব মনই কবি বিষ্ণু দে-কে তাঁর সাবেক জায়গায় থেমে থাকতে দেয় নি; তিনি ক্রমাগত এগিয়ে এসেছেন। তাঁর প্রথম আমলের বাঁকা সাড়া ক্রমে ঋজু হয়ে এসেছে। এককালে তাঁর মনের যে অন্তর্মুখী প্রতিক্রিয়া প্রায়ই আত্মগোপনে দুর্বোধ্য হয়ে উঠত, এখন তা আত্মপ্রকাশে ত্রাণ খুঁজছে।

সেই যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসার স্বস্তি 'সাত ভাই চম্পা'য় আগাগোড়া জড়িয়ে আছে। এবং হয়তো এই মুক্তির উত্তেজনাতেই তিনি এ গ্রন্থে বেশি ঝুঁকেছেন সরল বিবৃতির দিকে।

ভবিষ্যৎ 'সমসমাজের' প্রতি বিশ্বাস, ভারতের অমর জনসাধারণের অবধারিত মুক্তিতে বিশ্বাস, বিশ্বব্যাপী অত্যাচারের শক্তিকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতায় বিশ্বাস 'সাত ভাই চম্পা'র মূল সুর। এই কারণে সমসাময়িক কাব্যে এ গ্রন্থ মূল্যবান। সব চেয়ে নজরে পড়ে এর কবিতাগুলির রচনার ঘনসংবদ্ধতা। এ বিষয়ে বিষ্ণু দে-র আগেকার রচনার সঙ্গে 'সাত ভাই চম্পা'র সমতা আছে। সমতা নেই আবেগের অনুপাতে। এতে খোলা-হাওয়া যতটা রয়েছে, আবহাওয়া ততটা জমে নি, যা তাঁর 'পূর্বলেখ' পর্যন্তও অটুট ছিল। সমস্ত জটিলতা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র আগেকার বহু কবিতা অনুভূতিকে প্রগাঢ়ভাবে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু 'সাত ভাই চম্পা'র প্রধান আবেদন যেন সোজাসুজি প্রত্যক্ষ আশাবাদী বুদ্ধির কাছে।

'সাত ভাই চম্পা'র কবিতাগুলির প্রকাশভঙ্গিতে কাঠিন্য আছে ; এমনকি তাকে পৌরুষ বলা চলে। তবে অল্প কবিতাতেই বক্তব্য আবেগের এই রকম সংহত তীব্রতায় পৌঁচেছে যেমন—

> সে কিশোর বীর!
> ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে
> নূতন চেতনাচৈত্য রচনা করে কি দুই হাতে
> বিপ্লবী পাথাতে, সোনালি ঈগল তার,
> চোখে সূর্য, পায়ে তার কর্ণফুলি মৌন, ইরাবতী
> প্রতীক্ষায় স্থির ?

অথবা

> যুগান্তে আজ ছিঁড়ে যায় বুঝি
> আল্‌গা মাটির কাল—
> নবজীবনের বীজবপনের
> প্রাণহারানোর ক্রুশে।

এই ধরনের তীব্রতার অভাব থেকে 'ধার্কণ্ড'-এর মতো কবিতা ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। সুদীর্ঘ 'কোডা'য় গাঢ়তা আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে বিবৃতির ঝোঁকে তাল কেটেছে। এ ঝোঁক অন্যান্য কবিতাতেও আছে। সাধারণ সহজবোধ্য কথাকে আড়ম্বর করে বলবার লোভ দমনের ক্ষমতা

বিষ্ণু দে-র কাছে প্রত্যাশা করি। অবলীলায় সার্থক কাব্যরচনার শক্তি তো এই গ্রন্থেই তিনি দেখিয়েছেন যার অন্যতম দৃষ্টান্ত 'বুড়ো-ভোলানো ছড়া'। প্রতিরোধের অভিব্যক্তি চলতি ছড়ার বাহনে এই কবিতার ধাপে ধাপে চড়ে শেষ দু-লাইনে চরমে উঠেছে। আশা করি, এই শক্তি তাঁর হাতছাড়া হবে না।

পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

রুচি ও প্রগতি

ঈগল পাবলিশার্স, ১৯৪৬

গোপাল হালদার

…যে প্রশ্ন 'সাহিত্যে প্রগতি' গ্রন্থে ডাক্তার দত্ত [ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত] উত্থাপনও করেন নি, সেই প্রশ্নেরই প্রধানত উত্তর আছে কবি বিষ্ণু দে-র 'রুচি ও প্রগতি' নামক গ্রন্থে। অবশ্য শুধু সে প্রশ্নের নয়, আরও অনেক প্রশ্নেরও। কারণ এ গ্রন্থখানাও বিষ্ণু দে-র বারোটি প্রবন্ধ ও পুস্তক-আলোচনা নিয়ে গ্রথিত (এবং এ গ্রন্থেরও সূচি নেই), দু-একটি প্রধান প্রবন্ধ 'পরিচয়ে'ই প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' এ গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ। ডাক্তার দত্ত সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, সাহিত্যিকদের সাহিত্য-বিচারের অবলম্বিত মাপকাঠি অন্যরূপ। কবি বিষ্ণু দে তা বিশেষ করেই জানেন, তাতে বীতশ্রদ্ধও নন। কিন্তু তিনি জানেন যে, জীবনের দিকে না তাকালে সাহিত্যিকের মনের ব্যাপ্তি ও রূপান্তর হতে পারে না; আর "সাধারণের জীবনেই তো এ মানস-সরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত। এই উৎসের সন্ধান কেউ হয়তো জীবনযাত্রার কর্মধারায় পান, কেউ জনগণমন-অধিনায়কদের খুঁজে পান ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতিতে।" (পৃ ১-২)। "সজীব রচনাতে তাই শিল্পী ও শিল্পবস্তু বিষয় ও টেকনীকে টান পড়ে জ্যাবদ্ধ ধনুকের টঙ্কারে ধনু ও ছিলার টানের মতো। লক্ষ্যভেদের লক্ষ্য হয়ত অনেক সময়ে সরাসরি চেনা যায় না, ধনুর্ভঙ্গও হতে পারে।

তবু প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হল, এই চৈতন্যে জ্যাবদ্ধ টান।” (পৃ ২)। সেই জ্যাবদ্ধ ধনু থেকে কবি বিষ্ণু দে ক্ষিপ্র হাতে শর সন্ধান করেছেন শিল্পী-মানসের এ সম্পর্কিত প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্নের প্রতি, “আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনের গহ্বর নিষ্ক্রান্ত স্বয়ম্ভূ জীব না ভেবে, সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যার অংশ এই উপলব্ধির চর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়।” কারণ, “দৃষ্ট ও জ্ঞেয় দ্রষ্টার জ্ঞানে জারিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তনে তাঁদের (লেখকদের) পরিণতির ক্রান্তি। Interpretation তাই change-এ সম্পূর্ণ।” (পৃ ৩)। মার্কসীয় দর্শনের এই জীয়ন্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে তিনি তারপর বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ‘দেবদেবী ভাঙাগড়া’ ও ‘নর-নারী সম্বন্ধের বিদগ্ধ চর্চা’ থেকে একেবারে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর শিল্প-জিজ্ঞাসা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। অসাধারণ মৌলিকত্ব ও সূক্ষ্ম শিল্পীদৃষ্টি ছাড়াও যা এ প্রবন্ধে চমৎকৃত করে তা হচ্ছে এত অল্প পরিসরে এত গভীর ও ব্যাপক বিষয়ের আলোচনার শক্তি।

কিন্তু বিষ্ণুবাবুর এই শক্তির বিরুদ্ধেই পাঠক-সাধারণের অভিযোগ হবে বেশি। শুধু কাব্যে নয়, প্রত্যেক ‘সম্বোধনের শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য’, নিশ্চয়ই বিষ্ণুবাবু তা মানবেন। তাই, শ্রোতাদের এই অভিযোগেও তিনি একটু অবহিত হবেন। স্বীকার করতেই হবে—তাঁর প্রবন্ধ সাধারণের জন্য নয়। এমন কি, সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের পক্ষেও তাঁর আলোচ্য বিষয়ই শুধু যে সূক্ষ্ম ও গভীর তা নয়, তাঁর আলোচনা-রীতিও প্রায় সাঙ্কেতিক, প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ তা থেকে সযত্নে বর্জিত হয়েছে। তাঁর উজ্জ্বল কবি-বাক্যের জ্যা-মুক্ত তীর সময়ে সময়ে তাই লক্ষ্য ভেদ করে না; তির্যক-গতিতে তা পাঠক-মানসের চক্র স্পর্শ করে-না-করেই ছিটকে পড়ে। কিন্তু যেখানে তা লক্ষ্য ভেদ করে সেখানে তা অমোঘ; কবি-বাক্যের স্বাভাবিক নিয়মেই তা হয় অনিবার্য। এর প্রমাণ উপরের দু-একটি উদ্ধৃতির মধ্যেও রয়েছে। বারে বারে দুঃখ হয়, এমন বিদগ্ধ মন ও বুদ্ধি, এমন রসবোধ ও রসিকতা এবং নিপুণ বাক্য রচনা শিক্ষিত সাধারণের দাবিকে কেন স্বীকার করে না? তা যে ইচ্ছা করলেই স্বীকার করতে শ্রীযুত বিষ্ণু দে পারেন তার প্রমাণও রয়েছে রুচি ও প্রগতি'তে —‘জন-সাধারণের রুচি’, ‘সোভিয়েট শিল্প ও সাহিত্য’, এবং কয়েকটি গ্রন্থ-সমালোচনায় তা সাধারণ পাঠকও দেখতে পারেন।

‘রুচি ও প্রগতি’ সোয়া শ পৃষ্ঠার গ্রন্থও নয়। তথাপি তার পরিচয় দেওয়া এ কারণেই প্রায় অসম্ভব যে তাতে আলোচিত শিল্প-সমস্যা, বিশেষ

করে টি এস এলিয়ট ও পিকাশোকে উপলক্ষ করে শিল্পীর সাধন-মার্গ সম্পর্কে বিষ্ণুবাবু যে বিচার ও সিদ্ধান্ত করেছেন, এবং প্রায় প্রত্যেকটি ছোট বড় প্রবন্ধেই রুচি ও প্রগতির যে সব মৌলিক প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছেন, তা আরো সংক্ষেপে উল্লেখ করা অসম্ভব, কিন্তু প্রত্যেকটিই শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ্য এবং পাঠের থেকেও অধিকতর আলোচনার দাবি রাখে।…

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫৫

সন্দ্বীপের চর

দি বুকম্যান, ১৯৪৭

অরুণকুমার সরকার

…যে প্রগতিবাদ অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রে চিৎকৃত প্রস্তাব মাত্র, বিষ্ণু দে-র বেলায় তা, নিঃসংশয়েই বলা যায়, বসোত্তীর্ণ কাব্য। কর্মে ও কথায় সত্যকার আত্মীয়তা অর্জন করা সহজ নয়, সরল নয় যুক্তি ও ভাবজীবনের সংশ্লেষণ। যে-বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লেখেন আর যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধকার তাঁরা যে অভিন্ন ব্যক্তি তা বিশ্বাস করা রীতিমতো কঠিন। কিন্তু 'সন্দ্বীপের চর', মনে না হয়েই পারে না, 'রুচি ও প্রগতি'র একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি এবং শেষোক্ত গ্রন্থ বিষ্ণু দে-র কাব্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য নিশ্চয়ই অপরিহার্য।

মানবিক শুভদৃষ্টিতে এবং সম্পূর্ণতার প্রত্যয়বোধে এ-কাব্য অতুলনীয়। 'সন্দ্বীপের চর', এক কথায়, বিষ্ণু দে-র সমুদ্রযাত্রা এবং তাঁর সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমাদেরও।

> নিয়ে চলো…উত্তাল উর্মিল
> প্রতিশ্রুতি স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগরসঙ্গমে
> সহিষ্ণু ঘটনাস্রোতে, রুদ্র সমুদ্রের, সংগঠনে, স্বাধীন সমাজে
> স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছ জীবনের, জীবনের উন্মুক্ত প্রস্তনে
> সমুদ্র-স্বাধীন।

অথবা

> চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রসৈকতে

নীলে নীলে মুক্তি স্নানে, বালুকাবেলায়
শিশুর খেলায় স্বচ্ছ সমুদ্রের নীলামরকতে
স্ফটিকে পান্নায় মুহুর্মুহু রঙের খেলায়
হে তন্বী চূড়ালা ! ঊর্মিকলরোলে
জীবন মুখর যেথা সুস্থপ্রাণ স্বচ্ছল ভেলায়

যেখানে রাত্রিরা শুদ্ধ রাত্রি নীল রাত্রি নীলে কালোয় অসীম
যেখানে দিনেরা দীপ্ত দিন
সূর্যের নয়নে জ্বলে হীরক অম্লান শান্ত শীত জলে
ইন্দ্রনীল আকাশের বিস্তারে।

পাঠান্তে কার মন না উদ্দাম হয়ে ওঠে, অস্থির হয় না জীবনের জঙ্গমতায় ? আর 'সমুদ্র স্বাধীন' কবিতায় গঙ্গা, কাবেরি, নর্মদা, গোদাবরী, সিন্ধু, শতদ্রু, তিস্তা, যমুনা ইত্যাদির এবং 'চৈতে-বৈশাখে' কবিতায় কোকনদ, রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কুর, হস্তীগুম্ফা, কাম্বে, কচ্ছোপসাগর ইত্যাদির অপূর্ব প্রয়োগ আমাদের মনকে স্বল্পায়াসেই সুদূর দিগন্তপিয়াসী করে তোলে, যা, আশঙ্কা হয়, অন্য লোকের হাতে হয়তো ভৌগোলিক নামাবলির নির্ঘণ্ট হয়েই পরিসমাপ্ত হতো। বিষ্ণু দে-র অপরূপ শিল্পকার্য এ-সংগ্রহের প্রত্যেকটি দীর্ঘায়িত কবিতাতেই পরিস্ফুট এবং যদিও অনেকগুলি রচনা সাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক এবং আমাদের একটি শোচনীয় জাতিগত দুঃস্বপ্নের স্মৃতিবহ, তবু লেখকের কলা-কৌশলে আমরা তাৎকালোর গণ্ডিকে অতিক্রম করি ; 'কঙ্কালীতলা'য় আর নাম-কবিতাটিতে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বীভৎস চিত্রকেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হতে দেখি, এবং কবি যে ছিন্নদর্শীর জনতায় পথভ্রান্ত হন নি তা দেখে উল্লসিত হই, তাঁর কাছে আলোকের সন্ধান পাই, সান্ত্বনা পাই।

বক্তব্যের দিক থেকে বর্তমান সংকলনের অধিকাংশ রচনাই একটি আর একটির পুনরাবৃত্তি। তবু সুদক্ষ কারিগরিতে এবং মানবিক মূল্যের অঙ্গীকরণে, বর্তমানের যন্ত্রণার পাশাপাশি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে, মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার বলিষ্ঠ ইশারায় প্রত্যেকটিই স্বকীয়সার্থক। দুঃখের বিষয়, একই শব্দের অবিরাম ব্যবহার মাঝে-মাঝে কাব্যের সীমা অতিক্রম করে ডেমাগগির দিকেই অগ্রসর হয়েছে, তবে এমনতর অসংযমের উদাহরণ কমই। তাছাড়া প্রতীকগুলি প্রায়ই দেশীয় ঐতিহ্যঘেঁষা হওয়াতে ভাবানুষঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ততায় কবিতাপাঠ আনন্দময় হয়ে ওঠে।

উপযোগবাদীরা সম্ভবত 'সন্দ্বীপের চর' পাঠ করে সন্তুষ্ট হবেন না, কেননা এতে শিশুবোধ্যে সরলীকরণ নেই, প্রস্তাবের চাইতে প্রতীতিটাই স্পষ্টতর। সেই জন্যই বোধহয় এ-গ্রন্থ কাব্যের স্তরে উন্নীত, আর তাই বিষ্ণু দে র অনুপযুক্ত এমন দুর্বল পংক্তি আমাদের রীতিমতো পীড়া দেয়: 'মনুষ্যত্ব চোখে জলে, একমাত্র ধনীদরিদ্রের ভেদাভেদ মানুষের শত্রু যে তা তুমি তো ভোলো নি।'

এ-গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, আমার মনে হয়, 'আইসাথার খেদ'। এক চিরন্তন বেদনাবোধের উপর এর সংস্থান, পরিমিত-আয়ু মানুষের সন্ধ্যা মানসবিবরণ—স্মৃতিরোমন্থনে আনন্দ, জীবনের প্রতি লালসা, বর্তমানের প্রতি তির্যকচারী দৃষ্টি আর কালের উধাও যাত্রা। সাঁওতাল, উরাওঁ আর ছত্তিশগড়ী গানের অনুবাদ 'সন্দ্বীপের চরে'র অন্যতম আকর্ষণ, উল্লেখযোগ্য ১নং ছড়া, 'শালবন' নামক সনেটটি। কিন্তু ফরাসী কবিতার অনুবাদ একটিও ভালো লাগল না।

'নতুন সাহিত্য', অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

অন্বিষ্ট

ডি. এম্‌. লাইব্রেরি. ১৯৫০

মণীন্দ্র রায়

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ একটা ঘটনা। তার কারণ, তিনি যে শুধু প্রগতিবাদের একজন প্রধান প্রতিনিধি তাই নয়, তিনি আমাদের সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের ধারায় উল্লেখযোগ্য প্রাণশক্তি। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর কাল থেকে এ যাবৎ তাঁর প্রত্যেকটি রচনাসংগ্রহই বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন উত্তরোত্তর জীবনাভিসারী, আঙ্গিকের দিক থেকেও তেমনি দীর্ঘ পদক্ষেপ। 'অন্বিষ্ট' বিষ্ণু দে র অধুনাতম কাব্যগ্রন্থ।

কিন্তু আলোচনায় আর বেশি জড়িয়ে পড়বার আগে একটা কথা স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো। বিষ্ণু দে যে একজন প্রগতিবাদী কবি তা আগেই

বলেছি। সেই কারণেই জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত বাস্তব-অনুসন্ধিৎসু; বাস্তব জীবন, প্রত্যক্ষ সামাজিক ঘটনা তাঁর কবি-মানসকে প্রভাবিত করে। কল্লোল যুগের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্রূপপরায়ণতা, এবং আত্মকেন্দ্রিক গ্লানি, এসবেরই সাক্ষাৎ মিলবে শতাব্দীর তৃতীয় দশকে উৎপন্ন 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি'-তে। চতুর্থ দশকের প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েটের অসামান্য ভাবব্যাপ্তি, অন্যদিকে স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার এবং সে জোয়ারে সংগঠিত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ক্রমবর্ধিত বেগ 'পূর্বলেখ'-এর সুস্থ সমাজদৃষ্টির জন্মদাতা। এরপর 'বাইশে জুন'; গ্রন্থের নামকরণ থেকেই কবির পক্ষপাত স্পষ্ট। 'সাত ভাই-চম্পা' 'বাইশে জুন'-এরই পরিবর্ধিত সংস্করণ—তাতে একদিকে আছে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে গণচিত্ত অন্বেষণের আগ্রহ—যার ফলে লৌকিক রূপকল্প এবং রূপকথা-রূপকের আবির্ভাব। পরবর্তী সংযোজন 'সন্দ্বীপের চর'—যার পটভূমিতে আছে দেশজোড়া বিপুল জাতীয় আন্দোলন, তেভাগার লড়াই, নৌবিদ্রোহ, ২৯শে জুলাইয়ের বিরাট হরতাল, তারপর দাঙ্গা, ইংরেজের ক্ষমতা-হস্তান্তর এবং দেশভাগ, আর তেলেঙ্গানা। মোটের উপর 'সন্দ্বীপের চর' দাঙ্গার লোকক্ষয়কারী নৈরাজ্য সত্ত্বেও জাগ্রত জনগণের জিতালিতে উল্লসিত—নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণায় নীলকণ্ঠ হয়েও ভবিষ্যতের আশায় উন্মুখর। কবিত্বের সর্বপ্লাবী বন্যার বেগে জেগে উঠেছে বেগবান পয়ারের রূপ, যা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। কথ্যরীতির (spoken rhythm-এর) প্রয়োগ, যা বাংলা পয়ারে দুর্লভ, তারও সাক্ষাৎ মিলবে অনেক কবিতায়। সামাজিক জীবনের বিকাশের ধারা প্রভাবান্বিত করেছে কবির ব্যক্তিত্ব-উন্মেষের ধারাকে—রূপক নিয়েছে সমুদ্রসন্ধানী নদীর যাত্রায়। সঙ্গে রয়েছে প্রকৃতি-সম্ভোগের আনন্দ এবং প্রেমের দ্বৈত রচনার উপলব্ধি। কবি সমস্ত দুর্বিপাকের পরেও বর্তমান যন্ত্রণার অন্তপর্বে আশা করতে পারছেন সমাজ-নদীর তথা ব্যক্তি-নদীর মোহানায় এক ফালি নতুন জাগা চর, যেখানে জীবন সুস্থতর; রৌদ্রস্নাত মাটির বুকে সংসার পাতবে নতুন যুগের কর্মিষ্ঠ মানুষ।

অতঃপর 'অন্বিষ্ট'। বলতে বাধা নেই 'সন্দ্বীপের চর'-এর তুলনায় অনেক বেশি দ্বিধাগ্রস্ত, অনেক সংশয়াচ্ছন্ন, অনেক প্রচ্ছন্ন। কিন্তু বাস্তব পরিবেশও সেই অনুপাতে দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াচ্ছন্ন এবং প্রচ্ছন্ন। এই কথা বলবার জন্যেই ওপরে আমি বিষ্ণু দে-র কবি-জীবনের বিকাশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের এত দীর্ঘ যোগাযোগ টেনেছি। বিশেষ করে দেখাতে চেয়েছি কবির প্রত্যক্ষ

পারিপার্শ্বিক তাঁর কাব্যধারাকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করে এসেছে। 'সন্দীপের চর'-এর পর 'অন্বিষ্ট' যদি ঘোষণার দিক থেকে একটু থমকে দাঁড়ায় সে ইতস্ততের ভাব কি আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনকেও বিহ্বল করে রাখে নি? প্রত্যেক সৎ পাঠকই এর জবাব জানেন।

অবশ্য কবির ব্যক্তিগত মেজাজও এই সঙ্গে বিচার করা দরকার। কবি-জীবনের শুরু থেকেই বিষ্ণু দে উচ্চকণ্ঠ নন; কল্পনার সূক্ষ্মতা তাঁর স্বভাবগত। তাছাড়া তাঁর ভাষাও স্বনির্বাচিত, এবং সব সময়ে আমাদের বিশৃঙ্খল অভ্যাসকে খুশি করে চলে না। এ সমস্তই আমাদের মনে রাখা দরকার। তবু কবিকে তাঁর নিজের রচনার ভিত্তিতেই তো গ্রহণ করতে হবে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতা এবং মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও যদি তাঁর রচনায় জীবন-পিপাসা নিঃশ্বসিত হয়, যদি সেই সদ্‌বৃত্তিগুলি কবিত্বমণ্ডিত হয়, কবিকে নিশ্চয়ই আমরা সাধুবাদ দিয়ে গ্রহণ করব। আর আমার বক্তব্য, বিষ্ণু দে 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে সেই জীবনেরই অন্বেষণ করেছেন যা স্বাধীন মনুষ্যত্বে মহীয়ান; এবং কাব্যিক প্রকাশেও এই গ্রন্থ উৎকৃষ্ট।

হয়তো অনেক জায়গায় কবি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন সমসাময়িক সমাজকর্মীদের মূঢ়তায়, অনেক পংক্তিতে রয়েছে জ্বালার প্রকাশ, বেদনার অভিজ্ঞান। হয়তো তিনি লিখেছেন,—

১। তোমাকেই চাই তুমি দাও ক্ষিপ্র ঝনঝনা উপহার।

২। বিজ্ঞ বলে, এ ছলনার জাল,
বলে, অসৎ স্বপ্ন দেখা চাল।
... ...
বিজ্ঞ বলে, এ বুর্জোয়া চাল।
... ...
বিজ্ঞ বলে বলুক না দালাল।

৩। কিবা লাভ কুৎসা হেনে আত্মম্ভরী মণ্ডুক ভাষ্যের
তত্ত্বকথা কিম্বা মূঢ় মাৎসর্যের বর্জননীতিতে
অভিযান লক্ষ্যহীন, এ অন্ধতা শত্রুরই হাস্যের
খোরাক। আকাশ ছেঁটে নীড় চাও শুধুই মাটিতে।

৪। সমুদ্রের আন্দোলন বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ...

কিন্তু সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাস কি এসব উক্তির বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে? এই তো আমাদের দীর্ঘ কয়েক বছরের ইতিহাস। তবে

আশ্বাসের বিষয় এই যে বিষ্ণু দে-র কবিদৃষ্টি এ পর্বের পরেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। এবং তিনি লিখতে পেরেছেন :

১। কুৎসা শুধু কুয়াশা, হবে ভোর
উষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর।

(ওপরের ২নং উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য। আশার বিষয় বর্তমানে 'অসহিষ্ণু ঘোর' কেটে উষার আভাস দেখা দিয়েছে।)

২। আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে।

৩। আমারও আলোক মেশে আঁধারের উদ্ভিদ্ সাগরে।

৪। দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে রুজির সংঘাতে
মেঘে মেঘে কলিজার প্রচণ্ড আবেগে কব্জিতে বাঁকানো বেগে
... ...
ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
... ...
কাজের বিরস দিন করে দেবে বৈশাখের মেঘ

৫। ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে
দেখো আছি আমরাই দূরে।
তোমাদের নৃত্যের নূপুরে
বুক পেতে কারা দেয় তাল
দেখো চেয়ে কালের মুকুরে।

(কবিকর্মের আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সমাজকর্মীদের সঙ্গে নিজের অচ্ছেদ্য যোগাযোগে বিশ্বাস লক্ষণীয়।)

৬। তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ারভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য উর্মিল কল্লোলে
পাড় গড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
বিলাও বেগের আভা···
আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পাশে কখনও বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি···
তুমি যদি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে···
তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া

তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে
জল দাও আমার শিকড়ে ॥

এই স্বীকৃতির বেদনা ও আশাবাদ আমাকে মুগ্ধ করেছে ; এবং আমার ধারণা, বক্তব্যকে এত স্পষ্ট রেখে এভাবে কবিত্বমণ্ডিত করা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের এই মূল সুর মাঝে মাঝে অসতর্ক পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয় কোনো কোনো কবিতায়। তার কারণ কবি কতকগুলি সম্বোধনের আশ্রয় নিয়েছেন যা একই উক্তিকে ব্যক্তিপ্রেম এবং দেশপ্রেমের সমার্থবাচক বলে মনে করতে পারে, যেমন 'তুমি' 'প্রিয়া' ইত্যাদি। তাছাড়া নদীর রূপক তো আছেই—সেটা 'সন্দ্বীপের চর'-এর চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে, আরো প্রচ্ছন্নভাবে প্রযুক্ত—যেমন 'প্রতীক্ষা' কবিতায় ৫৫ পৃষ্ঠায় যে নদীর প্রস্তাবনা সেটা দৃশ্যপট হিসেবে এতই নিখুঁত যে 'মরে যাক নদী, থাক হোক গ্রাম, তবু বাঁয়ে জলে টানো বাঁশ' এই পংক্তিকে পাবার আগে তার অন্য অর্থ খোঁজবার কোনো ইচ্ছেও হয় না। এবং পরপৃষ্ঠায় 'নিস্রোত নদী, চলে না ধারা'। এই এক পংক্তিতে আগে পিছের ছেদের সাহায্যে যে বেদনাময় আবেগ সঞ্চার করা হয়েছে, ছ-মাস আগেও তাই ছিল আমাদের সমাজ-কর্মীদের ব্যথিত-বিহ্বল মনের প্রতিধ্বনি। কিন্তু এ-সবই সতর্ক পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হবে, সাধারণ পাঠক এসব নিহিতার্থের চেয়ে মুগ্ধ হবে ছন্দের বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গে, প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের আশ্চর্য কাব্যায়নে এবং কবির অকপট মানবপ্রেমের আভায়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বর্তমানে বিষ্ণু দে-র রচনারীতির সঙ্গে এক মেজাজ না হলেও, তাঁর এক একটি দীর্ঘ কবিতায় সমগ্র কাব্যরূপ তথা ভাষা-ব্যবহারের কাঠিন্য আমাকে বিড়ম্বিত করা সত্ত্বেও মহৎ কবিকে আমি সর্বদাই স্মরণ করি। আশা করি, বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক অনুরাগী পাঠকই এ উক্তিতে আমার সঙ্গে একমত হবেন।

১৭ অক্টোবর ১৯৫৩

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

সিগনেট প্রেস, ১৯৫৩

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রিয়বরেষু,

সিগনেট প্রেসের সৌজন্যে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' ইতিমধ্যেই হাতে এসে গেছে, এবং গ্রন্থখানি তিন-চার বার পড়ে ফেলেছি। পুস্তকের অঙ্গসজ্জা—বিশেষত প্রচ্ছদপট—একেবারে অনবদ্য, এবং এ-রকম সুদর্শন বাংলা বই আগে আর কখনও দেখে থাকলেও, মনে নেই। মানতেই হবে যে প্রকাশকেরা আপনার প্রতিভাকে যথোচিত সম্মান দিয়েছেন, এবং উৎসর্গ-পত্রের তারিখই হয়তো প্রমাণ যে চিরক্রিয় বলে তাঁদের যে-দুর্নাম এত দিন শুনেছি, তা এবার তাঁরা খণ্ডালেন।

আপনার সৃজনীশক্তি সত্যিই বিস্ময়কর, এবং অন্তত আমার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। এ-দিক থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়; এবং আমি যতদূর জানি, গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে অপর কোনও বাঙালি কবির লেখনী এমন অবাধে চলেনি। অবশ্য বর্তমান গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আমার পূর্বপরিচিত, কিন্তু সেগুলিকে একত্রে পেয়েই, বুঝলুম আপনার প্রেরণা কত স্বচ্ছন্দ, এবং আমাদের দেশ ও কাল আপাতত যখন এবম্বিধ প্রাচুর্যের পরিপন্থী, তখন আপনার মত ও পথের গুণ না গেয়ে উপায় নেই।

কিন্তু আমার স্বভাব যেহেতু বিপরীত, তাই আপনার কাব্যাদর্শ আজও আমার কাছে অল্প বিস্তর অস্পষ্ট; এবং বুঝি বা সেই কারণেই এখনও আমার মনে হয় যেন আপনার পদ্ধতি ও প্রসঙ্গের মধ্যে কোথায় একটা বিবাদ আছে। নিজেকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দেখেও, আপনি কবিতার লেখার সময়ে যুক্তির সাধারণ্য ছেড়ে, ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের আশ্রয় নেন বলেই, আমি এ-সন্দেহ উত্থাপন করছি না, আমার বিচারে আপনার রচনারীতি যতটা সঞ্চারী, আপনার বক্তব্য ততখানি পরিণামী নয়; এবং এখানেও আপনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী—ভাবের ধ্যানেই আপনার আনন্দ, ভাবনার প্রগতিতে আপনি অপেক্ষাকৃত উদাসীন।

বলতে পারি না তাই কিনা, আমার বিবেচনায় আপনার কোনও কোনও দীর্ঘ কবিতার সংক্ষেপসাধন সম্ভব; এবং ১২৮ পৃষ্ঠায় শেষের চার লাইন ও পরের পাতায় প্রথম তিন পংক্তি যদি বা সাঙ্গীতিক বিস্তারের কাব্যগত প্রয়োগ হয়, তবু ১০৭ পৃষ্ঠার 'বিষাদের অভিজ্ঞ পুলকে / যন্ত্রণার হর্ষে হর্ষে রোমাঞ্চিত', অথবা ৩৫ পৃষ্ঠার 'খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধারণে জনতায়...জনগণে জনসাধারণে', অন্তত আমার মতে, অনাবশ্যক পুনরুক্তি। কয়েকটি ভাবচ্ছবি-সম্বন্ধেও আমার অনুরূপ অভিযোগ আছে, এবং হাওয়া, আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, আশ্বিন, আষাঢ় ইত্যাদির পৌনঃপুন্য আমার কাছে যৎকিঞ্চিৎ ক্লান্তিকর ঠেকেছে।

আবার অন্যত্র—যেমন আপনার বহুলাঙ্গ কবিতাগুলিতে—অবয়বসমূহের সংযোগ সুপ্রকট নয়, এবং কোথাও কোথাও এমন অনুমান অনিবার্য যে অন্যোন্যবিলগ্ন রচনাবলীর উপরে আপনি অকারণে একই নাম জুড়ে দিয়েছেন। আসলে আপনার নামকরণ অনেক সময় অর্থগ্রহণের সহায় নয়, অন্তরায়; এবং 'অক্টোবর দিনগুলি' যে পৌর্বাপর্য বিরহিত দিনলিপি, তা বুঝতে দেরি লাগে ঐ নামের দোষেই। উক্ত অনৈক্যের প্রতিবিধানকল্পেই আপনি বোধহয়, শুধু বিরামচিহ্নের ব্যবহারে নয়, অন্বয়ের প্রতিও বিমুখ; এবং তৎসত্ত্বেও যাদের মন আমার মতো গদ্যধর্মী, তাদের কাছে আপনার অনেক কবিতা খণ্ড খণ্ড ভাবে উপভোগ্য।

আপনার ছন্দঃপ্রকরণেও স্বেচ্ছাচার রয়েছে, এবং কার্যত, সনাতন না হোক, উত্তরভারতচন্দ্রীয় নিয়ম মেনে চললেও, রবীন্দ্রনাথই যদিচ পয়ারকে স্থিতিস্থাপক বলেছিলেন, তবু অক্ষরবৃত্তের উক্ত সুবিধাবাদ বাংলা উচ্চারণের বিধিপালনে নিশ্চয়ই বাধ্য। কিন্তু আপনার কোনও কোনও পর্বে 'কিম্বা' 'কিন্তু' ইত্যাদি তো কিম্-বা, কিন্-তু রূপে পাঠ্য বটেই, এমনকি 'সমুদ্র'-এর পাঠও হয়তো সমুদ্-র এবং এ-ধরনের অস্বাভাবিক উচ্চারণ যে মাত্রাচ্ছন্দেও বর্তমান, তার অন্যতম নিদর্শন সম্ভবত ৭৮ পৃষ্ঠার 'একই মাটি জল একই নীলাকাশ—'। আক্ষরিক ছন্দেও, ৫১ পৃষ্ঠার 'যম-ও'-এর মতো, 'একই' ত্রিমাত্রিক ৮১ পাতার 'একই অমৃতপুত্র সহোদর আত্মীয় পালন'—এই পংক্তিতে; এবং আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে এমন পাঠ কেবল ছন্দোরক্ষার খাতিরে, যেমন বহু স্থলে 'না', 'নি'-র পরে 'কো'-র ব্যবহার।

ফলত আপনার যতিস্থাপনা মাঝে মাঝে খামখেয়ালী; এবং যেমন পয়ারে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত 'মেলে না পার্বতী পর ॥ মেশ্বরে এ ॥ বেতাল

গাজনে' (১৪ পৃষ্ঠা), তেমনই মাত্রাচ্ছন্দে তার উদাহরণ 'প্রাকৃতিক ও অ॥ মানুষিক' (২১ পৃষ্ঠা)। ছন্দের সাধারণ প্রবাহে অপ্রত্যাশিত ছেদ শব্দবিশেষের উপরে জোর দিয়ে, অবশ্য অর্থগৌরব বাড়াতে পারে; এবং ১২৩ পাতার 'তোমারই না॥ বণ্য যে॥ বিতবে' যদি বা সেই উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে, তবু 'প্রতিমা তোমার হোক প্র॥ তাক আ॥ রেক' (৯৩ পৃষ্ঠা) হয়তো অনুরূপ অভিপ্রায়ে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে 'পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রত্যক্ষ অথচ' (৩৫ পৃষ্ঠা) প্রাকৃত, অপ্রাকৃত কোনও স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে, অন্তত আমার দ্বারা, পদ্য হিসাবে পাঠ্য নয়, এবং 'রৌদ্রে জলে জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় সংগঠিত'—৬৫ পাতার এই পদে 'হাও য়ায়'এর উচ্চারণ-বিকৃতি ১২২ পৃষ্ঠার 'চাহনিতে ফোটে আলো সও-য়ার'-এর সঙ্গে তুলনীয়।

বর্তমানে শুরুচণ্ডাল রচনারীতি যদিও কোনও বাঙালি কবির নিজস্ব নয়, তবু 'সমুদ্রের গন্ধবহ হাতছানি' (৮২ পৃষ্ঠা) আজও কেমন যেন বেসুরো শোনায়, এবং 'আইনসঙ্গত' আর আমাদের কানে লাগে না বটে, কিন্তু ১৮ পৃষ্ঠায় 'নির্চেরাগ' শব্দ আপনি দীপহীন বা নিরালোক অর্থে ব্যবহার করে থাকলে, তাতে কেবল সন্ধিবিধিরই ব্যতিক্রম ঘটে নি, বাংলা শব্দনির্মাণের সাধারণ নিয়মও এই জন্যে উপেক্ষিত হয়েছে যে এখানে উর্দু-ফারসি-র 'বে' উপসর্গ অনায়াসে লাগানো যেতে পারত। পক্ষান্তরে বিশেষণে স্ত্রিলিঙ্গবর্জন আধুনিক বাংলায় খুবই চলে, অথচ ১১৬ পৃষ্ঠায়, আপাতত মিলের প্রয়োজনে, আপনি পুংলিঙ্গ প্রহরীর আখ্যা দিয়েছেন নিদ্রাহীনা, এবং এতাদৃশ ব্যাকরণ-দোষের এইটাই একমাত্র সাক্ষ্য নয়।

আপনার সার আমার উপলব্ধি মূলেই আলাদা বলে, উক্তির খুঁটিনাটি নিয়ে এত সময় কাটালুম; কিন্তু এ কথা মানাও আমার পক্ষে অসম্ভব যে কার্যগতিকে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির যে-চেহারা আমি দেখেছি, তার সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা খাপ খায় না, আমি যেহেতু শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা অন্ধ, সেই জন্যে; এবং মার্কসবাদের প্রভাবে বা স্বভাবে দৃষ্টিভঙ্গি যতই বদলাক না কেন, তাতে যদি বস্তুজগতেরও রূপান্তর ঘটে, তবে আপনার আমার বাক্যবিনিময় পণ্ডশ্রম। অগত্যা আমি ভাবতে বাধ্য যে আপনার বক্তব্য আদ্যন্ত অনুভূত নয়; এবং তাই বুঝি আপনার কাছে বনস্পতি উপমা আর দিউগাশভিলি উপমান (৩০ পৃষ্ঠা)।

সে যাই হোক, বিশ্বাসগত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও যে এ-বইয়ের অনেক কবিতা তথা অসংখ্য পংক্তি আমাকে চমৎকৃত করেছে, তা আপনার অবিসংবাদিত

কবিপ্রতিভার কল্যাণে, এবং সেই জন্যেই অন্যত্র যদি আমার অবিশ্বাস অন্তত সাময়িকভাবেও না ঘুচে থাকে, তবে আপনিই দায়ী। অবশ্য আমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিমাণ বেশি হলে, আপনার একাধিক ইঙ্গিত-উল্লেখ আমাকে এড়িয়ে যেত না, কিন্তু আমার শিক্ষা-দীক্ষার দৈন্য ঘুচলেও, আমি 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর প্রত্যেক 'তুমি'-কে চিনতে পারতুম কিনা সন্দেহ, তার কারণ একদিকে যেমন এই যে আপনি তাদের পরিচয়-প্রকাশে অনিচ্ছুক, তেমনই অন্যদিকে এমন মনে করাও হয়তো নিতান্ত অন্যায় নয় যে আপনি তাদের পরিচয় এখনও পুরোপুরি পান নি বলেই, আপনার কাব্যে তাদের স্বাতন্ত্র্য অনুপস্থিত।

এই অযাচিত চিঠির বেয়াদপি মাপ করবেন। বর্তমান পুস্তকের বহু লেখাই আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে, এইটাই বড় কথা, এবং এইটুকু বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু গতবারে ততোধিক লিখিনি বলে, আপনার কাছে বকুনি খেয়েছিলুম, এবং তাই এ-বারে কোমর বেঁধে লেগে গেছি 'সমালোচনা'-য়। কিন্তু আমি জানি যে এমন কোনও লেখক নেই যার ছিদ্রান্বেষ শক্ত: সৃজনীপ্রতিভাই দুর্লভ, এবং আপনার মধ্যে সেই অলৌকিক শক্তির প্রাদুর্ভাব আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়—বিশেষত আমার, কারণ আমি উক্ত ক্ষমতায় বঞ্চিত। উপরন্তু উল্লিখিত স্খলন-পতন-ত্রুটির প্রত্যেকটাই আমাতে স্পষ্টতর, এবং হয়তো সেইজন্যেই সেগুলির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। ইতি ১৭ অক্টোবর ১৯৫৩

'অগ্রণী', শারদীয় ১৩৬৫

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

বাক্, ১৯৫৮

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' বিষ্ণু দে-র সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের অন্যতম। অপর গ্রন্থ 'আলেখ্য'।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় সৎ অনুরাগী নিষ্ঠাবান পাঠকের ক্রমবর্ধিষ্ণু উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা ইদানীং সবিশেষ লক্ষণীয়। দুরূহ ও দুর্বোধ্য—এই দুই সক্রিয় বিশেষণ, তাঁর কাব্যগ্রন্থের আলোচনা মাত্রেই, কি সাধারণ পাঠক ও সমালোচক মহলের প্রথম কথা ছিল। এই হাস্যকর অলস অভিযোগ, লঘু শ্রমবিমুখ অসম্পূর্ণ পাঠক-মনের অনভিজ্ঞতা থেকে তাঁর কাব্যের মুক্তি ও পরিশেষে ভাস্বর প্রোজ্জ্বল আলোকে তার পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি, এক দীর্ঘ নিরলস একনিষ্ঠ কাব্যচর্চারই ধারাবাহিক ইতিহাস।

তাঁর সাম্প্রতিক কোনো কাব্যগ্রন্থেরই আলোচনা তাঁর কবিতার সুবিস্তৃত পটভূমিকা ব্যতিরেকে অসম্ভব। এই পটভূমিকা স্মরণে রেখে 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এর আলোচনায় যে বহুল প্রচলিত মন্তব্য কানে আসে, তা বিষ্ণু দে তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনের পরিক্রমায় এখন এখানে অনেক সহজবোধ্য, সরল ও তাঁর কবিতা প্রায়াংশে সাধারণ পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধির আয়ত্তাধীন। এই ব্যক্তিগত রুচিপ্রকাশে (কখনো ভালো বা মন্দ কখনো) কিন্তু একটি নিবিড় সত্যের কাছাকাছি পাঠক কোনোদিনও পৌঁছতে পারেন না। সেই সত্য হলো, বিষ্ণু দে-র আসল মেজাজ কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ থেকেছে আগাগোড়া। অসহিষ্ণু লঘুচিত্ত পাঠকের অসহযোগিতা উপেক্ষা করে আজও তিনি তাঁর কাব্যে allusion বা reference-এর দেশী ও বিদেশী উল্লেখ করে থাকেন, যদিও পরিশ্রমী আগ্রহশীল বুদ্ধিমান পাঠকের বিপুল নিষ্ঠা ও অসীম ধৈর্যের কথা অবশ্যই স্মরণীয়। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এও এমন অংশ আছে যার পাঠগ্রহণে পাঠককে রীতিমতো পরিশ্রমী হতে হবে, তাকে জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে কমবেশি সচেতন থাকতে হবে। তাই, বিষ্ণু দে বর্তমানে হঠাৎ (কোনো 'ওয়ান ফাইন মরনিং-এ !) খুবই সহজবোধ্য, সরল ও অতীব স্বচ্ছ হয়ে উঠলেন, এ-পদ্ধতিতে দীর্ঘ চিন্তা না-করে ভাবা যেতে পারে। কবিতার আন্তরিক পাঠক মাত্রই অনুধাবন করবেন একনিষ্ঠ নিবিড় কাব্যচর্চার মতো কাব্যপাঠও অতি অবশ্য পরিশ্রম ও তিতিক্ষা সাপেক্ষ, অর্থাৎ নিঃসন্দেহে অনুশীলন সাপেক্ষ।

অবিশ্যি এ-কথা খুবই শিরোধার্য যে প্রথম পাঠে তাঁর অনেক কবিতাই, বর্তমানের, পাঠকের বুদ্ধি ও উপলব্ধির গোচর হতে পারছে। এর প্রাথমিক কারণটি কিন্তু মনে হয় শব্দ ব্যবহারে পরিবর্তন। কিছু সংস্কৃতঘেঁষা বা কঠিন যুক্ত-শব্দ তাঁর আগেকার কিছু কাব্যগ্রন্থে খুবই লক্ষণীয়। আর সাধারণকে অসাধারণ করে তোলার দুর্লভ নিপুণতা তাঁর কাছে কিন্তু চিরকালই

সহজসাধ্য। আর এই সাধারণ ঘরোয়া কথা দিয়ে, অতিসাধারণও বা কখনো, তিনি বর্তমানের নানা নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার (কবিতার শরীর ও আত্মার, উভয়েরই) মাধ্যমে একটি শব্দভাণ্ডার রচনা করেছেন। আমার আশঙ্কা এই আপাত সহজবোধ্য মনে হওয়ার পশ্চাতে যে স্বচ্ছন্দ লঘু আরাম, তা যেন পাঠককে তাঁর কাব্যোপলব্ধির পথে বিভ্রান্ত না করে। কারণ শ্রমবিমুখ চিন্তায় তাঁর কাব্যের তাৎপর্য অহেতুক অনায়াসলভ্য মনে হতে পারে। অথচ তাঁর কাব্য সকল অবস্থায় পাঠকের সতর্কবুদ্ধি, কাব্যপাঠের অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান, যুক্তিনির্ভর আবেগের দাবি জানায়। এসব কথার উত্থাপন এই হেতু যে আমার ইঙ্গিত তাঁর বাচনভঙ্গির দিকে। যে বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি তাঁর কবিতাকে অনন্য করেছে সতর্ক অন্বেষী পাঠক মাত্রই অনুধাবন করবেন তা সুদীর্ঘ বা স্বল্প কয়েক ছত্রের রচনাতেও অক্ষুণ্ণ ও অক্ষত। সমস্ত প্রতিভাবান কবিরাই তাঁদের সময়ের কবিতাব ভাষা তৈরি করেন। বিষ্ণু দে তাঁর সময়ের কবিতার ভাষা রচনা করেছেন (আর মাইকেল কি সর্বাগ্রে এই অর্থেই আধুনিক নন? তিনি তো তাঁর সময়ের কবিতার ভাষা নির্মাণ করেন)। অতএব, বিষ্ণু দে-র রচনা বর্তমানে সহজবোধ্য—এই মনোভাবের পিছনে পাঠক যদি মনে করেন—তাঁর দীর্ঘদিনেব নিরলস কাব্যসাধনায় জীবনের বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিবিড়নিষ্ঠ রূপ তাঁব চৈতন্যের প্রাজ্ঞ আলোয় এমন স্বচ্ছ ও নিকটের—মানবজীবনেব ট্র্যাজেডির যে উৎস সন্ধান তাঁর কবিকর্মের একান্ত লক্ষ্য বা অন্বিষ্ট, সেই উৎস দ্বার তাঁর কাছে প্রায় উন্মুক্ত, তবে বুঝি তাঁর বহু দেখার ও অনেক পর্যবেক্ষণের বেদনাবিধুর মানবজীবনের জটিল যন্ত্রণার সামগ্রিক রূপ তাঁর কাব্যে বহুলাংশে সার্থক রূপায়িত, অর্থাৎ তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার মূলে যে-বিশ্বাস তা নিঃসন্দেহে হয়ে ওঠে পাঠকেরও, তবে হয়তো, তাঁর কবিতা যে বর্তমানে যথেষ্ট সুবোধ্য, তার সুষ্ঠু এক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আর রেফারেন্স বা এ্যালুসন ব্যবহারের সমস্যার মীমাংসায় শুধু একটি কথায় ফিরে-যাওয়ার মধ্যেই বোধকরি সমাধান পাওয়া যায়। সর্বকালে সর্বদেশে উচ্চাভিলাষী কবিমাত্রই বিশ্বসাহিত্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে থাকেন। আর এই কঠোর শ্রমলব্ধ বিদ্যার রূপ অনেক সাহিত্যশিল্পী তাঁদের রচনায় দেখতে চান। বিষ্ণু দে-র বিদেশী সাহিত্যপ্রিয়তা ও অনেক সময়ে বিদেশী শিল্প-সাহিত্য-সংগীতের জগতে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ, তাঁর কাব্যপাঠকের উষ্মার কারণ হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি টমাস গ্রে-র কটি সরল উপভোগ্য কথার উল্লেখের প্রলোভন এড়াতে পারছি না:

Our poetry...has a language peculiar to itself, to which almost everyone, that has written, has added something by enriching it with foreign idioms and derivatives। আর এই কয় ছত্রের আগেই আছে বহুশ্রুত the language of the age is never the language of poetry। গ্রে-র কথার সত্যাসত্য বিচার কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নয়, এ-কথাগুলির পিছনে কি মনোভাব প্রচ্ছন্ন তা-ই জিজ্ঞাস্য। স্বদেশের হিতার্থে, বিশেষ করে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিদেশীয় ধ্যান-ধারণা চিন্তাধারা বিচারপদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার প্রয়োজন কোনো কবির ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময় হয় তো সেক্ষেত্রে অস্বস্তির কোনো লক্ষণ দেখি না। যাঁর কথা থেকে নজির তুললে এ-দেশের সমস্ত কবি ও কাব্য-পাঠকেরা (প্রায় ব্যক্তিগত রুচি-ইচ্ছা নির্বিচারে) উৎসাহিত বোধ করেন, সেই প্রথিতযশা এলিয়টের কয়েকটি কথা উদ্ধার করছি—

......When I was a young man at the university in America, just beginning to write verse, Yeats was already a considerable figure in the world of poetry. I cannot remember that his poetry at that stage made any deep impression upon me...... The taste of an adolescent writer is intense but narrow: it is determined by personal needs. The kind of poetry that I needed, to teach me the use of my own voice, did not exist in English at all; it was only to be found in French.

এ সমস্ত কথার উত্থাপন বারে বারান্তরে করার উদ্দেশ্য একটিমাত্র যে, বিষ্ণু দে-র কবিতার পাঠক দ্বিধাজনিত জড়তায় অমনোযোগ হেতু তাঁর কাব্যপাঠকে অহেতুক বিড়ম্বিত করেন। এসব কথার স্বচ্ছ, স্বাধীন, সর্বাঙ্গীন আলোচনার প্রয়োজন তাই সর্বাগ্রে।

'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের উল্লেখই প্রাথমিক হবে। একেবারে শেষ কবিতাটি ব্যতীত অর্থাৎ 'শতমুখী নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়' ছাড়া দীর্ঘ কবিতার অর্থে কোনো কবিতা পাওয়া যাবে না। তাও ইংরেজিতে যথার্থ 'লংগার পোয়েম' বলতে যা বুঝি, যেমন বিষ্ণু দে-রই 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের অন্বিষ্ট, তা এখানে নেই। আকারে অধিকাংশ কবিতাই ক্ষুদ্র বা নাতিদীর্ঘ। আর মানবপ্রেম, প্রকৃতির অনাবিল

অঢেল সৌন্দর্য, তার ঔদার্য ও ভালোবাসা, জীবনের বহুবিধ সমস্যা-জটিলতা থেকে পশুপক্ষী পর্যন্ত এইসব কবিতার বিষয় হয়েছে। বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাববোধ নাকি আধুনিক বাংলা কবিতায় খুবই অনুভূত। এ অভিযোগও শ্রাব্য।

'চিরঋণী' কবিতার

চলে গেছে খিদ্‌মদ্‌গার তার দূর গ্রাম্যঘরে।
আমি একা বসে আছি পরিশ্রান্ত
ঘুমের নদীর যাত্রী কণ্টকিত অরণ্যের নানা নৈশস্বরে—

এই অংশে আমি গভীর অরণ্যের পরিবেশে নিজেকে কল্পনা করে রীতিমতো রোমাঞ্চ অনুভব করেছি বাস্তবিক। সব বড় কবিরাই কিন্তু এমন অনেক আপাত গৌণ অংশে দুরূহ কবিকর্মের স্বাক্ষর রাখেন। আবার এই কবিতারই শেষাংশে

আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ একটি হরিণ আর একটি হরিণী
কাচে নাক ঘষে আর মানবিক চোখ মেলে দেয়
উদ্বাস্তু নির্ভরে উপহারে।

জীবজগতের কাছে সেই থেকে আমি চিরঋণী।

এ কটি লাইনে প্রায় লরেন্সীয় মহিমার কথা স্মরণে আসে, সেই 'স্নেক' কবিতার শেষ দুই তিন ছত্র। বেঠোফেনের উক্তি মাথায় নিয়ে যে-কবিতার শুরু—'আমারও মন চৈত্রে পলাতক'—সেই 'একটি কাফি'র সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে তাঁর লেখা 'ক্লান্তি নেই' কবিতাটি। আরো অনেক কবিতা আছে যাদের বহু অংশে পাঠকমন বিভোর হয়ে থাকে নির্লিপ্ত নিসর্গ মাধুরীতে।

যেমন

দিঘীতে তিনটি সাদা হাঁস,
ওপারে সবুজ কচি ঘাস,
শরতের নীলের আকাশে
ছোটো ছোটো মেঘ কয় থোকা।

তবু এ-সব কিছু পার হয়ে ভাবুক তথা অন্বেষী পাঠক মাত্রই অনুধাবন করবেন সেই সত্যকে, তাঁর কবিতায়, যেখানে জীবনের করুণ মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডিই তাঁর লক্ষ্য বস্তু। তাঁর বহু আগেকার

এই তবে ভোরবেলা।
হে ভূমিশায়িনী শিউলি। আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই ?

এই অংশে জীবনের রিক্ততার, নিঃস্বতার বিদীর্ণ হাহাকারের ও শূন্যতার যে আন্তরিক চিত্র পেয়েছি, তারই এক স্থিতধী ও আত্মস্থ রূপ পাই 'পলাশ' কবিতার আরম্ভেই

না জানি কী দীর্ঘ সেই ভয়াবহ ইতিহাস।
যেদিকে তাকাই
অনেক মাইল ব্যেপে পৃথিবীর রাঙা দীর্ঘশ্বাস
বিষাদে আহত করে থরোথরো সৌন্দর্য আকাশ,
যতদূরে চাই।

তাই বার বার মনে হয়েছে মানুষের জীবনের এই ব্যাপক দুঃখে, বর্তমানের সমস্যাবিহীন নানা জটিলতায় মানুষের ছিন্নভিন্ন যে জীবন সেখানে কবি নিঃস্বার্থ সমব্যথী ও অন্তরঙ্গ অংশীদার। বর্তমানের এই দ্বিধা-সংশয়, ভয় অনাচার অভিযোগ, সর্ব অর্থে জীবনের অসম্পূর্ণতা যে-ট্র্যাজেডির মূল তারই উৎস সন্ধান, আমার নিশ্চিত ধারণা, তাঁর সব সার্থক রচনারই আদ্য কথা। আর ঠিক এ কারণবশতই কের মনে কবি যেখানে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা বাঁকা কথার ধারালো ভঙ্গিতে তিনি জীবন-সমস্যার সমাধান খোঁজেন বা বিবিধ সমস্যার সমালোচনাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে তার পূর্ণাঙ্গ সফলতা সম্বন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে। অন্তত আমার মনে হয়। ঠিক এই সহজ কারণেই 'আমাদের মেয়েরা' বা 'সময়ের ঘরে' 'নবমুচিরামবিলাপ' অপেক্ষা অনেক বেশি সার্থক মনে হয়েছে কাব্য বিচারের কঠিন পদ্ধতিতেও। যদিও আমার অভিযোগ 'নবমুচিরামবিলাপ' অপেক্ষা আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতার বিরুদ্ধে। কারণ প্রথমোক্ত কবিতা খুবই স্পষ্ট, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ওই ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে। কিন্তু 'শতমুখনদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়' কবিতায় বিষ্ণু দে নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা সত্ত্বেও রচনাটিতে আমার অনেক প্রত্যাশা ব্যাহত হয়েছে। বহু অংশ আমি আগেকার অভিযোগ অনুসারে সমালোচ্য মনে করি।

অথচ কাব্যবিচারের সকল নিগূঢ় অর্থেই উদ্ধার করব এই অংশটি

রাতের অন্ধার দিনের হীরাতে
কঠিন আকাশের পাহাড়ে প্রদাহে

দগ্ধ বালুচরে শুদ্ধ প্রবাহে
পারব শ্রাবণের মায়া কি ফেরাতে ?
অথচ পাণ্ডুর রুক্ষ আকাশের
তলায় চেয়ে থাকে হাল্‌কা বাতাসের ইত্যাদি

পরিশেষ শুধু বলব তাঁর কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে আমি মনন বা কান কোনোটাই তৈরি করে উঠতে পারি নি। সে-কারণেই সেই বিশেষ বিশেষ কবিতার উপভোগ বা উপলব্ধির পথে বাধা হয়েছে আমার বিদ্যাবুদ্ধি। তাঁর বৈদগ্ধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধিকে ধাওয়া করা আমার পক্ষে যেহেতু বহুলাংশেই নিষ্ফল প্রচেষ্টা, সে-কারণে আমার অক্ষমতা আপাতত সময়ের হাতে সমর্পণ ছাড়া উপায় দেখি না।

তাই বিষ্ণু দে-র কবি-মনীষায় অগাধ আস্থা ও সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা—যে শ্রদ্ধা আমার বহু পুরোনো, রেখে হয়তো ভাবতে পারি যে আগামী কালের উচ্চাভিলাষী যথার্থ সম্ভাবনাময় বাঙালি কবি উৎকৃষ্ট কবিতার মান খুঁজে পাবে তাঁর সার্থক রচনাগুলিতে, এই বাংলাদেশেই।

'সাম্প্রত', মাঘ ১৩৭৮

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা

নাভানা, ১৯৫৫

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে বাংলা কবিতা কয়েক দশক ধরে প্রকৃত পরিণতির স্তরে উপনীত হয়েছে। সেই পরিণতিকে নব নব উন্মেষে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে একজন অগ্রণী। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' যে সংকলিত হয়েছে, এটা আমাদের সাহিত্যে একটা রীতিমতো ঘটনা।

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে যখন কবিতার আবির্ভাব হয়েছিল, তখন তাতে ছিল এদেশের মাটির স্নিগ্ধ স্বাদ—যে স্বাদের তারিফ বহুকাল পরে এমার্সন করেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে। তারপর বৈষ্ণব কবিদের রচনায় গূঢ়ার্থবাদকে অনায়াসে ভেদ করে রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ কবিতাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করল। মুকুন্দরাম, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র পর্যন্ত দেশজ আবেগ ও সহজ বুদ্ধির সুঠাম ছাপ সুস্পষ্ট, কিন্তু যে ঔজ্জ্বল্য ছিল নগরসভ্যতার আনুষঙ্গিক ও সুশোভন সজ্জা, তখনও তার লক্ষণ দুর্লভ। পাশ্চাত্য শক্তির ধাক্কায় আমাদের জীবনে যে নতুন ব্যাঘাত এসে হাজির হল তার দ্বিমুখ প্রকোপে সাহিত্যে এল অজ্ঞাতপূর্ব বিচলিতি যার ইঙ্গিত ঈশ্বর গুপ্ত কিম্বা এমনকি দাশু রায়েও লক্ষ করা যায়। প্রভূত প্রতিভার সম্ভাবনা অথচ প্রকৃত প্রতিভার অভাবের ভার বইতে হয়েছিল বলে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় থেকে গেল একপ্রকার বঞ্চনা। নতুন জীবন অগ্রাহ্য আর প্রাচীন জীবন ছিন্নমূল—এই উভয়সংকটে পড়ে বাঙালির প্রাণান্ত হল। সাহিত্যে যেন একটা ছেদ পড়ে গেল—পথের নিশানা প্রাচীনপন্থীরা দেখাতে পারলেন না, কিন্তু নবীনপন্থীদের অভ্যুদয় তখনও হয় নি।

বিলিতী মদের নেশার মতো ইংরেজ প্রভাব কিছুকাল শিক্ষিত বাঙালির মাথায় চড়ে গিয়েছিল। তার পুরো ঝোঁক যখন কাটল, তখন এক ধরনের স্থৈর্য তাদের মনে আসে। এই স্থৈর্য কিন্তু ছিল অনিশ্চিত—কথাটা হেঁয়ালি কিন্তু তা স্পষ্ট হবে যদি আমরা মনে রাখি যে মাইকেল মধুসূদনের মতো যাঁর প্রতিভা ছিল বিরাট তাঁকেই এই টানাপোড়েনে ভুগতে হল সবচেয়ে বেশি। নিজের সত্যপথ তিনি নির্মাণ করতে পারলেন না, কিন্তু করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় ত্রুটি তাঁর হয় নি। আর সেই প্রচেষ্টারই ব্যপদেশে বাংলাকাব্যে তিনি আনলেন বিপুল বদল। তাঁর আগে প্রায় সব বাঙালি কবি নিজেদের 'মেটে ঘরে শ্রীবৃন্দাবন' কল্পনা করেই শ্রীহরির আগমনে রোমাঞ্চিত হতেন, কিন্তু মাইকেল প্রথম সেই 'মেটে ঘর' বর্জন করে বিদগ্ধ রাজকীয়তাকে বাংলাকাব্যে আসন দিলেন, গতানুগতিকতা পরিহার করে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ আর তার দশানন জনকের অনস্বীকার্য মহিমায় মুগ্ধ হলেন, কৃষ্ণের লীলা যে বৃন্দাবনের চেয়ে দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্রে অনেক বেশি, তারই আভাস দিলেন। বাংলা কবিতায় এল ভাস্বর, উদাত্ত তেজ—মমতার সিঞ্চনেও তার দার্ঢ্য শিথিল হল না।

তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ, দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তাঁর অজস্র লেখনীর

কিরণ বিচ্ছুরিত হল—প্রাচীন ও অর্বাচীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সর্ববিধ রসভাণ্ড থেকে মধু আহরণ করে গৌড়জনকে তিনি পরিবেশন করলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রজাপতিব্রহ্মা—সর্বোপরি তাঁরই বর্ণাঢ্য পক্ষবিস্তারে বাংলা রচনার সুবিচিত্র সৌন্দর্য সূচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণভার এতই বিপুল যে তাকে আমরা দান বলেই আত্মসাৎ করেছি, ঋণ পরিশোধের দম্ভ রাখি নি। কিন্তু রূপাঞ্জনশলাকা দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষুকে উন্মীলিত করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের গুরু, তেমনি আবার অমিত প্রতিভার ছটায় মোহাবিষ্ট করেছিলেন বলে মোহভঙ্গেরও আমাদের প্রয়োজন ছিল। একদা তাই রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ বর্জনের ব্যগ্রতা নিয়ে যে কথঞ্চিৎ অবিমৃষ্যকারী প্রচেষ্টা হয়েছিল আমাদের কাব্যক্ষেত্রে তা একেবারেই অসার্থক হয় নি। মনীষীশ্রেষ্ঠ কাল মার্কস একবার বলেছিলেন: 'Thank God I am no Marxist!' শিষ্যদের গরুড়সুলভ ভজনপ্রবৃত্তি বোধহয় রবীন্দ্রনাথেরও মনে অনুরূপ বিরক্তি সঞ্চার করেছিল। যথার্থ শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর অপরিমেয় অবদান সম্বন্ধে সজাগ থেকেই স্বতন্ত্র পথে বাংলা কবিতাকে প্রবাহিত করার কামনা অপরাধ নয় বরঞ্চ কর্তব্য বলেই প্রকৃত লেখকের মনে হওয়া অনিবার্য।

কিন্তু 'স্বতন্ত্র' বলতে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গির কল্পনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের ব্যর্থতা ঘটেছে নিতান্ত সঙ্গত কারণেই। ইতিহাসবোধ যদি না থাকে তো তার মূল্য কবিকেও দিতে হয়। বায়ুভূত ও স্বয়ম্ভূত নৈঃসঙ্গ্য সত্য নয়, সার্থকও হতে পারে না। বাংলার কবিকাহিনী যে পরম্পরা সৃষ্টি করেছে, যে পরম্পরাকে রবীন্দ্রনাথ ষড়ৈশ্বর্যে ভূষিত করেছেন, তাকে অস্বীকার করার চেয়ে সাহিত্যিক প্রত্যবায় আর নেই।

দীর্ঘ হলেও এ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ বহু সতীর্থের তুলনায় এই পরম্পরা সম্বন্ধে সমধিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি বিষ্ণু দে-র কবিচেতনাকে সমুজ্জ্বল করেছে, আর তাঁর কবিতাকে এই পরম্পরাকে পশ্চাৎপটরূপে রেখেই বিচার করা চাই। ইতিহাসবোধের দিক থেকে কোনো লেখকেরই চেয়ে তিনি ন্যূন নন। বাংলা কবিতার ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর অনুশীলন ব্যাপক ও গভীর। ইংরেজি—এবং কিয়ৎপরিমাণে ফরাসী—কবিতার আস্বাদ তাঁর কাছে শুধু সুপরিচিত নয় অন্তরঙ্গ। তাঁর সম্বন্ধে বাংলাকবিতার পাঠকদের তাই প্রত্যাশা প্রচুর।

প্রত্যাশাকে তিনি অপরিতুষ্ট রেখেছেন কেউ বলবে না। মনের যে

আপাত মধুর তরলতাকে আমরা সহজে অভ্যর্থনা করে এসেছি তার পরিবর্তে ভাবঘনত্ব কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করে তিনি অনেকের কাছে দুর্নাম পেয়েও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আবেগকে প্রকাশ করতে হলে তাকে স্বচ্ছ প্রস্রবণ বা চকিত বিস্ফোরণের আকার দেওয়া কবিযশঃপ্রার্থীদের পক্ষে দুরূহ নয়। কিন্তু গভীর কথা বলতে গেলে যে গভীর স্বরেরই প্রয়োজন আর সংগীততরঙ্গের মধ্যে শ্রুতের চেয়ে অশ্রুতের মহিমা ও মাধুর্য যে কম নয়, এই বোধ সহজ জনপ্রিয়তাকে তুচ্ছ করে বাংলা কবিতায় সঞ্চার করার কাজে রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিষ্ণু দে-র অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ইংরেজি কবিতায় অশান্ত জিজ্ঞাসার যে অর্থনিগূঢ় বাতাবরণ দেখা দিয়েছিল, তাকে বাংলা কবিতার বাচনপদ্ধতির মধ্যে রূপায়িত করার প্রায় একক সাফল্য বিষ্ণু দে-র। সমসাময়িক ঘটনার সত্য মূল্যকে কাব্যরীতির সঙ্গে সুসমঞ্জস রেখে প্রকাশ করার বিশিষ্ট ও মোহন ভঙ্গি তিনি অর্জন করেছেন। লেখনী তাঁর অক্লান্ত, কোনো কোনো শক্তিমান কবি ঝোড়ো হাওয়ায় বালিতে-মুখ-গোঁজা উটপাখির মতো মাঝে মাঝে কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণু দে পরাজয় স্বীকার করেননি। মহৎ কবির বহুগুণে সম্বলিত হয়ে তিনি কাব্যক্ষেত্রে বিরাজ করছেন; তাঁর কাছে কাব্যামোদীজনের ঋণ প্রভূত।

কারও শ্রেষ্ঠ কবিতা সঞ্চয়ন সম্পর্কে পাঠকদের মতদ্বৈধ অনিবার্য, কিন্তু কবি যখন স্বয়ং সঞ্চয়নের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত নন, তখন আপত্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। বিংশ বর্ষ ধরে যে সম্ভারের তিনি স্রষ্টা, তার পরিচয় এই কাব্যগ্রন্থে স্পষ্ট।

কিন্তু একথাও বলতে সংকুচিত নই যে প্রতিভার যে দ্যুতি তাঁর রচনায় বহুদিন থেকে লক্ষ করা গিয়েছে, তার অখণ্ড বিকাশে যেন কোথাও বাধা পড়েছে। এজন্য হয়তো কবিকে ততটা দায়ী করা ঠিক নয় যতটা দায়ী হলো আমাদের বর্তমান জীবনব্যবস্থা। যেখানে সামাজিক পরিবেশ বহু ভিন্নধর্মী ধারার অস্বস্তিকর সহ-অবস্থানের ফলে জটিলতা ও নৈরাশ্যব্যঞ্জনায় দূষিত হয়ে রয়েছে, সেখানে কবির সংবেদনশীল মনে জর্জরতার পরিমাণ এত অধিক হওয়া প্রায় অনিবার্য যে মুক্তকণ্ঠে স্বচ্ছচিত্তে যুগবাণীকে কাব্যরূপ দেওয়ার চেয়ে সুকঠিন কর্ম কিছু নেই। যে-সাহিত্যে কবিতার ঐতিহ্য স্বল্প ও শৈলীর বিকাশ নগণ্য, সেখানে বরং কৃতী কবির পথ সুগম, কিন্তু বাঙালি কবির সৌভাগ্য (ও দুর্ভাগ্য) হলো এই যে আমাদের কবিতার পরিপ্রেক্ষিত বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য—সার্থক রচনা সেখানে দাবি করে প্রগাঢ় অনুভূতির এমন ব্যঞ্জনা যা বাক্‌বহুল

নয়, যা অতি উচ্চ বা অতি অনুচ্চ তারে বাঁধা নয়, যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন পুনরুক্তিদুষ্ট নয়, যা মূলগতভাবে সর্বজনবোধ্য বলেই রুচি ও মূল্যজ্ঞানকে বিকৃত করার সম্ভাবনা রাখে না, যা সমসাময়িক বাঙালি মনের প্রকৃত কিন্তু হয়তো অচেতন স্বপ্নকেই প্রকাশ করে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কাব্যরস সম্ভোগকে 'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' বলে কল্পনা করেছিলেন; তার চেয়ে বড় দাবি তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদেব আধুনিক দাবিব সংজ্ঞা ও আধেয় অন্য হলেও মূলত অভিন্ন। সে-দাবি পূরণ করতে এখনও আমাদের কবিকুল অপারগ। বিষ্ণু দে-কেও এই অসামর্থ্যের দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সাম্প্রতিক বাঙালি কবিদের মধ্যে যাঁদের কাছে প্রত্যাশা ছিল বেশি, তাঁরা অল্পাধিক হতাশই করে আসছেন। মনে হয় যে প্রেমেন্দ্র মিত্র বুঝি স্বেচ্ছায় আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনিচ্ছায় পথ হারিয়ে ফেলেছেন, আর ফেলে যে অন্তর্দাহে পীড়িত হচ্ছেন তার লক্ষণও দেখাচ্ছেন না। অবাধ্য নিয়তি সুকান্তকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তাই উচ্চৈঃস্বরে যা সে বলতে চেয়েছিল, সে-কথাকেই অবিকল কাব্যের চিত্তজয়ী ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করার অবসর পর্যন্ত তার মিলল না। প্রথম থেকেই সর্বজন হতে অনপনেয় পার্থক্যবোধ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে প্রকৃত কাব্যসিদ্ধি থেকে বঞ্চিত করেছে। একদাখ্যাত বুদ্ধদেব বসু অপরিণতির জালে উর্ণনাভবৃত্তিতে সজ্ঞানেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। গুণগ্রাহিতার অভাবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুরপ্রধান কবিশক্তির স্ফুরণে অবিরাম প্রতিবন্ধক ঘটেছে। গণচেতনার প্রতিভূত্ব দাবি করে কয়েকজন কৃতী কবি দেখা দিয়েছেন বটে, মধ্যে মধ্যে মুগ্ধও হয়তো করেছেন, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠে জাদু নেই, বাক্য-চ্ছটায় সংযমের মহিমা নেই, পর্যবেক্ষণে গভীরতা নেই বলে অনুভূতির মধ্যে বঞ্চনা ও বিকৃতি প্রতীয়মান হয়।

বিষ্ণু দে সম্বন্ধেও বলব যে তাঁর ক্রমান্বিত রচনাগৌরব আমার কাছে শ্রদ্ধেয় হলেও তাঁরই নিজের একান্ত অন্বিষ্ট সিদ্ধির নিঃসংকোচ লক্ষণ দেখি না বলে আমি ক্লিষ্ট।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তিনি 'ঘোড়সওয়ার'-এর মতো কবিতা লিখেছেন। 'উর্বশী ও আর্টেমিস্' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ; পরিচ্ছন্ন হাত, মার্জিত মন আর ঈষৎ পুলকিত আত্মশ্লাঘা ছিল তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অচিরে 'চোরাবালি' বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিভার আবির্ভাব সূচিত করল। তারপর 'পূর্বলেখ' ও 'সাত ভাই চম্পা' থেকে 'নাম রেখেছি কোমল

গান্ধার' পর্যন্ত তাঁর অশ্রান্ত পরিক্রমা চলেছে—নিদিধ্যাসনগুণে কবি যেন প্রাক্তন দ্বিধাবিভক্তিকে অতিক্রম করেছেন :

স্বপ্নে আজ চেতন অবচেতন
যুক্তপাণি, মনে জীবনে দ্বন্দ্ব
রক্তে তবু নল গোলাপ বন।
স্বপ্ন আর মানে না কারাবন্ধ
বাগানে আব বাদায় বোনে ক্রান্তি
ত্রিকালে নাচে মুহূর্তের ছন্দ
মুঠিতে বাঁধে ঝঞ্ঝাময় শান্তি। ('অন্বিষ্ট')

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা বাঙলা সাহিত্যে সৌম্য, সৎ, সচেতন গভীরতার অতি ক্ষীণ ধারাকে পুষ্ট করেছে, সন্দেহ নেই। বহু পাঠক অবশ্য অনুযোগ করবেন স্নিগ্ধতার অভাব সম্বন্ধে, কিন্তু বাঙালি রচনায় স্নিগ্ধতা প্রায়শই কাল হয়েছে। বহুতর অভিযোগ আসবে যে তাঁর রচনা-শৈলী স্বচ্ছ নয়, কিন্তু যে-স্বচ্ছতা সুপ্রচুর আয়াসসাধ্য নয় তা অন্তত বাংলার কবিকুলের পক্ষে বর্জনীয়—অনায়াস কল্পনার রোমন্থনে আমাদের কাব্য কলঙ্কিত না হলেও ভারাক্রান্ত।

কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে এমন হ্রদ দুরধিগম্য নয় যার জল গভীর অথচ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, পাতাল পর্যন্ত তার মৃদু তরঙ্গায়িত মধুরিমা সর্বজনের দৃষ্টি ও মানসের গোচর। কবিতা যখন সিদ্ধির সেই শৃঙ্গে আরোহণ করে, তখন গভীরতা ও স্বচ্ছতা পরস্পরের অনুষঙ্গ নিয়ে থাকে। সে-কৃতিত্ব দুষ্কর ও দুর্লভ; তার উদাহরণ একান্ত অবশ্যম্ভাবিরূপে স্বল্প। এখনও বিষ্ণু দে-র রচনায় তার আবির্ভাব ঘটে নি। এখনও তাঁর কণ্ঠ স্বকীয় অনুভূতির গর্বেই যেন কথঞ্চিৎ স্তিমিত; এখনও তাঁর মুখ থেকে 'শৃন্বন্তু বিশ্বে'-র অমিত শ্লাঘা নিয়ে চলমান জীবনের মর্মবাণী নিঃসৃত হওয়ার লক্ষণ নেই; এখনও যেন তাঁর বিচরণপথে আছে শঙ্কা; এখনও পর্যন্ত অখণ্ড অনুভূতির অজর আনন্দ তাঁর লেখনী বিকিরণ করতে পারে নি।

কবি হিসাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হয় নি। অন্যে পরে কা কথা! কিন্তু তিনি ছিলেন বিচিত্রবীর্য, আর তাঁর অবদানের পরিমাণ ও গুণ মিলে এক অপরূপ সম্ভারের সৃষ্টি করেছে। তাঁরই উত্তরসাধকরূপে যাঁরা আজ লিখছেন, তাঁদের সম্বন্ধে প্রত্যাশা উর্ধ্বমুখী

হওয়া অনুচিত নয়। কিন্তু যে-প্রত্যাশার সংকেত ইতিপূর্বে দিয়েছি, তার পরিতুষ্টি বহু ভাগ্য বিনা সম্ভব নয়। আমাদের সে-ভাগ্য হবে কিনা, এ-প্রশ্নের উত্তর না-খোঁজাই বোধহয় শ্রেয়।

অত্যন্ত সভয়ে একটি কথা বলে শেষ করব। ভারতবর্ষের বিদগ্ধ চিন্তায় নিরাসক্তির ঐতিহ্য এতই দীর্ঘ ও দৃঢ় যে তার ফলেই বোধ হয় আমাদের কবিতার স্বকীয় মাহাত্ম্যে কিঞ্চিৎ হানি ঘটেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের স্থান গরীয়ান বটে, কিন্তু চীনে কয়েক সহস্র বৎসর ধরে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পরম-আসক্তি-জাত যে-কবিতা লেখা হয়েছে তার তুলনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নেই। ইয়োরোপের কবিকুলের কাছে তাই চীনা কবিতা মহামূল্য কিন্তু ভারতবর্ষের কবিতা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। অবশ্য কালিদাস-প্রমুখ মহাকবির প্রতিভা অস্বীকার করার চেয়ে বাতুলতা নেই। বেদ, উপনিষৎ, পুরাণে প্রোজ্জ্বল, স্বতঃস্ফূর্ত কবিতার উদাহরণ স্বল্প নয়। মহাভারত রামায়ণে অগণিত শ্লোক আছে যা কবিতার অষ্টধাতুতে ভরা। কিন্তু পুষ্করিণীর জলে একটি পত্রের পতনে যে-রোমাঞ্চ কবিমনকে সৃজনব্যাকুল করে তোলে, তার প্রতি কথঞ্চিৎ তাচ্ছিল্য আমাদের চিন্তায় বহুকাল হতে বাসা বেঁধে এসেছে। বিশ্ববীক্ষার জন্য একান্ত অধীরতা আমাদের দেশের বিদগ্ধ মনকে জীবনের বহু সামান্য অথচ সুগভীর ব্যঞ্জনা সম্পর্কে অনীহাগ্রস্ত করেছে, কবিতাকে প্রায় শুধু মনীষার সগোত্র করে রেখেছে। যারা সমসাময়িক অথচ পশ্চাৎমুখী ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে, যারা প্রকৃতপক্ষে সমাজে অন্তেবাসী হয়ে থেকেছে, যারা আয়াসলব্ধ আধ্যাত্মিকতার চেয়ে মানবীয় অনুভূতিকেই পরমার্থ বলে মনে করেছে, প্রধানত তাদেরই কাছ থেকে আমরা পেয়েছি নিছক কবিতা। বর্তমান যুগের জটিলতা দাবি করে—কবির কাছেও দাবি করে—চিন্তার মুক্তি, অনুভূতির ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য, যে-ত্রিধারায় পুষ্ট না হলে কাব্য-মন্দাকিনীর লাবণ্যও ম্লান হয়ে যায়। আমাদের কবিজনকে এবিষয়ে সম্যক সচেতন করার কাজে বিষ্ণু দে-র শ্রদ্ধেয় ভূমিকা এই সংকলনে সুস্পষ্ট। বাঙালি পাঠক এ-গ্রন্থের সমাদর করবে সন্দেহ নেই।

['বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র সমালোচনা।
'পরিচয়', পৌষ ১৩৬২]

পুনশ্চ :

বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্বন্ধে বহুদিন পূর্বে যে-সমালোচনাপ্রবন্ধ লিখেছিলাম, সেটিকে এই পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ['সাম্প্রত', বিষ্ণু দে সংখ্যা] ভূমিকারূপে পুনর্মুদ্রণ করা হচ্ছে।

পত্রিকার কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে আমায় অনুমতি দিয়েছেন যাতে 'পুনশ্চ' আখ্যা দিয়ে অল্প কয়েকটি কথা যোগ করতে পারি।

আমার বিপদ এই যে কিছুটা দশচক্রে কবিতা ব্যাপারে বিজ্ঞ বলে একটা ধারণা আমার সম্বন্ধে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। ১৯৩৯-৪০ সালে শ্রীযুক্ত আবু সয়ীদ আইয়ুবের সহযোগিতায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে আমায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল—কাজের সিংহভাগ করেছিলেন আইয়ুব এবং অপর কয়েকজন বন্ধু, আমার অংশীদারি তুলনায় অল্প ছিল। অবশ্য ভূমিকা একটা লিখেছিলাম,-এবং লিখে কিঞ্চিৎ শিষ্ট বিতণ্ডারও সূত্রপাত ঘটিয়ে ফেলেছিলাম। হয়তো তার জের আজও কিছু পরিমাণে চলছে। এটা বলে রাখছি কারণ কেউ যেন আমাকে কবিতার, বিশেষ করে আধুনিক কবিতার, মস্ত এক সমঝদার মনে করার মতো ভুল না করে বসেন।

আমাদের দেশের কবিতা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত অথচ নানা কাজে ব্যস্ত সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি হিসাবেই কয়েকটি কথা বলছি।

রবীন্দ্রোত্তর বলে যে-যুগের বর্ণনা করা হয়, বাংলা কাব্যক্ষেত্রে সেই যুগের সম্ভার নিয়ে অহংকারের অবকাশ আমাদের আছে। এ-যুগেরই প্রধান প্রতিভূ হলেন নজরুল, যাঁর ঝড়ের-ডানায়-চড়া প্রতিভার বিভূতি বাংলাভাষার এমন ভূষণ যার তুলনা নেই। অপর যে-মহাজনদের নাম মনে আসছে তাঁদের উল্লেখ আলাদাভাবে করছি না। কিন্তু আমার ধারণা যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অপর শৃঙ্গের তুঙ্গে যদি কাউকে দেখি তো তিনি হলেন বিষ্ণু দে।

স্বর মৃদু, কণ্ঠ অনুত্তোলিত, অথচ জীবনসত্যের সন্ধানে অবিরাম, বিশ্বরূপ দর্শনে পুলকিত, চিন্তায় গভীর, চেতনায় স্বচ্ছ এই কবি শব্দের যোজনায় যে-সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা বাঙালি পাঠকমাত্রেরই গর্ব।

যুক্তি দিয়ে, তথ্য হাজির করে, সাহিত্যবিচারের বিভিন্ন অভিজ্ঞানের উল্লেখ করে বিষ্ণু দে-র কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণের সামর্থ্য বা সময় আমার নেই। এই

সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট অন্যান্য রচনা সে-ব্যাপারে অবশ্যই সহায়তা দেবে। আমি শুধু এইটুকু বলে ক্ষান্ত হব যে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' গ্রন্থটি পেয়ে যা আমার মনে আলোর মতো ঝলকে উঠেছিল তাই আমার শেষ কথা—বিষ্ণু দে আজ বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবি, এ নিয়ে বিসম্বাদের কোনো স্থান নেই।

২৬।১২।৭১

কাব্য আলোচনা

১৯৬৬-১৯৭৭

এখন পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র শেষতম কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরে থাকো মৌন' (জুন, ১৯৭৭)। বইটিতে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির সমকালীন আরো কিছু কবিতা এখনও গ্রন্থভুক্ত হয় নি। এর পরেও তাঁর কিছু কবিতা বেরিয়েছে। এবং আরো অনেক কবিতাই তো তিনি লিখবেন। তাই তাঁর কবিতার পর্যায়ভাগ এখনো অবান্তর।

তবু, তাঁর এই সাম্প্রতিকতম কাব্যকর্ম উজিয়ে, 'সেই অন্ধকার চাই'-এ (১৯৬৬) পৌঁছনো যায়। প্রধানত একই সময়ের লেখা কবিতা সংকলিত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে ও পরপর 'সংবাদ মূলত কাব্য' (১৯৬৯) ও 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' (১৯৭০) বই দুটিতে।

এর পর 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' (১৯৭৪), 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' (১৯৭৫) ও 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৭)—এই কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্য দিয়েই বিষ্ণু দে-র আধুনিকতম কাব্যচেষ্টার পরিচয় লক্ষ করতে হয়।

'সেই অন্ধকার চাই'-এর রচনা শুরু ১৯৬৯-তে এবং 'উত্তরে থাকো মৌন'-র রচনাশেষ ১৯৭৭-এ। বিষ্ণু দে-র পঞ্চাশোর্ধ বয়স থেকে প্রায় সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত রচিত তাঁর এই কাব্যগ্রন্থগুলি নিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন লেখালেখি হলেও ধারাবাহিক আলোচনা হয়েছে কম। অথচ তাঁর কাব্য-জীবনের পরিণততর বিকাশে বোধহয় এগুলির স্থান কম গুরুত্বের নয়। আমরা তাই এই কাব্যগ্রন্থগুলি সম্পর্কে কয়েকটি নতুন আলোচনা প্রকাশ করছি এখানে।

সম্পাদক, 'পরিচয়'

সেই অন্ধকার চাই

ভাবরি, ১৯৬৬

নন্দিনী আল্‌হেলাল

ছিয়ান্নটি কবিতার এই সংকলনের একত্রিশটি কবিতা লেখা হয়েছে ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারি থেকে ৬৩-র ফেব্রুয়ারির মধ্যে। মাঝখানে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের গোড়া পর্যন্ত প্রায় তিনমাস কোনো কবিতা লেখেন নি। সেই অক্টোবরেই ভারত সীমান্ত লঙ্ঘন করে চীনা বাহিনী। অথচ এ বইটির নাম বেছেছেন 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-বইটির সমকালীন একটি কবিতা (১১ ডিসেম্বর, ১৯৫৮) থেকে। 'সৃষ্টিময়, মধুর দয়াল' সেই অন্ধকার :

> স্পন্দমান ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষে ভয়ে
> কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে মহাভিড
> লক্ষ লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার (পৃ ৯)

এই আকাঙ্ক্ষার এমন প্রকাশের দিন-বিশেক আগে 'বরিস্ পাস্তের্নাক-কে' কবিতাটিতে লিখছিলেন, বেশ চড়া মেজাজে, যে-মেজাজ তাঁর ঐ বিষয়ক প্রবন্ধটিতেও,

> ভাবতে অবাক লাগে, এত দেখে এত ঠেকে শিখে
> কেন যে অনেকে আজও পশ্চিমার দু-তিন শতকে ভাবি
> সভ্যতার আদি আর শেষ !...
> এ নাটে কুমার কোথা ? এতে নেই অর্ধনারীশ্বর।
> ('বরিস পাস্তের্নাক-কে', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত', পৃ ৩৭)

প্রায় এমন রাগী মেজাজেই দিন বিশেক পরে লেখেন

> থেকেছি বুর্জোয়া বহু দেশে গ্রামে শহরে বস্তিতে,
> বহু জন্তু সরীসৃপ কাজ করে, করে বিকিকিনি ;

দিবা দ্বিপ্রহরে ঢাকে কালো ছায়া হৃদয়ে-হৃদয়ে
অন্ধকার দিয়ে ঢাকে লালদীঘির লাল অন্ধকার। (পৃ ৯)

এমন বিরক্তি আর আকাঙ্ক্ষার নির্দিষ্টতা থেকে ১৯৫৯-এর ১০ জুলাই-এর একটি কবিতায় 'আকাশের আবেগ' ঘনানোর আর 'একান্ত আশ্লেষ'-এর আত্মদানের 'সেই ভাষা'-র উপমান

এ কথা জানেন ভালো নাম্বুদিরিপাদ,
শুদ্ধতা সংহত তাঁর নির্বিবাদ স্বরে। (পৃ ১১)

তখন কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট সরকারকে খারিজ করা হচ্ছে।

দিন-রাত্রি, আলো-অন্ধকার—এই উপমেয়ের 'সেই ভাষা' ও উপমানের নিশ্চয়তা নিয়ে ৬২-র ফেব্রুয়ারির আগে লেখা, 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর সমকালীন এই বইয়ের দশটি কবিতায়—'অনিদ্রার শিখরেও ছিল না সন্দেহ',

তোমার তিব্বতি হিম গলবে আর কপিল গুহায়
বইবে গাঙ্গেয় ধারা, সে-বিষয়ে করি না সন্দেহ
অনিদ্রার শিখরেও। (পৃ ১৩)

অনিদ্রাতেও নিঃসন্দেহ বিষ্ণু দে-র এই সাবেকি মেজাজ ৬১-র থেকে ১১ ডিসেম্বরে লেখা পরপর চারটি কবিতায় ব্যাঙ্গে অক্লান্ত, লিরিকে দ্বিধাহীন স্বরগ্রামে বিচিত্র, দীপ্র, তীব্র, বিষণ্ণও। স্তালিনের কবর সরানোর অব্যবহিতে

কেন এ ভূতের ভয়? কর্তার ভূত-কে
বলো না সাবেক সুরে: ভূত মোর পুত্।
কি হবে হরদম এই রাম নাম বলে?
('কর্তার ভূত', 'সংবাদ মূলত কাব্য', পৃ ৭)

৭ ডিসেম্বরে লেখা এই লাইনগুলির পরদিনই ৮ ডিসেম্বরে,

নির্ভয়ে চলো এদিকে শুধুই নির্ঝর,
শ্যামল শষ্প, রৌদ্রে ও মেঘে মসৃণ
শিলার নিদ্রা, নীলাকাশ ঈশাবাস্য,
স্তব্ধ গানের ক্ষিপ্র স্রোতের রাতদিন
প্রহরে-প্রহরে তোমাতেই করে নির্ভর,
তোমার শরীরে নিসর্গ পায় ভাষ্য। (পৃ ১৭)

শ্লেষ আর লিরিকের এমন খোলা মেজাজ ১০ আর ১১ তারিখে লেখা ছুটো

সনেটে স্তম্ভিত বিষাদ, সাহারায় আণবিক পরীক্ষার আর মেগাটনের স্পষ্ট উল্লেখে। প্রথমটিতে বেয়াত্রিচের উপমেয়ে,

তবু কেন লুব্ধ আবর্তের
প্রতিবেশী অট্টনাদ, তবু কেন শক্তির সংবিতে
শান্তি নয়, সখ্য নয়, চায় বিশ্বে চায় হিরোশিমা? (পৃ ১৮)

পরেরটিতে জলের,

জলের অদ্ভুত রাগ…
…কিংবা যেন মল্ল কেউ একাই খোঁজেন
ছায়ায় আপন শত্রু, যত ছায়া সরে তত মনে
রাগ গর্জে, দুস্থ চৈতন্যের রাগ, যেমন বারুণী হাঁকে
হিরোশিমা সাহারায়--কিংবা আরো মোটা মেগাটনে
আর কোথাও জুজুমানা বোমা ছোঁড়ে।
('দেখেছি জলের রাগ', 'সংবাদ মূলত কাব্য, পৃ ৯)

এই কবিতাটির শেষে কেমন এক সংশয়ের স্বর 'নদীর প্রাণ স্রোতের প্রতীকই বুঝি ডোবে'। নদীর স্রোতের এই উপমান ফিরে আসবে এক বছর পেরিয়ে, 'শীলভদ্র পঞ্চমুখ'-এ।

৬২-র ফেব্রুয়ারি জুড়ে বিষ্ণু দে কবিতা লিখেছেন—৮ থেকে ২৬ এই আঠারো দিনে ষোলটি কবিতা, কোনো-কোনো দিন দুটি-তিনটি।

কোনো-কোনো সময় যেমন ৮ ফেব্রুয়ারি লেখা তিনটি কবিতার একটি, 'অন্যদের আছে বারোমাস'-এ ('সংবাদ মূলত কাব্য', পৃ ১১), খুব একটা স্পষ্ট অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে না। আবার সেদিনেরই অপর ছোট কবিতাটিতে কোনো এক ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার আভাস যেন থেকেই যায়—'এরা সব বিশ্বের পাণ্ডব' ('সংবাদ মূলত কাব্য', পৃ ১২)। এই দিনের আর একটি কবিতাও 'কোনো পেত্রক যেন পেত্রকার জন্য', এই দুটি কবিতার মতো আট-ছয় মাত্রার সর্বোচ্চ পয়ারের ধাঁচে বাঁধা আর এ-কবিতাটিও অপর দুটির মতোই একটু সদুক্তি আবৃত্তির সুরে বলা,

যতই না শূন্যে জলে স্থলে
যবনিকা মেলে ধরে মূর্খ অন্ধকার,
আলোর মহিমা দেখি অতল অপার। (পৃ ২২)

এ রকম আরো কিছু কবিতা এ-বইয়ে আছে— পৃথিবীর নববধূ' (পৃ ২৩), 'নিকট বিকৃতি' (পৃ ৩৭)। এ কবিতাগুলির ভেতরে যেন কথা বলে নিজেকে একটু স্থিরতায় আনার লক্ষ্যটাই প্রধান। তাই শব্দের কোনো নাটক নেই, উপমানে কোনো উদ্ঘাটন নেই, কোনো নেপথ্যের সহসা সঞ্চার নেই।

অথচ এই একই সময়ে বিষ্ণু দে কিছু তীব্র আসঙ্গের কবিতা লিখছেন। সে আসঙ্গে তাত্ত্বিকতা এত গৌণ, প্রসঙ্গ এত প্রত্যক্ষ যে, এমন কি কোনো কোনো সময় কবির নৈর্ব্যক্তিক পর্যন্ত পৌঁছনো যায় না, অথবা কখনো সে নৈর্ব্যক্তিক কবিতা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। সেই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পর্যন্ত বিষ্ণু দে তো এই ব্যক্তিপ্রেমকেই যুক্ত করে দিয়েছেন বিশ্বনিখিলে, রক্তাক্ত কামনাবাসনাকে দেশকালে দেহের সঙ্গতি দিয়েছেন বা হয়তো কখনো তীক্ষ্ণ শ্লেষে লিবিডো-র উন্মোচন ঘটিয়েছেন। 'সেই অন্ধকার চাই'-এর এই গুটিকয়েক কবিতায় আসঙ্গের নগ্নতা থেকে কবিতাগুলি প্রত্যক্ষ উঠে আসে। তাতে কোনো ভনিতা নেই।

সময়ের দিক থেকে এই কবিতাগুলির শুরু ও শেষ বোধহয় চিহ্নিত করা যায় যথাক্রমে ৬২-র ৩ ফেব্রুয়ারি লেখা 'এখানে' ('সেই অন্ধকার চাই', পৃ ২১) ও ৬৪-র ৩১ জানুয়ারি লেখা 'রক্তে মাঘ' ('সংবাদ মূলত কাব্য', পৃ ৬০) এই দুটি কবিতায়।

প্রথম কবিতাটিতে দ্বিধাহীন তুষারবাসরের আহ্বান, বার্ধক্যে সচেতন, প্রতীক্ষায় স্থির

> যাও তবে পল্লবিনী লতার সঞ্চারে
> যৌবনের স্খলিত ভারে।
>
> বর্ষা যবে মরুভূমি, যখন নিদাঘে
> অশ্রুবন্যা স্বাভাবিক শাপ,
> এখানে তখন যদি আসো ক্লান্ত মাঘে
> হৃদয়ের গৌরীশৃঙ্গে,....
>
> দেবো আমি চিরস্থায়ী তুষারের বাহুবদ্ধ তাপ। (পৃ ২১)

দ্বিতীয় কবিতাটিতে, দু-বছর পরে, আত্মব্যঙ্গ শ্লেষে এই আবেগের যুক্তি-শৃঙ্খলা বাঁধা হয়, তবু অন্তর্গত থেকে যায় অচরিতার্থের বিষাদ

রক্তে মাঘ, তবু স্নায়ু বসন্তবাহারে বিচলিত,
ভাদ্রের সজল ব্যথা বিজ্ঞাপিত অস্থিতে পেশীতে ;
অথচ মনের ক্ষিপ্র কৌতূহল বুভুক্ষু, তৃষিত ,
কামনাও অন্তহীন, যেন বা ফাল্গুন কাঁপে শীতে।

...

তবু রক্তে হিম হাওয়া ঝড়ে, বালি ওড়ে, ওঠে চর,
...একমাত্র
বলা যায়, নিজেই নিজের কাছে প্রায় হাস্যকর !

('সংবাদ মূলত কাব্য', পৃ ৬০)

এই আত্মসচেতনতায় কবি পৌছেছেন দু-বছর পর। তার আগে, এখানে পৌছনোর বড় কঠিন আশ্লেষদীর্ণ পথ কবিকে পেরোতে হয় সদ্য পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ তাঁর গুটিকয়েক কবিতায়। তার কিছু আছে এই বইয়ে, কিছু 'সংবাদ মূলত কাব্য'-এ।

অনেকগুলি কবিতায় কবির দর্শকের আপাত ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা। এ-ভূমিকায় বিষ্ণু দে কিছু অভ্যস্ত—পঞ্চাশে পৌছনোর আগেই তো তিনি কবিতায় নিজেকে 'এই বৃদ্ধ' বলতে শুরু করেছেন। কিন্তু জঙ্গলে বা শহরে প্রেমিক-প্রেমিকা বা আসঙ্গলিপ্ত পুরুষ রমণীর এ দৃশ্যের যত গভীরে কবি যান, ততই তাঁর দূরত্ব অবাস্তর হয়ে যায়, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় কবিতার বিষয়ের সঙ্গেই তাঁর অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা হয়।

১. অঞ্জন কি রঞ্জনার হাতে পেল নক্ষত্রের কল্পিত আভাস
কিংবা চেনা মুখে পেল সাত সমুদ্রের রহস্যের আকস্মিক কূল ?
রঞ্জনা কি সেই রাত্রে শুনেছিল বাড়ির গঞ্জনা,
না কি তার মৃত্যুঞ্জয় বক্ষে ছিল সমুদ্রের ঝড়ের আশ্বাস ?
অঞ্জনের ঘর, রাত্রি, সেই রাত্রে হয়ে গেল সম্পূর্ণ রঞ্জনা। (পৃ২৫)

২. চতুর্দিকে প্রাণী, প্রেম, যৌবনের বীজকম্প্র তাপ !
যুগল গোখরো দূরে রেখে চলে নিরাপদ জলে।
গতিরুদ্ধ। স্বচ্ছ স্রোতে কোন্ নারী সমর্থ সন্তাপ
আশ্লেষে ডোবায় কোন্ যুবা পুরুষের কোলে পেশলে কোমলে !

(পৃ ২৮)

৩. একাই চলে বটে, সঙ্গে তবু তার
হাওয়ার সঙ্গীকে রাত্রে আনে

একেকে দুই করে প্রতিটি শ্বাসে
দুইকে এক প্রতি পদক্ষেপে। (পৃ ৩১)

কয়েকটি মাত্র কবিতা কাহিনীর এক অত্যন্ত অস্পষ্ট আভাসে শুরু হলেও, সে আভাস মুছে গিয়ে করাল সত্য হয়ে ওঠে রক্তের প্রবল জোয়ারের আকাঙ্ক্ষা। অথচ জোয়ারের বেলা কেটে গেছে। '...বাস্তব যে ক্ষুধার্ত পাবক। / রক্তের মাংসের সীমা ঘোচে অন্য কারো আরতিতে?' (পৃ ৪৫)

একই দেহে ক্ষিপ্র জিজীবিষা
হাসে কাঁদে, সন্নিপাতাতুর
আলিঙ্গনে চুম্বনের তৃষা—
দুহুঁ কোবে দুহুঁর বিচ্ছেদে
স্নায়ুতে উদ্বায়ু হাহাকার—
ভাদ্রের ধারায় শমী জ্বলে। (পৃ ৬০)

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর সমকালীন একটি কবিতা থেকে সামাজিক ও শিল্পের অন্ধকারের প্রতিতুলনায় এই কাব্যগ্রন্থের নাম নির্ধারিত হয়েছিল। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর পরবর্তী কবিতার এই নতুন ব্যক্তিগত আশ্লেষের আবহে সে অর্থ বদলে যায়—অন্ধকার আর উপমান থাকে না, ব্যক্তির উপমেয় হয়ে উঠতে চায়—'দুঃস্বপ্নে দুঃস্বপ্নে রাত যেন রাজবন্দীর শিবির', 'রাত্রি কাটে অস্পষ্ট বিনিদ্র এক একাকী মায়ায় ..', 'একা কম্পমান রাত্রি স্তব্ধতায় শিয়রে বাজায় নিজেরই হৃদয়স্পন্দ', 'অমাবস্যা আজ কেন মাত্র অন্ধকার।'

এই অর্থান্তরে 'সেই অন্ধকার চাই'-তে বিষ্ণু দে-র কাব্যের এক নতুন পর্যায় শুরু ধরা যায়। অন্ধকারের এই অর্থান্তরের ভেতর অনেক নাটক ঘটে যায়।

এর আগে কতকগুলি কবিতার কথা বলা হয়েছে যেখানে কবি প্রায় গদ্যের প্রত্যক্ষতায়, প্রায় পৌনঃপুনিক আবৃত্তির সুরে তাঁর আস্থা ও বিশ্বাসের কথা নিজেকেই শুনিয়েছেন। তত্ত্ববিশ্বের এমন প্রায় অভ্যাসিক সংলগ্নতা কবিদের কাছে প্রায়শই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

'শীলভদ্র পঞ্চমুখ' কবিতাটিতে এসে বোঝা যায় 'সেই অন্ধকার চাই'-এর অর্থান্তরে আরো জটিলতা। চীনের সৈন্যবাহিনী ভারত-সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করার পর প্রায় তিনমাস বিষ্ণু দে-র কোনো কবিতা নেই। ৬৩-র ফেব্রুয়ারিতে এই দীর্ঘ কবিতা।

কবিতাটির পাঁচটি ভাগের ভেতর একটি কোনো উপমেয়ের বিকাশ নেই, একটি কোনো রূপকের উন্মোচন নেই। আপাত বিচারে বা কবিতাটির বেশ ঘনিষ্ঠ বারংবার পাঠে সচেতন পাঠকেরও মনে হতে পারে—এ যেন পাঁচটি স্বতন্ত্র কবিতা। যেমন মিল থাকতে পারে কবির একই সময়ের লেখা বা একই গ্রন্থের অন্তর্গত দু-পাঁচটি কবিতার ভেতর তার অতিরিক্ত কোনো মিল যেন এখানে নেই! বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতার পাঠে এমন তো অনেকের অনেক সময়ই মনে হয়েছে। কিন্তু তেমন সব দীর্ঘ কবিতা থেকেও গঠনক্রিয়ায় এটি আলাদা।

প্রথমাংশে উপমেয় 'খুঁজি একমাত্র বরাভয় অচৈতন্যে', 'আরোগ্যের আবেক যন্ত্রণা'। দ্বিতীয়াংশে—'নদীর সমস্যা অন্তহীন সর্বদাই। তৃতীয়াংশে—'প্রাচীন পাথরপচা ঝুরঝুরু মাটি'। পঞ্চমাংশে—'কোনো কালে বন ছিল... আজ তেপান্তর'। মাঝখানে, চতুর্থ অংশে কোনো উপমেয় নেই, পরিবর্তে আছে এক সম্বোধন। প্রথমাংশে 'খুঁজি', এই ক্রিয়াপদটিতে উত্তম পুরুষের ইঙ্গিতের সঙ্গে চতুর্থ অংশের 'তুমি' একটি নাটককে নিহিত করে দেয়।

তা হলে এই কবিতাটির গঠন দাঁড়ায়—উত্তমপুরুষ (প্রথমাংশ), নদীর উপমার বিস্তার, দেশের উপমার বিস্তার, সম্বোধন, জনপদ-তেপান্তরের রান্দ্বিক। একেবারে শেষ চরণে এই উত্তমপুরুষ ও সম্বোধনের মধ্যম পুরুষের মিল ঘটতে দেখা যায় বাকৃভঙ্গিতে।

> ...একা-একা, এখন নিঃশব্দ একার সৃষ্টির
> অরণ্যের অনাগত গান করি। তুমিও তো গান করো মনের কথার
> প্রাণের কথার, নদীর, বৃষ্টির। (পৃ ৫৮).

কিন্তু এই গঠনটি কবিতাটির ভেতর থেকে উঠে আসছে কি? বা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতাটিই কি এই আকার নিয়ে ফেলে? নেওয়া কি সম্ভব—এমন কবিতার এমন আকার? কাহিনীর কোনো রেখা যদি থাকে, উপস্থাপনের কোনো ভঙ্গির ধারাবাহিকতা যদি থাকে, বা কোনো উপমার নির্মাণ-বিনির্মাণের প্রক্রিয়া যদি থাকে তা হলে দীর্ঘ কবিতার এই হয়ে ওঠাটা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। তেমন সুযোগ অন্তত এই কবিতাটিতে নেই।

প্রথমাংশে উত্তমপুরুষের সংবিতের জাগরণকেই ভয়, 'মনে হয় ভালো ছিল ক্লোফিয়ারই জিত'।

দ্বিতীয়াংশে নদীর উপমার বিস্তার ঘটে নদীর নিজেরই জোরে। প্রকৃতির উপমেয়ের সেই জোর থেকে যেন সূত্র বেরিয়ে আসে—নদীর জাগ্রত সংবিতের

সমস্যা। 'নদীর সমস্যা অন্তহীন সর্বদাই', 'নদীর সমস্যা বহু', 'পাহারায় সপ্রতীক্ষ'। উপমেয় থেকে এই প্রশ্নগুলি উত্থিত হলে নদী উপমান হয়ে উঠতে চায়—'অথচ এ-নদী বয় আমাদের অন্তরে-অন্তরে, আমাদের ব্যক্তিগত এককে ও সাধারণে'। উপমান থেকে উঠে আসে এই তুলনা, যা রূপক নয়, বিবৃতি মাত্র—কাব্যে যেমন বিবৃতিতে পৌঁছনোর চেষ্টা থাকে অহরহ—'নদীর নির্মম নির্বিকার ইতিহাস আমাদেরই আত্মকথা'। এই বিবৃতি থেকে ঘোষণা বা আহ্বানে পৌঁছনো যায়, 'আনো, আনো নদীর দুর্গম গভীরতা...'। কবিতাটির শেষে পৌঁছবার আগে, কবিতাটির চতুর্থ অংশের সম্বোধনে পৌঁছুবার আগে, দ্বিতীয়াংশের এই শেষেই সংবিতের সঞ্চার ঘটে যায় এই আহ্বানের ভেতর দিয়ে।

কবির কাছে এই নদীর প্রতিমার সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কবি হিসেবে তাঁর দায় তৃতীয়াংশে নির্দিষ্ট করে নিতে পারেন 'কিবা কল্কি যুগে, কিবা সত্য ত্রেতা দ্বাপরে / স্থপতিরা ভাস্করেরা প্রতিবাদে সর্বদা হাঘরে'। তৃতীয়াংশে প্রস্তাবিত এই 'প্রতিবাদ' চতুর্থাংশে জানিয়ে, পঞ্চমাংশে কবি তেপান্তরে গড়তে যাবেন। তাই 'প্রতিবাদ' হয়ে ওঠে আত্মঘোষণা, সংবিতের জাগরণ,

> কিন্তু তবু যত অন্ধকার হানো ইংরেজিতে হিন্দিতে চৈনিকে
> অথবা বাংলায় সমস্ত কলুষ রোগ ঝরে যায় মননের
> স্বর্গের দুর্গম লোকে...
> মননের দুর্ধর্ষ সুন্দরে
> যেখানে বেঁধেছি বাসা আমরা অনেক লোক...
> দেশে দেশে দীর্ঘকাল, অনেক চৈতন্যে। (পৃ ৫৬)

এইবার পঞ্চমাংশে কবির হাঘরে নির্মাণ তেপান্তরে, কল্কি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের মতো। নির্মাণের একাকীত্বের সেই প্রবল অহঙ্কারে শ্মশান তুচ্ছ হয়ে যায়, দ্বিতীয়াংশের নদীর উপমার মতো অর্থবহ বিস্তারে বিস্তারে নয়—প্রকৃতির প্রাণলীলাই উপমান হয়ে যেতে থাকে কবির সৃষ্টির উপমেয়ের। প্রথমাংশের মর্ফিয়াগ্রস্ত লৌল্য থেকে কবি-সংবিদ্ সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় তার সৃষ্টিশীলতার পরাক্রমে

> মাঝে-মাঝে বট ওঠে, মুণ্ডকাটা নুলো ধড়ে অশ্বত্থের অমর বিস্তার
> যেন এক জয়ধ্বনি শূন্যে-শূন্যে রটে, কোথাও বা আমের শিকড়ে

বউলের সম্ভাবনা মাৎ করে, কোথাও কাঁঠাল আনে
কোথাও মহুয়া পাতা ফেলে ফুল খুলে-খুলে আনে
ফাল্গুনের পোড়ামুখ গন্ধের বাহার ;
পলাশ বিদ্যুৎ জ্বালে যৌবনের, শাল হঠাৎ প্রস্তুতি পায়
কে বা জেতে কে বা হারে নতুন বরাতে...
...
...একা-একা, এখন নিঃশব্দ একার সৃষ্টির
অরণ্যের অনাগত গান করি। (পৃ ৫৭-৫৮)

ইতিহাসের অন্ধকার থেকে কবি 'কাব্যের আদিম গর্ভে'-র 'দিব্য অন্ধকার'-এ পৌঁছে যান—'সেই বনে হিংস্রতাও স্বাভাবিক'।

সংবাদ মূলত কাব্য

স। চিত্রপত্রগ্রন্থ, ১৯৬৯

কল্যাণ সেনগুপ্ত

সংবাদ মূলত কাব্য? তা কি এইজন্যই যে কবির চতুষ্পার্শ্ব আজ যখন তুচ্ছতায় ও গৌণতায় আক্রান্ত, যখন 'নিকট-বিকৃতি' দৃষ্টিকে ক্ষীণ করে দেয়, যখন তথ্য ও তত্ত্ব বিচ্ছিন্ন এবং আমরা তথ্যের মিথ্যাচার ও কলরবে ডুবি, তখন কবি আমাদের দৈনন্দিন মুহূর্তকে আপাত-তুচ্ছতার গ্লানি থেকে ভাসাতে চেয়েছেন, পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সার্থকতার গরিমায়, জানাতে চেয়েছেন আত্মবিস্মৃত আমাদের কানে কানে মুহূর্তের মহার্ঘতাকে? সংবাদ মূলত কাব্য—এ কি তবে কবির সেই দুর্মর আশা? না কি তা নৈরাশ্যের তিক্ততায় কবির ব্যঙ্গ? প্রতিবাদ? আজ যখন মহার্ঘতার এই বোধকেও আমরা হারাতে বসেছি তুচ্ছতার প্রতি মনোযোগে, অন্তর্কলহের কোলাহলে হারিয়েছি পরিপ্রেক্ষিত, সোনা ফেলে আঁচলে দিয়েছি গেরো—তখন কি আমাদের সেই বিভ্রান্তিও আভাসিত হয়ে ওঠে গ্রন্থনামে? না কি আশা এবং আশাভঙ্গের পরিহাস আজ আর পৃথক নয়—কারণ কবি ভাবেন, তিনি পৌঁছেছেন এমন

এক জায়গায়, যেখানে আশাও নেই নিরাশাও নেই, সঙ্গ নেই নৈঃসঙ্গ্যও নেই ?

কখনই তো বিষ্ণু দে সহজ আশায় বিশ্বাসী ছিলেন না—জীবনে এবং কাব্যে ক্রুতলভ্য মিল খোঁজেন নি—শিশুর ঘুড়ি বা ফানুস ওড়ানো নয় তাঁর মৃত্তিকামুখী আশার মুখ খোঁজা। কিন্তু আশার সেই কঠিন রূপ যে আরো কঠিনতর হয়ে উঠেছে—'সেই অন্ধকার চাই' আর 'সংবাদ মূলত কাব্য' থেকে।

অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫—এ কাব্যগ্রন্থ দুটির রচনাকাল—তখন থেকেই। চীন-সোভিয়েত বিরোধ, ভারতের সাম্যবাদী দলের ভাঙন, দুঃস্থ এই দেশে সাম্যবাদী শক্তির অন্তর্কলহ ও ক্ষয়, এই সমস্ত ঘটনাকে শিয়রে রেখে কবি কিভাবে বাঁচিয়ে রাখেন তাঁর প্রত্যাশাকে ? কবির আশার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়ানো যে এর ইতিহাস। দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর এই সংকট কবির মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ১৯৪৭-এ লেখা কবিতা 'নির্জলা ভূলোক'-কে তাই মনে হয় এ-সময়ের, 'সংবাদ মূলত কাব্য' গ্রন্থের, যোগ্য মুখবন্ধ।

> শেষটা কপালে বুঝি বনবাস বাধ্যতামূলক ?
> সঙ্গী হবে 'শেব' আর 'কা' আর 'বালু' ?
> ভারতবর্ষের বাণপ্রস্থে কবে এত দুঃখশোক ?

১৯৪৭-এর এই নির্জলা নরকের জ্ঞান ১৯৬২-তে আরো স্পষ্ট : 'বস্তুত এ আশাভঙ্গ অপমান, বন্ধুর বঞ্চনা মৃত্যুর ক্ষতির চেয়ে মর্মান্তিক'। বর্তমানকে যখন মনে হয় 'কর্তা-ভজা বোঝা', তখন 'বিশ্বব্যাপী আয়ত বিন্যাসে'র বোধকে টিকিয়ে রাখা তো ক্রমশই দুঃসাধ্য।

কবি নিজেই ঘোষণা করছেন, 'আমিও চূড়ান্ত ক্লান্ত', সর্বগ্রাসী ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের সেই পরিণামে, এই সময়েই দেখা গেল তাঁর কবিতার টেনশনের বিন্যাসে কিংবা কবিতার আকারে-আয়তনে কিংবা অভিজ্ঞতা প্রকাশের ধরনে কিছু কিছু নতুন ইঙ্গিত। কখনো কখনো মনে হয়, সত্যিই নিরালম্ব আশাহীন দমবন্ধ হাওয়ায় আট লাইনের বেশি কবিতা দানা বাঁধতে পারছে না—আবেগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে কষ্টসাধ্য নিঃশ্বাসের হাপরে। 'অন্য অঙ্ক' বা 'এরা সব বিশ্বের পাণ্ডব' জাতীয় কবিতায় কবিতার ঘনত্বের তাগিদে নয়, কিরকম যেন নিরুৎসাহ বন্ধ্যাত্বে ফুরিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ বিস্তারিত বাচনের সম্ভাবনা। কখনো-বা কিছু কিছু কবিতায়—যেমন 'দুই কর্মীর এক দাদার জন্য তর্ক' বা 'মাঝরাতে বাপ ফেরে' বা 'স্টেশনের দৃশ্য'-র মতো কবিতায়, গল্পের আভাসে প্রায় নক্শার ভঙ্গি, এতাবৎ পরিচিত আততিকে ভেঙে ফেলে সপ্রতিভ

বাচালতায় তিনি যেন প্রায় আড্ডাধারী পদাতিক হয়ে যান, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন আমাদের ফিচেল শূন্যগর্ভ কথাবার্তার হারিয়ে-যাওয়াকে। আবার তখনই কোনো সাময়িক উপলক্ষে বা পরিস্থিতির বিশিষ্টতায় ঈষৎ কৌতুকের মেজাজ আনেন, যেমন 'তাহলে ধৈর্য ধরো' বা 'সান্ত্বনা' জাতীয় কবিতায়:

কোথায় নদী পল্লবিত ছায়া
পাহাড় কোথা? বধির সেই রাধা।
এখন শুধু সিনেমাগান সাধা,
স্নায়ুর মরা নাকী সুরের মায়া। ('সান্ত্বনা')

কিন্তু এ-ভাবে ক্ষতিপূরণ তো বেশিক্ষণ চলে না—রুগ্ন তিক্ততা ছাড়িয়ে, 'লুব্ধতন্ত্রে'র 'মদমত্ত হুঙ্কার' ছাপিয়ে তাঁকে দাঁড়াতেই হয়। রাজনৈতিক ক্রূর কোলাহলে পক্ষপাত নেওয়া তো কবির কাজ নয়—তিনি তাই শেষপর্যন্ত পৌঁছে যান আত্মগ্লানি বা অনুতাপ মুক্ত আশার নির্বেদে। বাইরে যখন 'মোড়লে মোড়লে কানাকানি', তখন কবির প্রার্থনা:

তখন চৈতন্যে চাই নির্বিকার নিষ্কম্প নিশ্বাসে
প্রস্তুতিতে প্রতিশ্রুত সুস্থ কিন্তু স্থিতধী স্বদেশ।
('তখন চৈতন্যে চাই')

অবশ্য এই চৈতন্য বাহ্যত যতটা মনে হয় 'স্থির ব্যাপ্তির স্বাচ্ছন্দ্য', আসলে সত্যিই কি তাই? শুদ্ধ বৃক্ষকে মনে হয় 'স্থির সনাতন', কিন্তু ভেতরে ভেতরে 'শতচ্ছিন্ন অশ্রুময় সহস্র শিকড় অস্থির'। কবির হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সেই অস্থিরতা ও বহিরঙ্গের বিশ্বাসের নিশ্চয়তা আজ নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি:

তেষট্টিতে অর্জেছে প্রজ্ঞা, অন্তরে অন্তরে তাই আশা।
বাগানে কোথায় সঙ্গী? বিশ্বাসে মিলয়ে কিবা?
তর্কে কিবা আশা? তাই আশাভঙ্গ নেই।
শুধু আছে ক্ষিপ্রশ্বাসে শূন্যবাহু ধূ ধূ ভালোবাসা।
('সুতরাং নৈঃসঙ্গ্যও নেই')

এই 'শূন্যবাহু ধূ ধূ ভালোবাসা' নিয়েই কবির গোধূলি বিষাদ—তাঁর দাঁড়াবার জায়গা আজ।

নানা দিক থেকেই তো বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবহ—অজস্র ধারাবাহিকতা, নিত্যবৈচিত্র্য, ক্লান্তিহীন আশা, গড়ে-ওঠা শব্দ বা

প্রতিমার পুনরাবৃত্তিতে চেনা স্থির জগৎ। তাই কি নৈরাশ্যের চূড়ায় রাবীন্দ্রিক প্রশ্নমুখর অন্তিম আশার চেহারা পায় তাঁরও 'হে দিনের সূর্য' বা 'হে পৃথ্বী সুন্দর'-এর মতো কবিতার স্পষ্টবাক্ সত্যভাষণের ঋজুতায়, যদিও হয়তো জটিলতার আধুনিকতায়, আশা ও আশাভঙ্গের নতুন শ্রেণীবদ্ধতায়?

হে দিনের সূর্য! ছিলে প্রতিদিন অদ্বিতীয়,
তোমার নয়ন তাই অন্ধকারে নিত্য
অগণন চোখ দিয়ে প্রতিরাত্রে নভোনীল চিত্ত
জেলে দিত, হে সূর্য, হে নিবিত্তের প্রিয়!

আজ খুঁজি তোমার সে অযুত নক্ষত্র-জ্বালা রাত্রি,
অমাবস্যা আজ কেন মাত্র অন্ধকার?

'চতুর্মুখ' কবিতাতেও সেই রাবীন্দ্রিক ব্যঞ্জনা আধুনিক প্রেক্ষিত পায়—যেখানে 'বহুদিন মনে ছিল সাধ'-এর ধুয়ায় তিনি মেলে ধরেন তাঁর সন্ত্রস্ত ধ্যানের ও স্বাধীন স্বপ্নের চেহারাকে। 'ধলেশ্বরী'-তেও সেই অনুষঙ্গ:

অন্ধ, খুঁজি চেনা মুখ যার পরনে ঢাকাই শাড়ি,
কপালে সিঁদুর, ধলেশ্বরী।
কোথায় সে শুকতারা অন্তরঙ্গ সেই আশাবরী?

কবির মনে আজ সংশয় জেগেছে, সেই চেনা মুখ যথেষ্ট চেনা কিনা!

অবশ্য সামাজিক-রাজনৈতিক এই সংশয়ের ক্লান্তিতেও তিনি আশ্চর্য কয়েকটি প্রেমের কবিতায়, কয়েকটি শুদ্ধ লিরিকে প্রকাশ করেন প্রেমের সংরাগ ও বিচ্ছিন্নতার বিধুর বেদনার দ্বান্দ্বিক আভাস। 'ততঃ কিম' বা 'এই রকমফের' বা 'বৈদেহী'-তে নারীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির উত্তাপকে চকিতে আনেন, যদিও সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মিলিয়ে দেন বিরাটের ব্যঞ্জনায়।

তোমার প্রতিমা পাই তিলে তিলে, বক্ষে বক্ষ, অকপট
চোখে চোখ আশ্লেষ্য-র বিশুদ্ধ নৈকট্যে সত্যে যোগাযোগে,
আর পাই দূরান্বিত বিরাটের পটে আধৃত আকৃতি…

('যখনই তোমার সত্তায় রৌদ্র লাগে')

আর তা থেকেই আমরা যেন পেয়ে যাই নিঃশব্দ কবিতার মিতবাক্ রহস্য—চমকিত হই বিষ্ণু দে-র কবিতার অন্তহীন বৈচিত্র্যে। মহাকাব্যিক বাগবিস্তারে যিনি আমাদের আপ্লুত করেন, আবেগ ও মননের দ্বান্দ্বিকতায়

যিনি জটিল বুনট গড়েন, তিনিই আবার 'তৃষ্ণার জল', 'বন্দিনী না', 'বৈশ্য', 'শুদ্ধনীল গান' বা 'ঈপ্সা'-র মতো কবিতায় আমাদের অতলান্ত রহস্যে নিয়ে যান।

এইভাবে প্রেমের উপলব্ধির রহস্যে পারাপার করে, ব্যক্তির অনুভূতির বহুধা ব্যঞ্জনায় অবগাহন করে কবে আমরা পৌঁছে যাই সাংবাদিকতা-আক্রান্ত দৈনন্দিনতার লোভ বা কলহ বা ক্লান্তির পরপারে অস্তিত্বের সম্পূর্ণতায়।

দৈনিকে বা সাপ্তাহিকে কোথা উৎকর্ষের গরিমা?
আমি চাই তুমি দাও রচনাবলীর সমগ্রতা,
নিরবধি গর্বে বাঁধো বিপুল পৃথ্বীর শেষ সীমা,
আপাত চটকে তুচ্ছ চাটুকারে কেন ভোলো দৃপ্ত মহার্ঘতা?

('আমরা')

সাংবাদিকতার বা সাময়িকতার আপাত চটকে তুচ্ছ চাটুবৃত্তি নয়, কবিতার উপলব্ধির দীপ্ত মহার্ঘতায় কবি 'প্রেমের শত্রু মৃত্যু'র বা 'সংসারী শাঠ্যে'র উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে চান। 'সংবাদ মূলত কাব্য' সেই উত্তর।

'সেই অন্ধকার চাই'-তে দেখেছি কলকাতার দুই যুবক-যুবতী অঞ্জন ও রঞ্জনা—'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর সেই রাজার ছেলে আর রাজার মেয়ে—লালদীঘির লজ্জায় মুখ-লুকোনো চেনা মেয়েটি আর পাজামা-পরা একেলে যুবক—

হঠাৎ তাদের মুখের ভাঙা গদ্য
গান হয়ে পাখার ঝাপটে ছেয়ে দিল কলকাতার মামুলি আকাশ
আরেক আলোতে।

'সংবাদ মূলত কাব্য'-তেও দেখি ধরমতলায় তুস্থ চৌরঙ্গিতে ভিড়ের মাঝখানে 'সব কিছু এককের মনীষায় গৈরী কাব্য পায়'। এ কি তবে তাঁর আশা তারুণ্যের উপর? কবি শুধু দেখেন, দেখতে চান, কৃতজ্ঞ বৃদ্ধের চোখে, দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে আরোগ্য?

ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে

সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৭০

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

কাব্যগ্রন্থটির নামটিই চমকে দেয়: 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে'। ট্রাজিক উল্লাস—শব্দবন্ধটি আমাদের অর্ধমৃত অস্তিত্বের প্রতিপক্ষেই আসে। ছেষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে লেখা কবিতাবলীতে দেশ আসে অর্থাৎ মূর্ত বাস্তব আসে কবিতার মিডিয়েশনে, নানা রূপবন্ধনে—সেই সমাজ-পরিবেশে ইতিহাসের পটেই ট্রাজিক-উল্লাসের নেতির মুক্তিও আসে।

.. গোটা মাটিই যে ঝুরাঝারা,
    ভূতপত্রীর বালি, উড়ু-উড়ু, ধূলিসার,
শুষ্ক, দগ্ধ, ছায়াশূন্য, ছিন্নমূল
    কোনোটি বা স্কন্ধকাটা, নিষ্পল্লব, যত খাল
কানানদী পচা হাজা শত শব, আব নদী নদীর কঙ্কাল।

দুর্বিষহ গরম গুমোট, স্বার্থপর, খেয়ালী ইতর।
আজ গোটা ইতিহাস ধুলা ধোঁয়া, তেপান্তর বন উপবন,
ঘর চালাকির অন্ধকূপ আর মাঠঘাট মরা খরা।
শুধু বিবর্ণ গুমোট অপ্রাকৃতিক গরম।

এই রুদ্ধশ্বাস পরিবেশেই মনে হয়:

'রুদ্র কি শুধুই তাপ আর সেই
আমাদের শারদীয়া কন্যা সেই অপর্ণার
তারও কোনো স্পষ্ট আশা নেই ?

এই সামাজিক-ঐতিহাসিক দৃশ্যেই অন্তত নৈতির উত্তরণ চান: অন্ধকার একটি প্রতীক্ষা। মানবঋণের দায় শুধেই বাঁধতে চান:

দৈনন্দিন আনন্দেই, কিংবা তারই নামান্তরে ঐতিহাসিক বিষাদে,
ট্রাজিক উল্লাসে তীব্র, আবিশ্ব উদাসী ভারতীয় সঙ্গীতের মতো।

আগেই, সেই 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'ই কবি বলেছেন, 'এ নরকে মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই', এখানে 'চৈতন্যে মড়ক', 'নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুরও বিকার।' এ অবস্থায় নরকের দাহও মুক্তির পথ নির্মাণ করে, তেমনি ট্র্যাজিক

উল্লাসের তীব্রতার ঐতিহাসিক বিষাদও আনতে পারে বর্ণাঢ্য আনন্দ-ধ্বনি।

আসলে বিষ্ণু দে, ইতিহাসের নায়ক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সার্বিক ঔপনিবেশিক ব্যর্থতায় আর তার ওপর আস্থা রাখতে পারেন না। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পর্যন্তও একটা আশা ছিল তবু, আধুনিক রাজার ছেলেমেয়ের কথা বলেছেন সেখানে। কিন্তু পরবর্তীকালে এ আস্থা ক্রমশ বিলীন: শিল্পের দ্বান্দ্বিক প্রাজ্ঞতায় ক্রমশ অনুধাবন করেন এ ব্যর্থতায় এ মুহূর্তে আর ট্র্যাজেডি নেই, আছে হতাশ্বাস ক্লিন্নতা। নেই ঐতিহাসিক বিষাদ, আছে ধূর্ততা, চালাকি।

অথচ এই সমাজ-ইতিহাসের 'বিরাট শ্মশান-রাজ্যে'র বিরুদ্ধেই তাঁর লড়াই। এ পরিণতি তিনি মানেন না। উজ্জীবনে বাঁচতে চান শিল্পে, প্রকৃতিতে।

জীবনের চেয়ে শিল্পে বিরোধ কি তীব্র নয়? বিজয়ার ক্ষমা
সঙ্গীতে জীবনে আনি, আনো আনো স্রুক্, আনো বাখ্।
দেয়ালে মুখর হোক কঠিন পাথরে রূপে উত্তীর্ণ-সুষমা।

দৃষ্টি রাখেন জীবনের প্রতিরূপ নদীতে, মাঝিতে মাল্লায়।

অশ্রুনদী কাদের পাল্লায়
মুখর গানে, চোখের বাতিঘর
গড়ে হাজার জ্বালায় মনপ্রাণ
লক্ষ চোখ, ভাঙল গড় কার?
কাড়ল নিধিরামের ঢাল কারা?
পারানি করে মাঝিরা মাল্লারা।

চতুর্দিকের 'শূন্য মরুশ্মশানে' যেখানে 'মানুষ তাই নামানুষ ও নাপশু অবস্থা' যেখানে, 'নেই অন্ধকার দাহও' সেখানে বারবার আসে জননীর প্রতীক: 'অসামান্য সাধারণ্যে আমাদের মৃত্যুহীন জননীরই মতো গরীয়সী' কিংবা, 'মায়ের মতো সেই তো ভালোবেসে' অথবা 'কারণ মর্ত্য মাতা আমাদের বাতাসের পরপারেও' বা 'পিতার প্রেম ও বরাঙ্গী মাতা আদিতে', অথবা, 'সে উপমা করে তুমি তুলে নেবে সর্বব্যাপী মাতৃসমা', কিংবা 'তন্ত্র যদি মান্য হয়, মাতৃতন্ত্র মনে হয় শ্রেয়।' এই জননী-প্রতীকই ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে 'অনৈকা মার্কসীয়া'-য়।

তাকেই কি দেখি পিয়াল আবার অটল অচল ঠায় ?
শিকড়ে শিকড়ে গম্ভীর স্থিতি, ঝড় যত হাওয়া তোলে
তাল-ফেরতায় দ্বন্দ্বমুখর হয়েক আকর্ষণে
সে করে হৃদয়ে রূপান্তরিত, ঠোঁটে বেঁধে মাথা নাড়ে,
মৃদু আলোছায়া দুই হাতে পাড়ে পল্লব-অঞ্চলে।

সামগ্রিক রূপান্তরে কবি বলে ওঠেন, বিষয়-বিষয়ীর এ রূপান্তর বিস্ময়াবহ :

আমরা সবাই মানবজন্মে অমর মৌল প্রতীক
কঠিনে কোমল বীরের বাহুতে স্বায়ত্ত বরনারী।

এই রূপান্তরের শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াতেই বিষ্ণু দে-র আমি-তুমি-তার জটিল হয়ে-ওঠা দেখি : আধুনিক কবিতার বহুব্যক্তিত্বের সতত সঞ্চরমান পার্সোনার দ্বান্দ্বিক দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতায়। চতুর্দিকের ভগ্নতার মধ্যেও বিষ্ণু দে-র এই রূপান্তর, দ্বান্দ্বিক সংগ্রামেই মনে হয়, poetry does indeed, make life appear in certian ways। এই কবিতায় যিনি কথা বলেন, তিনি কোনো ব্যক্তি কবি নন, একজন কল্পনার কথকই, যাঁর কণ্ঠস্বরে বাজে ইতিহাস, জনসাধারণ, আবার ব্যক্তি। কবিতা-কর্মের প্রক্রিয়ার তাৎপর্য তত বড় হবে, যতটা এই বক্তার শৈলীতে, ভঙ্গিতে, বাচনে ধরা দেবে দেশ-কাল-মানুষ। পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের মধ্যেও আশাকে ছাড়া যায় না : কারণ ইতিহাসের চরম হীনতাতেও মানুষ বাঁচে, জীবন বয়, প্রকৃতি থাকে। বিষ্ণু দে তাই ইতিহাসে, সমাজে বৃহত্তর ভাবে খুঁজে পান না জীবনের অনুকূলকে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন তো চলে, 'মানুষেরা জৈবিকে বা প্রাকৃতিকে বস্তুতই মানবিক, স্বাভাবিক।' প্রাচীন পৃথিবীতেই, আদিম পাথরের আদিতেই তিনি পেয়ে যান আশা : আমাদের সংযোগের প্রধান সেতু ভাষাতেই পান আশার উপমাকে : 'আশা যেন মাতৃভাষা অজেয় চিরায়ুষ্মতী।' শত মারেও ভাষা—মুখের ভাষা—মরে না, জেগে থাকে—কবিতাও তাই।

এই আশা, জীবনের প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ী আস্থাই প্রকাশ পায় বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতায়, যা আবার প্রকৃতিরও। প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কাছে প্রায় অভিন্ন। প্রথমাবধিই বিষ্ণু দে চান প্রেমে চারিদিকের অসুস্থতা, পাপ ও পঙ্গুতাকে কাটাতে চান : ক্রেসিডা, ওফেলিয়া, মহাশ্বেতার প্রতীক এভাবেই, ব্যক্তিগত প্রেমের আবেগকে আরও দূরবিস্তৃত করে তোলে। প্রেমের কবিতাতেই

বিষ্ণু দে নিয়ে আসেন অনন্য সেই মাত্রা, যাতে প্রিয়া কখনো দেশ, কখনো সত্তা কখনো রক্তমাংসেরই বিশেষ মানুষ। এক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করেন, নিজস্ব আত্মসচেতন দ্বান্দ্বিক বস্তুতে। সামগ্রিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে বিরাট উত্তরাধিকার: মার্কসের আরম্ভ যেমন হেগেলে, আমাদের বস্তুবাদী ভাবনা, সংগ্রামের প্রারম্ভও তো রবীন্দ্রনাথে। কবি-শিল্পীর কাছে বিরাট সুবিধা আমাদের হেগেল, মহত্তম শিল্পীও বটে, যাঁর তুলনা মেলা ভার। রাবীন্দ্রিক সুন্দরকেই তাই বিষ্ণু দে চান। নন্দনতত্ত্বের কথাই বলেন,

> আশ্চর্য, যে ভূগোলতত্ত্বেই বাঁধা সৌন্দর্যের মৌলিক চেতনা।
> রৌদ্রমেঘবৃষ্টি দ্যাবাপৃথিবীর গাঙের চিত্রের আত্মে!
> আজও তাই চুয়ারবে ক্রন্দসীতে আঁকে গায় পৃথার বেদনা,
> রাবীন্দ্রিক সুন্দরের সাথ মেশে কৃষকের শ্রমসাধ্যে।

রাবীন্দ্রিক সুন্দর ও কৃষকের শ্রমসাধ্য—এই দুই মিলে যে সমগ্রতা তারই অঙ্গীকার বিষ্ণু দে কাটিয়ে দেন কবির, কবিতার বিশেষীকরণকে। প্রেমও হয়ে ওঠে প্রকৃতিলগ্ন, দেশব্যাপী আবেগের প্রতিনিধি।

১. তাকে দেখি, চিনি, সারাটা অঙ্গে
চিরাকাঙ্ক্ষীর মমতার মেঘ তাকিয়ে রয়েছে সর্বক্ষণ,
কখনও আষাঢ় কখনও বা কালবৈশাখীর
তীব্র দেখার প্রাণের বঙ্গে
বিশিষ্টতায় শারীরিক হল যমুনাতীরের তমালতরুর সুলক্ষণ।
সৌরভে তার সত্তা আমার নিজেকে পায়
অন্ধকারের আকাশপৃথিবী একাকার হয় যেমন হাওয়ায়।

২. এই মুখে বহু চেনা মুখের আদল।...
এ মুখ সাবেক, দেশী, বাংলা মনের
ঐতিহ্যের ছবি—যেন যামিনী রায়ের।...

সারা মুখে বাংলার আপ্লুত আদল।

৩. ঘৃণার স্বরূপ দেখি সর্ববস্ত্রহরণের পর্বে পর্বে
অথচ প্রেমের রাত্রে শুকতারায় প্রতিভাত হয় মর্ত্য।
হে পৃথিবী! দৈনিক তোমার সত্যে জীবনযাত্রার গর্বে

প্রেম পায়, যা সে চায়, চিরকাল, প্রেমের জীবনস্বত্ব,
সুখবহ দুঃখসহ, প্রেয়সী ! তোমায়।

৪. বাস করি চরে চড়ায় বালিতে বন্যায়,
ভেসে যাই কত মন্দাকিনীর অতলে।
হিমানীতে নয়, দিন কাটে জলে পাতালে,
তবু অনন্ত রাত চায় ঐ কন্যায়।

৫. আমি তো সখী কদাচিৎ তা ভুলি।
স্বাধীনতা কি শূন্যে ঝরে ? মুক্তি চাও তুমি,
বেড়ির পাকে তাই তো ঐ করকমলে তুলি।

এই উদ্ধৃতিতেই ধরা পড়ে বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতার ব্যাপ্তি : ব্যক্তিগত সম্ভাষণ থেকে দেশব্যাপী প্রতীকনির্মাণ সবই আছে তাঁর প্রেমের কবিতার আকাশে। ইতিহাসে কানাগলি দেখলেও প্রকৃতিতে-প্রেমে বিষ্ণু দে অন্ধকারকে কাটান—ব্যক্তিকে মেলান বিরাটে।

ঘুরে-ফিরেই তাঁর কবিতায় সংগীতের প্রসঙ্গ আসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব রকম সংগীত প্রসঙ্গই। এই প্রসঙ্গের তাৎপর্য গভীর : সময় ও সময়ের নিয়ন্ত্রণ সংগীতের একটি বড় কথা। সংগীতের প্রসঙ্গ তাই গভীরভাবে তাৎপর্যবাহী : ট্র্যাজিক উল্লাসও, আবিশ্ব উদাসী ভারতীয় সংগীতের মতো আসে। বিষ্ণু দে-র কবিতায় সময় যেহেতু একটি প্রধান উপাদান, সেই হেতু সংগীতের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে কবিতার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কেই রূপ পায়। ভারতীয় দার্শনিকদের মায়াবাদ সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনে বীজবোনা ফসল-কাটার সময়নির্ভরতা প্রবলভাবে ভারতীয় জীবনে রয়েছে—বিষ্ণু দে যেহেতু এই ঐতিহ্যকেই ক্রমশ মেনে নেন শিল্পের প্রক্রিয়ায়, মহৎ কবির উত্তরণের ধাপে ধাপে, সেহেতু সংগীতও আসে এই সময়বোধের ইতিহাস-বোধের বিস্তারের অনিবার্যতায়।

বিষ্ণু দে-র একটি কবিতা, একটি কবিতাগ্রন্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েও, চূড়ান্তরূপ-নির্দিষ্ট হয়েও এক বিরাট অভিযানের অন্তর্গত। এ সমুদ্র-অভিযানে চতুর্দিকের বিকারকে লঙ্ঘন করবার এক বীর্যপূর্ণ সংগ্রাম থাকে, কান্নাকে ছাপিয়ে বাজতে থাকে বাঁচবার উল্লাস, হোক না আপাতত তা ট্র্যাজিক।

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর

বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৫

রঞ্জিত দাস

১৯৭৪-এর ২১ মার্চ লেখা হলো 'একি এ মৃত্যুর আলো'। 'সেই অন্ধকার চাই' কবিতায় বিষ্ণু দে অন্ধকার চেয়েছিলেন, শরীরে হৃদয়ে—সেই অন্ধকার, 'অন্ধ অন্ধকার'—'লক্ষ লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার'। কিন্তু ষাটের ও সত্তরের দশকের পর তাঁকে বলতে হলো :

'একি এ মৃত্যুর আলো? জ্যোৎস্নারাতে কলুষের গ্লানি।'

এই কলুষিত মধ্যরাত্রির অস্পষ্ট আলো-আঁধারি তিনি কখনই চান নি। চেয়েছিলেন স্পষ্ট, বাস্তব, সৃষ্টিময় অন্ধকার। তখনও, সেই ১৯৫৮-এ, অবশ্যই পান নি। কিন্তু স্বপ্নে তাকে চেয়েছিলেন। যে স্বপ্ন কবিকে বাঁচায়। সেই স্বপ্নও কি আজ মিথ্যা হয়ে গেল?

'এ দল থেকে ও দলে ভেঙে, গড়ে,
আবার আশা ভাঙে দলীয়তায় ..'

ফলে কবি নিজেকেই নিজে প্রশ্নে জর্জর করে তোলেন। প্রশ্নের পরে প্রশ্ন। 'শান্তি কি কেবল জীবনমৃত্যুর ঘোলা ক্লান্তি?' স্বচ্ছস্রোত নদীর পরিচিত উপমা আজ অতীত—ঘোলা জল-ই এখন উপমা। আর 'ক্লান্তি' এ-যুগের, এ-গ্রন্থের সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দ।

'গ্লানির ক্লান্তিতে পঙ্গু, মূঢ়, একা, মূলত আত্মহা।'···
'ক্লান্তির মুহূর্তে, মনে আজ যেন কোনো ভাষা নেই।' ..
'এই আমাদের ক্লান্তি কি পাবে ক্ষমা?'···

মধুর দয়াল অন্ধকার আসে নি শরীরকে জুড়িয়ে দিতে, বোধ ও অনুভূতিকে তীব্র শুদ্ধ করে তুলতে, স্পষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চেনা অস্ত্রকে শানিত করতে। এখন সবটাই 'জীবনমৃত্যুর ঘোলা ক্লান্তি'। আলোও নয় অন্ধকারও নয়। 'আলো প্রায় অন্ধকার, তাও শুচি অন্ধকার নয়।'

দীর্ঘ পথ পার করে ইতিহাসের এই বাঁজা পরিণতিতে 'চূড়ান্ত ক্লান্তি'র কথা ওঠে ঠিকই, কিন্তু একালের সব্যসাচী অর্জুন—ডান বা কোনো দিকেই যার পক্ষপাত নেই—সে তো সম্পূর্ণতা চায়, চায় 'পৃথিবীর মানদণ্ডে বিরাজ করুক

বরাভয়'। চায় না আত্মক্ষয়ী হানাহানি বা সন্ত্রাস। কবিতাটির শেষ লাইন তাই :

'মানুষ বা জন্তু কেবা চায় বলো সর্বধ্বংসে প্রলয়।'

হঠাৎ 'প্রলয়ে'র কথা উঠল কেন? শুধু এ-কবিতাতেই নয়, পর পর অনেক কবিতাতেই। বেকসুর জীবনের ক্লান্তি বড়ই ক্লান্তিকর কবির কাছে—তা বলে 'রংপা-র লাথিতে আর গুপ্তিহানা হিসাবে' মুক্তি কই? তাই তো সব্যসাচী অর্জুনের কথা বারবার।

পরের কবিতাতেই ('নরলোকে লগ্ন সমাহূত') সেই হানাহানির বর্ণনায় বোঝা যায় সত্তর-দশকের গুরুবাদী সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির দাওয়াই যে মিথ্যার মোহজাল, নকশালী অভিযানের নামে বামপন্থী হঠকারিতার ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছিল, তারও ইঙ্গিত ঐ 'প্রলয়' শব্দে।

'সে সত্য কি ধূলিসাৎ কতিপয় চোরা পদক্ষেপে?

রংপা-র লাথিতে আর গুপ্তি-হানা হিসাবে দুহাতে
বিকাবে বিশ্বের পণ্য স্বদেশে বিদেশে কতকাল?
সজ্জন সকলে জানে, তবু কেন যে যার গুহাতে
কেউ বা গুরুজী খোঁজে, মহাশ্রমে কেউ বা জঞ্জাল।'

'যে যার গুহাতে'—এ ঠিক কোনো রাজনীতিকে গ্রহণবর্জনের দায় নয়—তাই সকলের কাছেই তাঁর তিক্ত প্রশ্ন :

'কোথা সেই ঐক্যতান? কেন ভল্‌গা কেন লেনা কেন গঙ্গাপদ্মা
আজও স্ব স্ব তন্ত্রে থামে?'

ঠিক তেমনি এই প্রলয়ের ঝড়েই দীপ্র যৌবনের রূপও তাঁকে সচকিত করে। এই যৌবন যেমন আত্মবিনাশী, তেমনি উত্তপ্ত। তাই ঘোলা ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন কবি হঠাৎ খুঁজে পান দামাল নদী।

'পাহাড় বুঝি এ নয়, এ কি এক নদী?
মাঝে মাঝে পাড় ভাঙে,
চর তোলে জলে,
টলোমলো করে বুঝি মসনদ বা গদিই।'

লাইন কটি 'নরলোকে লগ্ন সমাহূত'-এর রচনার দিনটিতেই লেখা কবিতা থেকে—'বুদ্ধেরও হঠাৎ বুঝি মিতা জুটে যায়'। কবিতাটিতে কোথাও

অবশ্য নদীর সাগরসঙ্গমের বা কপিলগুহার মুক্তির ইঙ্গিত নেই—কবির সেই চিরপুরাতন স্বপ্ন নেই—আছে শুধু নদীর পাড়-ভাঙা চর-তোলা আলোড়ন। এ মুখ কবির ঠিক চেনা মুখ নয়, যে চেনা মুখের সন্ধান তিনি করেছেন এতকাল, তবু যৌবনের এই আগুনজ্বলা রূপেই যেন মিত্রতার আভাস পাওয়া তাঁর রক্তে—যদিও 'বৃদ্ধের হঠাৎ বুঝি মিতা জুটে যায়'-এ 'হঠাৎ' এবং 'বুঝি'তে অনিশ্চয়তাটুকুকেও প্রকাশ করেন।

'জানি না যৌবন আজ কিবা ঠিক ভাবে।
শুধু বুঝি : জ্বালা তার তীব্র,
ঝনঝনাও শুনি বুঝি
মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন কিংখাবে,
দেখি চোখ অন্ধকার তারাজ্বলা প্রেমে,
কিংবা ঘৃণাভরে দীপ্র।'

'প্রকৃতি কিংবা রবিদীপ্ত স্বপ্ন গান জ্ঞান'-ও যখন আর মুক্তি এনে দেয় না, তখন যৌবনের এই অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত মূর্তিই কি তাঁর আশ্রয় হতে চায়?

'বৃদ্ধেরও হঠাৎ বুঝি মিতা জুটে যায়' যেদিন রচিত, সেদিনই তিনি আরেকটি কবিতা লেখেন: 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর'। অপরিচিত যৌবনের তীব্র জ্বালা-কে তিনি প্রাকৃতিক পৌরাণিক প্রতিমায় সঞ্চারিত করে দেন। 'প্রাত্যহিকে মরা'-র পরিবেশে যে-প্রকৃতি ছিল ঘোলা, বিবশ—তার চেহারাই পালটে যায়। তখন হঠাৎ পুরাণ-পড়া বালক প্রশ্ন করে, প্রকৃতির আলোড়নে প্রশ্ন করে, 'এই কি প্রলয়?' তারপর অকস্মাৎ সেই বালক বালকোচিত স্বাভাবিক ক্ষিপ্র টানে চিত্ররূপ দেয় সেই প্রলয়ের।

'বালকের দৃষ্টি স্থির, মনে প্রাণে, যেন গোটা শরীরেই,
গের্নিকার পরে,
চিত্ররূপ ধরে এই মত্ত পৃথিবীর।'

বালকের 'গোটা শরীরে' ব্যাপ্ত প্রতিজ্ঞায় ও সৃষ্টিশীলতায়, পিকাসো ও গের্নিকা-র উল্লেখে, মূর্ত হয় প্রতিবাদ।

পর পর কয়েকদিনের মধ্যে তিনি লেখেন: 'আকাশেরই যেন এক নকশালী মেজাজ, রাগ'। 'মাঝে মাঝে আঁধি অনুরাগে রাগে ক্ষ্যাপে মাটি/আকাশে বাতাসে, যেন দশভূজা মাতে'। যৌবনের তীব্র প্রতিবাদী নিরবয়ব জ্বালা থেকে কবি এভাবেই চলে আসেন 'প্রকৃতির মত্ত প্রতিবাদে'।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত, কবিকে স্বীকার করতেই হয়, এই রাগ হয়তো কিছুই মানে না। হয় অনাবৃষ্টি, না হয় অতিবৃষ্টি-বন্যা। বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নেই। 'এ জীবনে বহু খরা, নইলে প্রচণ্ড বন্যা।'

তবু যৌবনের এই দীপ্র রূপ কবির মনে জ্বেলে দিয়ে যায় নতুন আলো। আজ যখন 'বৈপরীত্যে আশাও পালায়', তখন এই ছন্নছাড়া যৌবনকে কবি কি করে অস্বীকার করবেন? প্রত্যেকেই 'স্ব স্ব তন্ত্রে থামে' জেনেও নেতি-ইতির মধ্যেই তাঁকে খুঁজে নিতে হয় ইশারা।

আর তাতেই সম্ভাবিত হয় তাঁর মুমূর্ষু উপমা। তিনি চলে যান শিল্প কিংবা পুরাণ-প্রতিমায়। পুরাণপ্রতিমা তো তাঁর কবিতায় নতুন নয়। কিন্তু এবারের নির্বাচনে, বিভিন্ন প্রতিমার চকিত সংযোগে ব্যঞ্জনায় বা পুনর্নির্মাণে যেন প্রলয়ের মাঝখান থেকে সৃষ্টিকে খুঁজে নেওয়ার স্ফূর্তি প্রকাশ পায়।

'হঠাৎ সাজেন গৌরী জবানেত্রী! ত্রিলোচন নিজে তাতে ভস্ম,
মানে—প্রায় ভস্ম, অস্থে সন্তুষ্ট, নইলে যে একা হবে যান হিমকন্যা ..'

'একালের মানুষ যে, কোথায় চক্র বা কোথায় ত্রিনেত্র?
মহাদক্ষযজ্ঞ কোথা! জলে স্থলে ধ্বংস নৃত্য, মাভৈ মাভৈ
হে কিরাত, হে অর্জুন! নাকি নারায়ণী সৈনিকের
পদযাত্রা শতকর্মে, নিত্য মানবীয় মনীষার কর্মে, ধর্মে
সত্যসেবী, মিথ্যা ভেদাভেদ ভেঙে যাতে কর্মব্রতে?...

তাই আশা চেতনায় যুক্তিযুক্ত। বিংশোত্তর বিশ্বে বাঁচে প্রাণ।'

দেখা গেল, বার্ধক্যের ক্লান্তি, যৌবনের দীপ্র রূপ ও আত্মক্ষয়, নেতি-ইতির ক্রমান্বয়ে কবি এমন জায়গায় পৌঁছলেন, যেখানে সাময়িকতায় পক্ষপাতের আভাস না দিয়েও উপার্জন করে নেওয়া যায় ইতিহাসের মিথ্যা ও সত্যের পটে অক্ষয় প্রতিবাদী ভূমিকা। 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' সেই প্রতিবাদেরই কাব্য।

উত্তরে থাকো মৌন

আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭

সুতপা ভট্টাচার্য

বার্ধক্যকে বলা হয় দ্বিতীয় শৈশব, কেননা শিশুর মতোই বৃদ্ধেরও সরলতাই স্বভাব। কিন্তু বার্ধক্য-অভিমুখী কোনো মানুষ যদি বলতে পারেন 'বার্ধক্য চৈতন্যে শ্রেষ্ঠ', সকাল-বিকালে স্বাস্থ্য-রক্ষাই শুধু বার্ধক্যের সান্ত্বনা নয়, 'সম্পূর্ণ মানুষ হয় বয়সেই দুরন্ত ভাবুক' ('সান্ত্বনা', 'ঈশাবাস্য দিবানিশা'), তবে সে বৃদ্ধের সরলতায় অন্য এক মাত্রা সংযোজিত হয়। বিষ্ণু দে-র শেষ কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরে থাকো মৌন'-তে আপাত-সারল্যের সেই অন্য মাত্রাটিই অনুধাবনযোগ্য।

সামগ্রিকভাবে বিষ্ণু দে-র কবিতা বিষয়ে সমালোচকের এ মন্তব্যে হয়তো দ্বিমত নেই যে 'রচনার বিষয় এবং বিন্যাসে তিনি ব্যবহার করতে চান জটিল আবহ: ধ্বনিপুঞ্জে জটিল, বিচিত্র অভিপ্রায়ে জটিল, বিরোধী বৃত্তির নিরন্তর সংঘর্ষে জটিল।' তবু, পাঠকমাত্রেই এও লক্ষ করবেন, 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর পর থেকে বিষয় ও বিন্যাসগত জটিলতা ক্রমান্বয়ে যেন কমে আসে, কমে আসে অবজেক্টিভ্ কো-রিলেটিভ্-এর বিবিধ প্রকার আয়োজন, নিজের অভিজ্ঞতা প্রায় যেন সরলরেখাতে উপস্থিত করেন কবি, বিশেষ করে তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ-দুটিতে। হয়তো এ তাঁর পরিণত বয়সের স্বাভাবিক সরলতার অভীপ্সা।

তাই বলে কি তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে আত্মগত? .

দীর্ঘকাল ধরে আত্মস্বরূপের যে অবৈকল্যের সাধনা তাঁর কাব্যরচনার ভিত, তার বৈশিষ্ট্যই হলো 'মানবসত্তার ব্যক্তি অহমের নয়--স্বকামোত্তীর্ণ একটা প্রেমময়তা…', এবং এর অধিকারী যিনি তিনি বোঝেন যে 'একটি বিশেষ ব্যক্তি-জীবন হল একটি জীবনবৃত্তের সঙ্গে ইতিহাসের বিশিষ্ট এক অংশের এক দৈব যোগাযোগ; এবং তার নিজের কাছে সমগ্র মানবিক অবৈকল্যই বাঁচে বা মরে তারই নির্দিষ্ট অবৈকল্যমার্গের বাঁচন-মরণে।' (বিষ্ণু দে কৃত এরিকসন-এর অনুবাদ—'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতা' থেকে)।

তাই 'উত্তরে থাকো মৌন'-র কবিতায় পাই বটে কবির দৈনন্দিন যাপনের দেশ-কাল-নিবদ্ধ পরিচয়, কিন্তু তা সর্বত্রই লগ্ন থাকে সারা

দেশের, পৃথিবীর সময়ে, ইতিহাসে। আমরা জেনে নিই কবির বাসস্থান যে অঞ্চলে, সেখানে প্রকৃতি 'সুস্থ আর চোখের আরামও বটে। / কিন্তু জড়, আজও ঠিক রসায়নে মানবিক নয়', কিন্তু কবি তার রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেন যখন, তখন তা ব্যাপ্ত হয়ে যায় সমগ্র মানব-চৈতন্যের পটে :

তখন মুক্তিই হয় চিরস্থায়ী অকাল-বোধনে
মানুষের চৈতন্যের স্বচ্ছ-নীল ঘটে,
বিশ্বজনে, মহাকাশে রাবণদহনে।

('প্রকৃতি অর্থাৎ পৃথিবী আকাশ হাওয়া')

সেই বিশেষ গ্রাম্য অঞ্চলটির নিকটবর্তী শহরেরও পরিচয় দেন তিনি, শ্লেষের স্বরে যাকে তিনি বলেন 'সদালোভী পুণ্যের সরাই'—তার বিশেষ পরিচয়কে সামান্য করে তুলে তিনি সারা দেশের ইতিহাসের রক্তে জমা গ্লানির বেদনাই মূর্ত করেন :

মুখ্য গ্রাম্যতাই আশেপাশে, রাত্রিদিন
বিস্তৃত অথচ বিকল ও খঞ্জ প্রায় সংকল্পবিহীন
তীর্থে গঙ্গে স্বাস্থ্যাবাসে আশেপাশে ছড়ানো শহরে!
কিবা রাজা মানসিং অথবা ক্লাইভেরা দলে দলে
বঙ্গীয় বিজয় সেরে ওসারে বহরে
সেখানে পত্তনী পান, যার জের আজও চলে!

('সকলেই পরশ পাবার প্রয়াসী')

তাঁর পরিপার্শ্ব বিষয়ে বেশ কিছু কবিতা আছে এ গ্রন্থে, সেসবে আরো লক্ষ করার দিক—পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তাঁর সদাজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা, দায়বোধ। এরিকসন-এর মতে এরই নাম প্রজ্ঞা—সার্থক বয়স্কতায় যার উদ্ভব—শক্তি যখন রূপ নেয় জীবনবিষয়ে নিরাসক্ত অথচ সক্রিয় এই দায়বোধে। তাই এই কবির বয়স্কতার বোধ নিছক 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই' গোছের নয়, বরং তিনি জানেন 'বৃদ্ধ বয়সেই গ্লানির বৃদ্ধি!' যদিও তার জন্য তাঁর খেদও নেই, কেননা

কিন্তু সে গ্লানির অনেক মূল্য—
সারাটা জীবনের স্মৃতির ঋদ্ধি।
ইতিহাসেই মেলে ব্যক্তি-স্মৃতির তুল্য,
যে স্রোতে সর্বদা নদীর সিদ্ধি।'

('যে স্রোতে সর্বদা নদীর সিদ্ধি')

পরিপার্শ্বের কোনো সদর্থক ছবি তিনি আঁকতে পারেন না, বারবারই দেখেন—'জীবনটাই আমাদের যে ঊর্ণনাভ জাল', আত্ম-স্বরূপ অবিকল বলে তবু তাঁর বাঁচার মুখ সামনের দিকে ফেরানো, তাই স্মৃতিচারণে মন যায় না তাঁর :

স্মৃতিচারণ বার্ধক্যে নয়, কৈশোরে বা যৌবনেই শ্রেয়।
কারণ, বার্ধক্যে দগ্ধ স্বপ্ননীল আকাশকুসুম,
কারণ, তখন শুধু রোমন্থিত কল্পনার ঘুম,
তখন অতীত আর অজ্ঞেয় আগামী থাকে প্রেয়।

('স্মৃতিচারণ বার্ধক্যে নয়')

না-পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস নয়, বরং আজও তাঁর চাওয়াও সজীব, অফুরাণ :

দূর বাংলার সমুদ্রের হাওয়া চাই অহরহ
পাহাড়ে প্রান্তরে বনে আর সবুজ বা গেরুয়া টিলায়।
অবশ্য সঙ্গও চাই সহমর্মী নৈঃসঙ্গ্যও চাই।
চাই বৈকি সহকর্মী সমধর্মী দুঃখ-সুখ-বহ সর্বদাই।

চেয়ে যাই, পাই কি-না পাই যেখানেই থাকি।
বয়সের তাই তো মানায় আজন্ম-আমৃত্যু বহু স্বপ্নময়—

('চেতনায় কিছু নয় অবান্তর')

এইভাবেই এই কবি বার্ধক্যকে সাগ্রহে স্বীকার করে আত্মস্থতা অটুট রাখেন, তাই তাঁর প্রশ্ন :

এ বার্ধক্য কি শুধুই জরা? নাকি সুদীর্ঘ যৌবন
সভ্যতা ও ব্যক্তিগত স্মৃতি দুই মিলে একাকার?

('স্মৃতিচারণ বার্ধক্যে নয়')

এই আত্মস্থতাকেই এরিকসন বলবেন জীবনের অন্ত্যপর্বিক নবসংস্করণ সত্তা-সংকট-এর উত্তরণ—'যা টিকে রইল আমার মধ্যে আমি শুধু সেইটুকুই' —এই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া। বিষ্ণু দে সে সংকট উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন বলেই জীবন ও জগৎ আজও তাঁর কাছে সদর্থক, ভালোবাসা আজও তাপদীপ্র :

সে আমার প্রাণে, দীর্ঘ আয়ুর
চিরহরিতের দিনরজনীর গান থামে না একটিবার

নিষ্পলক সে চোখে তুমি চিরকাল
একটি সত্য কঠিন প্রাত্যহিকে।

তাই বারবার বলি যে যেয়োনা ভুলে
পুরানো গানের অনেকদিনের দীর্ঘজীবীর ফুল।

('প্রাচীন-অর্বাচীন পদাবলী !')

বিষ্ণু দে-র তুলনায় অনেক বেশি বয়সেই রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক তীব্র প্রেমের কবিতা পড়েছি বটে আমরা, কিন্তু তাতে শাদা চুলের ছোপ লাগে নি—তা যেন কেবলই রক্তিম—তাই মনে হয় যেন স্মৃতি-সঞ্চারিত। বিষ্ণু দে-র কবিতায় দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ যে ভালোবাসার ছবি, বাংলা সাহিত্যে তার জুড়ি আছে বলে জানি না :

'তোমাকে আমি কত বছর জানি ?
জানো না তা কি ? বহু দশক পার
হয়েছি, তুমি জানো সে পারাবার।

ভুল হল কি ? ভূবিগ্যার ভুল !
লবণ-জল নয় তো চোখে, তার
সঙ্গে ছিল তুঙ্গ পর্বত।

ছিল সাম্য আর মৈত্রী, কতবার
বীর প্রয়াসে লক্ষ ভগীরথ
প্রাণ-গঙ্গা নামাল, দিলে প্রাণ— ('স্বপ্ন দিনমান')

দুইজনের মধ্যেই উৎসারিত এই ভালোবাসা, কিন্তু দুইজনেই আবদ্ধ নয়, বেদনা-ধারার লবণজলে এর পরিচয়ও নয়, এর সঙ্গে আছে তুঙ্গ পর্বতের কাঠিন্য, বীর্য। মানব-মানবীর ভালোবাসায় বলা শক্ত কোনটি বড়— শরীর, নাকি মন, কেননা শরীরেই মন বাঁচে, যেমন 'বিশ্বেই বাঁচে চৈতন্যের প্রণয় / মানবিক গানে, আমাদেরই দোতারায়'—তাই উত্তরে মৌন থাকতেই হয়, এবং এই নাম-কবিতাটি থেকে প্রতীত হয় কবির 'সত্যজাগ্রত ঈপ্সা' তথা 'ইতিবিশ্বাসে জিজীবিষা'ই এ কাব্যগ্রন্থের মূল থীম। এইভাবেই বিষ্ণু দে-র ভালোবাসার বোধ তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় বারবার।

কয়েকটি কবিতার নিবিড়পাঠ

যমও নেয় না * নবপ্রতিষ্ঠায় * ঈপ্সা * রাত্রি স্তোমং ন
জিগ্যুষে

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার
প্রথম প্রকাশঃ মাঘ ১৩৫৯ [১৯৫৩]

যম-ও নেয় না

তুমি তো দেখেছ তাকে? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে?
পেয়েছেন বহু তাপ, দেখেছেন বহু পাপ, মৃত্যুও অনেক
তবুও অম্লান প্রাণ, শুভ্রকেশ সৌন্দর্য আরেক
মর্যাদার, অনেক দেখার রূপ, অথচ সবাকে
নির্বিশেষ মমতায় সংযত উদ্বেগে উপদেশ,
সহের অম্লান প্রজ্ঞা নেভে নি বৃদ্ধার জরায়ণে,
সততার আশাদীপ্ত শীতের আকাশ সে-নয়নে,
হিরন্ময়ী, নিরুপমা, উপমা কি? খুঁজেছ স্বদেশ?

যম নাকি ভয় করে, যম নাকি দূরে রাখে তাকে!
সাত ছেলে সব গেছে, কেউ দূর কমিশরিয়টে,
কেউ-বা লক্ষ্মীর খোঁজে গদির তলায় চাপা কবে,
কারো নামে কানা ঘুষা বাজারে খারাপ কথা রটে,
সবাকে নিয়েছে যম, শুধু একজনার গৌরবে
তল্লাসীরা হানা দেয় আজও, ঘরে পায় নাকো তাকে,
কখনো নন্দিত বন্দী সর্বদাই দেশ যাকে ডাকে,
যে-ছেলের মুখ দেখে যম-ও নেয় না ঠাকুমাকে॥

বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে কিছু পেতে হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।
তাতেও যে বুড়ি ছোঁয়া যাবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তার কারণ

বিষ্ণু দে-র কবিতায় নানা ব্যাপার থাকে। অনেক কিছু জটিলভাবে মিশে থাকে। এবং নানা বিষয়ে জানা শোনা না থাকলে খুব মুস্কিল হয়। বিষ্ণু দে-র কবিতা বিষয়ে সাধারণভাবে একথাগুলোই মনে আসে। মনে হয় এক বিস্ময়কর সৌধের সামনে আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছি।

ছোট কবিতা 'যম-ও নেয় না'। মাত্র ষোল লাইনের মধ্যে সবটুকু ধরে গেছে। বিষ্ণু দে-র এ কবিতার ঢং ও মেজাজ একেবারে আলাদা: 'তুমি তো দেখেছ তাকে? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে?' কোনো অল্প অভিজ্ঞ পাঠককে যদি কবির নাম না বলে, কবিতাটি শুনিয়ে কার কবিতা বলতে বলা হয় তাহলে সে-পরীক্ষায় তার উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হবে না। এ যেন এ যুগের ঠাকুরমার ঝুলির গল্প নয়, এক অসামান্য কবিতা। অবশ্য একটা গল্পের ছায়াও রয়েছে এ-কবিতার অন্তরালে। সে-গল্প আমাদের খুব চেনা আপন জন বুড়ি ঠাকুমার গল্প। অনেক বয়েস হয়েছে ঠাকুমার। অনেক অভিজ্ঞতা। শোক-তাপও পেয়েছেন যথেষ্ট। চোখের সামনে দেখেছেন বহু মৃত্যু, বহু অন্যায়। কিন্তু তাঁর ভেতরটা একেবারে ধোয়া মোছা, তাজা। কারণ—'সহ্যের অম্লান প্রজ্ঞা নেভেনি বৃদ্ধার জরায়ণে'। এখানে বিষ্ণু দে একটি নতুন শব্দ তৈরি করেছেন—'জরায়ণ'। এবং তাকে খুব লাগসইভাবে ব্যবহার করেছেন। আর তার পরই একটি আশ্চর্য লিরিক লাইন: 'সততার আশাদীপ্ত শীতের আকাশ সে-নয়নে'। অন্য এক রূপদীপ্ত ঠাকুমার সাদা চুলে ছড়িয়ে আছে পবিত্র মহিমা। সকলের জন্য তাঁর হৃদয়ের দরজা খোলা। সেখানে আশ্রয় সকলের জন্য। স্নেহছায়া সকলের জন্য। তাই তাঁর প্রজ্ঞা এক অনির্বাণ শিখা। জরাও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আর এখানে বিষ্ণু দে তাঁর সহজাত মননের স্পর্শ রেখে গেছেন: 'হিরন্ময়ী, নিরুপমা, উপমা কী?'

এত বয়সেও কি অটুট মনোবল নিয়ে বেঁচে আছেন ঠাকুরমা! তাঁর ছেলেরা বৈষয়িক অর্থে কৃতী। কেউ বা বড় চাকুরে কারো বা বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি। এক ছেলের অবশ্য বদনামও আছে। কিন্তু তাদের কেউ বেঁচে নেই। অথচ এসবও ঠাকুমাকে একটু টলাতে পারে নি। কেননা ঠাকুমার এক ছেলের মতো ছেলে আছে। দেশের জন্য জীবনও তার কাছে তুচ্ছ। সেজন্য তার ঘরে তল্লাসী চলে, তাকে ফেরার হতে হয়। আবার কখনো বা জোটে বন্দী-দশা। সে ছেলের গৌরবে ঠাকুমার সমস্ত সত্তা উদ্দীপ্ত। সে ছেলেই তাঁর চোখের মণি। আর সেজন্য মৃত্যুও তাঁর ধারে কাছে ঘেঁষে না। খুব আলগোছে, অনায়াসে, আশ্চর্য সহজভাবে কবিতাটি তৈরি হয়েছে। ভাষায়

কথ্য ঢং। অথচ এ কবিতাকে কি এক ধরনের সনেট বলা যায়? কিন্তু সনেটের আঁটোসাটো গড়ন এতে নেই। বিষ্ণু দে যে এই ষোল লাইনের কবিতায় অনেক কিছু বলেও পয়ারে একটা স্বচ্ছন্দ মুক্তির হাওয়া খেলালেন তা থেকে এটাই মনে হয় যে তিনি প্রায় অসাধ্য সাধনই করতে পারেন এবং কি করে পারেন সে-রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এ-সব কিছুই তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিশেষণের মতো দুর্বোধ্য ঠেকে।

বিষ্ণু দে-র কবিতার ধারার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে বুদ্ধদেব যাকে 'শ্যাম্পেন স্বাদ' বলেছিলেন, কবিতার সেই পর্যায় অতিক্রম করে তিনি অনেক দূরে চলে এসেছেন। তাঁর কবিতায় এখন সাজ-পোষাকের বাহার আর নেই। কেননা তার চেয়ে বড় কিছুর সন্ধান তিনি পেয়েছেন। তাই তাঁর কবিতার এখন সাদামাঠা চেহারা। তাই তাঁর কবিতায় এখন স্বদেশ, মানবিক অনুভব ও মনন এক হয়ে গিয়েছে। তাই সেই বুড়ি ঠাকুমাকে ভোলা যায় না। বার বার মনে আসে তাঁর মুখ। তাঁর ওপর আমাদের অনেক ভরসা। কেননা তিনি দেশপ্রেমের, মানবিক প্রত্যয় ও প্রজ্ঞার এক অম্লান মূর্তি। বিষ্ণু দে তাঁকে অবিস্মরণীয় করেছেন।

আসলে বিষ্ণু দের কবিতাই কি বুড়ি ঠাকুমার রূপে এখন আমাদের সামনে? সুপরিণতির সেই সৌন্দর্য ও মহিমাই কি আমাদের উদ্দীপ্ত করে না? জীবনানন্দ যাকে বলেছেন—'এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস'—তা-ই 'যম-ও নেয় না' কবিতার মধ্যে। এবং এই দেশ ও এই দেশের জন্য সব কিছু যারা দিয়েছেন তারা বিষ্ণু দের হৃদয়ে, চেতনায়, মননে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে বলেই বুড়ি ঠাকুমাকে যেন চোখের সামনেই সর্বদা দেখা যায়, মনের মধ্যে পাওয়া যায়। কেননা তিনি হলেন :··· 'শুভ্রকেশ সৌন্দর্য আরেক / মর্যাদার, অনেক দেখার রূপ'।

চিত্ত ঘোষ

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
রচনাকাল : ১৬ এপ্রিল ১৯৫৭

নবপ্রতিষ্ঠায়

দুঃখের অবধি নেই, তুমি জানো আমার কাহিনী,
থেকে-থেকে অনুকম্পা দাও অন্যমনে আলিঙ্গনে,
কখনো-বা স্মৃতির শহরে হানো তোমার বাহিনী,
ভাবি বুঝি দিন যাবে ছদ্মবেশে একাকীর কোণে।

তোমারও প্রতাপ দেখি পৃথিবীর কাছে মানে হার,
দু-পাশের দেশ কাঁদে, তোমাব ও আমার স্বদেশ—
অনাহার অর্ধাহার আর অনাচার অত্যাচার—
সে বৃহতে হেরে যায় যন্ত্রণারও একাকী আবেশ।

আমার ব্যাপক দুঃখ রূপান্তরে উন্মুখ নিষ্ঠায়
তোমাকেই চায় তাই যন্ত্রণায় নব-প্রতিষ্ঠায় ॥

আমরা জানি, কবিতার প্রকরণ বারবার ভাঙতে হয়। পাল্টাতে হয় আঙ্গিক, আঙ্গিকের অলংকার—যে-অলংকারে আবরণে জড়িয়ে থাকে কবিতার তাপিত বিচ্ছুরণ, আমাদের আবিষ্কার-পুনরাবিষ্কারের উৎসাহ, অনুভূতি জাগাবার উত্তেজনা। অভ্যস্ত অলংকার-প্রকরণে পাঠকের মেধায় শৈথিল্য আসে, আবেগ হ্রাস পায়। এ-বিষয়ে এজরা পাউণ্ড-এর মন্তব্য : 'Use either good ornament or no ornament'—ওই 'good' বিশেষণটি বোঝাতে চাইছে অলংকারের তাজা ধার ; এখন দেখি, কবিতার

শরীর যেখানে নিরাভরণ? তেমন নিরাভরণ, প্রায় নগ্ন বর্তমান কবিতাটির শরীর; তৃতীয় পংক্তির 'বাহিনী' প্রতিমাটি সরিয়ে নিলে আর বিশেষ কোনো অলংকার বা আচরণের রহস্য নেই। কেবলমাত্র শব্দ ও বাক্‌বিন্যাসে অথবা বাচনিক স্বরক্ষেপে ধরে রাখা জীবনের নতুন মাত্রা, কবিতার নিগূঢ় ব্যক্তিত্ব: কবিতার অন্তর্জাত বিভা—বিভার প্রচ্ছন্ন টান আমাদের মানসিক অন্বেষাকে সক্রিয় করে তুলছে। ব্যাপারটা বেশ কঠিন, পরিণত কবিভাবনার প্রত্যাশী।

তিনটি ছোট স্তবকে ভাগু, ৪+৪+২=১০ পংক্তির এ-কবিতায় প্রতিটি পংক্তি অক্ষরবৃত্তের মাত্র আঠারো মাত্রার শব্দে বিরলদৃষ্ট অর্থসংগতিতে সম্পূর্ণ। স্বভাবতই ঋজু। বিচ্ছিন্ন পংক্তিতে পংক্তিতে অর্থসংগতির ঐ ঋজুতা কবিতার মৌল চরিত্রে মিশে গিয়ে, তার আভ্যন্তরীন টেনশন, টেনশনের আয়তনকে ধাপে ধাপে পাথরের বিস্তার দিয়েছে। কবিতার যে-কোনো একটি স্তবক তুলে নিয়ে দেখা যেতে পারে এ-নির্মাণ কেমন করে সম্ভব হয়েছে।

'দুঃখের অবধি নেই, তুমি জানো আমার কাহিনী'—প্রথম স্তবকের এই প্রথম পংক্তি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এক অর্থব্যঞ্জনা খুলে যায়, আমরা ধরে নিতে পারি, এ-দুঃখের প্রসঙ্গ, 'তুমি' সম্বোধনে যাকে বলা, সে জানে। কিন্তু তখনো আমাদের কাছে দুঃখের কারণ অজানা—অজানা, কে এই দুঃখদায়িকা। অপেক্ষা করতে হয় পরের পংক্তি 'থেকে থেকে অনুকম্পা দাও অন্যমনে আলিঙ্গনে' যতক্ষণ না-আসে। দেখা গেল, দ্বিতীয় পংক্তিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে আসছে, প্রথম পংক্তিতে উসকে দেওয়া, আমাদের কৌতূহলের সমাধানসূত্র। এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে যে-ভাবনার উন্মেষ, তার অন্তর্মুখ অভিঘাতের সমর্থক তৃতীয় পংক্তি: 'কখনো-বা স্মৃতির শহরে হানো তোমার বাহিনী'। এই পংক্তির প্রতিমাটি মনে রাখলে আলগা হয়ে যায় চতুর্থ পংক্তির নিপুণ মোড়কে ব্যক্ত কবির আত্মবিচ্ছেদ জল্পনার অনুষঙ্গ: 'ভাবি বুঝি দিন যাবে ছদ্মবেশে একাকীর কোণে'। অপর দুটি স্তবকেও ঐ একই রীতি। তবে এ-সব ঘনবদ্ধ পংক্তির বাচনিক চলনে এত স্বাচ্ছন্দ্য এবং পংক্তি-পরম্পরার জোড়ে অর্থ-ব্যাপ্তির এমন ভরাটান রয়েছে যে, সাংগীতিক নিয়মের এই শিল্পকর্মটি ঠিক ঠিক বুঝে নিতে, সতর্ক পাঠ হয়তো জরুরি।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রেমের রঙ বড় মিশ্র; তাই এত গাঢ়, এত গভীর। এমনকি, তাঁর প্রথম পর্বের কবিতাবলীর মধ্যেও, ভিন্ন দৃষ্টিকোণে, এর সমর্থন মেলে: 'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ-প্রেমপুটে' ('পলায়ন' / 'উর্বশী ও আর্টেমিস')। প্রেমের বিচিত্র রহস্য ও মহিমা তাঁর কবিতায় নানাভাবে বাহু মেলে দিয়েছে। এ-কবিতাটির উৎসেও ওই প্রবল শক্তি— প্রেম, প্রেমের বিসর্পিত ঐশ্বর্য। ব্যক্তিগত প্রেমের আহত আবেগ, নিয়ন্ত্রিত হতে হতে আত্মবিচ্ছেদের মুখোমুখি এসে, অদ্ভুত এক জটিল প্রক্রিয়ায় সমাজযন্ত্রণার সংলগ্ন হয়ে, বিশাল আয়তনে ছড়িয়ে পড়েছে। জটিল প্রক্রিয়া কথাটা কেন এল? যেহেতু পরিচিত কোনো প্রথা নয়, এখানে আমরা খুঁজে পাই, ব্যক্তিবিশ্বের অভিজ্ঞতায় ভেসে-ওঠা বোধ, বোধের ভূমিসম্প্রসারণ।

প্রথম পংক্তির 'তুমি' কবিতার মূল শব্দ। শব্দের শিকড় ধীরে ধীরে কবিতার একেবারে অভ্যন্তরে নেমে গিয়েছে। অথচ কবিতার বীজ— এই 'তুমি' সর্বনামটি কার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, সে-সম্পর্কে সংশয়হীন হতে দ্বিতীয় পংক্তিতে এসেও সময় যায়। বহুকৌণিক সম্ভাবনায় উদ্দীপক এ-শব্দটি এখানে এসেছে নারীপ্রকৃতির নির্বাসিত শক্তিকে অন্তর্বর্তী করে। আমাদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন মাত্রায়, মাত্রার মোচড়ে, শিরায় শিরায়, স্নায়ুর কোষে কোষে লুকনো থাকে এমন কিছু ভূখণ্ড, প্রকৃতির গহন থেকে উঠে-আসা গুণগত উপাদানের মতো নারীই যা কিনা ভরাট করতে পারে। সুতরাং নারীর এ-তাৎপর্য অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য পরিপূরক। পরিপূরণ অপরিহার্য বলেই হয়তো তৃতীয় পংক্তির 'বাহিনী' প্রতিমা বা পঞ্চম পংক্তিতে 'প্রতাপ' শব্দের ব্যবহারেব প্রাসঙ্গিকতায় আড়াল থাকে না কিছু। এবং 'তুমি' থেকে কবিতার শেষ পংক্তিতে এসে জাগল যে 'তোমাকে'—এ-শব্দের মধ্যে নিহিত নারীর ক্রিয়াশীল সত্তাটি ছুঁয়ে আছে কবির মনন, অনুভূতি বা অন্তর্লীন বেদনার যাবতীয় ভূখণ্ড। এই ছুঁয়ে থাকার মাধ্যম প্রেম।

কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত ভূখণ্ড যখন আর আয়ত্ত থাকতে চায় না একাকিত্বের সীমায়, তখন? স্বদেশ ও প্রতিবেশ যখন অবিরাম সামাজিক অনাচার-অত্যাচারে ধ্বস্ত, তখন নারীপ্রকৃতির সেই নির্বাসিত প্রতাপও, অন্তত মনোযোগের অতিপ্রাসঙ্গিকতার বিচারে, সীমায়িত সংকীর্ণতায় কেমন গুটিয়ে আসে। অবশ্য এই পরাভব বা সংকোচন আপতিক;

কেননা যে-যন্ত্রণা বা দুঃখ প্রেমের অবলম্বনে এতক্ষণ চারিয়ে ছিল কবির নিভৃত জগতের নিঃসঙ্গ একাকিত্বে, তা সমাজসম্পৃক্ত জীবনের সংকটে—স্ফুবান অপূর্ণতার আধভাঙা বিপুল ফ্রেমে পৌঁছে, সর্বাত্মকভাবে হয়ে ওঠে আরো অধিক তীব্র, পরিব্যাপ্ত এবং বাস্তবস্পৃষ্ট। 'একাকী আবেশ'—এই আত্মকেন্দ্রিকতার melancholy কাটিয়ে, তাই দেখি, 'আমার ব্যাপক দুঃখ রূপান্তরে' বলতে দেশ ও সমাজযন্ত্রণায় একাত্ম হয়ে আসে কবির যে-নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধি, তার দহনতৃষ্ণায় ব্যক্তিত্বের সেই নিয়ন্তাশক্তি 'তোমাকে' : নারীকে, নারীর তাৎপর্যময় অস্তিত্বকে।

সুনীলকুমার নন্দী

সংবাদ মূলত কাব্য
রচনাকাল : ৫ মে ১৯৬৫

ঈপ্সা

তন্বী চপলা বা পূর্ণ নারীতে
দয়িত চিরকালই ঈপ্সা-দীপ্র
রঙিন ডুরে আর কস্তা শাড়িতে
হৃদয় চিরকাল পরিতৃপ্য।

এবং পৃথিবীতে—যে দেশ সবাকার—
আনত চোখ রাখি তৃষায় ক্ষিপ্র।
এবং শেষ চোখে আপন বিধবার
শুভ্র বেশে একী গরিমা তীব্র!

১৯৬৫-র ৫ মে রচিত কবিতাটি 'সংবাদ মূলত কাব্য'-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো নজর দিয়ে পড়লে দেখা যাবে, বিষ্ণু দে 'তন্বী', 'চপলা' ও 'পূর্ণ নারী' বোঝাতে যথাক্রমে বয়ঃসন্ধির কিশোরী, সদ্যো-যুবতী ও স্থিরযৌবনা মধ্যবয়সিনী-র কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন। প্রেমিক বলতে 'দয়িত' শব্দটি সম্ভবত বিষ্ণু দে-ই শেষবার বাংলা কবিতায় ব্যবহার করলেন। এবং এই শব্দটির ব্যবহারেই 'ঈপ্সা' শিরোনামটি জোর পেল। না হলে, কবিতাটির প্রথম স্তবকটি এত তীব্রভাবে ভোগতপ্ত, আবেশে চঞ্চল যে, 'দয়িত চিরকালই ঈপ্সা-দীপ্র'—এই পংক্তির 'ঈপ্সা-দীপ্র' শব্দটির বদলে 'লিপ্সা-দীপ্র' বসালেই বোধহয় বেশি যথাযথ বা মানানসই হত। তাছাড়া ঐ পংক্তিতেই শুধু 'চিরকাল' না বলে 'চিরকালই' শব্দটি বসিয়ে

কবি মোহভিখারী একটি মানুষের আসক্তিকে আরও রক্তবর্ণ করে তুলেছেন। আর, কত সতর্কতায় শব্দ সঞ্চার ঘটে যায় বিষ্ণু দে-তে, বয়স অনুযায়ী শরীরে ও ব্যক্তিত্বে পালটে যেতে থাকা একটি রমণীর তিন পর্বে তিনি সাজিয়েছেন· যথাক্রমে তন্বীকে রঙিন, চপলাকে ডুরে এবং পূর্ণ নারীকে কস্তা-পেড়ে শাড়িতে। যে-বয়সে যাকে যা মানায় অর্থাৎ যাতে ঠিকঠাক খুলে যায় ভিতর-বাইরের রূপ।

প্রথম স্তবকের চতুর্থ পংক্তিতে এসে আচমকা কবিতাটির বিস্তার ঘটে যায়। দেহ-সর্বস্ব যৌনতার চোরা টান হঠাৎই থেমে আসে। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির যথাযথ সমাহারে বয়স্ক চেতনার সংরাগে জ্বলে ওঠে কবির প্রশান্তি, 'হৃদয় চিরকাল পরিতৃপ্য।' লক্ষ্য রাখতে হবে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে 'চিরকালই' ও 'চিরকাল' শব্দ দুটিকে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম শব্দটি অধীর কামনায় খরসান, দ্বিতীয়টি চিরায়ত প্রজ্ঞায় নিরঞ্জন। এছাড়া 'পরিতৃপ্য'—এই শব্দটির ব্যবহারে শুধু নতুনত্ব নয়, ভাবানুসারী স্নিগ্ধতার পরিমণ্ডলও তৈরি হয়ে যায়। আবেগ এবং মেধা— এই দুটি বিপরীতমুখী অশ্বকে এভাবে একটি দৃঢ় মুঠোয় একযোগে পরিচালনা করেন বিষ্ণু দে, কেউ কাউকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। কড়ি ও কোমলের যুগ্ম সঞ্চারে তাঁর কবিতায় সৃষ্ট হয় নতুন নতুন মাত্রা, প্রতিটি অপ্রত্যাশিত বাঁক আমাদের প্রত্যাশাকে অধীর করে তুলতে থাকে।

দ্বিতীয় স্তবকে ব্যক্তিগত ভাবনার সাধারণীকরণে আরো সচেষ্ট হয়ে ওঠেন কবি। অন্তর্জাত বিশেষ চেতনাকে আন্তর্জাতিক পটভূমির ওপরে স্থাপন করার দায় বহন করেছেন বিষ্ণু দে তাঁর সমগ্র কবি-জীবন, এখানেও তার অন্যথা নেই। নারীর দেহ-সীমার ধারালো অথচ সংক্ষিপ্ত রেখা ক্ষরিত হয়ে যায় কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের একেবারে প্রথম পংক্তিতেই। সংক্ষিপ্তাকার সংহত ভালোবাসার আত্মমগ্নতাকে তিনি রেণু রেণু করে আবিশ্ব ছড়িয়ে দেন, বিপুল জীবনস্রোতে কল্লোলিনী সমগ্র বসুধাই তাঁর দিগন্তপ্রাবী প্রেমের আধার হয়ে ওঠে। পৃথিবীকে তিনি উল্লেখ করেন 'যে দেশ সবাকার' বলে, সমস্ত মানুষের অন্তরের ঘনিষ্ঠ তাপের জন্য অতিপ্রধান তৃষ্ণা তাঁকে দেশে দেশে স্বজনের খোঁজে ক্ষিপ্র, বেগার্ত করে তোলে। প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে পাঠকের সামনে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের সেই দিগন্তবিস্তারী পংক্তি, 'যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে', অথবা সেই অতিবিখ্যাত উক্তি, 'স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।'

বিষ্ণু দে-র বর্তমান কবিতাটির ধারানুসরণে ষষ্ঠ পংক্তি পর্যন্ত অগ্রসর হতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। তারপরই, শেষ দুটি চরণে অর্থাৎ সপ্তম ও অষ্টম পংক্তিতে এসে প্রায় অপ্রত্যাশিত, এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ প্রায় নিরস্ত্র হয়ে পড়েন পাঠক। কবিতাটির এই অন্তিম চরণযুগলে বলা হয়, 'এবং শেষ চোখে আপন বিধবার / শুভ্র বেশে একী গরিমা তীব্র!'

সমগ্র রচনাটির সঙ্গে পংক্তি দুটিকে বারবার মিলিয়ে পড়তে পড়তে 'ঈপ্সা'-র টোট্যাল ডিজাইনটি আমাদের সামনে ক্রমশ আদল পেতে থাকে। মননের উজ্জীবনে জ্বলে ওঠে মৃত্যুর নিপুণ শিল্প। 'শেষ চোখে' কবি যেন প্রত্যক্ষ করেন গোচরাতীতকে, জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের অতিদৃশ্য রেখাটি নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে যে নারীকে তিনি নিছক দেহ-সংবাদ থেকে ক্রমোত্তীর্ণা ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণযোগ্য হতে দেখেছেন, সেই দেখার বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয় আশু বৈধব্যের শুভ্র গরিমায় পূর্ণভাবে বিকশিত রমণীর অকম্প্র বর্ণনায়। কোনো জিনিসকেই এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে বুঝতে চেয়েছেন বিষ্ণু দে। নিছক আইডিয়া থেকে নয়, অভিজ্ঞতা থেকেই পারফেকশনে পৌঁছনোর জটিল সাধনা তাঁর 'ঈপ্সা' কবিতাটিকে সেই যোগ্য উপসংহার দিয়েছে, যেখানে নিজের মৃত্যু ঘোষণা করেও তিনি উপলব্ধির বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা ও শিল্পরূপকে পরিহার করেন নি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

রচনাকাল : এপ্রিল, ১৯৫৯ (?)

রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে

—ঋগ্বেদ ১০/১২৭/৮

দিনকে ভয়, রাত্রি শুধু স্বাধীন,
অন্ধকারে চেতনা চোখ তোলে
ঘুমের মাঠে, যেখানে নীলাকাশে
কালের মেলা, শিশুরা ঘুম খেলে .
ঘরে ফেরার সান্ধ্য হিল্লোলে
নদীর পাড়ে শিশিরজাগা ঘাসে
জোনাকী জ্বালে স্বপ্ন-নীল দিন।

এখনও দিন ভয়ংকর দিন,
পরের দিন, দাসের প্রতিদিন,
চোখ কানের—সব ইন্দ্রিয়ের
শহীদ দিন, শ্রেয়ের আর প্রেয়ের
প্রাত্যহিক অপঘাতের হীন
কুশ্রী মূঢ় লুব্ধ প্রতিদিন ;
দিনের হাতে সুন্দরের, প্রিয়ের
মুক্তি নেই, আশাও আজ ক্ষীণ।

রাত্রি শুধু বিরাটে আর গভীরে
প্রাণের তীরে তমসাস্রোতে স্নানে
পুণ্য করে পূর্ণ করে মন,
সত্ত্ব শুচি চেতনা ওঠে ধীরে,

আঁচলে আঁকে তারার দীপাবলী ;
আগামীকাল শিশুর শতগানে
স্বপ্নে ঢাকে গ্রাম শহরতলী,
শহরে তোলে মুক্ত উপবন।
দিনকে ভয়, দিনেই চোরাগলি।
দিনের আগে রাত্রি চাই প্রাণে।

'দিনকে ভয়?' সূচনার এই শব্দদুটি থেকেই এ কবিতা একটা ধাক্কা তৈরি করে, প্রশ্ন জাগায় মনে। রাত্রি অন্ধকার ঘুম সন্ধ্যা শিশির জোনাকি স্বপ্ন— দিনের প্রতিতুলনায় এই যে একটা জগৎ তৈরি হয়ে উঠছে প্রথম স্তবকটিতে, অন্য অনেকের কবিতায় সেটা হয়তো তেমন অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু বিষ্ণু দে-ও কেন ভয়ংকর দিনকে, কুশ্রী মূঢ় লুব্ধ প্রতিদিনকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে ডুবে যেতে চাইবেন কেবল ঘুমের মাঠে, তমসাস্রোতে? এ কি একরকম আকস্মিক অসংগত বিমুখতা তবে? ক্লান্তির চিহ্ন? সংবরণের? 'দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু রাত্রি মোর জলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে', লিখেছিলেন বুদ্ধদেব। বিমুখতায় হলুদ হয়ে গেছে শহর, সূর্য তার বাজ ফেলছে নগরে-বন্দরে ; দেখতে যদি চাও, সরে এসো ছায়ায়—বলেছিলেন স্যাঁ-ঝন্ প্যার্সের মতো কবিরা। বলেছিলেন : দিন বড়ো মিথ্যে বলে। কিন্তু বিষ্ণু দে-র কাছে তো আমরা শুনেছিলাম দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে কীভাবে কথা জোগায়, তার ইশারা। সে পাপড়ি কি আজ শুকিয়ে এল তবে? সরে এলেন তিনি অনেকখানি কর্মের প্রহারের দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের জগৎ থেকে?

এ কবিতা রাত্রির বন্দনা। তাঁর অন্যতম প্রিয় কবি আরাগঁ-ও লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি রাত্রির কবিতা, কিন্তু সে ছিল চল্লিশ সালের মে মাসের কোনো ভয়ংকর রাতের কথা, অথবা ডানকার্কের রাত, কিংবা সেই রাত্রি, যখন ত্রস্ত প্রোষিতভর্তৃকায়া নিদ্রাহীন প্রহর যাপন করছে প্রতীক্ষায়। এমন রাত্রিরও অনেক ইঙ্গিত পেয়েছি আমরা বিষ্ণু দে-র কবিতায়, 'জন্মাষ্টমী'তে যেমন লিখেছিলেন একদিন :

অমাকৃষ্ণ তমিস্রাকে দুই হাতে ঠেলে ঠেলে কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে
চলেছ দুর্জয় একা—

কিন্তু সেই অন্ধকার নয়। আমাদের এই কবিতাটি বন্দনা করছে আরেক অন্ধকারের, ঘরে ফেরার, তারায় ভরা অন্ধকার।

লক্ষপ্রদীপ জ্বালা রবীন্দ্রনাথের আকাশের মতোই এ-আকাশও তাঁর আঁচলে তারার দীপাবলী জ্বেলে তুলছে। ক্লোদেল তাঁর একটি কবিতায় দেখেছিলেন রাত্রির বিশাল যাজক যেন তাঁর সহচরদের নিয়ে ছড়িয়ে আছেন শূন্যে, নিচে তিনি একা। বদলেয়র আবাহন করেছিলেন এক সন্ধ্যার, যে-সন্ধ্যা শহরের বুকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আর সেই গম্ভীর মুহূর্তে সমস্ত কলরোল থেকে মন সরিয়ে জেগে উঠতে বলছিলেন তিনি নিজেকে। এই এক আত্মোদ্‌বোধনের সুচেতনা অন্ধকার। বিদেশি এই কবিদের সঙ্গে মনের মিল নেই বিষ্ণু দে-র, কিন্তু তিনিও কি সেই অন্ধকারেই চলে এলেন হঠাৎ, যেখানে 'সদ্য শুচি চেতনা ওঠে নীরে'? প্রথম স্তবক থেকে অন্তিম স্তবকে আবার ফিরে এল এই 'চেতনা' শব্দটি।

ব্যাপারটা একেবারে আকস্মিক অবশ্য নয়। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রায় প্রথম যুগের রচনা থেকে আজ পর্যন্ত এ অন্ধকারের একটা ধারা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বিষ্ণু দে-র কবিতায়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে লিখেছিলেন তিনি, প্রায় প্যাসের মতোই যেন :

> অধীর, তোমার মুখর দিন
> ক্ষান্ত করো,
> মূকবধির নীল আঁধারে
> শান্ত করো!
>
> এ অন্ধার ছেড়ে হৃদয়
> আঁধার হোক
> ....
> গোপন নীলে জীবন খোলে
> চিরায়ু দল।

এই নীলই পরিণত হয়ে এল, 'সেই অন্ধকার চাই' ঘোষণার মধ্যে, যেখানে স্পষ্টই দুই ভিন্ন অন্ধকারের পরিচয় জানালেন কবি। একদিকে 'বুর্জোয়া দেশে'র 'জন্তুর দন্তুর নখী মানবিক শোষণে ভয়াল' এক হিংস্র অন্ধকার, আর অন্যদিকে 'কাব্যের আদিম গর্ভ'। শরীরে হৃদয়ে কবি সেই ঘন নীল অন্ধকার

চান যা তাঁকে স্পন্দমান ছন্দে আর অতল স্মৃতির হর্ষে আবিষ্ট করে নিতে পারে।

এই পর্যন্ত এসে মনে হয়, তাহলে এ হলো এক সৃষ্টির যোগ্য অন্ধকার, শিল্পের সৃষ্টি, সুন্দরের সৃষ্টি। তাই দ্বিতীয় স্তবকে বলতে হয়েছিল যে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অসাড়-করা দিনগুলির হাতে সুন্দরের মুক্তি নেই, মুক্তি নেই প্রিয়ের। কেননা, 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' বইতে যেমন আছে, এই দিনগুলির 'আলো প্রায় অন্ধকার, সেও শুচি অন্ধকার নয়।' দিনের ভিতরে, রাত্রির ভিতরে, এই শুচি অন্ধকারের বোধ আমাদের উজ্জীবিত করে তুলতে পারে কর্মের দিকে, সৃষ্টির দিকে। এই সৃষ্টিরই জন্য কখনো কখনো শব্দের ভিতরে অন্তঃশীল নৈঃশব্দ্যকে খোঁজেন কবি, খোঁজেন সেই ভাষা যার মধ্যে নীলাঞ্জন অন্ধকার সংহত হয়ে আছে। ভালোবাসার নির্বাক প্রকাশ অথবা নাসুদ্রিপাদের সংহত স্তব্ধতা প্রায় একই আবেগ নিয়ে তাঁর কাছে তাই সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে। অন্ধকার হয়ে ওঠে 'স্নায়ুতে নীল আলোকজয়ী সুর', তাই এই সুরের স্নানে 'পুণ্য করে পূর্ণ করে মন'।

দিন আর রাত্রি তাহলে কোনো কথা নয় আর, কথা কেবল তার হয়ে ওঠা নিয়ে। 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' বইটিতে কবি লিখেছিলেন যে আমাদের দিনগুলির হবার কথা ছিল জলদগ্নি জবাকুসুমের মতো আর সন্ধ্যাগুলি প্রাজ্ঞ পারিজাত, কিন্তু তার বদলে দিন হলো বিবর্ণ শেফালি আর সন্ধ্যা হলো নীরক্ত গোলাপ! ব্যর্থ ভঙ্গুর নীরক্ত বিশৃঙ্খল আত্মকলহে ছিন্ন এক সময়ের আঘাত এইভাবে ব্যাহত করে তাঁকে, এই পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য তাঁকে বলতে হয় 'প্রতিটি দিনের দাবি রাত্রিময় স্তব্ধ অবকাশ'। কিংবা তিনি বলবেন 'দিনকে রাত্রির নীলে অবিচ্ছিন্ন বাঁধি বার বার / দীর্ঘায়ু নিষ্ঠায়'।

দিনকে রাত্রির নীলে বাঁধা? এইবার তাহলে আমরা ফিরে আসতে পারি আমাদের কবিতাটিতে। ঋগ্‌বেদের রাত্রিস্তোত্র থেকে নির্বাচন করা হয়েছিল এর শিরোনাম। কি ছিল সেই স্তোত্রে? রাত্রির কথা; কিন্তু কেবলই রাত্রির কথা নয়। নক্ষত্রলোকের আলো আমাদের সবকিছু আচ্ছন্ন করে আছে, আর তারপর আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে রাত, বোনের মতো আসে ঊষা। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার ঘিরে নিচ্ছে আমাদের, ভোর তারপর সরিয়ে নিচ্ছে তাকে। আকাশদুহিতা রাত্রি চলে যাচ্ছে ওই, কবি তাঁর প্রণতি জানাচ্ছেন।

তাহলে এ কেবল রাত্রির নয়, তার অবসানেরও স্তব। আমাদের

এ কবিতাটি রাত্রির বন্দনা বটে, কিন্তু কেবলই রাত্রির নয়. ওরই সঙ্গে সে আবার দিনেরও বন্দনা, কর্মেরও। দিনকে ভয়, এই কথা বলে শুরু হয়েছিল কবিতাটি। উপান্ত্য পঙ্‌ক্তিটিতেও আমরা শুনতে পেলাম 'দিনকে ভয়, দিনেই চোরাগলি।' কিন্তু ঠিক তার পরেই এল কবিতার শেষ—এক অর্থে প্রথম লাইনটি: 'দিনের আগে রাত্রি চাই প্রাণে'। কখনো কখনো কবিতা শুরু হতে পারে তা শেষ হয়ে যাবার পর, এইখানে যেমন। এই শেষ উচ্চারণটিতে পৌঁছবার পর আবার বৃত্তের মতো ঘুরে আসতে হয় আমাদের প্রথম লাইনটিতে, আর ঘুরে এলে বুঝতে পারি যে 'প্রাত্যহিক অপঘাতের হীন' দিনকে যে একেবারে অস্বীকার করতে চাইছেন কবি তা নয়। নিজেকে সরিয়ে নেবার কোনো আয়োজন নয় এখানে, প্রত্যক্ষের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য এক আত্মস্থতা উপার্জনের জন্যই এই আকুলতা। 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবী'র বইটিতে ছিল এক লাইন 'এ অন্ধকারে কী দেখ সুরঙ্গমা।' বিষ্ণু দে-র কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য আমাদের খুবই পরিচিত অভ্যাস, বলাও যায় যে সুরঙ্গমার ওই অন্ধকারবোধ জীবনের কাজে লাগে বলেই ভাবছেন বিষ্ণু দে. ভাবছেন যে সুদর্শনাকে অন্ধকারের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তবে এসে পৌঁছতে হবে আলোয়, যখন তাকে বলা যাবে: এবার তবে বাইরে এসো, আলোয়। সেই আলোয় পৌঁছবার আগে, দিনের সামনে দাঁড়াবার আগে, 'রাত্রি চাই প্রাণে'।

জাক মারিতাঁ, যাঁর কথা বিষ্ণু দে প্রায়ই বলেন তাঁর প্রবন্ধে, লক্ষ করেছিলেন যে আধুনিক কবিতার একটা বড়ো অংশ হলো আত্মশুদ্ধির সন্ধান। এ-সন্ধান কবির ভাষার উপরেও এনে দিতে পারে রাত্রির প্রভাব, তাকে মুচড়ে নিতে পারে যুক্তির পারম্পর্য থেকে দূরে, বলেছিলেন মারিতাঁ। বিষ্ণু দে অবশ্য ব্যবহার করেন না সেই দিব্যোন্মাদ অবচেতনের ভাষা, কিন্তু কবিতা বিষয়ে তিনিও বলেন, অনূদিত এলিয়টের ভূমিকায় যেমন, 'বুঝলুম যে এই প্রক্রিয়ায় চাই যথাসম্ভব চিত্তশুদ্ধি।' এ চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি কোনো নৈতিক শুদ্ধি নয় নিশ্চয়, এ হলো আত্মস্থতা বা আত্মসচেতনতারই অন্য নাম। আমাদের আত্মতাহীন সময়ের মধ্যে এ-কবিতা সেই আত্ম-সচেতনতার আহ্বান, যার ধ্বনি ছড়ানো আছে বিষ্ণু দে-র প্রায় সব কটি কবিতার বইতেই, প্রায় সব বইয়েরই কেন্দ্র হিসেবে তাই আমরা পাব এই আরেক রকম অন্ধকারের বর্ণনা, কঠোর এক আয়তন বা বিচিত্র জটিল জীবনের ভিতরে রাত্রির এই স্তব। 'জন্মাষ্টমী'র এক অন্ধকারের কথা আগে বলেছি, কিন্তু তার অল্প খানিকটা দূরেই সেই কবিতায় আমাদের শুনতে হবে:

এ রাত্রিপ্রয়াণে
সংহত সত্তার বাস্তু এই গোধূলিতে, ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে

ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন।

এ ধ্যান কি কেবল শিল্পেরই জন্য? এ কি সৃষ্টিরই আত্মসচেতনতা শুধু? কেবলই শিল্পের নয়, কেবলই স্রষ্টার নয়, জীবনেরও। অথবা বলা যায়, জীবনশিল্পের, জীবনসৃষ্টির। তাই, তখন, এ কবিতা আর কবির ব্যক্তিগত উদ্‌বোধন মাত্র হয়ে থাকে না হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নদিশাময় সমস্ত কর্মীর বীজমন্ত্র, যে-কর্মীদের আত্মদানে একদিন সত্য হয়ে উঠবে এই স্বপ্ন: 'আগামীকাল শিশুর শতগানে / স্বপ্নে ঢাকে গ্রাম শহরতলী, / শহরে তোলে মুক্ত উপবন।'

কিন্তু কী ভাবে ফলে উঠবে সেই মুক্তি? আত্মদীক্ষার পরেও তো বাকি থাকে বড়ো-একটা যুদ্ধ। এটা ঠিক যে সেই যুদ্ধের জটিল সিঁড়িটা এখানে নেই, 'আঁচলে আঁকে তারার দীপাবলী'র পরের লাইনেই যে 'আগামী কাল শিশুর শতগান', তার মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য ঝাঁপ আছে। তাই এটা সেই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কবিতা নয়, যার থেকে জেগে উঠতে পারে স্লোগান। কিন্তু সেই সংঘর্ষ বা যুদ্ধের জন্য মানুষকে তৈরি করে তোলে যে বোধ, এ হলো সেই বোধের কবিতা সেই বিশ্বাস আর ভালোবাসার, সেই মজ্জার আর সামর্থ্যের, ভিত্তির আর প্রস্তুতির।

শঙ্খ ঘোষ

পরিচয়

মে-জুলাই ১৯৭৯

বিষ্ণু দে ৭০তম জয়ন্তী সংখ্যা

ক্রোড়পত্র

বিষ্ণু দে-রচনাপঞ্জি

অরুণ সেন

রচনাপঞ্জির সূত্রে কয়েকটি কথা

বিষ্ণু দে প্রথম পদ্য লেখা শুরু করেন খুবই অল্প বয়সে, ছোটদের একটি মাসিক-পত্রিকার জন্য। তখন থেকেই পদ্য লেখার মধ্যে যে 'আবিষ্কারের চেতনা', তা তাঁকে পেয়ে বসে। বাকপটু ছন্দপটু অজস্র পদ্য রচনা করে চলেন তিনি, প্রশংসাও পান বড়দের। কিন্তু 'কোনো এক নাটকীয় আতিশয্যে' 'দুশো পৃষ্ঠার কুশলী পদ্য' ছুঁড়ে ফেলে দেন। কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, কবিতা রচনা অত সহজ অত সাবলীল হওয়া উচিত নয়।

এরকম একটা জিজ্ঞাসু সময়ই তিনি পদ্য রচনার নিছক মজা থেকে ক্রমশ এক পা করে করে প্রবেশ করলেন কবিতার জগতে, অর্জন করলেন আত্ম-প্রত্যয়, ছাপানোর কথাও ভাবলেন প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায়। 'প্রবাসী' ফেরৎ পাঠালো রামমোহন রায় বিষয়ক পদ্য, কিন্তু অচিরেই তাঁর লেখা বেরোতে থাকল 'বিচিত্রা', 'কল্লোল', 'ধূপছায়া' বা 'প্রগতি'-তে।

রাবীন্দ্রিক আবহাওয়ায়, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল'-এর পরিবেশে, বিষ্ণু দে প্রায় প্রথম থেকেই ব্যক্তিসর্বস্ব অনুভূতির চর্চা, বা যাকে বলে স্বভাবকবিত্ব, তার উল্টো পথে গেলেন। তাই কৈশোরের গ্রহণেচ্ছু স্তরে যিনি তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ছিলেন তিনি প্রমথ চৌধুরী। অজস্র ট্রিওলেট বা ভিলানেল বা নানারকমের ফরাসী ছন্দোবন্ধের অনুশীলন করে পরিহাসতরল মেজাজে ও প্রকরণসবস্বতার আড়ালে ব্যক্তিগত কৈশোরক ভাবোচ্ছ্বাসকে উড়িয়ে দিলেন হাওয়ায়। এমনকি 'ট্রিওলেট'-এর অনুবাদ হিসেবে 'তেপাটি' নামটিও গ্রহণ করেন বিষ্ণু দে প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে। প্রমথ চৌধুরীর বিষয়ে তিনি এতটাই মশগুল ছিলেন যে তাঁকে অনুসরণ করে বেশ কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন। এ-সমস্তই ১৯২৫-২৬ সালের কথা। ১৯২৮-এ বেরোলেও বহু ট্রিয়োলেট লেখা শুরু হয় ১৯২৫ থেকেই। বিষ্ণু দে তখনও স্কুলের উঁচুক্লাসের ছাত্র। ১৯২৭ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। সে-বছরটিকে ঘিরেই, তার কিছু আগে-পরে ট্রিওলেট বা বীরবলী গল্প লেখা চলছে।

কিন্তু তখনই আবার মননের বা রসজ্ঞতার চর্চাও শুরু হয়ে গেছে। স্বদেশী বা বিদেশী ভাস্কর-চিত্রকরদের সম্পর্কে তাঁর লেখা সে-বয়সেই, যা কিছুটা-

বয়সে-বড় বুদ্ধদেব বসুকেও বিস্মিত করে। তাঁর নান্দনিক উপলব্ধিও উঠতে থাকে ছোট ছোট সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে—যেখানে বরং তাঁকে দেখি সে-যুগের বিভিন্ন অপরিণত রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রতিবাদে। কবিতায় যিনি রবীন্দ্রপ্রভাব তুলনাহীনভাবে বর্জন করেছেন প্রথম থেকেই, তিনিই কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যবোধের প্রবল সমর্থক, সে-যুগেই।

'বিচিত্রা' বা 'কল্লোলে'ও লিখছেন, কিন্তু এই পর্বে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল 'প্রগতি' ও 'ধূপছায়া'র সঙ্গে। 'ধূপছায়া'র সম্পাদনাতেও তাঁর সহায়তার কথা স্বীকৃত হয়েছে। আর 'প্রগতি'র সূত্রে বুদ্ধদেব বসু-র সঙ্গে যে যোগাযোগ তা তো আরো গাঢ় হয়েছে পরবর্তীকালে 'কবিতা'-র সংগঠনপর্বে।

১৯৩১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু দে-র লেখাগত পরিবেশেরও একটা বিরাট যুগের সূচনা হল। 'পরিচয়'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র সঙ্গে আগের ক্ষীণ সংযোগ এবারই বন্ধুত্বে পরিণত হল। পরিচয়ের বৈঠকে আরো নানা গুণীর সঙ্গে পরিচয় ঘটল। বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ বসু। শুরু হল সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ ৩০ বছরের মৈত্রী ও মতান্তরে চিহ্নিত বন্ধুত্ব।

প্রথম সংখ্যার 'পরিচয়ে'ই বিষ্ণু দে প্রুস্ত অনুবাদ করেছেন, কবিতা লিখেছেন দুটি, 'পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার শ্রেষ্ঠ কবিতা'। দ্বিতীয় সংখ্যায় লরেন্সের সমালোচনা। এইভাবে চলেছে দীর্ঘকাল সৃজনকর্ম ও সমালোচনা একই সঙ্গে 'পরিচয়ে'র আবহে। তবু, এটাও ঠিক, বিষ্ণু দে-র অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা—'ওফেলিয়া' 'জিজীবিষা' ('মহাশ্বেতা'), 'ঘোড়সওয়ার'—'পরিচয়ে'ই এই সময়ে বেরিয়ে থাকলেও সুধীন্দ্র-বিষ্ণু দে-সংযোগ নিঃসন্দেহে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ নানা বৈদেশিক বইয়ের রিভিউয়ে। এই তিরিশের দশক জুড়ে অজস্র বইয়ের সমালোচনা করেছেন তিনি—তাতে তাঁর মনীষার ব্যাপ্তির যেমন স্বাক্ষর আছে, তেমনি বোঝা যায় 'পরিচয়ে'র তাগিদ ও চেহারাটা। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রচনাতালিকায় শুধু দুটি বাংলা বইয়ের সমালোচনার খোঁজ পাওয়া যায়—সে দুটি হলো অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসু-র কাব্য-গ্রন্থ। 'পরিচয়ে'র তো একটা বড় উদ্দেশ্যই ছিল সমালোচনার মানোন্নয়নে বিদেশী গ্রন্থের পরিচয় দান। সেই উদ্দেশ্যসাধনে সুধীন্দ্রনাথের বড় সহায় ছিলেন এই কনিষ্ঠ বন্ধু।

বুদ্ধদেব বসু-র সঙ্গে প্রগতিতুতো সম্পর্ক, 'প্রগতি' উঠে গেলেও, তিনি কলকাতায় চলে আসার পরও রয়ে যায়। তাই ১৯৩৩ সালে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' যখন বেরোয়, তখন প্রকাশক হিসেবে নাম থাকে বুদ্ধদেব বসু-র। এর দু-বছর পরেই বুদ্ধদেব বসু বের করেন 'কবিতা'—প্রথম থেকেই বিষ্ণু দে তার সক্রিয় সহযোগী। 'কবিতা'তে লেখাই শুধু নয়, 'কবিতা'র সংগঠনে ও প্রচারেও তাঁর কমবেশি ভূমিকা ছিল। বুদ্ধদেব বসু-র যেমন 'পরিচয়' বিষয়ে কুণ্ঠা ছিল, তেমনি সুধীন্দ্রনাথও তখন বুদ্ধদেব বসু-র কবিতা ও 'কবিতা' পত্রিকা বিষয়ে নির্দ্বিধ ছিলেন না। বিষ্ণু দে-র কাছে প্রয়োজন ছিল এই দুই পত্রিকাবই।

'কবিতা'তে বিষ্ণু দে-র যে এক বিশেষ মর্যাদার আসন ছিল, তা কবিতার আদিযুগের পাতা ওলটালেই টের পাওয়া যায়। প্রথম ৫ বছরে এমন একটি সংখ্যা নেই যাতে বিষ্ণু দে অনুপস্থিত—৬ষ্ঠ থেকে ৮ম বর্ষ পর্যন্ত মাত্র একটি করে সংখ্যায় তাঁর কবিতা পাওয়া যাচ্ছে না। 'ক্রেসিডা' (যার আদি নাম ছিল 'মৃত্যু, প্রেম ও মহাকাল'), 'টপ্পা-ঠুংরি' তো বটেই, এমনকি পরে 'জন্মাষ্টমী'র মতো দীর্ঘ কবিতা দিয়ে একটি সংখ্যা শুরু হয় (শোনা যায়, এই কবিতাটি ছাপা নিয়ে সম্পাদকীয় মতভেদও হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত ছাপা সম্ভব হয় বুদ্ধদেব বসু-র অনমনীয় দৃঢ়তায়)। 'কবিতা'-র ৯ম বর্ষ থেকে দেখা গেল বিষ্ণু দে-র উপস্থিতি কিছুটা ক্ষীণ হয়ে আসছে—কিন্তু কোনো সময়ই তা অবলুপ্ত হয় নি।

—

নান্দনিক সাযুজ্যে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বই অবশ্য এই পর্বে ছিল বেশি জরুরি। এবং এই বন্ধুত্বের সূচনা ও লালন হয়েছিল টি. এস. এলিয়টের কাব্যনন্দনের প্রতি উভয়ের আকর্ষণে। পরে অবশ্য দুই কবি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে এলিয়টকে ছেড়ে গেছেন—কিন্তু প্রথম পর্বে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার সূত্রপাতে এলিয়টী প্রকরণ ও নন্দনের নৈরাত্ম্য-চর্চা অবলম্বন ও শিক্ষাস্থল হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল উভয়ের ক্ষেত্রে। তাই ১৯৩৮-এ 'চোরাবালি' যখন বেরোয় তখন কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের প্রকাশপূর্ব মনোযোগের প্রমাণ তাঁর ভূমিকা-সমালোচনাটি। সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি' এবং 'চোরাবালির'র সমালোচনা—এই দুটি মিলিয়ে দুই বন্ধুর নান্দনিক সংযোগের আবহটা অনুভব করা যায়।

এর আগেই ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে-র প্রথম কবিতার বই 'উর্বশী ও আর্টেমিস'। ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্রতা নিয়ে তরুণের নিঃসঙ্গ অভিযান—প্রাক্তনকে বাতিল করে দিয়ে—আবেগ ও কল্পনার শুদ্ধতা অর্জনের একাকীত্বে। রবীন্দ্রলালিত আবহাওয়ায় গ্রন্থটি সকলকেই সচকিত করেছিল, এবং সেই সঙ্গে তার প্রকরণের ছিমছাম তীব্র সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতা বিব্রতও করেছিল অনেককে।

'চোরাবালি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' হাতে পেয়েই রবীন্দ্রনাথ দুটি চিঠি দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে-কে। গ্রন্থটির পক্ষে প্রশংসামূলক হলেও, চিঠিতে নতুন কাব্যাদর্শ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা গোপন থাকে নি। 'চোরাবালি' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের আপত্তি সোচ্চার হয়ে উঠল। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যে-যে কারণ দেখিয়েছিলেন, তার প্রায় কোনোটাই আজকের কোনো পাঠকই গ্রাহ্য করবেন না—আধুনিক কবিতার সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে। এর আগেই, 'কবিতা' পত্রিকার ১ম সংখ্যার সমালোচনাতেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ আলাদা করে বিষ্ণু দে-র কবিতা বিষয়েই আপত্তি প্রকাশ করছেন। অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক কাব্যাদর্শ ও কাব্যরুচি সবচেয়ে বেশি আহত হচ্ছে বিষ্ণু দে-র কবিতার আধুনিকতায়। ক্রমশ বিষ্ণু দে-কে কেন্দ্র করে একটা বিরোধও দানা বেঁধে ওঠে। বিষ্ণু দে-র বিপরীতে নাম ওঠে অমিয় চক্রবর্তীর। সুধীন্দ্রনাথের বিশাল প্রবন্ধ তো বেরিয়েছিলই ভূমিকা হিসেবে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও বিষ্ণু দে-র এই রবীন্দ্রোত্তর 'নতুন' কবিতার সপক্ষে এবং অমিয় চক্রবর্তীর রবীন্দ্রানুসারী কবিতার লক্ষণ নির্দেশ করে প্রবন্ধ লেখেন। খানিকটা তিক্ততারও সৃষ্টি হয়েছিল।

৪ বছরের ব্যবধানে বেরোলেও 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি' কিন্তু যমজ, উভয় গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার রচনা একই সময়ে। এমন কি 'চোরাবালি'-র কিছু কবিতা 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর কবিতারও আগে লেখা। পুরোনো ট্রিওলেটগুলিকে তিনি 'চোরাবালি'-র বহু কবিতার ব্যঞ্জনাটো ব্যবহার করেছেন 'অসাধারণ নৈপুণ্যে'। কিন্তু তবু এ-গ্রন্থ দুটি মেজাজের দিক থেকে আলাদাও বটে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ ব্যক্তির যন্ত্রণায় ও চৈতন্যে যে নির্মোহ বর্জন ও গ্রহণ, 'চোরাবালি'তে তারই বিন্যাস বৈদেশিক পুরাণ বা শুদ্ধ প্রতীকের নাট্যকাব্যে।

কিন্তু এই সব ঘটনা ও চর্চার আড়ালে-আবডালেই বিষ্ণু দে-র চিন্তার ও কবিতার দিকবদল ঘটতে থাকে। নৈরাত্ম্যচর্চার প্রকরণের জগৎ ছেড়ে সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অন্য জগতে—নাটাকাবোর নেপথ্যবিহার সাঙ্গ করে আদিজননীর সহস্রবাহু নীড়ে—'চোরাবালি' থেকে 'পূর্বলেখে'। ১৯৩৬ সাল সেদিক থেকে একটা বড় মোড়। ১৯৩৫-এর রচনা (প্রকাশকাল নয়) 'ঘোড়সওয়ার', 'মহাশ্বেতা', 'টপ্পা-ঠুংরি'। কিন্তু ১৯৩৬-এই তিনি একদিকে লিখেছেন 'চোরাবালি'-র 'ক্রেসিডা'—অন্যদিকে 'পূর্বলেখ'-র প্রথম কবিতা 'বিভীষণের গান' এবং 'জন্মাষ্টমী'। মার্কসবাদী চেতনাকে কবিতার অভিজ্ঞতায় গ্রহণ করার এই পর্বে বিষ্ণু দে-র সঙ্গী ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বিস্ময়কর ব্যাপার এটাই যে, এই বাঁকবদলের যুগের কবিতার একটা বিরাট অংশের প্রকাশই কিন্তু বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা'য়, যদিও বুদ্ধদেব বসু-র রাজনীতি-বিরোধিতা ও শিল্পের শুদ্ধতার ঝোঁক সর্বজনবিদিত। ১৯৩৯-এ 'পূর্বলেখ'-র আঁটোসাঁটো কঠিন ভাবঘন দ্বান্দ্বিকচেতনাসমৃদ্ধ চতুর্দশপদী কবিতাগুলি 'পরিচয়'-এ যতটা না, তার চেয়ে বেশি বেরিয়েছিল 'কবিতা'য়। 'পরিচয়'-এ বেশি বেরিয়েছে তাঁর পুস্তক-সমালোচনা। সৃজনের দিক থেকে 'কবিতা'র চেয়েও 'পরিচয়' দূর হয়ে গেছে তখন? সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নান্দনিক বিচ্ছেদ আরো স্পষ্ট ও তীব্র? ১৯৩৯-এই বোধহয় বেরোয় বিষ্ণু দে-কৃত 'স্বগত'-র সমালোচনা—সুধীন্দ্রনাথের ফাঁকা যুক্তিসর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ। বুদ্ধদেব বসু-র শুদ্ধ শিল্পবাদের সঙ্গেও তো তাঁর নৈকট্য থাকতেই পারে না—তবু কি তিনি স্বস্তি পান বুদ্ধদেবের বিচ্ছিন্ন কিন্তু একনিষ্ঠ সাহিত্যপ্রেমের উদারতায়? অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের নন্দনবিলাসের প্রতিবাদও তাঁকে জানাতে হয়, শুধু ১৯৩৮-এর 'সম্পাদকসমীপে'-তেই নয়, ১৯৪৩-এ 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধটি 'কবিতা'তেই প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে। ১৯৪১-এ প্রকাশিত 'পূর্বলেখ' অবশ্য সর্বত্রই সমাদৃত হয়—বেশ কটি ভালো রিভিউ বেরোয়। 'চতুরঙ্গে' কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'অরণি'-তে সমর সেন, 'কবিতা'য় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং 'পরিচয়ে' দীর্ঘতরভাবে মণীন্দ্র রায়।

—

তখন থেকেই শুরু ফ্যাশিবিরোধী আন্দোলনের যুগ। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা একতাবদ্ধ। বিষ্ণু দে ফ্যাশিবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক সংঘের সম্পাদক,

হন। এই যুগে যে পত্রিকায় তিনি বেশি লেখেন সেটি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'অরণি'। বিষ্ণু দে নানাভাবে সক্রিয়—শিল্পসাহিত্যগত ভাবেই—কিন্তু সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এরকম সক্রিয়তা তাঁর জীবনে বোধহয় এর আগে বা পরে আর ঘটে নি। প্রচারপুস্তিকার ঢঙে কবিতাগ্রন্থের প্রকাশ ('২২শে জুন'), অনুবাদ ('সমুদ্রের মৌন' থেকে শুরু করে নানা ফ্যাশি-বিরোধী গল্পকবিতার অনুবাদ), শিল্পীসাহিত্যিকদের সামাজিক সক্রিয়তা বিষয়ে চিঠিপত্র লেখা, এমনকি ফ্যাশিবিরোধী উদ্দেশ্যে নাট্য-পরিচালনা (সুধীন্দ্রনাথ অনূদিত ইয়েটসের নাটকের অভিনয়ে তিনিই ছিলেন পরিচালক)। ফ্যাশিবিরোধী প্রেরণায় অসামান্য কবিতা রচনা বা অনুবাদও যেমন তিনি করেছেন, তেমনি প্রায় স্লোগানধর্মী আশু তাগিদের কবিতাও লিখেছেন ('গান' নামে ১৯৪২ সালে)।

স্বভাবতই ফরাসী কবি এলুয়াব বা আরার্গঁ তাঁর নন্দচেতনায় খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে এই সময়ে, এলিয়টকে সম্পূর্ণ বর্জন না করেও (১৯৪৪ সালে এলুয়ার-আরার্গঁ এলিয়ট প্রত্যেকের সম্পর্কেই তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন স্বীকৃতি-সূচক)। অবশ্য এই পর্বে এলিয়ট কোন্ দ্বান্দ্বিকতায় গৃহীত হতে পারে তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

—

১৯৪৫-এ বেরোয় 'সাত ভাই চম্পা'। 'সাত ভাই চম্পা'-র রচনাকাল শুরু হয়েছিল ফ্যাশিবিরোধী চেতনা এবং তার সঙ্গে স্বদেশী অভিজ্ঞতাকে সংলগ্ন করার সাধনার মধ্য দিয়ে, আর সেই কাল শেষ হলো ১৯৪৪-এ পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে বাংলার শিল্পীসাহিত্যিকদের নতুন আত্ম-প্রকাশের আবহে। ১৯৪৩-এই ফ্যাশিবিরোধী চৈতন্য যখন তীব্র তখনই ঘটল বাংলাদেশের ঐ মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ। এই দুটি অভিজ্ঞতাই 'সাত ভাই চম্পা'র ভুবন ছেয়ে আছে। হয়তো একটু সরল স্পষ্টঅতেই আছে—অন্তত 'পূর্বলেখ'-র পরে এই সারল্য অনেকের কাছেই বিস্ময়কর ঠেকেছিল।

—

১৯৪৬-এ একই সঙ্গে শুরু হলো হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা এবং সারা ভারতব্যাপী মুক্তিসংগ্রাম। নৌবিদ্রোহ, ডাক-তার ধর্মঘট, হায়দ্রাবাদ কাশ্মীর ত্রিবাঙ্কুরকোচিনে প্রতিবাদ, তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রাম, সর্বোপরি বাংলাদেশের তেভাগা আন্দোলন। মনুষ্যত্বের পরাজয় ও জয়ের ঘটনা একই সঙ্গে। দুটি ঘটনাই প্রবলভাবে নাড়া দেয় কবির অভিজ্ঞতাকে—সেই মথিত

আবেগ তাঁর কবিতার চেহারাকেও পালটে দেয়। আবেগের বিস্তারে তাঁর কবিতার অন্বয়েও বিস্তার ঘটে। সমকালীন একটি প্রবন্ধের ভাষায়, 'বিষ্ণুবাবু আজকাল খুব দীর্ঘ সুরে কথা বলেন। বুদ্ধির মাটিতেই যে হৃদয়ের চরম প্রতিফলন এই ধারণার পরম অভিব্যক্তি বিষ্ণু দে-র কবিতায়। তাই তাঁর কবিতা নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ঘটনা থেকে কাব্যাংশ বেছে নেয়। নদীর জলস্রোতের মতো তাঁর এই ধরনের কবিতাগুলি বহে যায়। কখনো বা মাত্রারত্তের ছন্দ-উচ্ছলতায়, কখনো পয়ারের দীর্ঘ ভগ্ন নিখুঁত তালে ঢেউ তুলে তুলে কবিতাটি শেষ হলে দেখা যায় যে সমস্ত মনটাতে একটি কাব্যের পলি-মাটির আস্তরণ পড়েছে।' (অভিনব গুপ্ত, 'শাবদীযা কবিতা পরিক্রমা'। 'অরণি', ২১ নভেম্বর ১৯৪৭)। এ-সময়েরই কবিতা 'সন্দ্বীপের চর'-এ।

—

এর সঙ্গে দুটো-তিনটে ঘটনাও তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটায়। একদল তরুণ শিল্পীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, যাঁরা পরে 'ক্যালকাটা গ্রুপ' নামে খ্যাত হন। ভেরিএর এলুইন, উইলিয়ম আর্চর এবং তাঁদের নৃতাত্ত্বিক পত্রিকা 'ম্যান ইন্ ইণ্ডিয়া' ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর মানসিক সংযোগ ঘটে। সাঁওতাল-পরগণার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ঘটে যায়। চেনা-অচেনায় ঘেরা এই প্রকৃতি, সেখানকার দরিদ্র লড়াকু আদিবাসী মানুষ, তাদের গান-ছবি, তাদের প্রত্যক্ষনন্দনের 'বাস্তবপরিপক্ক পরোক্ষতা' তাঁকে আশ্রয় দেয় (বিশেষত দাঙ্গার অভিজ্ঞতার পর), ক্লান্ত তিক্ত মন শুদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত পায় শিল্পের লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে। ১৯৪৬-এই তিনি সাঁওতালপরগণার গ্রাম রিখিয়াতে আসেন। তারপর থেকে এই স্থানটি হয়ে ওঠে তাঁর দ্বিতীয় আবাস —সময় পেলেই বারবার আসেন। এই প্রকৃতি আরো প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তাঁর জীবনে এবং কবিতায়।

—

শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে যে পরিচয়ের সূত্রপাত বহু আগে থেকেই ঘটেছিল, যা পরিণত হয়েছিল অসমবয়সী বন্ধুত্বে ও যামিনী রায়ের চিত্রসাধনার প্রতি বিষ্ণু দে-র শ্রদ্ধান্বিত মনোযোগে, তা ক্রমশই গভীর হয়ে উঠেছে। অসংখ্য প্রবন্ধে ও কবিতায় তার স্বীকৃতি আছে। বস্তুত সারা জীবনই বিষ্ণু দে যে দুজন সম্পর্কে বারবার আলোচনা করেছেন, সে দুজন হচ্ছেন টি. এস. এলিয়ট এবং যামিনী রায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দুই ব্যক্তিত্ব, স্বীকৃতির মাত্রাও সমান

নয়—তবু দুজনেই বিষ্ণু দে-র পক্ষে নিশ্চয়ই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিলেন।

'পূর্বলেখ' থেকে 'সাত ভাই চম্পা', 'সন্দ্বীপের চর' পর্যন্ত মার্কসবাদ এবং সেই সূত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিষ্ণু দে-র যোগাযোগ খুব সহজভাবেই এগোচ্ছিল। সক্রিয় কর্মী কখনই তিনি ছিলেন না, এমনকি ফ্যাশিবিরোধী যুগেও তা বলা যায় না---আর কবির পক্ষে সে প্রশ্ন হয়তো কিছুটা অবান্তরও—কিন্তু দীর্ঘ চেনা সম্পর্ক গভীর আত্মীয়তার।

১৯৪৮ নাগাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যে চরম বামপন্থী লাইন গৃহীত হয়, তার প্রভাবে কমিউনিস্ট জগতে বিশেষত শিল্পসাহিত্যের ব্যাপারে মতান্ধতা ও একদেশদর্শিতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—তার অংশীদার হওয়া বিষ্ণু দে-র সাহিত্যরুচি ও নন্দনে অসম্ভব। ফলে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই এই বিচ্যুতির একটি আন্তর্জাতিক সূত্র ছিল। মতভেদও ছিল। ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা ও লেখক রজের গারোদি-র মতামতকে হাতিয়ার করে লড়াইও চালিয়েছেন তিনি সাহিত্যিক অন্ধতার বিরুদ্ধে। অবশ্য যতদিন লড়াই চালানো সম্ভব হয়। ক্রমশই পার্টির হুকুমে তাঁকে একঘরে হতে হল। বেশ কিছুকাল সহ্য করতে হল নগ্ন, কুৎসিৎ আক্রমণ।

এর আগেই 'পরিচয়ে'র সঙ্গেও তাঁর বিচ্ছেদ প্রায় কতকগুলি নাটকীয় ঘটনার মধ্যে ঘটেছিল। উপলক্ষ যাই হোক, আসলে 'পরিচয়ে'র তৎকালীন শিল্পসাহিত্যগত অসহিষ্ণুতার জন্য বিষ্ণু দে-র নান্দনিক আপত্তিই ছিল এর মূলে। আর, তখনই, প্রয়োজন হল নিজের পত্রিকা 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশের। বিষ্ণু দে কখনই এর ঠিক সম্পাদক ছিলেন না, কিন্তু সে-সময়ে তাঁর নান্দনিক অবস্থান বোঝা যেত এ-পত্রিকার মধ্য দিয়েই।

—

১৯৪৯ থেকে ১৯৫১—এই কটি বছরে বিষ্ণু দে সরকারী সাম্যবাদী মহলের দ্বারা পরিত্যক্ত ও নিন্দিত, 'সাহিত্যপত্র' 'তৃতীয় শিবির' বলে ভর্ৎসিত—কিন্তু তার ফাঁকেই বিষ্ণু দে-র জীবনে নানা ঘটনা ঘটছে। যামিনী রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা তো আগেই বলা হয়েছে—'ক্যালকাটা গ্রুপে'র তরুণ সৃষ্টিমুখর শিল্পীদের কথাও উঠেছে। নিত্যপরীক্ষায় উন্মুখ ক্যালকাটা গ্রুপের নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পাল তাঁর সঙ্গী—তিনি 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র 'ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড'। আর্চারের সাহচর্যে শিল্পীবন্ধুদের

কারো কারো সঙ্গ নিয়ে তিনি ডুমকায় যান। রিখিয়ায় তো নিত্য যাওয়া-আসা। সাঁওতালপরগণার প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর মনে গেঁথে যায়। জমির ওঠাপড়ার রেখাটান, 'শত শত বর্ণাভাস', শিল্পীর প্যালেটের নানা রঙ তাঁর কবিতাতেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। আর এই আত্মপ্রসার ও আত্মস্থতাতেই, সাম্যবাদী দল যখন তাঁকে পরিত্যাগ করে, তখনই তাঁর আত্মবিশ্বাস প্রবলতম। প্রিয়জনের আঘাতে ব্যথাও কম নয়। এই ব্যথাহত আত্মবিশ্বাসেই তিনি লিখে চলেছেন 'অন্বিষ্ট' কবিতাটি এবং 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের একের পর এক কবিতা।

'অন্বিষ্ট'তেই বিষ্ণু দে-র ভাষা-আবিষ্কার সম্পূর্ণ হল বলা চলে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, আরোহনের এক একটা ধাপ অতিক্রম করে, অভিজ্ঞতার এক একটা স্তরের মধ্য দিয়ে যে বিস্তার ঘটেছিল, নিজের ভাষা ও স্বরে পৌঁছনোর সেই অভিযান সম্পূর্ণতা পেল 'অন্বিষ্ট'-তে এসে। 'অন্বিষ্ট' থেকে শুরু হল আরেক পর্ব।

—

সময় বা বিকাশের দিক থেকে কবির কাব্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে বা পর্যায়ে ভাগ করার চেষ্টা অনেক সময় উপকারী বোধ হলেও নিঃসন্দেহে স্থূল। সেটা স্বীকার করে নিয়েও বিষ্ণু দে-র কাব্যধারার কয়েকটি পর্যায় পাঠকের চোখের সামনে প্রতিভাত হতেও পারে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস ও 'চোরাবালি'-র প্রাথমিক স্তর পার হয়ে 'পূর্বলেখ' থেকে 'অন্বিষ্ট' পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র কাব্যের প্রথম পর্যায়ে যে আরোহণ ঘটেছে, সেই উপমাকেই বিস্তৃত করে বলা যায়, তার পরের গ্রন্থ 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' থেকেই চূড়ায় অবস্থান। এই শীর্ষ লগ্ন স্থায়ী হয়েছিল পরের দুটি কাব্যগ্রন্থেও: 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' ও 'আলেখ্য'-তে। হয়তো 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'ও। কিংবা 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত', 'অন্বিষ্টে'র মতোই, নতুন আরেকটি পর্যায়ের সূচনা।

—

তাহলে দাঁড়াল এই, ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০-৬১, এই পঞ্চাশের দশকই বোধহয় বিষ্ণু দে-র সৃজনশীলতার উজ্জ্বলতম সময়। স্বাধীনতা-উত্তর স্বদেশের যন্ত্রণা ও সম্ভাবনাকে তিনি বিষয় ও প্রকরণের অগাধ বৈচিত্র্যে প্রকাশ করেছেন। এ-পর্যায়ে কাব্য-অভিজ্ঞতার ঐতিহাসিক বিকাশের চেয়ে তাই লক্ষণীয় কবিতার অন্বয় ও প্রতিমার নিত্যনতুন পরীক্ষা ও সংহতি।

কখনো নাটকীয় বিন্যাসে, কখনো স্তব্ধ উপলব্ধির ভাষায় তিনি স্বদেশের বাস্তবের দুঃখ ও স্বপ্নকে বহুবর্ণে চিত্রিত করেন। প্রকৃতি, অবশ্যই রিখিয়ার প্রকৃতির ছাপ খুব বেশি তাতে, তাঁর কবিতার এ-সময়ে স্থায়ী উপাদান। মানুষের ব্যথা ও পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি এই পটভূমিতেই বারবার দেখেছেন। এই সময়ের কবিতা আবেদনের দিক থেকেও খুবই সহজ—বস্তুত 'পূর্বলেখ'-পর্যায়ের দুরূহতাকে ভেঙে ভেঙে তিনি অনায়াস সারল্যে পৌঁছেছেন।

—

অবশ্যই এই কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যেও এক-একটিতে হয়তো বিষয় ও প্রকরণের ভিন্ন ভিন্ন ঝোঁক আছে—কিন্তু সব মিলিয়ে তারা একটাই যুগ। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে' সাঁওতালপরগণার রূপসী প্রকৃতি, তার টিলার তরঙ্গ কবির স্নায়ুকে সতেজ করে—কবিতায় যেন তারই রোজনামচা। সংগীত বা চিত্র-কলার প্রতি অনুরাগ তো কবির ব্যক্তিত্বেরই অঙ্গ। বরাবর, এই পর্বেও, সংগীত-চিত্রের অনুষঙ্গ ছড়ানো তাঁর কবিতায় নানা দিক থেকে। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' গ্রন্থে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা—সে-অভিজ্ঞতা পশুপাখির সান্নিধ্য থেকে শুরু করে গান শোনা পর্যন্ত—তার মধ্যে সহজ উপভোগ ও বৃহৎ-এর ব্যঞ্জনাকে অনায়াসে মিলিয়ে দেন। আর 'আলেখ্য'-তে সুস্থ জঙ্গী লড়াকু নরনারীর ছবি। 'গোটা জীবনের প্রেমে বিশ্বাসী' বাংলাদেশের সেবাব্রতা মেয়ে বা কিশোরী-কন্যার লঘু-লাবণ্যের 'নিশ্চিত ছন্দ'।

'আলেখ্য' এবং 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' দুটি গ্রন্থেরই প্রকাশকাল ১৯৫৮। বছরটি বিষ্ণু দে-র রচনাপ্রকাশের দিক থেকে খুবই উর্বর। ঐ দুটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও, ইংরেজিতে প্রবন্ধ-পুস্তিকা বেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে, বাংলা প্রবন্ধগ্রন্থ বেরিয়েছে, অনুবাদ-গ্রন্থ বেরিয়েছে মাও ৎসে তুং-এর কবিতার। তাছাড়া 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কবিতাটিরও প্রকাশকাল ১৯৫৮। পরের বছরই বেরোয় 'সেই অন্ধকার চাই'।

—

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' ঐ শীর্ষ-পর্বেরই শেষ গ্রন্থ। অবশ্য এখানেই, কোথাও কোথাও, বিষাদ-ক্লান্তি ও স্মৃতির যন্ত্রণা কবিকে আচ্ছন্ন করছে। তবু

মানবিক মহিমা, অপ্রতিহত স্বপ্ন ও ভালোবাসার উচ্ছ্বসিত দীপ্তি যেন শেষ বারের মতো এমন নাটকীয় ও ঘরোয়া উচ্চারণে আমরা পেলাম।

এর পর 'সেই অন্ধকার চাই' থেকে 'উত্তরে থাকো মৌন' পর্যন্ত কবিতায় কখনো তিক্ত, কখনো অবসন্ন, কখনো মরিয়া স্বপ্নদ্রষ্টার কণ্ঠস্বরে তিনি সময়কে তুলে ধরেন। সময়? আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সাম্যবাদী আন্দোলনের চিন্তা ও কার্যকলাপে আত্মবিনাশী কলহ, ভারতীয় রাজনীতিতে অর্থহীনতার ও গৌণতার প্রসার, সাম্যবাদী অন্যসংস্কৃতিরও ক্ষয়—ষাট ও সত্তরের দশকের এই পরিবেশ বিষ্ণু দে-র অনুসন্ধানকেও ক্লান্ত করে তুলল, তাঁর 'চেনামুখ' অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হয়ে উঠতে চাইল। লেনিন, রবীন্দ্রনাথ বা অগ্রজ-বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র মতো কর্ম ও সৃজনের এই-সব 'পৌরাণিক চরিত্র'কে অবলম্বন করে, হো-চি-মিন-এর অনুবাদ করে, বাঁচাতে চাইলেন তাঁর স্বপ্নকে। বারবার তাই শেষযুগের কাব্যে 'ক্লান্তিখাত'-এর কথা, অশুচি অন্ধকারের কথা যেমন ওঠে, তেমনি ওঠে 'স্বপ্নে'র কথা। রবীন্দ্রনাথের চরিত্র, বাক্য, শব্দ, অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় হয়ে ওঠে প্রতীকী।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে পূর্ববঙ্গের মুক্তি আন্দোলনের সময় কেন তিনি উৎসাহভরে পূর্ববঙ্গের কবিতার সংকলন সম্পাদনা করেন, সে-বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৭২ সালে বেরোয় তাঁর 'অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলায় বাংলায়'। বাংলাদেশের রক্তাক্ত সংগ্রামের দিনগুলিতে কবির দিনলিপি। এও প্রতীক ছাড়া আর কি?

স্বপ্ন দেখা তিনি বাদ দেন নি। তাঁর কবিতার এই তিক্ততা ও ক্লান্তি যেমন, তেমনি স্বপ্নহীন ধৈর্যহীন গৌণ সাময়িকতার পশ্চাদ্ধাবনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ: 'তোমরা ভাবো স্বপ্ন শুধু বাবু পলায়ন?' কবির উত্তরহীন মৌনতেও হয়তো সেই প্রতিবাদই উচ্চারিত।

লক্ষ্য ও পদ্ধতি

এই পঞ্জি সংকলনেরও একটা ইতিহাস আছে। বিষ্ণু দে-র কবিতা পাঠে ও আলোচনায় দীর্ঘদিনের উৎসাহী এই লেখককর্মী নিজের প্রয়োজনেই হাতের কাছে রাখতে চেয়েছে তাঁর রচনার একটি বিস্তারিত ও কালানুক্রমিক পঞ্জি। ফলে কবিতালোচনার সূত্রেই তাকে গড়ে তুলতে হয়েছে এটা—এক হিসেবে তাই একে বলা যায় তার মূলের কাজেরই অংশ, ইংরেজিতে যাকে বলে বাইপ্রোডাক্ট।

যে-কোনো কবির আলোচনাতেই তাঁর রচনাপঞ্জির জ্ঞান অপরিহার্য। বিশেষ করে, বিষ্ণু দে-র মতো কবির পক্ষে তো আরো সত্য, যাঁর কাব্যের প্রবহমানতা তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্যেরই অঙ্গ এবং যাঁর আত্মসচেতন মন প্রত্যক্ষ, সমকালীন রচনার পারস্পরিক সংলগ্নতায়। নিজের প্রয়োজন ছাড়াও এই উপলব্ধিই ছিল রচনাপঞ্জিটি তৈরি করার পরিশ্রমের পেছনে সংকলকের প্রধান প্রেরণা।

পঞ্জি রচনার পদ্ধতিও স্থির করা হয়েছে এদিক থেকেই। সাধারণভাবে রীতি হচ্ছে লেখকের বিভিন্ন ধরনের রচনা, যথা কবিতা প্রবন্ধ পুস্তক-সমালোচনা মুখবন্ধ-রচনা ইত্যাদিকে আলাদা বিভাগে বিন্যস্ত করা। কিন্তু, এখানে কালানুষঙ্গ প্রতিষ্ঠাই যেহেতু সংকলকের প্রধান লক্ষ্য, অর্থাৎ এক-একটি কালপর্বে লেখকের গৌণ-অগৌণ সব রচনাকেই সন্নিবিষ্ট করে লেখকের মানসিক আবহকে ফুটিয়ে তোলা এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মের পারস্পরিকতা ও সমগ্রতা ও প্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করা, তাই বাঙলা ও ইংরেজি রচনা, কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-পুস্তকসমালোচনা-অনুবাদ, কিংবা স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রের বিচ্ছিন্ন রচনা—বিষয়, প্রকৃতি, অবয়ব ও ভাষা নির্বিশেষে সব রচনাকেই একটি পরম্পরায় (বা সিকোয়েন্সে) নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে জানি। মুখ্য এবং গৌণ রচনা তুল্যমূল্য হয়ে যায়, কোনো বিশেষ ধরনের রচনার পরম্পরাকে খুঁজে নিতে হয় পাঠককে, ইত্যাদি। কিন্তু সংকলকের প্রধান লক্ষ্য অনুধাবন করলে এই অসুবিধাকে উপেক্ষা করা যাবে।

এই বিপদ কিছুটা এড়াতে মুদ্রণে ভিন্ন ভিন্ন হরফ ব্যবহারই একমাত্র মুস্কিলআসান। শিরোনামে গ্রন্থের ক্ষেত্রে পাইকা হরফ ব্যবহার করা

হয়েছে বটে, কিন্তু অন্যত্র ইচ্ছে থাকলেও হরফের বৈচিত্র্যে বিষয়বৈচিত্র্য প্রকাশ করা যায় নি।

এই পঞ্জিতে যে যে ধরনের রচনাকে যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তার একটা বিবরণী নীচে দেওয়া হল:

ক) বলাই বাহুল্য, সর্বপ্রকার গ্রন্থ—কবিতাগ্রন্থ, প্রবন্ধগ্রন্থ, অনুবাদগ্রন্থ ইত্যাদিকে (পুস্তিকাও এখানে গ্রন্থ) গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) যে সব কবিতা বা প্রবন্ধ বা অনুবাদ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থস্থ হয় নি, তাদের নির্বিচারে গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) যে সব প্রবন্ধ ও অনুবাদ পরে গ্রন্থস্থ হয়েছে, সম্ভব হলেই সেগুলোকে সাময়িকপত্রে প্রকাশের তারিখ অনুসারে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) যে-সব কবিতা পরে গ্রন্থস্থ হয়েছে, তাদের প্রাথমিক প্রকাশের (সাময়িকপত্রে) উল্লেখের ব্যাপারে খুবই বাছাই করা হয়েছে। অর্থাৎ, সাধারণভাবে বলা যায়, সেগুলোর উল্লেখ এখানে করা হয় নি—কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে মাত্র। যে কবিতাগুলির প্রকাশকাল উল্লেখযোগ্য, কবিতার বিশিষ্টতার কারণে বা কবিতার শিরোনাম / পাঠ পরিবর্তনের কারণে কিংবা প্রকাশ-সম্পর্কিত কোনো ঐতিহাসিক বা বিতর্কমূলক কৌতূহলের কারণে (বিশেষত প্রথম দিককার কবিতায়), এমনকি যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সময়-সময় তারও খাতিরে, সে রকম কিছু কবিতাই স্থান পেয়েছে। গ্রন্থপঞ্জিশাস্ত্রে এরকম গ্রহণবর্জনের স্বাধীনতা নেই নিঃসন্দেহে, কিন্তু কিছু কিছু কবিতার প্রকাশকাল নির্দেশ করা হয়েছে সৃজনের ঐ আবহকে তুলে ধরার তাগিদে। এই তাগিদটাই এখানে বড়, গ্রন্থপঞ্জি রচনার ব্যাকরণ নয়।

ঙ) ভূমিকা বা মুখবন্ধ বা প্রশ্নোত্তর-সাক্ষাৎকার যত গৌণই হোক নির্বিচারে নেওয়া হয়েছে।

চ) পুস্তক-সমালোচনা—অন্য শিরোনাম না থাকলে—সমালোচিত পুস্তকের নামেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ছ) প্রকাশিত (কিন্তু দুষ্প্রাপ্য) বা প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানা যাচ্ছে না এমন কিছু কিছু রচনার পাণ্ডুলিপি সংকলকের চোখে পড়েছে—কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলোকেও গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন কবিতার ক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জন করা হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থ, বা কবিতা ছাড়া অন্যান্য বিচ্ছিন্ন রচনা, বা এমনকি গ্রন্থস্থ হয় নি এমন কবিতার ক্ষেত্রে যা যা পাওয়া গেছে, তারই প্রকাশকাল উল্লিখিত হয়েছে। দু-একটি ক্ষেত্রে রচনাকালও দেওয়া হয়েছে—কিন্তু তা নেহাতই ব্যতিক্রম।

রচনাপঞ্জিতে যথাসম্ভব কম শব্দ ব্যবহার করার রেওয়াজ, শব্দবাক্যছেদ-চিহ্নের সামঞ্জস্য বা সমতা সেখানে অবশ্যপালনীয়, প্রয়োজনমতো সংকেত বা চিহ্ন ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। সাধ্যমতো বর্তমান সংকলক তা করার চেষ্টা করেছেন, তবু ত্রুটি রয়ে গেল নিশ্চয়ই। পাঠকদের জন্য অনুসৃত নিয়মকানুন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে :

ক) পারস্পরিক উল্লেখ (cross-reference) যথাসাধ্য করার চেষ্টা হয়েছে—অর্থাৎ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন রচনা ও যে গ্রন্থে রচনাটি গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে যোগাযোগের কথা প্রায়শই যথাস্থানে বলা হয়েছে।

খ) যে সব রচনার শিরোনাম নেই, সে সব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু-নির্দেশক শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে, তৃতীয় বন্ধনীর ([ ]) মধ্যে।

গ) পুস্তক বা রচনার বিবরণীতে যে সব তথ্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে যেগুলি পুস্তক বা রচনার বাইরে অন্য কোনো সূত্রে পাওয়া গেছে, তারও উল্লেখ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে।

ঘ) যে রচনার শেষে গ্রন্থের নামের উল্লেখ নেই, বুঝতে হবে সে রচনা গ্রন্থভুক্ত হয় নি। কয়েক জায়গায় অবশ্য সেটা আলাদা করে বলে দেওয়াও হয়েছে।

ঙ) স্ট্রোক (/) অর্থে পরের লাইন বা পরের প্যারাগ্রাফ বোঝানো হয়েছে।

চ) নির্দেশিত রচনা বা গ্রন্থে যে বানান ব্যবহার করা হয়েছে, সেই স্থানে সেই বানানই অনুসৃত হয়েছে। তাই প্রথম দিকে 'এলিয়ট', কিন্তু পরে 'এলিঅট'।

ছ) যে রচনা বা গ্রন্থ-র কথা আমি শুনেছি বা পড়েছি, কিন্তু চোখে দেখি নি (তার সংখ্যা সামান্য), তার পাশে তারকাচিহ্ন (*) দেওয়া হয়েছে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

অভ্র ঘোষ ('প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা'-র জন্য), ইষিতা দত্ত ('প্রবাসী' পত্রিকার জন্য), জীবেন্দ্র সিংহ রায় ('কল্লোল' পত্রিকার জন্য), ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ('মানব মন' পত্রিকার জন্য), প্রণতি দে ('চোরাবালি', *Caramel Doll*, 'যাও ৎসে তুং/আঠারোটী কবিতা', *Satyendranath Bose*, *The People* পত্রিকার দু-তিনটি সংখ্যা এবং বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখতে দিয়েছেন), প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ('অরণি' পত্রিকার সন্ধানে সাহায্য করেছেন), প্রবীরগোপাল রায় ('সাহিত্যপত্র'-এর সূচির জন্য), বিমান সিংহ ('পূর্বলেখ' ও 'রুচি ও প্রগতি'র জন্য), মৈত্রেয়ী দাশগুপ্ত (*Bengal Painters' Testimony*-র জন্য), শঙ্খ ঘোষ (*South Asian Digest of Regional Writing* ও 'কবিতা' পত্রিকার সন্ধানে সাহায্য করেছেন), শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত (*Shakespeare with or without tears*-এর জন্য), সুনীলকুমার নন্দী ('সাত ভাই চম্পা'-র জন্য)।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, ভারতী পরিষদ গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার (বিশ্বভারতী), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

সংকেত

গ্রন্থের নামগুলি বারবার উল্লেখ না করে, বিশেষত পারস্পরিক উল্লেখের ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে :

কাব্যগ্রন্থ

উর্বশী ও আর্টেমিস	ক ১	তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ	ক ৯
চোরাবালি	ক ২	স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত	ক ১০
পূর্বলেখ	ক ৩	সেই অন্ধকার চাই	ক ১১
সাত ভাই চম্পা	ক ৪	সংবাদ মূলত কাব্য	ক ১২
সন্দ্বীপের চর	ক ৫	ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে	ক ১৩
অন্বিষ্ট	ক ৬	রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে	ক ১৪
নাম রেখেছি কোমল গান্ধার	ক ৭	ঈশাবাস্য দিবানিশা	ক ১৫
আলেখ্য	ক ৮	চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর	ক ১৬
		উত্তরে থাকো মৌন	ক ১৭

গদ্যগ্রন্থ

রুচি ও প্রগতি	প্র ১	মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা	প্র ৫
সাহিত্যের ভবিষ্যত	প্র ২	In the Sun and the Rain	প্র ৬
এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য	প্র ৩	জনসাধারণের রুচি	প্র ৭
সাহিত্যের দেশবিদেশ	প্র ৪	যামিনী রায়	প্র ৮

অনুবাদ

এলিঅটের কবিতা	অনু. ক ১	হে বিদেশী ফুল	অনু. ক ২

১৯২৮

১. পুরাণের পুনর্জন্ম / লক্ষ্মণ (গল্প)

'প্রগতি' [ঢাকা, ১ বর্ষ ৯ সংখ্যা], ফাল্গুন ১৩৩৪। প্রভু গুহ-ঠাকুরতার প্রেরণায় লেখা। 'প্রগতি'-র শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায় বেরিয়েছিল শ্রীবিপ্রদাস মিত্র-র (প্রভু গুহঠাকুরতার ছদ্মনাম) লেখা 'পুরাণের পুনর্জন্ম / ঊর্মিলা'। সেটা পড়ে বিষ্ণু দে খুব 'খুশি' হন, বিশেষত এর 'লেখার কায়দায়'। শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে কবিপত্নী শ্রীমতী প্রণতি দে জানিয়েছিলেন (২৫ মার্চ ১৯৭৫): "প্রগতি-তে প্রভু গুহঠাকুরতা 'পুরাণের পুনর্জন্ম' বলে একটা স্মার্ট গল্প লেখেন। বোধহয় John Ershine-এর গল্প অবলম্বনে। প্রাচীন গল্পের হেলেন অব ট্রয়ের আধুনিক রূপান্তর। বুদ্ধদেববাবুর [বুদ্ধদেব বসু] উৎসাহে সেই বইখানি Book Co. থেকে কেনেন। তখন বয়স খুব অল্প—হয় কলেজে উঠবেন বা উঠেছেন সবে। তাতে ওঁর মজা লাগল, এবং উনি একটু burlesque style-এ sequel একটা লেখেন। সেটা পাঠিয়েছিলেন বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে, ৪৭নং পুরাণা পল্টনে, প্রগতির আপিস এবং ওঁর বাড়িও। তখন ঢাকায় মোহিতলাল মজুমদারও ছিলেন, বাংলার লেকচারার হয়ে। তিনি নাকি ভেবেছিলেন ("of all men"!) প্রমথ চৌধুরী বেনামে লিখছেন!" বিষ্ণু দে-র সংযোজন ঐ চিঠিতেই: "আমি খুব খুশি হয়েছিলুম, কারণ সবুজপত্রের বিখ্যাত প্রমথ চৌধুরীর smartness আমাদের তখন খুব ভালো লাগত।"

২. স্মৃতি / (ফরাসী villanelle ছন্দে রচিত) (কবিতা)

'বিচিত্রা', [১ বর্ষ ২ খণ্ড ৩ সংখ্যা], ফাল্গুন ১৩৩৪।

৩. ফিরে-ফিরৃতি (গল্প)

'প্রগতি', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

৪. শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)

'ধূপছায়া', আষাঢ় ১৩৩৫। শ্রীশ্যামল রায় ছদ্মনামে পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে লিখিত বিষ্ণু দে-র চিঠি (২৫ মার্চ '৭৫) থেকে : "সে সময়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির বিষয়ে 'শ্যামল রায়' নামে একটা অসার প্রবন্ধ লিখি।...ধূপছায়ার সম্পাদক একদিন জানালেন যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট ঐ পত্রিকার তিন copy সমবায় ম্যানসনে পাঠিয়ে দিতে লিখেছেন, ওঁরা দাম দিয়ে কিনে নেবেন, সেখানে গগনেন্দ্রনাথের exhibition হবে। আমার জাঠতুতো দুই দাদা বললেন— 'গগনবাবুর ছবি কি বোঝো ? দেখতে গেছো ?' পর পর বোধহয় তিন পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি নাকি খুলে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু আত্ম-গ্লানিতে আমার আর exhibition-এ যাওয়া হল না। আমি 'এক হাত বুকে দিয়ে' গগনবাবুকে একটা চিঠি লিখে পাঠাই, এবং দ্বারকা ঠাকুর লেনে—গগনবাবু যদি আমাকে ওঁর একটা ফটো পাঠান সই করে।...গগনবাবু নিশ্চয়ই ভাবলেন—ছিলো 'শ্যামল রায়', এখন লিখছে 'বিষ্ণু দে'—ছবি পাঠান নি।"

৫. বাসর-রাত্রি (গল্প)

'প্রগতি', আষাঢ় ১৩৩৫।

৬. নব সাহিত্যতত্ত্ব (প্রবন্ধ)

'ধূপছায়া', আশ্বিন ১৩৩৫। 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত (শ্রাবণ ১৩৩৫) মন্মথনাথ ঘোষের প্রবন্ধের প্রতিবাদে রচিত। সম্ভবত সাধুরীতিতে লেখা একমাত্র প্রবন্ধ।

৭. আপন মনে / লেখক ও পাঠক (প্রবন্ধ)

'কল্লোল', আশ্বিন ১৩৩৫।

৮. গাঁয়ের চিঠি / (Ballade ছন্দে) (কবিতা)

'প্রগতি', আশ্বিন ১৩৩৫। ঐ পত্রিকারই কার্তিক ১৩৩৫ সংখ্যায় "ভ্রম-সংশোধন"।

৯. সুরসিক (গল্প)

'ধূপছায়া', কার্তিক ১৩৩৫।

১০. বন্ধু (গল্প)

'প্রগতি', অগ্রহায়ণ ১৩৩৫।

১৯২৯

১১. ট্রিয়োলেট্-গুচ্ছ (কবিতা)

'প্রগতি', পৌষ-মাঘ ১৩৩৫। ৫টি অংশ আছে: ওকালতী, মোটান-কান্না, সংসার, অকাল-দক্ষিণা, হৃদয়। এর কোনো কোনো অংশ পরে বহু পরিবর্তন ও পরিবর্জনের পর 'চোরাবালি' গ্রন্থে বিভিন্ন নামে বা অন্য কবিতার অংশ রূপে গৃহীত হয়েছে।

১২. লরেন্স্ য্যাট্কিন্সন্ (প্রবন্ধ)

'বিচিত্রা', বৈশাখ ১৩৩৬। সঙ্গে শিল্পীর ভাস্কর্যকর্মের ৬টি আলোকচিত্র।

১৩. আরব কবিতা (প্রবন্ধ ও কবিতানুবাদ)

'কল্লোল', বৈশাখ ১৩৩৬। লেবাননের কবি খলিল জিব্রান (Khalil Gibran)-এর কবিতা অবলম্বনে অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি।

১৪. আধুনিক প্রেম (কবিতা)

'প্রগতি', আষাঢ় ১৩৩৬। পরে কবিতাটি কিছু কিছু পরিমার্জনার পর গ্রন্থভুক্ত হয় 'মন-দেওয়া-নেওয়া' নামে (ক ২)।

১৫. বিদুষী [ও] ভারতচন্দ্র (কবিতা)

'প্রগতি', ভাদ্র ১৩৩৬। দুটি কবিতা: ১. 'বিদুষী / Austin Dobson অনুসরণে / (Triolet)', ২ 'ভারতচন্দ্র / (Rondelet)'।

১৬. ট্রিয়োলেট্ (কবিতা)

'প্রগতি', ভাদ্র ১৩৩৬। দুটি কবিতা: 'সুট্র্যাণ্ডে' এবং 'সুমিত্রাকে'। দ্বিতীয় কবিতাটি 'চোরাবালি' গ্রন্থে 'শিখণ্ডীর গান' কবিতার ৩য় অংশ হিসেবে 'প্রকৃতির ছায়ে বনভোজন' নামে গৃহীত হয়েছে (শেষ ২ লাইন বর্জিত)।

১৭ আপন মনে (প্রবন্ধ)

'প্রগতি', ভাদ্র ১৩৩৬। 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত সম্পাদকের এবং অন্য কোনো কোনো লেখকের "রবীন্দ্রবিরোধিতামূলক" ও "ব্যক্তিবাদে আক্রান্ত" সাহিত্য-সমালোচনার প্রতিবাদে লেখা।

১৮. তেপাটি / (Triolet) (কবিতা)

'কল্লোল', ভাদ্র ১৩৩৬।

১৯. অগস্টস্ জন্ (প্রবন্ধ)

'বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৩৬। সঙ্গে শিল্পীর চিত্রকর্মের ৫টি প্রতিলিপি

২০. স্মরস্মরণ (কবিতা)

'কল্লোল', আশ্বিন ১৩৩৬।

১৯৩১

২১ পৌরাণিক প্রশাখা (গল্প)

'কল্লোল', কার্তিক ১৩৩৬। "প্রগতিতে তখন 'পুরাণের পুনর্জন্ম' লেখা হচ্ছে—হালের সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে রামায়ণের পুনর্লেখন। প্রভু গুহঠাকুরতাই সে লেখার উদ্বোধন করেছেন। তারই অনুসরণে বিষ্ণু কল্লোলে 'পৌরাণিক প্রশাখা' লিখল—ভরতকে নিয়ে।" (অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ'। ডি. এম্. লাইব্রেরি, ১৩৫৭, পৃ ২৮৬)।

২২. বিচ্ছেদ (অনুবাদ)

'পরিচয়', [১ বর্ষ ১ সংখ্যা], শ্রাবণ ১৩৩৮। ফরাসী ঔপন্যাসিক মারসেল প্রুস্ত-এর ***Within a Budding Grove*** গ্রন্থ ("অতীতের অন্বেষণে-নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড") থেকে কয়েক পৃষ্ঠার অনুবাদ।

২৩. অর্ধনারীশ্বর [ও] বজ্রপাণি (কবিতা)

'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৩৮। ক ১। কবিতা দুটি ছাপা নিয়ে সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পারিবারিক মহলে কিছু 'কথা' ওঠে। সে বিষয়ে এবং কবিতা দুটি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের মতামত ("মৌলিকতার ও **experiment** এর দিক থেকে আপনার কবিতা দুটিই পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার শ্রেষ্ঠ কবিতা") জানা যাবে বর্তমান সংকলকের 'এই মৈত্রী! এই মনান্তর!' গ্রন্থে (পৃ ৪৭, ১০৮-৯)।

২৪. [ডি. এইচ্. লরেন্স] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', কার্তিক ১৩৩৮। **John Middleton Murry** লিখিত ***Son of Woman: The Story of D. H. Lawrence*** গ্রন্থের সমালোচনা।

১৯৩২

২৫. [অলডাস্ হাক্স্লি] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', মাঘ ১৩৩৮। Aldous Huxley রচিত *Music at Night, The World of Light* ও *The Cicades*—এই তিনটি উপন্যাসের সমালোচনা।

২৬. উর্ব্বশী (কবিতা)

'পরিচয়', মাঘ ১৩৩৮। ক ১।

২৭. মেঘার্ত্ত অমাবস্যা [ও] সন্ধ্যা (কবিতা)

'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৩৯। প্রথম কবিতাটি পরে 'রাত্রি' নামে ছাপা হয় (ক ১)।

২৮. [রোনাল্ড বট্‌র্যাল] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৩৯। **Ronald Bottral** রচিত *The Loosening and other poems* কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা।

২৯. [এলিঅট, অডেন, গ্রেগরি, পার্সনস্] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', কার্তিক ১৩৩৯। **T. S. Eliot**-এর *The Triumphal March*, **W.H. Auden**-এর *The Orators*, **Horace Gregory**-র *Rooming House* এবং **Clere Parsons**-এর *Poems*—এই চারটি গ্রন্থের সমালোচনা।

৩০. [রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিষ্ণু দে-র চিঠি]

রচনাকাল : ১৯৩২ (?)। 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২-তে প্রকাশিত।

১৯৩৩

৩১. [আধুনিক স্থাপত্যের অর্থ] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', মাঘ ১৩৩৯। **R. H. Wilenski**-রচিত *The Meaning of Modern Sculpture* গ্রন্থের সমালোচনা।

৩২. [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসু] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', মাঘ ১৩৩৯। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র 'আমরা' এবং বুদ্ধদেব বসু-র 'একটি কথা'—এই দুটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা।

৩৩. [ডি. এইচ. লরেন্স] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', মাঘ ১৩৩৯। **Aldous Huxley** সম্পাদিত *The*

Letters of D. H. Lawrence এবং তাঁরই রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ *Apocalypse*—এই দুটি গ্রন্থের সমালোচনা। প্রবন্ধটি পরে 'লরেন্স প্রতিভা' ও 'ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স' নামে ছাপা হয় (প্র ৩, প্র ৪)।

৩৪. [ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ ও ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি] (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৪০। **Viginia Wooli** রচিত ***The Common Reader*** এবং ***Desmond*** **MacCarthy** রচিত ***Criticism*** গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা।

৩৫. যাত্রা (কবিতা)
'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৪০। কবিতাটি প্রথমে 'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থের ১ম সংস্করণে ছাপা হয় এবং পরে 'পূর্বলেখ' গ্রন্থের 'জন্মাষ্টমী' কবিতার অংশ রূপে গৃহীত হয। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর ২য় সংস্করণে বর্জিত হয়।

"I remember how the mood of my verse with the clever facile style changed to a kind of halting but exploring mode of expression. And I recall how suddenly one night some ten lines came off almost like automatic writing, which spontaneously ran into a very long poem called *Janmastami* some eight or nine years later, and *which also incorporated another earlier poem about a dark journey addressed dramatically to Diotima of Socratic fame. (Speech of Shri Bishnu Dey,* ৪২৮নং রচনা)

৩৬. পুনশ্চ (কবিতা)
'পূর্বাশা', কার্তিক ১৩৪০।

৩৭ **উর্ব্বশী ও আর্টেমিস্‌ (কাব্যগ্রন্থ)**
প্রথম প্রকাশ : ১৩৪০ ব (১৯৩৩)। **রচনাকাল :** [১৯২৮-৩৩]। কোনো কবিতার রচনাকালের উল্লেখ নেই। **প্রকাশক :** বুদ্ধদেব বসু ; গ্রন্থকার-মণ্ডলী ; কলকাতা।
উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়'-কে। বোর্ড ও আংশিক কাপড়ে বাঁধাই ; মলাটে কোনো ছবি বা লেখা কিছুই নেই। দামেরও উল্লেখ নেই। কবিতার সংখ্যা ২৬। পৃ ৬+৪২।

গ্রন্থের সূচনায় টি. এস. এলিঅটের *The Sacred Wood* থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দুটি আছে :

"Let us avoid the assumption that rhetoric is a vice of manner" এবং "It is not his personal emotions, provoked by particular event in his life, that the poet is any way remarkable or interesting....The emotion in his poetry will be a very complex thing, but not with the complexity of the emotions of people who have very complex or unusual emotions in life. One error, in fact, of eccentricity in poetry is to seek for new human emotions to express ; and in this search for novelty in the wrong place it discovers the perverse. The business of the poet is not to find new emotions, but to use the ordinary ones and, in working them up into poetry, to express feelings which are not in actual emotions at all. And emotions which he has never experienced will serve his turn as well as those familiar to him. Consequently, we must believe that 'emotions recollected in tranquility' is an inexact formula. For it is neither emotion, nor recollection nor, without distortion of meaning, tranquility. It is a concentration, and a new thing resulting from the concentration, of a very great number of experiences which to the practical and active person would not seem to be experiences at all."

গ্রন্থটির প্রকাশনা বিষয়ে 'প্রকাশক' বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন : "আমার মাথায় খেলল দু-একটা বই নিজেরা ছেপে দেখলে মন্দ হয় না—তাতে পারমার্থিক এবং আর্থিক লাভও বেশি হতে পারে। / কয়েকদিন চলল বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা, হিসেব-নিকেশ, প্রেসের সন্ধান, আর সেইসব সুখদায়ক জল্পনা-কল্পনা যা এ-সব উদ্যমের আসল মুনফা। মূলধন বলতে কিছুই অবশ্য নেই।

আমাদের, কিন্তু তার প্রয়োজনই বা কী—বই বেরোবে লেখকদের নিজ-নিজ ব্যয়ে, বিক্রির চেষ্টা চলবে যৌথভাবে। আমাদের এই লেখক-প্রকাশক-সংস্থার নামকরণ হলো গ্রন্থকার-মণ্ডলী, ঠিকানা আমার রমেশ মিত্র রোডের ফ্ল্যাট, আমি ঘোষিতভাবে প্রকাশক। / প্রথমে বেরোল নিরাভরণ হলদে মলাটের দুটি ষোলো পৃষ্ঠার কবিতার বই—অচিন্ত্যর 'আমরা' ও আমার 'একটি কবিতা'—চার আনা মূল্যে পাঁচশো কপি কেটে গেল কলকাতার স্টলে। তারপর, উজ্জ্বলতরভাবে, বিষ্ণু দে প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' : সেটাই গ্রন্থকার-মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ এবং শেষ অবদান।" ('আমার যৌবন'। এম. সি. সরকার ১৯৭৬, পৃ ৯৫)

"এর পর 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বেরোয় ১৯৩২-এ [১৯৩৩ হবে]। সুধীন্দ্রনাথের কতখানি 'মানসিক বাধা' ছিল আগে জানি না, কিন্তু প্রকাশের পর তিনিও নাকি 'খুশি' হন। 'অনেক কবিতা আগে ছিঁড়ে ফেলার পর' পিতার অর্থানুকূল্যেই বইটি ছাপা হয়—এবং প্রথম থেকেই বইটির বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, জীবনময় রায়, প্রশান্ত মহলানবীশ—তা ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ তো বটেই।…[নীরেন্দ্রনাথ] সুধীন্দ্রনাথের ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র অন্তরঙ্গ, আবার বিষ্ণু দে-র স্বল্পকালের গৃহশিক্ষক। বিষ্ণু দে-র প্রথম দিককার কবিতার একজন উৎসাহী পাঠক ছিলেন তিনি—'উর্বশী ও আর্টেমিস' ওঁকেই উৎসর্গ করেন কবি। কিন্তু পরে সে উৎসাহে বোধহয় ভাঁটা পড়ে।" (অরুণ সেন, 'এই মৈত্রী! এই মনান্তর!' আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃ ১১১)

২য় সংস্করণ (১ম সিগনেট সংস্করণ) : বৈশাখ ১৩৬৭ ব (১৯৬০)। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত ; সিগনেট প্রেস ; কলকাতা ২০।

গ্রন্থনামের বানান পরিবর্তিত : 'উর্বশী ও আর্টেমিস'। বোর্ড-বাঁধাই ; পূর্ণেন্দু পত্রী অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ২ টাকা। পৃ ১০+৪০।

কবিতার রচনাকাল এখানে প্রথম স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হল, তবে কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত নয়। কবিতার সংখ্যা ২৫। প্রথম সংস্করণের 'যাত্রা' কবিতাটি এখানে বর্জিত এবং 'কয়েকটি কবিতা'-র

প্রথমটি কেবল এখানে রাখা হয়েছে (পরবর্তী 'চোরাবালি'-র 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' কবিতায় নানাভাবে সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে)। সূচনার ইংরেজি উদ্ধৃতি বর্জিত। বর্তমান সংস্করণে পাঠের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে (যথা, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের চলিত রূপ গ্রহণ, 'মোর' 'তব' ইত্যাদি 'কাবিক' শব্দের বর্জন, ইত্যাদি)। এ ছাড়া আর সব কিছু অপরিবর্তিত।

১৯৩৪

৩৮. [লিভিস, পাউণ্ড, সোভিয়েট সাহিত্য] (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', কার্তিক ১৩৪১। F.R. Leavis রচিত *Towards Standards of Criticism*, Ezra Pound রচিত *ABC of Reading*, Ezra Pound সম্পাদিত *Active Anthology* এবং George Reavey ও Marc Slonim রচিত *Soviet Literature* —এই চারটি গ্রন্থের সমালোচনা।

৩৯. ওফেলিয়া (কবিতা)
'পরিচয়', কার্তিক ১৩৪১। 'চোরাবালি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, অনেক পরিবর্তনের পর।

১৯৩৫

৪০. [আই. এ. রিচার্ডস] (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৪২। I.A. Richards রচিত *Coleridge on Imagination* এবং Thomas Gilby O. P. রচিত *Poetic Experience*—গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা। প্রবন্ধটি পরে 'রিচার্ডসের কল্পনা' নামে গ্রন্থভুক্ত হয় (প্র১, প্র৩, প্র৪)।

৪১. পঞ্চমুখ (কবিতা)
'কবিতা', [১ বর্ষ ১ সংখ্যা], আশ্বিন ১৩৪২। পরে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জনের পর গ্রন্থভুক্ত হয় (ক ২)।

৪২. [টি. এস. এলিঅট] (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', কার্তিক ১৩৪২। T.S. Eliot রচিত *The Rock* এবং *Murder in the Cathedral* গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা। রচনাটি প্র ৭ গ্রন্থের 'এলিঅট প্রসঙ্গে'-র প্রথমাংশ; দ্র. ৪৪৪ নং রচনা।

১৯৩৬

৪৩. প্রথম পার্টি (কবিতা)

'কবিতা', পৌষ ১৩৪২। ক ২।

৪৪. বিবমিষা (কবিতা)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৪২। ক ২।

৪৫. [এম্‌পসন, বার্কার, মুর, ডে লুইস] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৪৩। **William Empson** রচিত ***Poems,*** **Marianne Moore** রচিত ***Selected Poems,*** **Cecil Day Lewis** রচিত ***A Time to Dance***—কাব্যগ্রন্থসমূহের সমালোচনা। পরে 'আধুনিক কাব্য (১)' নামে গ্রন্থভুক্ত হয় (প্র ৪)।

৪৬. জিজীবিষা (কবিতা)

'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৪৩। পরে 'মহাশ্বেতা' নামে গ্রন্থভুক্ত হয় (ক ২)।

৪৭. মৃত্যু, প্রেম ও মহাকাল (কবিতা)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৩। 'ক্রেসিডা' নামে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত-ভাবে পরে গ্রন্থভুক্ত হয় (ক ২)।

৪৮. ঘোড়সওয়ার (কবিতা)

'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৪৩। বেশ কিছু পরিবর্তনের পর এটি গ্রন্থভুক্ত হয় (ক ২)।

৪৯. [অডেন, গ্যারেট, রবার্টস, পার্সন্স] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৪৩। **W. H. Auden** ও **J. T. Garrett** সম্পাদিত ***The Poet's Tongue*** ; **Michael Roberts** সম্পাদিত ***The Faber Book of Modern Verse*** ; **J.M. Parsons** সম্পাদিত ***The Progress of Poetry*** এবং ***The Year's Poetry, 1935***—এই গ্রন্থসমূহের সমালোচনা। রচনাটি পরে 'আধুনিক কাব্য (২)' নামে ছাপা হয় (প্র ৪)।

৫০. প্রার্থনা (কবিতা)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৩। 'উভচর' নামে কিছু পরিবর্তনের পর গ্রন্থভুক্ত হয় (ক ২)।

৫১. জন্মাষ্টমী (কবিতা)

রচনাকাল : ১৯৩৬। দ্র. ৬৭ নং রচনা।

১৯৩৭

৫২. যযাতি (কবিতা)

'কবিতা', পৌষ ১৩৪৩। অনেক পরিবর্তনের পর গ্রন্থভুক্ত হয় (ক ২)।

৫৩. ফাঁপা মানুষ / টি. এস্. এলিয়ট (অনুবাদ)

'পরিচয়', ফাল্গুন ১৩৪৩। T. S. Eliot-এর *The Hollow Man* কবিতার অনুবাদ। অনু. ক ১।

৫৪. [অলডাস্ হাক্স্লি-র উপন্যাস] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', চৈত্র ১৩৪৩। Aldous Huxley রচিত *Eyeless in Gaza* উপন্যাসটির সমালোচনা।

৫৫. ডি এইচ্. লরেন্সের কয়েকটি অনুবাদ (অনুবাদ)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৪৩। ৭টি কবিতার অনুবাদ। ক ৩ গ্রন্থের শেষাংশে সন্নিবিষ্ট।

৫৬. টপ্পা-ঠুংরি (কবিতা)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৪। ক ২।

৫৭. [সমর সেনের কবিতা] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', ভাদ্র ১৩৪৪। সমর সেনের কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা ও গ্রহণ'-এর সমালোচনা। পরে প্রবন্ধটি 'গদ্য কবিতা' ও 'বাংলা গদ্য কবিতা' নামে বিভিন্ন গ্রন্থে ছাপা হয় (প্র ১, প্র ২, প্র ৭)।

৫৮. অপস্মার (কবিতা)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৪। ক ২।

৫৯. [ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', কার্তিক ১৩৪৪। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস 'আবর্ত'-র সমালোচনা। পরে রচনাটি 'বুদ্ধিবাদীর উপন্যাস' ও 'বুদ্ধিবাদী উপন্যাস' নামে গ্রন্থভুক্ত হয় (প্র ১, প্র ২, প্র ৭)।

৬০. **চোরাবালি (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ : [১৩৪৪ ব, ১৯৩৭]। রচনাকাল : [১৯২৬-৩৬]। কোনো কবিতায় রচনাকালের উল্লেখ নেই। প্রকাশক : কুন্দভূষণ ভাদুড়ী ; ভারতী ভবন ; কলকাতা।
উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়-কে'। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক মুখবন্ধসহ' (মুখবন্ধটির রচনার তারিখ দেওয়া আছে ৬ আশ্বিন ১৩৪৪। 'চোরাবালি' শিরোনামে এই গদ্যরচনাটি সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগ্রন্থে, প্রথমে 'স্বগত'-তে ও পরে 'কুলায় ও কালপুরুষ-'এ মুদ্রিত হয়েছে)। বোর্ড-বাঁধাই, জ্যাকেট সহ ; প্রচ্ছদশিল্পীর নাম অনুল্লিখিত [প্রচ্ছদটি কবিপত্নী প্রণতি দে কৃত]। দাম ১৸০। কবিতার সংখ্যা ২১। পৃ ৬+১৩ (মুখবন্ধ)+৮০। 'সূচী' গ্রন্থের শেষে।

২য় সংস্করণ (১ম সিগনেট সংস্করণ) : আষাঢ় ১৩৬৭ ব (১৯৬০)। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত ; সিগনেট প্রেস ; কলকাতা ২০।
উৎসর্গের ভাষা সামান্য পরিবর্তিত : 'শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ-কে'। বোর্ড বাঁধাই ; পূর্ণেন্দু পত্রী অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ২ টাকা ২৫ ন. প.। পৃ ১০+৭৮।

কবিতার রচনাকাল স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত, তবে কালানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত নয়। কবিতার সংখ্যা একই। এই সংস্করণে বহু কবিতাতেই পাঠের প্রচুর পরিবর্তন আছে। বহু কবিতার মধ্যস্থিত বিরতিচিহ্ন '+ — +' এই সংস্করণে লুপ্ত হয়েছে।

৩য় সংস্করণ [২য় সিগনেট 'সংস্করণ' যথার্থ অর্থে মুদ্রণ] : ফাল্গুন ১৩৭৭ ব (১৯৭১)। অপরিবর্তিত।

১৯৩৮

৬১. বেকারবিহঙ্গ (কবিতা)

'কবিতা', পৌষ ১৩৪৪। ক ২।

৬২. খাসা দিন (কবিতানুবাদ)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৪৪। পল মোরাঁ-র এই কবিতাটি শিরোনাম-হীনভাবে ক ৩ গ্রন্থে ছাপা হয়।

৬৩. সম্পাদকসমীপে (প্রবন্ধ)

'কবিতা', বৈশাখ ১৩৪৫। সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু-র "অনুরোধে" পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ। 'কবিতা' পত্রিকার ঠিক আগের সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৪৪) প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু-র সমালোচনার ('চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে এটিও পত্রাকার সমালোচনা) প্রাসঙ্গিক জবাব এতে আছে।

৬৪. [অডেন ও ম্যাকনিস] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫। **W. H Auden** ও **Macniece Louis**-এর ***Letters from Iceland*** গ্রন্থের সমালোচনা।

৬৫. বিভীষণের গান (কবিতা)

'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৪৫। ক ৩

৬৬. পদধ্বনি (কবিতা)

'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৪৫। ক ৩। রচনাকাল: ১৯৩৮।

৬৭. জন্মাষ্টমী (কবিতা)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৫। ক ৩। রচনাকাল: ১৯৩৬।

৬৮. [সুরাওআর্দির গদ্য ও পদ্য] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৪৫। **Shahid Suhrawardy** রচিত কাব্যগ্রন্থ ***Prefaces*** ও কাব্যগ্রন্থ ***Essays in Verse***-এর সমালোচনা। রচনাটি পরে 'সুরুচি ও পণ্ডিতম্মন্যতা' নামে ছাপা হয় (প্র ৩)।

৬৯. চতুর্দশপদী / (শ্রীবুদ্ধদেব বসু-কে) (কবিতা).

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৫। মোট ৪টি। ক ৩।

৭০. [রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিষ্ণু দে-র চিঠি]

রচনাকাল: ১৯৩৮। 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২-তে প্রকাশিত।

১৯৩৯

৭১. চতুর্দশপদী (কবিতা)

'কবিতা', পৌষ ১৩৪৫। মোট ৫টি। ক ৩।

৭২. [অডেন সম্পাদিত লাইট ভর্স] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', চৈত্র ১৩৪৫। **W. H. Auden** সম্পাদিত ***The Oxford***

Book of Light Verse গ্রন্থের সমালোচনা। রচনাটি পরে 'হাল্‌কা কবিতা' নামে ছাপা হয় (প্র ১, প্র ২, প্র ৭)।

৭৩. পঞ্চপ্রদীপ (কবিতা)

'১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে (সম্পাদক : রমাপতি বসু। ১৯৩৯) সংকলিত। জওহরলাল, সরোজিনী, জয়প্রকাশ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে পাঁচটি স্তবকে রচিত ব্যঙ্গমূলক 'রাজনৈতিক' কবিতা। পরে 'চিত্রক্ষপ মত্ত পৃথিবীর' কাব্যগ্রন্থে 'কান্নাহাসির ইতিহাস থেকে কয়েকটি ছড়া' শিরোনামে গৃহীত হয়েছে।

৭৪. চতুর্দশপদী (কবিতা)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৪৫। মোট ৫টি। ক ৩।

৭৫. [সমারসেট মমের উপন্যাস] (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। **Somerset Maugham** রচিত *Christmas Holiday* গ্রন্থের সমালোচনা।

৭৬. আবির্ভাব (কবিতা)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৬। ক ৩।

৭৭. কোনো কমরেডের বিবাহে (কবিতা)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৬। 'কোনো বন্ধুর বিবাহে' নামে ক ৩ গ্রন্থে।

৭৮. বিদায় (কবিতা)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৬। কিছু পরিবর্তনের পর 'চতুরঙ্গ' কবিতার চতুর্থাংশ হিসেবে ক ৩ গ্রন্থে গৃহীত।

৭৯. "সৌখীনতায় হারালুম জীবন"—সবচেয়ে উঁচু মিনারের গান : র‍্যাবো (কবিতা)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৬। ক ৩ গ্রন্থে গৃহীত, সেখানে র‍্যাবো-র কবিতার মূল পাঠের উদ্ধৃতি দিয়ে শিরোনাম : ***Oisive jeunesse***··· ইত্যাদি।

৮০. এম-বি-র জন্য অনুবাদ / (হায়নে) (কবিতানুবাদ)

'চতুরঙ্গ', আশ্বিন ১৩৪৬। অনু. ক ২ গ্রন্থে জর্মান কবি হায়নরিখ্‌ হায়নের কবিতানুবাদের ২নং ও ৭নং।

৮১. "এ-যুগের চাঁদ হলো কাস্তে" (কবিতা)

'কবিতা', কার্তিক ১৩৪৬। ["বিশেষ পূজা সংখ্যা"—হঠাৎ কাগজের আকার বাড়ানো হয়েছে—তবে এই একটি সংখ্যাতেই]। ক ৩ গ্রন্থে 'বৈকালী' কবিতার ৬ষ্ঠ অংশ।

'বাংলা কবিতার আসরে তিনি [দিনেশ দাস] প্রথম এসেছিলেন আজ থেকে বছর ষোলো আগে, 'কাস্তে' কবিতার চমক তুলে, যে-কবিতায়, জীবনানন্দর 'কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ'-এর উপমা উল্‌টিয়ে, তিনি কাস্তেটাকেই 'এ যুগের চাঁদ' বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই কবিতা বিখ্যাত হয়েছিল—নিজের গুণেও বটে, এবং তারই একটি লাইন নিয়ে বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পাল্লা দিয়ে কবিতা লিখেছিলেন বলেও।" (বুদ্ধদেব বসু, 'সমালোচনা'। 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫৯)। বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের ঐ কবিতা দুটিই পর পর ছাপা আছে এ-সংখ্যায়।

৮২. Sudhindranath Datta / Review of Swagata

(পুস্তক সমালোচনা)

Progressive Literature Quarterly [লখনৌ ?], ১৯৩৯ (?)। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'স্বগত'-র সমালোচনা। অনেক অনুসন্ধান করেও পত্রিকাটির সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে সম্প্রতি বিষ্ণু দে-র পাণ্ডুলিপি ঘাঁটতে গিয়ে প্রবন্ধের একটি খসড়া পাওয়া গেছে। ঐ খসড়াটিরই অনুবাদ 'সুধীন্দ্রনাথ ও স্বগত' নামে বেরোয় 'অনুক্ত', বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮৫ সংখ্যায় (অনুবাদক : অরুণ সেন)।

১৯৪০

৮৩. ছুটি (কবিতা)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৪৬। 'বৈকালী' কবিতার ৮ম অংশরূপে শিরোনামহীনভাবে ছাপা হয় (ক ৩)।

৮৪. চতুর্দশপদী (কবিতা)

'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭। 'বৈকালী' কবিতার ৩য় অংশ (ক ৩)।

৮৫. বৈকালী (কবিতা)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৭। 'বৈকালী' কবিতার ১ম অংশ "মর্মর নিথর" থেকে "কলের সরকার" পর্যন্ত (ক ৩)। তবে গ্রন্থের পাঠে অনেক পরিবর্তন আছে।

৮৬. একটি ছবি (কবিতা)

'পরিচয়', আশ্বিন ১৩৪৭। 'যামিনী রায়ের একটি ছবি' নামে পরে ছাপা হয় (ক ৩)।

৮৭. একটি প্রেমের কবিতা (কবিতা)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৭। 'চতুরঙ্গ' কবিতার শিরোনামহীন তৃতীয়াংশ (ক ৩)। তবে পাঠের অনেক পরিবর্তন আছে।

১৯৪১

৮৮. ওএন্-এর একটি কবিতা (কবিতানুবাদ)

'কবিতা', পৌষ ১৩৪৭। অনেক পরিবর্তনের পর ক ৩ ও অনু. ক ২ গ্রন্থে।

৮৯. রসায়ন (কবিতা)

'পরিচয়', মাঘ ১৩৪৭। ক ৩।

৯০. পার্টির শেষ (কবিতা)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৪৭। ক ৩।

৯১. রবীন্দ্রনাথ, এজরা পাউণ্ড (অনুবাদ)*

'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮। *Fortnightly Review* (মার্চ ১৯৩১)-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে এজরা পাউণ্ডের প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ। পরে অনুবাদটি প্র৩-গ্রন্থের 'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড' প্রবন্ধে ও ৩৬৬নং রচনায় ব্যবহৃত।

৯২. একটি প্রেমের কবিতা (কবিতা)

'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৪৮। 'সোনালি ঈগল' নামে ক ৩ গ্রন্থে।

৯৩. এলিয়টের দুটি কবিতার অনুবাদ (কবিতানুবাদ)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৮। শিরোনাম যথাক্রমে : 'মারিনা' ও 'চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাওয়া'। অনু. ক ১।

৯৪. মধ্যবিত্ত পূজার ছুটি (কবিতা)

'পরিচয়', কার্তিক ১৩৪৮।

৯৫. **পূর্বলেখ (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ : [১৯৪১]। রচনাকাল : [১৯৩৬-৪১]। কোনো কবিতার রচনাকালের উল্লেখ নেই। প্রকাশক : প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী ; কবিতা ভবন ; রাসবিহারী এভিনিউ ; কলকাতা। উৎসর্গ : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / হ্বায়ামি তে মনসা মন…' ইত্যাদি [অথর্ববেদ এবং কৌশীতকী সূত্র থেকে মোট ৪ লাইনের উদ্ধৃতি]। হাতে-তৈরি ব্রাউন রঙের মোটা কাগজের মলাট ; যামিনী রায় অঙ্কিত লাল-রঙ প্রচ্ছদ। দাম দু টাকা বারো আনা। গ্রন্থটিতে ২টি অংশ আছে : মূল গ্রন্থ এবং 'বিদেশী' (স্বতন্ত্রভাবে এই অংশটি 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু'-কে উৎসর্গীকৃত) কবিতার সংখ্যা ২১+১৯। পৃ ৮+১১০। 'সূচী' গ্রন্থের শেষে।

গ্রন্থের নামপত্রের অপর পিঠে সম্ভবত কবির (অস্বাক্ষরিত) মন্তব্য : "কবিতাগুলি অধিকাংশই ১৯৩৫-৪০ সালে সামাজিক উপলক্ষ্যে বা ফরমায়েসে লিখিত।" মূল গ্রন্থটি অপরিবর্তিত ভাবে 'একুশ বাইশ' ও 'বছর পঁচিশ', এই দুটি কাব্যসংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অনুবাদগুলি (এলিঅট, লরেন্‌স্‌, পল মোরাঁ, উইলফ্রেড ওএন্‌ ও হাইনে) পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে 'এলিঅটের কবিতা' ও 'হে বিদেশী ফুল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৪২

৯৬. তোমাদের জানি (কবিতা)

'চতুরঙ্গ', পৌষ ১৩৪৮। বেশ কিছু পরিবর্তনের পর 'তোমাদের সনেট' নামে '২২শে জুন' ও ক ৪ গ্রন্থে।

৯৭. অজ্ঞাতবাস / (শান্তিনিকেতনপ্রবাসী কামাক্ষীপ্রসাদকে) (কবিতা)

'কবিতা', পৌষ ১৩৪৮। 'পলাতক' নামে ক ৪ গ্রন্থে।

৯৮. ভূগোল কাঁপে (কবিতা)

'অরণি', ১৩ মার্চ ১৯৪২। অনেক পরিবর্তনের পর কবিতাটি '১৯৪১' নামে '২২শে জুন' ও ক ৪ গ্রন্থে।

৯৯. অজেয় (কবিতা)

'অরণি', ২৪ এপ্রিল ১৯৪২। 'এ জনতার' নামে '২২শে জুন' ও ক ৪ গ্রন্থে।

১০০. গান (কবিতা)

'অরণি', ১ মে ১৯৪২। ২২শে জুন' গ্রন্থে 'জনযুদ্ধ' শিরোনামের ১নং কবিতা এটি। ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধের যুগে প্রত্যক্ষ ঘোষণার কবিতা—ক ৪ গ্রন্থে বর্জিত।

১০১. তোমরাই মহাকাল (কবিতা)

'অরণি', ১৫ মে ১৯৪২। *I am Cinna the Poet, Cinna the Poet* নামে '২২শে জুন' ও ক ৪ গ্রন্থে।

১০২. ২২শে জুন (কবিতা)

'অরণি', ২৬ জুন ১৯৪২ (সোভিয়েট সংখ্যা)। '২২শে জুন, ১৯৪২' নামে '২২শে জুন' ও ক ৪ গ্রন্থে।

১০৩. ছড়া [ও] হে ভারতী, খোলো (কবিতা)

'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯। প্রথম কবিতাটি 'বুড়োভোলানো ছড়া' নামে '২২শে জুন' পুস্তিকায় ও ক ৪ গ্রন্থে এবং দ্বিতীয় কবিতাটি 'আজকে এসেছি দুর্গ-শিখরে' নামে ক ৪ গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

১০৪. বেণুর জন্য (কবিতা)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৯। কবিতাটির শিরোনামের নীচে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি আছে (বন্ধনীর মধ্যে) : **A freeman thinks of death least of all things ; and his wisdom is a meditation, not of death but of life—Spinoza.**

পরে গ্রন্থস্থ হওয়ার সময় বর্তমান শিরোনামকে দ্বিতীয় শিরোনাম করা হয় এবং মূল শিরোনাম হয় 'ভারতীয় বিমানবাহিনী' (ক ৪) উপরন্তু উদ্ধৃতিটিও বর্জিত হয়।

১০৫. গান (কবিতা)

'অরণি', ১৭ জুলাই ১৯৪২। '২২শে জুন' গ্রন্থে 'জনযুদ্ধ' শিরোনামের ২নং কবিতা এটি। দ্র. ১০০নং রচনা। ফ্যাসিবিরোধী প্রত্যক্ষ আবেদনের এই কবিতাটি ক ৪ গ্রন্থে বর্জিত।

১০৬. শিল্পীদের দায়িত্ব (চিঠি)

'অরণি', ৩১ জুলাই ১৯৪২। ঐ পত্রিকারই ৩ জুলাই সংখ্যায় মনোজ হালদার রচিত এই শিরোনামের প্রবন্ধটির কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কে "ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ"র সম্পাদক বিষ্ণু দে-র চিঠি, পত্রিকার সম্পাদককে লেখা। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে প্রবন্ধ-লেখকের "হঠোক্তি"র প্রতিবাদ। সেই সঙ্গে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে "ছাত্র-সমাজের সঙ্গে লেখকশিল্পীর যোগ" বিষয়ে প্রবন্ধলেখকের অলীক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন।

১০৭. এক সভার সনেট (কবিতা)

'পরিচয়', ভাদ্র ১৩৪৯। 'কোড়া' নামক দীর্ঘ কবিতার মাঝখানে এই সনেটটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ("উজ্জীবনের রীতি কি এখানে ভিন্ন" থেকে "গোষ্ঠীস্তম্ভ যেখানে দীর্ণ" পর্যন্ত) ক ৪।

১০৮. আত্মজিজ্ঞাসা (কবিতা)

'অরণি', ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪২। ক ৪।

১০৯. শেষ রোমাণ্টিক [ও] চতুর্দশপদী [ও] কমি-কে (কবিতা)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৯। ক ৪। সেখানে দ্বিতীয় কবিতাটির শিরোনাম 'সংসার'।

১১০. চীনাংশুক (কবিতা)

'চতুরঙ্গ', আশ্বিন ১৩৪৯।

১১১. লক্ষ্মীপূর্ণিমা (কবিতা)

'অরণি', ৭ অক্টোবর ১৯৪২।

১১২. প্রগতিবাদী কবি (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', অগ্রহায়ণ ১৩৪৯। মণীন্দ্র রায়ের কাব্যগ্রন্থ 'একচক্ষু'-র সমালোচনা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও আছে। প্র ১।

১১৩. **Notes on Progressive Writing in Bengal** (প্রবন্ধ)।*

হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি সম্পাদিত *US—People's Symposium* সংকলনে প্রকাশিত প্রবন্ধ (প্রকাশক : Anti-Fascist Writers' Assn.)। প্রকাশকাল ১৯৪২ ?

১১৪. **২২শে জুন (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ : [১৯৪২]। রচনাকালের কোনো উল্লেখ নেই। প্রকাশক : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ; ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ; কলকাতা।

উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের করকমলে'। কাগজের পাতলা মলাট, শুধুমাত্র লাল রঙে প্রেসের হরফ ব্যবহার করে প্রচ্ছদপট। দাম চার আনা। কবিতার সংখ্যা ১৩। পৃ ৬+১০। কবিতারম্ভের পূর্বে বাঁ-দিকে চার-এর পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি আছে :

"I hate all boets and bainters—*George II.*

The creation of a new proletarian *class* culture is a fundamental goal of the Proletcult.—Ha ! Ha !—Bunk !—*Lenin*

The national problem was thereby transformed from a particular and national state of problem into a general and international problem, into a world problem of emancipating the oppressed peoples in the dependent countries and colonies from the yoke of imperialism.—*Stalin.*"

পুস্তিকার ২য় পৃষ্ঠায় "এই লেখকের অন্যান্য বই" এবং "ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের অন্যান্য পুস্তিকা"-র তালিকা আছে, এবং তার নীচে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি আছে যে, "এই বই-এর লভ্যাংশ ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রাপ্য"। পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির তালিকা আছে এবং তাতে দেখা যায় সঙ্ঘের সম্পাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে।

একটি কবিতা ('জনযুদ্ধ') বাদে সম্পূর্ণ পুস্তিকাটিই পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সাত ভাই চম্পা'-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৪৩

১১৫. মস্কো রেডিওর এক অজানা গানের সুরে (কবিতা)

'কবিতা', পৌষ ১৩৪৯। 'কোড়া' কবিতার মাঝখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে ("তবু তাঁরা বেচেছিল কভিকেনা দাসদাসী" থেকে "আশ্চর্য জীবন।" পর্যন্ত)। ক ৪।

১১৬. জঙ্গী (কবিতা)

'অরণি', ২৯ জানুয়ারি ১৯৪৩। ক ৪।

১১৭. এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতিকে (কবিতা)

'পরিচয়', ফাল্গুন ১৩৪৯। ক ৪।

১১৮. এক টিকেটহীন সহযাত্রী (কবিতা)

'পরিচয়', চৈত্র ১৩৪৯। ক ৪।

১১৯. বৈকালী (কবিতা)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৪৯।

১২০. চায়ের টেবিলে (কবিতা)

'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৫০। 'চা' নামে ক ৪ গ্রন্থে।

১২১. চালের কাতারে (কবিতা)

'অরণি', ২৩ জুলাই ১৯৪৩। সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও নির্বাচিত দুর্ভিক্ষ-বিষয়ক কবিতা-সংকলন 'আকাল'-এ গ্রন্থভুক্ত। পরে '১৯৪৩ অকাল বর্ষা' নামে ক ৪ গ্রন্থে।

১২২ এক পৌষে শীত পালায় না (কবিতা)

'অরণি', শারদীয় ১৯৪৩। ক ৪। কিন্তু 'একুশ বাইশ' কবিতা-সংকলনে শুধু মাত্র এই কবিতাটিই বর্জিত।

১২৩. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (প্রবন্ধ)

'কবিতা', কার্তিক ১৩৫০। প্র ১। সামান্য কিছু পাঠভেদ আছে।

১৯৪৪

১২৪. কেন লিখি? (প্রবন্ধ)

ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ প্রকাশিত ঐ নামেরই রচনাসংগ্রহের (সম্পাদক: হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশকাল, জানুয়ারি, ১৯৪৪) একটি প্রবন্ধ।

১২৫. পল এলুয়ারের অনুসরণে (কবিতানুবাদ)
'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৫১। ক ৪ এবং অনু. ক. ২।

১২৬. আরার্গ-র দুটি কবিতা (কবিতানুবাদ)
'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৫১। ক ৪ এবং অনু ক ২।

১২৭. আধুনিক ইংরেজি কবিতা (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', ভাদ্র ১৩৫১। John Manifold and others-এর *Trident*, David Martin সম্পাদিত *Rhyme and Reason* এবং Alan Rock-এর *There are my comrades* গ্রন্থত্রয়ের সমালোচনা।

১২৮ টি. এস্. এলিঅটের মহাপ্রস্থান (প্রবন্ধ)
'পরিচয়', কার্তিক ১৩৫১। ইংরেজি সংস্করণ ১৪০নং রচনা। বর্তমান শিরোনামে প্র ১ গ্রন্থে এবং 'এলিঅট' নামে প্র ২ গ্রন্থে।

১২৯. Put Out the Light (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', কার্তিক ১৩৫১। ফরাসী লেখক ভেরকর (Vercors) রচিত Le Silence de la Mer-এর ইংরেজি অনুবাদের সমালোচনা। দ্র. ১৫৩নং রচনা।

১৩০. এলিজাবেথান জগৎচিত্র (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', অগ্রহায়ণ ১৩৫১। Tillyard রচিত *The Elizabethan World Picture* গ্রন্থের সমালোচনা।

১৩১. Visions of Bengal (ভূমিকা-প্রবন্ধ)
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস ফেডারেশন প্রকাশিত (ডিসেম্বর ১৯৪৪-এ সর্বভারতীয় কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে) ছবির অ্যালবাম *Bengal Painters' Testimony*-র জন্য রচিত ভূমিকা। ২ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ। পুস্তকবিক্রয়ের সমস্ত টাকা দুর্ভিক্ষত্রাণ তহবিলে জমা হবে বলে ঘোষণা আছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ প্রমুখের ৩০টি আর্টপ্লেট আছে।

১৩২. Jamini Roy (প্রবন্ধগ্রন্থ ও চিত্রসংগ্রহ)
সহলেখক : John Irwin। **প্রকাশ :** ১৯৪৪। **প্রকাশক :** ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট, কলকাতা।
হাতে-তৈরি মোটা কাগজের মলাট (ভেতরের কাগজও তাই); প্রচ্ছদপটে যামিনী রায়ের একটি ছবি ও প্রকাশকসংস্থার প্রতীক-

চিহ্ন ছাপা হয়েছে। দাম লেখা নেই। পৃ ৬+২৮। প্রবন্ধের সঙ্গে মোট ২৪টি ছবি ছাপা হয়েছে। শেষাংশে, ছবির অ্যালবামে, ১৫টি শাদাকালো ও রঙিন প্লেট আছে। সূচনায় শিল্পীর একটি আলোকচিত্রও আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে স্টেলা ক্রামরিশ লিখিত ভূমিকা (২ পৃ), হেনরি মুর ও সেজান-এর উদ্ধৃতি এবং পরিশিষ্টে যামিনী রায় বিষয়ে রচনার পঞ্জি আছে।

১৯৪৫

১৩৩. দুটি বিদেশী গ্রন্থ (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', পৌষ ১৩৫১। **L. Schuking** রচিত ***The Sociology of Literary Taste*** এবং **E. M. Bates** রচিত ***Intertraffic : Studies in Translation*** গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা।

১৩৪. বের্টোল্ড্ ব্রেখ্ট্ অনুসারে (কবিতানুবাদ)

'অরণি', ৫ জানুয়ারি ১৯৪৫। ক ৪। অনু. ক ২ (সেখানে কবিতার নাম 'উপসংহার')।

১৩৫. সূর্যাস্ত (কবিতা)

'অরণি', ৫ জানুয়ারি ১৯৪৫। ক ৪ গ্রন্থের শেষ কবিতা।

১৩৬. পরিবর্তমান এই বিশ্বে (প্রবন্ধ)

'অরণি', ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৫। **J.R.M. Brumwell** সম্পাদিত ***This Changing World*** **(Routledge)** সংকলন গ্রন্থটি প্রসঙ্গে লেখা প্রবন্ধ। পাদটীকায় ঐ গ্রন্থের লেখক—যার মধ্যে মানহাইম্ ও মামফোর্ড-ও আছেন—তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে। প্র ১ ও প্র ৭ গ্রন্থে গৃহীত (সেখানে শিরোনামে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জিত) কিছু পাঠ পরিবর্তনের পর—তবে পাদটীকাটি সম্পূর্ণ বর্জিত।

১৩৭. **Navanna—A People's Play** (প্রবন্ধ)

Indo Soviet Journal**, 22. Feb. 1945**। বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র-র পরিচালনায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' নাটকাভিনয়ের আলোচনা। দ্র ৪১৪নং রচনা।

১৩৮. **Blue to Red / Subho Tagore now** (প্রবন্ধ)

অমল হোম সম্পাদিত *The Art of Subho Tagore* গ্রন্থের (প্রকাশ : ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫) একটি প্রবন্ধ।

১৩৯. বাংলা সাহিত্যে প্রগতি (প্রবন্ধ)

'অরণি', ১৬ মার্চ ১৯৪৫। প্র ১, প্র ২, প্র ৭।

১৪০. **What Krishna meant / An essay on T. S. Eliot** (প্রবন্ধ)

Orient Longmans Miscellany, no. 3, 1945। রচনাকাল : ১৯৪৩। বঙ্গীয় সংস্করণ, দ্র. ১২৮ নং রচনা।

১৪১. নির্বাহ (গল্পানুবাদ)

'অভ্যুদয়', সংখ্যা অজ্ঞাত. ১৯৪৫ (?)। বেলজিয়াম-ফ্রান্সের নাৎসি-বিরোধী প্রতিরোধের লেখক, "কুর্দিশ যুবক" হাকণ তাজিয়েফের ফরাসী গল্পের অনুবাদ। "তাজিয়েফের গল্প সেই যুদ্ধের শেষ দিকে অনুবাদ করি. আফ্রিকা থেকে নাৎসি-পলাতক ফরাসী দেশপ্রেমিকরা এক কাগজ বার করতেন. তাই বেরিয়েছিল স্বল্পায়ু 'অভ্যুদয়' পত্রে।" (সংকলককে লিখিত চিঠি)। পুনর্মুদ্রণ, 'প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা', ডিসেম্বর ১৯৭৩।

১৪২. জনসাধারণের রুচি (প্রবন্ধ)

'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৫২। প্র ১, প্র ৩, প্র ৫, প্র ৭। বিষ্ণু দে ১৯৪৩ সালে (?) মাস কয়েকের জন্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের **Statistical Laboratory, Presidency College**-এ চাকরি করেন—এ-সময়ে তাঁর কাজের ভিত্তিতেই প্রবন্ধটি রচিত হয়।

১৪৩. আইসায়ার খেদ (কবিতা)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫২। ক ৫।

১৪৪. **সাত ভাই চম্পা (কাব্যগ্রন্থ)**

'গ্রন্থটির দ্বিতীয় শিরোনাম : '২২শে জুন ও অন্যান্য কবিতা' (দ্র. ১১৪নং রচনা)। প্রথম প্রকাশ : [১৯৪৫]। রচনাকাল : [১৯৪১-৪৪]। কোনো কবিতার রচনাকালের উল্লেখ নেই। প্রকাশক : অমল বসু ; ঈগ্‌ল পাবলিশার্স ; কলকাতা।

উৎসর্গ : 'শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যকে'। মোটা কাগজের মলাট ; যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ১ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৪৪। পৃ ৪ + ৪২।

২টি কবিতা ('জনযুদ্ধ' এবং 'এক পৌষে শীত পালায় না') এবং ৭টি অনুবাদ-কবিতা (চৈনিক কবিতা ও রিলকে, সিমোনফ্, ল্যাংস্টন হিউজ, লুই আরাগঁ ও বের্টোলড্ ব্রেশ্ট্-এর কবিতা) বাদে বাকি ৩৫টি কবিতা নিয়ে গ্রন্থটি 'একুশ বাইশ' ও 'বছর পচিশ' কাব্যসংগ্রহে সন্নিবিষ্ট। তবে ক্রমের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। অনুবাদ-কবিতাগুলি অনু. ক. ২ গ্রন্থে। অন্য কবিতা দুটি আর গ্রন্থস্থ হয় নি।

১৯৪৬

১৪৫. দুটি স্কেচ (কবিতা)

'পরিচয়', পৌষ ১৩৫২। কবিতা-দুটির পুরো নাম: 'দুটি স্কেচ: নীরদ মজুমদারের জন্য ও গোপাল ঘোষের জন্য'। সাঁওতাল পরগণা-র গ্রাম রিখিয়া-র পটভূমিতে লেখা প্রথম কবিতা [পরবর্তীকালে দেখেছি রিখিয়ার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কবিতা অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে]। ক ৫।

১৪৬. পাঠকগোষ্ঠী (চিঠি)

'পরিচয়', চৈত্র ১৩৫২। রথীন্দ্র মজুমদার লিখিত 'ব৺দিনের চিত্র-প্রদর্শনী' ('পরিচয়', মাঘ ১৩৫২) রচনায় শিল্পী গোপাল ঘোষ প্রসঙ্গে লিখিত একটি মন্তব্যের ভ্রান্তিনির্দেশক চিঠি।

১৪৭. রিখিয়ায় জিষ্ণু দে (কবিতা)

'রংমশাল', শ্রাবণ ১৩৫৩। বালকপুত্রকে নিয়ে লেখা ছড়া। কোনো গ্রন্থে স্থান পায় নি।

১৪৮. এলিঅটের চণ্ডকের গান (কবিতানুবাদ)

'পরিচয়', শারদীয় ১৩৫৩। *Ash Wednesday*-র আংশিক অনুবাদ। অনু. ক. ১।

১৪৯. কঙ্কালীতলা (কবিতা)

'পরিচয়', শারদীয় ১৩৫৩। ক ৫।

১৫০. সাঁওতাল কবিতা (কবিতা)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫৩। ক ৫। ঐ শিরোনামেরই অন্তর্গত প্রথম ৩টি কবিতা।

১৫১. **The Calcutta Group** (প্রবন্ধ)

রচনাকাল : ১৯৪৬ ? ক্যালকাটা গ্রুপের জন্য ইংরেজিতে 'ইস্তেহার' ধাঁচের একটি রচনা, বিষ্ণু দে-র হাতের লেখায়, পাওয়া গেছে। কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি।

১৫২. মৌভোগ (কবিতা)

'অরণি', শারদীয় ১৩৫৩। ক ৫। খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম মৌভোগ। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ঐতিহাসিক স্থান এই মৌভোগ যেখান থেকে তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। "এর পর শুরু হয় সারা বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ৬০ লক্ষ চাষী এই সংগ্রামে অংশীদার হন। শত শত কৃষক লাঠি ও গুলির আঘাতে নিহত হন। এর পর শুরু হয় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে কৃষকরাও রুখে দাঁড়ালেন। আমাদের গ্রামের [মৌভোগ] ৬০ বছরের বৃদ্ধ এয়াছিন ফকির (অন্ধ), অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা গিরিধর মণ্ডল স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য সর্বত্র প্রচার শুরু করেন। কৃষক সভার কর্মীরাও সর্বত্র গ্রাম্য বৈঠক করে কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমন করেন, সে কারণে আমাদের অঞ্চলে কোনো দাঙ্গা হয় নি।" (সুবল মিত্র, 'মৌভোগ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি'। 'তেভাগা স্মারক রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ')। কবিতাটির পেছনে এই সব অনুষঙ্গই আছে।

১৫৩. **Caramel Doll** (অনুবাদগ্রন্থ)

সহ-অনুবাদক : প্রণতি দে। প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৪৬। প্রকাশক : ফিরোজ কে মিস্ত্রি ; কুতুব ; বোম্বাই। বোর্ড-বাঁধাই ; প্রচ্ছদপট ও ভেতরের অসংখ্য ছবি শীলা অডেন অঙ্কিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল'-এর ইংরেজি অনুবাদ। প্রারম্ভে অনুবাদকদ্বয়ের 'নোট' আছে।

[এটি এবং 'সমুদ্রের মৌন' ১৯৪৫ সালে রিখিয়াবাসকালে অনূদিত]।

১৫৪. **সমুদ্রের মৌন (অনুবাদগ্রন্থ)**

প্রকাশ : ১৯৪৬। প্রকাশক : অমল বসু ; ঈগ্‌ল পাবলিশার্স ; কলকাতা।

কাগজের পাতলা মলাট ; [নীরদ মজুমদার অঙ্কিত প্রচ্ছদ]। দাম বারো আনা। পৃ ২+৪৬।

ফরাসী লেখক ভেরকর (Vercors)-এর *Le Silence de la Mer* নামক ফ্যাসিবিরোধী গল্পের অনুবাদ—"মূল ফরাসী থেকে"। 'ফরাসী প্রতিরোধ ও সাহিত্য' এই শিরোনামে বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ ভূমিকা আছে—সেখানে বিশ্বের, বিশেষত ফ্রান্সের ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পীদের কীর্তি বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

১৫৫. Introducing Nirode Mazumdar (ভূমিকা-প্রবন্ধ)

রচনাকাল : [১৯৪৬]। The Book Emporium প্রকাশিত ও রথীন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত *Modern Art Publication, Vol. No. 2: Calcutta Group presents eight monochrome reproductions of Nirode Mazumdar's paintings* নামক পুস্তিকার ভূমিকা হিসেবে লিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ (পৃ ১-৪)। প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থে ছাপা হয় নি।

১৫৬. **রুচি ও প্রগতি (প্রবন্ধগ্রন্থ)**

প্রকাশ : [১৯৪৬]। প্রকাশক : অমল বসু ; ঈগ্‌ল পাবলিশার্স ; কলকাতা।

উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু কে'। বোর্ড-বাধাই ; প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। দাম ১ টাকা ১২ আনা। পৃ ৪+১১২। গ্রন্থারম্ভের পূর্বে Henry James, Pearse and Crocker এবং Rainer Maria Rilke-র উদ্ধৃতি আছে।

১২টি প্রবন্ধের সংকলন। সূচিপত্র নেই। প্রবন্ধের তালিকা : ১. বাংলা সাহিত্যে প্রগতি, ২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৩. টি. এস্. এলিঅটের মহাপ্রস্থান, ৪. সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, ৫. পরিবর্তমান এই বিশ্বে, ৬ সোভিয়েট শিল্পসাহিত্য, ৭. জনসাধারণের রুচি, ৮. হাল্‌কা কবিতা, ৯ গদ্য কবিতা, ১০. প্রগতিবাদী কবি, ১১. বুদ্ধিবাদী উপন্যাস, ১২. রিচার্ডসের কল্পনা। এর মধ্যে ৪টি—৬নং, ৭নং,

১০নং (মণীন্দ্র রায়ের 'একচক্ষু' গ্রন্থের সমালোচনা) ও ১২নং বাদে বাকি ৮টি প্রবন্ধই প্র২-গ্রন্থে এবং ৭ ও ১২নং প্রবন্ধ দুটি প্র৩-গ্রন্থে গৃহীত।

১৯৪৭

১৫৭. ছত্তিশগড়ী গান (কবিতানুবাদ)

'পরিচয়', মাঘ ১৩৫৩। **Verrier Elwin** সংগৃহীত ও অনূদিত ***Folk Songs of Chattisgarh***-এ (***Man in India*** পত্রিকার পক্ষে **Oxford University Press** কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৬) মুদ্রিত ৬২, ৬৫, ৬৭, ৭৬, ৮৮, ৯১, ১০০, ৪৪১, ৪৪২, ৩৮, ৩১, ৬১, ৫৪, ২৯৭নং কবিতা অবলম্বনে রচিত (অনুবাদের ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে)। মোট ১৬টি কবিতা আছে—২টি কবিতার মূল খুঁজে পাই নি। ক ৫। দ্র. ১৬৬নং রচনা।

১৫৮. উর্দিহীন শিল্পী (অনুবাদ)

'অরণি', ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা, শিল্পসমালোচক ও লেখক রজেন গারোদি-র **(Roger Garaudy)** প্রবন্ধের ***(Artist without trousers)*** অনুবাদ—মূল "ফরাসী থেকে"। পত্রিকার 'সমসাময়িক সাহিত্য' বিভাগে অনুবাদটি প্রকাশিত। সূচনায় পত্রিকা-সম্পাদকের ভূমিকা আছে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে। আগের সংখ্যায় (১৪ ফেব্রু ১৯৪৭) এ বিভাগেই 'আর্টের সমস্যা' প্রবন্ধে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শিল্পসাহিত্য বিষয়ে যে বিতর্ক উঠেছে, তার "সংক্ষিপ্তসার" দেওয়া হয়েছে—গারোদি, পিয়ের এর্‌ভে ও লুই আরাগঁ-র বক্তব্য সংক্ষেপে ছাপা হয়েছে। এই সংখ্যায় ছাপা হল গারোদি-র প্রবন্ধের বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদ।

গারোদি-র এই প্রবন্ধ ১৯৪৮ সাল নাগাদ ভারতীয় সাম্যবাদীদের মধ্যে শিল্পসংস্কৃতির আলোচনায় তুমুল ঝড় তুলেছিল। "শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপারে রাজনৈতিক ফতোয়া বা নির্দেশ কিংবা শিল্পের সৌধের সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির সমীকরণের যে সহজ ও সরল অভ্যাস মার্কসের রচনার মতোই পুরোনো তার বিরুদ্ধে গারোদি (এবং আরেকজন ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা এর্‌ভে) বলেছিলেন

শিল্পসাহিত্যের আপেক্ষিক স্বাধিকারের কথা এবং বিশেষ এক অর্থে এমনকি বলতে চেয়েছেন, কমিউনিস্ট শিল্পতত্ত্ব বলে কিছু নেই—শিল্পবিচারে কোনো পার্টিলাইন বা মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়। লুই আরাগঁ-র রচনাকে দাঁড করানো হলো এই মতের প্রবল বিরোধিতায়। গারোদি-আরাগঁ বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতটা যাই হোক, আমাদের দেশে কিন্তু আরাগঁ-র মতামত, ঐ মতের একজন বড় প্রবক্তা নীরেন্দ্রনাথ রায় সত্ত্বেও, তা শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির কালাপাহাড়ী আধিপত্য বা রুচির অদ্বৈতবাদের সমার্থক হয়ে দাঁডিয়েছিল।" ('সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৮২)। বিষ্ণু দে-ই গারোদির মতামত উপস্থিত করেছিলেন এই বিতর্কে। ১৯৫৭ সালে লেখাটির পুনর্মুদ্রণ হয়। দ্র. ২৮৪ নং রচনা।

১৫৯. লোকসংগীত (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪। **Verrier Elwin** এর *Folk Songs of Chattisgarh* , **Norman Cohn**-এর *Gold Khan* ; **Debendra Satyarathi**-র *Meet my people* ; **D. N. Majumdar**-এর *Snowball of Garhwall*—এই চারটি গ্রন্থের সমালোচনা। প্র২।

১৬০. সমুদ্র-স্বাধীন (কবিতা)

'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৫৪। ক৫।

১৬১. কয়েকটি কবিতা : রাইনের মারিয়া রিলকে (কবিতানুবাদ)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫৪। মোট ৫টি কবিতার অনুবাদ : 'নিঃসঙ্গ', 'হৃদয়ের পর্বতে পর্বতে', 'বিশ্ব ছিল', 'পরিবর্তনীয়তা', 'তবু বারম্বার'। শেষ ৪টি অনু. ক২ গ্রন্থে। কিন্তু প্রথমটির হদিশ পাই নি। ['কবিতা' পত্রিকায় এর পরেই বুদ্ধদেব বসু-র রিলকে-অনুবাদ সংলগ্নভাবে ছাপা হয়েছে।]

১৬২. গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা (প্রবন্ধ)

'পরিচয়', শারদীয় ১৩৫৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র উপন্যাস ও গল্প প্রসঙ্গে আলোচনা (প্রধানত শেষোক্ত লেখকের রচনার সূত্রেই আলোচনার অবতারণা)।

১৬৩. গান্ধীজির জন্মদিনে (কবিতা)

'অরণি', ৩ অক্টোবর ১৯৪৭। ক ৮।

১৬৪. জওহরলাল নেহরু (কবিতা)
'অরণি', ১৭ অক্টোবর ১৯৪৭।

১৬৫. Our Folk Songs (প্রবন্ধ)
Folk Songs of Chattisgarh-এর সমালোচনা। ১৫৯নং রচনার ইংরেজি সংস্করণ। কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয় জানা নেই। প্র ৬। সেখানে রচনাকাল দেওয়া আছে : ১৯৪৭।

১৬৬. Folk Art of Bengal (প্রবন্ধ)
সহলেখক : John Irwin। *Marg*, Vol 1, no. 4 [১৯৪৭ ?]। অসংখ্য চিত্রসংবলিত।

১৬৭. সন্দ্বীপের চর (কাব্যগ্রন্থ)
প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৪ ব (১৯৪৭)। রচনাকাল : [১৯৪৪-৪৭]। কোনো কবিতার রচনাকালের উল্লেখ নেই। প্রকাশক : চিন্মোহন সেহানবীশ, দি বুক ম্যান ; কলকাতা।
উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে'। মোটা কাগজের মলাট, রথীন মৈত্র অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ২ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৩৫। পৃ ৬+৯২। ৫টি কবিতা ('সাঁওতালী কবিতা', 'ছত্তিশগড়ী গান' ও 'উরাওঁ গান' এবং অন্য ২টি অনুবাদ-কবিতা) বাদে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি 'একুশ বাইশ' এবং পরে 'বছর পঁচিশ' কাব্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪৮

১৬৮. "শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প" (চিঠি)
'পরিচয়', পৌষ ১৩৫৪। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নীহার দাশগুপ্ত 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প' প্রবন্ধে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র মন্তব্যের (১৬২নং রচনা) তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন। তারই উত্তরে এই চিঠি 'পাঠকগোষ্ঠী'-তে প্রকাশিত হয়। ['পরিচয়'-এর এই সংখ্যাতেই বেরিয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'হাসুঁলিবাঁকের উপকথা' প্রসঙ্গে হিরণকুমার সান্যালের সমালোচনা—যেখানে বিষ্ণু দে-র মতে "ঘোর অবজ্ঞা প্রদর্শন" ও "সাহিত্যিকসৃষ্টিবিরোধী গোঁড়ামি"র প্রকাশ ঘটেছে। মাঘ-

সংখ্যায় নীহার দাশগুপ্ত ও অনিল সিংহ বিষ্ণু দে-র বর্তমান চিঠিটি প্রসঙ্গে খুবই তিক্ত জবাব দেন। ফাল্গুন-সংখ্যায় বেরোয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী চিঠি (দ্র. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লেখকের কথা')। ইতিমধ্যে, এইসব ঘটনা ও মতামতের প্রতিক্রিয়ায়, বিষ্ণু দে "অবজ্ঞামূলক মনোভাব ও উগ্র মতবাদের উদ্ধত যান্ত্রিকতায় সাহিত্যে প্রগতির এবং প্রগতি-সাহিত্যেরও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা"র কথা বলে পরিচালক-মণ্ডলী থেকে পদত্যাগের ইচ্ছায় চিঠি দেন। চিঠিটি ছাপা হয় নি। কিন্তু ফাল্গুন সংখ্যা থেকেই দেখা যাচ্ছে বিষ্ণু দে-র নাম পরিচালক-মণ্ডলীতে নেই। এর পর দীর্ঘকাল বিষ্ণু দে 'পরিচয়'-এ লেখেননি।

১৬৯. আশ্বিন (কবিতা)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৫৪। 'আশ্বিনে' নামে ক ৭ গ্রন্থে।

১৭০. রাইনের মারিয়া রিলকে-র কয়েকটি কবিতা (কবিতানুবাদ)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৫৪। মোট ৩টি কবিতার অনুবাদ: 'শরৎ', 'কবির উদ্দেশে মেয়েদের গান', 'মেয়েরা'। অনু. ক ২। তবে সেখানে দ্বিতীয় কবিতাটির শিরোনাম 'কবির উদ্দেশে নারী'।

১৭১. টি. এস এলিঅট-এর কয়েকটি কবিতা (কবিতানুবাদ)।

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৫৫। কবিতার সূচি: 'নিসর্গদৃশ্য' ১-৫, 'কোরিওলান' ২, 'বর্ণট্ নর্টন' ১-৪। অনু. ক ১।

১৭২. রামধনু / (বুড়োর জন্যে) (কবিতা)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৫৫। ক ৬। সেখানে উৎসর্গ-শিরোনাম বর্জিত।

১৭৩. An Acre of Green Grass (পুস্তক সমালোচনা)

'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৫ [১ বর্ষ ১ সংখ্যা]। বুদ্ধদেব বসু রচিত ঐ নামের ইংরেজি গ্রন্থটির (১৯৪৮) সমালোচনা। পরে 'রাস্তায় রাস্তায়' নামে প্র ২ গ্রন্থে।

["সাহিত্যপত্র-এর জন্মকালে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে যখন মার্কসবাদী মহলে বা বলা ভালো ভারতীয় সাম্যবাদী দলের মধ্যে শিল্পসাহিত্য বিষয়ে কখনো এক ধরনের সংকীর্ণতা, কখনো বা সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য এতদূর ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে সরকারী সাম্যবাদী

সাহিত্য পত্রিকাতে সাহিত্যের চেয়ে রাজনীতি বেশি সমাদর পেত, সহযোগী পত্রিকাগুলিও রাজনৈতিক রচনায় সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকত—সাহিত্যও স্থান পেত নিশ্চয়ই, কিন্তু সেখানেও প্রকাশ হয়ে পড়ত অনুদার মনোভাব।…

…"সাহিত্যপত্র-এর ১ম সংখ্যায় পুস্তক-সমালোচনা রূপে বিষ্ণু দে-র যে প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল, পরে যেটি 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে 'রাস্তায় রাস্তায়' নামে মুদ্রিত হয়েছে, সেটিকে এক হিসেবে 'সাহিত্যপত্র'-এর ইশ্‌তেহার…রূপে গণ্য করা যেতে পারে। কেননা শিল্পসাহিত্যের জগতে দুই বিপদ সম্পর্কেই সেখানে রয়েছে সচেতনতা—ডানের বিপদ এবং বাঁয়ের বিপদ—শুদ্ধ সাহিত্যের প্রবক্তা বুদ্ধদেব বসু-র 'অ্যান একর অফ গ্রীন গ্রাস' এবং সে সময়ের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের মতবাদের উগ্রতা দুইই তাঁর সমালোচ্য।" (অরুণ সেন, 'সাহিত্যপত্র এর ২৬ বছর'। 'সাহিত্যপত্র', গ্রীষ্ম সংকলন ১৩৮২)]।

১৭৪. টি. এস. এলিঅট (প্রবন্ধ)

'সাহিত্যপত্র', কার্তিক ১৩৫৫। ১৭৯নং রচনার বঙ্গীয় সংস্করণ—'টি. এস. এলিঅটের কবিতা' গ্রন্থের ১ম সংস্করণে ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে এলিঅটের দুটি কবিতার অনুবাদও আছে—'রাজর্ষিদের যাত্রা' ও 'জরায়ণ'।

১৭৫. অবনীন্দ্রনাথ ও বাঙলা শিল্পে নবজাগরণ (প্রবন্ধ)

'সাহিত্যপত্র', কার্তিক ১৩৫৫। 'অবনীন্দ্রনাথ' নামে প্র ২ গ্রন্থে।

১৭৬. **Abanindranath and Modern Art** (প্রবন্ধ)

প্রথম প্রকাশের স্থান ও কাল জানা নেই। রচনাকাল: ১৯৪৮। প্র ৬। ১৭৫নং রচনার সঙ্গে বহু জায়গায় মিল।

১৭৭. এলোরা (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', কার্তিক ১৩৫৫। ক ৬।

১৭৮. **Jamini Roy : The Great Artist** (প্রবন্ধ)

প্রথম প্রকাশের স্থান ও কাল জানা নেই। রচনাকাল: ১৯৪৮। প্র ৬।

১৭৯. **Mr. Eliot among the Arjunas** (প্রবন্ধ)

এলিঅটের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে *Poetry London* প্রকাশিত এবং Tambimutta ও Richard March সম্পাদিত *T. S. Eliot/ A Symposium* গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ। প্র ৬ গ্রন্থে *Homage to T. S. Eliot* প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে সম্পূর্ণ রচনাটি উদ্ধৃত হয়েছে। ১৭৪নং রচনাটি এরই বঙ্গীয় সংস্করণ।

১৯৪৯

১৮০. বহুবচন (কবিতা)

'কবিতা', পৌষ ১৩৫৫। ক ৭।

১৮১. **A Pablo Picasso** (পুস্তক সমালোচনা)

'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৫। ফরাসী কবি **Paul Eluard** রচিত এই নামের গ্রন্থের সমালোচনা ও অংশবিশেষের অনুবাদ। 'পিকাসো' নামে প্র ২ গ্রন্থে।

১৮২. **The Visvabharati Quarterly** (পুস্তক সমালোচনা)

'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৫। ক্ষিতীশ রায় সম্পাদিত পত্রিকার Education Number-এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—বিশ্বতোষ দত্ত ছদ্মনামে।

১৮৩. শিল্পপ্রদর্শনী (প্রবন্ধ)

'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৫। 'ক্যালকাটা গ্রুপ' নামে প্র ২ গ্রন্থে।

১৮৪. **Bengali Literature** (প্রবন্ধ)*

***The People*, 10 April 1949.**

১৮৫. **শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব** (কবিতা)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৫৫। ক ৬।

১৮৬. **Notes on Art in Bengal** (প্রবন্ধ)

The People*, 1 may 1949. *The Arts and Entertainment বিভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধ। পরবর্তী ৩টি প্রবন্ধও তাই। এই প্রবন্ধের তলায় লেখা আছে: **"Based on broadcast talks from the Calcutta Radio Station"**।

১৮৭. The Poetry of Louis Aragon (প্রবন্ধ)
The People, 8 May 1947 । প্র ৬। পরিবর্তিত বাংলা সংস্করণ, 'একটি কবির বিকাশের ধারা : আরাগঁ'। দ্র. ১৯৭নং রচনা।

১৮৮. Art of Jamini Roy (প্রবন্ধ)
The People, 15 May 1949। ১৮৬ ও ১৮৮নং রচনার বহু অংশই বিষ্ণু দে-র বিভিন্ন বাংলা প্রবন্ধে ব্যবহৃত।

১৮৯ The Calcutta Group (প্রবন্ধ)
The People, 22 May 1949। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের সম্পর্কে দীর্ঘতর রচনা।

১৯০. র‍্যাবোর কবিতা (কবিতানুবাদ)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৫৬। ফরাসী কবি Arthur Rimbaud-র ৫টি কবিতার অনুবাদ। অনু ক. ২ (শিরোনাম ও পাঠের পরিবর্তন সহ)।

১৯১. এলুয়ার (কবিতানুবাদ)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৫৬। ফরাসী কবি Paul Eluard-এর ৮টি কবিতার অনুবাদ। অনু. ক. ২ (শিরোনাম ও পাঠের পরিবর্তন সহ)।

১৯২. বাংলা সাহিত্যের ধারা (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৫৬। Verrier Elwin-এর *The Muria and their Ghotul*, W. G. Archer-এর *The Dove and the Leopard* এবং J. C. Ghosh-এর *Bengali Literature*—গ্রন্থ তিনটির সূত্রে রচিত প্রবন্ধ। প্র ২।

১৯৩. অবিচ্ছিন্ন কাব্য / পল এলুয়ারের জন্য (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৫৬। প্রসাদ রায়চৌধুরী ছদ্মনামে লিখিত। ক ৬।

১৯৪. এলসিনোরে (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৬। ক ৬।

১৯৫. ইংরেজি কবিতা (কবিতানুবাদ)
'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৬। ব্লেক, ইয়েটস ও এলিঅটের কবিতার অনুবাদ। অনু. ক ১ ও অনু. ক ২।

১৯৬ A Literary Despatch from India (প্রবন্ধ)

New Values, September 1949। দ্র ২৮১নং রচনা।

১৯৫০

১৯৭. একটি কবির বিকাশের ধারা : আবার্গ (প্রবন্ধ)

'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৬। 'আবার্গ' নামে প্র ২ গ্রন্থে। দ্র. ১৮৭নং রচনা।

১৯৮. বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ (পুস্তক সমালোচনা)

'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৬। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ নামের গ্রন্থের সমালোচনা।

১৯৯. অন্বিষ্ট (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৬ ও শ্রাবণ ১৩৫৭। ধারাবাহিকভাবে বেরোয় এই দীর্ঘ কবিতাটি—প্রথম দুই অংশ মাঘ-সংখ্যায় এবং শেষ দুই অংশ শ্রাবণ-সংখ্যায়।

মাঘ-সংখ্যায় কবিতা-শুরুর আগে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি আছে :

"An auxiliar light
Came from my mind, which on the setting sun
Bestowed new Splendour...
Extrinsic differences, the outward marks
Whereby society has parted man
From men, neglect the universal heart."

—*The Prelude.*

"Hence man also creates according to the laws of beauty." Marx-Engels Gesamstausgabe.

ক ৬। সেখানে উদ্ধৃতিটি বর্জিত।

২০০. পঞ্চবটী / 'যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা'—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (কবিতা)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৫৬। ক ৬। সেখানে শিরোনামের উদ্ধৃতি বর্জিত।

২০১. জল দাও (কবিতা)

'কবিতা', বৈশাখ ১৩৫৭। ক ৬।

'অস্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে রচনাকাল ছিল না, 'একুশ বাইশ' সংকলন-গ্রন্থে এর রচনাকাল দেওয়া আছে ১৯৪৬ এবং 'বছর পঁচিশ' গ্রন্থে ১৯৪৭। কবি নিজে বলেছেন, কবিতাটি লেখা শুরু হল ১৯৪৬-এর ১৪-১৫ অগাস্টের দাঙ্গার সময়ই। দুটি ঘটনা এ-প্রসঙ্গে তিনি অনেকবার উল্লেখ করেছেন :

১. "ছাদের ওপর টবে অসংখ্য বেলফুল ফুটেছিল (প্রিয়ফুল)।" "ছাদে পুত্রের সযত্নলালিত বেলফুল।" ('দৈনিক কবিতা', শরৎ ১৯৬৯)।

২. ' Beside my hou·e was a deserted cemetary. Three 'servants of gods' (Pathans), all tall and lofty like Badshah Khan (the Frontier Gandhi) appeared there with Congress banners in their folded hands in an appealing gesture. Two of them were killed near our house. Despite that, the third Pathan unperturbed still came forward with his flag of peace with folded hands. On the other hand, the excitement of some two hundred people, vain cries from a few of us, a hurl of brickbats. Wounded, the Pathan leaped into a pool nearby and tried his best to hold up the flag. But the assault went on unabated. At last he jumped out helplessly when a youth rushed out at him with a thin pipe containing a sword, Pehaps the Pathan's liver was torn in a flash. The prostrate, helpless, half-dead man was carried by Nirode Mazumdar (the painter) and the writer to the nearest Congress branch office to offer him first aid ; the mob became furious, almost frenzied. I remember a milkman instantaneously hit me with his bamboo stick which missed the dying man and hit my shoulders. We understood the extent of the blood intoxication when the Congress party office shut its door on us. Ashamed, we returned

home. When taking off the shirt before bathing, I found that I simply could not raise my left hand. My wife asked : what had happened ? The first movement of the poem *Water My Roots* started crystallizing immediately after this. The manuscript possibly was completed in the summer of 1947, during scattered, isolated events of riotings raging elsewhere."
(*Poet's note. South Asian Digest of Regional Writing*, Vol 2, 1973, University of Heidelberg)

কবির মতে, কবিতাটি দানা বাঁধতে শুরু করে ১৯৪৬-এর ১৪-১৫ আগস্টে এবং শেষ হয় ১৯৪৭-এর গ্রীষ্মে। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় ধরে লেখা হয়েছে কবিতাটি। কারো কারো মতে, আভ্যন্তরীণ বিচারে, কবিতাটি ১৯৪৬-এ শুরু হলেও শেষ হয়েছে আরো পরে। কারণ, তাঁদের মতে, কবিতাটির পটভূমিতে আছে **"the growing problem of homeless refugees from East Pakistan,...the recurrent misdeeds and blunders of the ruling power and administration and also apprehending the futility of some adventurist excesses of the Indian Communist movement in 1948-49."**

(Asok Sen, *Bishnu Dey. Poet of Human Fulfilment. Indian Literature*, Vol IX, no. 3, 1966).

২০২. কয়েকটি ফরাসী কবিতা (কবিতানুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৫৭। বদলেয়র, মালার্মে, আপলিনেয়র, আরাগঁ—এই কজন কবির মোট ১৫টি কবিতার অনুবাদ। অনু ক. ২।

২০৩. [মাও ৎসে তুঙের কবিতা] (কবিতানুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৭। নবযুগ আচার্য এই সংখ্যায় ***The White Pony / An Anthology of Chinese Poetry*** গ্রন্থের যে সমালোচনা লেখেন, তাতে মাও ৎসে তুঙের কবিতার উদ্ধৃতি আছে—সেই উদ্ধৃতিগুলির অনুবাদক যে বিষ্ণু দে পাদটীকায় তার উল্লেখ আছে।

২০৪. **নৃত্য (পুস্তক সমালোচনা)**

'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৭। প্রতিমা দেবীর ঐ নামের গ্রন্থের সমালোচনা।

২০৫. **সম্পাদকীয় মন্তব্য (প্রবন্ধ)**

'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৭। 'বী' ছদ্মনামে রচিত। প্রথম অনুচ্ছেদটি বাদে বাকি অংশ 'বীরবল থেকে পরশুরাম' নামে প্র২-গ্রন্থে গৃহীত।

২০৬. **অন্বিষ্ট (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫০। রচনাকাল : [১৯৪৬/৪৭-৪৯]। কোনো কবিতার রচনাকালের উল্লেখ নেই। প্রকাশক : নবযুগ আচার্য ; কলকাতা ১৯ (প্রাপ্তিস্থান : ডি. এম. লাইব্রেরী)।

উৎসর্গপত্র নেই। কাগজের মলাট ; প্রাণকৃষ্ণ পাল অঙ্কিত প্রচ্ছদ (দু-রকম ছাপা হয়েছে—কিছু বইতে হলদে কভার-পেপারের ওপর ইণ্ডিয়ান রেডে এবং কিছু বইতে ভিন্ন ধরনের হলদে রঙের ওপর গাঢ় সবুজে)। দাম আড়াই টাকা। কবিতার সংখ্যা ১৫। পৃ ৬+৭০। "কয়েকটি ভ্রম সংশোধন" শিরোনামে একটি আলগা চিরকুট গ্রন্থের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

গ্রন্থটি 'একুশ বাইশ' ও 'বছর পঁচিশ' কাব্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ (যদিও "প্রথম প্রকাশ : বি সংস্করণ" বলে উল্লিখিত হয়েছে) : ১৩৮৩। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী ; কলকাতা ৯। বোর্ড-বাঁধাই ; প্রচ্ছদপট. কবিতার সংখ্যা অপরিবর্তিত। পৃ ৪+৭২ (পৃষ্ঠানির্দেশে ভুল আছে)।

২০৭. বারোমাস্যা (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', কার্তিক ১৩৫৭ ও মাঘ ১৩৫৭। ধারাবাহিকভাবে বেরোয়। ক৭।

১৯৫১

২০৮. সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব (প্রবন্ধ)

'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৭। অস্বাক্ষরিত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির সঙ্গে

"পুডভকিন ও চেরকাসভের দুটি প্রকাশ্য ভাষণ"-এর অনুবাদ পাঠকদের "উপহার" দেওয়া হয়েছে।

২০৯. থ্রী মেন্ এ্যাণ্ড এ ডগ (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৭। অশোক গুপ্ত ছদ্মনামে লিখিত কবিতাটি পরে 'টাইরেসিয়স' নামে ক৭ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

২১০. ক্লান্তি নেই (কবিতা)
'কবিতা', চৈত্র ১৩৫৭। ক৭।

২১১. পাবলো নেরুদা : কয়েকটি কবিতা (প্রবন্ধ ও কবিতানুবাদ)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৫৮। স্পেনীয় কবি Pablo Neruda-র ৭টি কবিতার অনুবাদ এবং তাঁর সম্পর্কে ভূমিকা। অনুবাদগুলি আছে ক২ গ্রন্থে। ভূমিকা কোনো গ্রন্থে ছাপা হয় নি।

২১২. প্রচ্ছন্ন স্বদেশ (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৫৮। ক৭।

২১৩. জ্যৈষ্ঠের ট্রিয়োলেটগুচ্ছ (কবিতা)
'কবিতা', আষাঢ় ১৩৫৮। ক৭। সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

২১৪. যামিনী রায়ের শিল্পসংগ্রাম (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৮। পরে 'যামিনী রায়' নামে প্র২ গ্রন্থে। বহু অংশ ১৮৮নং রচনার বঙ্গীয় সংস্করণ।

২১৫. Bronzes of West Africa (পুস্তক সমালোচনা)
'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৮। Leon Underwood রচিত ঐ নামের গ্রন্থের সমালোচনা।

২১৬ শিল্পধারা (ভূমিকা-প্রবন্ধ)
ক্যালকাটা বুক ক্লাব পরিবেশিত ও অধ্যাপক প্রভাতকুমার দত্ত লিখিত 'শিল্পধারা / নতুন দৃষ্টিতে শিল্পবিচার' গ্রন্থের ছোট ভূমিকা (শ্রাবণ ১৩৫৮)।

২১৭. শান্তি, রুশ সওগাত (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৮। 'আত্মীয় সওগাত' নামে ক৭ গ্রন্থে।

২১৮. **Jamini Roy** (প্রবন্ধ)
India Today, October 1951।

১৯৫২

২১৯. [পাস্‌টেরনাকের কবিতা] (কবিতানুবাদ)
'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৮। রুশ কবি Boris Pasternak-এর দুটি কবিতার অনুবাদ। অনু. ক ২।

২২০. [রুশ ও স্পেনীয় কবিতা] (কবিতানুবাদ)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৫৯। রুশ কবি নিকোলাই টিখোনভ ও কনস্টান্টিন সিমোনভ এবং স্পেনীয় কবি য়াথিন্‌তো ফোম্বোনা-পাচানো-র মোট ৫টি কবিতার অনুবাদ। 'আমাদের গান' (যাতে প্রতি স্তবকের শেষে ধুয়ো আছে: "স্টালিনের অমর বাণী" ইত্যাদি) বাদে বাকিগুলো অনু. ক ২ গ্রন্থে।

২২১. সম্পাদকীয় মন্তব্য (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৫৯। অস্বাক্ষরিত। আলোচিত বিষয়: আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, সোভিয়েট চিত্রকলা প্রদর্শনী, নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলন।

২২২. সোভিয়েট শিল্প (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৯। অস্বাক্ষরিত। 'সাহিত্যপত্র-এর সম্পাদকীয়। অংশবিশেষ 'সোভিয়েট শিল্পপ্রদর্শনী' নামে প্র২ গ্রন্থে।

২২৩. রথযাত্রা ঈদ মুবারকে (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', ভাদ্র ১৩৫৯। ক ৭।

২২৪. গীওম আপলিনেয়র (কবিতানুবাদ)
'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫৯। ফরাসী কবি **Guillaume Apollinaire**-এর ৩টি কবিতার অনুবাদ: 'জাফরান', 'পীড়িত হেমন্ত', 'সর্বদাই'। অনু. ক ২।

২২৫. **সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধগ্রন্থ)**
প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৫৯ (১৯৫২)। প্রকাশক: দিলীপকুমার গুপ্ত; সিগনেট প্রেস; কলকাতা। উৎসর্গ: শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে'।
["সুতরাং ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির উৎকর্ষ বাদ দিয়েও বলতে পারি যে উৎসর্গপত্রে আমার নাম লিখে আমার প্রতি অনুচিত

সম্মান দেখিয়েছেন।—সেজন্যে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ, এবং হীরেন যখন মার্ক্সবাদী, তখন আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামের যোগে তিনিও নিশ্চয় উপাদেয় ডায়ালেক্‌টিকের আস্বাদ পাবেন।" বিষ্ণু দে-কে লেখা সুধীন্দ্রনাথের চিঠি। দ্র অরুণ সেন, 'এই মৈত্রী! এই মনান্তর।' আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃ ৭৮-৯।]

বোর্ড বাঁধাই: সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম দু টাকা। পৃ ৮+১১৮।

১৮টি প্রবন্ধের সংকলন। পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'রুচি ও প্রগতি'-র (১৯৪৬) ৪টি প্রবন্ধ বাদে বাকি ৮টি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। অতিরিক্ত প্রবন্ধ সংযোজিত:

১. অবনীন্দ্রনাথ ২. যামিনী রায় ৩. বাংলা সাহিত্যের ধারা ৪. বীরবল থেকে পরশুরাম ৫. রাজায় রাজায় ৬. আরাগঁ ৭. পিকাসো ৮. ক্যালকাটা গ্রুপ ৯. সোভিয়েট শিল্পপ্রদর্শনী ১০. লোকসঙ্গীত। 'রুচি ও প্রগতি'-র 'টি. এস. এলিঅটের মহাপ্রস্থান' এখানে 'এলিঅট' শিরোনামে ছাপা হয়েছে।

অনেক কাল পরে সমগ্র গ্রন্থটি একটু ভিন্ন সজ্জায় ও পরিবর্ধিত ভাবে ছাপা হয়েছে 'জনসাধারণের রুচি' নামে (১৯৭৫)।

২২৬. কালের রাখাল শিশু: ২১শে ডিসেম্বর (কবিতা)

'পরিচয়', শারদীয় ১৩৫৯। ক ৭।

[দীর্ঘদিন পরে 'পরিচয়'-এ লিখলেন—দিউগাশভিলি বা স্তালিনকে নিয়ে কবিতা]।

১৯৫৩

২২৭. অনুবাদগুচ্ছ (কবিতানুবাদ)

'কবিতা', পৌষ ১৩৫৯। শেক্‌সপীয়র: সনেট ১৫, ৪৪, ৫৫, ৭৩, ১৩০ এবং স্পেন্‌সর: আমোরেত্তি ৭৫—এই মোট ৬টি কবিতার অনুবাদ। অনু. ক ২।

২২৮. [তিনটি বই] (পুস্তক সমালোচনা)

'সাহিত্যপত্র', পৌষ ১৩৫৯। **Verrier Elwin** এর ***Tribal Art of Middle India***, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-র 'পূজাপার্বণ'

এবং চিন্তাহরণ চক্রবর্তী-র 'বাংলার পালপার্বণ'—এই তিনটি গ্রন্থ সম্পর্কে ছোট সমালোচনা।

২২৯. এলুয়ার (প্রবন্ধ ও কবিতানুবাদ)

'অগ্রণী', মাঘ ১৩৫৯। ফরাসী কবি **Paul Eluard** সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-প্রবন্ধ এবং ২২টি কবিতার অনুবাদ। এর মধ্যে কোনো-কোনোটি পূর্বেই ছাপা হয় (১৯১নং রচনা)। অনু. ক ২। প্রবন্ধটি গ্রন্থস্থ হয় নি।

২৩০. যমও নেয় না (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৯। ক ৭।

২৩১. স্লাভা স্তালিনু (প্রবন্ধ ও কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', ফাল্গুন ১৩৫৯। অস্বাক্ষরিত। জোসেফ স্তালিনের মৃত্যুতে দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী শোকজ্ঞাপক গদ্যরচনা এবং সঙ্গে একটি কবিতা ("অথচ সূর্য সূর্য অস্ত যায়") গদ্যরচনাটি বা কবিতাটি কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি।

২৩২ আলেখ্য (কবিতা)

'কবিতা', চৈত্র ১৩৫৯। ক ৮। ঐ গ্রন্থের 'আলেখ্য' নামক দীর্ঘ কবিতার ১ম ও ২য় অংশ।

২৩৩. নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০। ক ৭।

২৩৪. আলেখ্য (কবিতা)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৬০। ক ৮। 'আলেখ্য' নামক দীর্ঘ কবিতার ৩য় অংশ।

২৩৫. **এলিয়টের কবিতা (অনুবাদগ্রন্থ)**

প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৬০। প্রকাশক: দিলীপকুমার গুপ্ত · সিগনেট প্রেস।

উৎসর্গ: 'শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ কে'। বোর্ড-বাঁধাই; সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম দু টাকা। টি. এস. এলিঅটের ১৮টি কবিতার অনুবাদ। সঙ্গে দীর্ঘ ভূমিকা আছে।

২য় সংস্করণ: মাঘ ১৩৬৬ (১৯৬০)। কবিতার সংখ্যা ২২। পৃ ১২+৫০। "এলিঅটের কবিতার দ্বিতীয় সংস্করণে চারটি কবিতার নতুন যোজনা হল, তার মধ্যে একটির মূল হয়তো সকলের পরিচিত

নাও থাকতে পারে। / প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি এবার বাদ দিয়েছি, কারণ সেটি লেখা হয়েছিল শ্রীযুক্ত এলিয়টের ষাট জন্মদিনের উপলক্ষ্যে। সম্প্রতি তাঁর সত্তর জন্মদিন পালিত হয়ে গেছে। তা ছাড়া সেই ভূমিকাটি লেখকের 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' নামক প্রবন্ধপুস্তকে সন্নিবিষ্ট।" (২য় সংস্করণের মুখবন্ধ)। ভূমিকাটি পরে প্র ৭-গ্রন্থেও গৃহীত।

৩য় সংস্করণ: ভাদ্র ১৩৭৬ (১৯৬৯)। কবিতার সংখ্যা ২৩। পৃ ১২+৬০। সংযোজিত কবিতাটির নাম: 'আমার স্ত্রীকে উৎসর্গ-পত্র'। শেষাংশে একটি প্রবন্ধও সংযোজিত হয়েছে: 'শেষ কথা' (এলিঅটের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত। রচনাকাল: জানুয়ারি ১৯৬৫)।

২৩৬. ২৫শে বৈশাখ (কবিতা)

'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৬০। ক ৭।

২৩৭. শেক্‌সপীয়রের কল্পপ্রতিমা ও ছন্দ (অনুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', আষাঢ় ১৩৬০। "সোভিয়েট য়ুনিয়নে শেক্‌সপীয়র" পর্যায়ে বরিস পাস্টেরনাক-রচিত প্রবন্ধের অনুবাদ। [এই সংখ্যাতেই মিখাইল মরজভ্‌ রচিত 'কিং লিয়র-এর ভূমিকা'-র অনুবাদ করেছেন ইনা দে। এই দুটি অনুবাদেরই পরিচিতি হিসেবে বিষ্ণু দে রচিত একটি দেড়পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাও আছে]।

২৩৮. প্রমথ চৌধুরী (পুস্তকসমালোচনা)

'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬০। প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)' গ্রন্থের সমালোচনা। সমালোচনাটি পরে প্রবন্ধাকারে 'ক্রান্তি' পত্রিকায় (?) বেরোয়। 'প্রমথ চৌধুরী ও আমরা' নামে প্র৩ ও প্র৫ গ্রন্থে স্থান পায়।

২৩৯. **নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৬০। রচনাকাল: [১৯৪৬-৫৩]। কোনো কবিতার রচনাকালের উল্লেখ নেই। প্রকাশক: দিলীপকুমার গুপ্ত; সিগনেট প্রেস; কলকাতা।

উৎসর্গ: 'জন অরউইন, মার্টিন কর্কম্যান, পার্সি ও এপ্রিল মার্শালকে (২২শে জুন ১৯৫৩)'। বোর্ড-বাঁধাই; সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত

প্রচ্ছদ। দাম ৩ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৪১। পৃ ১২+১১৮।
২য় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৬। অপরিবর্তিত।
৪র্থ সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৭৯ (১৯৭২)। অপরিবর্তিত। দাম ৫ টাকা।

২৪০. আলেখ্য ৫ (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', কার্তিক ১৩৬০। ক৮।

১৯৫৪

২৪১. যামিনী রায়ের এক ছবি / (পটলের জন্য) (কবিতা)
'কবিতা', পৌষ ১৩৬০। ক৮।

২৪২. কোণার্ক (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৬১। ক৮। ঐ নামের কবিতার তৃতীয়াংশ।

২৪৩. কতো না ভুল (কবিতা)
'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৬১। 'একটি প্রেমের পাঁচটি কবিতা'-র চতুর্থাংশ। ক৮।

২৪৪. লাগুন (কবিতা)
'অগ্রণী', ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬১। বেশ কিছু পরিবর্তনের পর 'ঐ মহাসমুদ্রের' নামে ক৮ গ্রন্থে।

২৪৫. রাগমালা (কবিতা)
'পরিচয়', শারদীয় ১৩৬১। ঐ নামের দীর্ঘ কবিতার দ্বিতীয়াংশ। ক ৮।

২৪৬. **The Future of our Folk Art** (প্রবন্ধ)
***The Statesman,* Republic Day Supplement, 1954.**
১৯৫৪ সালে সাধারণতন্ত্র দিবসের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে প্রবন্ধটি লিখিত হয় এবং পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। পরে প্র ৬ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। প্র ৩ ও প্র ৫ গ্রন্থে প্রকাশিত 'লোকশিল্প ও বাবু সমাজ' ঐ প্রবন্ধেরই বঙ্গীয় সংস্করণ।

১৯৫৫

২৪৭. রবর্ট ব্রাউনিং (কবিতানুবাদ)
'অগ্রণী', ফাল্গুন ১৩৬১। ইংরেজ কবি **Robert Browning** এর

৩টি কবিতার অনুবাদ—'নষ্ট নেতা', 'রাত্রে মিলন', 'সকালে বিদায়'। অনু. ক ২।

২৪৮. [Prof. Kosambi-র প্রবন্ধ সম্পর্কে] (চিঠি)
রচনাকাল : ১৯৫৫ (?)। *Iscus Journal*-এ (জানুয়ারি সংখ্যায় ?) ভারত-ইতিহাস বিষয়ে Prof. D. D. Kosambi-র একটি প্রবন্ধ বেরোয় ("His article on the stages of Indian History") ঐ প্রবন্ধটি সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা বিষ্ণু দে-র একটি দীর্ঘ চিঠির পাণ্ডুলিপি দেখেছি—পত্রিকার সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রাকার প্রবন্ধ। কিন্তু ঐ লেখার মুদ্রণের কোনো সংবাদ জানা নেই। 'আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড' এরই বঙ্গীয় সংস্করণ। দ্র. ২৪৯নং রচনা।

২৪৯. আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', মাঘ-চৈত্র ১৩৬১। ডি ডি কোশাম্বী-র ভারতেতিহাস-বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্বের সমালোচনা। প্র ৩, প্র ৫।

২৫০. হেমন্ত (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', মাঘ-চৈত্র ১৩৬১। ক ৮।

২৫১. এজরা পাউণ্ড-এর কবিতা (কবিতানুবাদ)
'কবিতা', চৈত্র ১৩৬১। মার্কিন কবি Ezra Pound-এর ১৪টি কবিতার অনুবাদ। অনু. ক ২।

২৫২. নরকে এক ঋতু : র‍্যাঁবো (পুস্তক সমালোচনা)
'কবিতা', চৈত্র ১৩৬১। লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত গ্রন্থের সমালোচনা। গ্রন্থস্থ হয় নি।

২৫৩. চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ)
'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৬২। প্র ৩, প্র ৫।

২৫৪. বহুরূপী (কবিতা)
'বহুরূপী পত্রিকা', মে ১৯৫৫। বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে লেখা। ক ৮।

২৫৫. লুই আরাগঁর কবিতা (ভূমিকা-প্রবন্ধ)
দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী অনূদিত ঐ নামের গ্রন্থটির (নবভারতী) ভূমিকা। রচনাকাল : জুন ১৯৫৫।

২৫৬. **বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ (জুন ১৯৫৫)। প্রকাশক : গোপালচন্দ্র রায় ; নাভানা ; কলকাতা ১৩। বোর্ড-বাঁধাই ; যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৪ টাকা। পৃ ১০+১৫৫। ১৯২৬ থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি রচিত কবিতার নির্বাচিত সংকলন। ভূমিকা আছে (১২.৫.৫৫ তারিখে লিখিত)।

২য় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৯ (জুলাই ১৯৬২)। কবিতার সংখ্যা ৮৬। পৃ ১০+১৬৫। দাম ৫ টাকা। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' পর্যন্ত গ্রন্থস্থ কবিতার নির্বাচিত সংকলন। নতুন ভূমিকা আছে (১৭.৬.৬২ তারিখে লিখিত)।

৩য় সংস্করণ : কার্তিক ১৩৭৫ (নভেম্বর ১৯৬৮)। কবিতার সংখ্যা ১০৩। পৃ ১২+১৮৪। দাম ৬ টাকা। 'সেই অন্ধকার চাই' পর্যন্ত গ্রন্থস্থ কবিতার সংকলন। (তবে সব কটি সংস্করণেই গ্রন্থাতিরিক্ত কবিতাও আছে)। নতুন মুখবন্ধ সংযোজিত (৮.৮.৬৮ তারিখে লিখিত)। ২য় সংস্করণ পর্যন্ত যে অনুবাদের সংকলন ছিল, এই সংস্করণে সেই "অনুবাদের নমুনাগুলি বাদ দেওয়া গেল"।

২৫৭. ওআল্ট হুইটম্যান (কবিতানুবাদ)

'পরিচয়', ভাদ্র ১৩৬২। 'নিজের সত্তার গান করি' এই দ্বিতীয় শিরোনামে মার্কিন কবি **Walt Whitman**-এর ৬টি কবিতার অনুবাদ। অনু. ক. ২।

৩৫৮. তুষারে আগুন জ্বালে (কবিতা)

'পরিচয়', ভাদ্র ১৩৬২। কবিতার শীর্ষে হুইটম্যানের কবিতাংশের উদ্ধৃতি। ক ৮।

২৫৯. **শিল্পী ও সমাজ** / টমাস মান (অনুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২। জর্মান ঔপন্যাসিক **Thomas Mann** রচিত প্রবন্ধের অনুবাদ।

২৬০. মার্কিন কবিতা (কবিতানুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২। এমার্সন, হুইটম্যান, ডিকিনসন, ফ্রস্ট, স্টীভনস্, মারিয়ান মূর, কমিংস, ল্যাংস্টন হিউজ—এই আট জন মার্কিন কবির কবিতার অনুবাদ। অনু. ক ২।

২৬১. **ফরাসী কবিতা** (কবিতানুবাদ)

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৬২। শার্ল দ্যুক্ দ'র্লেআঁ, ফ্রাঁসোআ ভিলঁ, পিএর রঁসার ও শার্ল বোদলেয়র—এই চারজন ফরাসী কবির মোট চারটি কবিতার অনুবাদ। অনু. ক ২।

২৬২. **মুক্তির প্রতিষ্ঠা** (কবিতা)

'অগ্রণী', শারদীয় ১৩৬২।

১৯৫৬

২৬৩. সাতটি এপিগ্রাম (কবিতা)

'কবিতা', পৌষ ১৩৬২। ৭টি চতুষ্পদী ব্যঙ্গমূলক ছড়া। এর মধ্যে ৫টি ক১৫ গ্রন্থে 'কান্নাহাসির ইতিহাস থেকে কয়েকটি ছড়া'-তে স্থান পেয়েছে। তবে সেখানে 'সংস্কৃতি'-র নাম হয়েছে 'স্বাধীন সংস্কৃতি'। তবে অন্য দুটি ছড়া ('কবিতা-সর্কার বা সরকার', 'অমুকবাবু') গ্রন্থস্থ হয় নি।

২৬৪. যামিনী রায় ও শিল্পবিচার (প্রবন্ধ)

'পরিচয়', পৌষ ১৩৬২। অশোক মিত্র লিখিত প্রবন্ধ 'যামিনী রায়' ('পরিচয়', ভাদ্র ১৩৬২) প্রসঙ্গে প্রতিবাদী সমালোচনা। প্র ৩, প্র ৫, প্র ৮।

২৬৫. যামিনী রায় ও শিল্পবিচার প্রসঙ্গে (চিঠি)

'পরিচয়', মাঘ ১৩৬২। বিষ্ণু দে লিখিত প্রবন্ধের (২৬৪নং রচনা) উত্তরে ঐ সংখ্যাতেই অশোক মিত্রের যে চিঠি বেরোয় তার উত্তরে বিষ্ণু দে-র চিঠি।

২৬৬. সূরজমুখী (কবিতা)

'পরিচয়', মাঘ ১৩৬২। 'সূরজমুখীর প্রাণ' নামে ক৯ গ্রন্থে।

২৬৭. **Purpose of Art Education** (প্রবন্ধ)

'প্রকাশকাল : ১৯৫৬ (?)। ললিতকলা অকাদেমি প্রকাশিত *Seminar on Art Education* গ্রন্থে প্রকাশিত। গ্রন্থটির প্রকাশ-কালের তারিখ উল্লিখিত হয় নি, কিন্তু অকাদেমি আয়োজিত এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ১৮-২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬। ঐ সেমিনারেই বর্তমান প্রবন্ধটি পঠিত হয়। এই লেখারই ঈষৎ পরিবর্তিত সংস্করণ ৩২৬নং রচনা।

২৬৮. ইলিয়া গ্রিগরিয়েভিচ এরেনবুর্গ / তিনটি কবিতা (কবিতানুবাদ)
'পরিচয়', চৈত্র ১৩৬২। রুশ কবি **Ilya Ehrenburg**-এর কবিতার অনুবাদ। অনু. ক২।

২৬৯. স্বরের আড়ালে শ্রুতি (কবিতা)
'কবিতা', চৈত্র ১৩৬২। ক৯।

২৭০. ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড (প্রবন্ধ)
'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৩।

২৭১. এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৬৩। প্র৩।

২৭২. চেনা দেশ (কবিতা)
'চতুরঙ্গ', বৈশাখ ১৩৬৩। 'এ দেশ' নামে ক৯ গ্রন্থে।

২৭৩. তাবু বয়ে (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৬৩। 'পরবাসী' নামে ক৯ গ্রন্থে।

২৭৪. ভয় পাই (কবিতা)
'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৬৩। 'ভয় পাই মনের মুক্তিতে' নামে ক৯ গ্রন্থে।

২৭৫. [এলিঅট] (পুস্তক সমালোচনা)
'চতুরঙ্গ', শ্রাবণ ১৩৬৩। T. S. Eliot-এর *The Three Voices of Poetry (Cambridge University Press)* এবং *The Literature of Politics (Conservative Political Centre)* গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা। প্র৭ গ্রন্থে 'এলিঅট প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের তৃতীয়াংশ।

২৭৬. **হে বিদেশী ফুল (অনুবাদগ্রন্থ)**
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৩। প্রকাশক : তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় ; বাক্‌ ; কলকাতা ১৩। উৎসর্গপত্র নেই ("কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি অনেকের সাহায্য, বিশেষ করে আমার পরলোকগত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বহুভাষাবিদ্‌ অকৃপণ স্নেহ ও পরিশ্রম। তাঁর নামে এই অনুবাদগ্রন্থ বহু বিলম্বিত হলেও গ্রথিত করতে পেরে তাঁর সেই প্রবল উৎসাহের অনুরণন আজও বোধ করছি।" মুখবন্ধ)। বোর্ড-বাঁধাই ; যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

আখ্যাপত্রে বিষ্ণু দে-র হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি দেওয়া আছে। দাম ৫ টাকা। পৃ ৮+১৯০।

প্রাচীন চৈনিক কবিতা বা ইংরেজি ধাঁধার ছড়া ছাড়াও চৈনিক, ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজি, স্পেনীয়, রুশ, জর্মান এবং মার্কিন-ইংরেজি ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদের সংখ্যা-প্রাচুর্যের দিক থেকে নিম্নলিখিত কবিরা উল্লেখযোগ্য : মাও ৎসে তুং ; বদলেয়র, মালার্মে, র‍্যাবো, আপলিনেয়র, পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ ; শেক্‌সপীঅর, ব্লেক, হার্ডি, ইএট্‌স, লরেন্স, পাউণ্ড ; লোরকা, নেরুদা ; গয়টে, রিল্‌কে ; হুইটম্যান, এমিলি ডিকিনসন, রবার্ট ফ্রস্ট, ওঅলেস্‌ স্টিভ্‌ন্স।

২৭৭. উইলিয়ম শেক্‌সপীয়র / দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', কার্তিক ১৩৬৩। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় অনূদিত এই গ্রন্থের (বঙ্গীয় শেক্‌সপীয়র পরিষদ, ১৩৬৩) সমালোচনা।

২৭৮. লরেন্স প্রতিভা (প্রবন্ধ)
'পরিচয়', জয়ন্তী সংকলন ১৩৬৩। ৩৩নং রচনার পুনর্মুদ্রণ।

১৯৫৭

২৭৯. মালার্মে : প্রগতি (কবিতা)
'কবিতা', পৌষ ১৩৬৩। ক৯।

২৮০. ব্রেখটের একটি কবিতা (কবিতানুবাদ)
'পরিচয়', মাঘ ১৩৬৩। জর্মান কবি **Bertolt Brecht** রচিত *To Posterity* কবিতাটির অনুবাদ 'উত্তরপুরুষকে'।

২৮১. **In the Sun and the Rain** (প্রবন্ধ)
New Age, March 1957. রচনাকাল : ১৯৫৫। ১৯৬নং রচনার বক্তব্য ও ভাষা অনেকাংশেই ব্যবহার করা হয়েছে। প্র৬।

২৮২. ভারতপথিক ইংরেজ কবি (প্রবন্ধ)
'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৪। রচনাকাল : ১৯৫৬। প্র৩, প্র৪, প্র৫। দ্র. ৩১৭নং রচনা।

২৮৩. আমাদের মেয়েরা (কবিতা)
'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৬৪। ক৯।

২৮৪. উর্দিহীন শিল্পী (অনুবাদ)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৬৪। ১৫৮নং রচনার পুনর্মুদ্রণ।

২৮৫. মস্‌কভা-পিকাসো সংবাদ (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৬৪। প্র৩, প্র৪, প্র৫।

২৮৬. টি. এস. এলিঅট (কবিতানুবাদ)
'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৬৪। **T. S. Eliot**-এর কবিতার অনুবাদ 'জে আলফ্রেড প্রুফকের গান'। অনু. ক১।

২৮৭. 'হিন্দুস্থানের বিদ্রোহ' ও চার্টিস্ট নেতা (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', সিপাহীবিদ্রোহ স্মারক সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৪। **Ernest Jones**-এর *The Revolt of Hindosthan or The New World* গ্রন্থের সমালোচনা।

২৮৮. The Paintings of Rabindranath Tagore (প্রবন্ধ)
The Visvabharati Quarterly, Autumn 1957. দ্র. ২৯২নং রচনা।

২৮৯. শতমুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড় (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৬৪। ক৯।

২৯০. মন যেন নিভন্ত অঙ্গার (কবিতা)
'পরিচয়', শারদীয় ১৩৬৪। ক৯।

২৯১. Bengali Literature : its past and present (প্রবন্ধ)*
'দীপিকা', ১৯৫৭।

১৯৫৮

২৯২. The Paintings of Rabindranath Tagore
(প্রবন্ধপুস্তিকা)
প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৮। প্রকাশক : বিদ্যুৎরঞ্জন বসু ; শান্তিনিকেতন প্রেস ; শান্তিনিকেতন। পৃ ১২। দাম ১·৫০ টা। *Quarterly Booklet*। দ্র. ২৮৮নং রচনা। প্র ৬ গ্রন্থে *Rabindranath—Our Modern Painter* নামে গৃহীত।

২৯৩. মাওৎসে তুং-এর কবিতা (কবিতানুবাদ)
'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৬৪। চীনের মহানায়ক **Mao Tse Tung**-

এর ৬টি কবিতার অনুবাদ। ৩৪ লাইনের পাদটীকায় অনুবাদের পেছনের ইতিহাস দিয়েছেন অনুবাদক। কবিতাগুলি 'মাও ৎসে তুং / আঠারোটী কবিতা' গ্রন্থে (৩০৯নং রচনা) গ্রন্থে গৃহীত।

২৯৪. পল রোবসনের উদ্দেশ্যে (কবিতা ও প্রবন্ধ)

'পরিচয়' চৈত্র ১৩৬৪। মার্কিন গায়ক রোবসনের ৬০ বছর জন্মদিন উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও 'আলেখ্য' নামক কবিতা। কবিতাটি 'পল রোবসন' নামে ক১০ গ্রন্থে ছাপা হয়। ভূমিকাটি কোথায়ও ছাপা হয় নি।

২৯৫. **আলেখ্য (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৬৫। রচনাকাল: [১৯৫২-৫৮]। প্রকাশক: সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স; কলকাতা ১২। উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র ও শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবীশ-কে'। বোর্ড-বাঁধাই, দাম ২.৫০ টা। কবিতার সংখ্যা ৪৭। পৃ ৮+৭৪। স্বতন্ত্রভাবে কবিতার রচনাকালের উল্লেখ নেই। গ্রন্থটি পরে অপরিবর্তিতভাবে 'বছর পঁচিশ' কাব্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২৯৬. **তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ: ২৫ বৈশাখ ১৩৬৫ রচনাকাল: [১৯৫৫-৬০।]
প্রকাশক: তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়; বাক্; কলকাতা ৯।

উৎসর্গ: 'শ্রীমান চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান কমলকুমার মজুমদারকে'। বোর্ড-বাঁধাই; যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ; দাম ২ টাকা ৭৫ প। কবিতার সংখ্যা ৫৫। পৃ ৮+৮২।

কিছু কবিতার স্বতন্ত্রভাবে রচনাকালের উল্লেখ আছে, কিছু কবিতার নেই। পরবর্তীকালে গ্রন্থটি 'একুশ বাইশ' (১৯৬৫) ও 'বছর পঁচিশ' (১৯৭৩) কাব্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

২৯৭. স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৬৫। ক ১০।

২৯৮. অভিন্ন স্বস্তিতে (কবিতা)

'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৬৫। ক ১০।

২৯৯. যত সব টেকো মাথা (কবিতানুবাদ)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৬৫। ডবলিউ. বি. ইয়েটস-এর *The Scholars* কবিতার অনুবাদ।

৩০০. স্টীভন স্পেণ্ডর : দুটি কবিতা (কবিতানুবাদ)

'কবিতা', আষাঢ় ১৩৬৫। কবিতা দুটির শিরোনাম : 'বেঠোফেনের অন্তিম মুখচ্ছদ', 'প্রাতঃস্মরণীয় তারা'।

৩০১. A note on Michael Madhusudan Datta

Quest, April June 1958. ৩০৭নং রচনাটি এরই পরিমার্জিত সংস্করণ।

৩০২. কোণার্কের মৃত্যু (প্রবন্ধ)

'দেশ', ১৬ আগস্ট ১৯৫৮। সঙ্গে সুনীল জানা-র তোলা ৬টি আলোকচিত্র। প্র৫।

৩০৩. Archaeology kills Konarak (প্রবন্ধ)

Link, 31 Aug. 1958. ৩০২নং রচনারই ইংরেজি সংস্করণ।

৩০৪. "কোণার্কের মৃত্যু" (চিঠি)

'দেশ', ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। ৩০২নং রচনা প্রসঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও জনৈক চন্দ্রকুমার নাথ-এর যে দুটি চিঠি বেরোয় 'আলোচনা' বিভাগে, তার উত্তরে সেই একই সংখ্যায় দুটি পৃথক চিঠি বিষ্ণু দে-র।

৩০৫. "কোণার্কের মৃত্যু" [২] (চিঠি)

'দেশ', ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। ৩০২ ও ৩০৩নং রচনা প্রসঙ্গে আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্ট, ইস্টার্ন সার্কেল-এর সুপারিনটেনডেন্ট দেবলা মিত্র-র যে চিঠি বেরোয়, তার উত্তরে একই সঙ্গে বিষ্ণু দে-র চিঠি।

৩০৬. ঝিভাগো (কবিতা)

'পরিচয়', অগ্রহায়ণ ১৩৬৫। 'বরিস পাস্তেরনাককে' নামে ক১০ গ্রন্থে। 'আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক' প্রবন্ধটিও (৩১২নং রচনা) এই সময়ে রচিত।

৩০৭. Michael Madhusudan Datta (1824-1873) (প্রবন্ধ)

অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত *Studies in the Bengal Renaissance* (The National Council of Edn., Bengal/Jadavpur,

December 1958) গ্রন্থে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দ্র. ৩০১নং রচনা। প্র৬। 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স' (৩১৮নং রচনা) এরই বঙ্গীয় সংস্করণ।

৩০৮. **এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য (প্রবন্ধগ্রন্থ)**

প্রকাশ : [১৯৫৮]। প্রকাশক : অম্বিকাপদ বিশ্বাস ; ইস্ট অ্যাণ্ড কোম্পানী ; কলকাতা ৯। উৎসর্গ : শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে'। বোর্ড-বাঁধাই ; প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। দাম ৪ টাকা। পৃ ১০+১৭২।

"এই প্রবন্ধগুলি ১৯৩৮ থেকে প্রায় বিশ বছর ধরে নানা পত্রিকায় বেরিয়েছিল।" (লেখকের নিবেদন)। পিকাসো ও যামিনী রায়ের অনেকগুলি ছবি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। **প্রবন্ধসূচি :** ১. এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য, ২. চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, ৩. লোকশিল্প ও বাবুসমাজ, ৪. যামিনী রায় ও শিল্পবিচার, ৫. মস্‌কভা-পিকাসো সংবাদ, ৬. টমাস সটার্নস এলিঅট, ৭. প্রমথ চৌধুরী ও আমরা, ৮. আর্ব কোশাম্বীর কাণ্ড, ৯. সুরুচি ও পণ্ডিতম্মন্যতা, ১০. জনসাধারণের রুচি, ১১ রিচার্ডসের কল্পনা, ১২. ভারত পথিক ইংরেজ কবি, ১৩. রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড, ১৪. ডেভিড হর্বার্ট লরেন্স। এর মধ্যে ১০নং ও ১১নং প্রবন্ধ দুটি পূর্বেই প্র১ গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

৩০৯. **মাও ৎসে তুং। আঠারোটী কবিতা (অনুবাদগ্রন্থ)**

প্রকাশ : [১৯৫৮]। প্রকাশক : দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী ; কলকাতা ১৩।

উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত চেন্ হান্ সেং-কে'। কাগজের মলাট ("সাইজ ১০×৬½ ইঞ্চি") ; যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ২ টাকা। পৃ ৪+২৮। মাও ৎসে তুঙ-এর ১৮টি কবিতার অনুবাদ—প্রকৃতপক্ষে ১৮টি এবং পুনশ্চ ১টি, মোট ১৯টি কবিতার অনুবাদ।

"শ্রীযুক্ত তান য়ুন শান্-এর সাহায্যে বিষ্ণু দে কর্তৃক অনূদিত" (আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠায় লেখা)। বিষ্ণু দে লিখিত ভূমিকা আছে। অনু. ক ২ গ্রন্থে যে দুটি কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে, এখানে তার পাঠ ভিন্ন। দ্র. ২৯৩ রচনা।

২য় সংস্করণ (প্রথম বি. সংস্করণ) : আশ্বিন ১৩৮৩। প্রকাশক : বিশ্ববাণী প্রকাশনী ; কলকাতা ৯। প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়। দাম ৩ টাকা। পৃ ৪+২৮। গ্রন্থনামের ঈষৎ পরিবর্তন : 'মাও ৎসে তুংএর কবিতা'। বাকি সমস্তই অপরিবর্তিত—শুধু কবিতার উপরের ক্রমিক সংখ্যাগুলি বর্জিত এবং শেষ কবিতার উপরে "পুনশ্চ" শব্দটি সংযোজিত।

৩১০. [Jamini Roy] (ভূমিকা-প্রবন্ধ)

ধুমিমাল ধরমদাস, কনট প্লেস, নিউ দিল্লি-প্রকাশিত যামিনী রায়ের চিত্রসংগ্রহের ভূমিকা। রচনাকাল অনুল্লিখিত [১৯৫৮ ?]।

১৯৫৯

৩১১. সেই অন্ধকার চাই (কবিতা)

'পরিচয়', ফাল্গুন ১৩৬৫। ক ১১।

৩১২. আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক (প্রবন্ধ)

'সাহিত্যপত্র', বৈশাখ ১৩৬৬। রচনাকাল : ২১.১২.৫৮। দ্র. ৩০৬নং রচনা। প্র ৫।

৩১৩. চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা (কবিতা)

'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৬৬। ক ১০।

৩১৪. India and Modern Art (প্রবন্ধ)

The Visvabharati Quarterly, Summer, 1959. উইলিয়ম আর্চর রচিত ঐ নামের গ্রন্থের সমালোচনা। দ্র. ৩১৫নং রচনা।

৩১৫. India and Modern Art (প্রবন্ধপুস্তিকা)

৩১৪নং রচনাটিই *Quarterly Booklet* হিসেবে শান্তিনিকেতন থেকে প্রচারিত হয়।

প্রকাশকাল : [১৯৫৯]। প্রকাশক : বিদ্যুৎরঞ্জন বসু ; শান্তিনিকেতন প্রেস ; শান্তিনিকেতন। দাম ২ টাকা। পৃ ২৬। পুস্তিকাটির জ্যাকেটে নিম্নলিখিত পরিচিতি আছে : "When a former member of the Indian Civil Service who is at present Keeper of the Indian Section, Victoria and Albert Museum sets out to put India on the map of the World's Modern Art—it is an event of some

importance. His book, *India and Modern Art*... deserves, therefore, a thorough discussion. This review-article by Bishnu Dey, an old friend of the anthor's and a well-known poet and art-critic, is an attempt at such an appraisal. The 'seeming harshness' of the review, it is hoped, will not only help in removing errors of ommission and commission, but will also place Modern Indian Art in its proper perspective—historically and aesthetically. প্রবন্ধটি পরে প্র৬ গ্রন্থে গৃহীত হয়। এর বাংলা অনুবাদ [অরুণ সেন কৃত] 'ভারত ও আধুনিক শিল্পসৃষ্টি' নামে প্রকাশিত হয় 'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৭৫ সংখ্যায়।

৩১৬. 'ডুবিছে চতুর্থীর চাঁদ বিপাশার নীরে'—রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', গ্রীষ্ম ১৩৬৬। 'আকাশে তাকাও' নামে ক১০ গ্রন্থে।

৩১৭. An English poet discovers India (প্রবন্ধ)
Quest, Octo-December 1959। রচনাকাল : ১৯৫৬। প্র৬। 'ভারতপথিক ইংরেজ কবি' (২৮২নং রচনা)-র ইংরেজি সংস্করণ।

১৯৬০

৩১৮. মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স (প্রবন্ধ)
'দেশ', ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০। ৩০৭নং প্রবন্ধের বঙ্গীয় সংস্করণ। প্র৪, প্র৫।

৩১৯. টমাস এলিঅট / চড়কের গান (কবিতানুবাদ)
'সাহিত্যপত্র', বসন্ত ১৩৬৬। T. S. Eliot-এর *Ash Wednesday*-র অংশবিশেষের অনুবাদ 'চড়কের গান ২'। অনু. ক১।

৩২০. পরকে আপন করে (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', বসন্ত ১৩৬৬। রাজেশ্বরী দত্ত-কে উৎসর্গীকৃত। ক১০।

৩২১. অয়রিডিকে (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', বসন্ত ১৩৬৬। সত্যজিৎ রায়-কে উৎসর্গীকৃত। ক১০।

৩২২. ইএটসের কবিতা (কবিতানুবাদ)

'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৬৭। ইংরেজ কবি W. B. Yeats-এর দুটি কবিতার অনুবাদ।

৩২৩. সাম্প্রতিক মার্কিন সাহিত্য (প্রবন্ধ)

'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭। প্র৪, প্র৫।

৩২৪. বাংলা ফিল্মের পরিণত রূপ / আমাদের জীবন ও মেঘে ঢাকা তারা (প্রবন্ধ)

'স্বাধীনতা', ২২মে ১৯৬০। ঐ বছরই এপ্রিল মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত ঋত্বিককুমার ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রের বিষয়ে একটি প্রশংসামূলক সমালোচনা। ৩২৫নং রচনাটি এরই ইংরেজি সংস্করণ।

৩২৫. Indian film has passion and power (প্রবন্ধ)

৩২৪নং রচনারই ইংরেজি। প্রকাশের স্থান ও কাল জানা নেই। প্র৬। সেখানেই রচনাকাল আছে : ১৯৬০।

৩২৬. The Problem of art education in India (প্রবন্ধ)

Quest, April-June 1 60। দ্র. ২৬৭নং রচনা। *The Problem of art in our education* নামে প্র৬ গ্রন্থে। এর বাংলা অনুবাদ [অরুণ সেন কৃত] 'ভারতবর্ষে শিল্পশিক্ষার সমস্যা' নামে 'সাহিত্য-পত্র', আষাঢ়-ভাদ্র ১৩৭৫ সংখ্যায় বেরোয়।

৩২৭. The Eastern Outlook (প্রবন্ধ)

The Illustrated Weekly of India, 17 July 1970। *Modern Art in India* সিরিজের একটি রচনা। ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে *Modern Art and the East* নামে প্র৬ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। এর বাংলা অনুবাদ [অরুণ সেন কৃত] 'আধুনিক শিল্প ও প্রাচ্য' নামে 'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৭৪ সংখ্যায় বেরোয়।

৩২৮. দামিনী (কবিতা)

'দেশ', ২৫ আষাঢ় ১৩৬৭। ক১০।

৩২৯. The growth and fulfilment of Bengali (প্রবন্ধ)

The Statesman, [1960 ?]। *The Language of the two Bengals* নামে প্র৬ গ্রন্থে।

১৯৬১

৩৩০. যামিনী রায়ের ছবি (প্রবন্ধ)

'প্রবাসী', ষষ্ঠিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ৩১ চৈত্র ১৩৬৭। পরে 'বিদেশীর চোখে যামিনী রায় ও তাঁর ছবি' নামে প্রব গ্রন্থে গৃহীত। দ্র. ৩৬৩নং রচনা।

৩৩১. হেমন্তের কানে কানে (কবিতা)

'এক্ষণ', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ [প্রথম সংখ্যা]। ক ১০।

৩৩২. Rabindranath Tagore and the West (প্রবন্ধ)

The Statesman, Tagore Centenary Supplement, 8 May 1961। প্র ৬।

৩৩৩. রবীন্দ্রনাথের দুটি বই (অনুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮। Edward Morgan Forster লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' ['চিত্রাঙ্গদা']-র সমালোচনার অনুবাদ।

৩৩৪. Let the crisis face the Indian writer now (প্রবন্ধ)

Seminar, May 1961। প্র৬ গ্রন্থে গৃহীত—সেখানে শিরোনামের *now* শব্দটি বর্জিত।

৩৩৫. "রবীন্দ্ররচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব" (চিঠি)

'যুগান্তর', ২০ জুলাই ১৯৬১। সহলেখক : চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজি ভাষায় লিখিত এবং দিল্লী-র সাময়িকপত্রে প্রকাশিত (*Two Cities*) বুদ্ধদেব বসু-র 'রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব' প্রবন্ধটির বিষয়ে ১০ জুন ১৯৬১ তারিখে 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'জনান্তিকে'-রচনাসূত্রে মল্লিনাথ 'তীব্র' মন্তব্য করেন এবং পরে জুলাই মাসের প্রথমার্ধে বুদ্ধদেব বসুর রচনা ও মল্লিনাথের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'চিঠিপত্র' বিভাগে অনেক চিঠি (পক্ষে ও বিপক্ষে) বেরোয়। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিষ্ণু দে ও চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য পত্রটি লেখেন। চঞ্চলবাবুর ভাষ্য অনুসারে অবশ্য পত্রটি বিষ্ণু দে-রই লেখা। বুদ্ধদেব বসুর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এখানে বিরূপ মন্তব্য আছে।

৩৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইংরেজিতে তাঁর দ্বিতীয় বই (প্রবন্ধানুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৬৮। Ezra Pound লিখিত এবং

The New Free Woman পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *The Gardener* গ্রন্থের সমালোচনার অনুবাদ।

৩৩৭. মানবলোকে ভবিষ্যৎ চেপে (কবিতা)
'পরিচয়', শারদীয় ১৩৬৮। ক ১০।

৩৩৮. রবীন্দ্রশতবার্ষিকী (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৬৮। প্র ৫।

৩৩৯. **Pradosh Dasgupta : an introduction** (প্রবন্ধ)
ললিতকলা অকাদেমি প্রকাশিত (নিউ দিল্লি, ১৯৬১) **Contemporary Art Series**-এ *Pradosh Dasgupta* অ্যালবামে তাঁর ভাস্কর্য প্রসঙ্গে লিখিত ভূমিকা।
বাংলা অনুবাদ [অরুণ সেন কৃত] 'প্রদোষ দাশগুপ্ত-র ভাস্কর্য' নামে 'সাহিত্যপত্র', চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪-৭৫-এ প্রকাশিত হয়।

৩৪০. **To and from Konarak** (অনুবাদ)
The Journal of the Indian Society of Oriental Art (প্রকাশক : **ISOA**), অবনীন্দ্র সংখ্যা, ১৯৬১। অবনীন্দ্রনাথ-রচিত কোণারক বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ।

৩৪১. রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)
'রবীন্দ্র-শতায়ন' (বেথুন বিদ্যায়তন স্মারকগ্রন্থ), বেথুন কলেজ। ক ১০।

১৯৬২

৩৪২. কয়েকটি কবিতা (কবিতা)
'পরিচয়', চৈত্র ১৩৬৮। 'দুই কর্মীর এক দাদার জন্য তর্ক', 'বরং সে আর দুই বোন', 'পোলিং স্টেশনে', 'প্রশ্নপত্র'। ক ১২। সেখানে ২য় কবিতাটির নাম 'মাঝ রাতে বাপ ফেরে'।

৩৪৩. **Father and Son : A note on the work of Amiya** (প্রবন্ধ)
The Statesman, 1 April 1962। *Father and Son : Jamini Roy and Amiya* নামে প্রও গ্রন্থে।
বাংলা অনুবাদ [অরুণ সেন কৃত] 'পিতা ও পুত্র' নামে 'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৯ সংখ্যায়।

৩৪৪. সনেট (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', গ্রীষ্ম ১৩৬৯। 'নিকট বিকৃতি' নামে ক ১১ গ্রন্থে।

৩৪৫. **সাহিত্যের দেশবিদেশ (প্রবন্ধগ্রন্থ)**

প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৬৯। প্রকাশক: মনোতোষ সরকার; কথাকলি; কলকাতা ১২।

উৎসর্গ: 'শ্রীমান জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমান বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়কে'। বোর্ড-বাঁধাই। যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫ টাকা। প্রবন্ধ-সংখ্যা ১১। পৃ ১০+১৫৬।

১১টি প্রবন্ধের মধ্যে ৬টি প্রবন্ধই প্রও গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত প্রবন্ধ: ১. মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স, ২. আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক, ৩. সাম্প্রতিক মার্কিন সাহিত্য, ৪. আধুনিক কাব্য ১ [৪৫নং রচনা], ৫. আধুনিক কাব্য ২ [৪৯নং রচনা]। শেষ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি এবং ভ্রম-সংশোধন আছে।

৩৪৬. শিল্পের অভিজ্ঞতা (পুস্তক সমালোচনা)

'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৬৯। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের সমালোচনা।

৩৪৭. বিষম কলি (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', বর্ষা ১৩৬৯। 'তাহলে ধৈর্য ধরো' নামে ক১২ গ্রন্থে।

৩৪৮. [দান্তে] (কবিতানুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৬৯। "চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায়" দান্তের ৪টি কবিতার অনুবাদ।

৩৪৯. একালের কবিতা (প্রবন্ধ)

'চতুষ্কোণ', কার্তিক ১৩৬৯। প্রবন্ধটি বিষ্ণু দে সম্পাদিত কাব্য-সংকলনের ভূমিকা। দ্র. ৩৫২নং রচনা।

৩৫০. **The Pioneers of Art in Modern India** (প্রবন্ধ)

Lalitkala Contemporary **1 ; Lalitkala Academy** [১৯৬২]। ***The Modern Movement of Art in India*** সেমিনারের জন্য লিখিত প্রবন্ধ। কিছু কিছু অংশ ***Abanindranath and Modern Indian Art*** (১৯৪৮) নামক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

বাংলা অনুবাদ [অরুণ সেন কৃত] 'ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের অগ্রনেতা' নামে 'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৭৬ সংখ্যায় বেরোয়।

৩৫১. **Drawings and Paintings of Rabindranath Tagore** (প্রবন্ধ)
Lalitkala Contemporary 1, [১৯৬২]। ললিতকলা অকাদেমি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রসংগ্রহের বা অ্যালবামের সমালোচনা।

১৯৬৩

৩৫২. একালের কবিতা (ভূমিকা-প্রবন্ধ)
বিষ্ণু দে সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন 'একালের কবিতা' (সম্বোধি পাবলিকেশন্স্, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৬৩)-র ভূমিকা। রচনাকাল দেওয়া আছে : ২২ শ্রাবণ ১৩৬৯। দ্র. ৩৪৯নং রচনা।

৩৫৩. **স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত** (কাব্যগ্রন্থ)
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭০। রচনাকাল : ১৯৫৫-৬১। অধিকাংশ কবিতারই রচনাকাল দেওয়া আছে, তবে কালানুক্রমিক সজ্জিত নয়। প্রকাশক : রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; সম্বোধি পাবলিকেশন্স্ ; কলকাতা ১।
উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়কে / তাই পরালাম রাখী'। বোর্ড-বাঁধাই ; যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫ টাকা। কবিতার সংখ্যা ১০২। পৃ ৮+১৫২।
২য় সংস্করণ : অপরিবর্তিত।
৩য় সংস্করণ : (যদিও গ্রন্থে "১ম বি. সংস্করণ" বলে উল্লিখিত) : বৈশাখ ১৩৮০। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল ; বিশ্ববাণী প্রকাশনী ; কলকাতা ৯। বোর্ড-বাঁধাই ; প্রচ্ছদ হিসেবে যামিনী রায়ের একটি ভিন্ন চিত্র এবং পূর্ব সংস্করণের যামিনী রায়-কৃত নামলিপি ছাপা হয়েছে। দাম ৮ টাকা। পৃ ৮+১৩৬।
কবিতাগুলি পূর্ব-সংস্করণের মতো পাতায়-পাতায় ছাপা হয় নি, টানা (run-on) ছাপা হয়েছে। অন্যান্য ব্যাপার অপরিবর্তিত।
নতুন সংস্করণ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থটি 'বছর পঁচিশ' কাব্য-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩৫৪. শীলভদ্র পঞ্চমুখ (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', ১২ বর্ষ ২ সংখ্যা ১৩৭০। দীর্ঘ কবিতার প্রথম ৭টি অংশ। ক১১।

৩৫৫. হে দিনের সূর্য (কবিতা)
'পরিচয়', আশ্বিন ১৩৭০। ক:২।

৩৫৬. Music I live by (বেতারভাষণ)
রেকর্ড থেকে দৃষ্টান্ত সহ পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল সংগীত সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র এই ইংরেজি ভাষণটি বেতারে সম্প্রচারিত হয়। সঠিক তারিখ জানা নেই। সম্ভবত ১৯৬৩-তে (?)। এটি কোথায়ও ছাপা হয়েছিল কিনা তাও জানা নেই। বর্তমান সংকলক ভাষণটির লিখিত রূপের একটি খসড়া খুঁজে পেয়েছেন।

১৯৬৪

৩৫৭. শেক্সপীয়র ও বাংলা (প্রবন্ধ)
'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৭১। "প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ওথেলো' অনুবাদ প্রকাশের উপলক্ষে লেখা।" প্রবন্ধটি পরে গ্রন্থে এবং আরো পরে ৩৯০নং গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে

৩৫৮. সনেট ৫৫ (কবিতানুবাদ)
'যুগান্তর', ১৬ এপ্রিল ১৯৬৪। শেক্সপীয়রের সনেটের অনুবাদ। [illegible] ক২।

৩৫৯. Shakespeare with or without tears (সাক্ষাৎকার)
Oxygen News (Quarterly House Journal of Indian Oxygen Ltd) with a special Shakespeare Supplement [শেক্সপীয়রের জন্মের চারশ-বছর পূর্তি উপলক্ষে], January-June 1964. বিষ্ণু দে-কে মোট ৭টি প্রশ্ন করা হয়, প্রধানত বাংলাদেশে শেক্সপীয়রের পঠন-পাঠন বিষয়ে।

৩৬০. মনীষার পৌরাণিক চরিত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', ১২ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৩৭১। প্র৫। ইংরেজি সংস্করণ : *Satyendranath Bose : a legend in his life time* (দ্র. ৩৬২নং রচনা)।

৩৬১. বাংলায় ঋগ্বেদ অনুবাদ (পুস্তক সমালোচনা)
'অমৃত', ৮ শ্রাবণ ১৩৭১। রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা'-র (জ্ঞানভারতী সং) সমালোচনা।

৩৬২. Satyendranath Bose/A legend in his life-time (প্রবন্ধপুস্তিকা)
প্রকাশ : [১৯৬৪]। প্রকাশক : Public Relations Deptt ; Indian Oxygen Ltd. ; Cal 27. প্রচ্ছদপট : সুনীল জানা। ১২টি আলোকচিত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র। প্র৬। দ্র. ৩৬০নং রচনা।

"On New Year's day this year, the country celebrated the seventieth birth anniversary of the eminent scientist, Professor Satyen Bose...This booklet is a token of our humble tribute to a great son of India. We requested Prof. Bishnu Dey, one of our most eminent poets and a close personal friend of Satyendranath to write it and we are grateful and happy that he readily agreed." (*Forward*, A. K. Sen)

৩৬৩. মহানশিল্পী যামিনী রায় (প্রবন্ধানুবাদ)
'যুগান্তর', ১৯৬৪ (?)। ১৬ মার্চ ১৯৫১ তারিখে 'লার্' নামক পত্রিকায় আর্‌ভে মাসন্-আ [বা, এর্‌ডে মাসন্-আ] লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদটি ৩৩০নং রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে।

৩৬৪. কবিতার অসামান্য দর্পণে (পুস্তক সমালোচনা)
'যুগান্তর', ১৯৬৪ (?)। 'মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতা' (প্রকাশক : এম. সি. সরকার) ও মণীন্দ্র রায় অনূদিত 'শেকস-পীয়রের সনেট পঞ্চাশৎ' (প্রকাশক : বাক্ সাহিত্য)-এর সমালোচনা।

১৯৬৫

৩৬৫. একুশ বাইশ (কাব্যসংকলন)
প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭২। প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার ; এম. সি. সরকার ; কলকাতা।

বোর্ড-বাঁধাই ; সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৮ টাকা। কবিতার সংখ্যা ১৫৭। পৃ ১০+৩০০। "শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের দীর্ঘ পরিচিত সাহিত্য-সৌহার্দ্যের জন্যই এই পাঁচটি কবিতার বই একত্রে পুনঃপ্রকাশিত হল—প্রায় একুশ বছরের লেখা" (মুখবন্ধ)। এই পাঁচটি হল : ১. 'পূর্বলেখ', ২. 'সাত ভাই চম্পা', ৩. 'সন্দ্বীপের চর', ৪. 'অন্বিষ্ট', ৫. 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'। এখানে অবশ্য কিছু কিছু পরিবর্জন করা হয়েছে—'পূর্বলেখ' ও 'সাত ভাই চম্পা'-র অনুবাদ-কবিতাগুলো এবং 'সন্দ্বীপের চর'-এর 'সাঁওতাল কবিতা', 'ছত্রিশগড়ী গান' ও 'রাওঁ গান' এখানে নেই। পরবর্তীকালে এই সংগ্রহের সমস্ত গ্রন্থই 'বছর পঁচিশ' কাব্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

৩৬৬. এক দিগন্ত দিনান্তের : ফরাসী কবিতার পরিক্রমা

(পুস্তক সমালোচনা)

'চতুরঙ্গ', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২। লোকনাথ ভট্টাচার্য লিখিত ঐ নামের গ্রন্থের সমালোচনা।

৩৬৭. Yeats : Poet of the Universe (প্রবন্ধ)

The Statesman, 13 June 1965.

৩৬৮. রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা (প্রবন্ধ)

'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৭২। পাদটীকায় লেখা আছে : "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক গ্রন্থমালা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে।" পরে প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (৩৭৩নং রচনা)।

৩৬৯. আমার স্ত্রীকে উৎসর্গ-পত্র (কবিতানুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৭২। টি এস এলিঅটের নাটক *The Elder Statesman*-এ প্রকাশিত উৎসর্গ-কবিতার অনুবাদ। অনুবাদের নীচে সংক্ষিপ্ত টীকা আছে। এলিঅটের মৃত্যুর উল্লেখ আছে ঐ টীকায়—"আজ তাই তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধাই নিবেদন করা উচিত কৃতজ্ঞ শোকানুভূতিতে।"

৩৭০. **W. B. Yeats in India : A few centenary thoughts (প্রবন্ধ)**

***The Statesman* (?), 1965 (?)। প্রভু।**

৩৭১. রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস ও পাউণ্ড (প্রবন্ধ)

'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা', অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৬৫। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

৩৭২. My Calcutta (প্রবন্ধ)

Press Club, Calcutta প্রকাশিত কলকাতাবিষয়ক পুস্তিকার (১৯৫৫) একটি প্রবন্ধ। প্র৬। বাংলা সংস্করণ 'এই আমাদের কলকাতা' (দ্র. ৪১৮নং রচনা)।

১৯৬৬

৩৭৩. **রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা (প্রবন্ধগ্রন্থ)**

প্রকাশ : মাঘ ১৩৭২। **প্রকাশক :** জ্যোৎস্না সিংহ রায় ; লেখক সমবায় সমিতি ; কলকাতা ২৬।

উৎসর্গ : 'শ্রীমান সত্যজিৎ রায়কে'। বোর্ড-বাঁধাই ; প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। দাম ৪ টাকা। পৃ ৮+৯৮। দ্র. ৩৬৮নং রচনা।

বাংলাদেশের সংস্করণ **:** ডিসেম্বর ১৯৭৫। প্রকাশক **:** জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ২। প্রচ্ছদ **:** কাইয়ুম চৌধুরী। দাম ৭ টাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা অপরিবর্তিত। এই সংস্করণের জন্য পৃথক ভূমিকা আছে **:** "ঢাকায় নবীন ও প্রগতিশীল সংস্থা এই বাংলা-দেশীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন ; লেখক তাতে খুশী ও কৃতজ্ঞ।"

৩৭৪. [দুটি কবিতা] (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', পৌষ-ফাল্গুন ১৩৭২। 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ', 'এ নদীকে চেনো তুমি'। ক১৩।

৩৭৫ পাওলো ও ফ্রানচেস্‌কা (কবিতানুবাদ)

'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৭২। ইতালীয় কবি দান্তের "ইনফেরনো **:** সর্গ ৫, ৭০-১৪২" অংশের অনুবাদ।

৩৭৬ **সেই অন্ধকার চাই (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৩ (এপ্রিল ১৯৬৬)। রচনাকাল : ১৯৬১-৬৫। কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত। প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায় ; ভারবি ; কলকাতা ১২।

উৎসর্গ : 'জন-গণক ও পরিকল্পনাবিদ্ শ্রীমান অশোক মিত্রের কর-কমলে'। বোর্ড-বাঁধাই ; পূর্ণেন্দু পত্রী অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৩·৫০ টা। কবিতার সংখ্যা ৫৩। পৃ ৮+৬৪।

দ্বিতীয় সংস্করণ [যদিও লেখা আছে "দ্বিতীয় মুদ্রণ"] : শ্রাবণ ১৩৮৩ (সেপ্টেম্বর ১৯৭৬)। প্রকাশক : বিশ্ববাণী প্রকাশনী ; কলকাতা ৯। [এ-সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পীর নাম ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে পূর্ণেন্দু পত্রী, হবে গৌতম রায়]। সমস্তই অপরিবর্তিত।

৩৭৭. হো চি মিন (কবিতানুবাদ)

'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৭৩। ভিয়েতনামের মহানায়ক হো চি মিনের কবিতানুবাদ : 'মেঘেরা জড়ায় গিরিচূড়াদের'।

৩৭৮. [কবিতা-পরিচয়] (চিঠি)

'কবিতা-পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৭৩। পত্রটি লিখিত হয় ২.৬.৬৬ তারিখে, পত্রিকার সম্পাদককে। ঐ পত্রিকায় অনুসৃত কবিতার নিবিড় পাঠের আলোচনা-পদ্ধতির (close study) গুরুত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

৩৭৯ গালিভারের জীবনবৃত্তান্ত : জনাথান সুইফ্‌ট্‌ (পুস্তক সমালোচনা)

'সাহিত্যপত্র', চৈত্র-ভাদ্র ১৩৭২-৭৩। লীলা মজুমদার অনূদিত ঐ নামের গ্রন্থটির সমালোচনা।

৩৮০. স্পষ্টকে চাই (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', চৈত্র-ভাদ্র ১৩৭২-৭৩। ক১৩।

৩৮১. **Homage to T. S. Eliot** (প্রবন্ধ)

Indian Oxygen Ltd. প্রকাশিত পুস্তিকায় (১৯৬৬) প্রকাশিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধের শেষাংশটি ১৭৯নং রচনার পুনর্মুদ্রণ। প্র৬।

৩৮২. পোড়ো জমি (ভূমিকা)

অনিল বিশ্বাস কর্তৃক টি এস এলিঅটের *The Waste Land*-এর অনুবাদ 'পোড়ো জমি' গ্রন্থের জন্য লিখিত খুবই ছোট ভূমিকা।

১৯৬৭

৩৮৩. বিচ্ছেদ ভাবিয়া (প্রবন্ধ)

'মানব মন', জানুয়ারি ১৯৬৭। প্যাভলভ ইনস্টিটিউটের ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'বিচ্ছিন্নতার সমস্যা' বিষয়ে কয়েকটি

আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের আলোচনা হয় স্টুডেণ্টস হল-এ, ১১ ডিসেম্বর। সভাপতি ছিলেন বিষ্ণু দে। কয়েকজন আধুনিক কবি আলোচনায় যোগ দেন। আলোচ্য রচনাটি সভাপতির ভাষণের অনুলিপি।

৩৮৪. **মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা (প্রবন্ধ)**

প্রকাশ: ২৫ বৈশাখ ১৩৭৪ (৯ মে ১৯৬৭)। প্রকাশক: চিন্মোহন সেহানবীশ ; মনীষা গ্রন্থালয় ; কলকাতা ১২।

উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়কে / শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্যকে'। বোর্ড-বাঁধাই ; সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৯ টাকা। প্রবন্ধের সংখ্যা ১৮। পৃ ১০+২১৬।

প্র৩ ও প্র৪ গ্রন্থদুটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ওখানকার বহু প্রবন্ধই এখানে স্থান পেয়েছে—১৮টি প্রবন্ধর মধ্যে ১২টি। পুরোনো প্রবন্ধ: ১. মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স, ২. চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, ৩. এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য, ৪. যামিনী রায় ও শিল্প-বিচার, ৫. মস্কভা-পিকাসো সংবাদ, ৬. লোকশিল্প ও বাবুসমাজ, ৭. আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড, ৮. প্রমথ চৌধুরী ও আমরা, ৯. আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক, ১০. ভারতপথিক ইংরেজ কবি, ১১. সাম্প্রতিক মার্কিন সাহিত্য, ১২. জনসাধারণের রুচি। নতুন প্রবন্ধ: ১. মনীষার পৌরাণিক চরিত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ২. রবীন্দ্রশতবার্ষিকী, ৩. শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা [সূচি-পত্রে ভুল ছাপা হয়েছে 'শিল্পকথা', 'রবীন্দ্রকথা'-র বদলে], ৪. বিদেশীর চোখে যামিনী রায় ও তাঁর ছবি, ৫. কোণার্কের মৃত্যু, ৬. শেক্সপীঅর ও বাংলা।

৩৮৫. অসম্পূর্ণের কবিতা (কবিতা)

'পরিচয়', চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৩-৭৪। 'অসম্পূর্ণ কবিতা' নামে ক১৩ গ্রন্থে।

৩৮৬. আশা যেন মাতৃভাষা (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৭৪। ক১৩।

৩৮৭. চেনা মুখের আদল (কবিতা)

'দেশ', শারদীয় ১৩৭৪। ক১৩।

৩৮৮. বিপ্লবকালীন ও পরবর্তী সোভিয়েত কবিতা (প্রবন্ধ)
'সোভিয়েত বিপ্লব পরিচয় : পঞ্চাশৎ বার্ষিক সংকলন' (প্রকাশক : সোভিয়েত-বিপ্লব পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি, কলকাতা ১৩। ৭ নভেম্বর ১৯৬৭) গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ।

৩৮৯. **রূপতী পঞ্চাশতী (কাব্যসংগ্রহ)**
প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬৭। প্রকাশক : তরুণ সেনগুপ্ত ; মনীষা। বোর্ড-বাঁধাই ; সুবোধ দাশগুপ্ত অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৩ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৫০। পৃ ১২+৮৪। "মনীষা যে পঞ্চাশটি ভালো-মন্দ কবিতা সোভিএট বিপ্লবের পঞ্চাশৎ-বার্ষিক উৎসবে প্রকাশ করেছেন, তার জন্য আনন্দিত বোধ করছি।" (মুখবন্ধ)। কবির সুদীর্ঘ কাব্যরচনা থেকে সময়োপযোগী কবিতার সংকলন এই গ্রন্থ—প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো কবিতা, যেমন 'জল দাও', আংশিকভাবে উদ্ধৃত, কিংবা কোনো কবিতার শিরোনাম পরিবর্তিত, যেমন, 'সন্দ্বীপের চর' গ্রন্থের 'মৌভোগ' এখানে 'লাল নিশান'।

৩৯০. ওথেলো (ভূমিকা-প্রবন্ধ)
সুনীল চট্টোপাধ্যায় অনূদিত 'ওথেলো' (সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৭) গ্রন্থের মুখবন্ধ। 'শেক্সপীঅর ও বাংলা' নামে পূর্বেই ছাপা হয় (৩৫৭ নং রচনা)। ঐ নামেই প্র৫ গ্রন্থে।

১৯৬৮

৩৯১. পূর্ববঙ্গের বাংলা (প্রবন্ধ)
'সাহিত্যপত্র', পৌষ-ফাল্গুন ১৩৭৪। অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলকাতায় প্রদত্ত প্রথম কথিকার (কবে জানা নেই—সম্ভবত ১৯৬৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে) পরিবর্তিত রূপ। দ্র. ৩৯৫ নং রচনা।

৩৯২. ৭ই নভেম্বরের রোজনামচায় (কবিতা)
'সাহিত্যপত্র', পৌষ-ফাল্গুন ১৩৭৪। ক১৩।

৩৯৩. A Century of Bengali Literature (প্রবন্ধ)
The Amrita Bazar Patrika Supplement, 8 March 1968. *An Introduction to Bengali Literature* নামে প্র৬ গ্রন্থে (সেখানে রচনাকাল দেওয়া আছে ১৯৪৩)।

৩৯৪. [আধুনিক কবিতা ও কবিকথা] (প্রশ্নোত্তর)

২২-২৭ এপ্রিল ১৯৬৮ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কিত প্রদর্শনী' উপলক্ষে প্রকাশিত ১৮ জন আধুনিক কবির প্রশ্নোত্তরমূলক পুস্তিকা 'আধুনিক কবিতা ও কবিকথা'-য বিষ্ণু দে-র ৩টি প্রশ্নোত্তর ছাপা হয়েছে— প্রধানত 'ঘোড়সওয়ার' ও 'জল দাও' কবিতারচনার অনুষঙ্গ বিষয়ে। প্রশ্নকর্তার মন্তব্য : "বিষ্ণু দে প্রথাগতভাবে প্রশ্নের উত্তর দেন নি। আত্মচারণার ভঙ্গিতে স্মৃতিকথন করেছেন। আমরা সেই স্বগত সংলাপ থেকে আমাদের প্রশ্নানুসারে উত্তরকে তুলে ধরার ক্ষীণ চেষ্টা করেছি।"

৩৯৫. পূর্ববঙ্গের কবিতা (প্রবন্ধ)

'সাহিত্যপত্র', চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪-৭৫। দ্বিতীয় বেতার-কথিকার পরিবর্তিত রূপ (দ্র. ৩৯১ নং রচনা)।

৩৯৬. ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে (কবিতা)

'পরিচয়', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫। ক১৩।

৩৯৭. [শোকনিবেদন]

'সাহিত্যপত্র', আষাঢ়-ভাদ্র ১৩৭৫। 'সাহিত্যপত্রে'র প্রাক্তন সম্পাদক ও সহযোগী নবযুগ আচার্য-র মৃত্যুতে সংক্ষিপ্ত শোক-নিবেদন।

১৯৬৯

৩৯৮. রবীন্দ্রচিন্তার এদিকে ওদিকে (প্রবন্ধ)

'ধ্বনি', ২২ মার্চ ১৯৬৯। ঐ পত্রিকারই ১০ মে ১৯৬৯ সংখ্যায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩৯৯. কি করে লেখক হলুম (প্রবন্ধ)

'অমৃত', ১১ জুলাই ১৯৬৯।

৪০০. **সংবাদ মূলত কাব্য (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭৬ (জুলাই ১৯৬৯)। রচনাকাল : ১৯৪৭-৬৫ (তবে ১৯৪৭-৬১ পর্যন্ত কবিতা মাত্র ৮টি, বাকি কবিতা ১৯৬২-৬৫ মধ্যে)। প্রত্যেকটি কবিতারই রচনাকাল দেওয়া আছে এবং কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত। প্রকাশক : আশীষ মজুমদার ; সাহিত্য-পত্রগ্রন্থ ; কলকাতা-৬।

উৎসর্গ : 'শামসুর রহমান / আবুবকর সিদ্দিক /—পূর্ববঙ্গের সহ-কর্মীদের উপহার।' বোর্ড-বাঁধাই ; পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৪ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৮৯। পৃ ১০+১০২।

৪০১. শেষ কথা (প্রবন্ধ)

টি. এস. এলিঅটের মৃত্যুর পরে ঐ উপলক্ষে লিখিত—'এলিয়টের কবিতা' (৩য় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৭৬) গ্রন্থের একেবারে শেষাংশে সন্নিবিষ্ট। সেখানে রচনাকাল দেওয়া আছে : জানুয়ারি ১৯৬৫। বেতার কথিকা ? প্র৭ গ্রন্থে এটি 'এলিঅট প্রসঙ্গে'-র ৪র্থ রচনা।

৪০২. দুটি কবিতা / এলিঅটের কবিতার ভাবানুবাদ (কবিতানুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৭৬। 'তত্ত্ববোধিকা দৈনিকী' ও 'মিস নেলি কাপক'। প্রথম কবিতাটির শীর্ষে মাইকেলের হেক্টর বধ থেকে উদ্ধৃতি আছে। ক১৭। তবে উক্ত গ্রন্থে শিরোনাম : 'এলিঅটের পদাঙ্কে'। সেখানে প্রথম কবিতাটির নাম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং মাইকেলের উদ্ধৃতি বর্জিত।

৪০৩. [কবিমনন ও কাব্যচিন্তা প্রসঙ্গে] (প্রশ্নোত্তর)

'অন্যমনে', শরৎ ১৩৭৬। কবিতা ও জীবন প্রসঙ্গে বিভিন্ন কবিকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত পরিকল্পিত নির্দিষ্ট ৭টি প্রশ্ন পাঠানো হয়। সেই সূত্রেই বিষ্ণু দে-র সংক্ষিপ্ত উত্তর।

৪০৪. [লোকনাথ ভট্টাচার্য-কে] (চিঠি)

'দৈনিক কবিতা', শরৎ সংকলন ১৯৬৯-এ প্রকাশিত লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'গ্রাম্য দেশে নাগরিক' প্রবন্ধে লেখককে পাঠানো বিষ্ণু দে-র ৭টি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে (রচনাকাল : ১৯৬৬-র ২৫ অক্টোবর থেকে ১৯৬৭-র ১৮ মার্চ)। দেশের তৎকালীন নানাবিধ সংকট ও রিখিয়ার কথা আছে ঐ চিঠিগুলোতে।

৪০৫. এ বড় রঙ্গ তো (কবিতা)

'সাপ্তাহিক বসুমতী', শারদীয় ১৩৭৬। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন-জয় উপলক্ষে লেখা। ক১৪, ক১৫।

৪০৬. **Marx and Literature in Bengal** (প্রবন্ধ)

P.C. Joshi সম্পাদিত *Homage to Karl Marx* রচনাসংকলনের (PPH, ডিসেম্বর ১৯৬৯) একটি প্রবন্ধ। *Marx and Bengali Writing* নামে প্র৬ গ্রন্থে।

ইংরেজিতে মূল লেখাটি প্রকাশের আগেই বাংলা অনুবাদ [অরুণ সেন কৃত] 'মার্কস ও বাংলা দেশে সাহিত্য' বেরোয় 'সাহিত্যপত্র', পৌষ-ফাল্গুন ১৩৭৫ সংখ্যায়। বিষ্ণু দে রচিত পরিবর্ধিত বঙ্গীয় সংস্করণ 'সাহিত্যের সেকাল থেকে মার্কসীয় একাল' (দ্র. ৪২৫নং রচনা)।

১৯৭০

৪০৭. The Lesson of James Joyce (প্রবন্ধ)
রচনাকাল, প্রকাশকাল ও স্থান জানা নেই (১৯৭০ ?)। *The Letters of James Joyce* নামে প্রণ্ড গ্রন্থে। বাংলা সংস্করণ : ৪০৮নং রচনা।

৪০৮. জেমস্ জয়েসের উদাহরণ (প্রবন্ধ)
'অমৃত', ২ মাঘ ১৩৭৬। দ্র. ৪০৭নং রচনা।

৪০৯. রবীন্দ্রচর্চা (প্রবন্ধ)
'বেতার জগৎ', ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। এই শিরোনামায় ৪ জন লেখকের ধারাবাহিক বেতারকথিকার লিখিত রূপ (অপর ৩ জন : প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও পুলিনবিহারী সেন)।

৪১০. সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ (প্রবন্ধ)
'অমৃত', ৯ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা (মার্চ ১৯৭০)। ঐ নামের ধারাবাহিক রচনার অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ।

৪১১. অধিকার রক্তের কবিতা (পুস্তক সমালোচনা)
'পরিচয়', চৈত্র ১৩৭৬। গণেশ বসু-র ঐ নামের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা।

৪১২. **ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে (কাব্যগ্রন্থ)**
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৭। রচনাকাল : ১৯৬৬-৬৯। কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত। প্রকাশক : প্রশান্ত ভট্টাচার্য ; সারস্বত লাইব্রেরী ; কলকাতা ৬।
উৎসর্গ : 'শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কে শ্রীমান মণীন্দ্র রায়-কে'। বোর্ড-বাঁধাই ; প্রাণকৃষ্ণ পাল অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৭৭। পৃ ৮+৯৬।

৪১৩. ['সাক্ষাৎকার' প্রসঙ্গে প্রতিবাদ] (চিঠি)

'দৈনিক কবিতা', ২৫ বৈশাখ ১৩৭৭। কবিতা সিংহ লিখিত 'ঘরোয়া কথা : প্রণতি দে-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার' ('দৈনিক কবিতা', শরৎ ১৯৬৯) রচনাটির বিভিন্ন তথ্যগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভ্রান্তির নির্দেশক চিঠি।

৪১৪. নবান্নর পঁচিশ বছর ও নাট্য আন্দোলন (প্রবন্ধ)

'বহুরূপী', নবান্নস্মারকসংখ্যা২, জুন ১৯৭০। 'অমৃত', ১০ বর্ষ ৪ সংখ্যা (জুন ১৯৭০)। প্রায় একই সঙ্গে এই দুটি পত্রিকায় বেরোয়। *Navanna—A people's play* প্রবন্ধের (১৯৪৫) মূল অংশের (দ্র. ১৩৭নং রচনা) বঙ্গীয় সংস্করণ এবং সেই সঙ্গে ১৯৭০ সালে লিখিত সমকালীন বঙ্গীয় নাট্য আন্দোলন বিষয়ে সংযোজন।

৪১৫. আধুনিক আফ্রিকান কবিতা (কবিতানুবাদ)

'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৭৭। বিরাগো দিওপ্, লেওপোল্দ সেনয়র্, য়োসে ক্রেযাভেবিন্‌হা, আগোস্তিন্‌হো নেতো, নোয়েমিয়া দে সূসা, চিকায়া উ তাম্‌সি, ভালেন্তে মালাংগাতানা, দাভিদ দিওপ্ —এই ৮ জন আধুনিক আফ্রিকান কবির মোট ১৩টি কবিতার অনুবাদ। দ্র. ৪১৬নং রচনা।

৪১৬. **আফ্রিকায় এশিয়ায় মুরলী মৃদঙ্গে তূর্যে (অনুবাদপুস্তিকা)**

প্রকাশ : [১৯৭০]। প্রকাশক : প্রসূন বসু ; চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি কমিটি ; কলকাতা ১৩। মোটা কাগজের মলাট ; প্রচ্ছদপটে প্রদোষ দাশগুপ্ত-র ভাস্কর্যের আলোকচিত্র ব্যবহৃত। দাম ১ টাকা। কবিতার সংখ্যা ১৫। পৃ ২+১৮। ৪১৫নং রচনার কবিতাগুলির সঙ্গে আরো ২টি সংযোজিত।

৪১৭. **An artist in life** (পুস্তক সমালোচনা)

Indian Literature **(Sahitya Akademi),** ১৯৭০ (?)। নীহাররঞ্জন রায় লিখিত রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক ঐ নামের গ্রন্থটির (প্রকাশক : কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়) সমালোচনা।

১৯৭১

৪১৮. এই আমাদের কলকাতা (প্রবন্ধ)

'সপ্তাহ', ৮ জানুয়ারি ১৯৭১। ৩৭২নং রচনার বঙ্গীয় সংস্করণ।

৪১৯. বাংলা দেশের কবিতা : এক স্তবক (ভূমিকা-প্রবন্ধ)

বিষ্ণু দে সম্পাদিত ঐ নামের কাব্যসংকলনের (মনীষা, সেপ্টেম্বর ১৯৭১) ভূমিকা।

৪২০. রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার গরজে (প্রবন্ধ)

'ধ্বনি', কার্তিক ১৩৭৮।

১৯৭২

৪২১. অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলায় বাংলায় (কবিতা)

'সাহিত্যপত্র', চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৮-৭৯। বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিনগুলিতে বিভিন্ন সময়ে লিখিত ও প্রকাশিত কবিতাকে গ্রথিত করেছেন বিষ্ণু দে এই দীর্ঘ কবিতায়। ক১৪, ক১৫।

৪২২. In the Sun and the Rain/Essays on Aesthetics (প্রবন্ধগ্রন্থ)

প্রকাশ : মার্চ ১৯৭২। প্রকাশক : People's Publishing House, New Delhi 55. উৎসর্গ : ' I dedicate this book to two of my very good friends for three decades and a half—P. C. Joshi and Hirendranath Mukherji.. ''। জ্যাকেটসহ বোর্ড-বাঁধাই ; প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। দাম ২৫ টাকা। মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ২৭। পৃ ৬+২৫৪।

সূচি : In the Sun and the Rain ; An Introduction to Bengali Literature ; Michael Madhusudan Datta (1824-1873) ; Rabindranath Tagore and the West ; Our Folk-songs ; The Future of our Folk-art ; Rabindranath—Our Modern Painter ; Abanindranath and Modern Indian Art ; Jamini Roy : the Great Artist ; Modern Art and the East ; What Krishna Meant : an Essay on T. S. Eliot ; Let the Crisis Face the Indian Writer ; An English Poet Discovers India ;

The Problem of Art in our Education ; W. B. Yeats in India : a Few Centenary Thoughts ; A Legend in His Lifetime—Satyendranath Bose ; My Calcutta ; The Poetry of Louis Aragon ; Homage to T. S. Eliot ; Marx and Bengali Writing ; India and Modern Art ; *Notes on the way* (The language of the two Bengals ; Father and son : Jamini Roy and Amiya ; The Indian film has passion and power . The letters of James Joyce ; Navanna—after twentyfive years ; Bengal in Oxford and in nowhere).

১৯৪৩-৭০ মধ্যে লিখিত ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধ-সমূহের সংকলন। অধিকাংশ প্রবন্ধেরই বঙ্গীয় সংস্করণ আগে বা পরে রচিত হয়েছে। মুখবন্ধ (*An apology*) আছে (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ তারিখে লিখিত)।

৪২৩. Jamini Roy (প্রবন্ধ)

Mainstream, 6 May 1972. স্থানে স্থানে ৩৩০নং রচনার অংশবিশেষের ইংরেজি অনুবাদ। সমগ্র প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ [অরুণ সেন কৃত] 'যামিনী রায়' নামে 'সাহিত্যপত্র' শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৯ সংখ্যায় বেরোয়।

৪২৪. পূর্ববাংলায় কবি মধুসূদন (প্রবন্ধ)

'আনন্দবাজার পত্রিকা', সুবর্ণজয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৮ (মে ১৯৭২)। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম রচিত গ্রন্থ 'বাংলার কবি মধুসূদন' প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধ। বহু স্থানে ৩১৮নং রচনার অংশ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪২৫. সাহিত্যের সেকাল থেকে মার্কসীয় একাল (প্রবন্ধ)

'বিচিন্তা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। ৪০৬নং রচনার বঙ্গীয় সংস্করণ। তবে এই প্রবন্ধ-র প্রথম ৩টি অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ নতুন।

৪২৬. চীনের জেলখানা থেকে পত্রাবলী / হো চি মিন (কবিতানুবাদ)

'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৭৯। ভিয়েতনামের রাষ্ট্রনায়ক হো চি মিনের ৮টি কবিতার অনুবাদ। ক১৪। তবে গ্রন্থে শিরোনাম ও সজ্জার কিছু পরিবর্তন আছে।

৪২৭. Selected Poems (অনুবাদগ্রন্থ)

প্রকাশ : ১৯৭২। প্রকাশক : P. Lal ; Writers' Workshop, Calcutta 45।

বোর্ড-বাঁধাই এবং মোটা কাগজেব বাঁধাই (কাপড় সহ) দুই-ই আছে ; প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। দাম ৪০ টাকা ও ১০ টাকা যথাক্রমে। পৃ ২০+৭৬।

বিষ্ণু দে-র ৫৬টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। নামপত্রে লেখা আছে : "Translated from the Bengali by variour hands/Edited with an introduction by Samir Dasgupta." বিষ্ণু দে-র সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি, সম্পাদকের ভূমিকা ও বিষ্ণু দে-র গ্রন্থ-বিবরণী আছে।

১৯৭৩

৪২৮. History's Tragic Exultation/A few poems in translation (অনুবাদগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৩। প্রকাশক : People's Publishing House, New Delhi.

উৎসর্গ : "In Memory / of / Bhowani Sen (1909-1972)"। জ্যাকেটসহ বোর্ড-বাঁধাই ; হেমন্ত মিশ্র অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ১৫ টাকা। পৃ ১২+১৩২।

'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলায় বাংলায়' পর্যন্ত সমগ্র কাব্যরচনা থেকে নির্বাচিত ৭৩টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। অধিকাংশই কবি কর্তৃক অনূদিত। অন্যের করাও কয়েকটি আছে। ভূমিকা (*My only Excuse*) আছে (৭ নভেম্বর ১৯৭২-এ লিখিত)। পেছনের মলাটে কবি-পরিচিতি আছে।

৪২৯. Speech of Shri Bishnu Dey the Award-winner (প্রবন্ধপুস্তিকা)

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩। প্রকাশক : Bharatiya Jnanpith.

১৯৭১ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখে দিল্লির বিজ্ঞানভবনে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত ভাষণ।

বাংলা অনুবাদ (অরুণ সেন কৃত) 'কি করে লেখক হলুম' 'সাহিত্য-পত্র', শারদীয় ১৩৮২ সংখ্যায় বেরোয়।

৪৩০. **Bohurupee is Twentyfive now** (প্রবন্ধ)

'বহুরূপী', এপ্রিল ১৯৭৩। বহুরূপী নাট্যসংস্থার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ। রচনাটি প্রায় একই সময়ে তিনটি দৈনিক পত্রিকা (*The Statesman, Hindusthan Standard, Amrita Bazar Patrika*)-র *Twentyfifth year of Bohurupee* শীর্ষক বিজ্ঞাপনী ফিচারে ১ মে ১৯৭৩ তারিখে পুনর্মুদ্রিত।

৪৩১. **রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০। রচনাকাল: ১৯৬৯-৭১ (তবে শেষের দিকে প্রথম জীবনের অপ্রকাশিত কবিতাও কয়েকটি আছে)। প্রকাশক: আহমেদ আতিকুল মাওলা; মাওলা ব্রাদার্স; ঢাকা ১; বাংলাদেশ।

উৎসর্গ: 'বাংলাদেশের নবলব্ধ বন্ধুদের'। বোর্ড-বাঁধাই; কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৬ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৬৫। পৃ ৮+৬৪।

গ্রন্থের শেষভাগে আছে হো চি মিন্-এর ৬টি কবিতার অনুবাদ। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মকালীন ঘটনার সময়ে রচিত 'অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলায় বাংলায়' এই গ্রন্থেই স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থেরই পরিবর্ধিত ভারতীয় সংস্করণ 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' (১৯৭৪)।

৪৩২. [মুখোমুখি] (প্রশ্নোত্তর)

'অন্বিষ্ট', বিশেষ পট-সংকলন, জুলাই ১৯৭৩। প্রশান্ত দাঁ-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পটশিল্প বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর।

৪৩৩. বাংলায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (ভূমিকা-প্রবন্ধ)

অসমীয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া-র নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ 'রতন মুণ্ডা ও কয়েকটি গল্প' (সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৮০ ব। অনুবাদিকা: বীণা মিশ্র) গ্রন্থের জন্য ভূমিকা। রচনার তারিখ: ৯ অগাস্ট ১৯৭৩।

৪৩৪. **সংবাদ-সেবক, কিন্তু নিজে রচয়িতা** (কবিতা)

'পরিচয়', শারদীয় ১৩৮০। 'মহৎ শিল্পের শ্রম' নামে ক১৫ গ্রন্থে।

১৯৭৪

৪৩৫. **বছর পঁচিশ (কাব্যসংগ্রহ)**

প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৮০। প্রকাশক: ব্রজকিশোর মণ্ডল; বিশ্ববাণী প্রকাশনী; কলকাতা ৯।

বোর্ড-বাঁধাই; গৌতম রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ২০ টাকা। পৃ ১৮+৫২৮। কবির প্রতিকৃতির একটি আলোকচিত্র গ্রন্থসূচনায় দেওয়া হয়েছে।

৭টি পুরাতন ও সেই-সময়ে দুষ্প্রাপ্য কাব্যগ্রন্থের সংগ্রহ। এর মধ্যে শেষ ৫টি গ্রন্থ পূর্বে 'একুশ বাইশ' কাব্যসংগ্রহে স্থান পেয়েছিল (১৯৬৫)। গ্রন্থগুলি এখানে রচনাকালের দিক থেকে বিপরীত-ক্রমে সাজানো হয়েছে: ১. স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, ২. আলেখ্য, ৩. তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, ৪. অন্বিষ্ট, ৫. সন্দীপের চর, ৬. সাত ভাই চম্পা, ৭. পূর্বলেখ।

"এই স্থূলকায় বইতে বছর ছাব্বিশ যোগে ছাপা বইগুলি একত্রে সংগৃহীত। লেখার তারিখ ধরলে আরো বেশি বছর নিশ্চয়ই।/ প্রকাশকের তাগিদে এবং পারিবারিক সাহায্যে বইটি বেরোল।" (১০ অক্টোবর ১৯৭৩ তারিখে লিখিত)।

৪৩৬. একালের জিজ্ঞাসা / আলোচনা (প্রশ্নোত্তর)

'নতুন সংস্কৃতি'-র ৩০ এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'আধুনিক বাংলা কবিতার সংগীতরূপ' প্রযোজনা উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা (সম্পাদক: অরুণাচল বসু)-তে এই প্রশ্নোত্তর ছাপা হয়। "১৯৬৭ সালে ও ১৫-১৬ এপ্রিল মফঃস্বল শহর বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয় 'নতুন সংস্কৃতি' সম্মেলন।...একটি বিশেষ কর্মসূচি ছিল একটি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি আলোচনাচক্র। ঐ আলোচনাচক্রে...কবি বিষ্ণু দে, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত, অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রমুখ তাঁদের লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে সহযোগিতা করেন।" (সম্পাদক-লিখিত ভূমিকা)। মোট ১২টি প্রশ্ন ছিল—প্রধানত বাংলাদেশের সংস্কৃতির সংকট ও রূপান্তরের উপায় সম্পর্কে।

৪৩৭. [আধুনিক বাংলা কবিতার সংগীতরূপ] (চিঠি)

৪৩৬নং রচনায় উল্লিখিত পুস্তিকায় এই চিঠিটি বেরোয়। 'নতুন সংস্কৃতি' সংগঠনের "পরীক্ষামূলক সংগীতপ্রচেষ্টা" (আধুনিক কবিতায় সুরারোপ) বিষয়ে সমর্থনসূচক সংক্ষিপ্ত চিঠি, সম্পাদক অরুণাচল বসু-কে লেখা। তারিখ : ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, রিখিয়া-দেওঘর থেকে।

৪৩৮. **ঈশাবাস্য দিবানিশা (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮১। ১৯৬৯-৭৩। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী . কলকাতা ৯।

উৎসর্গপত্র নেই। বোর্ড-বাঁধাই ; গৌতম রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৬ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৯৯। পৃ ১০+১১৮।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে' (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থেরই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রথমাংশের অধিকাংশ কবিতা ঐ গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হয়েছে—তবে সজ্জায় ঈষৎ পার্থক্য আছে এবং শেষাংশের (২২.১২.৭১-এর পর থেকে) সব কবিতাই সংযোজিত। হো চি মিনের কবিতানুবাদ বর্জিত হয়েছে। অনেক পুরোনো কবিতা কয়েকটি ছাপা হয়েছে।

৪৩৯. Poet's note [on the poem *Water My Roots*] (প্রশ্নোত্তর)

University of Heidelberg (Deptt. of Modern Languages and Literatures : South Asia Institute) প্রকাশিত ***South Asian Digest of Regional Writing*, Vol. 2 (1973)** গ্রন্থের অন্তর্গত **The Making of a poem : Towards a creative theory of creativity in Contemporary Poetry** খণ্ডের বাংলা-অংশে বিষ্ণু দে-র কবিতা 'জল দাও'-র যে কবি-কৃত ইংরেজি অনুবাদ (***Water My Roots***) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, তার শেষে ৪টি অংশে বিন্যস্ত কবির টীকা। টীকার অনুবাদক : এ দাশগুপ্ত ও এস চক্রবর্তী। গ্রন্থের প্রকাশকাল : ১৯৭৪। ভারতীয় অংশের অন্যতম সম্পাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

১৯৭৫

৪৪০. [বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে] (চিঠি)

'লা পয়েজি', অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৪ (প্রকাশকাল ১৯৭৫)। পত্রিকার 'কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-ক্রোড়পত্রে' লেখার জন্য আমন্ত্রণের উত্তরে কবি সম্পর্কে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাসূচক বিষ্ণু দে-র ছোট চিঠি। তারিখ : রিখিয়া / ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫।

৪৪১. **[Jamini Roy]** (প্রবন্ধ)

যামিনী রায়ের মৃত্যুর পর তাঁরই গৃহে প্রথম যে চিত্রাবলির প্রদর্শনী হয় (২৫ জানু-৩ ফেব্রু ১৯৭৫), তার ক্যাটালগের মুখবন্ধ হিসেবে শিরোনামহীন ক্ষুদ্র রচনা। রচনাকাল : রিখিয়া, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৪। প্রদর্শনীস্থান ও ক্যাটালগের প্রকাশস্থান : ১৮ বালিগঞ্জ প্লেস ইস্ট, কলকাতা ১৯।

৪৪২. ভারত ভূখণ্ডের পরিণতি ও বাংলা (প্রবন্ধ)

'গণসাহিত্য' (বাংলাদেশ), চৈত্র ১৩৮১। ৪২৫নং রচনাবই পুনর্মুদ্রণ, ঈষৎ পরিমার্জনার পর।

৪৪৩. [রবীন্দ্রনাথকে] (চিঠি)

'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮২। রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিষ্ণু দে-র ২টি চিঠি (১৯৩২ ও ১৯৩৮ সালে লেখা)।

৪৪৪. পাদটীকা

'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮২। ৩০ ও ৭০নং রচনায় উল্লিখিত চিঠি দুটি প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে রচিত 'পাদটীকা'। বিষয় : রবীন্দ্রনাথের এলিঅট পাঠ ও অনুবাদ এবং সে-ব্যাপারে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগের কাহিনী।

৪৪৫. **চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর (কাব্যগ্রন্থ)**

প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮২। রচনাকাল : ১৯৭৪-৭৫ (প্রধানত)। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল ; বিশ্ববাণী প্রকাশনী ; কলকাতা ৯। উৎসর্গ : 'শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়-কে / শ্রীহীরেন মিত্র-কে'। বোর্ড-বাঁধাই ; মনোজ বিশ্বাস অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৫৪। পৃ ৮+৬৪।

প্রথম কবিতাটি ১৯৬৪ সালে রচিত (বস্তুত এটি ১৯৬৩ সালে রচিত

এবং 'সেই অন্ধকার চাই' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততি জন্মদিনে' কবিতাটিরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ) এবং গ্রন্থের শেষে আছে ১৯৪৮-এর একটি কবিতা। সর্বশেষে বিভিন্ন-সময়ে-রচিত "রাজনৈতিক ছড়া"গুলি একত্রিত করে 'কান্নাহাসির ইতিহাস থেকে কয়েকটি ছড়া' নামে এখানে ছাপা হয়েছে—এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সাম্প্রতিককালে রচিত আরো কয়েকটি 'রাজনৈতিক ছড়া'।

৪৪৬. **জনসাধারণের রুচি (প্রবন্ধগ্রন্থ)**

প্রকাশ : পৌষ ১৩৮২ (ডিসেম্বর ১৯৭৫)। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল ; বিশ্ববাণী প্রকাশনী ; কলকাতা ৯।

উৎসর্গ : 'বন্ধুবর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কেই উৎসর্গ করছি—আমাদের উভয়ের পরলোকগত বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিতে'। বোর্ড-বাঁধাই ; গৌতম রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ১০ টাকা। পৃ ৮+১৭৬।

গ্রন্থটি বস্তুত 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৫২)-এরই পুনর্মুদ্রণ এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত কয়েকটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'-এর ১৮টি প্রবন্ধ ছাড়া অতিরিক্ত আছে : ১. জনসাধারণের রুচি:(১৪২নং রচনা), ২. এলিঅট প্রসঙ্গে (এই প্রবন্ধের ৪টি অংশ। প্রথমটি ৪২নং রচনা। দ্বিতীয়টি ২৩৫নং রচনার ভূমিকা। তৃতীয়টি ২৭৫নং রচনা। চতুর্থটি ২৩৫নং রচনার, তৃতীয় সংস্করণের শেষ প্রবন্ধ)। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'-এর প্রবন্ধগুলো এখানে অবশ্য ভিন্ন ক্রমে বা বিন্যাসে ছাপা হয়েছে। যেমন, শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধগুলো একটি সাধারণ শিরোনাম 'বাংলায় শিল্পচর্চা'-র তলায় একত্রে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ফলে এ গ্রন্থে প্রবন্ধের সংখ্যা ১৮।

৪৪৭. প্রতীক্ষার্থী (ভূমিকা)

সুমিত চক্রবর্তীর ঐ নামের কাব্যগ্রন্থ (চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, ১৯৭৫)-র জন্য সংক্ষিপ্ত ভূমিকা।

৪৪৮. **Exhibition of Mosaic Paintings by Amiya Roy** (ভূমিকা)

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ অনুষ্ঠিত (১৯৭৫ ?) এই প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় যামিনী রায়ের পুত্র শিল্পী অমিয় রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান।

১৯৭৬

৪৪৯. প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (প্রশ্নোত্তর)
'কালান্তর', ২৫ এপ্রিল ১৯৭৬। "পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি লেখক সম্মেলন [১-২ মে ১৯৭৬] উপলক্ষে আমাদের ৩টি প্রশ্ন ও তার উত্তর নীচে প্রকাশিত হল।" (সম্পাদক, 'রবিবারের পাতা', 'কালান্তর')। প্রধানত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও লেখকের জীবনে সংঘের প্রভাব এবং ১৯৭৬ সালে (৪০তম প্রতিষ্ঠা বৎসরে) এই সম্মেলনে কিভাবে পালিত হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র সংক্ষিপ্ত মন্তব্য (মৌখিক উত্তরের অনুলিপি)।

৪৫০. যামিনী রায়ের চিত্রসাধনা / যামিনী রায় ও বিষ্ণু দে-র কথালাপ (সাক্ষাৎকার বিবরণী)
'পরিচয়', শারদীয় ১৩৮৩। যামিনী রায় ও বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ (সম্ভবত পাঁচটি বৈঠকের) কথালাপের যে ধারাবাহিক সম্প্রচার হয় আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে, তার তিনটি বৈঠকের অনুলিপি [অনুলেখক : দেবেশ রায় ও অরুণ সেন]। প্র৮।

১৯৭৭

৪৫১. **Contemporary Jorano Pats and Patuas of Bengal** (ভূমিকা)
ব্রিটিশ পেইন্টস্ ডেকর সার্ভিস-এর উদ্যোগে ফরাসী মহিলা **Mademoiselle Rosita de Selva**-উপস্থাপিত বাংলাদেশের লোকশিল্প জড়ানো-পটের যে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় (কলকাতার ডেকর সার্ভিস ভবনে ২৪ মার্চ-৭ এপ্রিল ১৯৭৭), তার জন্য প্রকাশিত স্মারকপত্রে সংগ্রাহিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান। রচনার তারিখ ১৫ মার্চ ১৯৭৭।

৪৫২. ইস্কুলের গল্প (সাক্ষাৎকার)
'যুগান্তর', ২৬ এপ্রিল ১৯৭৭। 'ছোটদের পাততাড়ি'-তে প্রকাশিত 'নিজস্ব প্রতিনিধি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বিষ্ণু দে-র স্কুলজীবনের কাহিনী ছোটদের জন্য।

৪৫৩. **উত্তরে থাকো মৌন (কাব্যগ্রন্থ)**
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৭। রচনাকাল : মূলত ১৯৭৫-৭৬। প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব ; আনন্দ পাবলিশার্স ; কলকাতা ৯।

উৎসর্গ : 'শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক / শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ দত্ত'। বোর্ড-বাঁধাই ; পূর্ণেন্দু পত্রী অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৪৩। পৃ ৮+৪৬।

১৯৩৪-৩৫ থেকে শুরু করে অতীতের কয়েকটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। 'এলিঅটের পদাঙ্কে' নামে ২টি অনুবাদ-কবিতা, 'নিতান্তই পিঁপড়ের ছড়া', 'কতিপয় বৈজ্ঞানিক ছড়া', 'কবিতার ধাঁধা' ইত্যাদি নানা ধরনের ও নানা সময়ের রচনা এই গ্রন্থের শেষভাগে সংযোজিত হয়েছে।

৪৫৪. পঞ্চানন রায় স্মরণে (কবিতা)

পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায় সম্পাদিত 'ঘাটালের কথা' গ্রন্থের (বাণী সংসদ, জুলাই ১৯৭৭) ভূমিকা-অংশের অন্তর্গত 'গবেষক পঞ্চানন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য' রচনাটির জন্য দ্বিতীয় সম্পাদকের অনুরোধে বিষ্ণু দে এই কবিতাটি লিখে দেন। কবিতার মুখবন্ধ হিসেবে বলা হয়েছে : "আধুনিককালের প্রখ্যাত কবি বিষ্ণু দে সংস্কৃত কলেজে শ্রীরায়ের বন্ধু ছিলেন এবং সে সময়ে দুজনে পত্রিকা সম্পাদনাও করতেন। শ্রীরায়ের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি যে কবিতাটি লিখেছেন সেটি এখানে মুদ্রিত করা হল।"

কবিতাটিতে পঞ্চানন রায়ের "আশ্চর্য চারিত্র্যে"র কথা তো আছেই— বাংলাদেশের মন্দির-বিশেষজ্ঞ ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচিঅনের উল্লেখও আছে।

৪৫৫. **যামিনী রায় (প্রবন্ধগ্রন্থ)**

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭৭। প্রকাশক : শীলা ভট্টাচার্য ; আশা প্রকাশনী ; কলকাতা ৯।

বোর্ড-বাঁধাই ; অমিয় রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ১২ টাকা। পৃ ৮+১৪৮।

যামিনী রায় বিষয়ক বিষ্ণু দে-র সমস্ত প্রবন্ধ, যামিনী রায় লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠি ইত্যাদির সংকলন।

এই গ্রন্থে আছে : বিষ্ণু দে লিখিত প্রবন্ধ (৫টি)+বিষ্ণু দে-যামিনী রায়-কথালাপ (১টি। ৪৫০নং রচনা)+যামিনী রায় লিখিত

প্রবন্ধ (২টি)+যামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (২টি)+ বিষ্ণু দে-কে লেখা যামিনী রায়ের চিঠি (৭১টি)। বিষ্ণু দে-র মোট ৫টি প্রবন্ধের মধ্যে ৪টিই পুনর্মুদ্রণ : 'যামিনী রায়' ; 'যামিনী রায় ও শিল্পবিচার' ; 'বিদেশীর চোখে যামিনী রায় ও তাঁর ছবি' ; 'শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা'। গ্রন্থের ১ম প্রবন্ধ 'যামিনী রায়ের কথা' সম্পূর্ণ নতুন ও অপ্রকাশিত রচনা [ফাইডন প্রেস যামিনী রায়ের অ্যালবাম প্রকাশ করার যে পরিকল্পনা করে, কিন্তু পরে নানা কারণে পরিত্যক্ত হয়, তার জন্যই ভূমিকা হিসেবে ইংরেজিতে একটি রচনা লিখতে শুরু করেন বিষ্ণু দে—বর্তমান প্রবন্ধটির গোড়াপত্তন সেই অসমাপ্ত ইংরেজি রচনাটির বঙ্গীয় রূপান্তর করতে গিয়েই]।

বিষ্ণু দে লিখিত মুখবন্ধ এবং গ্রন্থের শেষে অরুণ সেন সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ' নামে টীকা-অংশও আছে।

১৯৭৮

৪৫৬. স্মৃতি (প্রবন্ধ)

'পরিচয়', শারদীয় ১৯৭৮।

"নিজের জীবনের কথা লিখতে আমার লজ্জা করে। হাল্কাছলে গল্প করে, মজা করে বলা চলে এই পর্যন্ত। কিন্তু আমার অতি প্রিয়জন দীপেনের বারবার অনুরোধে যতটা পারি বলছি শরীরটা সম্প্রতি আবার অসুখের পর বড় দুর্বল, তাই নিজে কিছু লিখতে পারছি না।" প্রধানত ১৩-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত "ছেলেবেলার কথা"।

১৯৭৯

৪৫৭. দীপেন (প্রবন্ধ)

'পরিচয়', মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৫। 'পরিচয়'-এর প্রয়াত সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে প্রণতি দে কর্তৃক "অনুলিখিত"।

সংশোধন

রচনাপঞ্জির ক্ষেত্রে, বিশেষত যে-ব্যস্ততায় এটি ছাপা হয়েছে, তাতে সংশোধন নির্দেশ করা প্রায় বাতুলতা। নিশ্চিত জানি, ভবিষ্যতে অনেক ভুলই বেরোবে। সেজন্য আগেই থেকেই ক্ষমাপ্রার্থী।

তবু যে-ভুলগুলো ছাপা হওয়ার অব্যবহিত পরেই চোখে পড়েছে, তার তালিকা দেওয়া গেল।

১. ইংরেজি শিরোনামে বড়হরফ-ছোটহরফ ব্যবহারে কোনো সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি।

২. ৪ পৃ ২১নং রচনা ভুলক্রমে ১৯৩১-এর তলায় বসেছে, ওটি ১৯৩০ সালের একমাত্র রচনা।

৩. ৬ পৃ ৩৪নং রচনায় ২ লাইনে **Virginia Woolf** হবে।

৪. ঐ ৩ লাইনে **Desmond** ইটালিক্‌স্ হবে না।

৫. ঐ ৩৫নং রচনায় শেষ লাইনে ৪২৮-এর স্থানে ৪২৯ হবে।

৬. ৯ পৃ ৩৯নং রচনায় ২ লাইনে 'অন্তর্ভুক্ত' হবে।

৭. ঐ ৪২নং রচনায় শেষ লাইনে ৪৪৪-এর স্থানে ৪৪৬ হবে।

৮. ১৩ পৃ ৬৪নং রচনায় ২ লাইনে **Louis Macniece** হবে।

৯. ১৪ পৃ ৭৫নং রচনায় ৩ লাইনে ***Christmas Holiday*** হবে।

১০. ১৬ পৃ ৯১নং রচনায় শেষ লাইনে ৩৩৬ এর স্থানে ৩৭১ হবে।

১১. ১৯ পৃ ১১৩নং রচনায় ২ লাইনে 'সম্পাদিত' হবে।

১২. ৩০ পৃ ১৬৮নং রচনায় ৯ লাইনে 'সাহিত্যসৃষ্টিবিরোধী' হবে।

১৩. ৩৯ পৃ ২১১নং রচনায় ১ লাইনে 'পাবলো নেরুদা' হবে।

১৪. ঐ ২১৮নং রচনায় ১ লাইনে **Jamini Roy** হবে।

১৫. ৪৮ পৃ ২৭৩নং রচনায় ১ লাইনে 'তাঁবু বয়ে' হবে।

১৬. ৫০ পৃ ২৮৬নং রচনায় ৩ লাইনে 'জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের গান' হবে।

১৭. ৫১ পৃ ২৯৬নং রচনায় ২ লাইনে ১৩৬৫-এর পরে দাঁড়ি বসবে।

১৮. ঐ ২ লাইনে 'রচনাকাল : [১৯৫৫-৫৮]' হবে।

১৯. ঐ ২ লাইন ১ লাইনের সঙ্গে সমতায় বসবে।

সংস্কৃত গ্রন্থমালা

* উপনিষদের কথা
  সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪·০০
* তন্ত্রের কথা
  সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ১০·০০
* রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী
  তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪·৫০
* বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা
  সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৫·০০
* স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন
  ডঃ শঙ্কর ঘোষ ২০·০০
* চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ
  গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ১০·০০
* প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য
  ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৫·০০
* সংস্কৃত নাটকের গল্প
  অমিতা চক্রবর্তী ৮·০০
* সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান ৪০·০০
  (প্রায় সাড়ে-তিন হাজার উল্লেখ্য বাঙালীর জীবনী)

PARICHAYA May—July 79 WB/NC-173

পরিচয়

শারদীয় সংখ্যা

প্রবীন ও নবীন লেখকদের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও সমালোচনা সহ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার বই সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বেরবে।

আনুমানিক মূল্য ১০ টাকা

গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না

দাম ঃঃ সাত টাকা